নবম ভাগ। ১৩০৫ সাল। ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ সংখ্যা।

জন্মভূমি।

নবম ভাগ—১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ সংখ্যা।

পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, ১৩০৫ সাল।

পৌষ।

বিষয়		পৃষ্ঠা
মহামারী—মহাকালী	...	১
নাগ-পূজা ...	...	২
খৃষ্টানের প্রতিমা	...	৪
নিজের ফাঁদে ...	...	৬
দূর-শ্রবণ যন্ত্র ...	...	৯
বাঙ্গালা-সংবাদ-পত্রের ইতিহাস		১৪

মাঘ।

বাঙ্গালা ভাষার লেখক	...	১৭
শান্তির সম্রাট ...	...	২৪
প্রণয়ে প্রাণদণ্ড ...	...	২৯
পাপের প্রায়শ্চিত্ত	...	৩০
চুম্বনের স্রোতঃ ...	...	৩২

ফাল্গুন।

বিষয়		পৃষ্ঠা
শর্করা-সন্দেশ ...	...	৩৩
চোরবিদ্যা বড়বিদ্যা	...	৩৫
বিড়ালে বিরাগ ...	...	৩৯
প্রেমের পরিণাম ...	...	৪২
সবুরে মেওয়া ...	...	৪৩
ফরাসী য়িহুদি ...	...	৪৭
চক্রবাক-মিথুন ...	...	৪৮

চৈত্র।

মজুরে মহাপ্রলয় ...	...	৪৯
শর্করা-সংহার ...	...	৫৩
চুম্বনের বাজী ...	...	৫৬
বাঙ্গালাভাষার লেখক	...	৫৮
সহোদর স্বামী ...	...	৬৪
নূতন টেলীগ্রাফ ...	...	৬৪

কলিকাতা,

৩৪।১ কলুটোলা ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী ষ্টীম-মেশিন প্রেসে

শ্রীঅরুণোদয় রায় দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩০৫।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ।৴০ দশ আনা। প্রতিখণ্ডের মূল্য চারি পয়সা।

ভ্যালুপেবলে লইলে ৸০ তের আনা লাগে। কিন্তু

...জয়া বটিকা—আদিস্থান বেড়ুগ্রাম, বর্দ্ধমান।

...া বটিকা।

...কার জ্বররোগের মহৌষধ।

...য়া বটিকা আজ ভারত-প্রসিদ্ধ। অধিক কিন্তু ...স্ত, আরবদেশে, মি...রে, নেটালবন্দরে এবং লণ্ডন ...হানগরেও, বিজয়া বটিকা যাইতেছে। দরিদ্রের কুটীরে, রাজ্যেশ্বর রাজার সিংহাসন-সমীপে আজ বিজয়া বটিকা সমভাবে বর্ত্তমান। বিজয়া বটিকা প্রকৃতই ...ে ব্রহ্মাণ্ড বিজয় করিতে বসিয়াছে।

ইংরেজরমণী-কুলের বিজয়া বটিকা বিশেষ প্রিয় বস্তু জানিনা কেন, কোন গুণে, বিজয়া বটিকা দেশীয় সামগ্রী হইয়াও ইংরেজনরনারীর মন এরূপ আকর্ষণ করিল।

বিজয়া বটিকার শক্তি, মন্ত্রশক্তিবৎ অদ্ভুত। যে জ্বর-রোগ ডাক্তারী, কবিরাজী বা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় আরোগ্য হয় নাই, আত্মীয়-স্বজন যে রোগীর জীবনের আশা পর্য্যন্ত একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছেন ;—এমন বহু সংখ্যক রোগীও বিজয়া বটিকা সেবনে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

সময়-বিশেষে বিজয়া বটিকা বজ্রাপেক্ষাও কঠোর,—আবার, সময়-বিশেষে বিজয়া বটিকা কুসুম অপেক্ষাও কোমল। সামান্য মাথাধরা হইতে আরম্ভ করিয়া, নাগাই অতি গুরুতর—প্রাণ-সঙ্কট পীড়া পর্য্যন্ত বিজয়া বটিক দ্বারা সহজে আরোগ্য হইতেছে। বিজয়া বটিকার এই খানেই মহত্ত্ব—এইখানেই গুণপণা, এইখানেই অলৌকিকত্ব। রোগীর নাড়ীতে ২৪ ঘণ্টাই জ্বর আছে প্লীহার কামড়ানি এবং যকৃতের টাটানিতে রোগী অস্থির হইয়াছে, হাত মুখ পা পর্য্যন্ত ফুলিয়াছে, চক্ষু হরিদ্রা-বর্ণ হইয়াছে, নাক দিয়া মধ্যে মধ্যে রক্ত পড়িতেছে ;—এমন বিবিধ ব্যাধিগ্রস্ত রোগীও বিজয়া বটিকা সেবনে আরোগ্য হইতেছেন ;—অথচ এদিকে আপনার জ্বর-জ্বালা কিছুই নাই, প্লীহা যকৃৎ নাই,—সহজ শরীরে আপনি বিজয়া বটিকা সেবন করুন, আপনার ক্ষুধাবৃদ্ধি হইবে, পুরুষত্ব-বৃদ্ধি হইবে এবং লাবণ্যবৃদ্ধি হইবে। সুতরাং বিজয়া বটিকাকে অভূতপূর্ব্ব-শক্তিধর ঔষধ কে না বলিবে? কুইনাইন সেবনে যে জ্বর যায় না, বিজয়া বটিকায় সহজেই তাহা আরাম হয়। দশ পনর দিন অন্তর পুনঃপুনঃ জ্বররোগে যিনি কষ্ট পাইতেছেন, বিজয়া বটিকা তাঁহার জ্বররোগে ব্রহ্মাস্ত্র-স্বরূপ।

বিজয়া বটিকা কোন্ কোন্ রোগে কার্য্যকারী?—

(১) মাথাধরা; (২) অক্ষুধা; (৩) গা-হাত-পা কামড়ানি; (৪) বৈকালে চক্ষুজ্বালা; (৫) মাথাঘোরা; (৬) ... দৌর্ব্বল্য; (৯) দাস্ত অপরিষ্কার; (১০) লাবণ্যহীন; (১১) দুঃস্বপ্নাদি; (১২) পিঠে কোমরে বেদনা; (১... বুক-ভার; (১৪) আবিল্য।

ইহা ব্যতীত,—সর্ব্বরকম জ্বর, প্লীহা-যকৃৎ-কাসি... জ্বর, শোথ, পালাজ্বর, অমাবস্যা পূর্ণিমার জ্বর, আসা... কালাজ্বর, বঙ্গের ম্যালেরিয়া জ্বর, ইন্‌ফুলুয়েঞ্জা জ্বর, ক... জ্বর, দৌকালীন জ্বর, মেহঘটিত জ্বর, মজ্জাগত জ্বর, বৃষ... জ্বর,—ইত্যাদি যতপ্রকার জ্বর আছে, তৎসমস্তই বি... বটিকা দ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে। এরূপ ফলপ্রদ ঔ... একাধারে এত গুণবিশিষ্ট ঔষধ,—এদেশে এ পর্য্যন্ত আ...ষ্কৃত হয় নাই। সেবন করুন, সঙ্গে সঙ্গে শুভ ফল পাইবে...

মূল্যাদি।

	বটিকার সংখ্যা	মূল্য	ডাঃমাঃ	প্যা...
১ নং কৌটা	১৮	৸৵০	।০	৶
২ নং কৌটা	৩৬	১৵০	।০	৶
৩ নং কৌটা	৫৪	১॥৵০	।০	৶

বিশেষ বৃহৎ—গার্হস্থ্য কৌটা অর্থাৎ

৪ নং কৌটা	১৪৪	৪।০	।০	৶

ভ্যালুপেবলে কৌটা লইলে, মূল্য, ডাঃ মাঃ ও প্যা... চার্জ্জ ছাড়া গ্রাহকগণকে আরও দুই আনা অধিক দি... হয়।

বিজয়া বটিকা পাইকেরী বিক্রয়।

১নং কৌটা এক ডজন (অর্থাৎ বার কৌটা) লই... কমিশন এক টাকা; অর্থাৎ সাড়ে ছয় টাকাতেই বা... কৌটা ১নং বিজয়া বটিকা পাইবেন। ডাকমাশুল প্যাকিং আট আনা মাত্র। (বার কৌটার কমে কমিশ... নাই)। ভিঃ পিঃ কমিশন দুই আনা।

২নং এক ডজন লইলে কমিশন দেড় টাকা; অর্থ... বার টাকা বার আনাতেই ২নং বার কৌটা পাইবেন ইহার ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং বার আনা মাত্র। (বার কৌটা... কমে কমিশন নাই)। ভিঃ পিঃ কমিশন ।০ চারি আনা।

৩নং এক ডজন লইলে কমিশন দুই টাকা; অর্থ... সাড়ে সতর টাকাতেই ৩নং বার কৌটা পাইবেন। ইহ... প্যাকিং ও ডাঃ মাঃ এক টাকা মাত্র। (বার কৌটার ক... কমিশন নাই)। ভিঃ পিঃ কমিশন ।০ চারি আনা।

মফস্বলে ভিঃ পিঃ খরচ গ্রাহকগণকে দিতে হয়!

বিজয়া বটিকা প্রাপ্তিস্থান।

আদিস্থান—অর্থাৎ ঔষধের উৎপত্তিস্থান বেড়ুগ্রা... পোষ্ট সাদীপুর, জেলা বর্দ্ধমান, স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত জে, ... বসুর নিকট প্রাপ্তব্য; অথবা,—কলিকাতা ৭৯ নং হারিস... রোডে—ভারতে একমাত্র এজেন্ট ...্‌, বসু, এণ্ড কো...

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
৩১/১

জন্মভূমি।

নবম ভাগ। { পৌষ। ১৩০৫। { ১ সংখ্যা॥

মহামারী—মহাকালী।

মহামারীর কথা পুরাণে আছে, বৈদ্যকে আছে। দেবীভাগবতে মহামারীর কথা আছে, মার্কণ্ডেয় পুরাণেও মহামারীর কথা আছে। মহামারীই পুরাণের "মহাকালী" —"মহাকালের" শক্তি; মহেশ্বরের সংহারকারিণী মাহেশ্বরী শক্তি। মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেখিতে পাইবে,—

ব্যাপ্তং তয়ৈতৎ সকলং ব্রহ্মাণ্ডং মনুজেশ্বর।
মহাকাল্যা মহাকালে মহামারীস্বরূপয়া॥
সৈব কালে মহামারী সৈবসৃষ্টির্ভবত্যজা।
স্থিতিং করোতি ভূতানাং সৈবকালে সনাতনী॥

শুদ্ধ সংহারকর্ত্তার সংহারকারিণী নহেন, সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টিকারিণী শক্তিও সেই মহাকালী। যখন সৃষ্টিশক্তি, তখন তিনি জন্মবিরহিতা অনন্তা অজা; সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মিকা জগৎকারণীভূতা প্রধানা শক্তিই অজা।

"অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানামিতি"

শ্রুতেঃ। যে শক্তি সৃষ্টির কর্ত্রী, সেই শক্তিই সংহারের কর্ত্রী, মহাকালের সেই শক্তিই মহাকালী। বলাই ত আছে, সংহারকালে সেই শক্তি—সেই মহাকালী মহামারী, আবার সৃষ্টিকালে তিনিই অজা মহাকালী। তিনিই বহু প্রজার সৃজনকারিণী, তিনিই সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী; সত্ত্বরূপে সৃষ্টিকারিণী, রজোরূপে পালনকারিণী, তমোরূপে নাশকারিণী। যখন নাশকারিণী, তখনই মহাকালী মহামারী।

আবার দেবীভাগবতেও ঐ কথা, মহাকালের মহাশক্তিই সংহারকারিণীরূপে মহামারী বলিয়া অভিহিতা। সৃষ্টি স্থিতি সংহার, তিনিই জগতের মঙ্গলাত্মক। ধরা যখন পাপে ভরা হয়, তখনই সংহারের আবশ্যকতা হইয়া উঠে। ভগবানের অবতারও ত এই জন্যে। সংসারের পাপনাশ ও ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্তেই ত ভগবান্ যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

নিজামের হয়দরাবাদ-রাজ্যেও প্লেগের প্রকোপ হইয়াছিল; প্লেগদমনেরও ব্যবস্থা হইয়াছিল। ষ্টীভেন্স সাহেব সহকারী প্লেগ-কমিশনর হইয়া প্লেগ সম্বন্ধে তদন্ত করিয়াছেন। দেবী ভাগবতে যে মহামারী শক্তির কথা আছে, তাহাকেই তিনি প্লেগরূপে ধরিয়া লইয়াছেন। কেন না, সেই মহামারীর কথায় তিনি মূষিকের কথা পাইয়াছেন। কিন্তু দেবী ভাগবতে দেখিবে;

পাপতাপক্লিষ্ট ভক্ত-জনগণের প্রার্থনায় কৃপাময়ী হইয়া মহাকালের মহাকালী বলিতেছেন, "কলিযুগ আবির্ভুত হইবার পূর্ব্বে ব্রহ্মা আমায় সৃষ্টি করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন, হে নন্দিনি আমার কথার শ্রবণ কর এবং আমার আদেশের পালন করিও। কলিযুগে রাজা প্রজা সকলেই পাপকারী হইবে। সুতরাং তোমাকেও "মহামারী" রূপে মর্ত্তলোকে অবতীর্ণ হইয়া যত পাপীর সংহার করিতে হইবে। যাহারা পরস্বহরণে মত্ত হইবে, নারীজনের ধর্ম্মনাশে নিরত হইবে, প্রবল হইয়া দুর্ব্বলপীড়নে অনুরক্ত হইবে, দেবস্ব ব্রহ্মস্বের হরণ করিবে এবং এবম্ভূত অসৎকার্য্যসমূহের সাধন করিবে, তোমাকে তাহাদিগের সংহার করিতে হইবে। এই আদেশ উপদেশের বশেই আমাকে রাজা প্রজার অতিপাপ দেখিলেই মর্ত্তলোকে যাইতে হইবে। যেখানে যেখানে অতি পাপ দেখিব, সেই সেই গ্রামে নগরেই আমাকে পদার্পণ করিতে হইবে। পাপী ও দুরাত্মাদিগের ধ্বংস করিতে হইবে। এক গ্রামের বা এক নগরের পাপিসংহার হইলেই, আমাকে অন্য গ্রামে বা নগরে প্রবেশ করিতে হইবে। এইরূপে সমস্ত জগতে ভ্রমণ করিয়া, স্বকার্য্যের সাধন করিয়া, শেষে আমাকে এই স্বর্গলোকে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইবে। ধর্ম্মপরায়ণ ও বুদ্ধিমান লোকে আমার আবির্ভাব সহজেই বুঝিতে পারিবেন। যখন দেখিবে, যত মূষিকের মৃত্যু হইতেছে, যন্ত্রণা হইতেছে, যত মূষিক যাতনায় ছটফট করিতেছে; তখনই বুঝিবে, মহামারীর আবির্ভাব হইয়াছে। আর এইরূপ মহামারীর লক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াই যত বুদ্ধিমান লোকে ঘর বাড়ী গ্রাম

নগর ছাড়িয়া বন জঙ্গলে গিয়া শিবিরসংস্থাপন করিবেন। সেখানে গিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রের পাঠ করিবেন (মন্ত্র পাঠেরও পদ্ধতি আছে, ঊর্দ্ধবাহু হইয়া বীরাসনে বসিতে হইবে)। বনে আমার (মহাকালীর) মূর্ত্তি গড়াইয়া প্রতিদিন পূজা করিতে হইবে। ধূপ দীপ গন্ধাদিত দিতেই হইবে, তাহা ছাড়া তিণ্ডিণী ও ঘৃতে তণ্ডুল সিদ্ধ করিয়া তাহারই ভোগ দিতে হইবে; আর ব্রাহ্মণদিগকে এবং আত্মীয়-স্বজনগণকে ভোজন করাইতে হইবে। তার পরই নিম্নলিখিত মন্ত্র ভক্তিভরে পূতহৃদয়ে পড়িতে হইবে।

মন্ত্রের মর্ম্ম।

হে দেবীর দেবি! আমি তোমাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতেছি; আমার প্রতি কৃপা কর। হে ভয়ঙ্করি, তোমার দর্শনে যত লোকেই ভয়ে হতবুদ্ধি হইয়াছে; তুমি মেরু পর্ব্বতে থাক, কৈলাসপর্ব্বতে থাক, হিমালয়ে থাক, আর গন্ধমাদনেও থাক। তুমি মদ্য মাংসে তুষ্ট হও, তোমার অনুচর সৈনিক অসংখ্য। তুমি সর্ব্বসংহারে সমর্থা। হে দেবি হে সর্ব্বশক্তিময়ি, আমাকে রক্ষা কর। তুমি যেখানেই থাক, আর যাহাই হও, আমাকে সপরিবারে রক্ষা কর; আমার ভবনে চিরদিনই উৎসবের আয়োজন হইতে দেও।" এই মন্ত্রের প্রত্যহ আহারের পূর্ব্বে পাঠ করিতে হইবে।

অনন্তর মহামারীর নিবৃত্তি হইলে, লোকক্ষয় প্রশমিত হইলে, সপরিবারে মহাকালীর ভজন করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইবে। কিন্তু পূর্ব্বাহ্নে যত ঘর দ্বার আসবাব পত্রাদির শোধন করিতে হইবে। উৎসবকালে যেরূপ সাজ সজ্জাদি কর, সেইরূপ করিতে হইবে। গৃহে পুনর্ব্বাস করিবার পূর্ব্বে দেবীর দুইবার আরাধনা করিতে হইবে। অপিচ ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া দক্ষিণা দিতে হইবে। মহাকালীকে স্বস্থানে প্রস্থান করিতে বলিয়াই তাঁহার ভজনসাধন করিবে। এইরূপে কার্য্য সম্পন্ন হইলেই মহামারীর তিরোভাব হইবে।

বৈজ্ঞানিক পাঠক সব পাইলেন। ইন্দুর পাইলেন, মহামারীর এক গ্রাম বা এক নগর হইতে অন্য গ্রামে বা নগরে যাওয়া পাইলেন, এক স্থানের নিঃশেষ করিয়া তবে অন্যস্থানে যাইবার কথা পাইলেন, গৃহত্যাগ পাইলেন, বনে মাঠে থাকা পাইলেন, তাঁবুগাড়া পাইলেন, তেঁতুল পাইলেন, ঘৃত পাইলেন, মদ্য পাইলেন, মাংস পাইলেন। তার পর মহামারীর বাসস্থানও পাইলেন। মেরুপর্ব্বতে অর্থাৎ মধ্যএশিয়ার উত্তরে, হিমালয়ে—কমায়ুন গড়বালে, কৈলাসে—আফগানস্থানের উত্তর অঞ্চলে, মহামারীর—প্লেগের—বাসা আছে, ইহা ত অনেকেরই বিদিত। বাকি থাকিতেছে গন্ধমাদনটা; কোন দিকে দেখিয়া লও। গৃহাদির শোধনে কিছুমাত্র ত্রুটি আছে, আর ইন্‌স্পেক্‌শন ত আছেই। অতএব, মহামারী প্লেগ ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞান তাঁহার জন্যেই থাকুক, আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি, মহাকালের সংহারকারিণী শক্তি মহাকালীই—মহামারী। তাঁহার একরূপ শক্তিবিকাশকে প্লেগ বলিতে চাও, বল; কিন্তু ওলাউঠা বসন্ত জ্বর প্রভৃতিও তাঁহার শক্তিবিকাশ। প্লেগ এক নহেন। তাঁহার ভাই ভগিনী অনেক। ও হরি! একটা কথা ছাড়িয়া দিয়াছি; মার্কণ্ডেয় পুরাণেই ত রক্তবীজের কথা আছে। রক্ত হইতেই উৎপত্তি, তাই রক্তবীজ। প্লেগের বীজও ত রক্তে জন্মে, অসুর অপেক্ষাও অধিক ভয়ঙ্কর। অতএব, প্লেগের রক্তবীজ আর মার্কণ্ডেয় পুরাণের রক্তবীজ একই। এই রক্তবীজ যাঁহার জন্যে হত হইয়াছিল, তিনিই কলিযুগে হাফকীনের ঘরে টীকারূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। দেবতার লীলা বুঝা ভার! সংহাররূপিণী মহাকালী মহামারী হইয়া যে রক্তবীজের এখন সাহায্য লইতেছেন, সত্যযুগে ত সেই রক্তবীজের নিজেই সংহার করিয়াছিলেন। যুগভেদে লীলাভেদে। অন্য যুগের শত্রু এ যুগের মিত্র, অন্য যুগের মিত্র এ যুগের শত্রু!

নাগ-পূজা।

ভারতবর্ষে বহুকাল হইতে বহু বিধানে নাগ-পূজার ব্যবস্থা আছে। বেহুলা-লখিন্দরের বিবরণ,—মনসার ভাসানের রোমাঞ্চকর আখ্যান—বঙ্গের আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলেরই বিদিত। পরীক্ষিতের তক্ষক দংশন, অভিশাপ,—মহাভারত-সৃষ্টির মূলভিত্তি। সর্পযজ্ঞের অদ্ভুত কাণ্ড,—সেই ঋষি-সম্পাদিত উগ্র বিষধর বহুসর্প ধ্বংসের হেতুভূত অদ্ভুত সর্পযজ্ঞ,—মহাভারতের এক প্রধান ব্যাপার। বঙ্গের প্রত্যেক হিন্দু গৃহস্থকেই ভক্তিভরে মনসাদেবী ও অষ্টনাগের পূজা করিতে হয়। বৃদ্ধা ঠানদিদি, শুচি কাচ নাতি নাতনী গুলিকে লইয়া, শয়ন করিবার পূর্ব্বে, এখনও সর্প-ভয়-নিবারণ-উদ্দেশে-গরুড়-স্মরণ করিয়া থাকেন।

ভারতে যেরূপ যুগযুগান্তর যাবৎ নাগপূজার ব্যবস্থা আছে, পৃথিবীর অন্যান্য বহু দেশেও সেইরূপ স্মরণাতীত কাল হইতে এই নাগপূজার ব্যবস্থা বর্ত্তমান। কেবলমাত্র অসভ্য ইতর শিক্ষাজ্যোতিঃপরিচ্যুত জাতির কথা নহে, যে সকল দেশ একদা সভ্যতার অত্যুচ্চ সীমায় উপস্থিত হইয়াছিল, যে সকল জাতির অত্যুজ্জ্বল জ্ঞানালোকে বহু তমসাচ্ছন্ন দেশও উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সকল দেশ বা সেই সকল জাতির ভিতরও নাগপূজার ব্যবস্থা এবং রীতি ছিল। আমাদের শাস্ত্র অনুসারে আসমুদ্র

অবস্থিত, অন্যান্য বহু জাতির পৌরাণিক ইতিহাসেও অবিকল এইরূপ বা ঈষদংশে অন্যরূপ—বিবরণ উল্লিখিত আছে।

কোন্ ইতিহাসরসিক জগদ্বিখ্যাত বাবিলনের নাম না শুনিয়াছেন? এই বাবিলনেও সর্পপূজার বিধি ছিল। বাবিলনবাসীদের মতে এক দেবতার নাম রিয়া; রজতময় সর্পশিরে এই রিয়া দেবীর মূর্ত্তি বিরাজিত। ইহাদের সর্পের দেবতার নাম,—ওবেল। ইহারা ড্রেগন বা বিরাট সর্পাকৃতি জীবেরও পূজা করিত। ইহাদের পৌরাণিক ইতিহাসের এক স্থানে এই ড্রেগন-পূজার সবিশেষ উল্লেখ আছে। প্রাচীন পারস্য-দেশেও সর্পপূজার ব্যবহার ছিল। পারসীকদিগের মতে জগতের আদি প্রকৃতি বা আদ্যাশক্তি নাগরূপিণী; তাই পারসীকগণ ভক্তিভরে এই নাগরূপিণী আদি প্রকৃতির অর্চ্চনা করিত। বড় বড় মন্দিরে ইহার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইত। এই আদি প্রকৃতির প্রসাদ লাভের আকাঙ্ক্ষায় পারসীকেরা বলিদান করিত, মহোৎসব করিত; আদি প্রকৃতি যে, সকল দেবের দেবতা;—সমগ্র বিশ্বমণ্ডলের একমাত্র বিধাত্রী।

পারসীক পুরাণের এই যে আদ্যা প্রকৃতি, ইহাঁর আবার দুইটী রূপ; একরূপে ইনি বিশ্বচরাচরের শুভদায়িনী, অন্যরূপে ইনি সংহারকারিণী। এই দুই আদ্যা প্রকৃতির মধ্যে বিলক্ষণ রেষারেষি! একজনকে শক্তি সামর্থে পরাভূত করিয়া, আপন বিক্রমে অন্যা আদ্যাশক্তি সমগ্র বিশ্বমণ্ডলের সর্ব্বাধিকারিণী হইবেন, এই দারুণ আকাঙ্ক্ষাই—এই মদদম্ভপরিপূর্ণ অভিলাষই,—এইরূপ রেষারেষির—এইরূপ প্রলয়ঙ্করী প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রধান কারণ। পারস্যের পুরাণে এই দুই আদ্যপ্রকৃতিই নাগিনীরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। এই দুই ভীষণরূপিণী নাগিনী আপন আপন লাঙ্গুলের উপর সতেজে দাঁড়াইয়া,—বিশ্বমণ্ডলের অধিকারিত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষায় পরস্পরে যুঝাযুঝি করিতেছে।—পারসীক পুরাণকার এই চিত্র এবং বিধরূপেই দেখাইয়াছেন। মূর্ত্তিমতী হিংসারূপিণী নাগিনী না হইলে কি এরূপ খলতা সম্ভব! শুভঙ্করী প্রকৃতির নাম, অয়মুজদ; এবং অন্য শক্তির নাম অহ্রিমান। পারসীক জেন্দাবেস্তায় উল্লেখ আছে, যে, আদি মানবের ধ্বংসের জন্যই, অহ্রিমান নাগিনীরূপের পরিগ্রহ করেন; এবং মানবজাতির যিনি সর্ব্ব প্রথম, তাহাকে বিষদংশনে বিষাক্ত করেন। সাদু বা সুদ্দু নামক গ্রন্থের বিধি এই যে, যখন তোমার কোন সর্পকে বিনষ্ট করিবার প্রয়োজন হইবে, সে সময়ে জেন্দাবেস্তার পাঠ করিও; তাহা হইলেই তোমার মহৎ পুণ্য-লাভ হইবে; সকল পাপ,—সকল দোষ—খণ্ডিয়া যাইবে। সর্পবিনাশে ত আর পাপ নাই, সর্প যে, খলের সজীব অবতার। সর্পকে মারাওয়া,—আর মূর্ত্তিমান অমঙ্গলের ধ্বংস করাও তা।

পারসীকগণের মতেও সূর্য্যদেবের নাম মিত্র। চতুর্দ্দিকে সর্প দ্বারা ইনি পরিবেষ্টিত। ইহাঁরও সবিশেষ পূজা-বিধির ব্যবস্থা ছিল।

সকল দেশের সকল জাতির ভিতরই কোন না কোন রূপ নাগপূজার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীস, রোম, মিশর, চালদীয়া, আরব, মধ্যএশিয়া, সর্ব্বত্র নাগপূজা হইত। ভারতবর্ষে একদিকে উত্তুঙ্গপর্ব্বতপাদমূলবর্ত্তী কাশ্মীর, অন্য দিকে সাগরতরঙ্গ-বিধৌত কুমারিকা, সর্পপূজার বিধি সর্ব্বত্র। আবার সিংহল এবং বহু দ্বীপপুঞ্জেও এই ব্যবস্থা বর্ত্তমান ছিল। মেক্সিকো এবং পেরু, এবং সমগ্র আফ্রিকা, সিবিয়া, স্কাণ্ডিনেভিয়া, এই নাগপূজার জন্য বিখ্যাত। ইউরাল পর্ব্বতের নিকটবর্ত্ত ভূভাগে যে সকল জাতির বাস, তাহারাও সর্পপূজা করিত; ইউরোপের উত্তর খণ্ডে ওবী নদীর তীরবর্ত্তী জঙ্গলসমূহের ভিতরও নাগপূজার বিধি ছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, সরীসৃপ পূজার ব্যবহার হইতেই ওবী নদীর "ওবী" এই নামের উৎপত্তি হইয়াছে। পোলাণ্ডেও বহু কাল পূর্ব্বে অত্যন্ত ভক্তিসহকারে সর্পপূজা হইত। আমাদের দেশে যেমন দুধ কলা দিয়া সর্প-পোষণ করিবার একটা কথা প্রচলিত আছে, পোলাণ্ডবাসিগণও সেইরূপে উপাদেয় খাদ্য দিয়া সর্পপোষণ করিত। প্রত্যেক গৃহস্থলোকেই কতিপয় সর্পের লালন-পালন করিত। সংসারে শিশুসন্তানের যেরূপ যত্নে পালন করিতে হয়, পোলাণ্ডবাসিগণ তদধিক যত্নে, তদধিক আগ্রহাতিশয়ে, সর্পের পূজা করিত; সর্পগণকে বাটীতে গৃহে প্রাঙ্গণে অবাধে ইতস্ততঃ বেড়াইতে দেওয়া হইত; এঘর ওঘর এবাড়ী ওবাড়ী করিয়া তাহারা স্বচ্ছন্দে চরিয়া বেড়াইত। সংসারে কোন বিপদ ঘটিলে, কোন অমঙ্গল হইলে, পোলাণ্ডবাসিগণ মনে করিত,—বোধ হয়, সর্প পালনে,—সর্পের যত্নে, কোনরূপ ত্রুটি হইয়াছে, তাই এমন ঘটিল। চতুর্দ্দশ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পোলাণ্ডে এইরূপে নাগ-পূজা হইত। লাপলণ্ড, ফিন্‌ল্যাণ্ড, নরওয়ে, সুইডেন, এবং ডেনমার্ক দেশের লোকেও পোলাণ্ডদেশের অধিবাসিগণের মতই সর্পপূজা করিত। শিশু সন্তানের জন্য যেরূপ দুগ্ধের ব্যবস্থা করিতে হয়, এই সকল যত্নপোষিত সর্পের জন্যও, উহারা সেইরূপে দুগ্ধের আয়োজন করিয়া রাখিত। শিশুকে যেরূপ ডাকিয়া আহার দিতে হয়, ঘুমাইলে, জাগাইয়া খাওয়াইতে হয়, এই সকল সর্পকেও সেইরূপ অনেক সময়ে ডাকিয়া, আহার দিতে হইত, রাত্রেও জাগাইয়া খাওয়াইতে হইত। ভেণ্ডাল জাতিগণও সর্পের পূজা করিত। ইহাদের আবার আরও একটু বিশেষত্ব ছিল। বড় বড় বৃক্ষের কোটরে ইহারা সাপের ঘর প্রস্তুত করিয়া দিত; যত্ন করিয়া আপন আপন সংসারের সাপগুলিকে তাহারা এই সকল তরু গহ্বরে রাখিয়া দিত। সালঙ্কারা অনিন্দ্যকান্তি মুক্তকুন্তলা সুন্দরী যুবতীরা, বিবিধ খাদ্যপেয় সমন্বিত পাত্র লইয়া, অধিকাংশ সময়েই পয়ঃপরিপূর্ণ পাত্র লইয়া, এই তরুকোটরনিহিত সর্পকে

ভোজন করাইতে যাইত। সিংহলে অদ্যাপি এইরূপ অনুষ্ঠান বর্ত্তমান আছে।

লম্বার্ডজাতিগণও বহু কাল হইতে সর্পপূজা করিত; ভক্তি ভরে সর্পকে নমস্কার করিত। তবে অধুনা আর এ জাতির মধ্যে এইরূপ সর্প পূজার ব্যবস্থা প্রচলিত নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমেরিকার মেক্সিকো এবং আফ্রিকার মিশর প্রদেশেও এইরূপ সর্পপূজা হইত। মিশর-বাসিগণের ধর্ম্মানুষ্ঠানের সহিত মেক্সিকোবাসিগণের ধর্ম্মানুষ্ঠানের সে বহু বিষয়েই সাদৃশ্য ছিল, অনেক দেখিয়া শুনিয়া, বহু ঐতিহাসিক পণ্ডিত ইহা স্থির করিয়াছেন। মিশরবাসিগণ যেরূপ সূর্য্য পূজা করিত, বড় বড় পিরামিড-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করিত, মেক্সিকোবাসিগণও সেইরূপ সূর্য্য পূজা করিত এবং পিরামিডের প্রতিষ্ঠা করিত। বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে, ইদানীং-পরিচিত সমগ্র ভূভাগে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের প্রচলন ছিল, তাহা এই সকল ঐতিহাসিক বিবরণে বিলক্ষণরূপে বুঝিতে পারা যায়। দক্ষিণ আমেরিকার পেরু ও ব্রেজিল প্রদেশে যে, এককালে হিন্দু ধর্ম্মই প্রচলিত ছিল, তাহার বিবিধ নিদর্শনও তৎপ্রদেশে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

মেক্সিকো প্রদেশের হুইজিলপুংলি নামক স্থানে একটি মন্দির ছিল। বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডে এই মন্দির নির্ম্মিত। কিন্তু এই মন্দির-নির্ম্মাণে বড়ই কারুকার্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। একটি সর্প যেন আর একটী সর্পকে জড়াইয়া আছে, এইরূপ ভাবে পাথর কাটিয়া সেই পাথরে এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই মন্দিরের ভিত্তি-গাত্রে চতুর্দ্দিকেই সর্প-মূর্ত্তি পরিদৃষ্ট হইত। এই মন্দিরে অধিষ্ঠাত্রী দেবতার হস্তে, একটী সর্প বিরাজিত ছিল; এবং যে সিংহাসনের উপর এই দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, চারিটি প্রস্তর-নির্ম্মিত সর্পের মস্তকের উপর সেই সিংহাসন স্থাপিত ছিল।

মেক্সিকোদেশের জ্যোতির্ব্বেত্তাদিগের মতে শতাব্দীর আকৃতি বৃত্তাকার; সূর্য্যদেব এই বৃত্তের কেন্দ্রস্থানে অবস্থিত; এবং বৎসরমালা এই বৃত্তের পরিধিস্থানীয়; আর একটী সর্প জড়াইয়া জড়াইয়া চারি স্থানে কুণ্ডলি পাকাইয়া, এই বৃত্ত-পরিধির নির্ম্মাণ করিয়াছে। প্রাচীন মেক্সিকো প্রদেশের জ্যোতিষ-শাস্ত্রে শতাব্দীর কুড়ি দিনে মাস গণনা হইত, ইহার মধ্যে দুইটী দিন সর্পাকারে এবং ড্রেগনরূপে চিত্রিত হইত। ইহাদের বায়ু-দেবের মন্দিরের দ্বারদেশ সর্প মুখের অনুকরণে নির্ম্মিত হইত। কেবল মাত্র এইরূপ মূর্ত্তি প্রতিমাতেই যে, সর্প পূজার বিধি ছিল, তাহা নহে, মেক্সিকোবাসিগণ জীবন্ত সর্পেরও পূজা এবং পালন করিত। যে ভয়ঙ্কর র‍্যাটল সাপের নাম শুনিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে, ইহারা অতি সমাদরে সেই র‍্যাটল সাপের পূজা করিত। এই সর্পের মূর্ত্তি-পূজাও তাহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

ভারতবর্ষে আমাদের বঙ্গদেশে যেরূপ মনসা-পূজার ব্যবস্থা আছে, ঝাঁপানের মহোৎসব হইয়া থাকে, বিষহরির অর্চনা হয়, নাগপঞ্চমীতে পূজা হয়, ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও সেইরূপ নানা অনুষ্ঠানে নানা প্রকারে নাগ-পূজা হইয়া থাকে। দশহরার দিনে আমাদের দেশে প্রত্যেক হিন্দুর বাড়ীর বহির্ভাগে—প্রাচীরে সর্পভয়-নিবারণ-উদ্দেশে গোময়-রেখা দিবার বিধি আছে; দাক্ষিণাত্যেও মহোৎসবে নাগ-পূজা করিবার ব্যবস্থা আছে।

আমাদের এই নাগ-পূজার ব্যবহার দেখিয়া, কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত আমাদিগকে বিষম কুসংস্কারাপন্ন জাতি বলিয়া বিদ্রূপ করিয়া থাকেন। কিন্তু যে প্রথা-সমগ্র ভূমণ্ডলে,—সকল জাতির ভিতর বর্ত্তমান, ইউরোপ, আমেরিকা এবং আফরিকার বহু সুসভ্যজাতিগণও এক সময়ে যে আচারের একান্ত অনুরাগী ছিলেন, যে নাগপূজার ব্যবস্থা এখনও অক্ষুন্নভাবে বহুদেশে প্রচলিত, সে প্রথাকে হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া, বা সেরূপ প্রথার পক্ষপাতী জাতিকে বিষম কুসংস্কারবিশিষ্ট বলিয়া, টিটকারি করা কতদূর সুসঙ্গত কার্য্য, তাহা বুদ্ধিমান এবং বিবেচক মাত্রেরই অনুমেয়।

খৃষ্টানের প্রতিমা।

রোমান কাথলিক খৃষ্টানেরা প্রভু খৃষ্ট, খৃষ্টজননী মেরী, খৃষ্টহত্যার ক্রুশ, খৃষ্ট-সম্প্রদায়ের যত সেণ্ট বা মহাপুরুষ প্রভৃতির প্রতিমূর্ত্তি রাখিয়া থাকেন। ইহাঁদের ধর্ম্মকর্ম্মে ঐ সকল প্রতিমার যথেষ্ট সমাদর হয়। আমরা বলি পূজা, কাথলিকেরা বলিতেছেন পূজা নহে, সম্মান। বিলাতে রাজকীয় প্রোটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়ের অনেক পাদরিও অনেক বিষয়ে কাথলিক মতে এবং কাথলিক পথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অনেকেই কিন্তু এই আচরণে প্রতিকূলতা করিতেছেন। কেনসিট নামে এক ব্যক্তিই হইয়াছেন, প্রতিকূলদলের দলপতি; সার উইলিয়ম হারকোর্ট বেলফোর প্রভৃতি রাজনীতিকেরাও প্রতিবাদে যোগ দিয়াছেন। কিন্তু উভয় পক্ষেই জিদ বাড়িতেছে। এদিকে বিলাতের রোমান কাথলিকেরাও অবসর বুঝিয়া আপনাদের মত ও বিশ্বাসের প্রতিপত্তি বাড়াইয়া লইবার চেষ্টা দেখিতেছেন। কাথলিক সভার ঘোষণাপত্র বাহির হইয়াছে। সেই ঘোষণায় প্রতিমা-সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা যে, হিন্দুরও পাঠ্য। উক্ত হইয়াছে;

"আমরা যত কাথলিক, পিতা, পুত্র এবং পবিত্রাত্মা, এই ত্রিধা-বিভক্ত অথচ একীভূত এক পরমেশ্বরেরই পূজা করিয়া থাকি; পৌত্তলিকতায় আমাদিগের আন্তরিক অশ্রদ্ধা। কোন দেবী দেব বা মহাপুরুষেরই আমরা ঈশ্বর-জ্ঞানে পূজা করি না। খৃষ্টজননী কুমারী মেরীর আমরা

সম্মান করিয়া থাকি, কিন্তু তাঁহাকে দেবী বলিয়া পূজা করি না। ত্রিমূর্ত্তি ভগবানের যে ভাবে পূজা করি, সে ভাবে পূজা মেরী মাতারও করি না। যত দেবদূতের ও যোগী ঋষির সম্মান করি, কিন্তু তাঁহারা ভগবানের দাস বলিয়া। ভগবানের যত ধর্ম্মযাজক পাদরির সম্মান করি, যে ধর্ম্মমন্দিরে তাঁহার পূজা হয়, তাহার সম্মান করি; যে পীঠে তাঁহার পূজা ভজনা হয়, তাহারও সম্মান করি; তাঁহার বাক্য বাইবেলেরও সম্মান করি; যাহাতে যাহাতে তাঁহার সম্বন্ধ আছে, তৎসমস্তেরই আমরা সম্মান করিয়া থাকি। কিন্তু করি, তাঁহারই গৌরব করিবার তরে; তৎ-সংসৃষ্ট যত পদার্থের সম্মান করিয়া আমরা কেবল তাঁহারই পূজা করি। যে পূজায় কেবল ত্রিমূর্ত্তি ভগবানেরই অধিকার, সে পূজা আমরা আর কাহারই বা কোন পদার্থেরই করি না। এই হিসাবেই আমরা প্রভুর সেই ক্রুশ যন্ত্রের সম্মান করি, যত পবিত্র পদার্থের সম্মান করি; প্রভু ও তাঁহার ভক্ত যত মহাপুরুষেরও এই হিসাবেই সম্মান করিয়া থাকি। সর্ব্বত্রই আমরা ভগবানেরই সম্বন্ধ দেখিয়া থাকি, আর এই সকল মূর্ত্তি ও প্রতিমা দেখিলে হৃদয়ে ভগবদ্‌ভক্তির উদ্রেক হয় বলিয়াই, সম্মানপ্রদান করিয়া থাকি। কিন্তু যাঁহারা ভগবৎসম্বন্ধীয় ব্যক্তি ও পদার্থের—মূর্ত্তি ও চিত্রের—ভগবদ্বৎ পূজা করিয়া থাকে, ঐ সমস্তকেই ভগবান্ বলিয়া মনে করে, তাহাদিগকে আমরা পৌত্তলিক বলিয়াই ঘৃণা করিয়া থাকি। আমাদের বিশ্বাস, বিনা অনুতাপে কাহারই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না। পোপ বিশপ বা পাদরি কেহই কাহাকেই পাপমুক্ত করিতে পারেন না। যাহার হৃদয় প্রকৃত অনুতাপে দগ্ধ হইয়া শুদ্ধ হয়, তাহারই পাপে প্রায়শ্চিত্ত হয়।" ইত্যাদিরূপ বাক্যেই কাথলিক-সভা আপনাদের ধর্ম্মাচরণের সমর্থন করিয়াছেন। অনেক দেব দেবী ও অবতারেরই তাঁহারা প্রতিমা গড়াইয়া পূজা করেন। কিন্তু যাহাকে আর সকলে "পূজা" বলিয়া থাকেন, ইহাঁরা তাহাকে পূজা বলেন না; বলেন, তাহা "সম্মান।" যে কুম্ভকার শ্রীরামপুরের গির্জ্জার মেরী মাতা ও প্রভু খৃষ্টের মূর্ত্তি গড়াইয়া দিয়াছিল, তখনকার দিনেমারেরা তাহার পর্য্যন্ত পূজা করিয়াছিলেন। কিন্তু বিলাতের কাথলিকেরা বলিতেছেন, "পূজা" নহে "সম্মান।" আমরা দেখিতেছি, কাজে সাম্য, কেবল নামেই বৈষম্য। অন্য আর ওয়াশিপে, সম্মান আর পূজায়, কাথলিকেরা কিরূপ প্রভেদ রাখিতে চাহেন, তাহা আমরা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। কিন্তু তাঁহারা যদি এই প্রভেদের কল্যাণেই দলপুষ্টি করিতে পারেন, তাহা হইলে আমরা দুঃখিত হইব না।

রোমান কাথলিক খৃষ্টানেরা মুখে বলেন, "প্রতিমার পূজা করি না; ভগবানের সংসৃষ্ট বলিয়াই মেরীর মূর্ত্তি বা চিত্রের প্রতি সম্মান প্রদান করি। যে ক্রুশে প্রভু খৃষ্টের দেহত্যাগ হইয়াছিল, সেই ক্রুশের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করি; যে সকল অসাধারণ ভগবদ্ভক্ত ধর্ম্মের চরমে উঠিয়া দেহ-ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগকে সেণ্ট বা মহাপুরুষ মনে করিয়া ভক্তি উপহার দিই; যে গির্জ্জায় ভগবানের পূজা হয় সেই গির্জ্জার প্রতি শ্রদ্ধা-প্রদর্শন করি; রোমের পোপ সকল পাদরির শ্রেষ্ঠ, ভগবানের অসাধারণ অনুগ্রহ না পাইলে কেহ পোপ হইতে পারেন না, তাই পোপের অসাধারণরূপ সম্মান করিয়া থাকি। কিন্তু আমরা পৌত্তলিক নহি; প্রতিমার পূজ্য আমরা করি না।"

এ হিসাবে হিন্দুও ত প্রতিমার পূজা করেন না। হিন্দু মূর্ত্তি গড়াইয়া তাহাকে ভগবানের অনুরূপ বলিয়া মনে করেন। প্রতিমার পূজায় হিন্দু ভগবানেরই পূজা করেন। ভগবান সর্ব্বশক্তিমান, জগতে তাঁহার শক্তি বিরাজ করিতেছে নানারূপে—নানাপ্রকারে। তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-কর্ত্তা। তাঁহাকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলা যায়, সৃষ্টিকর্ত্রীও বলা যায়। কেন না, তাঁহাকে পিতা বলা যায়, তাঁহাকে মাতাও বলা যায়। তাঁহাকে দেব বলা যায়; তাঁহাকে দেবীও বলা যায়। সৃষ্টি স্থিতি সংহার, তিন কাজেই তিনি কখনও পুরুষ, কখনও নারী। নানারূপে তাঁহার শক্তির বিকাশ। অতএব, হিন্দুর যত দেবদেবীই ভগবদ্ভক্তি-বিকাশের প্রতিরূপ মাত্র। এই প্রতিরূপই প্রতিমা। হিন্দুর প্রতিমা-পূজাও ত পৌত্তলিকতা নহে। যত দেব দেবীতেই হিন্দু প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন। অগ্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা, পরে পূজা। প্রাণ-প্রতিষ্ঠা অর্থেই ভগবচ্ছক্তির আবির্ভাব, অর্থাৎ সেই প্রতিমাতে যে, পরব্রহ্মের প্রতিরূপত্ব হইল, ইহারই ধারণা। প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইলেই প্রতিমার পবিত্রতা, প্রতিমার দেবত্ব। প্রতিমাপূজায় হিন্দুও পরব্রহ্মেরই পূজা করেন। কেন না তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন শক্তিরই ভিন্ন ভিন্ন প্রতিমায় পূজা করিয়া থাকেন। কাথলিক খৃষ্টান যদি পৌত্তলিক না হন, তবে তিনি হিন্দুকেই বা পৌত্তলিক বলিয়া মনে করেন কেন? জগতের সমস্তই ভগবানের, সমস্তই তাঁহার সৃষ্ট, সমস্তেই তাঁহার শক্তি বিকাশ, সর্ব্বপদার্থেই, ত ভগবানের পূজা করা চলে। হিন্দু পাথর মৃত্তিকা কাষ্ঠাদির পূজা করেন না, সর্ব্বত্র ভগবানেরই পূজা করিয়া থাকেন। যাঁহারা হিন্দু ধর্ম্মের মর্ম্মগ্রহ করিতে পারেন না বা করিতে চাহেন না, তাঁহারাই হিন্দুকে পৌত্তলিক বলিয়া মনে করেন।

আর যেখানে ধর্ম্মে বাহাড়ম্বর, সেইখানেই ত হিন্দুত্ব। বাহ্যাড়ম্বর অর্থেই ক্রিয়া কাণ্ড। মানসিক পূজায় বাহ্য ক্রিয়া কাণ্ডের প্রয়োজন হয় না, সকল কার্য্যই মনের ভিতর হইয়া থাকে। কিন্তু মানসিক পূজায় ত সকলের অধিকার হয় না। মনের তত দূর উন্নতি ত আর সকলে সম্ভবে না। পরম যোগীর পক্ষেই মানসিক পূজা সম্ভবে, তাঁহাকে ক্রিয়া কাণ্ড করিতে হয় না—তাঁহাকে বাহ্যাড়ম্বরও করিতে হয় না। জগতে এমন ধর্ম্ম নাই, যাহাতে সাধারণের পক্ষে ক্রিয়া কাণ্ড— সুতরাং বাহ্য আড়ম্বর নাই

হয় না। যাঁহার এরূপ বাহ্য আড়ম্বর নাই, তাঁহার ভগবৎ পূজাও নাই। "আমি মানসিক পূজা করিয়া থাকি," একথা ত বলিলেই হয় না। মানসী পূজায় অধিকার হওয়া আবশ্যক। সে অধিকার যাহার তাহার হয় না। সুতরাং ক্রিয়া কাণ্ডের বাহ্য আড়ম্বরে দোষ দেওয়া উচিত নহে। কাথলিক খৃষ্টানদিগের কথা প্রথমেই কহিয়াছি। তাঁহারা যে, হিন্দুর মত প্রতিমা-পূজক, তাহাও দেখাইয়াছি। প্রোটেষ্টাণ্টদিগেরও ত ক্রিয়া কাণ্ড এবং সুতরাং বাহ্যাড়ম্বর আছে। ঐ যে, গির্জ্জা—ঐ যে, উপসনামন্দির, উহাই ত প্রধান বাহ্যাড়ম্বর; মানসপূজায় ত পূজাগৃহ আবশ্যক হয় না। আমাদের যেমন মণ্ডপ, খৃষ্টানেরও সেইরূপ গির্জ্জা। আবার গির্জ্জার খরচই কত! স্থাপত্যের কত শোভা, শিল্পীর কত কারুকার্য্য! যেখানে পাদরি ভজনা করেন, সে স্থানের কত সৌন্দর্য্য! সমস্তই বাহ্য আড়ম্বর, সমস্তই ক্রিয়াকাণ্ড, সমস্তই ত প্রতিমা-পূজার অনুরূপ। সুন্দর পরিচ্ছদ না হইলে গির্জ্জায় যাওয়া হয় না। উৎসবের সময়ে গির্জ্জায় পুষ্পমালার সজ্জা হইয়া থাকে। ভজনার টেবিলে ফুলের তোড়া রাখা হয়। ইহাও যদি প্রতিমা-পূজার অনুরূপ না হয়, তবে কি আর তাহার অনুরূপ? বড় দিনে বড় উৎসব, প্রভু যীশুর জন্মতিথি—উৎসব, খৃষ্টানের জন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসব। রাত্রে প্রভুর জন্ম হইয়াছিল, সেই দিন জন্মাষ্টমীর উৎসব; পর দিন সুসমাচারে আনন্দ উৎসব হইয়াছিল, সেই দিন নন্দোৎসব। ইহাও যদি দেবপূজা না হয়, তবে দেবপূজা কাহাকে বলি? এক বড় দিনে কতরূপ অনুষ্ঠান হয়! যত অনুষ্ঠানই ত ক্রিয়া কাণ্ড! সবই ত প্রতিমাপূজার অনুরূপ। ক্রুশে দেহত্যাগ করিবার পর প্রভু ভক্তবৃন্দকে আবার দেখা দিয়াছিলেন। যে শুক্রবার দেখা দিয়াছিলেন, সেই শুক্রবারই গুডফ্রাইডে। গুডফ্রাইডের উৎসবেও কত বাহ্য অনুষ্ঠান! সমস্তই প্রতিমা পূজার অনুরূপ। হিন্দুর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর; খৃষ্টানেরও পুত্র পরমেশ্বর, পিতা পরমেশ্বর আর পবিত্র পরমেশ্বর বা পরম পিতা। খৃষ্টান যে, কিরূপে হিন্দুকে পৌত্তলিক বলিয়া ঘৃণা করেন, তাহা ত বুঝাই যায় না! তাঁহারও ত বার মাসে তের পার্ব্বণ! তাঁহারও যত পার্ব্বণে নানারূপ অনুষ্ঠান, তাঁহারও ভোজ ফলার, তাঁহারও নববস্ত্র পরিধান, তাঁহারও নৃত্য গীত, তাঁহারও অভিনয় যাত্রা!

যেখানে ক্রিয়াকাণ্ড, সেইখানেই বাহ্য আড়ম্বর, সেইখানেই আচার অনুষ্ঠান; সেইখানেই দেব-পূজা। খৃষ্টানকেই দৃষ্টান্তস্থলে আনিয়াছি, আনা চলে সকলকে; আর আনাই উচিত। আচার অনুষ্ঠান না হইলে পূজা হয় না, মানস পূজায় সাধারণের অধিকার নাই। আচার অনুষ্ঠান না হইলে লোকের ধর্ম্মে আসক্তি বাড়ে না, আসক্তি হয়ই না। সকল খৃষ্টানসম্প্রদায়েই আচার অনুষ্ঠান আছে, বাহ্যাড়ম্বর আছে, আমোদ আহ্লাদ আছে, ভোজন জলপান আছে। কোন না কোনরূপ প্রতিমাপূজা সকলেরই আছে। যদি হিন্দুকে দোষ দিতে হয়, তাহা হইলে সকলকেই দোষ দিতে হয়; যদি হিন্দুকে প্রতিমাপূজক বলিয়া পৌত্তলিকের দলে ফেলিতে হয়, তাহা হইলে সকলকেই ফেলিতে হয়। হিন্দুর পূজাপ্রথাই প্রকৃষ্ট প্রথা। সকলেরই উচিত, হিন্দুর অনুসরণ করা। হিন্দুর প্রথা উৎকৃষ্ট বলিয়াই ধর্ম্মে হিন্দুর এখনও অচলা ভক্তি। এত ভক্তি আর কাহারও নাই, হিন্দুর মত তন্ময় হইয়া ভগবৎপূজা করিবার শক্তি আর কাহারই নাই। হিন্দুর পূজা-প্রথার এমনই স্বাভাবিক গুণ যে, তন্ময়তা স্বতই উপস্থিত হয়। আর কোন ধর্ম্মেই এরূপ তন্ময়তা দৃষ্ট হয় না। কেন না, আর কোন ধর্ম্মেই তন্ময়তার পথ এরূপ মুক্ত এবং প্রশস্ত নহে। রোমান কাথলিকের ত কুণ্ঠিত হইবার প্রয়োজন নাই। খৃষ্টানের ভিতর তিনিই হিন্দুর একটু আদর্শে চলিয়া থাকেন, তাই তাঁহারই পূজা-প্রথা অন্যান্য খৃষ্টানের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আর অন্যান্য খৃষ্টানের অপেক্ষা যে, তাঁহারই তন্ময়তা অধিক, তাহা ত দেখিতেই পাওয়া যায়। রুষ গ্রীকের ধর্ম্মেও কাথলিকবৎ পন্থা অনেকটা আছে, তাঁহারাও অনেকটা কাথলিকের অনুরূপ। সুতরাং তাঁহাদের কথা আর বিশেষ করিয়া কহিলাম না।

নিজের ফাঁদে।

প্রেমের রীতি-নীতি গতি-মতি সকল দেশে সকল যুগে একরূপ; সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি, চারি যুগেই প্রেমের লীলা চলিয়া আসিতেছে। গুপ্তপ্রেম চলিতেছে চারি যুগে; গুপ্তপ্রেমের সুখ দুঃখ, অমৃত গরল, শান্তি অশান্তি, জল আগুন, শৈত্য উত্তাপ, আশা আশঙ্কা, সবই চলিতেছে সকল যুগে। প্রেমের সেই সত্যকালের পথেই প্রেমিক ত্রেতায় চলিয়াছেন, দ্বাপরেও সেই পথেই বিচরণ করিয়াছেন, আবার এখন কলিকালেও সেই পথেই যাতায়াত করিতেছেন প্রেমের যে সাগরে প্রেমিক প্রেমিকা সত্যে—মান্ধাতার আমলে সাঁতার দিয়াছিলেন, ত্রেতার রামরাজ্যেও সেই সাগরেই ঝাঁপ দিতে হইয়াছিল, দ্বাপরে স্বয়ং কালাচাঁদও সেই সাগরেই ডুব দিয়াছিলেন; আবার এই কলিকালের সাদাচাঁদেরাও সেই সাগরেই পড়িয়া হাবু ডুবু খাইতেছেন। প্রেমিক-পক্ষী সত্য যুগে যে ফাঁদে পড়িয়াছিলেন, ত্রেতায় তাঁহাকে সেই ফাঁদে জড়াইতে হইয়াছিল, দ্বাপরেও তাঁহার জন্যে সেই ফাঁদ পাতা হইত, আবার এই কলির যত প্রণয়-বিহঙ্গমকেও সেই জালে পড়িয়াই ঝটপট করিতে হইতেছে। সত্যযুগেও সকলের ভাগ্য প্রসন্ন হইত না, অনেকের পক্ষেই হইত, "প্রণয় পিয়ুষ নয় বিষেভরা বিষময়।" ত্রেতায়ও অনেকের অমৃতভাণ্ড গরলে পূর্ণ হইত, দ্বাপরেও অনেকের সুধাবাটী

হলাহলে ভরিয়া থাকিত। আর এই কলিযুগেও অনেকের পেয়ালা সে পড়িয়া পিয়ুষ কালকূটে পরিণত হইতেছে! অতএব, পাঠক আর দেশ-কাল-পাত্রের আলোচনা না করিয়া, চল একবার কলিযুগের প্রধান প্রেমতীর্থে—পূর্ণ-প্রণয়ের লীলাক্ষেত্রে—প্রেমতীর্থের প্রধান পাণ্ডা ফরাসীর প্যারিসক্ষেত্রে—চল। যুগভেদে তীর্থের মাহাত্ম্যভেদ হয়। কলিযুগে যেমন ভারতীয় পুরুষোত্তমের শ্রীক্ষেত্র ভক্তি-পূজার প্রধান তীর্থ, সেইরূপ ইউরোপীয় পুরুষোত্তম ফরাসীর প্যারিসক্ষেত্র প্রেম-পূজার প্রধান তীর্থ। সেখানে পরিণয়ের অপেক্ষা প্রণয়ের আদর অধিক; প্রণয় মুখ্য, পরিণয় গৌণ। ফরাসীই কলিযুগের ধর্ম্মপ্রচারক। সাম্য স্বাধীনতার প্রচার করিয়াছেন ফরাসী, রাজনীতির বদলে প্রজানীতির প্রচার করিয়াছেন ফরাসী, ধর্ম্মগত ইচ্ছা-তন্ত্রের প্রচার করিয়াছেন ফরাসী, অর্থগত অধিকার-সাম্যের প্রচার করিয়াছেন ফরাসী, আবার প্রেমগত ইচ্ছা-তন্ত্রেরও প্রচার করিয়াছেন ফরাসী। যেমন গ্রহ মধ্যে চন্দ্রগ্রহ, নক্ষত্র মধ্যে ধ্রুব নক্ষত্র, ঋতু মধ্যে বসন্তঋতু, মাস মধ্যে মধুমাস, বার মধ্যে রবিবার, তিথি মধ্যে পূর্ণিমা তিথি, সেইরূপ দেশ মধ্যে ফরাসিদেশ, নগর মধ্যে পরীনগর। পরীর নগর বলিয়াই ফরাসী রাজনগরের নাম পরীনগর। সেই পরীনগরে পরীর লীলা, পরীর আবার প্রেমের লীলা! অতএব আর কথা-বৃদ্ধি না করিয়া, এইবার প্রকৃতের আরম্ভ করিয়া দিই।

প্যারিসের এক যুবক ঔষধের কারবার করেন। অমৃত গরল দুই লইয়াই তাঁহাকে থাকিতে হয়। কিন্তু বিষও অমৃতের কার্য্য করিয়া থাকে, "বিষমপ্যমৃতং ভবেৎ কচিদমৃতং বা বিষমীশ্বরেচ্ছয়া।" চিকিৎসকের ইচ্ছাতেও বিষ অমৃত হয়, তিনি ত আরোগ্যের ঈশ্বরও বটেন। যাহাই হউক, যুবকের দৈনিক কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, দিনমণি অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইয়াছেন, কিন্তু চন্দ্রের জ্যোৎস্না শীতল আলোকের বিতরণ করিতেছে। যুবক একাকী, মনটা সুতরাং একটু উড়ুউড়ু করিতেছে। হাতে বীণা, বারান্দায় বসিয়া ইচ্ছামত দুইটা গত বাজাইতেছেন, মধ্যে মধ্যে একটু আলাপচারীও করিতেছেন। হঠাৎ দেখিলেন, সম্মুখে বাতায়ন অর্দ্ধমুক্ত। কিন্তু অর্দ্ধমুক্ত বাতায়নে যাহা দেখিলেন, তাহাতে মুগ্ধ হইলেন। সুন্দরী যুবতীর—পরীনগরের সেই পরীর—রূপ দেখিয়া যুবক একেবারেই "চিত্রার্পিতারম্ভ ইবাবতস্থৌ।" হাতের বীণা হাতেই রহিল, অঙ্গুলির মেজরাফ অচল হইয়া পড়িল! কিন্তু এভাব অধিকক্ষণ রহিল না। যুবক যে, ইঙ্গিত বুঝিতে পারিলেন; জ্যোৎস্নালোকে যে যুবতীর একটু হাতনাড়া দেখিতে পাইলেন! দেখিলেন, যেন সুন্দরী সাহস দিতেছেন, যেন নিকটে যাইতে আদেশ করিতেছেন। এরূপ আদেশে নিতান্ত কাপুরুষেরও পৌরুষ হয়; ভীরুও বীর হয়। রসিক তখনই আস্তে আস্তে গিয়া বাতায়নতলে দণ্ডায়মান হইলেন। পরীহস্তের একখানি পত্র নিপতিত হইল, যুবক ধরিতে গেলেন। কিন্তু হায়! "শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি।" পত্রখানি বাতাসে উড়িয়া পার্শ্ববর্ত্তী ভবনের উদ্যান-মধ্যে নিপতিত হইল। যুবক আর কোন দিকে না চাহিয়া, প্রাচীরোল্লংঘন করিয়া সেই উদ্যানে প্রবেশ করিলেন, এবং সেই পত্র হস্তগত করিয়া আবার সেই প্রাচীরের উল্লংঘন করিয়া রাজপথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চন্দ্রালোকে দেখিলেন, পত্রে লেখা আছে,

"সতত হেরিতে চাই, যেন বিলম্বে দেখিতে পাই।"

নিশীথেই গুপ্তপ্রেমের নির্দ্দিষ্ট সময়, নিদানপক্ষে দেড় প্রহরে। তাই সুন্দরী সুন্দরকে বিলম্বে দর্শন দিতে বলিয়াছেন। প্রেম প্রথম রাত্রে হয় না,—না কোন দেশে কোন যুগে হয় নাই—হয় না—হইবেও না। গুপ্ত ব্যক্ত সকল প্রেমেই এই নিয়ম। "সংযমী নাবসীদতি।" অনেক সহিষ্ণুতা আবশ্যক, অনেক অপেক্ষা প্রতীক্ষা করিতে হয়, অনেক মশা ওয়ানকীর কামড় সহিতে হয়, হাত বুলাইয়া মুখের পিঠের মশা মারিতে হয়, চাঁদড়াইলে বিপদে পড়িতে হয়। অনেক যত্ন না হইলে, রত্ন মেলে না; অনেক অধ্যবসায় না থাকিলে, প্রেমবৃক্ষের ফলভোগ করিতে পারা যায় না। প্রেমশাস্ত্রের উপদেশ বড় কঠোর। কঠোর তপস্যা না হইলে মুক্তির পথ দেখিতে পাইবে কেন পাঠক?

পত্রকে চুম্বনপূর্ব্বক যুবক বুকের পকেটে পকেটস্থ করিলেন।

"From Iloisa it came
And Abelard must kiss the name"

পত্রচুম্বন প্রেমশাস্ত্রের উপদিষ্ট—না না—আদিষ্ট। ডাকের চিঠীর টিকিট অধরামৃত দিয়া আঁটা হয়। কোন কোন প্রেমিক তাই পত্রের টিকিট গিলিয়া ফেলেন, তবুওত টিকিটে হৃদয়েশ্বরীর অধরামৃত আছে। পাঠক, তোমার বোধ হয় এতটা করিতে হয় না। তুমি কি বিরহী? পুষ্পধন্বা তোমার কল্যাণ করুন, বিরহযন্ত্রণা তোমার শত্রু সহ্য করুক, যেন তোমাকে সহ্য করিতে না হয়। ডাকের টিকিট তোমার শত্রু গিলুক, যেন তোমাকে গিলিতে না হয়। আর আজ কাল কতকটা হিন্দুয়ানীর জ্বালায়—অনেকটা বেক্টিরিয়লজি বা বীজাণুবাদের জ্বালায়—অধরোষ্ঠে টিকিট খাম আঁটা একপ্রকার রহিতই হইয়া গিয়াছে। যে কাজ পূর্ব্বে অমৃতে হইত, সে কাজ এখন জলে হয়! গরলে হইলেও ত ক্ষতি ছিল না! তুমি পাঠক, বীজাণুবাদে ভুলিও না, জলের ব্যবহারে অনুমোদন করিও না। বলা ত যায় না, যদি কখনও বিরহ-যন্ত্রণা তোমাকে সহ্য করিতেই হয়!

আর বীজাণুবাদ কীটাণুবাদের বিচার নিষ্প্রয়োজন।

সর্ব্বনাশ উপস্থিত ! রাত্রি পোহাইল। যাহার উদ্যানে পত্র পড়িয়াছিল, সেই পুরুষ উঠিয়া উদ্যানদর্শনে আসিলেন। পুরুষটী একটু প্রবীণ, তাঁহার গৃহিণী কিন্তু প্রবীণা নহেন—পূর্ণ যুবতী। একে যুবতী, তায় সুরূপা—সুন্দরী ! সুতরাং পুরুষের মনে সদাই সন্দেহ। ভাঙ্গা ঘরে কহীনূর। পুরুষের রাত্রে নিদ্রা হয় না, দিবসে শান্তি হয় না। আবার নিকটেই প্রবাসী রাসায়নিক, রাসায়নিক আবার রসিক ; অন্যথা বীণাবাদ্য করিবেন কেন ? আবার বীণার সঙ্গে গান—যে সে গান নহে, বিরহ সঙ্গীত ! প্রবীণ পুরুষ সন্দেহে অস্থির। খোঁড়ার পা খালেই পড়ে। যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানেই সন্ধ্যা হয়। প্রবীণ উদ্যানে আসিয়া দেখিলেন পদচিহ্ন, দেখিলেন ফুলের কেয়ারী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বুঝিলেন, কেহ প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া বাগানে আসিয়াছিল ! আর ত সন্দেহ রহিল না, ঐ নরাধমের কাজ, ঐ বীণাবাদক রাসায়নিকটাই রসপান করিতে আসিয়াছিল ! ভারতের সুন্দর সুড়ঙ্গ কাটিয়াছিল ; প্রবীণ বুঝিলেন, রসায়নের সুন্দর অতি সাহসী, সে অসুর প্রাচীর লংঘিয়া রসপান করে। সিদ্ধান্ত হইল, চোর ধরিতে হইবে। ভারতচন্দ্রের সুন্দর-চোরকে নারীবেশী কোটালের হাতে পড়িতে হইয়াছিল। রামপ্রসাদের সুন্দর চোর সিন্দুরের জন্যে রজকের সাহায্যে ধরা পড়িয়াছিলেন। প্যারিসের প্রবীণ, চোর ধরিবার জন্যে, ফাঁদ পাতিলেন। পাতিলেন এখনকার বৈজ্ঞানিক ফাঁদ ! বিষম জাল, পড়িলেই জড়াইতে হইবে। চোর যেমন জালে পড়িবে, অমনই চারি দিকে তাড়িতঘণ্টা বাজিয়া উঠিবে। গোটা সহর প্রতিধ্বনিত হইবে, পুলীশ পর্য্যন্ত জানিতে পারিবে। ইউরোপ আমরিকায় চোর-ধরার এইরূপ ফাঁদের চলন হইয়াছে। প্রবীণও চুপি চুপি এইরূপ ফাঁদ পাতিয়া স্ত্রীকে বলিলেন, "আমি আজ বাড়ী আসিব না, অমুক স্থানে যাইব, কার্য্যবশতঃ সেই খানেই রাত্রিযাপন করিব।" সন্ধ্যার সময়ে এই কথা কহিয়া প্রবীণ বিদায় লইলেন, কিন্তু স্থানান্তরে না গিয়া বাড়ীর আনাচে কানাচেই লুকাইয়া রহিলেন। পত্নীর গুপ্তমধুপকে ধরিবার জন্যে এরূপ মুষ্টিযোগের প্রয়োগ অনেকেই করিয়া থাকেন, সকল দেশেই এ মুষ্টিযোগের চলন আছে। রহস্য পাঠকের অবিদিত নহে, সুতরাং প্রবীণের বিদায় ও অন্তর্গোপনের কথায় আর কথা বাড়াইব না। আমাদের রসিক রাসায়নিক যুবক এসব কিছুই জানিতে পারেন নাই, জানিবার আবশ্যকতাও হয় নাই ; তিনি ত আর প্রবীণের সেই আঘ্রাত আস্বাদিত পুষ্পের মধুপান করিবার জন্যে লালায়িত নহেন ; প্রবীণ যে রত্নের জন্যে এত যত্ন করিতেছে, সে রত্নের ত আর তিনি অন্বেষণ করিতেছেন না। তিনি যথাকালে বীণাহস্তে সেই বাতায়নের তলে গিয়া হাজির হইলেন। প্রবীণ গুপ্তভাবে ছিলেন, আর থাকিতে

"তবেরে শয়তান !" বলিয়া যেমন লাঠী চালাইলেন, অমনই রাসায়নিকের মুষ্ট্যাঘাতে অবসন্নপ্রায় হইয়া স্বীয় দুর্গে পলায়ন করিলেন ! নবীনে প্রবীণে যুদ্ধ হইলে, প্রবীণের এই দশাই ঘটিয়া থাকে। উদ্যানের দ্বার মুক্ত ছিল, প্রবীণ ছুটিয়া যেমন উদ্যান মধ্যে পলাইবেন, অমনই গিয়া ফাঁদে পড়িলেন। চোর ধরিবার জন্যে যে জালযন্ত্র পাতিয়া রাখিয়াছিলেন, নিজেই তাহাতে পড়িয়া জড়িত হইলেন। আর তিনি যেমন জালে পড়িলেন, অমনই চারিদিকে তাড়িতঘণ্টা টনটন ঠনঠন ডনডন ঢনঢন করিয়া বাজিতে লাগিল। জাল এড়াইবার জন্যে যত ছটফট ঝটপট করিতে লাগিলেন, ততই জড়িত হইলেন ; আর চারিদিকের ঘণ্টাও তত জোরে বাজিতে লাগিল। অদূরেই পুলীশ-থানা, থানাদার প্রহরিসমভিব্যবহারে ছুটিয়া আসিলেন। জালে জড়িত চোর ধরিয়া পুলীশ বাহাদুরী লইবার উপক্রম করিলেন। আসামীকে জালমুক্ত করিয়া থানাদার প্রহরীর জিম্মায় দিলেন, তখন তাঁহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিতে হইল। নিজের পাতা ফাঁদে নিজেই পড়িয়াছেন বলিয়া অনেক অনুতাপ আক্ষেপও করিতে হইল। ইন্‌স্পেক্টর ও কনষ্টেবলেরা কিন্তু কিছুতেই হাস্য সংবরণ করিতে পারিলেন না। জালমুক্ত গৃহস্বামীর অভিযোগে ব্যবসায়নিককে ধরিলেন বটে, কিন্তু প্রহসনের জের তখনও ইন্‌স্পেক্টর মিটাইতে পারিলে না।

আমাদের কিন্তু জানা আছে, ঘুটে পোড়ে গোবর হাসে। আমাদের এখানে কলিকাতার অদূরে এক পুলীশ ইন্‌স্পেক্টর, অনেক দিন হইল, ফৌজদারী আদালতেরই কতিপয় বন্ধু সমভিব্যহারে, আনন্দ করিতে করিতে—লীচুর সময়ে—একদা এক বাগানে সদলে লীচু চুরি করিতে গিয়াছিলেন। হয়, নৈশ আনন্দের সময়ে অনেকের এরূপ প্রবৃত্তি বলবতী হয়। ইন্‌স্পেক্টর বাবু ও তাঁহার সহযোগীরা লীচু বাগানে গিয়া গাছে উঠিয়াছিলেন, মনের সাধে মধুবন-ভঙ্গ করিতে লাগিয়াছিলেন। বাগান ছিল ইজারা দেওয়া, আর অতি উৎকৃষ্ট লীচু বলিয়া গাছে জাল ঘেরা ছিল। লীচু-গাছে জাল ঘিরিয়া দেওয়া হয়, ইহা অনেক পাঠকেরই দৃষ্ট বিদিত। যাহাই হউক, আরোহণের সময়ে সকলেই জাল এড়াইয়া উঠিয়াছিলেন। যখন ইজারদার লোকজন লইয়া তাড়া করিয়া আসিল, তখন সকলেই তাড়াতাড়ি নামিয়া পলাইলেন ; কিন্তু আনন্দের মাত্রাধিক্য হইয়াছিল বলিয়াই হউক বা দৈহিক গঠনের দোষেই হউক, ইন্‌স্পেক্টর বাবু তাড়াতাড়ি নামিবার সময়ে জালে পড়িয়া গেলেন। ইজারদারের লোকেও তাঁহাকে জালমুক্ত করিয়া থানায় হাজির করিল। চোরকে তাহারা থানায় ইন্‌স্পেক্টরের কাছে লইয়া আসিল। যাঁহার কাছে যাহাকে আনিল, সেই যে, তিনি, তাহা উহারা অন্ধকারে বুঝিতে পারে নাই ; থানায় আসিয়া সব বুঝিল। দেখিল, [illegible] ভক্ষক। পলাইয়া গেল ; কেন পলাইয়া গেল, তাহা

পাঠক বুঝিতেছেন। কিন্তু প্যারিসের পুলিশ-ইন্‌স্পেক্টরের অতটা হাস্য করা উচিত ছিল না। আজ ঘুঁটের যে দশা, দুই দিন পরে গোবরেরও যে, সেই দশা হইতে পারে, তাহা ইন্‌স্পেক্টর সাহেবের বুঝা উচিত ছিল।

যাহাই হউক, প্রহসনের জের চলিল, প্রবীণের অভিযোগেই রাসায়নিক যুবককেও ইন্‌স্পেক্টরের ধরিতে হইল। প্রবীণের বিশ্বাস দাঁড়াইয়াছিল, ইনিই নিতি নিতি মধুপান করিয়া পলান। তাই ত প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন,—

"বার বার মুরগী খেয়ে গেছ ধান।
এইবার মুরগীর বধিব পরাণ !"

ধৃত অভিযুক্ত হইয়া রাসায়নিককেও অগত্যা আত্মকাহিনী কহিতে হইল, বাতায়নের কথা কহিতেই হইল ; তাঁহার বাতায়নবিহারিণী হৃদয়হারিণীর কথাও কহিতে হইল। আর উপায়ান্তর না থাকায় সেই হৃদয়েশ্বরীকেও সকল কথা কবুল করিতে হইল ; প্রেমের কথায় সায় দিতে হইল। "যাহার শেষ রেশ তাহাই বেশ।" রাসায়নিকের হৃদয়েশ্বরী গুপ্ত প্রেম আর গুপ্ত রাখিতে পারিলেন না, প্রণয় পরিণয়ে পরিণত হইল ; শুভদিনে শুভক্ষণে চারি হাত এক হইল। আর আমাদের প্রবীণেরও সন্দেহ-ব্যাধি দূর হইল ;—বুঝিলেন, গৃহিণী সতী—সাধ্বী। রাসায়নিকের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেন। প্রবীণেরা এরূপ অবস্থায় ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে সুপটু। আর বস্তুতও ইনি লোক ছিলেন ভাল, কেবল সন্দেহেই মন্দ হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রগাঢ় বিদ্বেষ প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হইল, রাসায়নিকের শুভবিবাহে আনন্দের একশেষ হইল। বন্ধুর বিবাহ উপলক্ষে প্রবীণ নিজের বাড়ীতেও উৎসব করিলেন ; নবদম্পতীর কল্যাণে পানভোজনের আয়োজন করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না ! গরলে অমৃত উঠিল, ফাঁদে চাঁদ পড়িল। প্রবীণের দুঃখসাগর শুষ্ক হইল, সুখসাগর পূরিয়া গেল। নবীনের ত কথাই নাই ! রসিক পাঠক ! এ প্রবন্ধে তোমার কিছু শুষ্ক বা কিছু পূর্ণ হইল কি ?

দূর-শ্রবণ যন্ত্র।

(The Telephone.)

পাশ্চাত্য পদার্থ-বিজ্ঞানের আলোচনার কল্যাণে বহুবিধ যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। তন্মধ্যে দূর-শ্রবণ যন্ত্রটী যেমন বিস্ময়জনক, সেইরূপ মহোপকারী।

টেলিগ্রাফ বা তাড়িত-বার্ত্তাবহ-যন্ত্রযোগে আমরা বহুদূরস্থিত স্থানে সংবাদ প্রেরণ করিয়া থাকি ; পরস্পর হইতে বহুদূরে থাকিয়া আমরা একপ্রকার কথোপকথনও করিতে পারি ; কিন্তু তদ্দ্বারা সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে কথোপকথন

অক্ষরবাচকস্বরূপ নির্দ্দিষ্ট থাকে। সেই সকল সাঙ্কেতিক চিহ্ন প্রয়োজনমত টেলিগ্রাফ-যন্ত্রযোগে তাড়িতবলসহকারে দূরবর্ত্তী স্থানে প্রেরিত হয়। সেই চিহ্নগুলিকে আবার নির্দ্দিষ্ট অক্ষরে পরিণত করিয়া লইতে হয়। কোন্ চিহ্ন ভাষার কোন্ অক্ষরবাচকরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা অগ্রে শিক্ষা করিতে হয়। অভ্যাসবশতঃ সহজেই চিহ্নগুলিকে ভাষাস্বরূপ সঙ্গে সঙ্গে পাঠ করিয়া লওয়া যায়।

দূর-শ্রবণ-যন্ত্রে কিন্তু পূর্ব্বোক্তরূপ সঙ্কেতের প্রয়োজন হয় না। এতদ্দ্বারা সাক্ষাৎসম্বন্ধেই কথোপকথন করা যায়। তুমি যন্ত্রমধ্যে মুখ দিয়া যাহা কহিবে, দূরস্থিত অন্য ব্যক্তিও তদ্রূপ আর একটী যন্ত্র কর্ণে ধারণ করিয়া, ঠিক সেই কথাগুলিই শুনিতে পাইবে। সুতরাং টেলিগ্রাফযন্ত্র অপেক্ষায় টেলিফোনের কার্য্যপ্রণালী একক্রমে অতি সহজ, স্বাভাবিক ও সুন্দর। নিকটে বসিয়া দুইজনে যেমন পরস্পর কথোপকথন করিয়া থাকে, এই যন্ত্রের সাহায্যেও ঠিক তদ্রূপ হয়। কেবল ঐ দুই ব্যক্তি পরস্পরকে দেখিতে পায় না, এই মাত্র প্রভেদ।

দূর-শ্রবণ-যন্ত্রের গঠন যেমন সামান্য উহার নির্ম্মাণকার্য্যও সেইরূপ অল্পব্যয়সাপেক্ষ ও অল্পায়াসসাধ্য। আজিকালি কলিকাতা সহরে অনেক আফিসে এবং অনেক বাটীতে টেলিফোন যন্ত্র বসিয়াছে। এতদ্দ্বারা যে কত সময় ও কত ব্যয় বাঁচিয়া গিয়াছে, তাহা বলা যায় না ! এরূপ অতি প্রয়োজনীয় যন্ত্রের গঠনপ্রণালীর কিঞ্চিৎ বিবরণ পাঠকগণের মনোরঞ্জন করিতে পারে, এই বিশ্বাসে আমরা এই প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম।

শব্দ, তাড়িত ও চুম্বকধর্ম্ম এই যন্ত্রের ভিত্তিস্বরূপ। শব্দের উৎপত্তি কিরূপে হয়, তাড়িত-স্রোতের গতিবিধি কিরূপ এবং চুম্বকের কি ধর্ম্ম, এই তিনটী বিষয় যৎসামান্যমাত্র বুঝিয়া লইলেই, দূর-শ্রবণ যন্ত্রের গঠনপ্রকরণ ও তাহার কার্য্যপ্রণালী সহজে বুঝা যাইবে।

অনেকের হয় ত এরূপ ধারণা আছে যে, বিস্তৃত ধাতু-তারমধ্য দিয়া শব্দ সঞ্চালিত হইয়া থাকে। এই প্রবন্ধপাঠে পাঠক-মহাশয় বুঝিবেন, তাহা কতদূর ভ্রমমূলক।

শব্দ তাহার উৎপত্তিস্থান হইতে বায়ু দ্বারা পরিচালিত হইয়া কর্ণবিবরে প্রবিষ্ট হইলে, আমাদের শব্দজ্ঞান জন্মে। কোন পদার্থের গাত্রে আঘাত করিলে, ঢোলে কাঠি দিলে, সেতারের তারে টঙ্কার মারিলে, ঘণ্টা বাজাইলে, কথা কহিলে, ফলে যে কোন প্রকারে হউক্ শব্দ করিলে, শব্দোৎপাদক পদার্থের জড়কণাসমূহ দ্রুতবেগে কাঁপিতে থাকে। সেই আণবিক পরিকম্পন বায়ুতে পরিচালিত হয়। বায়ুর যে অংশটুকু সেই পরিকম্পিত পদার্থগাত্র স্পর্শ করিয়া থাকে, সেই অংশটুকু প্রথমে কাঁপিতে থাকে। ক্রমে চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী সমগ্র বায়ু তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে।

অনুসারে অল্প কিম্বা অধিক দূর পর্য্যন্ত বায়ু এইরূপে পরিকম্পিত ও তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে। সেই বায়ুতরঙ্গ ক্রমে বিস্তৃত হইয়া আমাদের কর্ণমধ্যে প্রবিষ্ট হয়। কর্ণবিবরে কর্ণপটহ নামক একখানি সূক্ষ্ম চর্ম্মপর্দ্দা বিস্তৃত আছে। পূর্ব্বোক্ত বায়ুতরঙ্গ সেই কর্ণপটহে গিয়া আঘাত করে। তাহাতে ঐ চর্ম্মপার্দ্দারও আন্দোলন বা পরিকম্পন ঘটিয়া থাকে, অর্থাৎ তাহা দ্রুতবেগে কাঁপিতে থাকে। সেই পটহ স্পর্শ করিয়া যে শ্রবণজ্ঞানোৎপাদক শিরা মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে, তখন সেই শিরা দ্বারা ঐ পরিকম্পন মস্তিষ্কে নীত হয়। তখনই আমাদের শব্দজ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে। বায়ু না থাকিলে, কোন শব্দজ্ঞানই লাভ করা যাইত না। বায়ুবিরহিত স্থানে কোন উপায়ে এক পদার্থের গাত্রে অন্য পদার্থ দ্বারা আঘাত করিলে সেই আঘাতজনিত শব্দ আমাদের কর্ণপটহ স্পর্শ করিবে না; সুতরাং সেই শব্দ শ্রুতিগোচর হইবে না। ফল কথা, এই দাঁড়াইতেছে যে, আঘাত মাত্র শব্দোৎপাদক পদার্থের দ্রুত পরিকম্পন ঘটে; সেই পরিকম্পন বায়ু দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া গিয়া কর্ণপাটহের পরিকম্পন-সম্পাদন করে। তদনন্তর কর্ণপটহ স্পর্শ করিয়া যে শ্রুতিশিরা মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে, সেই শিরাযোগে ঐ পরিকম্পন আমাদের অনুভূতির আধার মস্তিষ্কে গিয়া উপস্থিত হয়; তখনই আমাদের শব্দজ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে।

এখন তাড়িতপ্রবাহের বিষয় কিছু বলিব:—

কাচ, চীনেমাটি অথবা সাধারণ মাটিতে বিনির্ম্মিত একটী পাত্র, দুইখানি দুইপ্রকার ধাতু-নির্ম্মিত ফলক বা পাত এবং লবণ অথবা অম্ল কিম্বা দ্রাবকে মিশ্রিত জল, এই তিনটী উপকরণের একত্র সমাবেশে এক একটী তাড়িত-কোষ সংগঠিত হইয়া থাকে। ঐ কোষের মধ্যে তাড়িত বলের উৎপত্তি হয়। এইরূপ অনেকগুলি তাড়িত-কোষকে পরস্পর সংযুক্ত করিলেই, একটী বৃহৎ বলশালী তাড়িতব্যাটারী রচিত হইয়া থাকে। নিম্নে একটী সংযুক্ত বা মিশ্র ব্যাটারীর প্রতিরূপ প্রদত্ত হইল।

১ম চিত্র।

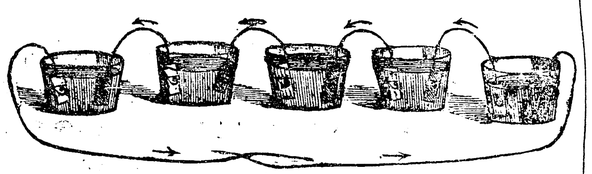

প্রতি পাত্রে একখানি করিয়া তাম্রফলক ও একখানি করিয়া দস্তাফলক অম্লাক্ত জলে নিমজ্জিত থাকে। এক পাত্রের একবিধ ফলক পরপাত্রের অন্যবিধ ফলকের সহিত ধাতুপাত দ্বারা সংবদ্ধ থাকে। ধাতুফলকগুলি এইরূপে জোড়া জোড়া সংবদ্ধ হইলে, প্রথম পাত্রের প্রথম ফলক তাম্রফলক হইলে শেষপাত্রের শেষফলক দস্তা-ফলক সন্নিবিষ্ট থাকে। ঐ তার দুইগাছিকে পরস্পর সংলগ্ন করিয়া দিলে, তন্মধ্যে তাড়িতস্রোত প্রবাহিত হইতে থাকিবে। ইহার বহুবিধ প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে;—ব্যাটারীর তারপ্রান্ত দুইটী একগাছি সরু তার সংলগ্ন করিয়া দিলে, ঐ তার উত্তপ্ত হইয়া লালবর্ণ হইয়া উঠিবে। ব্যাটারীর বল অধিকতর হইলে ঐ লোহিতোত্তপ্ত তার-গাছটী গলিয়া যাইবে; তারপ্রান্তদ্বয় পরস্পর নিকটবর্ত্তী করিয়া ধরিলে, তন্মধ্যে অতি প্রখর তাড়িতালোক প্রকাশমান হইবে; প্রান্তদ্বয় জীবশরীরে সংলগ্ন করিয়া দিলে শরীরে সংক্ষোভ বা আঘাত প্রদান করিবে; প্রান্ত দুইটী কোন দাহ্য পদার্থের সংস্পর্শে আসিলে ঐ পদার্থ প্রজ্বলিত হইবে; প্রান্তের তার দুইটী লৌহ-খণ্ডে জড়াইয়া দিলে, ঐ লৌহখণ্ড চুম্বকধর্ম্ম প্রাপ্ত হইবে, অর্থাৎ উহা অপর লৌহকে আকর্ষণ করিবে; আবার ঐ লৌহখণ্ডকে যেইমাত্র তার দুইটী হইতে বিচ্ছিন্ন করিবে, অমনি তৎক্ষণাৎ উহার চুম্বকধর্ম্ম বিনষ্ট হইবে। এইরূপ বিবিধ বিস্ময়জনক কার্য্য দৃষ্টে স্পষ্ট বোধ হয় যে, ব্যাটারীর মধ্যে তাড়িতবলের উৎপত্তি হয় এবং ঐ তাড়িত-বল ব্যাটারি-প্রান্তদ্বয়-সংলগ্ন দুইগাছি তারমধ্যে নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহিত হইতে থাকে।

ব্যাটারি-সংলগ্ন তার দুইটী এক-হাত-পরিমিত হউক্ অথবা শত সহস্র ক্রোশ দীর্ঘ হউক্ ঐ দুইগাছিকে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়া রাখিয়া, উহাদের প্রান্তদ্বয় কোন যন্ত্রে অথবা ধাতু, জল, জীবদেহ প্রভৃতি কোন পরিচালক পদার্থে সন্নিবিষ্ট করিলে, ঐ তারমধ্যে অবিশ্রান্ত তাড়িত-স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকিবে; ইহাকেই তাড়িতস্রোতঃ-পূরণ করা কহে। ব্যাটারীর এক-প্রান্তস্থ ধাতুফলক হইতে তাড়িতপ্রবাহ নির্গত হইয়া তৎসন্নিবিষ্ট তারমধ্যে ধাবিত হয় এবং ব্যাটারীর অপরপ্রান্তস্থ ধাতুফলক-সন্নিবিষ্ট তার-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পুনরায় ব্যাটারি-মধ্যে আসিয়া পৌঁছে। তাড়িতবলের এবম্বিধ গতি-বিধি অপরিমিত ত্বরিতবেগে হইয়া থাকে। ব্যাটারি-তারকে পৃথিবী বেষ্টন করাইয়া বিস্তৃত রাখিলে তাড়িতস্রোত ব্যাটারীর এক প্রান্ত হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, ঐ তারমণ্ডল-মধ্যে প্রবাহিত হইয়া, নিমেষমধ্যে ব্যাটারীর অপর প্রান্তে আসিয়া প্রবিষ্ট হইবে। এইরূপে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিয়া আবর্ত্তন করিতে তাড়িতস্রোতের নিমেষপরিমিত সময়ও লাগে না। দ্রুতগতির চরম দৃষ্টান্ত এরূপ আর দেখা যায় না। ব্যাটারীর তারপ্রান্ত দুইটী পরস্পর সংলগ্ন করিয়া দিলে, তাহাকে তাড়িতস্রোতঃ পূরণ করা কহে এবং প্রান্ত দুইটীকে পরস্পর বিযুক্ত বা পৃথগ্‌ভূত করাকে তাড়িত-স্রোতো ভঙ্গ করা কহে। তাড়িতবল সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বুঝিলেই চলিবে।

এক্ষণে চুম্বক-তত্ত্বের বিষয় কিছু অবগত হওয়া

চুম্বক একপ্রকার খনিজ লৌহবিশেষ। উহার প্রধান ধর্ম্ম এই যে, উহা লৌহ ও ইস্পাতকে আকর্ষণ করে। তদ্ব্যতীত নিকল ও কোবল্ট নামক ধাতু দুইটীকেও চুম্বক আকর্ষণ করিয়া থাকে। চুম্বকের আরও একটী বিশেষ ধর্ম্ম এই যে, উহার সংস্পর্শে অথবা সন্নিধানে—উহাকে স্পর্শ করিয়া কিম্বা উহার অতি নিকটে—লৌহখণ্ড রাখিয়া দিলে, ঐ লৌহখণ্ডও চুম্বক হইয়া দাঁড়াইবে; লৌহখণ্ড যতক্ষণ চুম্বকের নিকটে থাকিবে—অথবা চুম্বক-স্পর্শ করিয়া থাকিবে, ততক্ষণ ঐ লৌহখণ্ড চুম্বক-শক্তি প্রাপ্ত হইয়া, নিজেই একটী চুম্বক হইয়া উঠিবে। চুম্বক-সন্নিধান হইতে লৌহখণ্ডকে স্থানান্তরিত কর, লৌহখণ্ডের চুম্বকশক্তি তৎক্ষণাৎ তিরোহিত হইবে। চুম্বকের সংস্পর্শে কিম্বা সন্নিধানে লৌহখণ্ড যে চুম্বক হইয়া দাঁড়ায়, তাহাকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় চুম্বক-সংক্রামণ কহে।

সরল অথবা বক্র লৌহদণ্ডের গাত্রোপরি ব্যাটারি-সংলগ্ন তার জড়াইয়া দিলে, যতক্ষণ ঐ তারমধ্যে তাড়িত-স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকিবে, ততক্ষণ ঐ লৌহদণ্ড চুম্বক ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইবে। তাড়িতস্রোতের ভঙ্গ কর, অমনি তৎক্ষণাৎ ঐ লৌহদণ্ড চুম্বকধর্ম্ম-বিরহিত হইয়া পড়িয়া পূর্ব্ববৎ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। আবার তাড়িতস্রোত-পূরণ করিয়া দাও, তাড়িত-সমাগমে লৌহদণ্ডও পুনরায় চুম্বক হইয়া দাঁড়াইবে; স্রোতোভঙ্গ করিলে, লৌহদণ্ড আবার চুম্বকশক্তি-শূন্য হইবে। এরূপ চুম্বককে তাড়িত চুম্বক কহে। খানিকটা লম্বা সরু তামার তার লইয়া অগ্রে তাহাতে ভাল করিয়া রেশম জড়াইবে। তারের গায়ের কোন স্থান বাহির হইয়া না থাকে, এরূপ ভাবে তাহাকে রেশমমণ্ডিত করিবে। তাহার পর উহার দুই প্রান্ত হইতে খানিকটা খানিকটা বাদ রাখিয়া, উহাকে একটী লৌহদণ্ডের গাত্রে, ফেরের পর ফের দিয়া, স্ক্রুপের প্যাঁচের ন্যায় জড়াইয়া ফেলিবে। তদনন্তর তারপ্রান্ত দুইটী ব্যাটারীর দুই প্রান্তে সংলগ্ন করিয়া দিলেই হইবে। তখন ঐ লৌহদণ্ড তাড়িতচুম্বক হইয়া উঠিবে। উহার নিকটে সূচি অথবা অন্য কোন লৌহদণ্ড ধরিলে দেখিবে, উহা ঐ লৌহখণ্ডকে আকর্ষণ করিয়া, নিজ গাত্রে সংলগ্ন করিয়া রাখিবে।

আবার একটী দণ্ড-চুম্বকের গাত্রোপরি যদি ব্যাটারি-তার পূর্ব্বোক্তরূপে জড়াইয়া দেওয়া যায়, অর্থাৎ দণ্ড-চুম্বক বেষ্টন করিয়া যদি তাড়িত-স্রোত প্রবাহিত হয়, তবে ঐ দণ্ড-চুম্বকের চুম্বকশক্তি বা লৌহ-আকর্ষণী শক্তি অনেকাংশে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। প্রযুক্ত তাড়িতবল যে পরিমাণে অল্প অথবা অধিক হইবে, চুম্বকের আকর্ষণী-শক্তিও সেই পরিমাণে ন্যূনাধিক প্রবল হইবে। চুম্বকদণ্ড বেষ্টন করিয়া তাড়িত-স্রোতের আবর্ত্তন-কালমধ্যেই ঐ চুম্বক-দণ্ডের বলাধিক্য ঘটিবে, স্রোতোভঙ্গ করিবামাত্রই চুম্বকের বলাধিক্য তিরোহিত হইবে।

চুম্বকবল ও তাড়িতবলের মধ্যে পরস্পর অতিঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। তাহাতেই তাড়িত ও চুম্বক আর একটী পরমাশ্চর্য্যজনক গুণের অধিকারী হইয়াছে। ইংলণ্ডের বিখ্যাত তাড়িতবিদ্যাবিৎ পণ্ডিত মাইকেল ফ্যারাডে ঐ ধর্ম্মের আবিষ্কর্ত্তা। দূরশ্রবণ-যন্ত্রে প্রধানতঃ ঐ ধর্ম্মেরই নিয়োগ হইয়াছে। তাড়িত ও চুম্বকের ঐ শক্তি অবলম্বন করিয়া আমেরিকানিবাসী বেল্ সাহেব প্রচলিত টেলিফোন যন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন।

একটী তারকুণ্ডলের সন্নিধানে যদি একটি চুম্বক দ্রুত আন্দোলিত হইতে থাকে, অর্থাৎ ঘন ঘন কাঁপিতে থাকে, যদি চুম্বকটী তারকুণ্ডলের একবার অভিমুখে অগ্রসর হয়, আবার তৎপর মুহূর্ত্তেই পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হয়, যদি এইরূপে ক্রমাগত অগ্রপশ্চাৎ গতিযুক্ত হইতে থাকে, তাহা হইলে, ঐ তারকুণ্ডলমধ্যে তাড়িত-স্রোতের উদ্রেক হইবে এবং তন্মধ্যে তাড়িতস্রোত নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহিত হইতে থাকিবে। রেশমমণ্ডিত একগাছি দীর্ঘ ধাতুময় তার লইয়া, তাহাকে স্ক্রুপের প্যাঁচের ন্যায় বহুসংখ্যক ফেরে জড়াইয়া লইলে, সেটা একটি চোঙ্গার আকার ধারণ করিবে। ঐ তার-চোঙ্গার প্রান্তদ্বয় পরস্পর সংলগ্ন করিয়া, অথবা কোন ধাতুময় পদার্থের সহিত সংযুক্ত করিয়া, রাখিয়া দিয়া, যদি চোঙ্গার এক প্রান্ত-দেশের অতি সন্নিহিত একখানি চুম্বককে ত্বরিত-বেগে পরিকম্পিত করা যায়, তাহা হইলে, ঐ তার-চোঙ্গার মধ্যে তাড়িত-স্রোত আবির্ভূত হইয়া নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহিত হইতে থাকিবে। চুম্বকের প্রতি কম্পনে, অর্থাৎ তার-চোঙ্গার সন্নিধানে চুম্বকের অগ্রপশ্চাৎ গতির সঙ্গে সঙ্গে, তার-চোঙ্গা-মধ্যে একটী করিয়া তাড়িত-স্রোতের উদ্রেক হইবে; চুম্বক তারমণ্ডলের অভিমুখে একবার অগ্রসর হইলে তার-চোঙ্গার মধ্যে একটী তাড়িত-স্রোতের সমাবেশ হইবে; আবার চুম্বক পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইবার সময় আর একটী তাড়িত স্রোতের উদ্রেক হইবে। এই দুই তাড়িত প্রবাহের কেবল দিগন্তর ঘটিয়া থাকে, অর্থাৎ তারমণ্ডলের অভিমুখে চুম্বকের গতির সহিত যে তাড়িত স্রোতের উদ্রেক হয়, তাহার গতি তারকুণ্ডলের দক্ষিণপ্রান্ত হইতে বামপ্রান্তাভিমুখে হইয়া থাকে এবং তদ্বিপরীত দিকে চুম্বকের গতির সহিত তারকুণ্ডলের বামপ্রান্ত হইতে দক্ষিণ প্রান্তাভিমুখে প্রবাহিত হয়। ফলে, তারকুণ্ডলের নিকটে চুম্বক যেমন ঘন ঘন পরিকম্পিত হইতে থাকিবে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে তৎসন্নিহিত তার-কুণ্ডলমধ্যে উপর্য্যুপরি ক্রমান্বয়ে দুই বিপরীত দিকে দুইটী তাড়িত-স্রোত উৎপন্ন হইবে। তাহার ফলে এই দাঁড়াইবে যে, তার-কুণ্ডলমধ্যে অপরিমিত বেগে নিরবচ্ছিন্ন তাড়িত-স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকিবে।

এক্ষণে দূরশ্রবণ যন্ত্রের গঠন-প্রণালী কিরূপ এবং উহার কার্য্য-প্রকরণই বা কি প্রকার, তাহা দেখা যাউক্।

নিম্নবর্ত্তী ২য় চিত্রে 'ক' 'খ' ও 'গ' চিহ্নিত তিনটীমাত্র উপকরণের সমাবেশে টেলিফোন্ বা দূরশ্রবণ-যন্ত্র রচিত হইয়া থাকে। 'ক' একটী সরল দণ্ড-চুম্বক, 'খ' একখানি খুব পাতলা লৌহ-চাকৃতি, এবং 'গ' একটী কাঠের গুটি—উহার গাত্রে রেশমমোড়া সরু ও সুদীর্ঘ তামার তার জড়ান।

২য় চিত্র।

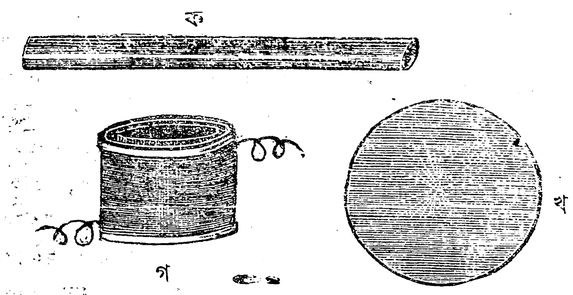

এই যন্ত্রে মুলেই তাড়িত-ব্যাটারীর নিয়োগ নাই। প্রচলিত টেলিফোন্ যন্ত্র যেরূপ সংগঠিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ একটীর প্রতিকৃতি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

৩য় চিত্র।

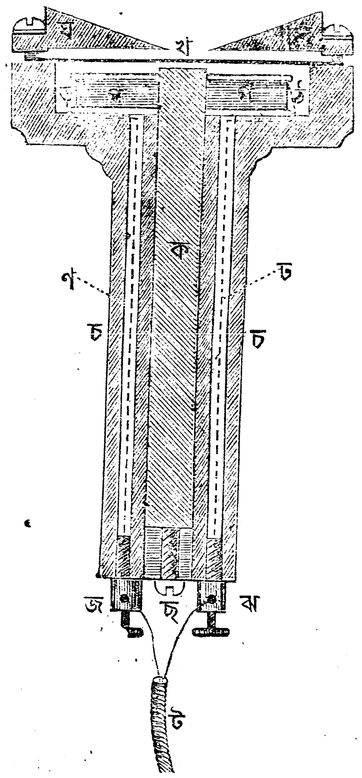

'ক' একটী ৪ ইঞ্চি লম্বা ও ১ ইঞ্চির ৮ ভাগের ৩ ভাগ-পরিমিত মোটা সরল দণ্ড-চুম্বক; 'চ' 'চ' একটী শূন্যগর্ভ বা ফাঁপা কাঠের চোঙ্গা।—তন্মধ্যে চুম্বকদণ্ড প্রবিষ্ট। ঐ চোঙ্গা যন্ত্রের হাতলেরও কাজ করে;—চোঙ্গাটী ধরিয়া যন্ত্রটী কাণে দিয়া শুনিতে হয়; আবার মুখের নিকটে ধরিয়া তন্মধ্যে কথা কহিতে হয়। চুম্বকদণ্ডের একপ্রান্তদেশের গাত্রে ১ ইঞ্চের ৮ ভাগের ৩ ভাগ-পরিমিত মোটা ও সওয়া ইঞ্চ বেড় এরূপ একটি গুটী 'গ' পরান। ঐ গুটির গাত্রে ১২৮ হাত ৩৬ নং রেশমমোড়া তার জড়ান। 'চ' 'চ' কাষ্ঠ আবরণের মধ্যে চুম্বকদণ্ডের দুই পার্শ্বে লম্বালম্বি দুইটী সঙ্কীর্ণ ছিদ্র ('চ' ও 'ণ') থাকে। গুটির তারের ভিতর ও বাহির প্রান্ত দুইটী 'ঠ' ও 'ড', দুইগাছি অপেক্ষাকৃত মোটা তারের (উহাতে রেশম-মোড়া) দুই প্রান্তে সংবদ্ধ এবং ঐ তার দুইগাছি চ' ও 'ণ' চিহ্নিত সঙ্কীর্ণ ছিদ্রমধ্য দিয়া বিস্তৃত থাকে। উহাদের অপর দুইপ্রান্ত 'জ' ও 'ঝ' চিহ্নিত দুইটী পিত্তলের ক্রুপের 'চ' 'চ' এর মধ্যে প্রবিষ্ট অংশের গাত্রে অড়ান; 'জ' 'ঝ' এর বহির্গাত্রে দুইটী ছিদ্রমধ্যে অন্য দুইগাছি অল্প মোটা তামার তার পরান; দুইটী বন্ধনী ক্রুপ ঐ তার দুইগাছিকে 'জ' 'ঝ' এর মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া রাখে। ঐ তার দুইটী রেশম-মোড়া হওয়া আবশ্যক; কেবল 'জ' 'ঝ' এ প্রবিষ্ট অংশমাত্র খালি অর্থাৎ অনাবৃত থাকিবে। ফলে, গুটির তারের সহিত 'চ' 'ণ' এর মধ্যে বিস্তৃত তারের ধাতুময় সংযোগে থাকা আবশ্যক; উহারা আবার 'জ' 'ঝ' ধাতু ক্রুপের গাত্রে জড়ান, তাহাদের গাত্রে দুই ছিদ্রে আবার অপর দুইগাছি তার পরান; এতদ্দ্বারা শেষোক্ত দুইটী তারের সহিত গুটির তারের নিরবচ্ছিন্ন ধাতব সংযোগ থাকিবে; ঐ তার দুইটীকে তখন আর অনাবৃত না রাখিয়া উহাদের গাত্রে পৃথগ্‌ভাবে রেশম জড়ান হয়; তাহার পরে উহাদিগকে একত্র করিবার সুবিধার জন্য 'ট' চিহ্নিত ভাবে জড়ান থাকে। প্রয়োজনমতে 'ট'কে দীর্ঘ করিয়া লইয়া শেষে উহার মধ্যস্থ দুই তারের খানিকটা করিয়া বাহির করিয়া ফেলিয়া উহাদের গাত্রের রেশমাংশ চাঁচিয়া ফেলিয়া রাখিতে হয়। তাহার আবশ্যকতা ক্রমে প্রদর্শিত হইবে। 'ক' চুম্বকের ঊর্দ্ধপ্রান্ত-সন্নিহিত আড়াই ইঞ্চ পরিধি 'খ' একখানি লৌহ-চাক্তি, 'চ' 'চ' চিহ্নিত কাষ্ঠ-ফ্রেমের মাথায় স্থাপিত। ঐ কাষ্ঠাবরণের ঢাক্‌নি 'ঘ' 'ঘ' দুই পার্শ্বে দুইটী ক্রুপ দ্বারা 'চ' 'চ' এর সহিত সংবদ্ধ। এইরূপে সংবদ্ধ হইলে 'ঘ' 'ঘ', ধাতু-চাক্তি 'খ' এর কিয়দংশ ধার বা কিনারা চাপিয়া ধরিয়া রাখিবে। তাহাতে 'খ'কে স্বস্থানে স্থির করিয়া রাখিবে, উহা আর কোন দিকে সরিয়া যাইতে পারিবে না। চিত্রে যেরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে ক্রুপ দুইটীর আর দুই এক প্যাঁচ ঘুরাইয়া দিলেই ঢাক্‌নিখানি লৌহ-চাক্তির কিনারা চাপিয়া বসিয়া যাইবে।

পূর্ব্বোক্তরূপ আর একটী যন্ত্র, স্থানান্তরে যাহার সহিত কথোপকথন করিবে, তাহার নিকটে থাকিবে। এই দুই যন্ত্রের মধ্যে ধাতুময় সংযোগ থাকা আবশ্যক। একের গুটির তারপ্রান্ত দুইটীতে দুইগাছি তারের দুই প্রান্ত সংবদ্ধ করিয়া দিয়া, ঐ তার দুইগাছি বরাবর দ্বিতীয় স্থানের

যন্ত্রটী পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়া রাখিতে হয়। ঐ দুই তারের সেই অপর প্রান্ত দুইটী ঐ স্থানের দ্বিতীয় যন্ত্রের গুটির তারপ্রান্ত দুইটীতে বাঁধিয়া দিলেই হইবে। 'ট'কে আবশ্যকমত দীর্ঘ করিয়া লইয়া, তন্মধ্যস্থ দুইটী তারকে আবার বাহির করিয়া ফেলিয়া ও তদুপরিস্থিত রেশমকে চাঁচিয়া ফেলিয়া, তাহার পরে গুটির দুই তারের সহিত সংবদ্ধ করিতে হয়। এতদ্দ্বারা উভয় যন্ত্রের মধ্যে ধাতুময় সংযোগ সাধিত হইয়া থাকে। এবম্বিধ ধাতু-সংযোজনা ঠিক না হইলে যন্ত্র চলিবে না। নূতন আবিষ্কারমতে উক্ত ধাতুসংযোজনা দুইগাছি সুদীর্ঘ তারে বিস্তৃত রাখিতে হয় না। দ্বিতীয় লম্বা তারের স্থানের প্রত্যেক যন্ত্রের, ঐ তারপ্রান্তের সহিত একখানি করিয়া ধাতুফলক সংবদ্ধ করিয়া দিয়া, তাহাদিগকে ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া রাখিতে হয়, অথবা তারপ্রান্ত জলের কলের পাইপ কিম্বা গ্যাসের পাইপের সহিত বাঁধিয়া দিলেও চলে। এস্থলে ধরাপৃষ্ঠস্থ মাটি অপর বিস্তৃত তারের কার্য্য করিয়া থাকে। নিম্নবর্ত্তী চিত্রে এই সংযোজনা প্রণালী-প্রদর্শিত হইল।

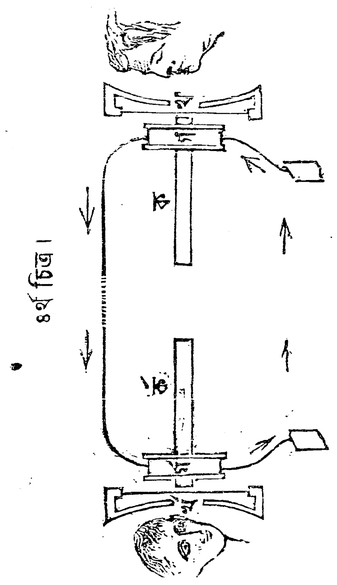

১ম যন্ত্রের (৪র্থ চিত্র) 'গ' গুটির তার-কুণ্ডলের একপ্রান্ত দীর্ঘ সংযোজক তারের একপ্রান্তে সংবদ্ধ এবং ঐ সংযোজক তারের অপরপ্রান্ত ২য় যন্ত্রের 'গ' গুটির তারকুণ্ডলের একপ্রান্তের সহিত সংবদ্ধ। উভয় যন্ত্রের 'গ' ও 'গ' দুই গুটির তারকুণ্ডলের অপর দুইপ্রান্তে একখানি করিয়া ধাতুফলক অর্থাৎ টিনের বা লোহার পাত সংবদ্ধ এবং ফলক দুইখানি মাটিতে প্রোথিত। ঐ দুই ধাতুফলক-মধ্যবর্ত্তী ধরাপৃষ্ঠস্থ মাটি এ স্থলে দ্বিতীয় সংযোজক তারের কার্য্য করে। এরূপ ব্যবস্থায় অনেক ব্যয় লাঘব হইয়াছে। পরস্পর-বহু-দূরবর্ত্তী দুই স্থানের দুই যন্ত্রমধ্যে কেবলমাত্র একটী ধাতুতার বিস্তৃত করিয়া রাখিলেই হয়। পূর্ব্বে দুইগাছি তার আবশ্যক হইত; সুতরাং এক্ষণে আর একগাছি তারের ব্যয় কমিয়া গিয়াছে। দুই যন্ত্রকে এরূপ ধাতুতার ও ধরাপৃষ্ঠ দ্বারা সংযুক্ত করিবার কারণ পশ্চাৎ দেখা যাইবে। ঐ ধাতুসংযোজনা দ্বারা তাড়িত-স্রোতঃসঞ্চালনের সুগমপথ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

এক্ষণে যন্ত্রটীর কার্য্যপ্রণালী কিরূপ বুঝিতে হইবে।

মনে কর, ১ম দূরশ্রবণ-যন্ত্রে কথা কহিলে, সেই কথাগুলি দূরবর্ত্তী দ্বিতীয় স্থানের যন্ত্রে অবিকল শুনা যাইবে। উভয় যন্ত্রমধ্যে বিস্তৃত সংযোজক-তার কি ঐ কথাগুলিকে বহন করে?—না। বাক্যবলে ১ম যন্ত্রে তাড়িতবলের উৎপত্তি হয়, সেই তাড়িত-বল তখন বিস্তৃত সংযোজকতারমধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়া ২য় যন্ত্রে আবার সেইরূপ বাক্যে পরিণত হয়। কিরূপে দেখ;—প্রথমতঃ, ১ম যন্ত্রে কথা কহিলে, সেই বাক্যবলে বায়ুতরঙ্গের উৎপত্তি হয়; সেই বায়ু তরঙ্গের আঘাতে ১ম যন্ত্রের 'খ' ধাতুচাক্তিখানি দ্রুত আন্দোলিত বা ঘন ঘন পরিকম্পিত হইতে থাকে;—একবার চুম্বকের অভিমুখে অগ্রবর্ত্তী হয়, পরক্ষণেই পশ্চাদ্‌বর্ত্তী বা চুম্বক হইতে দূরবর্ত্তী হয়। 'খ', 'ক' চুম্বকের সান্নিধ্য হেতু, নিজে চুম্বকধর্ম্মী হইয়া থাকে। তাহাতে 'খ' চুম্বকের দ্রুত পরিকম্পনে 'গ' তারকুণ্ডলমধ্যে তাড়িত-স্রোতের উদ্রেক হয়। পূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে, দুইপ্রান্ত পরস্পর সংযুক্ত এরূপ তারকুণ্ডলের সন্নিধানে যদি একটী চুম্বক দ্রুত আন্দোলিত হয়, তবে সেই চুম্বকের আন্দোলন হেতু ঐ তারকুণ্ডলমধ্যে তাড়িতস্রোতের উৎপত্তি হইবে। 'ক' চুম্বকের অভিমুখে 'খ' এর একবার গতিতে তারকুণ্ডলমধ্যে একটী তাড়িতস্রোতের উৎপত্তি হয়, আবার পরক্ষণেই 'খ' এর একবার পশ্চাদ্‌গতিতে আর একটী তাড়িতস্রোতের উৎপত্তি হইয়া থাকে। 'খ' ধাতুচাক্তি যে পরিমাণ বেগে, যত বল সহকারে এবং যে ভাবে পরিকম্পিত হইবে, তন্নিকটবর্ত্তী তারকুণ্ডল-মধ্যে উপর্য্যুপরি তত্তবার, তত কমবেশী বা সেই পরিমাণে এবং সেই ভাবে তাড়িতস্রোতের উৎপত্তি ও গতিবিধি হইবে। সেই তাড়িতস্রোত তখন বিস্তৃত সংযোজক তার-মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া, ২য় স্থানের 'গ' চিহ্নিত তারকুণ্ডলমধ্যে গিয়া আবর্ত্তন করিতে থাকে। তন্নিবন্ধন ঐ তারকুণ্ডল-সন্নিবিষ্ট 'ক' চুম্বকের বলের বৃদ্ধি বা হ্রাস হইয়া থাকে। এইরূপে ১ম লৌহচাক্তিখানি অসংখ্যবার, ঘন ঘন ও কমবেশী দ্রুতবেগে কাঁপিতে থাকে। তাহার ফলে ঐ লৌহচাক্তির নিকটস্থিত গুটীর তারকুণ্ডলমধ্যে অবিচ্ছেদে কম-বেশী, প্রবল ও অসংখ্য তাড়িতস্রোতের উদ্রেক হয়। সেই তাড়িতস্রোতসমূহ তখন সংযোজক দীর্ঘতারমধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া দ্বিতীয় যন্ত্রের গুটীর তারকুণ্ডলমধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতে থাকে। সেই সকল তাড়িতস্রোতের বল সমান নহে বলিয়া অর্থাৎ তাহাদের বলের ন্যূনাধিক্য বশতঃ সেই চুম্বকদণ্ডের

স্বলেরও ঠিক সেই পরিমাণে ন্যূনাধিক্য ঘটিয়া থাকে। সেই জন্য ঐ ২য় যন্ত্রের লৌহচাক্তিখানিও ঐ চুম্বকদণ্ড দ্বারা কম-বেশী আকৃষ্ট হয় অর্থাৎ একবার চুম্বকের অভিমুখে আকৃষ্ট ও পরক্ষণেই তাহা হইতে প্রতিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। সেই ঘন ঘন আকর্ষণ ও প্রতিক্ষেপণ-গুণে 'খ' এর দ্রুতপরিকম্পন উৎপাদিত হয়। 'খ' এর এই পরিকম্পন ১ম যন্ত্রের 'খ'-এর পরিকম্পনের ঠিক অনুরূপ। 'খ'-এর এইরূপ দ্রুত পরিকম্পন বা আন্দোলন হেতু তাহার নিকটস্থিত বায়ুও অবিকল সেই ভাবে সন্তাড়িত হয় অর্থাৎ তথাকার বায়ুতে ১ম যন্ত্রের নিকটস্থিত বায়ুর অনুরূপ তরঙ্গমালা উৎপন্ন হয়। তখন সেই বায়ুতে কর্ণপাত করিলে, বায়ুতরঙ্গ কর্ণপটহে গিয়া আঘাত করে। তখনই ১ম যন্ত্রের নিকট কথিত বাক্যের অনুরূপ শব্দজ্ঞানের উদয় হয়। প্রথম যন্ত্রে যেরূপ কথা কহিবে, দূরস্থানের ২য় যন্ত্রে ঠিক তদনুরূপ কথা শুনিতে পাইবে। দুই স্থানের দুইটী যন্ত্রের দুইখানি লৌহ-চাক্তি যুগপৎ সমভাবে পরিকম্পিত বা আন্দোলিত হয়। তবেই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, উভয় স্থানের বায়ু এক-রূপ ভাবে সন্তাড়িত হইলে, উভয় যন্ত্রে সমশব্দের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ১ম যন্ত্রে কথা কহিলে, সেই কথিত বাক্য-বলে বায়ুতরঙ্গের উৎপাদন, সেই বায়ুতরঙ্গাঘাতে লৌহ-চাক্তির দ্রুত পরিকম্পন এবং সেই পরিকম্পন হেতু তারকুণ্ডলমধ্যে তাড়িতপ্রবাহের সমাগম হয়। সংযোজক দীর্ঘতার তখন সেই তাড়িতপ্রবাহ বহন করিয়া ২য় স্থানের যন্ত্রে আনয়ন করে। তখন ২য় যন্ত্রের তারকুণ্ডলমধ্যে সেই তাড়িতস্রোতের আবর্ত্তন, তন্নিবন্ধন তথাকার দণ্ড-চুম্বকের বলের হ্রাসবর্দ্ধন তৎসঙ্গে সন্নিহিত লৌহচাক্তির দ্রুত পরিকম্পন, সেই পরিকম্পনে তখন তৎসংস্পৃষ্ট বায়ুতে সঞ্চালন এবং পরিশেষে সেই বায়ুতরঙ্গ কথিত শব্দের অনুরূপবাক্যের উৎপাদন করিয়া থাকে। এক মুহূর্ত্তে অসংখ্য পরিকম্পন সমুৎপন্ন। ১ম যন্ত্রের ধাতু-চাক্তি অপরিমিত দ্রুতবেগে পরিকম্পিত হইয়া মশকের ডাক 'পোঁ' শব্দের উৎপত্তি করিলে, তন্মুহূর্ত্তেই ২য় যন্ত্রে অবিকল ঐ 'পোঁ' শব্দের উৎপত্তি হইবে। ফলতঃ এই যন্ত্র-সহযোগে বাদ্যযন্ত্রাদির শব্দ, মানুষের কথা, হাসি-কান্না, পশুপক্ষীর ডাক প্রভৃতি শব্দমাত্রই প্রেরিত হইতে পারে।

শ্রীঅমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাঙ্গালা-সংবাদ-পত্রের ইতিহাস।

(চতুর্দ্দশ প্রস্তাব।)

গতবারে "জন্মভূমির" বিজ্ঞ-বর সম্পাদক-মহাশয়, ... পত্রিকার সম্পাদক-মহাশয়ের 'ব্রজনাথ বন্ধু" নাম লইয়া যে আলোচনা করিয়াছেন, অদ্যাবধি আমরা সে বিষয়ের কোন নির্ণয় করিতে পারিলাম না। যদি ভবি-ষ্যতে কিছু জ্ঞাত হইতে পারি, তন্মুহূর্ত্তেই কোন না কোন সন্দর্ভের টীকায় তাহাকে স্থান প্রদান করিতে সঙ্কুচিত হইব না। এরূপ করিলেই অনুসন্ধিৎসা বর্দ্ধিত হইবে। ইহাতেই প্রস্তাবিত বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়।

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় যতগুলি সংবাদ-পত্রিকা প্রচারিত ছিল, তাহার নাতিবৃহৎ এক তালিকা পাঠক-মহাশয়গণকে উপহার দিতে উদ্যোগী হইলাম। এই তালিকার পত্রিকায় নাম ভিন্ন কেবল প্রকাশের নিয়ম ও মূল্য—এই দুইটী বিষয়ের নির্দ্দেশ থাকিবে। ইতিপূর্ব্বে পত্রিকা-সমুদয়ের ইতিবৃত্তে মূল্যের উল্লেখ করিতে পারা যায় নাই, সে জন্য দুঃখে ও ক্ষোভে আমরা ম্রিয়মাণ হইয়াছিলাম। ঘণ্টাটীতে আমাদের মৃতপ্রায় প্রাণ যেন পুনর্জীবন লাভ করিল। এখন নবজীবনে বলীয়ান্ হইয়া উৎসাহে কর্ম্মভূমিতে অবতীর্ণ হইতেছি।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দ (১২২৫ সাল) হইতে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দ (১২৫৪ সাল) পর্য্যন্ত ৩০ বর্ষ ব্যাপিয়া একাধিক ভাষায় (অর্থাৎ দুই, তিন, চারি বা তদধিক ভাষায়) যতগুলির প্রচার হইয়াছিল, তাহার এক তালিকা দেখিলে পাঠকের উপকার ও আনন্দ—উভয়েরই উদ্রেকের কথা। সেই নিমিত্ত প্রকাশ-কালের সঙ্গে পত্রিকা-সমূহের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত পশ্চাৎ প্রদত্ত হইতেছে।

১।	সমাচার-দর্পণ	১৮১৮।২৩শে মে। (১২২৫।১০ই জ্যৈষ্ঠ)।
২।	সমাচার-সভারাজেন্দ্র	১৮৩১ খৃঃ (১২৩৮ সাল)।
৩।	সংবাদ-সার-সংগ্রহ	" "
৪।	জ্ঞানান্বেষণ	" "
৫।	সত্যবাদী	১৮৩৫ খৃঃ (১২৪২ সাল)।
৬।	সংবাদ-সৌদামিনী	১৮৩৮ খৃঃ (১২৪৫ সাল)।
৭।	বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট গেজেট	১৮৪০ খৃঃ (১২৪৭ সাল)।
৮।	বেঙ্গল স্পেক্টেটর্	১৮৪২ খৃঃ (১২৪৯ সাল)।
৯।	জগদ্দীপক ভাস্কর	১৮৪৬ খৃঃ (১২৫৩ সাল)। (১)
১০।	মার্ত্তণ্ড	" (২)
১১।	ইবাঙ্গিলিষ্ট	১৮৪৭ খৃঃ (১২৫৪ সাল)।

(১) চারি ভাষায় প্রকাশিত হইত।
(২) পাঁচ ভাষায় প্রকাশিত হইত।

১২।	সংবাদজ্ঞানাঞ্জন	১৮৪৭ খৃঃ (১২৫৪ সাল)। (১)
১৩।	আক্কেল গুড়ুম	" "
১৪।	কাব্যরত্নাকর	" "

৫৬। সংবাদ-জ্ঞানদর্পণ।

(১৮৪৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দ)

"দুর্জ্জন-দমন-মহানবমী" পত্রিকায় উক্ত সংবাদ-পত্রের উল্লেখ থাকাতেই, উহার অস্তিত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া গেল। তিনি কটু-কাটব্য করিতে করিতেই এই কথার প্রচার হয়। অন্যত্র "জ্ঞান-দর্পণের" প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয় নাই। জ্ঞানপ্রদ দর্পণের যদি কেহ বার্ত্তা লয়, সেটা ভারী কথা। বাবু উমাচরণ ভট্টাচার্য্যই এই "জ্ঞান-দর্পন" প্রণয়ন করেন। ১২৫৪ সাল হইতে ১২৬৩ সালের ৯ই পৌষ পর্য্যন্ত এই জ্ঞানদায়ক "দর্পণ" বঙ্গ-রঙ্গ-ক্ষেত্রে নিজের কার্য্য করিয়া অদর্শন হইয়াছিলেন। আরও হয় ত কতিপয় বৎসর. কি কতিপয় মাস,—অথবা কতিপয় দিবসও, অন্ততঃ জীবিত ছিলেন। কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণ বা নিদর্শনের অসদ্ভাবে সেদিকে পদমাত্রও অগ্রসর হওয়া, সুবিবেচনা-সিদ্ধ নহে। যাহা হউক্, অন্ততঃ পক্ষে দশ বর্ষ ব্যাপিয়া এই "দর্পণের" জ্ঞান-কিরণ-কণায় লোকে কৃতার্থতা লাভ করিয়াছিল। "দর্পণ" সপ্তদিনান্তে দর্শন দিতেন, এই কথা না বলিয়া দিলে আমাদের পাঠকেরা কদাচ বুঝিতে পারিবেন না, কি নিয়মে উহার প্রচার হইত।

৫৭। দুর্জ্জন মানব-দলন।

(১৮৪৭ খৃষ্টাব্দ)।

বাঙ্গালাভাষার পাক্ষিক-পত্রিকার ইনিই আদি। ইনি "দুর্জ্জন-দমন মহানবমীর" ভ্রাতা; কিন্তু অগ্রজাত সহোদর ভ্রাতা বা বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নহেন; পিতা ও মাতা ভিন্ন, সুতরাং গ্রাম-সম্পর্কে ভ্রাতা। "নবমীর" কনিষ্ঠ এই "দলনে" কত শত জ্বালা-জ্বলন চলিয়াছিল, তাহার সংখ্যা হয় না। "নবমী" দিদী ভাল এক পথ দেখাইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার প্রদর্শিত পথে "দলন" পদার্পণ করিয়া কত অনর্থেরই সঙ্ঘটন করিয়াছিলেন। পক্ষে পক্ষে মানব দলন চলিত, অথচ বারমাসের দলনের দাম দুইটী টাকা দিতে হইত। বোধ করি, এক বৎসরও লোককে জ্বালাইতে হয় নাই।

৫৮। রস-সাগর।

(১৮৪৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ)

খিদিরপুরনিবাসী সৎকবি স্বনামধন্য রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "রসসাগরের" সৃষ্টিকর্ত্তা। বাবু রঙ্গলাল বঙ্গসাহিত্যের এককালে একতম নেতা। বাঙ্গালাভাষায় এমন কাল গিয়াছে, যখন কবিপ্রবর রঙ্গলাল, যুবক ও বৃদ্ধ নরগণের এবং যুবতী ও বর্ষীয়সী নারীমণ্ডলীর উপর অসা-ধারণ কর্ত্তৃত্ব করিতেন। সমভাবে চিরদিন যাপন নাকি সৌভাগ্যের ভারি জোর না হইলে ঘটে না, তাই তাঁহার নামমাত্র শুনিয়া, লোকের ভক্তি উচ্ছ্বসিত হইত। কৃষ্ণ-কায় "মাইকেল"-মেঘে লাল রঙ্গলাল যেন প্রচ্ছন্ন হইবার উপক্রম হইয়াছিলেন। ভাগ্যক্রমে তিনি পদ্মিনীর উপাখ্যান ও "শূরসুন্দরী" প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাকেই তাঁহাকে অমর করিয়া তুলিয়াছে।

"নবীন ভাবুক এক ভ্রমণ-কারণ,
ভারতের নানা স্থান করিয়া ভ্রমণ,
অবশেষে উপস্থিত রাজপুতনায়।
বসুধা বেষ্টিত যাঁর কীর্ত্তি-মেখলায়॥"

ইত্যাদি কবিতাগুচ্ছ কি মহোচ্চভাব-মাখা! বালক, বৃদ্ধ, যুবা,—পুরুষ, স্ত্রী উহার সমান সমাদর করিয়াছেন ও করিতেছেন। ভবিষ্যতে কখনও উহার অনাদর হইবার কথা নহে। কাব্য-বিভাগে ত তাঁহার অভাবনীয় ক্ষমতা।

কবি রঙ্গলাল বিচারপতির কর্ম্মেও অতুল খ্যাতিমান্। তিনি ডেপুটীগিরিতেও সুদক্ষতার জন্য যশস্বী হইয়াছি-লেন। সেই কারণে তাঁহার দৃষ্টি, দূরদর্শিনী হইয়াছিল্। কিন্তু তাহা হইলেও, সংবাদপত্রের সম্পাদকতা নাকি এক বিভিন্ন শ্রেণীর ক্রিয়া; কিন্তু আনন্দের বিষয়, তাহাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত। সুপরিপক্ক প্রধান প্রবীণ গায়কের সুরবাঁধা সাধা গলা যেমন ভাল লাগে,—এক একজন নিপুণ লোকের কথাও তেমনই। সংবাদ-পত্রিকা-পরি-চালনায় তাঁহার সাধা হাত। কবি-মানুষের কাছে "রসের" "সাগরের" কথা কি বল,—"মহাসাগরও" হার মানে। "রস-সাগর" তোয়াজ করার কাজটা তাঁহার ক্ষমতায়ত্ত। সামর্থ্য-সীমার বহির্ভূত হইলে, এই দুরূহকার্য্যে দূরদর্শক রঙ্গ-লালকে কোনক্রমেই কেহ রাজি করিতে সাহস করি-তেন না।

অগ্রজ ভ্রাতাদের ন্যায় "রসসাগরকে" অতি শৈশবে অপমৃত্যু-দুঃখে ক্লিষ্ট হইতে হয় নাই। তথাপি কিন্তু মৃত্যু-ঘটনা শুনিয়া পাঠকগণের প্রাণে তেমন প্রীতির সঞ্চার হইবে না। কেন না, "রসসাগরের" ষড়ূর্দ্ধ বয়সে ইহলোক-লীলা-সমাপ্তি। ইহার পূর্ব্বে বিলয় ঘটিলে কি অধিকতর অশেষ ক্লেশের বিষয় হইত না? "রসসাগরকে" শরীর-সৌষ্ঠব জন্য নানা আভরণের অনুষ্ঠান করিতে হইয়াছিল। রকম রকম নূতন নূতন ভূষণ না হইলে "রসের" জিনিষ মানাইবেই বা কিরূপে?

সাধারণতঃ সংবাদপত্রে সংবাদ যেমন থাকিবার নিয়ম, তাহার ত সুবন্দোবস্তই ছিল। তা, ছাড়া রাশি রাশি

(১) বিজ্ঞানুসেবধিও ভাষাদ্বয়ে পরিচালিত অন্যতম পত্রিকা। উহা

সকল সন্দর্ভ সাহিত্য, রাজনীতি ইতিহাস, জীবনবৃত্তান্ত এ সকলকে উপেক্ষা না করিয়া, উহাদেরই অন্তর্ভুক্ত থাকিত। পশ্চাত্তে মহাসমুদ্র, সমুদ্র, উপসাগর প্রভৃতির বারিরাশি সংরুদ্ধ হয়। কিন্তু "রসসাগরের" ব্যাপার স্বতন্ত্র। সপ্তাহের ভিতর তিনবার "রসসাগরের" রস বঙ্গের গৃহে গৃহে উচ্ছ্বাসিত ও প্রবাহিত হইত। *

ফলে, "কলিকাতা রিভিউ" পত্রের লোককে দর্শন দিবার ব্যবস্থাও মন্দ ছিল না।

রঙ্গলাল কেবল কবি নহেন। গদ্যে সাহিত্যে বিশেষতঃ সংবাদপত্র বিভাগে তাঁহার অতুলনীয় ক্ষমতা। একে একে সে সব দেখাইব। তিনি সংবাদপ্রভাকরের এক নিয়মিত লেখক ছিলেন। সে কথা কবিপ্রবর গুপ্ত মহাশয় সরল মনে নিষ্কপট-হৃদয়ে স্বীকার করিতেন। তিনি মুক্তকণ্ঠে কিরূপ তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিলেন। (২) এই "রসসাগর" তাঁহার প্রাধান্যে পরিচালিত হইত, তাহার বর্ণনা করা গেল। (৩) অতঃপর যথাস্থানে দেখাইব,—"এডুকেশনগেজেট" তাঁহার নায়কত্ব সঙ্কলিত ও প্রচারিত হইবার বিধি ব্যবস্থাপিত হয়। ঐ কার্য্যে গবর্ণমেণ্টেরও অনুমোদিত। (৪) সুতরাং তিনি এক পরিপক্ব সম্পাদক। (৫) বিচক্ষণ ডেপুটী। (৬) সুকবি।

৬০। জ্ঞানচন্দ্রোদয়।

(১৮৪৮ খৃষ্টাব্দ)।

"জ্ঞানচন্দ্রোদয়ের" কর্ত্তা কে, কতদিন তাঁহার জীবনলীলা-খেলা চলিয়াছিল, কি নিয়মে তিনি আবির্ভূত হইতেন, কখনই বা তাঁহার তিরোধান, কোথায় তিনি ভূমিষ্ঠ হন, এই সমস্ত বৃত্তান্ত একেবারেই নিবিড় তমসাচ্ছন্ন। এখানে কেবলই নিবিড় ঘন ঘোর অন্ধকারের রাজত্ব। তিমির-মহাশয়কে সুতরাং বিদায় দেওয়াই বুদ্ধিমান্‌দিগের পরামর্শ।

৬১। দ্বিতীয় ভৃঙ্গদূত।

(১৮৪৮ খৃষ্টাব্দ)।

১২৫৯ সালে (১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে) এক "ভৃঙ্গদূতের" সঙ্গ পাইয়াছিলাম। তাঁহারই রঙ্গভঙ্গ সকলের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুশীতল ও সুস্নিগ্ধ হইয়াছিল। সুপ্রাচীনকালে মাতঙ্গেরা সমরের কার্য্যসমূহ সম্পাদন করিত। সেই কার্য্য হইতে মাতঙ্গ অনেক দিন হইতে লব্ধাবসর। বহুকাল হইতে তুরঙ্গের উপর সেই ভার নিপতিত; তাই তুরঙ্গ এখন যুদ্ধ-বিজয়ীর পরম সহায়। কুরঙ্গ কর্ণে উত্তম শব্দ কিংবা গীতধ্বনি শুনিয়া আত্মহারা হয়; মাতঙ্গের নাসারন্ধ্রে সদ্গন্ধ প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে বিহ্বল করিয়া ফেলে; পতঙ্গ চক্ষে সুরূপ দেখিলে জ্ঞানহীন হইয়া যায়;—অগ্নির মূর্ত্তি অর্থাৎ আলোক তাহার যমসম। ভৃঙ্গ, রসনায় সুরস আস্বাদন করিতে পাইলে, অজ্ঞান হয়; মৎস্য বড়শীর স্পর্শে মরে;—"টোপ" ভক্ষণ করিলেই তাহার মরণ। সাহিত্য "ভৃঙ্গেরও" এই দশা ঘটিয়াছিল। কেন না, সাহিত্য "ভৃঙ্গদূত" মানবের পরিচালিত। সেই মানব, আবার কর্ণ, নাসিকা, নয়ন, জিহ্বা ও ত্বক্—এই সকলগুলিরই বশীভূত। অতএব মানব, মরণশীল আর তাহার কার্য্যও যে, অস্থায়ী হইবে, তাহা অনুভবসিদ্ধ।

৬২। অরুণোদয়।

(১৮৪৮ খৃষ্টাব্দ)।

বঙ্গের অজ্ঞানতিমির-দূরীকরণে সাতদিন অন্তর "অরুণোদয়ের" প্রচার হইত। যাঁহার অধ্যবসায়ের উপর নির্ভর করিয়া "অরুণোদয়" প্রকাশিত হইত, তাঁহার নাম পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়। পঞ্চানন না হইলে কে কোথায় গুরুতর কার্য্য সমাহিত করিতে সাহসী হয়? দেবাদিদেব "পঞ্চাননের অধ্যক্ষতায় সম্পাদিত সমুদ্রমন্থনের পরিণাম কি বিষম! সে কথা ভাবিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। এই মানব 'পঞ্চাননের' অরুণোদয়ের অন্তিমকালও তেমনই ভয়াল ভাব ধারণ করিয়াছিল। "অরুণোদয়ে" ধরণীমণ্ডল চিরকাল আলোকিত হয়। সংবাদ "অরুণোদয়ে" কত অধিক লোকেরই অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হইত, কে এখন সেই প্রাচীন-কাহিনী কীর্ত্তন করিবেন?

৬৩। বারাণসী-চন্দ্রোদয়।

(১৮৪৮ খৃষ্টাব্দ)।

উমাচরণ ভটাচার্য্য "বারাণসী-চন্দ্রোদয়ের" গুরুভারবাহী। পবিত্র কাশীধামের কথা শুনিলে, প্রাণের সুষুপ্ত কত কোমলভাব জাগিয়া উঠে। "কাশীখণ্ড"ও মহিমা ঘোষণা করিতে গিয়া অসামর্থ্য স্বীকার করিয়াছে! বারাণসীর বৃত্তান্ত যতই শ্রুত হইবে, সামাজিকদিগের ততই কল্যাণ-কর্ম্মপরম্পরার স্রোতঃ অবিরত প্রবাহিত হইতে থাকিবে। "বারাণসী-চন্দ্রের" উদয়টা একপাদ কি দ্বিপাদ, অথবা ত্রিপাদ বা চতুষ্পাদ হইত, তাহা ত জ্ঞাত হইবার কোনও পথ দেখিতেছি না।

* "কলিকাতা রিভিউ" ইহাকে সাপ্তাহিক বলিয়া এক ভ্রমে পড়িয়াছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় ভ্রম—ইহার আয়ুঃ তিন বৎসর কমাইয়াছিলেন। ইহাকেই বলে—"মনের সাধে ভুল লেখা।" লোকে ভাল জিনিষ দেখিয়া চক্ষু সার্থক করে আর বলে, "চক্ষের সাধে দেখিয়া আশা মিটাইয়াছি," "সুখে খাইয়াছি" ইত্যাদি। এখানে সেরূপ কথা নয়, ফলতঃ তিনি যেন ভুলের রাজা। ভ্রান্তিরাজ

জন্মভূমি।

নবম ভাগ। { মাঘ। ১৩০৫। { ২য় সংখ্যা।

বাঙ্গলা ভাষার লেখক।

প

(৫)

—প্রবোধচন্দ্র সরকার। পিতা ৺ঈশ্বরচন্দ্র সরকার। বয়স ৪৪।৪৫ বৎসর। উত্তরাঢ়ি কায়স্থ। নিবাস চন্দ্রকোণা, জেলা মেদিনীপুর।

সরকার মহাশয় নিজে তাঁহার যে জীবনী লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, আমরা তাহাই পত্রস্থ করিলাম;—

"আমার সহধর্ম্মিণী আজ প্রায় দশ বৎসর হইল, ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। আমি দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করি নাই। আমি নিঃসন্তান।

"অল্পবয়সেই আমার কবিতা লিখিবার ঔৎসুক্য জন্মে। পঠদ্দশায় আমি চারিটি কবিতা লিখিয়া ছিলাম। ১২৮১ সালে "পাণিপথের যুদ্ধ" নামক একখানি কাব্যপুস্তক লিখি। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার সে সকল হস্তলিখিত কাগজপত্র হারাইয়া গিয়াছে।

"১২৮৫সালে আমি "মানসরঞ্জিনী কাব্য" নামে আর একখানি ছোট ছোট কবিতাপূর্ণ পুস্তক প্রণয়ন করিয়া মুদ্রিত ও প্রকাশিত করি। তাহার পর মধ্যে মধ্যে "সহচর" সংবাদপত্রে দুই একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছি। ১৮৮৫। ৮৬ অব্দে "বঙ্গবাসী" ও "দৈনিক" সংবাদপত্রে আমি কতকগুলি সঙ্গীত লিখিয়া ছিলাম। ১৮৮৭ অব্দের জানুয়ারি মাসে দৈনিকের লেখকশ্রেণী ভুক্ত হই, এবং ঐ সময় হইতে ১৮৮৮ অব্দের ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত দৈনিক স্তম্ভে কয়েকটী জাতীয় সঙ্গীত ও কতকগুলি গদ্যময় প্রবন্ধ লিখিয়া ছিলাম।

"নানা কারণে আমি ১৮৮৮ অব্দের মার্চ্চমাস হইতে সংবাদপত্রে লিখিতে বিরত হই। কিন্তু লেখার নেশা ছাড়িতে পারি নাই। গত বৎসর জুনমাসে "বিবিধ সঙ্গীত" নামে একখানি গানের বই প্রকাশ করিয়াছি। সম্প্রতি "শালফুল" নামক একখানি উপন্যাসও প্রণয়ন করিয়াছি।"

* * *

—প্রসন্নকুমার পাল। পিতার নাম ৺দ্বারকানাথ পাল। সাকিম মাজিদা, জেলা নদীয়া;—পূর্ব্ববঙ্গ রেলষ্টেসন হাঁসখালি হইতে মাজিদা তিন মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। জন্ম সন ১২৫৯ সালের ১৯এ কার্ত্তিক,—দিবা দেড় প্রহর।

মাজিদার পালবংশ সদাব্রত ও অতিথিসেবার জন্য প্রসিদ্ধ। স্বর্গীয় দ্বারকানাথ পাল মহাশয় একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি ছিলেন। বিপন্নের বিপদ দূর করা, সাধ্যাতীত হইলেও, সমধিক চেষ্টা করিতে তিনি পরাঙ্মুখ হইতেন না। প্রসন্নকুমার সেই দ্বারকানাথের বংশধর। তিনি পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান ও কার্য্যকুশল। "গয়ায় পিণ্ডদান পদ্ধতি" ও "গয়া মাহাত্ম্য" নামে দুই খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। মধ্যে ৺গয়াধামে, "সুলভ যাত্রিনিবাস"ও স্থাপিত করিয়াছিলেন। সেখানে ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুগণ অপেক্ষাকৃত স্বল্পব্যয়ে পিতৃকার্য্যাদি সম্পন্ন করিতে পারিতেন। এই সূত্রে পাল মহাশয় অনেকের নিকট সুপরিচিত হইয়াছেন।

ফ

—ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়। ইনি বিলাত-প্রত্যাগত একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। হুগলী কলেজে প্রফেসরী করিতেছেন। বাঙ্গলা সাহিত্যে ইহাঁর অনুরাগ আছে। ইহাঁর লিখিত বিজ্ঞানবিষয়ক কয়েকটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ ভারতীতে প্রকাশ হইয়াছিল। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ন্যায় কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের বাঙ্গলাসাহিত্যে অনুরাগ,—বড়ই আহ্লাদের বিষয়, সন্দেহ নাই।

ব

(১)

—বিহারিলাল সরকার। পিতার নাম ৺ উমাচরণ সরকার। পিতামহ ৺ বেচারাম সরকার। অগ্রজ ৺ নীলকণ্ঠ সরকার। মাতামহ,—হুগলী জেলার অন্তর্গত মথুরাবাটী-নিবাসী ৺ রামচাঁদ মিত্র। মাতুল শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মিত্র। বিহারী বাবুর জন্মস্থান—পৈতৃক বাসস্থান,—

হাওড়া জেলার অন্তর্গত আন্দুলগ্রাম; হাল সাকিম—কলিকাতা, দর্জ্জিপাড়া, ১০ নং রামচাঁদ নন্দীর গলি।

শ্রীযুক্ত বিহারিলাল সরকার মহাশয়,—আজিকার দিনে,—বঙ্গের একজন খ্যাতনামা লেখক। শক্তিশালী সুলেখক বলিয়া সর্ব্বত্র তাঁহার প্রতিপত্তি ও সম্মান আছে। তিনি একাধারে ঐতিহাসিক, সমালোচক, জীবনীকার ও একজন প্রধান প্রবন্ধ-লেখক। কবি-পদ-প্রাপ্ত না হইলেও, কবি-প্রতিভা তাঁহাতে আছে। তাঁহার প্রায় সকল লেখাতেই একটু না একটু কবিত্বের লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। একাধারে এত গুণের অধিকারী হওয়া, বড় কম সৌভাগ্যের বিষয় নহে। তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ "বিদ্যাসাগর",—তাঁহার অদ্ভুত কাব্য-সমালোচন "শকুন্তলা-রহস্য",—তাঁহার গভীর গবেষণা ও অপূর্ব্ব সংগ্রহপূর্ণ "ইংরেজের জয়",—তাঁহার তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানের নিদর্শন "তিতুমীর",—আজিকার দিনে পাঠ না করিয়াছেন কে? তাঁহার গম্ভীর অথচ সরল,—মর্ম্মস্পর্শিনী অথচ বিশুদ্ধ,—লীলাময়ী অথচ উশৃঙ্খলতাশূন্য ভাষায় মুগ্ধ নয় কে? দীর্ঘকাল হইতে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত বঙ্গবাসী সংবাদপত্রের সহকারী সম্পাদকের পদে আসীন হইয়া,—অক্লান্ত শ্রমে,—অসাধারণ অধ্যবসায়ে,—অবিচলিত কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় সকলকে মুগ্ধ করিয়া আসিতেছেন। বঙ্গবাসীতে নানাশ্রেণীর রাশি রাশি প্রবন্ধ তিনি প্রকটিত করিয়াছেন। তাঁহার লেখা খুব উচ্চশ্রেণীর।

৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনী প্রণয়ন করিয়া, বিহারী বাবু বঙ্গের বসওয়েল হইয়াছেন। একাধারে এমন সংগ্রহ,—এমন নির্ভীক ও স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ, এমন অদ্ভুত শক্তির সহিত বিরুদ্ধ-মত-খণ্ডন,—বাঙ্গলা ভাষায় অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। তারপর বিহারিলালের শকুন্তলারহস্য,—চিন্তাশীল বিদ্বৎ সমাজের প্রিয় গ্রন্থ। এই গ্রন্থে তিনি পদ্মপুরাণ হইতে নানা প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, মহাকবি কালিদাস তাঁহার অপূর্ব্ব শকুন্তল-প্রতিমার কাঠামো,—পদ্মপুরাণ হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন,—মহাভারত হইতে নহে। "ইংরেজের জয়" গ্রন্থে, ঐতিহাসিক বিহারিলাল,—হতভাগ্য সিরাজউদ্দৌলার কলঙ্ক-কালিমা অনেকাংশে বিদূরিত করিয়াছেন, এবং নানা সমীচীন মত ও বিশিষ্ট প্রমাণ প্রয়োগপূর্ব্বক,—বাঙ্গলায় সর্ব্ব প্রথম দেখাইয়াছেন যে, অন্ধকূপহত্যার মূলে কোন সত্য নাই,—পরন্তু উহা একদেশদর্শী ইংরেজ লেখকগণের বিকৃত কল্পনা মাত্র। এই ঐতিহাসিক সত্য প্রচার করিয়া, বিহারী বাবু সকলেরই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। সহৃদয় সাহিত্যামোদী ব্যক্তিমাত্রেই এজন্য বিহারী বাবুর নিকট কৃতজ্ঞ। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন কোন অনভিজ্ঞ পাঠক ও সমালোচক,—এবং পর কৃতিত্ব-গোপনেচ্ছু কোন কোন লেখক, বিহারী বাবুর এই কৃতিত্ব স্বীকারে কুণ্ঠিত হন। তাঁহারা [illegible] সর্ব্ব প্রথম বিহারী বাবু উড়াইয়া দেন নাই,—ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র উড়াইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা বিশেষরূপ অবগত আছি, আজ পাঁচ ছয় বৎসর হইল, বিহারী বাবু—জন্মভূমিতে সর্ব্ব প্রথম এই তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। যাহা হোক, এ বিষয়ের প্রমাণের ভার আমরা সাহিত্যবিদ্ সুধীগণের উপর দিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। আমরা সাহিত্যের ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি; সুতরাং প্রকৃত সত্য প্রকাশ করিতে আমরা ধর্ম্মতঃ বাধ্য;—তাই এ অবান্তর ঘটনার উল্লেখ করিলাম।

বিহারী বাবুর সাহিত্য-জীবনের ইতিহাস,—এবং সুখ-দুঃখময় জীবনের দুই চারি কথা বলিয়া আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

১৭৭৭ শকাব্দা ১লা কার্ত্তিক,—শারদীয়া মহাষ্টমীর পুণ্যময় মুহূর্ত্তে,—বঙ্গের সুসন্তান বিহারিলাল জন্মগ্রহণ করেন। বিহারী বাবুর পৈতৃক বাটীতে ৺শারদীয়া পূজা হইত। সপ্তমীর দিন,—বিহারিলালের মাতৃদেবীর প্রসব বেদনা উপস্থিত হয়। বিহারিলালের ধর্ম্মপ্রাণ পিতামহ,—জগন্মাতা জগদম্বার নিকট এই মর্ম্মে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন যে, "হে মা, দুর্গে! সর্ব্বসিদ্ধিদায়িনি! আমার সংকল্পে যেন মা বিঘ্ন না হয়! পূজারম্ভের পরে,—আমার নামে সংকল্প হইয়া গেলে যেন সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। দোহাই মা, শুভ অশৌচে তোমার পূজা যেন পণ্ড না হয়।" তার পর সেই ধর্ম্মপ্রাণ বৃদ্ধ,—পুত্রবধূকে লক্ষ্য করিয়া এই মর্ম্মে বলেন যে, "দেখো মা, মুখ রেখো।—সংকল্পের পর যেন তোমার সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়।" ভক্তের কাতর ক্রন্দন—জগদম্বার চরণে স্থান পাইল;—সন্ধিপূজা সমাপ্ত হইবার কয়েক মুহূর্ত্ত পরে বিহারিলাল ভূমিষ্ঠ হইলেন। মহাতিথিতে, পুণ্যলগ্নে জন্ম বলিয়াই, বুঝি বিহারিলালের জীবনে ধর্ম্মের এমন মধুর মনোহর ভাব দেখিতে পাই। বিহারিলাল,—স্বধর্ম্মনিরত, আচারবান্, ধর্ম্মভীরু ও ঈশ্বর-বিশ্বাসী। সেই জন্যই বিহারিলালের চরিত্র নির্ম্মল, প্রকৃতি অহমিকাশূন্য ও মাৎসর্য্যবিহীন। সেই জন্যই বুঝি বিহারিলাল সহৃদয়, পরদুঃখকাতর, সুরসিক ও পর-উপকারেচ্ছু এইরূপ এবং আরও অনেক রূপ গুণগ্রামে বিহারিলাল সকলেরই প্রিয়।

বাল্যকালে বিহারিলাল,—দেশে পীতাম্বর গুরুমহাশয়ের পাঠশালে নিযুক্ত হন। এই পাঠশালাতেই তাঁহার বাল্য-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। কড়ানিয়া, শতকিয়া প্রভৃতি গণিত,—তিনি একাদনের মধ্যেই এক একটি কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিতেন। সাত আট বৎসর বয়সে বিহারিলাল কলিকাতায় আগমন করেন। তাঁহার পিতৃব্য তখন সার্ভেয়ার জেনারল আপিসে চাকরি করেন; বাসা বহুবাজার উড়েপাড়া। বউবাজার বাঙ্গলা ইস্কুলে (এক্ষণে এই স্কুল গবর্ণমেণ্টের হইয়াছে) ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত বিহারিলাল পাঠ করেন। ক্লাসের তিনি ভালো ছাত্র ছিলেন। তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত তিনি প্রথম-পারিতোষিক পান। যথাসময়ে বিহারী বাবু ইংরেজী ইস্কুলে ভর্ত্তি হন। একেশ্বরবাদী খৃষ্টান মার্কিন ডল্ সাহেবের আর্ট ইস্কুলে ভর্ত্তি হন। এখানে ষষ্ঠশ্রেণী হইতে তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পাঠ করেন। বরাবর প্রথম পারিতোষিক পাইয়াছিলেন। ১৮৭৪ সালে বিহারী বাবু জেনেরল এসেমব্লি কলেজে নিযুক্ত হন এবং ৭৭ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

ডল স্কুলে বিহারী বাবু তৃতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে,—লর্ড মেয়োর মৃত্যু হয়। তদুপলক্ষে বিহারী বাবু এক সঙ্গীত রচনা করেন। এই তাঁহার প্রথম রচনা। এই প্রথম রচনাতেই তিনি বাহবা পান। তাঁহার পরলোকগত পিতা ও প্রসিদ্ধ সঙ্গীত-রচয়িতা রূপচাঁদ পক্ষী বলেন,—"কালে বিহারিলাল কবি হইবেন।" তাঁহাদের সেই ভবিষ্যদ্বাণী প্রকারান্তরে সফল হইয়াছে।—কবি-পদ-বাচ্য না হউন,—প্রগাঢ় ঐতিহাসিক ও বিশিষ্ট প্রবন্ধ-লেখক বলিয়া,—বিহারিলাল আজ বিখ্যাত হইয়াছেন। জেনারল এসেম্ব্লি কলেজে বিহারিলাল এফ, এ পর্য্যন্ত পাঠ করেন। কিন্তু শিরঃপীড়াবশতঃ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। তারপর আজ পর্য্যন্ত সমান আগ্রহে ও সমান যত্নে তিনি নানা ইংরেজী গ্রন্থ পাঠ করিয়া আসিতেছেন। ইতিহাস ও সাহিত্যপাঠে তাঁহার বিশেষ আনুরক্তি। কলেজ পরিত্যাগ করিয়াও বিহারিলাল ঘরে বসিয়া, বি, এ ক্লাসের ছাত্রদের সহিত ইংরেজী সাহিত্য ও ইতিহাস পাঠ করিতেন। ফাষ্টইয়ারে পাঠকালে,—বউবাজার হলধর বর্দ্ধনের লেন হইতে প্রকাশিত ৺দীতানাথ দাসের "মানসমোহিনী" পত্রিকার "সূচনা" বিহারিলাল লিখিয়াছিলেন। সেই তাঁহার প্রথম গদ্য রচনা। ন্যাশন্যাল পেপারের ৺ নবগোপাল মিত্রের প্রতিষ্ঠিত চৈত্রমেলায় বিহারিলাল ভারত বিষয়ে এক কবিতা পাঠ করেন। তখন "ভারত" "ভারত" রবে চারিদিক প্রতিধ্বনিত হইত। সেই কবিতায় বিহারী-বাবু আরও বাহবা পান। উক্ত মেলার সভাপতি দার্শনিক-লেখক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বিহারিলালের যথেষ্ট প্রশংসা করেন এবং সাধারণীর সেই স্বনামধন্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় খুব বাহবা দিয়া বিহারী বাবুর সেই কবিতা সাধারণীতে প্রকাশ করেন। চৈত্রমেলা হইতে বিহারী বাবু একখানি রূপার পদক পুরস্কার প্রাপ্ত হন। নবগোপাল বাবুর এই চৈত্র-মেলা কালে "হিন্দুমেলা" নামে অভিহিত হইয়াছিল। টাউন-হলে উক্ত মেলার অধিবেশনেও বিহারী বাবু এক কবিতা পাঠ করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন।

বিহারিলাল যখন সেকেণ্ডইয়ারে পড়েন, তখন ২৪ পরগণার অন্তর্গতঃ বারুইপুরে তত্রত্য জমিদার চৌধুরী মহাশয়দেরও ঐরূপ একটী হিন্দু মেলা হইত। বিহারী বাবু জনৈক বন্ধুর আগ্রহে ঐ মেলাতেও একটি কবিতা পাঠ করেন। সেখানেও তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা হয় এবং পুরস্কারস্বরূপ সেখানে তিনি একখণ্ড "মেঘনাদবধকাব্য" উপহার পান। এই সূত্রে বিহারী বাবু যে আর একটি অমূল্যনিধি লাভ করেন, কথাপ্রসঙ্গে এখানে সে কথাটি বলিতেও ইচ্ছা হইতেছে। বারুইপুরের মেলায় কবিতা পড়িতে গিয়া বিহারী বাবু এক কন্যারত্ন দেখিয়া আসেন। সেই কন্যারত্নকে দেখিতে যান, অন্য কোন পাত্রের জন্য; কিন্তু প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে, যথাদিনে নিজেই সেই কুমারী কন্যাকে লাভ করেন। সেই গুণবতী রমণীরত্ন এখন সন্তানবতী হইয়া স্বামীর গৃহ উজ্জ্বল করিয়া আছেন। উপস্থিত বিহারী বাবুর দুই পুত্র ও এক কন্যা।

পাঠদ্দশার পরেই বিহারী বাবু বিষয়কর্ম্মে নিযুক্ত হন। কলিকাতা আহেরীটোলা-নিবাসী ৺ রাজমোহন মুখোপাধ্যায়ের কলিকাতা প্রেসের ম্যানেজারীপদ তিনি পান। দিবাভাগে ঐ কাজ করিয়া রাত্রে বিহারী বাবু সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করেন। তাঁহার সংস্কৃত-সাহিত্যের গুরু,—কলিকাতা হাতিবাগান-নিবাসী,—সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ কালিদাস দাস রায় মহাশয়ের সুযোগ্যপুত্র পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল কবিরত্ন মহাশয়। এই সময় বিহারী বাবু মধ্যে মধ্যে মিরর ও ষ্টেটসম্যান পত্রে পত্রাদি লিখিতেন।

"প্রভাতী" নামে একখানি প্রাত্যহিক পত্রের সেই সময় জন্ম হয়। বিহারী বাবু কলিকাতা প্রেসের ম্যানেজার হইলে,—প্রেসের সত্ত্বাধিকারী রাজকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত "প্রভাতী" পত্রিকার সত্ত্বগ্রহণ করেন। সে সময় প্রভাতীর সম্পাদক ছিলেন,—৺ পশুপতি মুখোপাধ্যায়। ইনি,—পাউয়ার গার্জ্জেনের শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের অগ্রজ। এক বৎসর পরে,—বাঙ্গলা সংবাদপত্র-সম্পাদকের একজন মহারথ উক্ত প্রভাতীর সম্পাদক নিযুক্ত হন। তিনি আমাদের বিজ্ঞ, বহুজ্ঞ, সুপণ্ডিত, লেখকশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন সেন গুপ্ত মহাশয়। সেন গুপ্ত মহাশয় অনেককে মানুষ করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। তাঁহার বহু শিষ্য-শাখা আছে। আমাদের বিহারী বাবুও তাঁহার একজন শিষ্য। ক্ষেত্র বাবুর আমলে বিহারী বাবু "কন্যাদায়" সম্বন্ধে প্রভাতীতে এক পত্র লিখেন। প্রভাতীতে বিহারিলালের এই প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়। সেই হইতেই বিহারী বাবু "প্রভাতীর" নিয়মিত লেখক হইলেন। ক্ষেত্র বাবুর পর শ্রীযুক্ত তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রভাতীর সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করেন। তিনি সম্পাদক হইলেন বটে, কিন্তু প্রভাতীর প্রায় যাবতীয় কার্য্য বিহারী বাবুই সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। প্রভাতীতে তাঁহার বহু প্রবন্ধ প্রকটিত হইতে লাগিল। প্রভাতী আপিস পূর্ব্বে রাধাবাজারে ছিল; কিছু দিন পরে উহা রাধাবাজার হইতে উঠিয়া রাজমোহন বাবুর নিজ নিমতলার বাটীতে আসে। এইখানে ঘটনাক্রমে এক সময় কম্পোজিটরগণ অনুপস্থিত হয়। কার্য্যকুশল বিহারীলাল মুখে মুখে রচনা করিয়া, নিজহস্তে সেই রচনা কম্পোজ

করিয়া "প্রভাতী" প্রকাশ করেন। সুতরাং সে সময় কম্পোজিটরীও বিহারিলাল কিছু কিছু শিখিয়াছিলেন। একাধারে এত-শক্তি বড় সহজ নয়।

ইহার চারি পাঁচ বৎসর পর প্রভাতী উঠিয়া গেল।

এই সময় "বঙ্গবাসী" প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গবাসীর একমাত্র সত্বাধিকারী,—গুণী ও গুণগ্রাহী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুজ মহাশয়,—বহু গীতিনাট্য-প্রণেতা শ্রীযুক্ত রাধানাথ মিত্রের নিকট বিহারী বাবুর গুণের পরিচয় পাইয়া, বঙ্গবাসী-আপিসের প্রেস-বিভাগে বিহারী বাবুকে নিযুক্ত করিলেন। তখন বঙ্গবাসী ছাপাখানা-বিভাগের বড় বে-বন্দোবস্ত ছিল। তখন দৈনিক প্রকাশিত হইয়াছে, সুতরাং কার্য্যের বড়ই ঝঞ্ঝাট। স্বত্বাধিকারী মহাশয় বিহারী বাবুকে প্রেসের যাবতীয় ভার ন্যস্ত করিলেন। কার্য্যকুশল,—প্রেসের অধ্যক্ষতায় দক্ষ বিহারিলাল অল্প দিনের মধ্যে প্রেসের সুশৃঙ্খলা সম্পাদন করিলেন; অযথা ব্যয় কমাইয়া আয় বাড়াইলেন; আরও অনেকরূপ উন্নতি করিলেন।

প্রেসের অধ্যক্ষতার কাজ করিতে করিতেও বিহারী বাবু মধ্যে মধ্যে দৈনিকে লিখিতেন। এক বৎসর পরে বঙ্গবাসীতেও লিখিতে আরম্ভ করিলেন। দৈনিক জন্মগ্রহণের তিন বৎসর পরে সুকবি স্বর্গীয় বামদেব দত্ত মহাশয় দৈনিকের সম্পাদক নিযুক্ত হন; সেই সময় বিহারী বাবু তাঁহার সহকারী হইলেন। ক্ষেত্রবাবু তখন দৈনিকের লেখক ছিলেন,—সম্পাদক নন। কিন্তু দৈনিকের শেষ দশবর্ষ কাল, ক্ষেত্রবাবুই একমাত্র সম্পাদক ছিলেন। সম্প্রতি দৈনিক উঠিয়া গিয়াছে;—ক্ষেত্র বাবু বঙ্গবাসীতে নিযুক্ত হইয়াছেন।

অতঃপর যখন শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গবাসীর সম্পাদক হইলেন, রামবাবু তখন দৈনিক হইতে বঙ্গবাসীতে আসিলেন এবং ক্ষেত্র বাবুই তখন দৈনিকের ভার লইলেন। এই সময় বিহারী বাবু বঙ্গবাসীর "শাস্ত্রপ্রকাশ" বিভাগে নিযুক্ত হইলেন। বিহারী বাবুর সে সময়কার অগাধ পরিশ্রম ও অসাধারণ অধ্যবসায়ের কথা স্মরণ করিলে মুগ্ধ হইতে হয়। শাস্ত্রপ্রকাশের গ্রাহক সংগ্রহের জন্য তিনি যেরূপ উৎকট পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহাতে আজ অবধিও সকলেই তাঁহার কার্য্যকুশলতার প্রশংসা করিয়া থাকেন। বামদেব বাবুর সহিত বঙ্গবাসীর সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে, বিহারী বাবু বঙ্গবাসীর সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হন এবং ঈশ্বরেচ্ছায় আজিও সেই পদে প্রশংসার সহিত কার্য্য করিতেছেন।

বঙ্গবাসীতে বিহারী বাবুর প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, "নেপাল"; এবং জন্মভূমিতে প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়,—"পঙ্গপাল।" এই দুই প্রবন্ধেই বিহারী বাবু সুধী সমাজের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। সেই মনোযোগ এখন সহস্র সহস্র পাঠককে আকর্ষিত করিতেছে।

বিহারী বাবু সুস্থ শরীরে থাকিয়া দীর্ঘজীবী হউন,—ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

* * * * *

—বিষ্ণুচন্দ্র মৈত্র। বয়ঃক্রম ৪৮ বৎসর। রাঢ়েন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ,—আঢ্যকাণ-সাতোটার মৈত্র। পূর্ব্বপুরুষেরা ভট্টাচার্য্য উপাধিতে অভিহিত হইতেন। নিবাস,—বর্দ্ধমান-জেলার অন্তঃপাতী গঙ্গাতীরবর্ত্তী মাজিদাগ্রাম। পিতার নাম ৺রাজনারায়ণ ভট্টাচার্য্য। রাজনারায়ণ অতি কৃতবিদ্য ও ধীমান্ ছিলেন। তাঁহার পিতা ৺হরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য তেজস্বী ও ধর্ম্মশীল ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অতি যত্নসহকারে পুত্র রাজনারায়ণকে বাঙ্গলা ও ইংরেজী শিক্ষা দিয়াছিলেন। বয়োবৃদ্ধি সহকারে, অধ্যবসায় বলে, রাজনারায়ণ সংস্কৃত ভাষাতেও বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বাল্যকালে পিতা মাতার অজ্ঞাতসারে একবন্ধুর সহিত দেশভ্রমণে বহির্গত হন এবং উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাবের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া দেশে প্রত্যাগত হন, এই সময়ে ঐ বন্ধুর অনুরোধে তিনি "রসিকরঞ্জন" নামক কাব্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থ আদিরসঘটিত এবং পূর্ব্বে ইহার বহুল প্রচার ছিল। কিছুদিন বাটীর নিকটবর্ত্তী দুই একস্থানে বিষয়কর্ম্ম করিয়া অবশেষে তিনি কলিকাতা নগরীতে আগমন করেন। সে সময়ে ৺ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সমাচার চন্দ্রিকা" প্রকাশিত হইয়াছে। রাজনারায়ণ, ভবানীচরণের জীবিতকালে ও মৃত্যুর পরে "চন্দ্রিকার" লেখক ও "রত্নাবলী" নামক সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিলেন। ১২৫৪ সালে তাঁহার "পঞ্জাবেতিহাস" প্রকাশিত হয়। এই সময়ে কলিকাতায় "ভূম্যাধকারী-সভা বা "Land-holders" Association সংস্থাপিত হয়। ১২৫৬ সালে রাজনারায়ণ মফস্বলে "ভূম্যধিকারী সভার" শাখা সংস্থাপনার্থ রঙ্গপুরে গমন করেন। কিছুদিন রঙ্গপুর ভূম্যধিকারী সভার সম্পাদকের কার্য্য সম্পাদনের পর, ১২৫৭ সালের কার্ত্তিক মাসে ৪৩ বর্ষ বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

রাজনারায়ণের মৃত্যুকালে বিষ্ণুচন্দ্র জননীর ক্রোড়ে। পিতার যত্নে তাঁহার যেরূপ শিক্ষাও মানসিক উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, তাহা হয় নাই। তাঁহার শিক্ষার ভার তাঁহার পিতামহ হরচন্দ্র ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মধুসূদনের উপর ন্যস্ত হয়। তাঁহার বাল্যকাল পিতামহের নিকট অতিবাহিত হয়। প্রাথমিক শিক্ষাও বিষ্ণুচন্দ্র পিতামহের নিকট প্রাপ্ত হন। পিতামহের চরিত্রে প্রভাবে ভক্তি ও বিশ্বাসের বীজ তাঁহার হৃদয়ে নিহিত হয়। শিক্ষার্থ পিতামহ বিষ্ণুচন্দ্রকে কোন পণ্ডিতের টোলে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এখানে বিষ্ণুচন্দ্র ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মধুসূদন তাঁহাকে টোল ছাড়াইয়া ইংরেজী শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। এসময়ে

মধুসূদন কলিকাতায় "ভাস্কর," "প্রভাকর" প্রভৃতি সংবাদপত্রের সহকারী সম্পাদকতায় নিযুক্ত ছিলেন। যে সময়ে 'ভাস্কর"-সম্পাদক ৺গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য কারারুদ্ধ হন, সে সময়ে 'ভাস্কর" পত্রের সমস্ত ভার মধুসূদনের হস্তে ন্যস্ত ছিল।

বিষ্ণুচন্দ্র ভ্রাতার আদেশক্রমে গ্রামের কোন লোকের নিকট ইংরেজী শিখিতে আরম্ভ করিলেন বটে; কিন্তু তাঁহার অধিকাংশ সময় পুস্তক ও সংবাদপত্র পাঠে অতিবাহিত হইত। গৃহে অসংখ্য পুস্তক ছিল, সংবাদপত্রের ফাইল ছিল,—তিনি দিবানিশি তাহাই পাঠ করিতেন। সে সময়ে এখনকার ন্যায় গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় ছিল না; লোকে পাঠশালায় বাঙ্গলা শিক্ষা করিত। পাঠশালার শিক্ষিত বালকেরা মুদ্রিত বাঙ্গলা পুস্তক ভালো করিয়া পড়িতে পারিত না। কিন্তু বিষ্ণুচন্দ্রের বাঙ্গলা শিক্ষা পিতামহের নিকটেই হইত এবং তিনি বাঙ্গলা পুস্তকাদি ও সংবাদপত্র পাঠ করিয়া পিতামহকে শুনাইতেন। এই সময়ে তিনি একবার জ্যেষ্ঠভ্রাতা মধুসূদনের সহিত কলিকাতায় গিয়াছিলেন। একদিন বিষ্ণুচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া, মধুসূদন কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। গুপ্তকবির সহিত বিষ্ণুচন্দ্রের পিতা রাজনারায়ণের বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। কবিবর বিষ্ণুচন্দ্রকে দেখিয়া আনন্দ প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহার জ্ঞান পরীক্ষার্থ মাসিক প্রভাকরের সম্মুখস্থিত ফাইলটী তাঁহাকে পড়িতে দিলেন। প্রথমেই ঈশ্বরচন্দ্রের রচিত দীর্ঘ সন্ধিসমাস পরিপূর্ণ গদ্যময় ঈশ্বর স্তোত্র। বিষ্ণুচন্দ্র অবলীলাক্রমে তাহা পাঠ করিলেন,—গুপ্ত কবির আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি বিষ্ণুচন্দ্রকে কলিকাতায় রাখিয়া শিক্ষা দিবার জন্য মধুবাবুকে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। কিন্তু অল্প বয়স বিধায় বিষ্ণুচন্দ্র তখন দীর্ঘকাল কলিকাতায় অবস্থান করিতে সমর্থ হন নাই।

এই সময় নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী নাকাশীপাড়ার রাজপুত জমিদারেরা একটী ইংরেজী বাঙ্গলা স্কুল স্থাপিত করেন। বিষ্ণুচন্দ্র শিক্ষালাভার্থ ঐ স্কুলে প্রেরিত হন। সেখানে কয়েক মাস মাত্র অধ্যয়নের পর মধু বাবু পুনরায় তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া যান এবং গৌরমোহন আঢ্যের স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন। এই স্কুলে অল্পদিন অধ্যয়নের পরেই বিষ্ণুচন্দ্র পীড়িত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হন। কিছুদিন পরে শিক্ষালাভার্থ কৃষ্ণনগরে প্রেরিত হন এবং তথাকার মিশনরিস্কুলে প্রায় এক বৎসর অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে অর্থাৎ ইংরেজী ১৮৫৯ সালে রঙ্গপুর জেলার অধীন কাকিনীয়ার বিচক্ষণ ও বিদ্যোৎসাহী ভূম্যধিকারী শম্ভুচন্দ্র রায় মহাশয় একটী মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন ও একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে বাসনা করেন। মধুসূদন ভাবী সংবাদপত্রের সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হইয়া কাকিনীয়া যাত্রা করেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া তিনি সম্ভবতঃ ১৮৬০ সালে "রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ" নামক সংবাদপত্র প্রচার করেন। ঐ পত্র এখনও জীবিত আছে; কিন্তু মধু বাবুর সহিত তাহার আর কোন সংশ্রব নাই। ১৮৬১ সালে বিষ্ণুচন্দ্র মধুবাবুর সহিত কাকিনীয়ায় গমন করেন এবং স্বর্গীয় শম্ভুচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের স্থাপিত ইংরেজী বাঙ্গলাস্কুলে একবর্ষ যাবৎ অধ্যয়ন করেন। ১৮৬২ সালে ভ্রাতার সহিত বাটী আসিয়া কিছুদিন তাঁহার পড়াশুনা বন্ধ হইয়াছিল। এই সময় শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের মৃত্যু হয়। মধুবাবু এইজন্য কাকিনীয়ায় যাইতে ইচ্ছুক না হইয়া, ১৮৬৩ সালে-প্রথমে কলিকাতায় আগমন করেন। বিষ্ণুচন্দ্র তাঁহারই সঙ্গে ছিলেন, এবং কয়েকমাস ফ্রী চর্চ্চ ইনিষ্টিটিউশনে অধ্যয়ন করেন। নানা কারণে মধুবাবু ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী যাইতে বাধ্য হন। অল্পদিন পরেই মধুবাবু কোন সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া দারজিলিং গমন করেন। বিষ্ণুচন্দ্র ঘোরতর ম্যালেরিয়া-জ্বরে আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী ছিলেন। ঐ সময়ে নবদ্বীপ অঞ্চলে ভয়ানক ম্যালেরিয়ার উপদ্রব হইয়াছিল এবং এই উৎপাতে পূর্ব্বস্থলী গ্রাম প্রায় ধ্বংস হইয়া যায়। ১৮৬৪ সালে বিষ্ণুচন্দ্র শিক্ষালাভার্থ পুনরায় কৃষ্ণনগরে প্রেরিত হন এবং তথাকার বিদ্যালয়ে নিযুক্ত হইয়া কিছুদিন অধ্যয়ন করেন। ১৮৬৫ সালে কৃষ্ণনগরের এ,ভি, স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে নিযুক্ত হইয়া প্রায় একবর্ষ যাবৎ তিনি অধ্যয়ন করেন। তখন মধুবাবু ময়নাগুড়ির ডিপুটী কমিশনরের হেডক্লার্কের পদে নিযুক্ত ছিলেন। পীড়া নিবন্ধন ঐ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তিনি দার্জ্জিলিং যাইতে বাধ্য হন। তাঁহার আদেশক্রমে বিষ্ণুচন্দ্রও ঐ বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া দারজিলিং গমন করেন। ইহার কিছু পূর্ব্ব হইতেই বিষ্ণুচন্দ্র সংবাদপত্রে লিখিতে আরম্ভ করেন। মধুবাবু ভ্রাতাকে কোন বন্ধুর নিকট রাখিয়া দেশে প্রত্যাগমন করেন। অল্পদিন পরে ময়নাগুড়ি পুলিস আপিসে কোন একটী কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া বিষ্ণুবাবু তথায় গমন করেন। কিন্তু অতি অল্পদিনের মধ্যেই পীড়িত হইয়া দেশে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হন।

মধু বাবু ইত্যবসরে এলাহাবাদে আসিয়া একাউণ্টেণ্ট জেনারেলের আপিসে কার্য্যে নিযুক্ত হন। ১৮৬৬ সালের শেষে ম্যালেরিয়া-পীড়িত বিষ্ণুচন্দ্রও এলাহাবাদে আগমন করেন। ইহা তাঁহার জীবনে একটী গুরুতর ফলপ্রসূ ঘটনা। প্রতিকূল ঘটনাবলী নিবন্ধন বিদ্যালয়ে তাঁহার রীতিমত অধ্যয়ন করা হয় নাই। কিন্তু তাঁহার জ্ঞানলালসা ও অধ্যবসায় অত্যন্ত প্রবল ছিল। যদিও বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে পান নাই, তথাপি তিনি নিজ চেষ্টায় যতদূর জ্ঞানবৃদ্ধি করা সম্ভব, তাহা করিতেছিলেন। এইবার তাঁহার পক্ষে শুভযোগ উপস্থিত হইল। তিনি ১৮৬৭ সালে একাউণ্টেণ্ট জেনারেল আফিসে প্রবিষ্ট হইলেন। ঐ সময়ে "এলাহাবাদ ইনিষ্টিটিউট" নামক এক সভা ও

পুস্তকালয় স্থাপিত হয়। বিষ্ণুচন্দ্র সংবাদপত্রে লিখিতেন বলিয়া, ঐ সভার অবৈতনিক সভ্যরূপে মনোনীত হন। তিনি আপিসে কাজ করিতেন বটে, কিন্তু প্রাতে, সন্ধায় ও রাত্রে,—যখনই অবসর পাইতেন, তখনই "ইনিষ্টিটিউট" পুস্তকালয়ে অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইতেন। ৪ বর্ষকাল অনন্য মনা হইয়া অধ্যয়ন করাতে, তাঁহার জ্ঞান অনেক বৰ্দ্ধিত হইল। একাউণ্টেণ্ট জেনারেল আপিসের কার্য্যে অবসর বেশী থাকিত না, এজন্য সেই কাজ পরিত্যাগ করিয়া, তিনি রেলওয়ে আপিসের কার্য্যে নিযুক্ত হন। মধ্যে স্থানান্তরে সরকারী আপিসে দু একটী ভালো কৰ্ম্মও যুটিয়াছিল। কিন্তু ইনিষ্টিটিউট্‌ পুস্তকালয়ের প্রলোভনে, ভ্রাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও, তিনি তাহা গ্রহণ করে নাই। এদিকে মেডিকেল কলেজে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিবার বাসনা তাঁহার নিতান্তই বলবতী ছিল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে মেডিকেল কলেজে প্রবেশাধিকার লাভ করা যায় না। এজন্য তিনি এলাহাবাদস্থ মিশনরিদিগের সহায়তায়, ১৮৭১ সালে ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তথাপি ঘটনার প্রতিকূলতা বশতঃ তাঁহার মেডিকেল কলেজে যাওয়া হইল না।

ইহার কিছু পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুস্তৌফী মহাশয়ের প্রযত্নে এলাহাবাদে "প্রয়াগদূত" নামক একখানি সংবাদপত্র প্রচারিত হয়। ঐ পত্রের পরিচালন সম্বন্ধে নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হওয়াতে, শশীবাবু উহার সম্পাদকীয় সমস্তভার মধুবাবুর হস্তে অর্পণ করেন। পরে "প্রয়াগদূতের" একটী প্রেসও সাধারণের সাহায্যে সংস্থাপিত হয়। মধুবাবুর লেখার গুণে, তিন চারি বৎসর পর্য্যন্ত এই পত্রের অবস্থা বেশ উন্নত ছিল। বলা বাহুল্য, এইকার্য্যে বিষ্ণুচন্দ্র, ভ্রাতার সহকারী ছিলেন। ১৮৭৩ সালে বিষ্ণুচন্দ্র এলাহাবাদের গভর্ণমেণ্ট "ল" স্কুলে ভর্ত্তি হন এবং ১৮৭৪ সালে পরীক্ষা দিয়া, জেলাকোর্টের ওকালতি করিবার সনন্দপ্রাপ্ত হন। অতঃপর ১৮৭৫ সালে এলাহাবাদ হাইকোর্টের ওকালতি পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হন। ১৮৭৫ সালের শেষে কৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, বিষ্ণুচন্দ্র হাইকোর্টে এনরোল হন। ১৮৭৬ সাল হইতে ১৮৮৬ সাল পর্য্যন্ত আজমগড় জেলায় ওকালতি করেন এবং ১৮৮৭ সালের শেষভাগ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত এলাবাদ হাইকোর্টে ওকালতি করিতেছেন।

বিষ্ণুবাবুর জীবন,—প্রতিকূল ঘটনাবলীর সহিত অবিরাম সংগ্রামময়। কিন্তু তিনি কখনই দূরবস্থা বা বাধাবিঘ্নে নিরুদ্যম হন নাই। পূর্ব্বেও যেরূপ জ্ঞানলাভে যত্নশীল ছিলেন, এখনও সেইরূপ। কলেজের ছাত্রগণ পরীক্ষা দিবার জন্য যেরূপ প্রবল অধ্যবসায় সহকারে অধ্যয়ন করিয়া থাকে, বিষ্ণুবাবুও আজ আটচল্লিশ বর্ষ বয়সেও ঠিক সেইরূপ করেন। বাল্যকালেই তিনি নিজ চেষ্টায় বঙ্গভাষা শিক্ষা করিয়া সংবাদপত্রে লিখিতে আরম্ভ করেন। ক্রমে

কার লাভ করিয়াছেন। দর্শনশাস্ত্রের উপর বিষ্ণুবাবুর বাল্যাবধি অনুরাগ এবং ইংরেজী দর্শন শাস্ত্রের অনেক পুস্তক তিনি পাঠ করিয়াছেন। কিন্তু কেবল পুস্তক পাঠেই তিনি পরিতৃপ্ত নহেন,—সঙ্গে সঙ্গে দর্শনশাস্ত্রের নানা জটিল বিষয়েও অনেক স্বাধীন চিন্তা করিয়াছেন। এবং পাশ্চাত্য ও ভারতীয় দার্শনিকগণের মতের তুলনা এবং সমালোচনাও করিয়াছেন। এই চিন্তার ফলে তিনি যাহা কিছু বলেন বা লিখেন,—সকলই সারগর্ভ, শিক্ষাময়, সুন্দর ও সুযুক্তিপূর্ণ হইয়া থাকে।

বাল্যকাল হইতে পিতৃপদানুসরণ করিতে, বিষ্ণু বাবুর বলবতী ইচ্ছা ছিল। পিতার লিখিত সংবাদপত্রের ফাইল এবং তদ্রচিত পুস্তকাদি পাঠ করিয়া, তাঁহার এই প্রবৃত্তির উন্মেষ হয়। কিন্তু বিষ্ণুবাবুর ভ্রাতা মধুবাবু ইহার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি ভ্রাতাকে এবিষয়ে উৎসাহিত করা দূরে থাক,—ভ্রাতার এরূপ ইচ্ছার প্রতিবাদ করিতেন। এরূপ প্রতিবাদের একমাত্র কারণ এই যে, বঙ্গদেশে সাহিত্য-সেবা দ্বারা অর্থাগম হয় না। বিষ্ণুবাবু ভ্রাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, গোপনে বাঙ্গলা লেখা অভ্যাস করিতেন। কাকিনীয়া অবস্থানকালে, বিষ্ণুবাবুর বয়স অনুমান তের বৎসর হইবে। এই সময়ে তিনি, এবং "রঙ্গপুরদিক্‌প্রকাশের" বর্ত্তমান সম্পাদক বাবু হরশঙ্কর মৈত্র,—অন্যান্য কতকগুলি বালককে লইয়া "অজ্ঞান তিমিরনাশিনী" নাম্নী একটী সভা স্থাপন করেন। সেই সভায় পঠিত বিষ্ণুবাবুর একটী প্রবন্ধ,—সভার কার্য্য বিবরণের সহিত 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়" পত্রে প্রকাশিত হয়। যে সংখ্যক সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে উহা প্রকাশিত হয়, ভাগ্যক্রমে তাহা প্রথমেই মধু বাবুর হাতে পড়ে। মধুবাবু দেখিলেন, ভ্রাতার মনোবেগ অদম্য; সুতরাং তিনি সেই অবধি আর বিষ্ণুবাবুর বাঙ্গলা রচনা ও সংবাদপত্রে লেখার জন্য প্রতিবাদ করিতেন না। এই ঘটনার পর হইতে বিষ্ণুবাবু অবাধে বাঙ্গলা ভাষার চর্চ্চা করিতে ও সংবাদপত্রাদিতে প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন। "সংবাদ-প্রভাকরে" তাঁহার অনেকগুলি-গদ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এতদ্ব্যতীত কখন কখন "সোমপ্রকাশ", "এডুকেশন গেজেট" ও "রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশেও" তাঁহার লেখা প্রকাশিত হইয়াছে। দারজিলিঙে অবস্থানকালে, তাঁহার "পথিক" শীর্ষক প্রথম কবিতাময় পত্র,—"প্রভাকর" পত্রে প্রকাশিত হয়। ময়নাগুড়ি অবস্থানকালে "পথিক" শীর্ষক দ্বিতীয় কবিতা এবং এলাহাবাদে আগমনের পর ঐ শীর্ষক তৃতীয় কবিতাও উক্ত পত্রে প্রকাশিত হয়। এলাহাবাদ আগমনের পর বিষ্ণুবাবু "প্রয়াগদূতের" সম্পাদন-কার্য্যে মধুবাবুর সহায়তা করিতেন,—তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। বিষ্ণু বাবুর রচিত অনেক প্রবন্ধ ঐ পত্রের কলেবর পূর্ণ করিয়াছে; তন্মধ্যে "মনুষ্যের উন্নতি" শীর্ষক কয়েকটী প্রবন্ধ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাতে তাঁহার চিন্তাশীলতার প্রবল লেখা স্পৃহা প্রতীয়মান হয়। একদা ভ্রাতার অমু

পস্থিতি নিবন্ধন বিষ্ণুবাবু তিনমাসকাল স্বয়ং "প্রয়াগদূত" সম্পাদন করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি মধ্যে মধ্যে ইংরেজী সংবাদ পত্রেও লিখিতেন। এই সময়ে, তাঁহার এই ইংরেজী সংবাদপত্রে লেখার ফলে, পাটুলী অঞ্চলের একটী লোমহর্ষণ অত্যাচার নিবারিত হয় এবং একজন ঘোরদুর্দ্দান্ত অত্যাচারী জমিদার কারারুদ্ধ হন।

আজিমগড় অবস্থানকালে নানা কারণে বিষ্ণুবাবু দশ বর্ষকাল বঙ্গভাষার চর্চ্চা এক প্রকার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে কেবল ইংরেজী সংবাদপত্রে লিখিতেন এবং প্রতিবর্ষে একবার কাশীদাসের মহাভারত পাঠ করিতেন। এই ইংরেজী সংবাদপত্রে লেখার ফলে "হিন্দুপেট্রিয়টের" ভূতপূর্ব্ব খ্যাতনামা সম্পাদক কৃষ্ণদাস পালের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। কিছুদিন বিষ্ণুচন্দ্র কেবল ইংরেজীই লিখিলেন, বাঙ্গলা সংবাদপত্রের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ ১৮৮৭ সালে এলাহাবাদে পুনরাগমনের পর, তিনি অনুতপ্ত হৃদয়ে পুনরায় বঙ্গ ভাষার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন। সে অনুশীলনের ফলে,—আজ জন্মভূমি, নব্যভারত মাসিকপত্রে,—তাঁহার অতি উৎকৃষ্ট সামাজিক প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হইতেছে। বিনা প্রয়োজনে বিষ্ণুবাবু এখন আর ইংরেজীতে কিছু লিখেন না।

১৮৯০ সালে বিষ্ণুবাবুর "অপচয় ও উন্নতি" নামক পুস্তক প্রকাশিত হয়। তিন মাসের মধ্যে এই পুস্তকের কল্পনা ও রচনা শেষ হইয়া যায়। এই "অপচয় ও উন্নতি" একখানি উচ্চশ্রেণীর সন্দর্ভ পুস্তক। গ্রন্থের অনেকস্থলেই গ্রন্থকারের গভীর চিন্তাশীলতা ও সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ বালক ও বৃদ্ধ,—উভয়েরই পাঠ্য। এ শ্রেণীর গ্রন্থ কেন যে স্কুলপাঠ্য হয় না, বলিতে পারি না।

বিষ্ণুবাবুর রচিত কয়েকটী কবিতা ও গদ্য প্রবন্ধ "জন্মভূমিতে" এবং "হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান" নামে আর একটি গদ্যপ্রবন্ধ "নব্যভারতে" প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার রচিত অনেক বিষয় এখনও প্রকাশিত হয় নাই। তিনি স্বয়ং বলিয়া থাকেন যে, এখনও তাঁহার শিক্ষাকার্য্য চলিয়া আসিতেছে এবং তাঁহার জীবনের কার্য্যের সূত্রপাত হইয়াছে মাত্র।—মহতেরই উক্তি বটে।

নাম ছাড়।

—নীলমাধব সেন গুপ্ত। ১৮৫৬ সালে শ্রাবণ মাসে বাঁকুড়া জেলার অন্তঃপাতী মাতুলালয় হাড়মাসড়া গ্রামে নীলমাধব বাবুর জন্ম হয়। উক্ত জেলার বালসী গ্রাম তাঁহার পৈতৃক বাসস্থান। তাঁহার পিতার নাম ৺ নন্দলাল সেন গুপ্ত।

শৈশবে পাঠশালার অধ্যয়ন শেষ করিয়া বংশগত রীত্যনুসারে নীলমাধব বাবু বালসী গ্রামে পণ্ডিত কালীচরণ ন্যায় পঞ্চানন মহাশয়ের টোলে সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করেন। ব্যাকরণশাস্ত্রে সম্পূর্ণরূপ জ্ঞানলাভ করিতে না করিতে ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রেরিত হন। স্কুলে ইংরেজী এবং গৃহে সংস্কৃত ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে থাকেন। কয়েক বৎসর এইভাবে অতিবাহিত হইলে ১৮৬৯ সালে নীলমাধব বাবু মেদিনীপুরে যান। তথাকার গবর্ণমেণ্ট স্কুলে পড়িতে আরম্ভ করিয়া ১৮৭১ সালে মাইনর পরীক্ষা দেন, তাহাতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৮৭২ সালে এনট্রেন্স পরীক্ষা দেন। ১৮৭১ সালে বিষ্ণুপুর রাজবাটীর চিকিৎসক অনন্তলাল দাস গুপ্ত মহাশয়ের কন্যার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়। ইহার কিছুদিন পরে তাঁহার পিতা পরলোক গমন করেন।

সংসারের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া কিছুদিন নীলমাধব বাবুকে নানা কষ্টে পড়িতে হয়। শেষে ১৮৭৩ সালে তাঁহার শ্বশুর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ সহোদর লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবিরাজ শ্রীযুক্ত হলধর দাস গুপ্ত মহাশয়ের নিকটে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন, শ্বশুর মহাশয়ের নিকট ঔষধ প্রস্তুত করণ এবং চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। দুই তিন বৎসর গত হইলে তিনি বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বীরপুর গ্রামের ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কাজ করেন। তৎপরে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত দাঁতন স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের কাজ করিয়াছিলেন। ১৮৮০ সালে নীলমাধব বাবুর শ্বশুর মহাশয় তীর্থপর্য্যটনে বহির্গত হইলে নীলমাধব বাবু বিষ্ণুপুরের রাজবাটীতে চিকিৎসাকার্য্য আরম্ভ করিলেন। তাঁহার চিকিৎসা-প্রণালীর সারবত্তা এবং কয়েকটী কঠিন রোগ তাঁহাকে আরাম করিতে দেখিয়া রাজা রামকৃষ্ণদেব বাহাদুর তাঁহার উপর অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। বিষ্ণুপুরে তাঁহার শ্বশুর মহাশয়ের যথেষ্ট পসার প্রতিপত্তি ছিল। তাঁহার সুচিকিৎসা গুণে অল্পদিনের মধ্যে তিনি সকলেরই প্রীতিভাজন লইয়া উঠিলেন। অতঃপর নীলমাধব বাবুর শ্বশুর মহাশয়ের মৃত্যু হইলে নীলমাধব বাবুই উক্ত রাজবাড়ীর চিকিৎসক নিযুক্ত হন।

১২৯২ সালে নানা কারণে নীলমাধব বাবুর সহিত রাজবাটীর সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল। চাকরি পরিত্যাগের অব্যবহিত পরেই নীলমাধব বাবু এলাহাবাদে আসিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ স্নিগ্ধ ও কোমল স্বভাব এবং সুচিকিৎসা গুণে অল্প সময়ের মধ্যে এলাহাবাদবাসীর বিশেষ সম্মান ও প্রীতিভাজন হইয়া উঠিলেন। আর তাঁহার সেই সুচিকিৎসার যশও চারিদিক পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

নীলমাধব বাবু বিশেষ সংস্কৃতানুরাগী ব্যক্তি। পঠদ্দশাতে তিনি রঘুবংশ, শকুন্তলা, কুমারসম্ভব ইত্যাদি কয়েকখানি কাব্য পাঠ করেন। সেই সময়ে "মাতৃস্নেহ" ও "পিতা" নামে দুইখানি পদ্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু নানা কারণে ইহা মুদ্রিত হয় নাই। সংবাদপত্রে

তাঁহার কয়েকটি লেখা প্রকাশ হইয়াছিল। এলাহাবাদ আগমনের কিছুদিন পরে তিনি "ঠানদিদির কবিরাজী" নামে একখানি চিকিৎসা পুস্তকের প্রথমভাগ প্রকাশ করিয়াছেন, আর তিন ভাগ প্রকাশ করিবার বাসনা আছে। "ঠানদিদির কবিরাজী" পুস্তকের ভাষা এরূপ প্রাঞ্জল যে তাহা সকলেরই সহজবোধ্য। কবিরাজ মহাশয় এই পুস্তকখানি প্রকাশ করিতে,—তাঁহার বন্ধু বাবু সর্ব্বেশ্বর মিত্র মহাশয়ের যথেষ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই জন্য তিনি সর্ব্বেশ্বর বাবুর নিকট কৃতজ্ঞ।

* * *

—কুঞ্জবিহারী বসু। গ্রাম শালিপুর, পোষ্ট হাড়োয়া, জেলা ২৪ পরগণা। ইহাঁর পিতার অবস্থা মন্দ ছিল। ইনি স্বীয় যত্ন ও অধ্যবসায় বলে, অনেক কষ্টে বিদ্যা শিক্ষা করেন। ইনি সুশিক্ষিত, সুরসিক ও অমায়িক। যখন বয়ঃক্রম ১৮।১৯ বৎসর, তখন হইতে ইনি "প্রভাতী" নামে দৈনিক সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। তৎপরে "সোমপ্রকাশ" ও "নববিভাকরে"ও নিয়মিতরূপ লেখকশ্রেণীভুক্ত হন। তখন সোমপ্রকাশের "সম্পাদক ছিলেন,—পণ্ডিতপ্রবর দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়। পরে "সুলভ দৈনিকের" সহকারী সম্পাদক-পদে নিযুক্ত হইয়া ইনি কয়েক বৎসর কার্য্য করেন। এতদ্ভিন্ন "অমৃত-বাজার", "ষ্টেটস্‌ম্যান" প্রভৃতি সংবাদপত্রে সময়ে সময়ে প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন। ইহাঁর প্রণীত কয়খানি ইংরেজী পুস্তকও আছে। কুঞ্জ বাবুর বয়ঃক্রম এক্ষণে ৩৫।৩৬ বৎসর। এক্ষণে ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি খুব প্রসন্ন।

ভ্রম-সংশোধন।

বিগত আষাঢ় মাসের জন্মভূমিতে জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত লাঙ্গলবেড়িয়া গ্রামবাসী পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয় "হরিনাভি স্কুলের হেড পণ্ডিতের পদাভিষিক্ত" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন; কিন্তু সম্প্রতি তাঁহার জীবনী-সংগ্রহকার লিখিয়া পাঠাইয়াছেন,—উক্ত ভট্টাচার্য মহাশয় এক্ষণে হুগলি জেলা ও হরিপাল ডাকঘরের অধীন কৈকালা গ্রামস্থ কৈকালা হাই ইংলিস স্কুলে অধ্যাপনা করিতেছেন।

শান্তির সম্রাট।

রুষের কথা কহিতে হইলে, এখন আর আমাদিগকে গৌরচন্দ্রিকা করিতে হয় না। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির সূত্র-পাত সময়ে—সেই প্রথম আমলে—যেমন ফরাসীর কথা কহিতে হইলে, উপক্রমণিকার প্রয়োজন হইত না, এখনও সেইরূপ রুষের কথা কহিতে হইলে, উপক্রমণিকার প্রয়োজন হয় না। তখনকার ভারতে ইংরেজের কথা পড়িলেই ফরাসীর কথা আপনি পড়িত, এখনও সেইরূপ ইংরেজের কথা পড়িলেই রুষের কথা আপনি পড়ে। তখন দিনে দিনে—পদে পদে—ফরাসী ইংরেজের রেষারেষি, দ্বেষাদেষি, ঠেশাঠেশি, ঘেসাঘেসি, কেশাকেশি, পেষাপেষি এবং প্রায়ই শেষে সমরক্ষেত্রে মেশামিশি হইত; এখনও রুষের সহিত প্রায় সেইরূপ হইয়া থাকে। রেষারেষি, দ্বেষাদ্বেষি, ঠেশাঠেশি, ঘেসাঘেসি সেইরূপ হইয়া থাকে; কেশাকেশি পেষাপেষি হয় না, এখনও সেরূপ মেশামেশি হয় নাই বলিয়া। ফরাসী ইংরেজকে এই ভারতে থাকিতে হইয়াছিল, রুষ ইংরেজকে এই ভারতে থাকিতে হয় নাই; আর ভগবানের ইচ্ছায়, কখন হইবেও না। একস্থানে থাকা নাই বলিয়াই সেরূপ পেষাপেষি নাই, সেরূপ মেশামেশিও নাই, কিন্তু আর সমস্তই ষোল আনা। তখন যেরূপ ইংরেজ-রাজকে ফরাসীর জন্যেই ব্যস্ত বিব্রত হইতে হইয়াছিল, এখন সেইরূপ রুষের জন্যেই ব্যস্ত বিব্রত হইতে হইয়াছে। রুষের নাম শুনে নাই এমন লোক ভারতে নাই, ভারতের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই জানে, রুষই এখন ইংরেজের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। রুষ ভারতের দিকে আসিবার চেষ্টা করিতেছে, ইহা ভারতের সকলেই জানে। কোথায় হিরাট, কোথায় খুস্ক, কোথায় খাইবার, কোথায় বোলান, কোথায় পামীর, কোথায় চিত্রল, কোথায় ঘিল-ঘিট, কোথায় রোষণ, তাহা ভারতের পনর আনা লোকে জানে না বটে; রুষ খাইবার দিয়া আসিতে চাহে কি বোলান দিয়া আসিতে চাহে, পামীর পার হইয়া আসিতে ইচ্ছা করে কি হিন্দুকুশ ভেদিয়া আসিবার বাসনা করে, তাহা ভারতের পনর আনা লোকে জানে না বটে; কিন্তু রুষ যে, ভারতে আসিতে চাহে, ইহা সকলেই জানে। হত শত বুঝে না—পথ ঘাট চিনে না, কিন্তু কাবুলের নাম সকলেই শুনিয়াছে। যাহারা বেদানা পেস্তা লইয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়ায়, ধোসা লুই লইয়া পাড়ায় পাড়ায় বেড়াইয়া বেড়ায়, তাহারা যে, কাবুলী—তাহাদের দেশেই যে কাবুল, তাহা ভারতের প্রাসাদবাসী কুবেরতনয় হইতে কুটীরবাসী কৃষকতনয় পর্য্যন্ত সকলেই জানে—কেননা সকলেই শুনিয়াছে। এজন্যে কাহাকেও ভূগোল-পরিচয় পড়িতে হয় না, সংবাদপত্রও দেখিতে হয় না, কাবলী মেওয়াওয়ালারাই ইহা ভারতের কত লোককে শিখাইয়া দিয়াছে। আর এদেশে যে সকল আফগান, পাঠান, কাবুলী, খাইবারী প্রভৃতি ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহাদের কেহই যে, রুষের কথায় অনভিজ্ঞ নহে, তাহা সকলেই দেখিয়াছেন। বরং অনেকেই দেখিয়াছেন, উহারা কথার সময় রুষের কথা কহিয়া থাকে, রুষের গতিবিধি কার্য্যা-কার্য্যের কথাও কহিয়া থাকে। প্রকৃত রহস্যে সকলের অভিজ্ঞতা নাই সত্য, কিন্তু উহাদের সকলেরই মুখে যে, অতিরঞ্জিত রুষবার্ত্তা শোনা যায়, তাহা না জানে কে? তাই বলিতেছি, ভারতে এমন লোক নাই, যে রুষের কথা না শুনিয়াছে। আবার যিনি এখন রুষের সম্রাট, তিনি পিতা থাকিতে ভারতে আসিয়া, ভারতের চারিদিকে ভ্রমণ করিয়া, রাজা ইংরেজের কল্যাণে ধূমধামের একশেষ করিয়া, সকলকেই রুষ সম্বন্ধে কিছু কিছু অভিজ্ঞ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। তাই বলিতেছি, রুষের কথা কহিতে হইলে, উপক্রমণিকার প্রয়োজন নাই, রুষের পালা গাহিতে গেলে গৌরচন্দ্রিকা করিতে হয় না, রুষের কথা কহিলে কাহারই পক্ষে অনধিকারচর্চ্চা করা হয় না। বর্ত্তমান রুষ সম্রাটের জননী আমাদের মহারাণীর জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূর সহোদরা। সম্রাটের পিসী মহারাণীর মধ্যম পুত্রের মহিষী। আবার মহারাণীর মৃতা কন্যা এলিসের কন্যা—মহারাণীর দৌহিত্রী—হইয়াছেন বর্ত্তমান রুষ সম্রাটের সহধর্ম্মিণী। সুতরাং রুষের সহিত আমাদের রাজবংশের যত ঘনিষ্ঠতা এত ঘনিষ্ঠতা আর কাহারই সহিত নাই, প্রুষিয়ার সহিতও এত ঘনিষ্ঠতা নহে। অতএব, রুষের কথায় আমাদিগের অনধিকারচর্চ্চা হইতেই পারে না, গৌরচন্দ্রিকারও প্রয়োজন হইতে পারে না। বর্ত্তমান রুষ সম্রাট জন্মিয়াছেন ১৮৬৮ সালে, বয়স এখন ৩১ বৎসর। যৌবনের প্রারম্ভেই ভারতভ্রমণে আসিয়াছিলেন। ভারতেশ্বরীর দৌহিত্রীকে বিবাহ করিয়াছেন ১৮৯৪ সালে। দুই কন্যার মুখ দেখিয়াছেন, এখনও তাঁহার পুত্রদর্শনসুখ ঘটে নাই। সম্রাট খুব দীর্ঘকায় নহেন, আবার খর্ব্বাকৃতিও নহেন, তাঁহার মাফিকসই চেহারা। সুস্থ সবল দেহ, বিদ্যা বুদ্ধি খুব আছে। নিজের রুষভাষার ত কথাই নাই, জর্ম্মণ ফরাসী এবং ইতালীয় ভাষায় জলদ কথা বার্ত্তা কহিতে পারেন। ইংরেজি তাঁহার প্রিয়ভাষা। পিতা তৃতীয় এলেক-জন্দর পুত্রকে বাল্যাবস্থাতেই ইংরেজি শিখাইয়া ছিলেন, একজন পণ্ডিত ইংরেজ অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। বর্ত্তমান জার ইংরেজি সাহিত্যে অধিকারী, ভাল ভাল কাব্য নাটকাদি সব রীতিমত পড়িয়াছেন। বিলাতের যত বড় বড় সংবাদপত্র মাসিকপত্র প্রভৃতি নিজে পড়েন। তাহার উপর মহিষী ইংলণ্ডেশ্বরীর দৌহিত্রী, ইংরেজি ভাষায় তাঁহার মাতৃক অধিকার; সম্রাটের ইংরেজি শিক্ষায় আরও জোর পড়িয়াছে। ভারত, ব্রহ্ম, জাপানাদি ঘুরিয়া গিয়া ভূয়োদর্শনের অধিকারী হইয়াছেন। স্বয়ং বুদ্ধিমান,

যতদূর সাধ্য—যতদূর সম্ভব—নানা দেশের—নানা জাতির—অবস্থা সম্বন্ধে—অভিজ্ঞতা-সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। ভ্রমণের পুস্তক লিখিয়াছেন। ইংরেজের ভারতরাজ্যটা ভাল করিয়াই দেখিয়া গিয়াছেন। ইউরোপীয় অভিজ্ঞতার অভাব হয় নাই। অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় রাজা হইয়াছেন অল্প বয়সে, অবস্থায় পড়িয়া যৌবনেই প্রবীণ হইয়াছেন। রাজনীতিবিষয়ে উপযুক্ত প্রবীণ মন্ত্রীদিগের কাছে শিক্ষা পাইয়াছেন। ইতিহাস ভূগোলে অসাধারণ অনুরাগ; রাজনীতি-শিক্ষার পথ সহজেই মুক্ত হইয়াছিল; ত্রুটি কোনদিকে হয় নাই। বিশাল বিরাট বিশ্বস্তর সাম্রাজ্যের উপর আধিপত্য করিতেছেন, বার কোটি প্রজার রাজাধিরাজ হইয়া পদোচিত কর্ত্তব্যপালন করিতেছেন; কোনদিকেই কেহ কোনরূপ ত্রুটি দেখিতে পাইতেছে না। এবম্ভূত রুষ সম্রাট সম্প্রতি এক

শান্তির ঘোষণাপত্রে

সমগ্র জগৎকে বিস্মিত করিয়া দিয়াছেন। ঘোষণাপত্রের মর্ম্ম;—

"যুদ্ধ বিগ্রহের ভয়ে ইউরোপের যত বড় বড় রাজ্য-কেই প্রভূত সৈন্য সদা সজ্জিত রাখিতে হইয়াছে। অনেক-কেই আবার পলটনের সঙ্গে সঙ্গে প্রভূত রণপোতও প্রস্তুত রাখিতে হইয়াছে। পোত পলটন সকলেরই ক্রমে ক্রমে বাড়িতেছে। রাজ্যের অধিকাংশ আয় ইহাতেই উড়িয়া যাইতেছে। সুতরাং যাহাতে প্রজাবর্গের দুঃখ ঘুচে এবং সুখ বাড়ে, এরূপ কোন কার্য্যেই কুত্রাপি যথোচিত ব্যয় হইতেছে না। প্রজাদের দুঃখ ঘুচিতেছে না। আবার অনেক রাজ্যেরই যত প্রজাকে পোত পলটনের কার্য্যে অগত্যা নিযুক্ত থাকিতে হইতেছে; আপনাদের সাংসারিক সামাজিক উন্নতি সম্বন্ধে অগত্যা ঔদাসীন্য করিতে হইতেছে। অর্থাভাবে রাজা ও রাজপুরুষদিগের পক্ষে ঔদাসীন্য, আর পোত পলটনের বাধ্যতার জন্যে প্রজাপক্ষেও ঔদাসীন্য। ইউরোপের যত রাজ্যকেই ক্রমে অবসন্ন হইয়া পড়িতে হইতেছে; উন্নতির পথ সর্ব্বত্রই রুদ্ধ থাকিতেছে। অতএব, সকলেরই উচিত, যুদ্ধবিগ্রহে ক্ষান্ত হওয়া; সকলেরই একমত হইয়া পোত পলটন কমাইবার ব্যবস্থা করা উচিত; বৃদ্ধির পক্ষে একেবারেই বিরত হওয়া উচিত। আসুন, সকলে মিলিয়া এই সাধু সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করুন।"

যে রুষ সমরসজ্জায় সদাই প্রধান, যাঁহার ৬৮ লক্ষ সৈন্য যখন তখন যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারে, আবশ্যক হইলে যিনি এক মাসে এক কোটি সৈন্য সমরক্ষেত্রে খাড়া করিতে পারেন, যাঁহার রণপোতও পলটনের মত হুহু করিয়া বাড়িতেছে, যাঁহার প্রধান কার্য্যই হইয়াছে পোত পলটনের বৃদ্ধি করা, সুদূর প্রশান্ত মহাসাগরও যাঁহার

পলটন বিরাজ করিতেছে, যিনি সৈন্যচালনার পথ সহজ করিবার জন্যে অসাধ্য-সাধন করিতেছেন, চারিদিকেই রেল-বিস্তার করিতেছেন। রুষের ইউরোপীয় রাজধানী সেণ্টপীটর্সবর্গ হইতে যাঁহার রেল প্রশান্ত তীরে আসিয়া পৌঁছিতেছে, যাঁহার রেল আফগান রাজ্যের শিয়রে ঠেকিয়াছে, আফগান সীমার আড়াইক্রোশ দূরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, আর ৪৫ ক্রোশ আসিলেই যাঁহার রেল কাবুলের হিরাটে ঠেকিবে, যাঁহার প্রভূত পলটন আফগান সীমার অদূরে বিরাজমান, সৈনিক সেনানী রাই যাঁহার রাজ্যে সকলের অপেক্ষা সম্মানভাজন, যাঁহার জন্যে ইংরেজকে চারিদিকেই আত্মরক্ষা করিতে হইতেছে, জলে স্থলে প্রস্তুত থাকিতে হইয়াছে, যাঁহার জন্যেই ইংরেজকে কাবুলে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতে হইয়াছে, পামীরের দিকে খরনজর রাখিতে হইতেছে, খাইবার বোলান প্রভৃতি পঞ্চপথের রক্ষা করিতে হইতেছে, যাঁহার জন্যেই এখন ভূমধ্যসাগরে ইংরেজের প্রবল পোতপুঞ্জ সদা প্রস্তুত রাখিতে হইয়াছে, মল্টায় পলটন রাখিতে হইতেছে, সুইয়েজ খালে কর্ত্তৃত্ব রাখিতে হইতেছে, সেই কর্ত্তৃত্বের জন্যে মিশররাজ্যে আধিপত্য রাখিতে হইয়াছে, যাঁহার জন্যে ইংরেজকেও প্রশান্ত সাগরে পোত রাখিতে হইয়াছে, চীন সাগরে রাখিতে হইয়াছে, যাঁহার ভয়ই ইংরেজের প্রধান ভয়, যাঁহার জন্যেই ইংরেজ অধিক বিব্রত, সেই রুষের রাজাধিরাজ দ্বিতীয় নিকোলাস হঠাৎ ঐরূপ শান্তির প্রস্তাব করিলেন, শান্তি-সমিতির আয়োজন করিতে চাহিলেন; জগৎকে যে, কাজেই বিস্মিত হইতে হইয়াছে! কিন্তু

প্রস্তাবে অমত

করাও ত শোভা পায় না। প্রস্তাবের সাধুতা সম্বন্ধে ত আর দ্বিরুক্তি করা চলে না। যিনি প্রস্তাব করিয়াছেন, তাঁহাকে বিশ্বাস না করিতে পার, কিন্তু তাঁহার প্রস্তাবে ত দোষ দিতে পারিবে না। আর তিনি যে যে কারণ দর্শাইয়া শান্তির প্রস্তাব করিয়াছেন, সে সে কারণ ত সর্ব্ববাদিসম্মত। গোটা ইউরোপ যেন এখন সৈনিকশিবির। যত সাগরই যেন রণপোতের ক্রীড়াক্ষেত্র! ইউরোপের যত সমর্থ সবল পুরুষই যেন দিবারাত্র যুদ্ধযাত্রার জন্যে প্রস্তুত! এমন রাজ্য নাই, যাহার রাজস্বের তৃতীয়াংশ সমরসজ্জায় না যাইতেছে! অতিব্যয়ে সকলকেই অবসন্ন হইতে হইয়াছে। ইংলণ্ড ছাড়া আর যত প্রধান রাজ্যেরই ঋণভার বাড়িতেছে। ইংলণ্ডের ধনসমৃদ্ধি বড় অধিক, তাই ঋণভার বাড়িতেছে না। কিন্তু সামরিক ব্যয় ত ইংলণ্ডেও কম নহে, রাজস্বের অর্দ্ধেক পোত পলটনে যাইতেছে। পৌণ্ডের ৪৬ কোটি টাকা পড়িতেছে, আমাদের প্রায় ৭০ কোটি! রুষ জর্ম্মণ ফরাসীকে ত পোত পলটনের জন্যে ক্রমেই দেউলিয়ার পথে যাইতে হইতেছে।

প্রস্তাব সকলেরই অনুমোদনীয়। প্রস্তাবের মত কার্য্য হইলে, যুদ্ধবিগ্রহের আশঙ্কা ঘুচিয়া গেলে, শান্তির সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইলে, সকলেরই মঙ্গল। কিন্তু

সন্দেহ ও অবিশ্বাস

যে, সকল হৃদয়ে! দস্যু দস্যুকে বিশ্বাস করে, বাঘে বাঘে প্রণয় আছে, কিন্তু রাজায় রাজায় প্রণয় হয় না, রাজার উপর রাজার বিশ্বাস হয় না। কোন রাজ্যের প্রধান রাজপুরুষেরা ত রুষের সম্রাট ও তাঁহার প্রধান রাজপুরুষদিগকে বিশ্বাস করিতেছেন না। ভাঙ্গিতে ক্লেশ নাই, কিন্তু গড়িতে অনেক ক্লেশ। সকলেই ভাবিতেছেন, রুষের প্রস্তাবে যদি আজ আমি পোত পলটন কমাইয়া দিই, তাহা হইলে হঠাৎ বাড়াইতে পারিব না। অথচ কাহার মনে কি আছে কে বলিতে পারে? রুষকেও ত বিশ্বাস নাই। রুষ সম্রাট নিজে শান্তির জন্যে লালায়িত হইতে পারেন, কিন্তু তিনিও ত অবস্থার দাস। আর মন্ত্রি সেনাপতিদিগের কথা ত তাঁহাকেও শুনিতে হয়। সর্ব্বত্রই সন্দেহ, সর্ব্বত্রই শান্তির প্রস্তাবে মৌখিক সহানুভূতি, কিন্তু আন্তরিক অবিশ্বাস! রুষ সম্রাট যদি প্রথমেই নিজের পোত পলটন কমাইয়া দিতে পারিতেন, তাহা হইলে, হয় ত সকলেই বিশ্বাস করিতেন, সকলেই শান্তির আয়োজনে যোগ দিতেন কিন্তু রুষ সম্রাটও ত পাগল নহেন; তিনি পোত পলটন ভাঙ্গিয়া দিলেন, অমনই অপরে তাঁহাকে চাপিয়া ধরিল তখন বল-মা তারা দাঁড়াই কোথায়? এই ভয়েই ত সকলে ভীত। এক দিন এক সময়ে সকলে পঞ্চায়তে বসিয়া যদি পোত পলটন কমাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে বরং সন্দেহ অবিশ্বাস ঘুচিতে পারে। কিন্তু সে পক্ষেও ইংরেজ রাজের অমত আছে। তিনি বলিতেছেন, "ইউরোপের ভিতর আর সকলেই যখন তখন বলবৃদ্ধি করিতে পারেন কেন না, তাঁহাদের যত প্রজাই পলটনে খাটিতে বাধ্য আমাদিগকে অনেক কষ্টে—অনেক অর্থে—সৈন্যসংগ্রহ করিতে হয়। আর পলটন কমাইলে বাড়াইলে বরং চলে রণপোত কমানো বাড়ানো সহজ নহে—একান্তই দুঃসাধ্য অথচ পোতবলই আমার প্রধান বল। অন্যের পক্ষে বল খর্ব্ব করা সুসাধ্য, আমার পক্ষে অসাধ্য।" অথচ—এরূপ অবস্থা সত্ত্বেও—ইংরেজের মন্ত্রীদিগকে রুষ সম্রাটের প্রস্তাবে আসানুভূতি দেখাইতে হইতেছে। এই খানেই বৈচিত্র্য আবার ইংলণ্ডেই

শান্তি-যাত্রার

উদ্যোগ হইতেছে—আয়োজন হইতেছে। ইংলণ্ডের যত গির্জ্জায় শান্তির সুরে ভজনা হইতেছে, যত পাদরি রুষ সম্রাটের শান্তি প্রস্তাবে অনুমোদন করিতেছেন। অনেক শান্তিপ্রিয় রাজনীতিকও শান্তি-যাত্রায় অনুমোদন করিতেছেন। "রিবিউ রিবিউ' নামে একখানি মাসিক প

াছেন। শান্তিযাত্রার তিনিই প্রধান উদ্যোগী। অনেক বড় বড় পাদরি দলে আছেন, অন্যান্য অনেকেও না আছেন তমন নহে। স্থানে স্থানে সভা হইয়াছে, শান্তির সভায় শান্তির গান হইয়াছে। ষ্টেডের দল নগরে নগরে শান্তি-সভার আয়োজন করিতেছেন। আমরিকা পর্য্যন্ত শান্তির স্রোত চালাইয়া দিয়াছেন। ষ্টেড সাহেব শান্তিযাত্রার পথ খাট লোকজনও স্থির করিয়া দিয়াছেন। বলিয়াছেন, বিলাতের চারি দিকে সভা হইবে, সভায় শান্তির প্রস্তাব গ্রাহ্য হইবে। বিলাতের যত সভাই একমত হইয়া দশজন প্রতিনিধি বাছিয়া দিবেন। সেইরূপ, আমরিকার বৃটিশ কানাডা এবং স্বাধীন ইউনাইটেডষ্টেট্‌সের লোকেও সভা সমিতি করিয়া দশ জন প্রতিনিধি বাছিয়া দিবেন। বিলাত ও আমরিকার হইবে, ২০ জন; ইহার ১৫ জন পুরুষ আর ৫ জন স্ত্রীলোক। ষ্টেড বলিতেছেন, নারীর সহানুভূতি ও সাহায্য না হইলে, শান্তির যাত্রায় সুবিধা হইবে না! যাহাই হউক, এই ২০ জন, শান্তির গান গাহিতে গাহিতে, সুইজরলণ্ড, বেলজিয়ম, হলন্দ, দেনমার্ক, সুইডেন নরোয়ে এবং পর্ত্তুগালে উপস্থিত হইবেন। এই ৭ রাজ্য হইতে ৭ প্রতিনিধি লইবেন। ৭টীই পুরুষ কি মেয়ে-মানুষও থাকিবেন, তাহা ষ্টেড সাহেব বলেন নাই। কিন্তু ঐ ২৭ জন, শান্তির গান গাহিতে গাহিতে ফরাসিরাজ্যে আসিবেন। সেখানেও ১০ প্রতিনিধি দলে যোগ দিবেন। তাহার পর জর্ম্মণীর দশ, অস্ত্রিয়ার দশ, ইতালির দশ, সর্ব্বশুদ্ধ হইবে ৬৭ জন। আমরিকা ও বিলাত ছাড়া অন্যত্রও পুরুষের সঙ্গে মেয়ে মানুষ লওয়া হইবে কি না, তাহা ষ্টেড সাহেব খুলিয়া দেখান নাই। বোধ হয় মেয়ে মানুষও লইতে হইবে। ২০ জনে ৫ জন লওয়া হইয়াছে, ৬৭ জনে অন্যূন ১৮ জন ত লইতেই হইবে। ষ্টেড বলিয়াছেন, শীঘ্রই শান্তিযাত্রী দিগের অভূতপূর্ব্ব সমবায় হইবে। মার্কিণ প্রেসিডেণ্টের কাছে মার্কিণ যাত্রীদিগের সম্মান হইবে, বিলাতে মহারাণীর কাছে সম্মান হইবে, প্রধান মন্ত্রীর কাছেও খুবই সম্মান হইবে। ফরাসিরাজ্যেও প্রেসিডেণ্টের কাছে সম্মান হইবে। অন্যত্র সম্রাটদিগের কাছে হইবে। আর যাত্রাকালে চারিদিকেই বক্তৃতা হইবে। শেষে যাত্রীরা রুষরাজ্যে গিয়াই যাত্রা জমাইয়া দিবেন। সেখানে মান মর্য্যাদার ত আর কথাই থাকিবে না। তাহার পর শান্তির প্রস্তাবনা আলোচনা হইবে; শান্তির পথ প্রদর্শিত হইবে। তখন যাহা যাহা করিতে হয় সব করা হইবে। ষ্টেড সাহেবের যেমন উদ্যোগ, তেমনই অধ্যবসায়, তেমনই আগ্রহ। পূর্ব্বেই রুষ সম্রাটের সহিত দেখা করিয়াছেন, তাঁহাকে শান্তির আশাও দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু নিজের বৃটিশ ও জ্ঞাতিপুত্র মার্কিণকেই অগ্রণী করিতেছেন। শুদ্ধ পক্ষপাতেই সব পণ্ড হইবে, যাত্রার উদ্যোগেই বাধা পড়িবে। হয় ত গৌরচন্দ্রিকাতেই গান ভাঙ্গিবে, হয় ত নান্দীপাঠেই যবনিকাপতন হইবে, হয় পাত পড়িতে না পড়িতেই ফলার মাটী হইবে, হয় ত ষ্টেড ও তাঁহার সহযোগী সহযোগিনীদিগকে বাসর সাজাইয়া লজ্জা পাইতে হইবে! সংসারে যে শয়তানের আধিপত্য আছে!

শান্তিরই সজ্জা!

এই ত শান্তি-যাত্রার আয়োজন হইতেছে, শান্তিগানের সুর ভাঁজা হইতেছে, শান্তির অভিনয়ে রিহার্শাল হইতেছে। শান্তির নীতল নৃত্যে কাণ্ডারলীর "রাম দুই সাড়ে তিন"—গণিয়া ষ্টেড সাহেবের নর্ত্তক নর্ত্তকীরা তালে তালে পা ফেলিতেছেন, আর অধিকারী মহাশয়—"রিবিউ রিবিউ" দলের সূত্রধার—ষ্টেড সাহেব নিজে বেহালায় সুর ধরিয়া দিতেছেন। কিন্তু ফলে দাঁড়াইতেছে কি? শান্তির ধূয়া উঠিয়াছে দেখিয়াই, জর্ম্মণী পলটনে আর ৭৫ হাজার লোক বাড়াইয়া দিতেছেন, গোলন্দাজের দলে আর ৪৮০টা প্রকাণ্ড কামান বাড়াইয়া দিতেছেন; আমরিকার ইউনাইটেড ষ্টেটস ২৫ হাজার সরকারী পলটনে আর ৭৫ হাজার বাড়াইয়া দিতেছেন; তুরস্কের সুলতান পলটন পূর্ব্বেই বাড়াইয়াছেন, এখন আবার রণপোত বাড়াইবার জন্যে প্রাণপণে অর্থসংযোগ করিতেছেন; যিনি শান্তির মুখ্য মুখপত্র—যাঁহার প্রস্তাবেই শান্তির আয়োজন, সেই রুষ স্বয়ং যত সৈন্যকে নরহত্যার অধিকতর উপযোগী নব নব বন্দুক দিয়া আরও সবল করিতেছেন, রণপোতের জন্যে আরও অনেক টাকা ধার করিবার চেষ্টা দেখিতেছেন, আর কুত্রাপি না পাইয়া শেষে মার্কিণ রাজ্যের নিউইয়র্ক সহরেই ২৮ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা ধার করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন! বিলাতই বা উদাসীন থাকিবেন কেন? তিনি বিরাট শ্বিগ্রাসী রণপোতের সংখ্যা ক্রমশই বাড়াইয়া দিতেছেন। যাহা অন্যের পক্ষে অসাধ্য, কুবেরকুলের পক্ষে তাহা সুসাধ্য হইতেছে। সুদূর প্রশান্তপ্রদেশে জাপানও ত প্রশান্ত নহেন, নিজের পোতবল আরও বাড়াইবার জন্যে পদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ফরাসী সকলের সেরা, পোত পলটন লইয়াই মত্ত; তাঁহার নবোদ্ভাবিত 'প্রলয়-কামান দেখিয়া সকলকেই ভীত হইতে হইয়াছে। যে ফরাসী ঐ নূতন সংহারমূর্ত্তির সৃষ্টি করিয়াছেন, জনরব, রুষ—ফরাসীর বন্ধু রুষ—নিজেই তাঁহকে উৎকোচ দিয়া সেই কামানের রহস্য হস্তগত করিবার চেষ্টা দেখিতেছেন; পোতবলবৃদ্ধির তরে কিন্তু ফরাসীও প্রভূত অর্থের সংস্থান করিতেছেন। ইতালি এখনও কার্য্যারম্ভ করিতে পারেন নাই, অর্থাভাবে বিব্রত হইয়া রহিয়াছেন; কিন্তু রাজা হুম্বার্ত্ত সে দিনও রণপোতবলের বৃদ্ধিপক্ষে ইঙ্গিত করিয়াছেন। অস্ত্রিয়ার স্বর্গগৃহে বড় বিভ্রাট, গৃহযুদ্ধের ভয় বাড়িয়াছে, কিন্তু সৈন্যবৃদ্ধির পক্ষে তাঁহারও মনোযোগ রহিয়াছে। এইরূপেই ইউরোপ আমরিকায় শান্তির পথ প্রশস্ত হইতেছে! অথচ রুষসম্রাটের শান্তি-প্রস্তাবে সকলেই অনুমোদন করিতেছেন, সকলেই নবীন জারকে

বাহবা দিতেছেন! আবার শান্তিসভার জন্যে সকলেই লোক বাছিবারও উদ্যোগ করিতেছেন! এদিকে রোগ, ওদিকে ঔষধ; এদিকে কালসর্প, ওদিকে রোজা ডাকা! রাজনীতির এ মর্ম্ম পাঠক আমরা বুঝিতে পারিব না।

"নিসর্গদুর্ব্বোধমবোধবিক্লবাঃ
ক্ব ভূপতীনাঞ্চরিতং ক্ব জন্তবঃ।"

কিন্তু বৈদ্যকশাস্ত্রে দেখিয়াছি, অনেক ধাতুগত মজ্জাগত রোগই তীব্রবীর্য্য ঔষধে উত্তেজিত হইয়া পরে প্রশমিত হইয়া যায়। পুরাতন ক্ষতের ডাক্তারেরা প্রলেপে ঔষধে তেজোবৃদ্ধি করিয়া আরোগ্য করিয়া থাকেন। ভূত ছাড়িবার সময়ে ভূতাবিষ্টকে ভয়ঙ্কর উত্তেজিত হইতে দেখা যায়। ধাতুগত অশান্তিরোগেও বোধ হয় আরোগ্যের পূর্ব্বে বৃদ্ধি হইতেছে। দীপ যে, নিবিবার পূর্ব্বে একবার হুস্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে!

শান্তির অভিনয়।

রুষমন্ত্রী মুরাবীফ ত আবার শান্তির ঘোষণা করিলেন, হয় বেলজিয়মের রাজধানী ব্রসেল্‌স সহরে, ন হয় রুষ-সম্রাটের মাতুলালয়ে—দিনেমার রাজ্যের রাজধানী কোপ-হেগনে—শান্তির সভা বসিবে বলিয়া আভাস দিলেন। শেষে স্থির হইল, ওলন্দাজের হেগ-সহরেই শান্তির জলসা বসিবে; কিন্তু ওদিকে শান্তিরও ত বিচিত্র অভিনয়েও বিরাম নাই! সর্ব্বত্রই সমরসজ্জায় বাড়াবাড়ি হইতেছে! আবার বিলাতেই শান্তির গানটা জমিয়াছে ভাল বলিয়া, সেই খানেই অভিনয়ের নানারঙ্গ। যাত্রায় থিয়েটরে পর্য্যন্ত অভিনয়! বড় দিনের উৎসবে অপূর্ব্ব অভিনয় হইয়াছিল। বড় মন্ত্রী সল্‌সবেরি, উপনিবেশমন্ত্রী চেম্বার্লেন, সুদনবিজয়ী কিচেনার, ফরাসীর ড্রেফু এস্তারহেজি এবং জোলা প্রভৃতির সঙ দেওয়া হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে ভারতকেও টানা হইয়াছিল। বিলাতের প্রতিরূপ করা হইয়াছিল সিংহকে; বৃটিশরাজ যে, বৃটিশসিংহ বলিয়াই পরিচিত। ভারতের প্রতিরূপ করা হইয়াছিল বাঘকে, ভারতের বৃটিশকেই বাঘ করা হইয়াছিল; এংলোইণ্ডিয়ানই ব্যাঘ্ররূপে বিরাজ করিয়াছিলেন। খাস ভারতের—দেশী ভারতের—প্রতিরূপ করিতে হইলে যে, মেষকেই করিতে হয়। ফরাসীর প্রতিরূপ করা হইয়াছিল, কুমীরকে। কুমীর মানুষ খায় আর দয়ার বশে কাঁদে, সে শঠ-নিষ্ঠুর বলিয়াই পরিচিত। ফরাসীর উপরই ইংরেজের বিদ্বেষটা ঘোরতর হইয়াছিল, তাই তাঁহাকে কুমীরের সাজে সাজান হইয়াছিল। মার্কিণ রাজ্য বড় বড় ঈগল পক্ষীর জন্যে বিখ্যাত। বৃটিশ যেমন সিংহ বলিয়া পরিচিত, মার্কিণও সেইরূপ ঈগল বলিয়া পরিচিত হইলেন; আর তিনি যে, স্পেনের উপর ছোঁ মারিয়াছিলেন। স্পেন ষাঁড়ের যুদ্ধের জন্যে প্রসিদ্ধ, অভিনয়ে তাঁহাকে ষাঁড় করা হইয়াছিল; মার্কিণ ঈগল আসিয়া তাঁহার উপর ছোঁ মারিয়াছিলেন। রুষ চিরদিনই ভল্লুকরূপে পরিচিত, তাঁহাকে ভল্লুকসাজেই সাজান হইয়াছিল। আফরিকার যে ফাশোদার জন্যে ফরাসীর সহিত ইংরেজের বিবাদ হইয়াছিল, সেই ফাশোদাকেও অভিনয়ে পোরা হইয়াছিল। ফরাসী কুমীর ফাশোদা উদরস্থ করিতে গেল, আর অমনই বৃটিশসিংহ আসিয়া কাড়িয়া লইলেন। অভিনয়ে এইটাই হইয়াছিল প্রধান অঙ্গ, আর সব আনুষঙ্গিক। অভিনয় জমিয়াছিল খুব। সল্‌সবেরি, চেম্বার্লেন দুই জনেই হইয়াছিলেন প্রধান নায়ক। ফরাসীর কয় জনকে কেবল লঙ দিতে হইয়াছিল। গৃহবিভ্রাট লইয়াও ফরাসীকে খুব উপহাস করা হইয়াছিল; ড্রেফু এবং জোলার উপর যে, বিলাতের খুব সহানুভূতি, ইহাঁদিগের উপর ফরাসী সামরিকদিগের অত্যাচার হইয়াছে বলিয়া সহানুভূতি, কি ইহাঁদের জন্যেই ফরাসীর গৃহবিপত্তি বলিয়া সহানুভূতি, তাহার ঠিক বিশ্লেষণ করা সহজ নহে; ধরিতে হয়, দুই কারণেই সহানুভূতি। ফলতঃ অভিনয়টা জমিয়াছিল ভাল, দেশের ছেলে বুড়ো সকলেই আনন্দ করিয়াছিলেন; শান্তির বাতাস হাড়ে হাড়ে লাগিয়াছে কি না! শান্তির বাতাস বলবতী হইলে বুঝি এইরূপেই বিদ্বেষবিকাশ হইয়া থাকে! যে বিলাতে এইরূপ বিদ্বেষের বিকাশ, সেই বিলাতেই আবার শান্তির গান—শান্তির অভিযান, যাত্রা! এদিকেও অভিনয়, ওদিকেও অভিনয়! ফল যাহা হইবে, তাহা বুঝাই যাইতেছে। ইউরোপে শান্তির আদর হইবে না, আধিপত্য ত সুদূরপরাহত! আবার শান্তির জন্যে

অস্ত্রসংকোচের

প্রস্তাব হইল! রুষমন্ত্রী কাউণ্ট মুরাবীফ ঘোষণা করিলেন "কেহই সাগরনদাদিতলগামী, পোতবিদারক টর্পেডো যুদ্ধার্থ রাখিতে পাইবেন না। যাহাতে মেড়ার লড়াইয়ের মত লড়াই হয়—দুষাদুষি ঠুষাঠুষি হয় এরূপ রণপোত রাখিতে পারিবেন না। এখনকার অপেক্ষা অধিকতর সবল সতেজ যন্ত্রাদির কেহ ব্যবহার করিতে পারিবেন না। ডিনামাইটের মত যে সকল দ্রব্য বারুদের অপেক্ষা অধিকতর ভয়ঙ্কর তেজে প্রজ্বলিত হয় বা ফুটিয়া উঠে, তাহার বা তন্ময় গুলি গোলার কেহই ব্যবহার করিতে পারিবেন না। অন্যান্যরূপ নবোদ্ভাবিত যন্ত্রাদিরও কেহ প্রযোগ করিতে পারিবেন না। শান্তিসভায় এই মর্ম্মে অনেকরূপ সর্ত্ত স্থির করিয়া সকল সর্ত্তেই সকলকে আবদ্ধ হইতে হইবে।" রুষ-মন্ত্রীর এই ঘোষণায় সকলেই হাস্য করিতেছেন। মানুষ-মারার কাজে আবার চুক্তিসর্ত্ত—বিশেষতঃ এই কলিকালে! সেকালে যখন ধর্ম্মযুদ্ধ চলিত, তখন কোন বীরই নিরস্ত্র শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতেন না, হঠাৎ-বিপন্ন শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতেন না। কর্ণের রথ মাটীতে বসিয়া গিয়াছিল বলিয়া অর্জ্জুন যুদ্ধ করিতে চাহেন নাই। দশ জন তখন এক জনের সহিত যুদ্ধ করিতেন না; অভিমন্যুকে সপ্তরথী বিরিয়াছিল—মহাপাপে পাপী হইয়াছিল। তখন দ্বৈরথ যুদ্ধের নিয়ম ছিল, ইউরোপেও ছিল। তখন যোধেরা শিষ্টার গুণে—বলবীর্য্য আর শৌর্য্য সাহসের গুণেই—জয়লাভ করিতেন। এখন সকল দিকেই ব্যতিক্রম, কলির যুদ্ধ কলে হয়। সেই কল যাঁহার যত প্রবল হইবে, তাঁহারই জয়লাভে তত সুবিধা হইবে। শান্তিসভায় এই কল বল সংযত করিয়া দিবার প্রস্তাব হইলে ত কাহারই শিরোধার্য্য হইবে না। সুতরাং বিলাতের টাইম্‌সকে উপহাস করিতে দেখিয়া আমরা বিরক্ত হই নাই। আর ফলও প্রত্যক্ষ। যে সময়ে রুষ মন্ত্রী ঐরূপ ঘোষণা করিতেছিলেন, সেই সময়েই ত রুষবন্ধু ফরাসী ঐ নিষেধনীয় জলতলগামী টর্পেডোরই সংখ্যা বাড়াইতেছিলেন। "সর্ত্ত হইবার পূর্ব্বে বাড়াইয়া লও ভাই; শ্রবণা পড়িবে, এই বেলা নেবর ছেয়ে।" এই নীতিরই কি সর্ব্বত্র পালন হইতেছিল! ফলতঃ রুষ সম্রাটের শান্তিপর্ব্বে যেন দৈবই প্রতিকূল হইয়াছিলেন; বিভ্রাট যে, সকল দিকেই বাড়িতে লাগিয়াছিল। শান্তির অভিনয় সাঙ্গ হয় নাই। শান্তিসভার অধিবেশনেই কিন্তু অভিনয়ের চূড়ান্ত হইবে। অধিবেশনে ত্রুটি হইবে না, প্রতিনিধি সমাগমে ত্রুটি হইবে না, বিচার বিতর্কে ত্রুটি হইবে না, বক্তৃতা বাগ্মিতারও ত্রুটি হইবে না, ধূমধাম জাঁক জমকেরও ত্রুটি হইবে না। কিন্তু আসল কর্ম্মে ত্রুটি হইবে, শান্তির অভিনয় শেষে প্রহসনেই পর্য্যবসিত হইবে!

এখনও উৎসাহ

রহিয়াছে। কিন্তু যাঁহাদের হাতে রাজ্যভার, রাজ্যের ভাল মন্দ ভবিষ্যতে যাঁহাদিগকে দিবারাত্র দৃষ্টি রাখিতে হয়, অশান্তি শান্তির সঙ্গে যাঁহাদিগেরই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাঁহারা ত তাদৃশ উৎসাহে উৎসাহিত হইতে পারিতেছেন না; রুষসম্রাটের শান্তি-প্রস্তাবে নির্ভর করিয়া ত তাঁহারা গন্তব্যপথের কোনরূপ পরিবর্ত্তন করিতে পারিতেছেন না। যে বিলাতে, ষ্টেড সাহেব শান্তির গানে মাতিয়াছেন, অনেক পাদরি পুরোহিতকেও মাতাইয়াছেন, সেই বিলাতেরই প্রধান রাজপুরুষেরা কেবল মৌখিক সহানুভূতিপ্রদর্শনেই কর্ত্তব্যের শেষ করিয়াছেন। প্রধান রাজনীতিকেরাও শান্তির গানে মন প্রাণ ভরিয়া যোগ দিতে পারিতেছেন না। আজ যেন কন্‌সার্ব্বেটিবদিগের উপর রাজ্যের ভার আছে বলিয়া, লিবারেলেরা শান্তির যাত্রায় যোগ দিতে পারেন; কিন্তু তাঁহাদের হাতেও রাজ্যভার পড়িবে। তখন ত আবার তাঁহাদিগকেও রাজ্যরক্ষার জন্যে ব্যস্ত হইতে হইবে। শান্তির গান বিলাতে প্রথম প্রথম যেরূপ চড়া সুরে চলিয়াছিল, বরাবর ত সেরূপ চড়া সুরে থাকিল না। মুল-গায়ক ষ্টেডসাহেব সুর এখনও জমাইয়া রাখিতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহার দোহারদিগের গলা যে

অনেকটা ধরিয়া গিয়াছে। বিলাতে ৫০টা আসরে গান হইয়াছিল—৫০টা সভায় বক্তৃতা হইয়াছে। কিন্তু হুজুক যে ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে; শান্তির সভা আরত চারিদিকে হইতেছে না!

প্রণয়ে প্রাণদণ্ড।

স্কটলণ্ডের রাণী মেরীকে যে, ইংলণ্ডেশ্বরী এলিজেবেথের জন্যে কারারুদ্ধা হইয়া শেষে হত হইতে হইয়াছিল, তাহা ইতিহাসজ্ঞ পাঠকের বিদিত আছে। রাজসিংহাসনে মেরীর দাবী দাওয়া অধিক ছিল, তাঁহার ভক্ত অনুগত অনেক হইয়াছিল; এই জন্যেই ত তাঁহাকে ঘাতকের হাতে পড়িতে হইয়াছিল। অনেক গণ্যমান্য মহাবংশীয় লোকে পূর্ব্বাহ্নে মেরীর পক্ষ লইয়াছিলেন। কতকগুলি সম্ভ্রান্তবংশীয় বিদ্বান যুবককে কিন্তু বল ত বিনা পাপেই মেরীর জন্যে প্রাণ দিতে হইয়াছিল, নিষ্ঠুরভাবে হত হইতে হইয়াছিল। প্রাণবায়ু বহির্গত হইবার পূর্ব্বেই উহাঁদিগের অন্ত্রতন্ত্র বাহির করিয়া ফেলা হইয়াছিল। তৎকালে এরূপ দণ্ডের রেওয়াজও ছিল। কিন্তু সেই সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছিল, বালার্দ্দ নামে এক জেসুইট বা কাথলিক পাদরির জন্যে! সেই ত এণ্টনি বেবিংটনকে ষড়যন্ত্রে জড়াইয়াছিল। বেবিংটন মহাকুলে জন্মিয়াছিলেন, উচ্চশিক্ষায় অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার স্বভাব চরিত্র ছিল অতি সুন্দর! বন্ধুবান্ধবদিগকে প্রাণের অপেক্ষা ভাল বাসিতেন, তাঁহারাও প্রাণাধিক বেবিংটনকে কিছুতেই ছাড়িতে পারিতেন না। ষড়যন্ত্র হইয়াছিল, স্কটলণ্ডের রাণী মেরীর মঙ্গলার্থে। সঙ্কল্প হইয়াছিল, এলিজেবেথকে মারিয়া ফেলিতে হইবে! ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র! কিন্তু পরে প্রচার হইয়াছে, এলিজেবেথের কূটমন্ত্রী ওয়াল্‌সিংহামই ঐ বালার্দ্দ ক উৎসাহ দিয়াছিলেন। তাঁহারই চাতুরীর ভিতর পড়িয়া বালার্দ্দ পাপাচারের একশেষ করিয়াছিল, ষড়যন্ত্রের যত রহস্য ওয়াল্‌সিংহামকে জানাইয়াছিল। যে যে যুবক বেবিংটনের দলে যোগ দিয়াছিলেন, বালার্দ্দের সাহায্যে ওয়ালসিংহাম তাঁহাদিগের চিত্র পর্য্যন্ত হস্তগত করিয়াছিলেন। কারাগারে গিয়া উহারা মেরীর সহিত দেখা করিতেছেন, মন্ত্রণার সময়ে তাঁহার চারিদিকে দাঁড়াইয়া আছে, এরূপ চিত্রও বালার্দ্দের জন্যে ওয়ালসিংহামের হস্তগত হইয়াছিল! বালার্দ্দ বিশ্বাসঘাতকতার ত্রুটি করে নাই, সুতরাং অপরাধী ধরিতে বা অপরাধ প্রতিপন্ন করিতে কষ্ট হয় নাই। আর বেবিংটন ও তাঁহার সহযোগীরা সকলেই একবাক্যে অপরাধের স্বীকারও করিয়াছিলেন। বালার্দ্দ নিশ্চিতই উৎকোচে ক্রীত হইয়াছিল। বেবিংটন হৃদয়ের আবেগে আর বালার্দ্দের কুহকে ভুলিয়াছিলেন, মেরীর জন্যে প্রাণ দিতেও প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কিন্তু যে ষড়-

যন্ত্রে টানিয়াছে, সেই ধরাইয়া দিবে, ইহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। আর তাঁহার সমবয়স্ক বন্ধুরা শুদ্ধ তাঁহার প্রেমেই আবদ্ধ ছিলেন, তিনি যে দিকে, উহারাও সেই দিকে। ধন প্রাণ সব তুচ্ছ, আত্মীয় স্বজন আগ্রহ; বন্ধুকে তুষ্ট করাই জীবনের প্রধান কার্য্য! কেহবা আশা করিয়াছিলেন হয় ত বন্ধু বেবিংটনকে ষড়যন্ত্র হইতে বাহির করিয়া লইবেন। কেহ বা আশা করিয়াছিলেন, বেবিংটনের চৈতন্য হইলেই জাল ছিঁড়িয়া যাইবে। কেহ বা কোন ভাবনাই ভাবেন নাই, যেখানে বেবিংটন, আমিও সেই খানে। এরূপ বন্ধুত্ব—বিচিত্র বন্ধুত্ব—বিচিত্র উপাখ্যানেও বিরল! রাজার ভাবনা নাই, রাজ্যের ভাবনা নাই, স্বজনের ভাবনা নাই, নিজের ভাবনা নাই, কেবল বন্ধুত্বের উপাসনা! পরিণাম যাহাই হউক, এরূপ বন্ধুত্বের পূজা করিতে হয়! আবার যেমন বন্ধুত্ব, তেমনই মহত্ত্ব। বিচারের সময়ে সরলতার একশেষ, সকলেই সরলতার অবতার! "হাঁ রাজদ্রোহ হইয়াছে, অপরাধের দণ্ড হউক, কিন্তু হৃদয়ে কোন চিন্তাই ছিল না। কেবল বন্ধু বেবিংটনের প্রেমেই পাপে পড়িয়াছিলাম, এ পাপের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রস্তুত আছি! বন্ধু বেবিংটন যেখানে, আমিও সেইখানে, তাঁহার প্রাণদণ্ডে আমার প্রাণদণ্ড না হইলে আমার মৃত্যু-যন্ত্রণা হইবে। বন্ধুর সাহায্যার্থে প্রাণ দেওয়াই আমার পক্ষে একান্ত প্রার্থনীয়। আমার প্রাণ দিয়া বন্ধুর প্রাণ রাখিতে পাইলে কৃতার্থ হইব, আর যদি বন্ধুর প্রাণরক্ষা না হয়, তাহা হইলে আমার এ ক্ষুদ্র ছার প্রাণ ত রাখিবই না। ষড়যন্ত্র চক্রান্ত করিব, কিসে কি হইবে, তাহা একবারও ভাবি নাই। বন্ধুত্বের মোহেই মোহিত হইয়াছিলাম। এখনও সেই বন্ধুত্বের জন্যেই আত্মবলি দিতে আসিয়াছি।" প্রত্যেক মুখেই এই কথা! প্রচার, বিচারকদিগকেও—এলিজেবেথের নিষ্ঠুর বিচারকদিগকেও—করুণরসে আক্রান্ত হইতে হইয়াছিল। হইয়াছিল কিন্তু কেবল হৃদয়ে—কার্য্যে নহে! সকলেই বুঝিয়াছিলেন, বালার্দ্দই সর্ব্বনাশ করিয়াছে! বালার্দ্দকে তিরস্কার করিতেও ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু মন্ত্রী ওয়ালসিংহামের চাতুরী বোধ হয় তখন সেরূপ প্রকাশ পায় নাই, তিনিই যে মেরীর মুণ্ডপাতের জন্যে কতকগুলি নিরীহ নিষ্পাপ নির্ব্বোধ সম্ভ্রান্ত যুবককে পাপে উত্তেজিত করিয়াছিলেন, ষড়যন্ত্রে ফেলিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় তখন ততটা প্রকাশ পায় নাই। কিন্তু রাণী এলিজেবেথ জানিতে পারিয়াছিলেন। তিনি যে, স্কটলণ্ডের রাণী মেরীর যেন তেন প্রকারেণ নিপাত করিবার জন্যে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন! যাহা হউক, বিচার হইয়া গেল, প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়া গেল; প্রাণদণ্ড হইতে লাগিল; কয়েকজনের জীয়ন্তেই নাড়ীভুড়ী বাহির করিয়া ফেলা হইল। যুবকেরা কিন্তু তখনও নিষ্পাপ, বদন তখনও প্রফুল্ল! বন্ধুর জন্যে বন্ধুর সঙ্গে প্রাণ দিতেছেন! পাপের সত্য সত্যই লেশমাত্র নাই। রাজাদেশে প্রাণ গেল, ধন গেল; বিষয় সম্পত্তি সমস্তই রাজে-আপ্ত হইল! ভাবনা কেবল আশ্রিত আত্মীয় স্বজনের জন্যে, আশ্রিত প্রতিপালিত ভৃত্যগণের জন্যে, আর বড় ভাবনা উত্তমর্ণদিগের জন্যে। আশ্রিতদিগকে কে আশ্রয় দিবে? উত্তমর্ণদিগের যে, ঋণশোধ হইল না! মৃত্যুকালে মনে এই চিন্তা, মুখে এই উক্তি! তথাপি যদি পাপের অবতারণা করিতে চাও, তাহা হইলে পাঠক, তোমাকেই পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইতে হইবে! দলে ছিলেন এক টিচবোরণ। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি প্রিয়তমা পত্নীকে যেপত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা পড়িলে, হৃদয় পুলকিত হয়—হাঁ সেই করুণরসপূর্ণ পত্রেও হৃদয় পুলকিত হইতে হয়! সে সময়েও যিনি নিজের ধৈর্য্য অটল রাখিয়া পত্নীকে ধর্ম্মের উপদেশ দিতে পারেন, কর্ত্তব্যের উপদেশ দিতে পারেন, সহিষ্ণুতার উপদেশ দিতে পারেন, আশ্রিতবাৎসল্যের উপদেশ দিতে পারেন, তিনি মহাপুরুষ। পত্রে এই মহাপুরুষের মহাপুরুষত্ব প্রতিফলিত হইতেছে ছত্রে ছত্রে অক্ষরে অক্ষরে! পাঠক, পুলকিত না হইবে কেন? মহাব্যসনেও মহোৎসবের সুখ না পাইবে কেন? নিষ্পাপ টিচবোরণের মনে পাপ নাই, পাপের চিন্তা নাই, পাপের উদ্বেগ নাই, পাপের আতঙ্ক নাই! বন্ধুত্বের উপাসক—বন্ধুত্বের স্বয়ং অবতার—টিচবোরণ শুদ্ধ বন্ধুত্বের জন্যে প্রাণ দিতেছেন। পরকালে বন্ধুর সহিত মিলিবেন, প্রিয়তমা পত্নীর সহিত সমবেত হইবেন। হৃদয়ে দুঃখ নাই, খেদ নাই, কেবল আনন্দ! তিনি পুলকিত হইয়া মরিয়াছিলেন, তুমি পাঠক পুলকিত হইয়া না পড়িবে কেন? কিন্তু এরূপ বন্ধুত্ব সংসারে অদৃশ্য! আর এরূপ নিদারুণ অভিনয়ও অদৃশ্য! বলিয়াছি ত বিচিত্র উপাখ্যানেও অদৃশ্য!

পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

সুইডেনের এক কৌণ্ট কোনিংসমার্ক ছিলেন ইংলণ্ডে। সেখানে কৌণ্টেশ ওগলের রূপে মোহিত হইয়াছিলেন, তাঁহার স্বামীকে সুতরাং ইহলোক হইতে সরাইয়া দিবার জন্যে ঘাতক লাগাইয়াছিলেন। ভয়ঙ্কর লোক! পরস্ত্রীহরণে অকুণ্ঠিত, আবার তাঁহার পতির হত্যা করিয়া! বিচারে তিন ঘাতকের প্রাণদণ্ড হইল, মূল অপরাধী অব্যাহতি পাইলেন; অব্যাহতি পাইলেন বিচারকের দোষে নহে, দোভাষীর দোষে। বিচারালয়ের দোভাষী ছিলেন কাউণ্ট কোনিংসমার্কের অনুগত এবং অর্থে বশীভূত আর ঐ সুইডীশ আসামীর বিচারে দোভাষীর কথাই জজকে শিরোধার্য্য করিতে হইয়াছিল! অনেক বিচারালয়েই ত অনেক বিচারে দোভাষীর কথাই বিচারককে শিরোধার্য্য করিতে হয়। বোধ হয় দোভাষীর দোষে অনেক

সময়ে অবিচারও হয়, অনেক সময়েই বোধ হয় অপরাধী অব্যাহতি পায়, আবার নিরপরাধেরও দণ্ড হয়! বিচারে অনেক খট্‌কা! দোভাষীর দোষে কোনিংসমার্ক অব্যাহতি পাইলেন, কিন্তু ইংলণ্ডের লোকের কাছে তিনি অপরাধী হইয়া রহিলেন, সকলেরই নিন্দাভাজন হইয়া রহিলেন। ইংলণ্ডে থাকা তাঁহার পক্ষে শক্ত হইয়া উঠিল, বিশেষতঃ হত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনগণের জন্যে। তাঁহারা জাতক্রোধ হইয়া থাকিলেন, ইংলণ্ড কৌণ্টের পক্ষে বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিল। তিনি পলাইয়া আসিয়া জর্ম্মণীর হেনোবরে আশ্রয় লইলেন। তখনও হেনোবর স্বাধীন ছিল, হেনোবরের রাজপুত্র জর্জ্জ তখনও ইংলণ্ডের রাজা হন নাই, তখনও তিনি হেনোবরের যুবরাজ, তাহার পিতা রাজা। কৌণ্ট কোনিংসমার্ক চুপ করিয়া থাকিবার লোক ছিলেন না। দেখিলেন, যুবরাজ জর্জ্জ নিজের ভার্য্যায় বিরক্ত এবং অন্যান্য রমণীর প্রেমে আসক্ত। যুবরাজ-মহিষী সুন্দরী এবং যুবতী, পতির বিরাগভাজন হইয়া কালযাপন করিতেছেন। কোনিংসমার্কের দুরাশা এবং দুর্ম্মতি উত্তেজিত হইল, তিনি যুবরাজ-মহিষীর সঙ্গেই প্রেম করিতে উদ্যত হইলেন। যুবরাজ মহিষীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিলেন, তাঁহার প্রাসাদের দিকে যাওয়া আসাও করিতে থাকিলেন, আশা না পাইয়াও দুরাশায় উত্তেজিত হইলেন। মনে করিতে লাগিলেন, যুবরাজ-মহিষীও প্রেমের প্রতিদান করিতে প্রস্তুত। দুরাশ কামুকদিগের এরূপ হইয়া থাকে। আবার যুবরাজ-মহিষীরও শত্রুর অভাব ছিল না। জর্জ্জের প্রধানা প্রণয়িনী—যিনিই শেষে ডচেস মনষ্টার হইয়াছিলেন—সেই অবিদ্যা যুবরাজ-মহিষীর সর্ব্বনাশ করিবার জন্যেই ব্যস্ত ছিলেন, ক্রমাগত ছল খুঁজিতে ছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, মহিষীর সর্ব্বনাশ করিয়া নিজেই সর্ব্বময়ী হইয়া বসিবেন। যে ছল খুঁজিতেছিলেন, জর্জ্জের অবিদ্যা তাহাই হাতে পাইলেন। দেখিলেন, কৌণ্ট কোনিংসমার্ক যুবরাজ-মহিষীর দিকে যাওয়া আসা করিতেছেন। পাপিয়সী জাল ফেলিল। যুবরাজ-মহিষীর এক প্রধানা পরিচারিকাকে উৎকোচে বশীভূত করিয়া নিজের ক্রীড়াপুত্তলি করিল, তাহাকেই নিজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির যন্ত্র করিল। তাহারই আদেশে এবং উপদেশে পরিচারিকা কোনিংসমার্কের সহিত দেখা করিয়া বলিল, "যুবরাজ-মহিষী আপনার জন্যে লালায়িত, দিবারাত্র আপনার জন্যে প্রতীক্ষা করিতেছেন। আপনার রূপে তিনি পাগল হইয়াছেন। অদ্য সন্ধ্যার পর আপনি একেবারেই তাঁহার শয্যাগৃহে প্রবেশ করিবেন, আমিই পথ দেখাইয়া দিব।" জাল সফল হইল, কৌণ্ট কোনিংসমার্ক নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিলেন, অবাধে যুবরাজ-মহিষীর শয্যাগৃহে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ প্রত্যাখ্যাত হইয়া ফিরিলেন। এদিকেও সেই মুহূর্ত্তেই সেই অবিদ্যার কথায় উত্তেজিত জর্জ্জ তরবারি হস্তে মহিষীর কক্ষে প্রবেশ করিয়াছেন। অবিদ্যার মুখে শুনিয়াছিলেন, কৌণ্ট কোনিংসমার্ক মহিষীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়াছে, প্রেমালাপ করিতে গিয়াছে। দেখিলেন, তাই বটে, কৌণ্ট যুবরাজমহিষীর শয়নকক্ষ হইতে ফিরিতেছিলেন। জর্জ্জ সিদ্ধান্ত করিলেন, প্রেমালাপ হইয়া গিয়াছে, প্রত্যাখানের কথা ত আর তিনি জানিতে পারেন নাই। পতি নিজে পত্নীকে দুই চক্ষে দেখিতে পারেন না, তাঁহার মৃত্যু হইলে আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন। অথচ সেই পত্নীর সতীত্বে সন্দেহ হইলে সেই পতি ক্ষেপিয়া উঠেন! মানবহৃদয়ের বিচিত্র লীলা! এরূপ অভিনয় অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক স্থলে আবার অনেক বিরাগী পতি শুদ্ধ স্ত্রীর চরিত্রে সন্দেহ করিয়া অনুরাগী হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে স্ত্রীর পক্ষে হয় সাপে বর। আমাদের বন্ধু হরিচরণ সিংহ এক আত্মীয়কে এইরূপে—তাহার স্ত্রীর চরিত্রে তাহার সন্দেহ উত্তেজিত করিয়াই—স্ত্রীর অনুরাগী করিয়াছিলেন। হরি ভায়া নিজে সাধুপুরুষ, শুদ্ধ আত্মীয় ও আত্মীয়পত্নীর হিতের জন্যেই দিন দুই ঐ আত্মীয় পত্নীর ঘরে, বিনা পাপে—বিশুদ্ধ মনে কিন্তু গুপ্তভাবে—যেন পাপীর মত—যাওয়া আসা করিয়াছিলেন। দেখিয়াই কিন্তু আত্মীয় সাবধান হইয়াছিলেন, স্ত্রীকে নজরে নজরে রাখিয়াছিলেন। আর তাঁহাকে নজরে নজরে রাখিতে গিয়াই অবস্থায় বাধ্য হইয়া, তাঁহার প্রতি—নিজের স্ত্রীর প্রতি—পুনরাসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এরূপ হইয়া থাকে, কিন্তু জর্জ্জের পক্ষে এরূপ হইল না। তিনি স্ত্রীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিতে গিয়াই দেখিলেন, কোনিংসমার্ক ঘর হইতে বাহির হইতেছেন। প্রশ্ন নাই, কথা নাই, যেমন দেখা অমনই তরবারির আঘাত। কৌণ্ট কোনিংসমার্কেরও তৎক্ষণাৎ পতন ও মৃত্যু! যুবরাজের হস্তে হত্যা; সব চুপচুপ হইয়া গেল। স্ত্রী সরলপ্রাণা, কৌণ্ট কোনিংসমার্ক যে, কেন তাঁহার শয়নকক্ষে গিয়াছিল, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। পতিরই প্রধানা অবিদ্যা যে এত কাণ্ড করিয়াছিল, তাহা ত তিনি জানিতে পারেন নাই। নিজের পরিচারিকাই যে, কোনিংসমার্ককে ডাকিয়া আনিয়াছিল, তাহাও ত তিনি ঘুণাক্ষরে জানিতে পারেন নাই। তখন কোন রহস্যেরই প্রকাশ হয় নাই। সব লেঠা সহজেই মিটিয়া গেল। কোনিংসমার্কেরও পূর্ব্বকৃতপাপে প্রায়শ্চিত্ত হইয়া গেল! এরূপ প্রায়শ্চিত্ত অনেকের হয়। অনেক দস্যু তস্করেরও হইয়া থাকে। স্বকৃত অপরাধে দণ্ড না পাইয়া দস্যুর অনেক সময়ে পূর্ব্বকৃত অপরাধের জন্যে দণ্ড পাইয়া থাকে!

চুম্বনের স্রোত।

চুম্বনের চলনটা ইউরোপ আমরিকার সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। চুম্বন কিন্তু নানা রকমের এবং নানা রসের। আদিরসেই চুম্বনের অধিক আদর; তবে কি না, যাহা স্বকীয় স্বকীয়ায় মেড়ো পড়িয়া গিয়াছে, তাহা পরকীয় পরকীয়ায় বড়ই চকচকে ঝকঝকে। এদিকে মিড়মিড়ে, ওদিকে চিড়চিড়ে; ওদিকে সপসপে, ওদিকে দপদপে; স্থলবা অনেক স্থলেই এদিকে ঔষধগেলা, ওদিকে ক্ষীর-ভোজন; এদিকে মরামরা, ওদিকে জলজীয়ন্ত। তবে কি না, নূতনে যেমন মন পুরাতনে হয় না তেমন; সকল বিষয়েই নূতনের আদর। আর স্বকীয়ারাও ত নূতন বেলায় কতকটা পরকীয়া; গোত্রে গোত্র ডুবিয়া গেলেই পুরাতনের গন্ধ বাহির হয়। এই জন্যেই ত অভিজ্ঞ অভিজ্ঞারা বলিয়া থাকেন, যত দিন কোর্টশিপ চলে, তত দিনই আনন্দ। মাছ ধরায় ত খেলানোই আনন্দের। পাঠক, আইবড়ো ভাতে যত আনন্দ, বউ ভাতে কি তত হয়? আর সাধ হইল ত সাধ মিটিল! তথাপি আদিরসের চুম্বনে রস আছে। বাৎসল্যের চুম্বনে বাৎসল্য ভাব, আনন্দ পবিত্র; যাঁহার উপভোগ হয়, তিনিই ধন্য। ইউরোপ আমরিকায় কিন্তু বয়সে চুম্বনপথের রোধ হয় না। চুম্বনে হাস্যরস রঙ্গমঞ্চে দেখিতে পাইবে, হাস্য কিন্তু সময়ে সময়ে উপহাস্য হইয়া উঠে। আমরা ত অনেক সময়ে বীভৎসেরও অনুভব করি। বিপ্রলম্ভের চুম্বনে কেবল করুণ। প্রোষিতভর্ত্তৃকাই রসবোধ করিয়াছেন। প্রবাসী পুরুষেরও না হইয়াছে, এরূপ নহে। পিশাচ পিশাচীর চুম্বনে আর সকলের বীভৎস বটে, তাহাদের কিন্তু আদিরস হইতে পারে। রাক্ষস রাক্ষসীর বেলায় ভয়ানক। তাড়কা বা কুম্ভ-কর্ণের চুম্বনটা একবার মনে আনিলেই ত বুঝিতে পারিবে। রাবণের চুম্বনে অন্যের পক্ষে রৌদ্র রস, তাঁহার নিজের পক্ষে না হইতে পারে। ফলতঃ চুম্বনে নানারস। ইউ রোপের ভিতর আবার রুষেই কিন্তু চুম্বনের স্রোতটা বড় অধিক চলিতেছে; আবার, নৈমিত্তিক নহে নিত্য, সখের নহে পেশাদারী। পুরাতন প্রথা, অপ্রকাশে নহে প্রকাশে, সকলের সম্মুখে। পিতা পুত্রকে চুম্বন করিতে বাধ্য; নবতিবর্ষীয় পিতাও ষষ্টিবর্ষীয় পুত্রকে চুম্বন করিয়া থাকেন। সেনাপতি যত সৈনিককে চুম্বিতে বাধ্য। তাঁহাকে গোটা রেজিমেণ্টের গণ্ডে চুম্বন করিতে হয়। কিন্তু বড় সেনা-পতির বেলায় কি হয়? তাঁহার অধীনে যে শত শত রেজিমেণ্ট। শুনিয়াছি, সে ক্ষেত্রে বরাতে চলে। সেনা-পতি এক জনের গালে চুম্বন করেন, সে দশ জনকে চুম্বন করে। ঐ দশ জন আবার দশ দশ জনকে। এইরূপে চুম্বনের বিস্তৃতি হয়। কিন্তু সর্ব্বত্রই চুম্বনের আদান এস্থলেও নিশ্চিত প্রতিনিধি চলে, যত সহকারী সেনা-পতিকেই সহকারিতা করিতে হয়। সম্রাটও চুম্বনে অব্যাহতি পান না। যত সেনানীর গালে যত রাজ-পুরুষের গালে তাঁহাকে চুম্বন করিতে হয়। কাওয়াজের দিনই বাড়াবাড়ি হয়! কখনও কখনও কিন্তু সম্রাটকে বড়ই নম্র হইতে হয়, ছোট ছোট সৈনিকের ত সহজে গাল পাওয়া যায় না। আবার দীর্ঘচ্ছন্দে—পড়িলে, চুম্বককে বোধ হয় টুলের উপর দাঁড়াইতে হয়, বুকের চুম্বনে ত আর গালের পোষায় না। পল্টনের চুম্বনে প্রায়ই প্রতিনিধি চলে, সম্রাটের বেলায় ত কথাই নাই। বাড়ীর গৃহিণীকেও চুম্বনে মাতিতে হয়, উৎসবে পর্ব্বাহে যত দাসীর ত বটেই যত দাসের গালেও কর্ত্রীর চুম্বন করিতে হয়। দাসেরা যদি কুণ্ঠিত হয়, যদি কর্ত্রীর হাতেই কাজ সারিতে চায়, তাহা হইলে, তিনি নিজেই তাহার গাল টানিয়া লন। রুষে বোধ হয় চাকরের বেতন খুব অল্প। পেটে খেলে পিঠে সয়, গালে পেলে কি না হয়! চুম্বনটা স্নেহ ভাল বাসা সখ্য সদ্‌ভাবের পরিচায়ক, রুষ চুম্বনের উদ্দেশ্য ভাল। কিন্তু পাশ্চাত্য মতেও রুষচুম্বনে বাড়াবাড়ি বলিয়া ধরা হয়। আর অমৃতও শস্তা হইলে আদৃত হয় না। পেনেটীর রামচাকীতেও, শস্তা হইলে, অরুচি ধরে। জনাইয়ের মনোহরা মহার্ঘ বলিয়াই ত তত মনোহরা। পয়সা-জোড়া ইলিশ মাছের কেবল ডিম খাইতেও যে, প্রবৃত্তি হয় না। সেনাও শস্তা হইলে পিতল হইত, শস্তা হীরা পাথুরে কয়লা। কৃষ্ণপক্ষ না থাকিলে চন্দ্রিকার আদর হইত না। অভাব না হইলে, আকাংক্ষা থাকিত না। পরিশ্রম না হইলে ত আর বিশ্রাম হয় না। যাহার জন্য প্রয়াস পাইতে হয়, তাহার লাভেই ত আনন্দ হয়। চুম্বনেরও মূল্য, দুর্ল্লভ বলিয়া। রুষের বাজারে তাহার মূল্য নাই। স্বকীয়ার হাটে হয়ত খরিদদারই জুটে না। পরকীয়ার বাজারে কিরূপ দর, রুষের অভিজ্ঞেরাই তাহা বলিতে পারেন। বিলাতের হইলে না হয় সেখানকার ফেরত বন্ধুবান্ধব-দিগকে জিজ্ঞাসা করিতাম। ষ্টেটসমাবের ইয়ার-বুকে সব কথা আছে, এ কথা নাই। ইয়র বুকের কর্ত্তাটী যে, বড়ই বদ্ ইয়ার। নামটী তাঁহার কেলটি, আসল কাজে ফেলটি। রুষের স্কুলকলেজে ত কথাই নাই, বোধ হয় মেয়ে-স্কুলেও চুম্বন চলে। কিন্তু চুম্বন-চর্চ্চা সাঙ্গ হলো, কেবল শোনা বলিয়া খেদটী রলো।

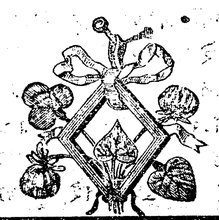

জন্মভূমি।

নবম ভাগ। { ফাল্গুন। ১৩০৫। { ৩য় সংখ্যা।

শর্করা-সন্দেশ।

প্রবন্ধের শিরোবন্ধে যে সন্দেশের উল্লেখ করিলাম; মিষ্টান্ন-সন্দেশেরও নামকরণ হইয়াছে, সেই সন্দেশের জন্যে। সন্দেশ অর্থে সংবাদ, সমাচার, খবর। প্রিয়জনের খবর লইতে হইলে, লোকহস্তে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন পাঠাইতে হইত; সন্দেশের অর্থাৎ সংবাদের মিষ্টান্ন বলিয়া, তাই সেই মিষ্টান্ন,—সন্দেশ নামে অভিহিত হইত। খবরের সংস্রব না থাকিলেও কিন্তু এখন মিষ্টান্ন সন্দেশ। মিষ্টান্নের সাধারণ নাম সন্দেশ বলিয়া, এখনও পাটালি-সন্দেশে আর ছানার সন্দেশে প্রভেদ করা হয়। সহর অঞ্চলের লোকে এ প্রভেদের ভেদজ্ঞ না হইতে পারেন, মফস্বলের পাঠক সন্দেশের ভেদজ্ঞ। শর্করা না হইলে সন্দেশ হয় না, কোনরূপ মিষ্টান্নই বিনা শর্করায় প্রস্তুত হয় না; যত দেব-দুর্ল্লভ খাদ্যেই শর্করার প্রয়োজন। কেবল দুগ্ধে বর্‌ফি হয় না, কেবল ছানায় গোল্লা রসগোল্লা হয় না। রসের জন্যেই গোল্লা; রসগোল্লা—সে রসের উপাদান শর্করা। যেমন লবণ বিনা ব্যঞ্জন হয় না, সেইরূপ শর্করা বিনাও মিষ্টান্ন হয় না। শর্করাকে মিষ্টান্নের লবণ বলিলেও বলিতে পার; শর্করা অমৃত ব্যঞ্জনের লবণ। হিন্দুর উৎকৃষ্ট খাদ্য মিষ্টান্ন; সন্দেশ, মিঠাই, মতিচুর, খাজা, গজা, ছানাবড়া, রসগোল্লা, সীতা-ভোগ প্রভৃতি সমস্ত সুধাময় খাদ্যেই শর্করার প্রয়োজন; পায়স পিষ্টকাদিও বিনা শর্করায় প্রস্তুত হয় না। শর্করা দেবতাদেরও প্রিয়, শর্করা দেবলোকের ভোগ্য। আবার উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জনেও শর্করা মিশাইতে হয়; পোলাও, কালিয়ায় চিনি দিতে হয়। আমাদিগের প্রায় তাবৎপ্রকার ব্যঞ্জনেই চিনি না দিলে চলে না; চিনির অভাবে গুড়। গুড়ই ত শর্করার মূল। গাদ কাটিলেই, গুড়—চিনি।

প্রায় সকল উদ্ভিজ্জে ও সকল ফলেই চিনি পাওয়া যায়। মাংসেও চিনি আছে, শর্করা জীবদেহের একটা প্রধান উপাদান; আধিক্যে রোগ হয়, আবার অভাবেও রোগ হয়। শর্করার শ্রেষ্ঠতা এবং উপযোগিতা সর্ব্ববাদি-সম্মত। যেমন কাব্যরসের মধ্যে আদিরস, সেইরূপ খাদ্যরসের মধ্যে মধুররস। মধুও মধুর রসের আধার বটে, কিন্তু মধুও ত শর্করার রস। মধু জমিলে মিছরি হয়, মিছরি ত শর্করারই প্রকারভেদ; শর্করোপল-শর্করা,—রত্নের হীরা!

ইক্ষু, খর্জ্জুর এবং তালের রসে গুড় হয়; গুড়ে চিনি হয়। ইউরোপে বীটপালনের রসে চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে। আমরিকায় মেপল বা শর্করা-বৃক্ষ নামে এক প্রকার বৃক্ষ আছে; তাহার রসে প্রচুর শর্করা প্রস্তুত হয়। গোল আলু হইতেও শর্করা প্রস্তুত হইতেছে।

ইক্ষু নানাবিধ। পূর্ব্বে এদেশে বোম্বাই আখেরই আদর ছিল। মোটা মোটা রাঙা রাঙা লম্বা লম্বা নরম নরম বোম্বাই আখের রেওয়াজ উঠিয়া গিয়াছে ত্রিশ বত্রিশ বৎসর। আমরা কিন্তু এখনও তাহার তার ভুলিতে পারি নাই। একবার সকল স্থানের বোম্বাই আখেই পোকা ধরিয়াছিল, তাহার পরই এখনকার শামসাড়ার চলন হই-য়াছিল। শামসাড়াও লম্বা লম্বা, কতকটা মোটা মোটাও বটে, কিন্তু রাঙা রাঙা নহে, বরং জরদা গোছের। আর শামসাড়া বোম্বাই অপেক্ষা শক্ত। চীনের আখের এদেশে বড় চলন নহে, প্রণালী প্রদেশে—সিঙ্গাপুর অঞ্চলেই—চীনের চলন। কাজুলী আখের চিনিই কিন্তু সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং সর্ব্বাপেক্ষা উপকারী। আমরিকায় এবং আমরিকার যত দ্বীপে এখনও কাজুলীর আদর। কাজুলী আখের মিছ-রীই রোগের পথ্য। মেদিনীপুর জেলার নোয়াদা অঞ্চলে পূর্ব্বে প্রচুর মিছরী প্রস্তুত হইত। কলের মিছরীর জন্য নোয়াদার মিছরীর আদর কমিয়াছে; কিন্তু এখনও সে মিছরীর মত মিছরী নাই; তাহার সোঁটও সাক্ষাৎ অমৃতরস! কাজুলী আখেরবর্ণ কৃষ্ণাভ, পাব ছোট ছোট, অথচ শক্ত। কিন্তু রসটা অধিক গৌড়। ইক্ষুর গুড় এবং শর্করা আমাদের দেশে রহিয়াছে মান্ধাতার আমল হইতে, চরক সুশ্রুতেও শর্করার দর্শন পাওয়া যায়। খণ্ড মোদকাদি সত্যযুগেও ছিল। ইউরোপে পূর্ব্বে চিনির চলন ছিল না, মধুর রস মধুতেই পর্য্যবসিত হইত। সুতরাং ইউরোপীয়দিগের পক্ষে

মিষ্টান্ন অপ্রাপ্য অদৃশ্য ছিল। ভারত হইতেই ইক্ষু ইউরোপে গিয়াছে। ১১৪৮ খৃষ্টাব্দেই প্রথমে সাইপ্রস ও সিসিলি দ্বীপে ইক্ষুর যাত্রা হইয়াছিল। সিসিলি দ্বীপে ১১৬৬ সালে আখমাড়া গণ্ডী-গাছের আবির্ভাব হইয়াছিল, সিসিলির রাজা দ্বিতীয় উইলিয়ম দেবভোগ্য ইক্ষুরসের জন্যে এক মঠে গণ্ডীগাছ বসাইয়া দিয়াছিলেন।

আরবেরাই ভারত হইতে ইক্ষু ও চিনি লইয়া গিয়াছিলেন। ইউরোপের খৃষ্টানেরা খৃষ্ট-মথুরা—জেরুজেলমে যুদ্ধ করিতে আসিয়া, আরবদিগের কাছেই চিনির ব্যবহার শিখিয়াছিলেন। ক্রুসেদের ধর্ম্মযুদ্ধেই তাঁহাদিগের অমৃত-চূর্ণের লাভ হইয়াছিল। ইক্ষু সিসিলি হইতে আফরিকায় আসিয়াছিল; স্পেনীয় এবং পর্ত্তুগীজদিগের জন্যেই আফরিকায় ইক্ষু এবং শর্করার পত্তন হইয়াছিল। ১৪২০ খৃষ্টাব্দে পর্তুগালের প্রতিনিধি রাজা ডোম হেনরিই সিসিলির ইক্ষু মদীরা দ্বীপে পাঠাইয়াছিলেন। মদীরায় গণ্ডী গাছেরও চলন হইয়াছিল, সেখানে চিনির ধূম লাগিয়াছিল। মদীরা হইতে কেনারী দ্বীপে ইক্ষু ও চিনির প্রয়াণ হইয়াছিল। কলম্বসের জন্যে আমরিকার আবিষ্কার হইলে পর, হয় মদীরা না হয় আফরিকার অঙ্গোলা হইতেই, ইক্ষু দক্ষিণ আমরিকার ব্রেজীলে গিয়াছিল। ব্রেজীল হইতে বার্ব্বাদো যাত্রা করিয়াছিল, ক্রমে ক্রমে চারিদিকেই বিস্তৃত হইয়াছিল। যত পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ঐ সময়েই ইক্ষুর চলন ও চাষ হইয়াছিল। কথিত আছে, কলম্বস নিজেই হেত্তিদ্বীপে ইক্ষু লইয়া গিয়াছিলেন। তাহা হইলে, কলম্বসই মার্কিণ ইক্ষুর প্রথম পত্তন করিয়াছিলেন। কলম্বসের মার্কিণ-যাত্রাকে সুতরাং শর্করায়ণ বলিয়া জাহির করা উচিত। হনূমানের জন্য আমায়ন হইয়াছে, কলম্বসের জন্য আমেরিকায় শর্করায়ণ হইয়াছে।

যখন শর্করা আরব হইয়া, সিসিলি সাইপ্রস দিয়া, আফ্রিকায় আসিয়াছিল, তখনও "সুসভ্য" ইংরেজ চিনিকে চিনিতে পারেন নাই; যখন আফরিকা হইতে আমরিকায় গিয়াছিল, তখনও ইংরেজ শর্করা-সুধায় বঞ্চিত ছিলেন। তিনি প্রথমে চিনির মুখ দেখিয়াছিলেন ১৫৬৩ খৃষ্টাব্দে, এডমিরাল হকিন্স যে, ঐ সময়েই একটু চিনি লইয়া গিয়া বিলাতে হাজির করিয়াছিলেন! হকিন্সকে বিলাতী শর্করায়ণের হনূমান বলিলে দোষ হয় না। কিন্তু চিনির কথা আর এখানে না কহিয়া, অগ্রে ইক্ষুর কথাই দুই এক কথায় কহিয়া দিই।

ইক্ষু সচরাচর দৈর্ঘ্যে ৮ ফুটের কম হয় না, আর প্রায়ই ২০ ফুটের অধিক হয় না। মরীচাদি দ্বীপে আরও দীর্ঘ হয় বটে, কিন্তু সর্ব্বদা নহে—সর্ব্বত্র নহে। এখন ইক্ষু পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। ৫ হাজার ফুট উচ্চ পর্ব্বতেও যে, এখন ইক্ষুর সুন্দর চাষ হইয়া থাকে।

ইক্ষুরও ফুল হয়, ফুল হয়। আখের ফুলে পূর্ব্বে গাছ হইত, এখন হয় না। পূর্ব্বে কলার বীজেও গাছ হইত। উদ্ভিজ্জতত্ত্বের ধর্ম্মই হইতেছে, যার গাছ, গেঁড়ো বা শিকড়েই পুরুষানুক্রমে চারা করা হয়, তার বীজ ক্রমে ব্যর্থ হইয়া পড়ে। ইক্ষুর বীজ তাই ক্রমে ব্যর্থ হইয়া পড়িয়াছে, কলার বীজেও ঐ দশা হইয়াছে। বীচেকলা রহিয়াছে, কিন্তু তাহার বীচিতে গাছ করা হয় না! আখের বীচিতেও এখন আর গাছ হয় না। জাত্যংশে ইক্ষুও ঘাস, ধান্যাদির মত। ইহার বীজও দেধানের ন্যায়; দেধানের গাছও ত কতকটা ইক্ষুর মত। কবি গাহিয়াছেন,—"কি সুখ হতো, যদি চন্দনে ফুল হইত, ইক্ষুতে ফল ফলিত।" ফলত ফলে; কিন্তু আখের গাছে গোল্লার মত ফল ফলে না বলিয়াই, কবি খেদ করিয়াছিলেন। রসময়ী রসগোল্লা ফলে না বলিয়াই, কবি মর্ম্মব্যথা পাইয়াছিলেন। ইক্ষুবৃক্ষে আঙ্গুর ফল হইলেই বোধ হয়, তাঁহার খেদ মিটিত। আঙ্গুরই ত পানুতুয়া-ফল। আমাদের দেশের আখে কদাচ কখনও ফুল হয়, বীজ হয়। আমরিকার প্রায় সকল আখেই কিন্তু ফুল হয়, বীজ হয়। আমরিকার অনেক স্থলেই আখের তিন চারি ফসল হইয়া থাকে; কেনারী মদীরা প্রভৃতি দ্বীপেও এই নিয়ম। যে ইক্ষুর বয়স অধিক হয়, তাহাতেই ফুল ফল দেখা দেয়।

আমাদের দেশে শামসাড়া আখে গুড় অধিক হয় বলিয়াই, তাহার আদর অধিক; কিন্তু সিঙ্গাপুর অঞ্চলে যে চীনের আখ হয়, তাহার মত গুড় শামসাড়ায়ও হয় না। চীনের আখে প্রত্যেক বিঘায় ৩২ মন গুড় হয়। কোন কোন জমিতে আরও অধিক। ৩২ মণ গুড়ে ২৪ মণ চিনি হয়।

ইউরোপ আমরিকা প্রভৃতি দেশে কলেই আখমাড়া হয়; কলেই গুড় হয়; কলেই চিনি হয়; চিনির শোধন হয় কলে; দানা বাঁধা হয় কলে; চিনিকে কাচের মত করা হয় কলে। আমাদের দেশেও কল হইয়াছে, কিন্তু গণ্ডী-গাছ এখনও আছে। আর নানারূপ যে, লোহার যন্ত্র হইয়াছে, তাও ত গণ্ডী-গাছেরই ধরণে। অনেক স্থলে বলদ দিয়া আখমাড়ান হইয়া থাকে, ঘোড়াও বলদের কাজ করিতে পারে।

খেজুর গাছে ঘড়া দিয়া রস লইতে হয়। যশোহর জেলায় চাঁদপুর অঞ্চলের বড় বড় কারখানার জন্যে বড় বড় খেজুর বাগান আছে। রস হয় প্রচুর, চিনি মিছরীও হয় প্রচুর। তালের তাড়ী কাটিতে হয় যেরূপে, তালের রসও লইতে হয় সেইরূপে। আমাদের দক্ষিণাঞ্চলে তালের গুড় প্রচুর, তালের চিনিও অপ্রচুর নহে। তালের মিছরী বড়ই সুপথ্য। খেজুর ও তাল গাছের গুঁড়ি চিরিয়া দিতে হয় না। আমরিকায় মেপল গাছের কিন্তু গুঁড়ি চিরিয়া দিতে হয়; সেই চেরা দিয়া রস বাহির হইয়া গাছের গায়ে লাগিয়া থাকে। চাঁছিয়া লইলেই গুড়; আবার সেই গুড়েই চিনি।

সুবিধার একশেষ! মেপল গাছ বনে হয়, চাষে গাছের উন্নতি হইয়াছে। বীটচিনির কথা আর কহিতে হইবে কেন? বাবুরা যে কাচকুচির মত বিলাতী চিনি না হইলে, রসনায় দেন না, দুধে ফেলেন না, চায় ঢালেন না, যার রসে এখন সন্দেশ ধপধপে, বাতাসা ধপধপে, যাহাকে রসে পরিণত করিতে আর কষ্ট পাইতে হয় না, জল ঢালিয়া জ্বাল দিলেই হইল, সেই জাহাজী চিনির অধিকাংশই বীটপালনে প্রস্তুত হয়। বীটপালন বড় মিষ্ট, মোটা মোটা গোড়াগুলা যেমন রাঙা আলু। বীটের ঐ মূলে চিনি হইতেছে। বীটচিনির ফরাসীর দেশেই প্রথম উৎপত্তি। ফরাসিবিপ্লবের সময়ে মার্কিণ চিনির ফরাসিরাজ্যে গতিরোধ হইয়াছিল, আমাদের ভারত প্রভৃতি হইতেও চিনি যাইতে পাইত না। নেপোলীয়নই বীট হইতে চিনি বাহির করাইয়া স্বদেশের শর্করাভাব পূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার দৃষ্টি ছিল সকল দিকে। সেই অবধিই ফরাসিরাজ্যে বীটের চিনি চলিয়া আসিতেছে। এখন জর্ম্মণরাজ্যেও ভারি ধূম, হলন্দ বেলজিয়মেও কম নহে; অস্ট্রিয়াও ফেলা যান না। বীটের চিনি হইতেছে প্রচুর, হয়ও প্রচুর, এক বিঘা জমিতে পাঁচ টন বীট সচরাচর হইয়া থাকে। সুতরাং চিনি হইতেছে অপর্য্যাপ্ত! বীটের চিনি জ্বাল দিয়া প্রস্তুত করিলে চলে, পালো বাহির করার মত প্রণালীও না চলে এমন নহে। কলবল বীটের স্বতন্ত্র প্রকার। গোল আলু হইতেও চিনি বাহির করা হইয়া থাকে, কিন্তু বীটের দৌরাত্ম্যে আলুর পসার কমিয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বে কলের চিনিতে গরু বাছুরের রক্ত ঢালিয়া দিয়া গাদ কাটা হইত, হাঁস মুরগির ডিমও দিতে হইত। হাউয়ার্ড সাহেবের গাদ-কাটা কল প্রস্তুত হইবার পর রক্ত ডিম্বাদির ব্যবহার প্রায় রহিত হইয়া গিয়াছে। রক্ত ডিমে যে চিনির গাদ কাটা হয়, তাহা মধ্যে মধ্যে পচিয়া যায়, এই জন্যেই রক্ত ডিম্বাদি রহিত হইয়াছে। কিন্তু হাড়ের কয়লার রেওয়াজ বাড়িয়াছে। কাঠের কয়লাতেও কাজ হইতে পারে, কিন্তু হাড়ের কয়লায় বড় সুবিধা। হাড়ের কয়লায় গাদ ঝাঁ করিয়া কাটিয়া যায়; এই জন্যেই এখন যত কলেই হাড়ের কয়লার চলন হইয়াছে। মড়ার হাড়, গরুর হাড়, শূকরের হাড়, সকল হাড়েরই ব্যবহার হইতেছে। ফ্রান্স, জর্ম্মণী, বেলজিয়ম, হলন্দ, অস্ট্রিয়া আমরিকা প্রভৃতি দেশ হইতে যত চিনি আসে, সমস্তেরই গাদ কাটা হয় হাড়-পোড়ায়। যাঁহারা খান, তাঁহাদেরও পরকাল পোড়ে! লোফ-সুগার, ক্রিষ্টাল-সুগার বা কাচবৎ চিনি, ক্রষ্ট-সুগার বা চূর্ণচিনি, সমস্তই হাড়ের কয়লায় সাফ হইয়া থাকে।

আমাদের দেশী চিনির কিন্তু স্বতন্ত্র প্রণালী, পুকুরের পাটা শেওলায় চিনি সাফ হয়; গাদ কাটিবার উপাদান

[illegible]

চলে, তখন অখাদ্য অস্পৃশ্য উপাদানের ব্যবহারই বা করিতে হইবে কেন? কিন্তু বলি কাকে আর শুনেই বা কে? বাবুরা জানেন সব, শুনেন সব, তথাপি লোফ সুগার, ক্রিষ্টাল সুগার না হইলে রসনা তৃপ্তি করিতে পারেন না। নিদানপক্ষে ক্রষ্ট; তবুও ত বিলাতী—তবুও ত জাহাজে আসিয়াছে! জাহাজী চিনির জন্যে আমাদের দেশী চিনি যাইতে বসিয়াছে, আমাদের শর্করা-শিল্পের দিন দিন অবনতি হইতেছে, এ ভাবনা যেন নাই ভাবিলেন; দেশহিতৈষী বাবুরা যেন স্বদেশের ভাবনা নাই ভাবিলেন; মড়ার হাড় গরুর হাড় প্রভৃতি হাড়ের ভাবনাটাও ত তাঁহাদের ভাবা উচিত। হাড়ভক্ত বাবুদের ভাবগতি দেখিলে যে, হিন্দুর হাড় কালী হইয়া যায়! তথাপি যে, চিনির কথা কহিতেছি, তাহা মন বুঝে না বলিয়া। চিকিৎসায় যে, বৈদ্যের হতাশ হইতে নাই। চিনির কথা আরও দুই তিন প্রবন্ধে কহিব, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশা। আর দেশের বাবুরা উদাসীন বলিয়া ত আমাদের গবর্ণমেণ্ট উদাসীন নহেন। এই জন্যেই আমরা এখনও একেবারে হতাশ হইতে পারিতেছি না!

চোরবিদ্যা বড়বিদ্যা।

কলিকাতা রাজধানী, বিদ্যার বড় আড্ডা, ব্যবসায় বাণিজ্যের বড় আড্ডা, ধনসম্পত্তির বড় আড্ডা, বড় বাজার কলিকাতায়, বড় বড় দোকান কলিকাতায়, কলিকাতায় বড় বড় কারখানা, বড় বড় আপিশ কলিকাতায়, বড় আদালত কলিকাতায়, বড় লাটের বাড়ী কলিকাতায়, বড় লাটের বড় গির্জ্জা কলিকাতায়, উইলসনের বড় হোটেল কলিকাতায়, ব্রাহ্মসমাজের বড় মন্দির কলিকাতায়, বড় বড় কলেজ স্কুল কলিকাতায়, সবই কলিকাতায়। চুরিবিদ্যাও ত বিদ্যা; চুরি-বিদ্যার কলেজ না থাকুক, কলিকাতায় স্কুল আছে। কলিকাতায় চিকিৎসার কলেজ আছে, আইনের কলেজ আছে; চুরির যখন স্কুল আছে, তখন কলেজও হইবে। আর এখনও বোধ হয় স্কুলেই কলেজ-কেলাস আছে। মদের দোকান কলিকাতার চারিদিকে, গাঁজার আড্ডাও অনেক আছে, গাঁজার দোকান ত মোড়ে মোড়ে। গুলির আড্ডা আছে, কিন্তু পুরাতনগুলা উঠিয়া গিয়াছে; এখন আড্ডা নাই—কলব আছে। ইট বাহির-করা ভাঙ্গা ঘরে কলসীর কানায় বসান থেলো হুকা চতুর্দ্দিকে বিরাজ করিতেছে, ছেঁড়া চেটায় বসিয়া যত চক্ষু-বসা হাত-পা-সরু ময়লা-কাপড়-পরা গুলিখোর চক্ষু মুদিয়া ধূম পান করিতেছে। কাহারও সম্মুখে খানকতক

[illegible]

একটু গুড়; যাহার ভাগ্য প্রসন্ন, তাহার সম্মুখে না হয় একটু সর বা একটু ক্ষীর, কাহার বা দুইটা রসগোল্লা। ঘরের মাঝে পরদা ফেলা, ক্ষীর রসগোল্লার দল পরদার আড়ালে। সেখানে যে, ভদ্র গুলিখোরের বৈঠক। পরদার বাহিরে যত ছোটলোক গুলিখোর। হিন্দু আছে, মুসলমান আছে, এক আধজন ফিরিঙ্গিও আছে। পল্লীভেদে—জাতিভেদ। কোথাও কোথাও দুই একটী স্ত্রীলোকও বিরাজ করিতেছে। পূর্ব্বে এইরূপই ছিল, আর এই সকল চিহ্নেই গুলির আড্ডা নিজের পরিচয় দিত। বিলাতী প্রতিবাদে—এখানকারও পাদরি সাহেবদিগের আন্দোলনে—আবকারী কমিশন বসিয়াছিল। তাহার পরেই গুলির আড্ডা উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু গুলি উঠে নাই। আড্ডা উঠিয়াছে, স্থানে স্থানে কলব বা গুলির বৈঠক হইয়াছে। তোড়যোড় মেরু জাসু প্রভৃতি সবই আছে। কেবল সে ভাঙ্গা ঘর নাই; ভাঙ্গাঘরে সাইনবোর্ড নাই। সাইনবোর্ডে "সরকারের অনুমতিক্রমে খুজরা বা খরচা মদত বিক্রী করিতেছি" এ কথা গুলা নাই। রাস্তার ধারের দরজায় সে ছেঁড়া চটের পরদা নাই, চটের অভাবে যে ছেঁড়া মাদুর ঝুলিত, তাহাও আর দেখা যায় না। চণ্ডু গুলির দাদা, তাহার আড্ডাও কলবে পরিণত হইয়াছে। চীনাপাড়ায় চণ্ডুর পসার। কিন্তু বাঙ্গালিরাও উপাসনা সুরু করিয়াছে অনেক দিন। সহরের এখানে ওখানে তাড়িখানাও আছে; যেখানে ভাড়াটে গাড়ীর বড় আড্ডা, তাড়িখানা প্রায় সেই খানেই বসে। গাড়ী ও তাড়ীর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; দেখিয়াছি, ভদ্র লোকের ছেলেও গাড়ীর কারবার করিলে তাড়ী চালাইয়া থাকে। নেশাবিদ্যাটা চুরিবিদ্যারই সহচরী। নেশার ভিতর আবার গুলিরই আদর অধিক; কেন না, চুরিবিদ্যাটা গুলির নেশারই অনুকূলা। অথবা গুলির নেশাই চুরির অনুকূলা। গাঁজাও কতক কতক। মদ ডাকাতীর সহচর এবং সহায়, চুরির নহে। আমরা কহিতেছি চুরিবিদ্যার কথা। বেশ্যাও চুরিবিদ্যার সঙ্গিনী; এটা অবিদ্যা, ওটা বিদ্যা। যেমন অলক্ষ্মী লক্ষ্মীর সহোদরা, অবিদ্যাও সেইরূপ চুরি বিদ্যার সহোদরা। নেশা—চুরির নিত্য সহচরী এবং সহকরী, বেশ্যাও নেশার সহচরী। "যে দুই পদার্থ অন্য এক পদার্থের সমান, সে দুই পদার্থও পরস্পর সমান" জ্যামিতির এই সূত্র অনুসারেও বেশ্যা চুরির সহচরী। কিন্তু সকল বেশ্যাকে এক পর্য্যায়ে ফেলা চলে না, লাইবেলের ভয় আছে ত। অবস্থাভেদে ভেদ করিতে হয়। পাড়া ভেদে অবস্থা ভেদ, অথবা অবস্থা-ভেদেই পাড়াভেদ। শ্রেণীবিভাগও আছে। যথা;—সোনাগাছী প্রথম শ্রেণী। রূপাগাছীর নূতন পত্তন হইয়াছে, সোনাগাছীর সহিত প্রতিযোগিতা করিতে চায়; কিন্তু এখনও দ্বিতীয় শ্রেণীতে আছে। যদি নিতান্তই দ্বিতীয় বলিতে না চাও, তাহা হইলেও খাস প্রথম শ্রেণীর ভিতর রূপাগাছী শ্রেণীর "ক" বিভাগে ফেলিয়া, রূপাগাছীকে "খ" বিভাগেই ফেলিতে হইবে। ইংরেজিনবীশেরা না হয় "এ" সেকৃশন আর "বি" সেকৃশন বলিয়া প্রভেদ করিবেন। সোনা রূপার তারতম্য করিতেই হইবে। এক ত স্বর্ণের জন্যেই স্বর্ণগাছীর এখনও আদর, তাহার উপর বাঁটার হাঙ্গামায় এখন যে, রূপো শস্তার দুরবস্থায় পড়িয়া গিয়াছে। আবার গবরমেণ্ট রূপাকে আরও শস্তা করিয়া তাহার দফা রফা করিয়াছেন। কাজেই রূপাগাছীকে খাট হইয়া থাকিতেই হইতেছে। মেছোবাজার পূর্ব্বে দ্বিতীয় শ্রেণীতেই ছিল, এখন তাহাকে ইণ্টারমিডীয়েট হইতে হইয়াছে। হাড়কাটাই এখনকার তৃতীয় শ্রেণী। বীডন ষ্ট্রীটকে রূপাগাছীরই শাখা বলিয়া ধরিতে হয়। থিয়েটারের গৌরবে তাহার গৌরব বাড়িয়াছে। যেমন বীডনষ্ট্রীট রূপাগাছীর শাখা, সেইরূপ বটতলা সোনাগাছীর শাখা। নিতান্ত ছোট খাট গুলার আর নাম করিব না। কিন্তু চুরিবিদ্যার সহচরীদিগের অবস্থিতি ঐ সকল ছোট স্থানেই অধিক। আর শিক্ষানবীশদিগেরও আশ্রয়স্থান ঐ সকল অঞ্চলে।

প্রায় চৌদ্দ বৎসরের কথা, ঠন্‌ঠনের চৌমাথার একটু উত্তরে রাস্তার পশ্চিমধারে একটা কদমগাছের তলায় একটা ঘরের রোয়াকে প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত দুই জন লোক বসিয়া থাকিত; যে ঘরের রোয়াকে উহারা বসিত সেই ঘরে একটী ছাপাখানা ছিল, একখানি সংবাদপত্র ছিল। সুতরাং আমাদিগেরও যাওয়া আসা এবং বসা দাঁড়ানো ছিল। দেখিতাম, দুইটী লোক বসিয়া সারা দিন মঙ্গলপাঠান না হয় বাঘবন্দী খেলিতেছে। একস্থানে প্রত্যহ এইরূপ অভিনয় হইতেছে, দেখিলে, সকলেরই সোদকে দৃষ্টি পড়ে; আমাদের অন্ততঃ পড়িয়াছিল। দেখিয়াছিলাম, লোক দুই জন বটে। কিন্তু যে দুই জন প্রাতে আরম্ভ করিত, সেই দুই জনই বরাবরই থাকিত না; মধ্যে মধ্যে বদল হইত। প্রথম প্রথম এটা দেখিতে পাই নাই অর্থাৎ দেখিয়াও বুঝিতে পারি নাই; ততটা খেয়াল করি নাই। মাসখানেকের পরে তবে খেয়াল হইয়াছিল, আরও দিন পনর পরে সন্দেহ হইয়াছিল। কাজেই সন্দেহভঞ্জনের বাসনাও ক্রমে বলবতী হইয়াছিল। তখন বয়স কম ছিল, যৌবনসুলভ ঔৎসুক্যের জের তখনও মিটে নাই। আর সঙ্গীদের বয়স আরও কাঁচা ছিল। সুতরাং ঔৎসুক্যনিবৃত্তিও করিতেই হইয়াছিল।

রহস্যভেদে একটু বেগ পাইতে হইয়াছিল; জিজ্ঞাসায় প্রথমে সাফ উত্তর পাই নাই। শেষে যখন তাড়াইয়া দিবার ভয় দেখাইয়াছিলাম, তখন অভিনেতাদের কাছে প্রকৃত রহস্য জানিতে পারিয়াছিলাম। কিন্তু আমরা গুপ্তরহস্য ব্যক্ত করিব না, এরূপ আশা দিয়াছিলাম—বল ত একপ্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তবে প্রকৃত রহস্য জানিতে পারিয়াছিলাম। প্রশ্নোত্তরচ্ছলে কথা বাড়াইব না, নাটক

রাখি না; সংক্ষেপেই কাজ সারিব। উহারা বলিল, "বাবু আপনারা আশ্রয়দাতা, ইচ্ছা করিলেই আমাদিগকে এস্থান হইতে তাড়াইয়া দিতে পারেন, সুতরাং মিথ্যা কথা কহিব না। আমরা কাজের জন্যেই এখানে বসিয়া থাকি। দেখিয়াছেন, মধ্যে মধ্যে আমাদের পাহারা বদল হয়। এখানে বসিয়া আমরা শীকারের সন্ধান লই, আর পুলীশের দিকেও নজর রাখি। পুলীশের সকলকে ভয় করিতে হয় না, অনেকের সঙ্গেই আমাদের ভাব প্রণয় আছে, দহরম মহরম আছে, বাধ্য বাধকতা আছে; নূতন লোককেই ভয় করি। আর কখনও কখনও পুলীশের বড় কর্ম্মচারীদিগকেও ভয় করিতে হয়। আমাদের এরূপ ঘাটী অনেক আছে। আমাদেরই হুদ্দায় এরূপ চারিটী ঘাটী আছে। কালীতলা হইতে বউবাজারের মোড় পর্য্যন্ত বেশ করিয়া দেখিয়া যাইবেন, এইরূপ দুই দুই জনকে আর তিন জায়গায় দেখিতে পাইবেন। সকল কর্ম্মচারীকেই যে, এইরূপ মঙ্গলপাঠান বা বাঘবন্দী খেলা খেলিতে হয়, এরূপ মনে করিবেন না। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন প্রণালী। যেখানে ভয় অধিক, সেখানে কাজ কর্ম্মের ছিলা করিতে হয়। কিন্তু সকল সন্ধান দিব না, মাপ করিবেন।" তখন মনে হইয়াছিল, আরও দুই এক জায়গায় জন দুই লোককে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছি। এক জায়গায় পানের খিলি বেচাও দেখিয়াছি। পানওয়ালাকেও পরে একদিন সুযোগ পাইয়া চাপিয়া ধরিয়াছিলাম, তাহাকে কবুলও করিতে হইয়াছিল। কিন্তু সে নিজে কাজ করিত না, কেবল সন্ধান দিত। তাহার প্রধান কাজ ছিল, একটা জুয়ার আড্ডার ফড়ওয়ালা আড্ডাধারীকে সাবধান করা। প্রথমে বলিতে ভুলিয়াছি, জুয়াখেলা চুরিবিদ্যার সর্ব্বপ্রধান অন্তরঙ্গ।

"ভিক্ষো মাংসনিষেবনং প্রকুরুষে? কিন্তত্র মদ্যং বিনা।
মদ্যঞ্চাপি তব প্রিয়ং? প্রিয়মহো বারাঙ্গণাভিঃ সহ।
বেশ্যাপ্যর্থরুচিঃ কুতস্তব ধনং? দ্যূতেন চৌর্য্যেণ বা।"

দ্যূত আর চৌর্য্য গলায় গলায়, ঠিক যেন জীবাত্মা আর পরমাত্মা, যেন এনাটমি আর ফিজিয়লজি, যেন সেন্‌সেশন আর পার্সেপ্‌শন, যেন ইংরেজির কিউ আর ইউ, যেন গাঁজা আর দোক্তা, যেন নর আর নারায়ণ, যেন কানাই আর বলাই—ইত্যাদি ইত্যাদি।

এখন আবার ঐ কদমতলার উহাদের কথা। উহারা বলিল,—"আমাদের দল মস্ত। কালীতলা হইতে বউবাজার পর্য্যন্তই ২৪ জনকে কাজ করিতে হয়, পকেটের কাজ করি, পিত্তলের জিনিস সোনার বলিয়া বেচি; এই দুইটাই প্রধান।" পকেটের কাজ বলিতে পকেট-মারা অর্থাৎ গাঁটকাটা। সেকালে জামার আধিপত্য ছিল না, পকেট ছিল না, লোকে গাঁটে অর্থাৎ টেঁকে বা কাপড়ের খুঁটে টাকা কড়ী রাখিত। তাই কাজটার নাম হইয়াছিল গাঁটকাটা। ... হইয়াছে পকেট-মারা, পকেটের কামও বলা হয়। আমরাই ত দেখিয়াছি, এক বৃদ্ধা একদিন পুলীশকে বলিতেছে,—"না বাবা আমার নাতী এখন আর পকেটের কাজ করে না, সে কলে চাকরী করিতেছে।"

কদমতলার কালাচাঁদেরা বলিতে লাগিল,—"বাবু! আমাদের মস্ত দল। একটা হুদ্দার কথা কহিলাম; এমন হুদ্দা অনেক আছে। আমাদের যিনি রাজা, তিনি পূর্ব্বে হাতে কাজ করিতেন, এখন আর নিজে কাজ করেন না। করিবেনই বা কেন? এখন তাঁর অতুল ঐশ্বর্য্য। দুই তিন শত লোক তাঁহার তাঁবে খাটিতেছে। বড় বড় ওস্তাদ তাঁহার দলে আছে। সকল দিকেই রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত কাজ হয়, ১০টার সময় সকলকেই গিয়া রাজার কাছে হাজির হইতে হয়। যে যাহা রোজগার করিতে পারিয়াছে, তাঁহার কাছে গিয়া তাহাকে তৎসমস্তই জমা দিতে হয়। ভয়ঙ্কর শাসন, গোপন করিলে রক্ষা নাই, বাঁচা ভার! আর তাঁহার কাছে লুকাইবারও শক্তি কাহারও নাই; গোয়েন্দা আছে, বলিয়া দেয়। রাজার ভাণ্ডারে সমস্ত জমা হয়, সপ্তাহে সপ্তাহে ভাগ হয়। আমাদের দলে কাহারও মাহিয়ানা নাই, সকলেই কমিশনে কাজ করি, কিছু কিছু পাওয়া চাই! রাজার তহবিলে অর্দ্ধেক যায়, আর অর্দ্ধেক ভাগ হয়। যাহার যেমন পদ, সে সেইরূপ পায়। আর হুদ্দা হিসাবে ভাগ বাঁটোয়ারা হয়। রীতিমত জমা খরচ হয়; যত হুদ্দা, তত লোক, তত মুহুরী। গহনা পত্র সবই সদ্যঃসদ্যঃ গালাইয়া ফেলা হয়, তাহা লোক আছে। আর মাল কিনিবার লোকও ধরা বাঁধা আছে। কিন্তু আপনাদের কথাই কহিব, সকলের কথা কহিব না। বিশেষতঃ, যাহারা গাঁতের মাল কেনে, তাহারা সব বড় বড় লোক, সকলেরই বড় বড় দোকান আছে।"

কদমতলায় অনেক কথাই হইল, সকল কথা মনে নাই নোট করিয়া রাখিতে পারি নাই। একটা কথা মনে আছে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তোমরা কি কখনও ধরা পড় না?"

উহারা বলিল, "দুই একজন ধরা পড়ে বই কি, কি যে গুলা শিক্ষানবীশ, প্রায় সেই গুলাই ধরা পড়ে। এ দেখুন, আমরা দুই জন আজ দশ বৎসর কাজ করিতেছি একবারও ধরা পড়ি নাই। কিন্তু ধরা পড়িলেও ত ক্ষতি নাই। আমাদের রাজা বড় দয়ালু, যে জেলে যায়, তাহার পরিবার প্রতিপালনের ভার লন। আর বাড়ীর একজন যে, রোজগারী, এরূপ নহে। এই, আমরা দুই জনেই তি পুরুষে। ঠাকুরদাদা এই কাজে বুড়া হইয়া মরিয়া গিয়াছে বাবা এখনও কাজ করিতেছেন, তিনি দলের একজন ও ওস্তাদ; আমি আছি, আরও আমার খুড়তুতো ভাই, খু সেদিন মারা গিয়াছেন।" সে দিন আমাদের এই জ্ঞানল হইল। আর জানা গেল, কলিকাতায় এমন দল অনে গুলা আছে। কখনও কখনও দলে দলে বিবাদও হ বিবাদ হইলেই বড় গোল, কিন্তু দলপতিরা বড় বুদ্ধি

এবং স্থিরবুদ্ধি ; বিবাদ শীঘ্রই মিটাইয়া ফেলেন। বিবাদ হয় অনধিকারপ্রবেশ হইলে ; এক দলের হুদ্দায় অন্য দলের লোকের প্রবেশ হইলেই বিবাদ হয়। কিন্তু ভাল জায়গার জন্যে মধ্যে মধ্যে বিবাদও করিতে হয়। সকল সময়ে না হউক, পূজার সময়ে ত বটেই। বড় বাজার অঞ্চলে যে, সে সময়ে সকল দলেরই কাজ করিতে হয় ; রোজগারটা ঐ খানেই যে, অধিক। সর্ত্ত আছে ; যেমন কালীঘাটের মহাষ্টমীর পালা। আর কোথাও বারইয়ারী পূজা বা মেলা বা অন্যরূপ জনতা হইলে, সকল দলেরই যাইবার অধিকার আছে, কোন দলেরই প্রবেশনিষেধ হয় না। সর্ত্ত আছে, চুক্তি আছে, লেখাপড়া আছে, এরূপ স্থলে সকলেই কাজ করিবে। তথাপি মধ্যে মধ্যে বিবাদ হয়। আর এক কথা, দলে জাতিভেদের জোর কম, হিন্দু মুসলমান একত্র কাজ করিতেছে, পরস্পর সদ্ভাবও আছে। মনে করিলাম, এই পুণ্যের জোরেই দলের উন্নতি শ্রীবৃদ্ধি অধিক এবং বিপদ আপদ কম। জাতিতেদেই যে, ভারতের সর্ব্বনাশ হইতেছে !

আরও একটু শিক্ষা হইল। দলে রীতিমত শিক্ষা হয় ; নূতন লোককে রীতিমত শিক্ষা দিতে হয়। সে, দিনকতক আড্ডার ভিতর থাকিয়া পড়া লয়, দলের লোকেই আপোষে পকেট কাটিয়া গাঁটকাটার কাজ শেখায়। মাস খানেকেই যথেষ্ট হয়। কাহারও কাহারও ১৫ দিনেই যথেষ্ট ; যেমন বুদ্ধি, তেমন শিক্ষা। একটু শিক্ষা হইলে, অর্থাৎ চুরিবিদ্যার কিঞ্চিৎ আদায় হইলে, তার পর শিক্ষানবীশের দলে যোগ দিয়া কাজ করিতে যায়। কিন্তু ধরা পড়িতে ইহারা। পুরাতন পাপীও যে, ধরা পড়ে না, এরূপ নহে, তবে কম।

যাহাদের বংশগত ব্যবসায় তাহারা ত দলে যোগ দিয়াই থাকে। কোন কোন অনাথ বালকও কুহকে পড়িয়া দলে যোগ দেয় ! আর যাহারা হঠাৎ অন্য কোন বদ কাজ করিয়া একবার জেলে যায়, তাহারা সেইখানেই তালিম খানার সন্ধান লইয়া আসে, সঙ্গী জুটাইয়া আসে। তাহারাও দলে যোগ দেয়। মেয়ে মানুষ দুই এক দলে আছে, সকল দলে নাই। কিন্তু চৌদ্দ পনর বৎসরের কথা কহিতেছি, এত দিনে উন্নতি হইয়াছে নিশ্চিত ; স্ত্রীস্বাধীনতা যে, হুহু করিয়া বাড়িতেছে। সকল কথাই কহিলাম না, কলিকাতার কথাও এইখানেই সাঙ্গ করিলাম। চুরিবিদ্যার স্কুলও যে, কলিকাতায় আছে, তাহা পাঠক বুঝিতে পারিলেন। যেখানে কাজ, সেইখানেই শিক্ষা, কার্য্যক্ষেত্রই শিক্ষাক্ষেত্র। এইবার বিলাতের কথা একটুখানি কহিয়াই প্রবন্ধ সাঙ্গ করিব। বিলাতের বা ইউরোপ আমরিকার সকল কথা কহিতে পারিব না ; প্রবন্ধ লিখিতেছি, গ্রন্থ লিখিতে বসি নাই। বিলাতী বালিকাদিগের কথাই কহিব। সম্প্রতি সংবাদপত্রে যে কথা কথিত হইয়াছে, সেই কথারই একটু আভাস দিব।

বিলাতী সংবাদপত্রের রিপোর্টার মহাশয়দিগকে সর্ব্বত্র যাইতে হয়, সকলের সহিত দেখাশুনা করিতে হয়, সকলেরই খবরাখবর লইতে হয়, চোরের সঙ্গেও দেখাশুনা করিতে হয়। কেহ কেহ দলে মিশিয়া যান কিনা, বলিতে পারি না। বেশ্যাপাড়ায় ধর্ম্মপ্রচার করিতে গিয়া এদেশের কোন কোন ধার্ম্মিক যে, শেষে রীতিমতই ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে সেন, তাহা অনেকেরই জানা আছে। সংবাদপত্রের রিপোর্টার হইয়া যদি কেহ ঐ কাজ চান, তবে হয় ত তাঁহাকেও হাতে কলমে লাগিয়া যাইতে হয়। চোরের বেলাই বা একেবারে অন্যথা হইবে কেন ?

কিন্তু বিলাতী পত্রে যিনি মেয়ে-চোরের কথা কহিয়াছেন, তিনি দলে মেশেন নাই। পরন্তু যিনি "চাল্লিশ চোরের রাণী"—এরূপ একটী রমণীর সহিত দেখা করিয়াছিলেন। ইহাঁরই কাছে জানিয়াছেন,—'বিলাতের বালিকারা প্রথমে চুরীবিদ্যা শিখিতে আসে ; শেখে প্রায় তিন মাস। এই তিন মাসের ভিতর থিয়রেটিকাল শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রাক্‌টিকাল শিক্ষাও হইয়া থাকে। শিক্ষারম্ভ হয় প্রায়ই বালিকার পঞ্চদশবর্ষে। যৌবনের প্রারম্ভ, আর যৌবনে কুক্কুরী রম্যা। নবযৌবনটা চৌর্য্যকার্য্যের খুবই সাহায্য করে। "চল্লিশ চোরের রাণী" চৌর্য্যশাস্ত্রে অদ্বিতীয়, একপ্রকার চৌর্য্যশাস্ত্রের শাস্ত্রিণী। অনেক ছাত্রীরই অধ্যাপনা করিয়াছেন ; বংশ বুঝিয়া ছাত্রী লন। যাহার মা বাপ দুই জনেই চোর, তাহারই অধিক আদর। মা চোর হইলেও আদর বটে, বাপ চোর হইলেও কিঞ্চিৎ। যাহার কেহই চোর নহে, মা বাপ দুইটার একটাও কোন কালে চুরির কাজ করে নাই, তাহাকে স্কুলে ভর্ত্তি করা হয় না। গাধা পিটিয়ে ত আর ঘোড়া করা চলে না। কিন্তু কখনও কখনও ঠকিতে হয়। কোন কোন স্বয়ংসিদ্ধা স্বনামধন্যা যুবতী অনেক সাতপুরুষেকেও পরাজিত করিয়া, নিজে শেষে দলপত্নী হয়।" এরূপ হইয়া থাকে। নেপোলীয়নের পিতা বীর ছিলেন না, মাতা "অবীরা" না হইয়াও অবীরা ছিলেন। আবার অনেক চৌদ্দপুরুষে পণ্ডিতের বেটাও ত দিগ্‌গজ মূর্খ হইয়া থাকেন। প্রাক্তন সংস্কারে কি না হয় ! গোময়কুণ্ডেও পদ্ম ফোটে, দৈত্য বংশে প্রহ্লাদ জন্মে। অহল্যা হড্ডিকা কি না হইয়াছিলেন ? মেহেরপুরের বলরাম হাড়ী যে, ধর্ম্মপ্রচারই করিয়াছিলেন। কত চাকরাণী রাণী হইয়াছেন, কত রাজকন্যা দাসী হইয়াছেন ! কিন্তু চল্লিশ চোরের রাণী বলেন,—"যাহার মা বাপ কেহই কোন পুরুষে চুরীর কাজ করে নাই, এরূপ বালিকাকে তাড়াইয়া দিয়া ঠকিয়াছি, সেই বালিকাই আবার প্রাইভেটষ্টুডেণ্ট হইয়া—ঘরে পড়িয়া—অনেক বিএ এম এ কে হারাইয়া দিয়াছে, দল বাঁধিয়া চৌর্য্যরাজ্যে রাজত্ব করিয়াছে, এখনও করিতেছে। বড় বড় চুরীর কাজে বাহাদুরী লইয়াছে, পুরুষগুলা ধরা পড়িতেছে, যুবতী নিজে কখনও ধরা পড়ে নাই।" তিনি বলেন, হাতে যেমন ধ্বজবজ্রাংকুশাদি রাজচিহ্ন থাকে, সেইরূপ সিঁধকাটি পকেট-কাটা কাঁচী প্রভৃতি তস্কর-চিহ্নও হাতে থাকে। তাহা দেখিয়াই ছাত্র ছাত্রী লইতে হয়। যে যুবতী স্বয়ংসিদ্ধ হইয়া শেষে দিগ্বিজয়িনী হইয়াছে, তাহার হাতে কোনরূপ সন্ধিযন্ত্রাদির চিহ্ন প্রথমে দৃষ্ট হয় নাই। শেষে সব ফুটিয়া বাহির হইয়াছিল।

চল্লিশ চোরের রাণী বলিয়াছেন,"বালিকাদিগকে বাসাতে —অর্থাৎ আড্ডায় রাখিয়া খাইতে পরিতে দিতে হয়, আর পাছে পুলীশ সন্দেহ করে, এই ভয়ে উহাদিগকে হয় কাটা কাপড়ের দোকানে না হয় অন্য দোকানে এপ্রেণ্টিশ করিয়া দিতে হয়। সেখানে আহার ঔষধ দুই চলে। পুলীশকে ঠকান হয়, আর চুরীর কাজ, বেমালুম মিথ্যা কথা কহিবার কাজ, লোক ভুলাইবার কাজ এবং অন্যান্য আবশ্যক কাজও শেখা হয়। প্রথমে অল্প স্বল্প চুরি, পরে বড় বড়। আর মিথ্যা বাক্য কহিয়া, সত্যবাদিনী বলিয়া সার্টফিকেট লইতে হয়, পেটের কথা পেটে রাখা শিখিতে হয়, নির্ভয় হইতে শিখিতে হয়, কত কি শিখিতে হয়। দোকানে যাহা হয়, তাহার অতিরিক্ত আবার আড্ডায় হয়, কিন্তু দোকানের কাজেই এপ্রেণ্টিশ থাকিয়া সময়ে যুবতীরা বাহিরে চুরি করে। তাহাতেই গুরুদক্ষিণা হয়, খাওয়া পরাও হয়। খাওয়া পরাটা বেশ ভাল রকমই দিতে হয়, অন্যথা যুবতীরা অনাথপালনের আড্ডায় চলিয়া যায়। আবার অনাথপালনের সভাও ত চারিদিকে। যে বালিকা একবার ধরা পড়িয়া ছুকরী-জেলে—শোধনাগারে যায়, তাহাকে আর আড্ডায় লওয়া হয় না। শোধনাগারে যে, পাদরির যাতায়াত হইয়া থাকে। যদি যুবতী বিগড়িয়া গিয়া থাকে !

চল্লিশ চোরের রাণীর কথায় জানা যায়, চুরির বালিকাবিদ্যালয়ে এবং যুবতী-বিদ্যালয়েও ডিসিপ্লীন বা নীতিশিক্ষার খুব কড়াকড়ি ; কাহাকেও মদ্য স্পর্শ করিতে দেওয়া হয় না। বলিয়াছি ত প্রথমেই, মদটা ডাকাতী কাজের প্রধান অঙ্গ হইলেও, চুরির কাজে বড়ই অন্তরায়। চুরির কাজে অতিসাহস—দুঃসাহস চলে না। চুপি চুপি সব করিতে হয়, আত্মগোপন করিতে হয় পূর্ণমাত্রায়, নিঃশব্দে কাজ করিতে হয় ; মদে এসব হয় না। কলিকাতারই মণ্ডলষ্ট্রীটে দুই চোর এক শুঁড়ীর বাড়ীতে চুরি করিতে ঢুকিয়া প্রথমেই মনের সাধে মদ খাইয়াছিল। শেষে—"প্রাণ তুমি কার হবে আমি যদি মুদি আঁখি,"—বলিয়া সপ্তমে গান ধরিয়াছিল ; অগত্যা ধরাও পড়িয়াছিল। বিলাতেও মাতাল চোর প্রায়ই ধরা পড়ে।

চল্লিশ চোরের রাণী এইরূপ এবং অন্যরূপ অনেক তথ্যেরই প্রকাশ করিয়াছেন। রিপোর্টারের প্রথম পত্রও বিলাতী সহযোগীর স্তম্ভে প্রচারিত হইয়াছে ; বালিকা যুবতীরই কেবল আভাস পাওয়া গিয়াছে ; ক্রমে বালক যুবকেরও পাওয়া যাইবে। অথবা স্ত্রীশিক্ষারই অধিক আদর বলিয়া বোধ হয়, বালিকা যুবতীর কথাই বিশিষ্টরূপে কথিত হইতেছে। বালক যুবককে বোধ হয়, এ যাত্রায় বাদ পড়িতে হইল। আমরা কিন্তু বালক যুবকের কথাই ভাল করিয়া কহিয়া দিয়াছি। যেখানে যেমন, সেখানে তেমন।

বিড়ালে বিরাগ।

বিড়াল আমাদের ভারতেশ্বরীর বড়ই বিরাগভাজন। কিন্তু তিনি কুকুরকে বড় ভাল বাসেন। কুকুরের মত প্রভুভক্ত জীব প্রায় দেখিতেই পাওয়া যায় না ; বিড়ালের প্রভুভক্তি নাই বলিলেই হয়। কত কুকুর প্রভুর জন্যে প্রাণ দিয়াছে ; বিড়াল কি কখনও কোন প্রভুর জন্যে প্রাণ দিয়াছে ? কুকুর স্বল্পেই সন্তুষ্ট, পাতের খাইয়া তৃপ্তিলাভ করে ; যৎকিঞ্চিৎ হইলেই, তাহার যথেষ্ট হয়। বিড়াল কেবল ছোঁক ছোঁক করিয়া বেড়ায়, দুধের কড়া—মাছের হাড়ী—খুঁজিয়া বেড়ায়। কুকুর সাহসী বীর ; শঠতার কাছ দিয়াও যায় না ; বিড়াল শঠ তস্কর, কেবল চুরি করিবার জন্যেই ঘুরিয়া বেড়ায়। বিড়াল সদাই ভাবে, বাড়ীর লোকগুলা অন্ধ হউক, আমি সকলের পাত হইতে মাছ তুলিয়া খাইব ; দুধের বাটী খালি করিয়া ফেলিব। বিড়াল ষষ্ঠীর বাহন, কিন্তু আঁটকুড়া ঘরেই থাকিতে ভাল বাসে। আর দেখিতেও পাওয়া যায়, আঁটকুড়ার ঘরেই তাহার আদর অধিক। ছাগল ভাবে, গৃহস্থ নির্ব্বংশ হউক তাহার বাড়ীর উঠানে—ঘরের ছাদে ঘাস হউক ; আমাকে আর আহারের জন্যে কষ্ট পাইতে হইবে না। ছাগলও বড় নিমকহারাম জানোয়ার ; বিড়ালের যুড়িদার। কুকুর প্রভুর দাসত্ব করিবার জন্যে লালায়িত, প্রভুর উপকার করিতে পারিলে কৃতার্থ হয় ; বিড়াল কোন উপকারে আসে না, কেবল নিজের স্বার্থ লইয়াই সারা দিন ব্যস্ত। প্রভু গৃহত্যাগী হইলে, কুকুরও সঙ্গে সঙ্গে গৃহত্যাগী হয় ; বিড়াল কিন্তু কিছুতেই গৃহত্যাগী হয় না। সে বাড়ীর অধিবাসীদিগকে ভাল বাসে না, বাড়ীটাই ভাল বাসে। পরিচিত স্থানের মূষিক ভেক প্রভৃতির বাসা তাহার পরিচিত ; সে সীকার ফেলিয়া যাইবে কেন ? বিড়ালের মত ধূর্ত্ত বদমাইস দ্বিতীয় নাই। তাহার প্রতিহিংসাও বড় প্রবলা। তাড়না লাঞ্ছনা খাইয়া তখন চুপ করিয়া থাকে, কিন্তু বাগে পাইলেই প্রতিশোধ লয় ; গৃহে মলত্যাগ করে, শয্যায় মূত্রত্যাগ করে। আবার যাহার কাছে তাড়না লাঞ্ছনা পাইয়াছে, নিদ্রিত পাইলে, তাহার গায়ে মূত্রত্যাগ পর্য্যন্ত করিয়া যায়। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, অন্নপূর্ণ পাত্র, মৎস্যপূর্ণ দুগ্ধপূর্ণ বাটী সম্মুখে রহিয়াছে, কুকুর বসিয়া আগলাইতেছে। প্রভু বা প্রভু-

পত্নী, প্রভুপুত্র বা প্রভুকন্যা আসিয়া আহার করিবেন। বাড়ীর কুকুর রূপচাঁদ প্রহরীর কার্য্য করিতেছে; বিড়ালকে কাছে আসিতে দিবে না। নিজে নির্লোভ! আহারান্তে তুমি প্রসাদ দেও, ভালই; না দেও, তথাপি রূপচাঁদের মুখে বিরাগ বিরক্তির লেশমাত্র নাই। ঈর্ষা দ্বেষ তাহার নির্ম্মল হৃদয়ে স্থান পায় না। কিন্তু তুমি আহারান্তে এক মুষ্টি অন্ন দিলে, ত রূপচাঁদ আনন্দে গলিয়া গেলেন, তাহার মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, লেজটা ফুলিয়া উঠিল; রূপো যেন পা বাড়াইয়া চাঁদ ধরিল! আর বিড়াল? সে তোমার মুষ্টিতে তুষ্ট নহে। পাতের তুলিয়া খাইতে না পাইলে, তাহার তৃপ্তি হয় না! বিড়াল যে, বাঘের মামা; বিড়ালী যে, বাঘের মাসী। রাগ রোষ ঈর্ষা দ্বেষ তাহার আঠারো আনা! বিড়াল আমাদেরও দুই চক্ষের বিষ। কিন্তু দৈব প্রতিকূল, কোথা হইতে বিড়াল আসিয়া আমাদের কাছে জুটিয়া পড়ে। গৃহিণী ঠিক কথাই কহিয়াছিলেন। এক দিন মাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, আমাদের রাশিটা কি গা? মার মনে নাই, বলিতে পারিলেন না। গৃহিণী বলিলেন, "তা আর জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? দেখিতেই ত পাওয়া যাইতেছে, 'তোমার বিড়াল রাশি।" যাহাকে দেখিতে পারি না, সেই আসিয়া কাছে জুটে! বিড়ালের ডাক শুনিলেই আমরা শিহরিয়া উঠি। বিড়াল যখন রাগিয়া গর্জ্জন করে, তখন ঠিক যেন মনে হয়, একটা ক্ষুদ্র ব্যাঘ্র গর্জ্জন করিতেছে! এক এক সময়ে বিড়াল যে, বড় অলক্ষুণে ডাক ডাকে, তাহা ত প্রবাণাদিগের বেশ জানা আছে। এই এখনই ত—এই প্রবন্ধ লিখিবার সময়েই ত—২৮শে পৌষ রাত্রি ৮টার সময়েই ত—দুইটা বিড়াল অলক্ষুণে ডাক ডাকিতেছে! ডাক যেমন কর্কশ, তেমনই একটা কদর্য্য সুরের! যাহার প্রেমের সম্বোধনে —ভাল বাসার ডাকেও—চমকিয়া উঠিতে হয়, বুঝিয়া দেখ দেখি, তাহার চরিত্র কিরূপ ভয়ঙ্কর; তাহার স্বভাব কিরূপ কদর্য্য! এমন জন্তুকে আবার লোকে আদর করিয়া পোষে! মহারাণীর কাছে বিড়ালের আদর নাই, বরং অনাদরই ষোল আনা। কিন্তু যুবরাজের সংসারে বিড়ালের বড় আদর! যুবরাজমহিষী বিড়াল ভাল বাসেন, তাঁহার কন্যারাও বিড়াল ভাল বাসেন; যুবরাজ নিজেও অগত্যা বিড়ালকে ভাল বাসেন। যুবরাজমহিষী আবার অনেক টাকা দিয়া অনেক বিড়াল কিনিয়াছেন; প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী সারাবার্ণাতের কাছে প্রচুর অর্থ দিয়া গোটা দুই বিড়াল লইয়াছেন! এতটা দেখিতে শুনিতে ভাল নহে; শ্বাশুড়ী বিড়ালকে দুই চক্ষে দেখিতে পারে না, বউমার উচিত কি বিড়ালের অত আদর করা? ভাগ্যে এক বাড়ীতে থাকা নাই। অন্যথা বিড়ালের জন্যেই ত দিবারাত্র শ্বাশুড়ী বউয়ে কোঁদল হইত। যুবরাজমহিষীর সব ভাল, কিন্তু তাঁহার এ বিড়াল-ভালবাসাটা ভাল নহে। প্রকৃতির পরি-

বিড়াল ইন্দুর মারে, এই তাহার একমাত্র সুখ্যাতি। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি, কুকুরও ইন্দুর মারিতে পারে। আবার নেউল যেমন ইন্দুর মারিতে মজবুত, বিড়াল ত সেরূপ নহে। যুবরাজের ভবনে কি মূষিকের বড় উৎপাত? যদিই হয়, তাহা হইলেও ত অন্য অনেকরূপ উপায় আছে। কত রকম কল আছে। খাঁচা কল আছে, কপাটে কল আছে, জাঁতি কল আছে;—কত কল আছে। শেঁখো আছে, দারমুজ আছে, "রফ অন র‍্যাট" আছে, কত কি আছে! ইন্দুর নাশের জন্যে বিড়াল পুষিতে হইবে কেন? যুবরাজ-ভবনে বিড়ালের আদর অনেক দিন হইতে। অন্যথা হয় ত প্লেগের দোহাই দেওয়া চলিত। ভারতে প্লেগ হইয়াছে; প্লেগ মাদাগস্কর পর্য্যন্ত গিয়াছে। মধ্যে অষ্ট্রিয়া রাজ্যেও গিয়াছিল। আবার একখানা জাহাজে চড়িয়া সেদিন বিলাতের দিকেও যাত্রা করিয়াছিল। ইন্দুরই প্লেগ লইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া দেয়, এইরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে। সুতরাং যুবরাজমহিষী যদি প্লেগের ভয়ে বিড়ালের আদর করিতেন, তাহা হইলে, তাঁহাকে ততটা দোষ দেওয়া চলিত না। তাত নহে, প্লেগের জন্যে ত বিড়াল পোষা হয় নাই! বিড়ালের উপর একটা স্বাভাবিক স্নেহ আছে বলিয়াই যুবরাজভবনে তাহার আদর হইয়াছে। এ আদরটা হয় ত যুবরাজমহিষী বাপের বাড়ী হইতে শিখিয়া আসিয়াছেন। দিনেমারের দেশে হয়ত বিড়ালের বড় আদর। শোনা আছে, যখন ভারতে দিনেমারদিগের জমিদারী ছিল, খুব আসা যাওয়া ছিল, যথেষ্ট ব্যবসায় বাণিজ্য ছিল, সেই সময়ে একবার তাঁহাদের এক খানা জাহাজে বড় ইন্দুরের উৎপাত হইয়াছিল। আর জাহাজের দিনেমার কাপ্তেন শ্রীরামপুর হইতে এক যোড়া বিড়াল লইয়া জাহাজে রাখিয়াছিলেন। সেই বিড়াল স্বদেশে লইয়া গিয়াছিলেন। সেই অবধিই নাকি দিনেমারের দেশে বিড়ালের আদর হইয়াছে। আর তাহার বংশবৃদ্ধিটাও খুব অধিক হইয়াছে। বিবাহের সময়ে দিনেমার রাজা রাণী কন্যা ও জামাতাকে বিড়াল যৌতুক দিয়াছিলেন কি না, জানি না, কিন্তু মহারাণীর জ্যেষ্ঠা বধূ বর-বসতের সময়ে নিশ্চিতই বিড়াল সঙ্গে বিলাতে আসিয়াছিলেন।

কুকুরের সবই ভাল। কিন্তু সে ক্ষেপিলেই সর্ব্বনাশ করে; ক্ষেপিলে যখন মানুষেরই জ্ঞান চৈতন্য থাকে না, তখন কুকুরেই বা থাকিবে কেন? ক্ষেপা কুকুরে কামড়াইলে সর্ব্বনাশ! যাহাকে কামড়ায়, তাহাকে ক্ষেপিয়া মরিতে হয়! ফরাসিরাজ্যে পাস্তর সাহেব প্রতিকারের পথ করিতে চাহিয়াছিলেন; "বিষস্য বিষমৌষধম্," মনে করিয়া যত সুস্থ সুখী জীব জন্তুকে ক্ষেপা কুকুরের বিষে বিপন্ন করিয়া, তাহাদের বিষাক্ত লালা লইয়া কুক্কুরদষ্ট নর নারীর দেহে টীকা দিয়াছিলেন। পাস্তর মরিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার আড্ডা রহিয়াছে, আড্ডায় তাঁহার অনেক চেলাও

রহিয়াছেন। অনেক চেলা অন্যান্য দেশেও ঘুরিতেছেন। আমাদের দেশেও তাঁহার চেলা—হাফকীন আসিয়া হৈচৈ করিতেছেন। এদেশেও পাস্তরী প্রতিকারের ব্যবস্থা করা হইবে; উদ্যোগ আয়োজন হইতেছে। ঢোলপুরের মহারাজ নিজে অনেক টাকা রাখিয়াছেন, আরও অনেক রাজা মহারাজের কাছে অনেক টাকা লইয়া ছন; ৩০ লক্ষ জমিয়াছে। ঢোলপুরে একটী আড্ডা হইবে সেই স্থানে পাস্তরী প্রথার পরীক্ষা হইবে, চলন হইবে। কিন্তু ফলে যে, এখনও সন্দেহ আছে। ইউরোপের অনেক বড় বড় ডাক্তারই বলিতেছেন,—"পাস্তরী প্রথায় প্রতিকার হয় না, বরং হিতে বিপরীত হয়। যাহাদের দেহে কুক্কুরদংশন-জনিত বিষ ছিল না, পাস্তরী বিষে তাহাদিগের শোণিত বিষাক্ত হয়, আর তাহাতেই মৃত্যুও হয়।" ইহাঁরা পাস্তর-শালার হিসাব লইয়া দেখাইতেছেন, এ পর্য্যন্ত কেবল কুফল হইয়াছে। "কুক্কুর দংশনেও যাহাদের কোন রোগ হয় নাই, হইবার কোন সম্ভাবনাও ছিল না, তাহাদেরই দুই এক জন আরাম হইয়াছে, অর্থাৎ যাহাদের রোগ ছিল না—রোগের সম্ভাবনা ছিল না, তাহাদেরই দুই এক জনের রোগ সারিয়াছে! অথচ, এরূপ অনেক লোকেরও পাস্তরী বিষে সর্ব্বনাশ হইয়াছে!" বস্তুতও যাহাকে রোগ ধরিয়াছে, যে কুকুর ডাক ডাকিতেছে, জল দেখিলেই ভয় পাইতেছে, এরূপ কোন ব্যক্তিকেই পাস্তরী প্রথায় আরোগ্য-লাভ করিতে দেখা যায় না! বিনা রোগে আরোগ্য হইলে ত আর কিছুই হইল না, ঔষধের কোন যোগ্যতাই ত প্রতিপন্ন হইল না। ঠিক প্লেগের টীকা! টীকার কর্ত্তা হাফকীন সাহেবই বলিতেছেন, "পেলেগ ধরিবার পর টীকা দিলে সুফল হয় না, বরং কুফলই হইবে। যাহাকে পেলেগ ধরে নাই, তাহাকেই টীকা দিতে হয়, তবে ফল হয়!" অভিজ্ঞেরা বলিতেছেন, "পেলেগ সকল লোককে ধরে না, টীকার ব্যবস্থা হইবার পূর্ব্বেও সকল লোককে ধরিত না, এখনও ত অনেক নিষ্টীকের কাছে যায় না। পেলেগ যাহাদিগকে ধরে নাই, তাহারাই অব্যাহতি পাইতেছে। এরূপ অব্যাহতির স্থলে যেমন অনেক সটীক আছে, সেইরূপ অনেক নিষ্টীকও আছে। সুতরাং হাফকীনের টীকাই যে, প্রতিকার করিতেছে, তাহা প্রতিপন্ন হয় নাই।" অনেক বড় বড় বিলাতী ডাক্তারও পেলেগের টীকায় দোষ দিতেছেন, হয়দরাবাদের বড় ডাক্তার লরী সাহেব ত পেলেগ-তদন্তের কমিশনের কাছে এই কথা বলিয়াছেন। বিষ দিয়া বিষ-মারায় অনেকেরই আপত্তি। পাস্তরী প্রথায় অনেকেরই অবিশ্বাস, কিন্তু গোঁদলপাড়ার ঔষধে ফল প্রত্যক্ষ। যাহাকে ক্ষেপা কুকুরে কামড়াইয়াছে, এরূপ লোক গোঁদলপাড়ার ঔষধ খাইয়া নির্ব্বিঘ্ন হইয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত অসংখ্য। ডাক্তার বিশো ভাপরা দিয়া চিকিৎসা করেন। তপ্ত জলের বাষ্প আছে। এই ভাপরা-চিকিৎসার এদেশেও চলন হইয়াছে। অনেকে বলেন, এ প্রথায় বস্তুতঃ প্রতিকার হয়। ক্ষেপা কুকুর শিয়ালে কামড়াইলেই, বিশোঁর ভাপরা লওয়া উচিত। আমাদেরও বিশ্বাস, লওয়া দোষের নহে, কেননা ইহাতে উপকার না হইলেও অপকার হয় না। পাস্তরী প্রথায় যেরূপ অপকার হয়—অনিষ্ট হয়, বিশোঁর প্রথায় সেরূপ হয় না। কিন্তু সব সে আচ্ছা গোঁদলপাড়া! গোঁদলপাড়ায় যাঁহারা ঔষধ দেন, তাঁহাদের উচিত, ঔষধটার ইউরোপ আমরিকায় এজেণ্ট করা। কুকুরের কামড়টা ইউরোপ আমরিকায় বড় অধিক; সকলেই যে, কুকুর পোষেন। আমরা জানি, ইংরেজই ব্যবসায়ের রাজা। এ পর্য্যন্ত কোন ইংরেজ যে, গোঁদলপাড়ার ঔষধটা ইউরোপ আমরিকায় পাঠান নাই, ইহাই বিচিত্র! ফরাসিরাজ্যেই পাস্তরী প্রথার চলন হইয়াছে, বিশোঁর ভাপরাও সেখানে আদর পাইয়া থাকে। গোঁদলপাড়াও ত ফরাসিরাজ্যেরই জমিদারী। দেখিতেছি, কুকুরের ঔষধে যেন ফরাসীরই দৈব অধিকার। কোন ফরাসীরই উচিত, গোঁদলপাড়ার ঔষধ লইয়া স্বদেশে চালাইয়া দেওয়া। কলিকাতার ঔষধ-ওয়ালা সাহেবেরা কত কত ঔষধের আড়তদারী করিতেছেন, তাঁহারাই বা উদাসীন কেন? স্মিথ ষ্টেনষ্ট্রার্ট কোম্পানির ত ঔদাসীন্য শোভা পায় না।

ভয়টা যে, কেবল কুকুর-দংশনেই আবদ্ধ, এরূপ নহে; বিড়াল-দংশনেও ভয় আছে। কুকুরদংশনে যেরূপ জলাতঙ্ক রোগ জন্মে, বিড়াল-দংশনেও সেইরূপ জন্মিয়া থাকে; শৃগাল দংশনে ত কথাই নাই। তরক্ষু দংশনেও জলাতঙ্ক জন্মে। শৃগাল নেকড়ে লোকে পোষে না, তাই উহাদের দংশনও অবসর কম; সুতরাং দংশনজনিত রোগেরও অবসর কম। বিড়াল ক্ষেপে কম; ধূর্ত্ত শঠ চতুর; তাহার হৃদয় ক্ষুদ্র, উত্তেজনা নাই; ভবিষ্যৎ ভাবিয়া চলে; স্থির-বুদ্ধি বিড়াল সহজে ক্ষেপিতে যাইবে কেন? যাহাদের হৃদয়ে আবেগ অধিক, তাহারাই ত সহজে উত্তেজিত হয়। উত্তেজনার অসম্ভবরূপ আধিক্য হইলেই বুদ্ধি বিকৃত হয়। সাপও ত ক্ষেপে না। বিড়াল ক্ষেপে না বলিয়াই যে, কুকুরের অপেক্ষা বা কুকুরের মত আদর পাইবে, ইহা ত আর যুক্তিসিদ্ধ নহে। ক্ষিপ্ত লোক অপেক্ষা যে, দস্যু অধিক ভয়ঙ্কর, জিঘাংসু অধিকতর ভয়ঙ্কর! ক্ষিপ্ত কুকুর অপেক্ষা স্বভাবধূর্ত্ত—দস্যু তস্কর জিঘাংসু—বিড়াল কি অধিকতর ভয়ঙ্কর নহে? যে প্রভুকে সপরিবারে অন্ধ হইতে দেখিলে কৃতার্থ হয়, প্রভুকে সপরিবারে উপবাসী করাইয়া নিজের পেট ভরাইতে চায়, সেই বিড়াল যদি জিঘাংসু না হয়, তবে জিঘাংসু কে? মহারাণী ভারতেশ্বরী ত আর সহজে বিড়াল-বিদ্বেষিণী হন নাই, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিয়া শুনিয়া তবে তিনি বিড়ালকে চিনিয়াছেন। যুবরাজের উচিত, জননীর দৃষ্টান্তে চলা। যুবরাজ-মহি-

প্রথা পদ্ধতি ফেশন রেওয়াজের কথা ছাড়িয়া দেও, ফরাসিরাজ্যে যে, মধ্যে কুমীর-পোষার রেওয়াজ হইয়াছিল। ছোট ছোট মেছো কুমীর যে, বিলাসিনীদিগের ভোজের টেবিলে বসিয়া থাকিত। দিন কতক যে, মাথার টুপিতে গিরগিটী বসাইয়া রাখা হইতেছিল! বিখ্যাত অভিনেত্রী সারা বার্ণাত্ যে, সাপ পুষিতে ভাল বাসেন! মানি, বিড়াল বিড়ালী—বিশেষতঃ বিড়ালী দেখিতে সুন্দর হয়, স্পর্শিতে কোমল হয়, শীতকালে বিড়ালদেহ গায়ে ঠেকিলে আরাম হয়, বিড়ালের জামা হইলে মন্দ হয় না। তাই হয় ত শীতপ্রধান ইউরোপে বিড়ালের অত আদর। বিড়াল গরম বলিয়া যদি শীতপ্রধান দেশে আদরণীয় হয়, তবে ত কেউটে গোখুরা সাপ শীতল বলিয়া গ্রীষ্মপ্রধান দেশে আদরণীয় হইতে অধিকারী? না না, বিড়ালকে অত আদর করা উচিত নহে। গুণের বিচার করিতে হয়। রূপের বা অবয়বের শোভা শোভাই নহে, গুণের শোভাতেই শোভা হয়।

"শরীরং ক্ষণবিধ্বংসি কল্পান্তস্থায়িনো গুণাঃ।"

রূপ ত শরীরের সঙ্গেই চলিয়া যায়। গুণই যে, চিরকাল থাকে। বিড়ালের রূপ আছে, কিন্তু গুণ নাই। তাহার আদর করিবে কেন? 'মাকাল ফল মাথায় রাখিয়া ঝুনো নারিকেলে পদাঘাত করিবে কি? টক্‌টকে পাকা লোণা কি আতার অপেক্ষা সুশ্রী নহে? আমরা রাজভক্ত, মহারাণী আমাদের বিড়ালে বিরক্তা; ভগবান্ বোধ হয় সেই জন্যেই আমাদিগকে বিড়াল-বিরাগী করিয়াছেন। যুবরাজের সংসারে বিড়ালের বড় আদর শুনিয়া, আমরা বড়ই দুঃখিত হইয়াছি। আশা করি, আমাদের বড় লাট কর্জ্জন ও তাঁহার মহিষী বিড়ালের আদরে প্রশ্রয় দিবেন না।

প্রেমের পরিণাম।

কুবেরজী, দারাশা আর মোতাভয়, তিন জনেই বোম্বাই সহরের পারসী, বয়স তিন জনেরই বড় কম। কুবেরজীর বয়স কুড়ি একুশ। মোতাভয়েরও ঐরূপ; দারাশা নিতান্তই বালক, বয়স তাহার সপ্তদশ বর্ষ মাত্র। কিন্তু তিন জনেই বন্ধুত্ব। বড় বন্ধুত্ব বলিয়াই, মোতাভয় সর্ব্বদাই কুবেরজীর ভবনে যাওয়া আসা করেন। বন্ধু ভবনে বন্ধুর অবারিত দ্বার। বাল্যবন্ধুর জননী ভগিনীরাও লজ্জা সরম করেন না। বন্ধুজননী জননীসমা, বন্ধুর সহোদরা নিজের সহোদরা। মোতাভয় কুবেরজীর ভবনে আসেন যান, বাটীর সকলের সঙ্গেই কথাবার্ত্তা কহেন, কাহারই মনে সন্দেহ সংশয় নাই, বন্ধু মোতাভয়ের জন্যে কাহারও মনে ভয় ভীতি নাই!

কিন্তু কন্দর্প সাধুকেও অসাধু করেন, ধার্ম্মিককে অধার্ম্মিক করেন, ধীরকে অধীর করেন, যোগীকেও ভোগী করিয়া তুলেন। কুবেরজীর যুবতী সহোদরার সঙ্গে কন্দর্প ই মোতাভয়ের প্রেম ঘটাইয়া দিলেন। আদান প্রদান দুই হইল; মোতাভয়—কুবের-বন্ধু মোতাভয়—কুবের-সহোদরাকে ভালবাসা দিয়া আশা পাইলেন। আশা পূর্ণ হইল, মন দিয়া প্রাণ পাইলেন, পুষ্পধন্বার কুসুমবাণে দুই জনেই দারুণ আহত হইয়া আত্মহারা হইলেন। মোতাভয় বন্ধু কুবেরজীকে ভুলিয়া গেলেন, নিজের কৃতজ্ঞতা ভুলিয়া গেলেন, পাপতাপ ভুলিয়া গেলেন, তিনি একেবারেই মাতিয়া উঠিলেন। কিন্তু

"পাপ কর্ম্ম না ছাপা থাকে।
দুদিন পরে জানে লোকে।"

কুবেরজী বুঝিতে পারিলেন, বন্ধুকে অনেক নিষেধ করিলেন, অনেক কাকুতি বিনতি করিলেন। এক দিকে প্রাণের বন্ধু, অন্য দিকে সহোদরা ভগিনী! কুবেরজীও হৃদয়বান্ লোক। প্রগাঢ় বন্ধুত্বে তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ! কিন্তু মোতাভয় একেবারে মত্ত! রতিপতি তাঁহার মতিগতি একেবারে বিকৃত করিয়া দিয়াছেন, মকরধ্বজ তাঁহাকে জয় করিয়া একেবারেই নিজের আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছেন, আত্মভুর আদেশে তিনি একেবারেই আত্মহারা হইয়াছেন। কুবেরজীর যত পরামর্শ সব উড়িয়া গেল। বন্ধুর সৎপরামর্শ তাঁর কর্ণে স্থান পাইল, কিন্তু মনে প্রবেশ করিতে পাইল না। মোতাভয় সাবধান হইবার জন্যে অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ফল হইল না। বন্ধুর নিষেধ নির্ব্বন্ধ সত্ত্বেও তিনি তাঁহার ভগিনীকে ভুলিতে পারিলেন না।

ক্রমে বন্ধুর বন্ধুত্ব শিথিল হইল, ক্রমে শিথিল বন্ধুত্ব অবন্ধুত্বে পরিণত হইল, ক্রমে অবন্ধুত্ব শত্রুত্বে পরিণত হইল। কুবেরজী তখন মোতাভয়কে ভ্রুকুটিভঙ্গ ভয় দেখাইলেন, "যদি তুমি সাবধান না হও, তাহা হইলে, এই বন্ধু-হস্তই তোমার মুণ্ডপাতের হেতু হইবে। কুবেরজীর মুখে একথা শুনিয়াও মোতাভয় সাবধান হইলেন না। তখন যে, তাঁহার চৈতন্যলোপ হইয়াছে; অনেকেরই ত হইয়া থাকে! মোতাভয় তখনও পাপে বিরত হইলেন না।

তখন কিন্তু কুবেরজীরও আর সহ্য হইল না। বন্ধুত্ব পূর্ব্বাহ্নেই শত্রুত্বে পরিণত হইয়াছিল, এইবার কুবেরত্ব পিশাচত্বে পরিণত হইল। কুবেরজী মোতাভয়কে প্রাণে মারিবারই সংকল্প করিলেন; পিশাচ হইয়া তিনি পিশাচের মতই কাজ করিলেন। সপ্তদশবর্ষীয় অন্যতম বন্ধু দারাশাকেই নিজের সহযোগী করিলেন। বালকের বুদ্ধি সহজেই বিকৃত হইয়া গেল। আবার সভ্যতা-সুলভ মদ্যপান সহায় হইল, বোতল গেলাস পরামর্শে সাহায্য করিল, বালককেও পিশাচের সহায় করিয়া দিল। কুবেরজী তীক্ষ্ণ ছুরিকার সংগ্রহ করিল, মদ্যসংগ্রহেও অসুবিধা হইল না।

বিকৃত হইয়াছিল; তাই তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, বন্ধু কুবেরজী সত্য সত্যই পিশাচের মত ব্যবহার করিবেন। সুতরাং বন্ধুর অনুরোধে মোতাভয় নির্ভয় মনে তাঁহার সঙ্গী হইলেন। তিন জনে কোন গুপ্ত স্থানে বসিয়া মদ্যপান করিলেন। মদ্যপানে মোতাভয় আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া পড়িলেন। সেই অবস্থায় কুবেরজীর ছুরিকায় তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইল, প্রাণ-বায়ু উড়িয়া গেল। দেহ বান্দরার উপকূলে পর্ব্বতগর্ভস্থ হইয়া পড়িয়া রহিল, হঠাৎ পুলীশের নেত্রপথে পতিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত রহস্যের ভেদে হেতু হইল। বালক দারাশার অনুতাপদগ্ধ হৃদয় গলিয়া গিয়া সকল রহস্য বাহির করিয়া দিল। দুই বন্ধুকেই থানার দায়রায় পড়িতে হইল। দারাশার একরারে ঘটনার যেরূপ বিবৃতি হইয়াছে; বোম্বাই এডভোকেট পত্রে প্রতিফলিত হইয়া সেইরূপ বিবৃতিই এখানে আসিয়াছে; আমাদের পত্রেও সেইরূপই আভাসিত হইল। গুপ্ত প্রেমের কিরূপ পরিণাম হইয়াছে, তাহা পাঠক দেখিতে পাইলেন। আত্মীয়ার ধর্ম্মনাশ হইলে, মানুষের দেবত্ব দূর হয়; মানুষত্বের লোপ হয়, মনে পিশাচত্বেরই আধিপত্য হয়! বিচারে যাহাই হউক, দারাশা ও কুবেরজী সহৃদয় পাঠকের কৃপার পাত্র! কিন্তু পাঠক, সুদূর বোম্বাই হইতে একবার বর্দ্ধমানে আগমন কর। দেখ, সেখানে এক পূর্ণচন্দ্র প্রেমের দায়ে কিরূপ কাণ্ড করিয়া বসিয়াছেন! পূর্ণচন্দ্র দে যুগলকিশোরীর রূপে মোহিত হইয়াছিলেন। যুগল জন্মিয়াছে বটে নীচ ঘরে, জাত্যংশে সে বাগ্দিনী বটে, কিন্তু রূপে ত পূর্ণচন্দ্রকে পাগল করিয়াছিল! পূর্ণচন্দ্র যুগলকিশোরীর জন্যে সব ছাড়িয়াছিলেন; মানকে পায়ে ঠেলিয়া অবমানকে শিরোভূষণ করিয়াছিলেন; ধর্ম্মকে ভাসাইয়া দিয়া পাপের ভেলায় ভর দিয়াছিলেন; যুগলের জন্যে পাগল হইয়া পূর্ণচন্দ্রও আত্মহারা হইয়াছিলেন। সেই বাগ্দিনীই রাহু হইয়া পূর্ণচন্দ্রকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল। পিশাচী পরে আবার অন্য পুরুষেও প্রেমদান করিয়াছিল! পূর্ণচন্দ্রকেও শেষে বুঝিতে হইয়াছিল,

"যাং চিন্তয়ামি সততং ময়ি সা বিরক্তা।"

প্রথমে মনে সন্দেহ হইয়াছিল। ক্রমে সন্দেহ ঘোর অবিশ্বাসে পরিণত হইয়াছিল। পূর্ণ দেখিয়াছিলেন,

"সাচান্যমিচ্ছতি জনম্।"

পূর্ণচন্দ্র সত্য সত্যই হতবুদ্ধি হইলেন। দেখিলেন, রঘুনাথ সরকারই অমৃতে গরল ঢালিয়াছে, সেই যুগল কিশোরীর মন প্রাণ হরিয়া লইয়াছে! পূর্ণচন্দ্রের হৃদয় হিংসাদ্বেষে ক্রোধে আক্রোশে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। পূর্ণচন্দ্র স্থির করিলেন, শত্রুর নিপাত করিতেই হইবে! একদা নিশাযোগে খড়্গহস্তে রঘুনাথ-হত্যায় বহির্গত হইলেন। গিয়া দেখিলেন, শত্রু নিদ্রিত। ক্ষিপ্ত পূর্ণচন্দ্র নিদ্রিত রঘুনাথের দেহে খড়্গাঘাত করিলেন। সেই আঘাতেরই পর তাহার নিপাত হইল! রঘুনাথের নিপাত হইল, পূর্ণচন্দ্রকেও বর্দ্ধমানের দায়রায় পড়িয়া দশ বৎসরের জন্যে কারাগারে যাইতে হইল। হাইকোর্টে আপীল হইল, কিন্তু কোন ফল হইল না। প্রেমের যাহা পরিণাম, তাহা হইয়া গেল!

সবুরে মেওয়া।

জনষ্টুয়ার্টমিলের ন্যায়শাস্ত্র, মনোবিজ্ঞান, অর্থনীতি, স্বাধীনতা প্রভৃতি গ্রন্থের অনেকেই অধ্যয়ন করিয়াছেন। বিলাতী বিদ্যায় যাঁহারা কৃতবিদ্য, মিলের গ্রন্থ পড়া না থাকিলে, তাঁহাদের পক্ষে কলঙ্ক। বিদ্যাভূষণ ভায়া আবার বাঙ্গলা ভাষায় তাঁহার জীবনচরিত বাহির করিয়া মিলকে বাঙ্গলানবীশদিগেরও পরিচিত করিয়া দিয়াছেন। জনষ্টুয়ার্ট মিলের পিতা জেম্‌স মিলও পণ্ডিত ছিলেন; ভারতের ইতিহাস লিখিয়া বিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন। জনষ্টুয়ার্ট মিল পার্লেমেণ্টেরও সভ্য হইয়াছিলেন, সুতরাং কৃতবিদ্যগণের কাছে তাঁহার পরিচয় না দিলেও চলে। দার্শনিকপ্রধান মিলের শিষ্য সেবক অনেক; অনেকে যে, এখনও তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন। সেই জনষ্টুয়ার্ট মিল যৌবনে যে যুবতীকে মন প্রাণ দিয়াছিলেন, তাঁহাকে বিবাহ করিতে পান নাই; যুবতী এক টেলরের গৃহিণী হইয়াছিলেন। সেই শোকে মিল আর বিবাহ করেন নাই, হয় ত আর বিবাহ করিতেনও না। কিন্তু ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র। জনষ্টুয়ার্ট মিলের ভাগ্যেও সবুরে মেওয়া ফলিয়াছিল। যৌবনের প্রাণাধিকা টেলরের পত্নী হইয়া বহুকাল স্বরকন্না করিয়া বিধবা হইলে পর, মিল দ্বিতীয় পক্ষে তাঁহার পতি হইয়াছিলেন। পত্নীও পণ্ডিতা ছিলেন, সুতরাং শেষদশায় মিলের সংসারধর্ম্ম হইয়াছিল ভাল। অনেকে এই ঘটনাও এইরূপ ঘটনায় নির্ভর করিয়া বিধবাবিবাহের যৌক্তিকতা আবশ্যকতা এবং বৈধতা প্রতিপন্ন করিতে চাহেন। সংসারে অনেকরূপ লোককেই দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা জানি, কোন কোন ব্যক্তি পুরাতন সেকেণ্ডহেণ্ড জিনিস না হইলে খরিদ করেন না! বউবাজার ষ্ট্রীটের যত কাটরার দোকানে প্রতিদিনই কত সেকেণ্ডহেণ্ড চেয়ার টেবিল প্রভৃতির বেচা কেনা না হইতেছে! কলেজষ্ট্রীটে পুরাতন পুস্তকের কত দোকান! আবার সাহেব সুবাদের পুরাতন টেবিল চেয়ার প্রভৃতি যে, অনেক সময়ে নূতনের অপেক্ষা অধিক দরে লইতে হয়। শুদ্ধ ব্যবহারের গুণে নহে—ব্যবহারীর গুণে—দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি হইয়া থাকে। লাটবাড়ীর জিনিসের নীলাম হইলে, মেকেঞ্জিলায়লদিগের নীলাম-ঘরে লোক ধরে না, রাস্তায় গাড়ী ধরে না! সেদিন ফরাসীর প্যারিস নগরে বিখ্যাত লেখক জোলার একটা সামান্য টেবিল ত্রিশ হাজার টাকায় বিক্রীত হইয়াছে! গ্লাডষ্টোন যে কুঠারে গাছ কাটিতেন, তাহা পাইলে, অনেকে হয়ত লক্ষ টাকাও

দিতে পারেন। পুরাতন জিনিসের যে অনেক সময়ে নূতনের অপেক্ষা অধিক দর হয়, তাহা অভিজ্ঞদিগের অবিদিত নহে।

কুমারী অপেক্ষা যে, বিধবার অনেক সময়ে মূল্য বাড়ে, তাহাই বা না জানা আছে কাহার? কুমারী যদি রাজার রাণী হইয়া বিধবা হন, আর বিধবা হইয়া যদি দ্বিতীয় পক্ষে পতিগ্রহণ করেন, তাহা হইলে, কি তাঁহার আদর অধিক হয় না? এ স্থলে ব্যবহারের গুণ ধর্ত্তব্য নয়, ব্যবহারীর গুণই ধর্ত্তব্য হয়। জনষ্টুয়ার্ট মিলের বেলায় টেলর বিধবার কি হইয়াছিল না হইয়াছিল, ততদূর বিচার বা সিদ্ধান্ত করি নাই। কিন্তু পুরাতন প্রেয়সীও মিলের কাছে—আদরে সম্মানে যে, কিছুমাত্র হীনা হন নাই, তাহা সকলেরই বিদিত। বরং অনেক দিনের পর রত্নলাভ হইয়াছিল বলিয়া, মিল আপনাকে অধিক ভাগ্যবান্ বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন। আর পণ্ডিত টেলরের হাতে পড়িয়াই ত টেলরপত্নী তত পাণ্ডিত্য-লাভ করিয়াছিলেন। টেলরপত্নী মিলের গৃহিণী হইয়া তাঁহার গ্রন্থ-রচনায় পর্য্যন্ত সাহায্য করিয়াছিলেন। মূল্যের বৃদ্ধি হয় নাই কি? আবার অনেক সময়ে যুবতী প্রথমে শুদ্ধ রূপে মোহিত হইয়া, গুণবান্ হৃদয়বান্ ছাড়িয়া, গুণহীন হৃদয়হীনকে বিবাহ করিয়া ফেলেন। আদালতের সাহায্যে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া ভ্রমসংশোধন করা সকল সময়ে সহজ হয় না। কেন না, পতিপক্ষে ব্যভিচার ও নিষ্ঠুরতা না থাকিলে ত আর আদালতের সাহায্য লওয়া চলে না। কিন্তু পতি ত নিষ্ঠুর এবং ব্যভিচারী না হইয়াও নির্গুণতা নিবন্ধন পাশ্চাত্য পত্নীর পক্ষে কষ্টপ্রদ হইতে পারেন; অনেকস্থলে ত হইয়াও থাকেন। এরূপ স্থলে মানুষের সাহায্যে প্রতিকার-লাভ করা চলে না; ইহলোকের বিচারালয়ে ইহলোকের বিচারকের কাছে প্রতিকার পাওয়া যায় না। এরূপ স্থলে সেই বিচারকের বিচারক ভগবানের কৃপায় নির্ভর করিতে হয়। তিনি যদি পত্নীরই অগ্রে মৃত্যু ঘটান, তাহ হইলে ত লেটা চুকিয়াই যায়। আর যদি পতির অগ্রে মৃত্যু ঘটান, তাহা হইলে, পত্নী দ্বিতীয় পক্ষে দেখিয়া শুনিয়া মনোমত পতি লইতে পারেন। ভ্রমশোধনের এটা বড় সামান্য পন্থা নহে! কিন্তু জনষ্টুয়ার্ট মিলের মত পতি ত আর সকলের ভাগ্যে ঘটে না। কেন না, মিলের মত অপেক্ষা করিয়া থাকা ত সকল পুরুষের পক্ষে সাধ্য নহে। অনেকেই দিন কতক হতাশ থাকিয়া, হা হুতাশ করিয়া, তাহার পর একটী বাছিয়া গুছিয়া লইয়া থাকেন। নর নারী উভয় পক্ষেই এই নিয়ম। কদাচ কেহ কেহ একেবারেই চির-কৌমার্য্য-ব্রতগ্রহণ করিয়াও থাকেন। এরূপ নরনারীর সংখ্যা বড় অধিক নহে। একবার হতাশ হইয়া চিরদিনই হতাশ থাকিতে পারেন বা থাকিতে চাহেন, এরূপ নর নারীর সংখ্যা সমাজে অধিক নহে। বিধবাবিবাহে যে, শুদ্ধ পুরুষেরই সুবিধা এরূপ নহে, রমণীরও। কেন না, সবুরে মেওয়া দুই পক্ষেই ফলিতে পারে, ফলিয়াও থাকে। মিলের বেলায় বোধ হয়, কিন্তু একপক্ষেই মেওয়া ফলিয়াছিল। কেন না, রমণী টেলরপত্নী হইয়াও ত অসুখিনী হন নাই। আর তিনি ত পতির মৃত্যুর জন্যে লালায়িতও ছিলেন না। পাশ্চাত্য সমাজে অনেক মহিলা কিন্তু পতির মৃত্যুর জন্যে লালায়িত হইয়া থাকেন। বিধবাবিবাহ প্রচলিত থাকাতেই এই নিয়ম। আমাদের সমাজের মত যদি রমণীর পক্ষে 'পত্যন্তর-গ্রহণ একেবারেই নিষিদ্ধ হইত, তাহা হইলে, পাশ্চাত্য রমণীরাও কুরূপ নির্গুণ পতিকে লইয়াই, মনের সুখে স্বরকন্না করিতে পারিতেন। নাই পতির চেয়ে ত কাণা পতি ভাল; তিনিই যে, সবে ধন নীলমণি!

"হকুনা কেন কাণা খোঁড়া
সেই ত আমার চাঁদের কোঁড়া।"

যেখানে মন্দ গেলে ভাল মিলে, সেখানে মন্দের লোপের জন্যে কে না ইচ্ছা করিয়া থাকে?

সেকেণ্ডহেণ্ডের প্রতি পত্নীর কল্যাণে কিন্তু সুখও হইয়া থাকে অনেক সময়ে। পাশ্চাত্য সমাজে বিচ্ছেদান্তে বিবাহ হয়, বৈধব্যে বিবাহ হয়, সেখানে দ্বিতীয় পক্ষের পতিলাভ ততটা দৃষ্য নহে। আর পুরুষপরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে বলিয়া মনেও ততটা কিন্তু হয় না। যাঁহারা বড় খুঁতখুঁতে পিট্‌পিটে, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। অনেকে যে, বিনা মূল্যে পাইলেও, রাজবাড়ীর সেকেণ্ডহেণ্ড মালও গৃহে আনিতে চাহেন না! ভয়, পাছে গুপ্ত রোগ ব্যাধির বীজাণু কীটাণু আসিয়া পড়ে। কেহ কেহ আবার কেবল পুরাতন বলিয়াই সেকেণ্ডহেণ্ডের বিরাগী। "অন্যে যাহার ব্যবহার করিয়াছে, আমি তাহার ব্যবহার করিব না।" এরূপ কুসংস্কারও অনেকের আছে। ইঁহাদের কাছে সেকেণ্ডহেণ্ড স্ত্রীরও বড় অনাদর। এরূপ লোকে বিধবা বিবাহ করেন না। জন্ম জন্ম আইবড়ো থাকেন, তথাপি কাহারও দ্বিতীয় পক্ষের পতি হইতে চাহেন না। এরূপ টিপিটে পুরুষগুলার কথা ছাড়িয়া দেও। যাঁহারা দ্বিতীয় পক্ষের পতি হইতে ভাল বাসেন, নূতন অপেক্ষা পুরাতনের অধিক যত্ন করেন, তাঁহাদিগের সঙ্গেই আমাদিগের সম্বন্ধ। যদি পুরাতন বধূ পরিচিত হন, তাহা হইলে ত কথাই নাই। কিন্তু যদি ঐ পরিচিতা পূর্ব্বেকার প্রেমিকা বা প্রাণাধিকা হন, তাহা হইলে ত আরও ভাল; সোনায় সোহাগা, দুধে চিনি, ব্যঞ্জনে লবণ, মদে চাট, ঘৃতে নেবু, বেগুণ-পোড়ায় কাঁচা লঙ্কা, কলায়ের দাউলে আদা মৌরী, মাংসে গরম মস্‌লা, পাটীর মাছে সজনে ফুল, ইলিশ মাছে কাঁচা আম। জনষ্টুয়ার্ট মিলের তাই ঘটিয়াছিল, দুই একজন ভাগ্যবানের ঘটিয়া থাকে।

একটী ঐতিহাসিক উপাখ্যানের শ্রবণ কর। স্কটলণ্ডের অন্তঃপাতী ক্রোমর্ত্তি অঞ্চলে ছিলেন একটী জন ফেডিস, আর ছিলেন একটী জিন গ্যালী। বাল্যে ভাব-

ভাব হইয়াছিল, একত্র খেলা-ধূলা চলিয়াছিল, যৌবনে প্রেম হইয়াছিল। যুবক ফেডিস যুবতী গ্যালীকে প্রাণ মন সঁপিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু অনেক স্থলে যেরূপ হইয়া থাকে, এখানেও সেইরূপ হইয়াছিল। জীন জনের গুণ না দেখিয়া, আর এক যুবার রূপ দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলেন। আর বলিতে কি, রূপের সঙ্গে কিঞ্চিৎ ধনও ছিল। জীন গ্যালী কিন্তু ধনের মোহে মোহিত হন নাই। কেন না, তাঁহারও পৈতৃক ধন যথেষ্ট ছিল, আর পিতার তিনি একমাত্র সন্তান ছিলেন। জন প্রথমে বরাবরই আশা করিয়াছিলেন, বরাবরই জীনের মন যোগাইয়া চলিয়াছিলেন, তাঁহার ব্যবহারেও কখনও হতাশ হন নাই। শেষে যখন দেখিলেন, জীন অন্য যুবককে ভাল বাসেন, তখন একেবারে হতাশ হইলেন, তাঁহার সকল আশার ভস্ম পড়িল! ক্রমে বিবাহের দিন ঘনাইয়া আসিল, বিবাহের দিনেই কিন্তু জন একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। চারিদিকে অন্ধকার দেখিলেন, জননী জন্মভূমিও তাঁহার বিষ হইল, তিনি গৃহত্যাগেরই সংকল্প করিলেন। সুযোগও হইল, সেই দিনই সমুদ্রকূলে দেখিলেন, এক খানা জাহাজ নাবিক ধরিবার জন্য ব্যস্ত; তাহার লোকজন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। জন সাগ্রহে গিয়া সেই জাহাজের নাবিক হইলেন এবং পরদিনই জন্মভূমি হইতে—প্রাণাধিক বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনদিগকে ছাড়িয়া—প্রস্থান করিলেন। বিলাতে জাহাজ ও পলটনের জন্যে এখনও লোক ধরা হয়। ইউরোপের অন্যান্য রাজ্যে আইন আছে, পুরুষদিগকে পলটনের কার্য্য করিতেই হইবে। বিলাতে এরূপ আইন নাই, স্বাধীনতার লীলাক্ষেত্রে কাহাকেও জোর করিয়া কোন কার্য্যে নিযুক্ত করিবার যো নাই। কিন্তু পলটনেও ত লোক চাই। বেতন দেওয়া হয় অন্যান্য রাজ্যের অপেক্ষা বিলাতে অনেক অধিক। আবার প্রথমে লইবার সময়ে বেশ কিছু সেলামীও দেওয়া হয়। তথাপি ত লোক লইবার জন্যে কষ্ট পাইতে হয় কম নহে! আমাদের দশেও ত নিয়ম আছে, যে ইচ্ছাপূর্ব্বক আসাম কাচারের চাক্ষেত্রে বা দ্বীপদ্বীপান্তরে মজুরী করিতে যাইবে, তাহাকেই লওয়া হইবে। কিন্তু কার্য্যতঃ কি হয়? কুলিধরা আড়কাটীরা লোককে কত কৌশলে ভুলাইয়া থাকে, কত লোভ দেখায়! প্রথমে পোষাক পরিচ্ছদের ও খাদ্য পেয়ের কত সুন্দর ব্যবস্থা করে! আমাদের দেশে কুলিসংগ্রহে যাহা করা হয়, বিলাতে পলটনের সৈনিকসংগ্রহে তাহাই করা হয়—করিতে হয়। রণপোতের লোকসংগ্রহেও বিলাতে এইরূপ ব্যবস্থা, জোর করিয়া কাহাকেই লওয়া হয় না। কিন্তু কুলিসংগ্রহের মত প্রথা রণপোতের লোকসংগ্রহেও চলিয়া থাকে। আবার বাণিজ্যপোতেও এই নিয়ম। এই কলিকাতা সহরেই দেখা যায়, বেকার জাহাজী গোরাদিগের পাছে পাছে লোক ঘুরিতেছে। কলিকাতার যে সকল হোটেলে বা আড্ডায় জাহাজী গোরা থাকে, সেখানেও গোরা ভুলাইবার চেষ্টা হয়। জন ফেডিসের আমলেও জাহাজের জন্যে লোক ধরা হইত, লোককে ভুলাইতে হইত। ক্রোমর্ত্তির বন্দরেও ঐরূপেই লোকসংগ্রহ হইতেছিল, কিন্তু জনকে কাহারও ভুলাইতে হয় নাই জন যে, নিজেই সাগ্রহে জাহাজের কাজ লইয়াছিল, যে কোন রূপে দেশত্যাগী হইবার জন্যেই যে, তখন লালায়িত হইয়াছিল—বল ত ক্ষিপ্তই হইয়াছিল!

অন্য দিকে হতাশ হইলে, মানুষ এত ক্ষেপে না, ধনে মানে হতাশ হইলেও মানুষ বুদ্ধি স্থির রাখিতে পারে, রোগে শোকে হতাশ হইলেও না পারে এমন নহে। কিন্তু কন্দর্পের কেমন মহিমা, প্রেমে হতাশ হইলে, অল্প লোকেই বুদ্ধি স্থির রাখিতে পারে! যৌবনেই মানুষ প্রেমের টানে পড়িয়া হাবুডুবু খায়, প্রবীণকে প্রায় প্রেম করিতে হয় না। আর যদি কোন প্রবীণ অকালে প্রেম করে, যদিই সন্ধ্যার সময়ে সাগরে ঝাঁপ দেয়, তাহা হইলে বড় একটা হাবুডুবু খায় না। তখন যে, তাহার দেখিয়া শুনিয়া অভিজ্ঞতা হইয়াছে; সে যে, সাঁতার শিখিয়াছে! যৌবনেই প্রেমের মরসুম, আর যৌবনেই মানুষ অনভিজ্ঞ এবং অদূরদর্শী থাকে।

জন ফেডিস জাহাজের মাল্লা হইয়া জন্মভূমি ছাড়িয়া গেল, এক জীন গ্যালীর জন্যে—একটা সামান্য যুবতীর জন্যে;—এ সংসারের যত প্রিয়বন্ধু, যত সুখ ফেলিয়া গেল! প্রবীণ পাঠক, হয় ত হাস্য করিবেন। আমরাও ত প্রবীণ, অনেক পাঠকের অপেক্ষা প্রবীণ, তথাপি ত হাস্য করিতে পারিতেছি না। আমাদিগকেও যে, যৌবনের অবস্থাটা ভাবিতে হইতেছে। যৌবনে অনেককেই প্রেমে হতাশ হইতে হয়। ইউরোপ আমরিকার ত কথাই নাই, এদেশেও অনেককেই হতাশ হইতে হয়। কাথলিক খৃষ্টান নহি, পাঠক তুমিও আমাদিগের কন্‌ফেসর পাদরী নহ; মনের কপাট খুলিয়া দিতে বসি নাই। যাহা অনেকের হয়, তাহারই কথা কহিতেছি, আমাদের নিজের কথা কহিতেছি না। জন ফেডিসকে ত আমরা তত দোষে দোষী করিতে পারিতেছি না, বেচারী ত আর এরূপ অভিনয়ে একমাত্র অভিনেতা নহে। সে নাবিকের পুত্র, লেখাপড়া শেখে নাই বলিলেই হয়, দর্শন-শাস্ত্রের ত্রিসীমা দিয়াও যায় নাই। সংসারের অনিত্যতা, পার্থিক প্রেমের অপদার্থতা প্রভৃতি সে বুঝে নাই। যাঁহারা বুঝিয়াছেন, তাঁহাদের ভিতরও ত কত লোক জন ফেডিসের মত হতাশ হইয়া, দেশত্যাগী হইয়াছেন, অনেকে যে, সংসারত্যাগী হইয়াছেন। অনেক ইলোইজার জন্যে যে, অনেক এবেলার্দকে মঠের সন্ন্যাসী হইতে হইয়াছে, তাহা ত পাঠকের জানা আছে। আমাদের দেশের সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের ভিতর খুঁজিলেও পাঠক অনেক এবেলার্দ পাইবে। দেখিবে, অনেকে প্রেমে হতাশ হইয়া সংসারত্যাগী হইয়াছে। এদেশে স্বাধীন প্রেম নাই, যুবক যুবতীর কোর্টশিপ বা বিবাহের পূর্ব্বে

আলাপ পরিচয় হয় না। তথাপি যখন এদেশেও অনেককে প্রেমে হতাশ হইতে হয়, তখন ইউরোপের কথা ত ধরিতেই নাই। যেখানে স্বাধীন প্রেমের আধিপত্য, যুবক যুবতীর বিবাহের পূর্ব্বে আলাপ পরিচয় হয়, সেখানে যে, অনেককেই প্রেমে হতজ্ঞান হইতে হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? জন ফেডিসকে কেহ দোষ দিও না। আর সুমতি পাঠকে, তুমি জীন গ্যালীকেও গালাগালি দিও না। তোমার বিবাহ হইয়াছে বাল্যকালে, পিতা মাতা যাঁহার হাতে তোমাকে সমর্পণ করিয়াছেন, তিনিই তোমার পতি হইয়াছেন; তোমার শিক্ষা অন্যরূপ। তুমি মনে জানে জান, পিতা মন্ত্র পড়িয়া যাঁহার হাতে তোমাকে দিয়াছেন, তিনিই তোমার ভর্ত্তা—পাতা; তিনিই তোমার ব্রহ্মা বিষ্ণু, তিনিই তোমার পরমেশ্বর! ভাগ্য-দোষে পাশ্চাত্য সমাজে এরূপ বিবাহের অভাব। পাশ্চাত্য যুবতী কোন কালে এ শিক্ষা পায় নাই; পাশ্চাত্য পিতা মাতাও ত স্বয়ংই কন্যার জন্যে বর বা পুত্রের জন্যে বধূ বাছিয়া দেন না। পাশ্চাত্য যুবতীকে স্বয়ংবরা হইতে হয়, নিজের পতি নিজে বাছিয়া লইতে হয়, তাহার ভ্রম পদে পদে। কিন্তু সে ভ্রমের জন্যে ত তাহাকে অপরাধিনী করা উচিত নহে। জীন গ্যালী জন ফেডিসকে পছন্দ করেন নাই, তাহাকে ভাল বাসিতে পারেন নাই। যাহাকে ভাল বাসিয়াছেন, তাহাকেই পতি করিয়াছেন। জন ফেডিস হতাশ হইয়া দেশত্যাগী হইল, জীন গ্যালীকে গালাগালি দিতে যাইবে কেন?

যে দিন ফেডিস জন্মভূমির কাছে জনমের মত বিদায় লন, সেই দিনই—ফেডিসের সেই ব্যসনের দিনই গ্যালীর উৎসব হইল, তাঁহার বিবাহ সম্পন্ন হইল, আনন্দ চলিল, যুবতী মনোমত যুবকের সহিত সংসার ধর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাঁহার আশালতা শুখাইতে লাগিল, ক্রমে ক্রমে দেখিতে লাগিলেন, যাহার হাতে মন প্রাণ দিয়াছেন, সে বিদ্বান হইয়াও মূর্খের অধম! সে দেহে সুরূপ হইয়াও হৃদয়ে কুৎসিত কুরূপ! দেখিলেন, সে নেশাখোর, সে জুয়া খেলে, সে পত্নীব্রত নহে। সর্ব্বনাশ! কিন্তু চারা নাই, নিজে হাতে করিয়া বিষ ভখিয়াছেন। তখন জনের কথা তাঁহার হৃদয়ে জাগিতে লাগিল, তখন জনকে তাহার সুরূপ সুন্দর বিদ্বান বুদ্ধিমান বলিয়া মনে হইতে লাগিল; অনুতাপে তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। কিন্তু সর্ব্বংসহা রমণী সব সহিতে লাগিলেন। ক্রমে পতি নিজের সম্পত্তি উড়াইয়া দিল, দিয়া পত্নীর পিতৃদত্ত ধনও নষ্ট করিল; শেষে ভগ্নহৃদয়ে অকালে প্রাণত্যাগ করিল!

নববিধবার তখন শোচনীয় দশা। বিবাহের কিয়দ্দিবস পরেই পিতা মাতার মৃত্যু হইয়াছে, ভ্রাতা নাই, ভাগনী নাই, পিতারও পিতা মাতা নাই। বিষয় বৈভব সব গিয়াছে; অসহায়া বিধবার দশা শোচনীয়। বিধবার বিবাহ হয়; কিন্তু প্রায়ই দেখিবে, যেখানে বিধবার ধন সম্পত্তি আছে, বা অসাধারণ রূপযৌবন আছে, সেই খানেই মধুকর উচ্ছিষ্ট চক্রে বসিবার জন্যে লালায়িত হয়। জীনের সে সব ছিল না! দুরবস্থার একশেষ, কোন দিন আহার জুটে, কোন দিন জুটে না! প্রতিবেশীরা আর কত সাহায্য করিবে বল?

হঠাৎ বন্দরে একখানা জাহাজ আসিল! দশ বৎসর পরে! জাহাজের প্রধান নাবিককেও ত কেহ চিনিতে পারিল না! তিনিও ত পরিচয়ের জন্যে ব্যস্ত নহেন, আসিয়াছেন, শেষদেখা দেখিবার জন্যে! আর কেহ নহে, তোমার সেই জন ফেডিস! হঠাৎ একজন পুরাতন পরমবন্ধুর সহিত দেখা হইল, তিনি চিনিতে পারিলেন না, কিন্তু জন ফেডিস তাহাকে চিনিতে পারিলেন। জনের দশ বৎসরে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, চেনা ভার! বন্ধুর তাদৃশ পরিবর্ত্তন হয় নাই, জন তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। যেমন চেনা, অমনই কথা বার্ত্তা। বন্ধু বলিলেন, জন এখন তোমার মতলব কি? জন—জন্মভূমি দেখিয়াই চলিয়া যাইব, আমরিকায় ছিলাম, সেই খানেই থাকিব। বন্ধু—এখনও তোমার মন শোধরায় নাই? জন—সে যা কোন কালে শুধাইবে না! বন্ধু—তা বটে! কিন্তু জীন গ্যালীরও বড় কষ্ট!

জন। সাগ্রহে—কেন কেন, তাহার কি হইয়াছে? পল্লীগ্রামের সরল লোক, অভিনয় জানে না। নবন্যাসের বা নাটকের নায়ক নহে। এরূপ অবস্থায় যে, আসল কথাই বিলম্ব করিয়া আনিতে হয়, তাহা জানে না। আমরাও পাঠক এরূপ অবস্থায় প্রবন্ধ বাড়াইতে রাজী নহি; পাঠক পাঠিকার কৌতূহল চরমে তুলিয়া প্রবন্ধের বাহার বাড়াইতে প্রস্তুত নহি। অতএব, আমাদের জন বন্ধুমুখে তৎক্ষণাৎ জীন গ্যালীর সমস্ত কথা শুনিয়া লইলেন, সমস্ত অবস্থা জানিয়া ফেলিলেন। কথা সাঙ্গ করিয়া বন্ধু বলিলেন, "আহা! জীনের আর কিছুই নাই! স্বামীই তাহার সিন্দুক খালি করিয়া গিয়াছে। সিন্দুকটী পর্য্যন্ত তাহাকে পেটের দায়ে বেচিতে হইয়াছে। আর চলে না। দিন আর যায় না।" জন ফেডিস তখন উত্তেজিত হইয়াছেন, জীনের যত দোষ ভুলিয়া গিয়াছেন। তাহার জন্যেই যে, দেশছাড়া বন্ধুছাড়া হইয়াছিলেন, তাহা পর্য্যন্ত ভুলিয়া গেলেন; চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "নাই বা থাকিল জীনের এক পয়সা। আমার ত যথেষ্ট আছে।" দশ বৎসর নিজগুণে জন অনেক উপার্জ্জন করিয়াছেন। এখন তিনি নিজের ঐ সুলুপখানির নিজে মালিক, নিজের টাকায় বাণিজ্য করেন। এক জায়গায় কিনিয়া মাল অন্য জায়গায় বেচেন। বেশ উপার্জ্জন হয়। একটা মার্কিণ বেঙ্কে জীনের যথেষ্ট অর্থ গচ্ছিত আছে।

দুই বন্ধুর কথাপ্রসঙ্গ সাঙ্গ হইল, বন্ধু জীন সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করিলেন, জীনের উদ্দেশ্য অভিলাষাদি সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করিলেন। তিনি মিতভাষী ছিলেন। দেখাইলেন,

"ক্রিয়া কেবলমুত্তরম্।" সপ্তাহ মধ্যেই গ্রামে উৎসব হইল, গ্রামের যত নর নারী উৎসবে যোগ দিল, গ্রাম্য গির্জ্জায় শুভকর্ম্ম সম্পন্ন হইল। জনের জীন আবার জনের হইল; জীনের জনও আবার জীনের হইল। এ মিলনে সুখের অবধি থাকিল না, সবুরে মেওয়া ফলিল। জনের জীন সেকেণ্ডহেণ্ড হইয়া আবার জনের হাতে আসিল।

তথাপি যাঁহারা বিধবাবিবাহের বিরোধী, তাঁহারাই পাশ্চাত্য মতে নির্ব্বোধের নরপতি। কিন্তু বস্তুতঃ তাঁহারা নির্ব্বোধ নহেন, তাঁহারা টাটকা সন্দেশ বাসী করিয়া খান না। তাঁহাদের এরূপ মেওয়ার জন্যে সবুরও করিতে হয় না। তাঁহারাই জানেন, প্রথার দোষেই অমৃতে গরল পড়ে, সন্দেশ পচিয়া যায়। জীনে জনে পরিণয়ের পূর্ব্বে প্রেম না হইলে ত বিপত্তি ঘটিত না, অমৃত গরল হইত না। পিতা মাতার নির্ব্বাচনই চূড়ান্ত। আর যাহার যিনি, ভবিতব্য তাঁহাকেই তাঁহার হাতে দেন। জন্ম মৃত্যু বিবাহ ঈশ্বরাধীন কার্য্য। "ধঃ কৌমারহরঃ সব এব হি বরঃ।" হিন্দু বালিকার পক্ষে একমেবাদ্বিতীয়ং; আর সত্যই ত তিনি ব্রহ্ম। হিন্দুকে মেওয়ার জন্যে সবুর করিতে হয় না, মেওয়াফল হিন্দুকে নিজে পাড়িতে কুড়াইতে হয় না। পিতা মাতা যাহা দিবেন, হিন্দুর পক্ষে তাহাই মেওয়া, তাহাই অমৃত। পরিণয় যে, হিন্দুর পবিত্রবন্ধন, স্বর্গের সম্বন্ধ। পরলোকেও জের চলিবে, এখানে ত সবে সূত্রপাত, না হয় জোর ভিত্তি স্থাপন; পরিণতি পরকালে। হিন্দুর বিবাহ সাত্ত্বিক, হিন্দুর বিবাহ পুত্রের জন্যে! পিণ্ডের জন্যে! পরকালের জন্যে!

ফরাসী যিহুদি।

পূর্ব্বে বটে খৃষ্টানের হাতে যিহুদির অতিপীড়নই হইত, এখন রুষ ছাড়া আর সর্ব্বত্রই ভাবান্তর হইয়াছে। কিন্তু মনে মনে এখনও অনেক খৃষ্টান যিহুদিদ্বেষী! যে দ্রেফুর জন্যে ফরাসিদেশে এত গণ্ডগোল, তিনি যিহুদি; যে জোলা দ্রেফুর অবিচারে আপত্তি করিয়া নিজে বিপন্ন হইয়াছিলেন, এখনও হইয়া আছেন, তিনিও যিহুদি। দ্রেফুর বিরোধীরা ফরাসিদেশের অনেক নীচ লোককেই যিহুদিদ্বেষী করিয়া তুলিয়াছে, যিহুদিদ্বেষ বড় বড় লোকের হৃদয়েও প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু যিহুদিসমাজ ধনবলে দুর্ব্বল নহে, এত কুবের আর কোন সমাজে নাই। বিলতের লণ্ডনে, অস্ত্রিয়ার বিয়েনায়, জর্ম্মণীর ফ্রাঙ্কফোর্টে এবং ফ্রান্সের প্যারিসে চারি রথশীল্ডবংশ আছেন, চারিটীই কুবেরবংশ। চারি বংশই এক বংশের শাখা, চারি ভ্রাতার বংশ, পরস্পর ঘনিষ্ঠতা খুব। রথশীল্ডদিগের অতুল ধন! অনেক রাজা ও গবরমেণ্টকেই ইহাঁদিগের কাছে ঋণী হইতে হইয়াছে, এখনও ঋণী হইতে হয়। ফরাসী গবরমেণ্ট ফরাসী সর্ব্বত্রই আরও অনেক আছেন। বেরণ হর্ষও বড় সামান্য লোক নহেন। তিনি দানে অদ্বিতীয়, কোন কোন বৎসর তাঁহার ৪॥০ কোটি টাকাও দানে যায়। তিনি যত যিহুদির রক্ষক, যিহুদি-পালনের সভা করিয়াছেন অনেক, তাঁহার আয় অসীম! বিলাতে যিহুদির বড় আদর। লর্ড বীকন্সফীল্ড ছিলেন যিহুদি, নিজেই খৃষ্টান হইয়াছিলেন। ফ্রান্সের অনেক যিহুদিও গবরমেণ্টের আদরভাজন। রথশীল্ডদিগের ত কথাই নাই। দ্রেফু সুতরাং নিতান্ত অগ্রাহ্য নহেন—যেহেতু অগ্রাহ্য সমাজের নহেন। যিহুদির সংখ্যা রুষেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। যিহুদি আছে রুষে ৩০ লক্ষ, অস্ত্রিয়ায় ১৬ লক্ষ ৫০ হাজার; জর্ম্মণরাজ্যে ৫ লক্ষ ৬২ হাজার; রুমানীয়ায় ২ লক্ষ ৫ হাজার; তুরস্কে ১ লক্ষ, ৫ হাজার; হলন্দে ৮২ হাজার; ফ্রান্সে ৬৩ হাজার; ইংলণ্ডে ৭০ হাজার; ইতালিরাজ্যে ৪০ হাজার; সুইজরলণ্ডে ৭॥০ হাজার; নরোয়ে সুইডীনে ৭ হাজার; সার্ভিয়ায় ৩॥০ হাজার; গ্রীসে ২৫০ হাজার; স্পেনে ২ হাজার; মোট ইউরোপে প্রায় ৬০ লক্ষ। এশিয়ায় প্রায় ৩ লক্ষ; আফরিকায় প্রায় ৩॥০ লক্ষ; আমরিকায় ২॥০ লক্ষ; অষ্ট্রেলিয়ায় ১৫।১৬ হাজার। জগতে যিহুদি আছে, ৮০ লক্ষ আন্দাজ। চারি বৎসরের পুরাতন হিসাব। সংখ্যায় দুর্ব্বল হইলেও যিহুদি ধনে দুর্ব্বল নহে। ইহাদের গতিবিধি সর্ব্বত্র, ব্যবসায় বাণিজ্য সর্ব্বত্র। ধনবৃদ্ধি করিতে যিহুদির মত দক্ষ প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। আমাদের এজরা গবরমেণ্ট আপকার প্রভৃতির বংশও ত ধনবলে দুর্ব্বল নহেন। একালে যাঁহার ধন, তাঁহারই মান। কবিবর বায়রণ গাহিয়া গিয়াছেন, "রথশীল্ডেরাই দেশের রাজা।" বস্তুতও অনেক বার ইহাঁরা গবরমেণ্টকে রক্ষা করিয়াছেন। যখনই যুদ্ধবিগ্রহাদি উপলক্ষে হঠাৎ অর্থাভাব হইয়াছে, তখনই গবরমেণ্টকে রথশীল্ডদিগের কাছে হাত পাতিতে হইয়াছে। ফরাসী গবরমেণ্টকে অনেকবার হাত পাতিতে হইয়াছে, এখনও পাতিতে হয়। সুতরাং যিহুদি ধনপতির মানও গবরমেণ্টকে রাখিতে হয়। যিহুদি-সমাজে যেরূপ সামাজিক সহানুভূতি, আর কোন সমাজে সেরূপ কহে। রথশীল্ডেরা যখনই গবরমেণ্টকে টাকা ধার দিয়াছেন, তখনই স্বজাতির কিছু না কিছু সুবিধা সুযোগ করিয়া লইয়াছেন। সুযোগের সর্ত্ত করিয়া তবে টাকা দিয়াছেন। চারি বংশেরই এই নিয়ম। এরূপ অবস্থায় ফরাসি রাজ্যের কোন রাজনীতিক বা রাজপুরুষের পক্ষেই যিহুদিদ্বেষ শোভা পায় না। অসামরিকদিগের ততটা দ্বেষ নাই, সামরিকপ্রধানদিগের দ্বেষ দেখিয়া অনেককেই উদ্বিগ্ন ভীত হইতে হইয়াছে। এক মাঘে জাড় পলায় না; যিহুদি সমাজকে তুষ্ট করিতেই হইবে। অতএব যিহুদি দ্রেফুর সুবিচারই শ্রেয়ঃ। ন্যায়পরতার জন্যে শ্রেয়ঃ, ফরাসি গবর্ণমেণ্টের স্বার্থপরতার জন্যেও শ্রেয়ঃ।

চক্রবাক-মিথুন।

(১)

বহিছে গণ্ডকী অই করি কুল কুল
প্রেমের লহরী তুলি ভাসায়ে দুকূল।
অস্তাচলে গেছে রবি,
নীরব প্রকৃতি দেবী
পুরুষেরা সান্ধ্যধ্যান-মননে ব্যাকুল।
সৈকতে বিরহশোকে কাঁদে কোককুল॥

(২)

রথাঙ্গযুগল যেন দিবসে আছিলা
চন্দ্রের চন্দ্রিকা কিম্বা জলদে চপলা।
দুটি যেন এক কায়া,
একটি অন্যের ছায়া;
বক্ষে বক্ষ মিশাইয়া
চক্ষে চক্ষু মিলাইয়া
গাইত প্রণয়-গীতি জড়াইয়া গলে
অথবা খাইত সুখে শৈবালসকলে।
উভয়েই এক লক্ষ্যে
সংবাহি একত্র পক্ষে,
উড়িত আকাশে যথা প্রণয়-পাগল
সপতিপার্ব্বতি-রতি—দেহার্দ্ধযুগল॥

(৩)

সহসা শর্ব্বরী দেবী সকোপে আসিয়া
কিদোষে দোঁহার আঁখি দিলরে বাঁধিয়া।
অন্ধকারে অন্ধ হ'য়ে
প্রেমান্ধ বিহগদ্বয়ে
সন্নিকটে সখী,—তবু খুঁজিয়া বেড়ায়*
আর্ত্তনাদে হৃদয়ের বেদনা জানায়॥

(৪)

শর্ব্বরি রে! কিবা তোর পাষাণ হৃদয়!
মিথুন মুরতি বুঝি নেত্রে নাহি সয়।
চাঁদেরে হারায়ে তোর
তাই এ বিদ্বেষ ঘোর?
কিন্তু রে বুঝিও বাহ্য আঁখির বাঁধায়—
অন্তরনিহিত ছবি জ্বলন্ত দেখায়!

মূর্খ সেই যেবা বলে "বড় দুঃখে সুখ
নিশিযোগে ব্যাধে যদি বাঁধে মুখে মুখ"।*
নয়নে নয়ন রাখি
যে সুখ লভয়ে পাখি,
সে সুখ আঁধারে কিরে দেয় স্পর্শসুখ?
পৌরুষ কি করে, যেথা বিধাতা বিমুখ!
চক্রবাক! তাই বুঝি প্রিয়াপরাঙ্মুখ
তুমিই বিরহ জান সুখ কিবা দুখ।

(৬)

পবিত্র প্রণয় ছবি! আয় পাখি আয়!
আয় তোরে বুকে রাখি ধরি তোর পায়।
এক পত্নী এক পতি
এক নহে অন্যে রতি।
যেথা দেখ দুই দুই,
চঞ্চুপুটে চঞ্চুথুই
বহিছে দাম্পত্যপ্রেম শিরায় শিরায়
এ প্রেম কৃতঘ্ন নরে কেই বা শিখায়!

(৭)

ওদের একটি কেন না করিলি মোরে
জিজ্ঞাসি বিধাতঃ! তাই তোরে যোড়করে।
ওরূপ আমরা দু'য়ে
চঞ্চুপুটে চঞ্চুথুয়ে
কালস্রোত সঙ্গে রঙ্গে যাইতাম ছুটি
নিশির আঁধারে সহি দারুণ ভ্রুকুটি।
শেষ হলে পর্য্যটন,
দিইতাম সন্তরণ,
মানস-সায়রে মোরা কর্ম্ম-ক্রৌঞ্চী কাটি;
তুলিয়া প্রফুল্ল হৃদে
চঞ্চুপুটে কোকনদে
পূজিতাম হরগৌরী-চরণচারিটি
খেলিতাম তথা ভাসি উলটি পালটি
দুটিতে একটি কভু একটিতে দুটি॥

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ দত্ত।

হাতুয়া।

* নিশাগমে চক্রবাক-মিথুনের একটীর নদীর এপারে, অপরটীর পর পারে থাকা প্রসিদ্ধি আছে, এমন কি মূর্খ মাঝীরাও ইহা বলিয়া থাকে। আমি কিন্তু বিশেষ দৃষ্টি করিয়া দেখিয়াছি,—বস্তুতঃ উহারা এপারে ওপারে যায় না, একপারেই উভয়ে থাকে। রাত্র্যন্ধত্ববশতঃ কতকটা দূরে পড়ে এবং একটা অন্যের রবানুগামী হইয়া উড়িয়া

* চক্রবাক বলে সখি এ বড় কৌতুক।
বিধিহতে ব্যাধ ভাল বড় দুঃখে সুখ।" রসসাগর।

† "হংসদ্বারং ভৃগুপতিযশোবর্ত্ম যৎ ক্রৌঞ্চরন্ধ্রম্" মেঘদূতম্। প্রাচীন কবিরা যে হংসের মানস সাগরে গমনের কথা বলেন, তাহা যে এই চক্রবাক-হংস, তাহার সন্দেহ নাই! এই পক্ষী দেখিতে ঠিক হংসের মতন, কেবল রক্তবর্ণ; আর শীতাগমে পর্ব্বত হইতে

জন্মভূমি।

নবম ভাগ। { চৈত্র। ১৩০৫। } ৪র্থ সংখ্যা।

মজুরে মহাপ্রলয়।

(১)

সাম্যবাদের কথায় সোশালিষ্ট কমিউনিষ্ট নিহিলিষ্ট এনার্কিষ্টের কথা কহিয়াছি, সকলেরই পরিচয় দিয়াছি; সাম্যবাদই যে, সকল সম্প্রদায়ের উৎপাদক এবং উত্তেজক, তাহাও দেখাইয়া দিয়াছি; ইউরোপের রোগ আমরিকায় প্রবল; পৃথিবীর যেখানে ইউরোপীয়দিগের আধিপত্য হইয়াছে, রোগ সেইখানেই উপস্থিত হইয়াছে। মূলবৃক্ষে যেরূপ ফল ফলে, চারায়ও ত সেইরূপ ফলই ফলিয়া থাকে। বীজের চারা অপেক্ষা কলমের চারায় ফল বরং শীঘ্রই ফলিয়া থাকে। আমরিকায় ইউরোপীয় সাম্যবাদ-বৃক্ষের কলমের চারা, যত উপনিবেশেই কলমের চারা। সাম্যবাদের সৃষ্টি হইয়াছে হউরোপে বটে; কিন্তু পুষ্টি প্রথমে আমরিকায় হইয়াছে। ইংলণ্ডের সাম্যবাদ ত আজিকার নহে। যখন সম্ভ্রান্ত সম্পন্ন-ভূস্বামিবৃন্দ রাজা জনকে ধরিয়া মেগনাচার্টার সহি করাইয়া লইয়াছিলেন, তখনই ত সাম্যবাদের সূচনা হইয়াছিল। তখন জমিদার-সম্প্রদায়ে যে সাম্যবাদ ঢুকিয়াছিল, রাজা প্রথম চার্লসের সময়ে গৃহস্থ-সম্প্রদায়ের ভিতরও সেই সাম্যবাদই প্রভুত্ব করিয়াছিল। আবার হেম্‌ডেন ক্রমোয়েল প্রভৃতির জন্যে যে সাম্যবাদের পুষ্টি হইয়াছিল, তাহাই ত পরে ফরাসিরাজ্যে প্রবল হইয়া বিপ্লব ঘটাইয়াছিল। কিন্তু প্রাচীনকালেও গ্রীস রোমে সাম্যবাদ ছিল; যেখানে রাজহীন রাজত্ব ছিল, সেখানেই সাম্যবাদও ছিল। আর ইংলণ্ডে ক্রমোয়েলের সময়ে যে সাম্যবাদ পুষ্ট হইয়াছিল, আমরিকায় ত সেই সাম্যবাদই প্রবল হইয়া রাজ্যকে অরাজক করিয়া দিয়াছিল। আমরিকায় রোগ প্রবল হইবার পূর্ব্বেই ফরাসিরাজ্যে সূচনা হইয়াছিল। আমরিকার অভিনয় দেখিয়াই ফরাসীরা অভিনয়ে লাগিয়া গিয়াছিল। আবার ফরাসীর লাফেতেই ত আমরিকার অভিনয়ে নেতৃত্ব করিয়া, স্বদেশে আসিয়া অভিনয়ের সূত্রপাত করিয়া দিয়াছিলেন। ফলতঃ ইউরোপের সাম্যবাদই এখন জগতের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে; সাম্যবাদের বল পলকে পলকে বৃদ্ধি পাইতেছে; দলে লোক বাড়িতেছে পঙ্গপালের মত! ইউরোপের যত রাজ্যেই ঘোর আতঙ্ক উপস্থিত। যত রাজ্যেই যে, মজুরগুলা দলে মিশিতেছে; মজুরদলের জন্যে যত কলকারখানাকে প্রায়ই ত বিকল হইতে হইতেছে। যত কলকারখানার যত মজুরই মনে মনে বিগড়িয়া আছে। "আমরা খাটিতেছি, তাই ধনাগম হইতেছে, অথচ আমাদের তাদৃশ প্রাপ্তি নাই; কর্ত্তারা রাজত্ব করিতেছেন, আর আমাদের ডাইনে আনিতে বাঁয়ে নাই; আমাদের কষ্ট বার মাস!" এই ধারণা ইউরোপ আমরিকার এবং যত উপনিবেশের যত মজুরের মনেই স্থান পাইয়াছে। সাম্যবাদের আলোচনায় বলিয়াছি, অদৃষ্টে ও কর্ম্মফলে বিশ্বাস না থাকাতেই, যত খৃষ্টানসম্প্রদায়ে সর্ব্বনাশ ঘটিতে বসিয়াছে; ইউরোপ আমরিকা এবং যত উপনিবেশের শ্রমজীবীরা তাই কথায় কথায় প্রভুদিগের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিতেছে; কথায় কথায় ধর্ম্মঘট করিতেছে; কথায় কথায় জটলা করিতেছে; হাঙ্গামা করিতেছে! পুরুষের রোগ স্ত্রীলোকেও ঢুকিয়াছে. পুরুষের ধর্ম্মঘটে মেয়েরাও ঘটা করিতেছে! যত গবরমেণ্টকেই সময়ে সময়ে অন্ধকার দেখিতে হইতেছে। যত ধর্ম্মঘটেই শ্রমজীবীদিগের জয়লাভ হইতেছে। প্রভুরা যেন কার্য্যতঃ দাস হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদের জিদ প্রায় বজায় থাকে না, ভৃত্যদিগের জিদই বজায় থাকে। যত রাজ্যেই

মজুর-তুষ্টির

চেষ্টা হইতেছে; আইন কানুনও হইতেছে; নানারূপ আয়োজন অনুষ্ঠান হইতেছে। বিলাতের চারিদিকেই "কন্‌সিলিয়েশনবোর্ড" বা মধ্যস্থসভা বসান হইয়াছে; প্রভু ও ভৃত্য, নিয়োক্তা নিযুক্ত, দুই পক্ষের প্রতিনিধিই সভায় আছেন। এমন ব্যবসায় নাই, যাহাতে মজুর মিস্ত্রীদিগের অবাধ্যতা নাই, বিদ্রোহপ্রবৃত্তি নাই, ধর্ম্মঘট নাই;

সুতরাং বিলাতে এমন ব্যবসায় নাই, যাহাতে মধ্যস্থ-সভা নাই। তথাপি ত আশানুরূপ ফল হইতেছে না। শ্রমজীবীরা যত প্রশ্রয় পাইতেছে, ততই চড়িয়া উঠিতেছে। যত ব্যবসায়ের যত শ্রমজীবীরই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দল আছে। এই সকল দলকে "ট্রেড ইউনিয়ন" বলে। ট্রেড ইউনিয়ন বা শ্রমজীবিসমবায় নাই কোন্ ব্যবসায়ে? রুটির ব্যবসায়ে আছে, ইমারতী ব্যবসায়ে আছে, কাটারার কাজে—ছুতার মিস্ত্রীদিগের ব্যবসায়ে আছে, চুরটের ব্যবসায়ে আছে, দরজীর ব্যবসায়ে আছে, গাড়ীর মিস্ত্রিখানায় আছে, পিপা টবের ব্যবসায়ে আছে, কামার মিস্ত্রীর ব্যবসায়ে আছে, কল-চালকের ব্যবসায়ে আছে, পিতল কাঁসা প্রভৃতির কাজে আছে, খনির কাজে ত খুবই আছে, চীনা বাসনের ব্যবসায়ে আছে, ছাপাখানার ব্যবসায়ে আছে, বইবাঁধার ব্যবসায়ে আছে, ঘোড়ার সাজে আছে, জুতার কাজে আছে, জাহাজ নির্ম্মাণে আছে, জাহাজী বয়লারের কাজে আছে, কাপড় সুতার কাজে ভয়ঙ্কর আছে, রেলে ষ্টীমারে ট্রামে ডকে আছে, কৃষির কাজে আছে, গ্যাসের কাজে আছে, ঔষধপত্রের কাজে আছে। পুরুষদিগের ন্যায় স্ত্রীলোকদিগেরও আছে; নাই যে, কোন্ কাজে কোন্ ব্যবসায়ে, তাহাই ত বলা যায় না!

কুঠি ও কারখানা

আছে ত বিলাতে কম নহে! ১৮৯৪ সালের হিসাবে দেখা যায়, ফেক্টরি বা কুঠি ছিল বিলাতে ৭৪ হাজারেরও অধিক। আর ওয়ার্কশপ বা কারখানা ছিল ৯৬ হাজারেরও অধিক। চারি বৎসরে বাড়িয়াছে; হয়ত দুই প্রকারে ২ লক্ষ দাঁড়াইয়াছে! ঐ সালেই দেখা হইয়াছিল, খাটে প্রায় ৯৮ লক্ষ লোক; চারি বৎসরে ১ কোটির উপর দাঁড়াইয়াছে। মেয়ে পুরুষ বালক বালিকা, সকলেই খাটে; এক কোটি না হইবে কেন? দুই লক্ষ শ্রমিকশালার এক কোটি লোকের ভিতর সাম্যবাদ ঢুকিয়াছে। বল দেখি, বিলাতে কি সর্ব্বনাশেরই সূত্রপাত হইয়াছে! কিন্তু ইউরোপ আমরিকার প্রায় সর্ব্বত্রই এইরূপ। যত উপনিবেশেও এই ভাব! ভাবিলে যে, হতবুদ্ধি হইতে হয়! দল হইয়াছে সর্ব্বত্র, সকল প্রকারেরই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দল আছে। আবার সকল দলেই পরস্পর ঘনিষ্ঠতা—সহানুভূতি—একতা!। যেখানে সাম্য, সেইখানেই মৈত্রী; আর সর্ব্বত্রই স্বাধীনতা! মহাপ্রলয় যে, প্রত্যহ হয় না, ইহাই বিচিত্র! শ্রমজীবীদিগের সভা আছে। সভাপতিরা বিদ্বান বুদ্ধিমান। সাম্যবাদের যে, অনেক প্রচারক। ইহাঁরাই শ্রমজীবিদলের দলপতিত্ব করিয়া থাকেন, অনেকে আবার পার্লেমেণ্টের সভ্যও হন। এখনও পার্লেমেণ্টে অনেকে আছেন। বরন্স, বর্ট, উডস, পিকার্ড, উইলসন, ম্যান প্রভৃতির যে, প্রতিপত্তিও আছে। কীয়ার হার্ডির নামে যে, এদেশেও আসিয়াছে! বিদ্বান বুদ্ধিমান সাম্যবাদীরাই ত যত নির্ব্বোধকে ক্ষেপাইয়া দিয়াছেন। ক্ষিপ্ততাও ত চরমে উঠিয়াছে! আবার যত দেশের যত দলই পরস্পর এক স্বার্থে এক মতে আবদ্ধ। এই ধর, খনির দল; ইউরোপের যেখানে যত খনি আছে, সর্ব্বত্রই খনির যত শ্রমজীবীর দল বা সভা আছে। সকল দেশের সকল দলেই চিঠী পত্রাদি চলে, বর্ষে বর্ষে মহাসভা হয়। সেবার জর্ম্মণীর বার্লিন সহরে খনিশ্রমীদিগের মহাসভা হইয়াছিল। বিলাত, জর্ম্মণী, অস্ট্রিয়া, ফান্স এবং বেলজিয়মের খনিজীবীরা ঐ মহাসভায় প্রতিনিধি পাঠাইয়াছিলেন। বিলাতের (আয়রলণ্ড ছাড়া) প্রতিনিধি ছিলেন ৩৮ জন, জর্ম্মণীর ৩৯ জন, অস্ট্রিয়ার ২ জন, ফ্রান্সের ৪ জন, বেলজিয়মের ৩ জন। ১৮৯৪ সালে বিলাতের যত ট্রেড ইউনিয়নের বা বিবিধ ব্যবসায়ঘটিত যত শ্রমজীবিসম্প্রদায়ের মহাসভা হইয়াছিল, বসিয়াছিল নরইচ সহরে। স্ব স্ব সম্প্রদায়ের স্বার্থের আলোচনার চেষ্টা সকল দলই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র করিয়া থাকে। আবার সকল দলের প্রতিনিধিরা সার্ব্বজাতিক কংগ্রেসে বসিয়া নানাবিষয়ের আলোচনা ও সংকল্প করিয়া থাকেন।

কংগ্রেসের

আলোচনায় আসে অনেক কথা! পাঠক, ইউরোপের মজুর লোকে বর্ষে বর্ষে যে সহাসভার আয়োজন করে, তাহার নাম কংগ্রেস। মার্কিণ রাজ্যের পার্লেমেণ্টের নাম কংগ্রেস। ইউরোপের মজুর সভাকে বলে কংগ্রেস; ভারতে যে নেশানাল কংগ্রেস হইয়াছে, তাহার নামটা ত তবে সম্ভ্রমসূচক না হইতেও পারে। মজুর কংগ্রেসে বিচার বিতর্ক হয়, রেজলিউশন পাস হয়, প্রস্তাব সমর্থন হয়, বক্তৃতারও অভাব হয় না। আবার পার্লেমেণ্টের সোশালিষ্ট বা সাম্যবাদী সভ্যেরা উপস্থিত থাকিয়া অধ্যক্ষতা করেন বলিয়া, সময়ে সময়ে বক্তৃতার বেশ বাহারও হইয়া থাকে! আলোচ্য আলোচনার একটু আভাস দিয়া রাখি। বিলাতের নরইচ ট্রেড ইউনিয়নের যে কংগ্রেস হইয়াছিল, তাহাতে আলোচ্য ছিল অনেক; অনেক রেজলিউশন পাস হইয়াছিল। বিলাতী পার্লেমেণ্টে যাহাতে শ্রমজীবিসম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা আধিপত্য করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল; পার্লেমেণ্টের উপস্থিত প্রণালীর শোধন করিতে চাওয়া হইয়াছিল—সুতরাং লর্ড হার্টসের বিরুদ্ধে রেজলিউশনও জারী হইয়াছিল; দেশে ট্রেড-ইউনিয়ন বা শ্রমজীবিসভার সংখ্যা ও প্রতিপত্তি আরও বাড়াইবার প্রস্তাব হইয়াছিল। শ্রমজীবিসম্প্রদায়ের যে সকল প্রতিনিধি পার্লেমেণ্ট বসেন, তাঁহাদের অবস্থা তত ভাল নহে। অন্যান্য সভ্যেরা যেরূপ স্বরের খাইয়া পার্লেমেণ্টের কাজ করিতে পারেন, ইহাঁরা সেরূপ পারেন না; শ্রমজীবিসম্প্রদায়কেই খরচা দিতে হয়। সুতরাং কংগ্রেসে প্রস্তাব হইয়াছিল, পার্লেমেণ্টের সভ্যদিগকে গবরমেণ্টের

বেতন বা বারবরদারী দিতে হইবে। বিলাতের অনেক রেডিকেল সভ্যই এই মতের পোষক, সরকারী বেতন বা বৃত্তি বরাদ্দ হইলে যে, ইহাঁদের সকলেরই সুবিধা। আয়রলণ্ডে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শ্রমজীবি সভা আছে, বিলাতের আয়রলণ্ডের যত সভাকেই একসূত্রে আবদ্ধ করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। যাহাতে শ্রমজীবীদিগের ঘর-ভাড়ার সুবিধা হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে বলা হইয়াছিল। রোজ কেহ ৮ ঘণ্টার অধিক খাটিবে না, সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টার অধিক নহে; এই প্রস্তাবই হইয়াছিল কিন্তু সর্ব্বপ্রধান। আট ঘণ্টার জন্যে জিদ চলিতেছে যত দলে; শুদ্ধ বিলাতে নহে, ইউরোপ আমরিকা এবং উপনিবেশের সর্ব্বত্র। বিলাতে গবরমেণ্টকে পলটন ও পোতের শ্রমশালায় এই মতে চলিতে হইতেছে। শ্রমজীবীরাও খুব প্রশ্রয় পাইয়াছে। মজুরকংগ্রেসে কৃষিশ্রমীদিগের সুবিধা করিতে বলা হইয়াছিল, ইহাদের উপার্জ্জন-পথ স্থির করিয়া দিতে চাওয়া হইয়াছিল। এই উদ্দেশে স্বতন্ত্র আইন করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল। সকল রাজ্যেই কারাগারে নানারূপ শিল্পকার্য্য হইয়া থাকে, কারাগারের শিল্পজাত সাধারণ শিল্পজাতের অপেক্ষা স্বল্পমূল্যে বিক্রীত হয়; সকল দেশেরই ত গবরমেণ্ট কেবল খরচা পোষাইলেই তুষ্ট। এরূপ কারাজাত দ্রব্য বিলাতেও যায়। কংগ্রেসে প্রস্তাব হইয়াছিল, যে এইরূপ বৈদেশিক কারাজাত দ্রব্যের আমদানী করিবে, তাহারই রাজদ্বারে দণ্ড হইবে। কুঠি কারখানার সরকারী পরিদর্শক আরও বাড়াইতে বলা হইয়াছিল। স্বস্থানে যথেষ্ট মজুর থাকিতেও যে ব্যক্তি অন্যত্র হইতে মজুর আনিয়া কাজ চালাইবে—অর্থাৎ মজুরদিগের ধর্ম্মঘট বিফল করিয়া দিতে চাহিবে, তাহারও রাজদ্বারে দণ্ড হইবে; নরইচের কংগ্রেসে এরূপ প্রস্তাবও হইয়াছিল। বেতনাদির সুবিধার কথা ত হইয়াই ছিল। মজুরেরা প্রভুদের নামে সহজে নালিশ করিতে পারিবে, যাহাতে এরূপ ব্যবস্থা হয়, তাহারও প্রস্তাব না হইয়াছিল এরূপ নহে। তাহার পর প্রস্তাব হইয়াছিল, জমিদারদিগের জমিদারী থাকিবে না, দেশের যত ভূমি-সম্পত্তির উপর যত লোকেরই অধিকার হইবে; অর্থাৎ জমিদারশ্রেণীর উচ্ছেদ করিয়া গবরমেণ্টকে যত জমি খাসে লইয়া বিলি করিয়া দিতে হইবে। আমরিকার হেনরি জর্জ্জই এই ধুয়া ধরিয়া দিয়াছেন; এই মত যত লোকের মাথায় ঢুকাইয়া দিয়াছেন। মজুরী করা ভিন্ন যাহাদের অন্য উপায় নাই, এরূপ বৈদেশিকদিগকে বিলাতে থাকিতে দেওয়া হইবে না, কংগ্রেসে এরূপ প্রস্তাবও হইয়াছিল। আবার যাহাতে রাজ্যের যত ব্যবস্থাপকসভায় অর্থাৎ পার্লেমেণ্ট, মন্ত্রিসভায়, যত মিউনিসিপাল সভায়, যত ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডে, যত লোকাল বোর্ডে এবং এবংবিধ যত সভায় শ্রমজীবীদিগের প্রতিপত্তি হয়, অর্থাৎ এই দলের প্রতিনিধিরা বসিতে পান, তাহারও প্রস্তাব করা হইয়াছিল। অন্যান্য সমিতি সভায়ও এই দলের এইরূপে প্রতিপত্তি বাড়াইতে যাওয়া হইয়াছিল।

শ্রমজীবিকংগ্রেসের মতই যত শ্রমজীবিসভার অনুমোদিত। সর্ব্বত্রই এক রা। পরিচালনে বেশ ব্যবস্থা বন্দোবস্ত আছে। মুটে মজুর মিস্ত্রীদিগের সভায় যেরূপ গোলযোগের ও বিবাদ বিসংবাদের সম্ভাবনা করা যায়, সেরূপ ত প্রায় কুত্রাপি নাই। সাম্যবাদী বিদ্বান বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের হাতে পরিচালনভার আছে বলিয়াই সুব্যবস্থা চলিতেছে; আর যত শ্রমজীবিসভার ও শ্রমজীবিসম্প্রদায়ের শক্তি ক্ষমতাও ত ক্রমে বাড়িয়া উঠিতেছে। সম্প্রদায় অনেক,

সভাও অনেক!

কয়লা-মজুরদিগের স্বতন্ত্র সভা আছে; ইংলণ্ডে আছে, স্কটলণ্ডে আছে; আবার যত খনির যত মজুরের স্বতন্ত্র আছে। কয়লা-ব্যবসায়ের মুটে মজুরদিগেরও আলাহিদা আছে। বলিয়াছি ত, খনিজীবীদিগেরও যত সভার আবার কংগ্রেস বা সমবায় আছে। যত ব্যবসায়েরই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সভা আছে, আবার সকল সভার সমবায় বা কংগ্রেস আছে। বিলাতীর বিলাতে আছে, অন্যান্য রাজ্যেরও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আছে। আবার সার্ব্বজাতিক সমবায়েরও যে, ব্যবস্থা আছে, ইণ্টারনেশনাল কংগ্রেসে বা সার্ব্বজাতিক মহাসমবায়ে যে, উৎসাহ উত্তেজনার অধিপত্য হয়, তাহাও পাঠককে দেখাইয়াছি। বিলাতেই শ্রমিকসম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় আছে। আবার অল্পদিন হইল, একটা দল হইয়াছে, তাহার নাম ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লেবার পার্টি বা শ্রমের স্বাধীন সম্প্রদায়। এ সম্প্রদায়ের শ্রমজীবীরা লিবারেল কন্সার্ব্বেটিব কোন দলেরই তোয়াক্কা রাখিতে চান না। ইহাঁদেরও কয়েকজন প্রতিনিধি কমন সভায় বসিয়া স্বাধীনভাবে—শুদ্ধ শ্রমজীবিসম্প্রদায়ের হিতে মন রাখিয়া—কাজ করিতেছেন। একটী লেবর ইলেক্টোরাল এসোসিয়েশন আছে—অল্প দিন হইয়াছে। এ সভার সভ্যেরাও পার্লেমেণ্টে আপনাদের প্রতিনিধি পাঠাইবার জন্যে ব্যস্ত, চেষ্টাও করিয়া থাকেন সর্ব্বত্র। কিন্তু যে স্থলে আপনাদের লোক না মিলে, সে স্থলে লিবারেল কন্সার্ব্বেটিব দলের লোককে শ্রমজীবিহিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া, তবে ভোট দেন। গ্লাডষ্টোনের জন্যেই ত যত মুটে মজুরেরও নির্ব্বাচনশক্তি হইয়াছে, সকলেই পার্লেমেণ্টের সভ্য-নির্ব্বাচনে ভোট দিতে অধিকারী হইয়াছে। আবার একটা স্ত্রীলেবর এসোসিয়েশন হইয়াছে। এসভারও উদ্দেশ্য, শ্রমজীবিদলের স্বার্থ সম্পাদন। পার্লেমেণ্টের সহিত এ সভারও সম্বন্ধ আছে।

ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লেবরপার্টি

বা স্বাধীন শ্রমিক সমবায়ের সৃষ্টি হইয়াছে সোশালিষ্ট বা সাম্যবাদীদিগের চেষ্টায়। ১৮৮৯ সালে বিলাতের যত

ডকের মজুর ধর্ম্মঘট করিয়া ভয়ঙ্কর বিভ্রাট ঘটাইয়াছিল, বিলাতের জাহাজী কাজ বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। জের চলিয়াছিল জগতের চারিদিকে। যত উপনিবেশ হইতেই ডকের ধর্ম্মঘটীরা সাহায্য ও সহানুভূতি পাইয়াছিল। অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত জের হইয়াছিল; সেখানেও ধর্ম্মঘট হইয়াছিল। সেই ঘটনায় শ্রমজীবীদিগের শক্তি সাধ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াই সাম্যবাদী সোশালিষ্টেরা আসরে নামিয়াছিলেন। ১৮৯২ সালে যখন বিলাতী পার্লেমেণ্টের নির্ব্বাচন হয়, সেই সময়েই সাম্যবাদীরা প্রকৃতপ্রস্তাবে কার্য্যারম্ভ করিয়াছিলেন। নির্ব্বাচনে আপনাদের মত ও মন্ত্রর চারিদিকে প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রমজীবীদিগের সাহায্যে আপনাদের দলের লোককে পার্লেমেণ্টে পাঠাইবার চেষ্টা দেখিয়াছিলেন, কোন কোন স্থলে সফলকামও হইয়াছিলেন। সাম্যবাদের বিলাতে দুইটা সভা আছে; একটার নাম সোশাল ডেমক্রাটিক ফেডারেশন বা সামাজিক লোকতন্ত্রের সমবায়, অন্যটার নাম ফেবীয়ান সোসাইটী। দুই সভারই মতামত প্রায় একপ্রকার।

ফেবিয়ান সোসাইটী

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ১৮৮৩ সালে। এ সভায় নিতান্ত নিম্নশ্রেণীর সম্বন্ধ নাই। গৃহস্থ গোছের সোশালিষ্ট বা সাম্যবাদীরাই এই সভার সভ্য। সভার মত, "ভূমি ও ধন দুই দশ জনের হাতে না রাখিয়া, যত লোকেরই হস্তগত করিতে হইবে, এবং এইরূপে সমাজের নূতন সংঘটন,—নূতন গঠন করিতে হইবে। এইরূপ ব্যবস্থা না হইলে, যত লোকের কখনই সুখ স্বচ্ছন্দ হইবে না।" ভয়ঙ্কর মত! এই মতের—এই মন্ত্রর—উপাসক হইয়াই ত নিহিলিষ্ট এনার্কিষ্টেরা যত রাজ্যে সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছে। ১৮৯৪ সালে ফেবিয়ান সোসাইটীর সভ্যতালিকায় নাম ছিল ৬৮১ জনের, ৪ বৎসরে অনেক বাড়িয়াছে। সাম্যবাদের প্রচার করাই সভ্যদিগের প্রধান কার্য্য। ১৮৯৪ সালে ১৫০ সভ্য শুদ্ধ সাম্যবাদপ্রচারে নিযুক্ত ছিলেন; ১৫০ জনে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তা ও বক্তৃতার সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে! শাখা চারিদিকে। ১৮৯৪ সালে অষ্ট্রেলিয়া, কানাডায় শাখা বসিয়াছিল; ভারতের বোম্বাই সহরেও শাখা ছিল, এখনও আছে বোধ হয়। নিজ বিলাতের ৭৫টা সহরে সভার শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; সংখ্যা আরও বাড়িয়াছে। ফেবীয়ান সোসাইটী শুদ্ধ বক্তৃতায় তুষ্ট নহেন, আবার সাম্যবাদের পুস্তক পুস্তিকারও প্রচার ও বিতরণ করিয়া থাকেন। উপদেশ ও শিক্ষাও সঙ্গে সঙ্গে আছে! লণ্ডনে পক্ষে পক্ষে লোককে সাম্যবাদে উপদেশ দিবার ব্যবস্থা আছে, সর্ব্বত্রই আছে। লণ্ডনেই বড় আড্ডা। আর একটী পীজ সাহেব বড় সভার সেক্রেটরি। সভার উদ্দেশ্য কিরূপ তাহা সহজেই বুঝিতে পারিবে। দাদাভাই নরৌজী এই সভার বৈঠকে বসিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন; আমাদিগকেও বিরক্ত হইতে হইয়াছিল।

সোশাল ডেমক্রাটিক।

সোশাল ডেমক্রাটিক ফেডারেশনের কথা কহিয়াছি। সোশাল ডেমক্রাটিক ফেডারেশনের উদ্দেশ্য এক, মতও ফেবীয়ান সোসাইটীরই মত। কিন্তু দল আরও পুষ্ট। এই দুই সভার সাম্যবাদীরাই উদ্যোগী হইয়া শ্রমজীবীদিগকেও আপনাদের মতে আনিবার চেষ্টা করিতেছেন। ১৮৯২ সাল হইতেই চেষ্টা রীতিমত সুরু হইয়াছে। সুতরাং ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লেবরপার্টি বা স্বাধীন শ্রমিকদিগের দল যে, সাম্যবাদেই পরিচালিত হইতেছে, তাহা বুঝিতে কষ্ট নাই। রাজ্যের শিক্ষা দীক্ষায়ও সাম্যবাদ চালাইবার জন্যে এই দলের চেষ্টা আছে; আইন কানূনও সাম্যবাদ প্রবিষ্ট করিবার চেষ্টা আছে। পার্লেমেণ্টের নির্ব্বাচনে ত কথাই নাই। বলাই ত হয়, "বিলাতে ডেমক্রেসি বা লোকতন্ত্র শাসনপ্রণালী চালাইবার জন্যেই আমাদিগের সংকল্প।" ১৮৯৩ সালে দেখা গিয়াছিল, এই স্বাধীন শ্রমিকসভার বিলাতেই শাখা বসিয়াছে ৩০০টা; সভ্য হইয়াছে ৪০ হাজার। ৪ বৎসরে শাখা ও সভ্য অনেক বাড়িয়াছে! যত শাখারই বর্ষে বর্ষে একত্র বৈঠক হয়, মহাবৈঠকে মহান্দোলনও হইয়া থাকে। বিলাতের লক্ষাশয়েরই শ্রমজীবীদিগের আধিক্য ও আধিপত্য; সভারও সেই দিকে অধিক প্রতিপত্তি। কিন্তু প্রতিপত্তি হইতেছে সকল দিকে। পার্লেমেণ্টের সাম্যবাদী সভ্যেরা ক্রমেই আপনাদের পথ মুক্ত করিয়া লইতেছেন।

লেবর ইলেক্টোরাল্

এসোসিয়েশন নামের মতই কাজ করিতেছে। শ্রমজীবিনির্ব্বাচনের সভা পার্লেমেণ্টে শ্রমজীবিদলের লোক বাড়াইবার জন্যেই বদ্ধপরিকর। বলিয়াছি ত স্বদলের লোক পাইলে ইহাঁরা লিবারেল কন্‌সার্ব্বেটিব কাহাকেও চান না; স্বদলের লোক একেবারে দুষ্প্রাপ্য হইলে, লিবারেল কন্‌সার্ব্বেটিবকেই পার্লেমেণ্টের জন্যে বাছিয়া দেন, কিন্তু আপনাদের হিতে মন রাখিয়া। এরূপ স্থলে উক্ত প্রতিনিধিকে প্রতিজ্ঞা করিতে হয় যে, শ্রমজীবিসম্প্রদায়ের হিতেই অধিক মনোযোগী হইবেন। কোন কোন প্রতিনিধিকে ত এইরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়া পার্লেমেণ্টে বসিতে হইয়াছে। এই এসোসিয়েশনেরও অনেক সভ্য; সভ্যদিগের আবার বর্ষে বর্ষে কনফারেন্স হইয়া থাকে।

ফ্রী লেবর-এসোসিয়েশন

শ্রমজীবীদিগের আর একটী সভা। এ সভা কারখানাওয়ালাদিগের সহিত মজুর মিস্ত্রীদিগের সদ্ভাব রাখিবার কথা মুখে বলিয়া থাকেন বটে, কাজে কিন্তু শ্রমজীবীদিগেরই পক্ষে অধিক টানিয়া থাকেন। যত কুঠি কারখানার অধিকারীদিগকে মুটে মজুর প্রভৃতির অসময়ে সাহায্য করিতে হইবে, এইরূপ আইনের প্রস্তাব হইয়াছে, এই সভার জন্যে। আইন যাহাতে পাস হয়, এই সভার সভ্যেরাই তাহার জন্যে অধিক চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। চেষ্টায় পথও ত অনেকটা প্রশস্ত হইয়াছে। সভা ধর্ম্মঘটেরও বিরোধী নহেন, তবে অশান্তি হাঙ্গামার অনুমোদন করেন না। ধর্ম্মঘটের শ্রমজীবীরা দল বাঁধিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায়, লোককে আপনাদের স্বার্থে বাধ্য করিয়া থাকে; ইহাতে সভার অমত নাই, বরং এরূপ ব্যবস্থার সভা সমর্থনই করিয়া থাকেন। তবে বলিয়া থাকেন, যেখানে এইরূপ অবস্থায় শান্তিভঙ্গ হইবে, সেখানে দণ্ড দেওয়া উচিত। ফলে কিন্তু দুই দিক রাখা অসাধ্য হইয়া উঠে।

শ্রমজীবীদিগের জিদই

বজায় থাকিতেছে সকল ব্যবসায়ে সকল কাজে। তাহারা যাহা চাহিতেছে, প্রায়ই তাহা লইতেছে। আর আইনের পথও ত আপনাদের পক্ষে ক্রমেই প্রশস্ত করিয়া লইতেছে। বিলাতের যাহারা ভাড়াটিয়া গাড়ী চালায়, তাহাদিগের জিদ দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। গাড়ীর যাঁহারা অধিকারী, তাঁহাদিগের কোন কথাই খাটে না। গাড়োয়ানেরা অধিকারীদিগের বেতনভুক ভৃত্য নহে, গাড়ী লইয়া আপনারাই সারাদিন চালায়; যত ভাড়া পায়, সবই লয়; তাহা হইতে, অধিকারীদিগকে চুক্তিমত অংশ দেয়। বৎসরের ভিতর মাসভেদে তারতম্য হইয়া থাকে; কেননা, মাসভেদে গাড়োয়ানদিগেরও রোজগারে তারতম্য হয়। কিন্তু অধিকারীদিগের দৈনিক প্রাপ্য কখনও ১০ শিলিঙের নীচে নামে না, কখনও ১৬ শিলিঙের উপর উঠে না। গড়ে ১২।০ শিলিঙই ধরিতে হয়। ইহা দিয়াও গাড়োয়ানেরা লাভ করে। বুঝিয়া দেখ, বিলাতে গাড়ীর ভাড় কত অধিক! কাহারই বা কম? খনির মজুরদিগের প্রাপ্তিও ত কম নহে। যাহারা খনির ভিতর—গহ্বরমধ্যে—কাজ করে, তাহাদের প্রাপ্য যথেষ্ট, যাহারা উপরে খাটে, তাহাদের কিছু কম। গহ্বরস্থ শ্রমজীবীরা সালিয়ানা ৮০০ টাকাও পাইয়া থাকে। উপরের মজুর ৫০০ টাকার কম পায় না। ফরাসিরাজ্যে এই হার, বিলাতে বরং অধিক। রেলের শ্রমজীবীরা বেশ রোজগার করে, জাহাজী নাবিকদিগের ত কথাই নাই। যাহারা জাহাজ প্রস্তুত করে, তাহাদের সুখের দশা। তন্তুবায় শ্রমজীবীদিগের আরও; ট্রামেও মন্দ নহে। ডকের মজুর হইতে পাইলে, আমাদের দেশেরই কেরাণী ও মাষ্টার বাবুরা তরিয়া যান। যাহারা গ্যাসের কাজ করে, তাহাদিগের পকেটেও ত ক্যাশ কম নহে। এত সুখেও কিন্তু তৃপ্তি নাই, তুষ্টি নাই। "দেহি দেহি পুনঃ পুনঃ।"

শর্করা-সংহার।

যে ভারতভূমি এক সময়ে সভ্যতায়, বিদ্যায়, শিক্ষায়, শিল্পে, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে সকলেরই শ্রেষ্ঠ ছিলেন; যে ভারতভূমির কাছে সকল শিল্প, সকল বিদ্যা, সকল জ্ঞানের জন্যে সমস্ত জগৎ ঋণী; সেই ভারতভূমিকে এখন পরভৃতা হইতে হইয়াছে! পরের বস্ত্রে লজ্জানিবারণ করিতে হইতেছে, পরের বিজ্ঞানে বিজ্ঞ হইতে হইতেছে, পরের জ্ঞানকে শিরোধার্য্য করিতে হইতেছে। পরের হাঁড়ি কুড়ি হাতা-বেড়ি লইয়া ঘরকন্না করিতে হইতেছে, পরের সভ্যতায় সভ্য হইতে হইয়াছে; পরের লইয়াই পরভৃতা হইতে হইয়াছে; পরের লবণে লাবণ্য রাখিতে হইতেছে! আবার কি না শেষদশায় পরের শর্করায় মুখ মিষ্ট করিতে হইতেছে! অদৃষ্টে যে, আরও কত আছে, তাহা ভগবানই জানেন! "শর্করা-সন্দেশে" দেখাইয়াছি, শর্করা ইউরোপ আফরিকা আমরিকায় ছিল না, চিনিকে কেহই চিনিত না; ভারতের ইক্ষু লইয়াই আজ সকলেই ইক্ষুবান্! ভারতের চিনি দেখিয়াই আর সকলে মধুরতা চিনিয়াছেন! আজ কি না, সেই ভারত পরকীয়া শর্করায় মিষ্ট হইতেছেন, পরকীয় মিষ্টে তুষ্ট হইতেছেন!

যে ভারতের চিনি জগতের চারি দিকে যাইত, সেই ভারতে এখন জগতের চারিদিক হইতে চিনি আসিতেছে। যে ইউরোপ চিনি চিনিয়াছেন, ভারতের কল্যাণে; সেই ইউরোপের জর্ম্মণ ফরাসী প্রভৃতি ভারতকে চিনিভারে ভরিয়া দিতেছেন! ক্ষুদ্র বেলজিয়মও শর্করা সরবরাহে কুণ্ঠিত নহেন! যে ভারতের ইক্ষু ইউরোপ হইয়া আফরিকা দিয়া আমরিকায় গিয়াছিল, সেই ভারতকে এখন সেই মার্কিণের চিনির আদর করিতে হইতেছে! ভারতের কাছেই মার্কিণ ইক্ষু লইয়াছেন, ভারতের মজুর দিয়া সেই ইক্ষুর চাষ করিতেছেন, ভারতের মজুর দিয়া সেই ইক্ষুর রসে চিনি করিতেছেন; আবার সেই চিনি এই ভারতকে দিয়া ভারতের ধনে ধনী হইতেছেন! ভারতের ইক্ষু লইয়া মদীরা ইক্ষুবতী হইয়াছেন, মদীরার ইক্ষু মরীচে আসিয়াছে, আর ঐ মরীচ এখন ভারতকে চিনির বোঝায় বুড়াইয়া দিতেছে! না দিতেছে কে? চীনের চিনিও যে, ভারতে আসে! যবদ্বীপই বা ছাড়িবে কেন?

অথচ ভারতের চারিদিকেই এখনও সেইরূপই ইক্ষু জন্মিতেছে; খর্জ্জুর তালেরও অভাব নাই। ইউরোপে গোল আলুর চিনি হয়। আলুর চিনিই যদি বাবুদের মুখরোচক হয়; তাহা হইলে ত ভারতেও সেই আলু-শর্করা প্রস্তুত করা যাইতে পারে। ইউরোপে গোল আলুর চিনি হয়, ভারতের শকরকন্দ যে, শর্করারই কন্দ। রাঙ্গা আলুও ত শর্করাপূর্ণ; মণ্ড আলু যে, মণ্ড-আলু। জর্ম্মণ

ফরাসী প্রভৃতির বীট-চিনি এখন লোফসুগার, ক্রিষ্টাল সুগার হইয়া, ভারতের যত চিনিবাসকে বশীভুত করিয়াছে; বীটের চাষও ত ভারতে হয়। কিন্তু আসল থাকিতে নকল কেন? যাহাদের ইক্ষু আছে, তাহাদের আবার চিনির ভাবনা! ইক্ষুই যে, মধুদণ্ড—অমৃতযষ্টি। আবার খর্জ্জুর! সে যে, সাক্ষাৎ শর্করা-বৃক্ষ! খেজুরের নূতন গুড়—বঙ্গের একচেটিয়া অমৃত! এই জন্যেই ত দেশের নাম গৌড় দেশ! যাহার গন্ধে মুনির মন টলে, সেই নলিন! নলিনাক্ষেরও প্রিয় ভক্ষ্য! এই গুড়ে দোবারা চিনি, তাহাকে ভুলিয়া বীটকে চিনি? তালের গুড় তালের চিনি, আহার ঔষধের কাজ করে; অম্লঃশূলেরও মহৌষধ। আর তালের মিছরীর ত কথাই নাই। শ্বাস কাসেও মহৌষধ!

যাহার আখে চিনি, গাছে চিনি, তাহাকে আলু বীটের কাছে যাইতে হইবে কেন? আর কেবল মিষ্টতার জন্যেই ত চিনির উপযোগিতা নহে। শর্করা যে,—"মধুরা শীতদাহ-পিত্তশ্রমঘ্নী রক্তদোষঘ্নী ভ্রমিঘ্নী কৃমিঘ্নী চ।" মধুর, শীতল, গাত্রদাহনিবারক, পিত্তনাশক, শ্রমনাশক, রক্তদোষনাশক, মূর্চ্ছানাশক, কৃমিনাশক যে চিনি, তাহা ইক্ষুজাতই প্রশস্ত। খর্জ্জুরজাতও মন্দ নহে। আবার তালজাতের অন্যান্য গুণও আছে। এরূপ ত্রিবিধ চিনি থাকিতে, আমাদিগকে আলু বীটের কাছে যাইতে হইবে কেন?

কিন্তু কেমন অদৃষ্ট, এখনকার বাবুদের কাছে যাহা সুদৃশ্য, তাহাই সুখাদ্য; বিশেষতঃ জাহাজী হইলে! জাহাজে মাকাল ফলের আমদানী যে, কেন হয় না, তাহাই আমরা বুঝিতে পারি না! পূর্ব্বপ্রবন্ধে বলিয়াছি, পূর্ব্বে ইউরোপ আমরিকা প্রভৃতি রাজ্যে শর্করা-শোধনে গরুর রক্ত, মুরগীর ডিম দিতে হইত; এখনও যে, কোন স্থলে দেওয়া হয় না, এরূপ নহে; তবে হাড়-পোড়ারই রেওয়াজ বাড়িয়াছে। কিন্তু হাড়ের কয়লাও ত হিন্দু জৈনাদির অস্পৃশ্য। অথচ যত জাহাজী চিনিরই হাড়-পোড়া দিয়া ময়লা সাফ করা হয়। যেখানে কল, প্রায় সেইখানেই হাড়। অহিন্দু রাজ্যে ত কথাই নাই! বিলাতী জর্ম্মণ প্রভৃতি লবণেও এই দশা!

বিদেশী চিনির জন্যে স্বদেশী চিনির আদর কমিতেছে, কাটতি কমিতেছে; অন্যান্য শিল্পের ন্যায় এদেশের শর্করা শিল্পও অবনতির পথে যাইতেছে; ইহাতেও যদি চৈতন্য না হয়, তাহা হইলেও ত বিদেশীয় চিনির অস্থিসাধনত্বে দৃষ্টি রাখা উচিত।

গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি পড়িয়াছে, বিলাতী রাজ-পুরুষদিগের দৃষ্টি পড়িয়াছে; হিন্দু জৈনাদির দৃষ্টি না পড়ে কেন? মুসলমানেরই বা না পড়ে কেন? সকল মড়ার সকল জন্তুর হাড়ই ত চিনিতে লাগান হয়।

ভারতে জাহাজী চিনির আমদানী ক্রমেই বাড়িতেছে; বীটের আসিতেছে, ইক্ষুরও আসিতেছে। অল্পদিন হইল, আমদানী-রপ্তানী-রিপোর্টে দেখিয়াছি; জর্ম্মণ চিনির কাটতি প্রতিদিনই বাড়িতেছে।

বৃদ্ধির পরিচয় চাও ত হিসাব দেখ।

১২৯৯ সালে ১৪৯৫৭৭৲; ১৩০০ সালে ৪০১২৫৲; ১৩০১ সালে ৬৬৮৯২৭৲; ১৩০২ সালে ৮৮৩৬৪৪২৲; ১৩০৩ সালে ১০১৪৭১৩৪৲; ১৩০৪ সালে ২৩৬১৮৩৩৮৲ টাকা।

বীট-চিনির আমদানী এইরূপ বাড়িতেছে। ৬ বৎসর পূর্ব্বে ছিল দেড় লক্ষ টাকার। পাঁচ বৎসর পরে দাঁড়াইয়াছে, ২ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকার উপর! কত গুণ, ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিবে। বীটের বৃদ্ধিতেই বৃদ্ধি হইয়াছে; ঐক্ষবী শর্করায় ততদূর নহে। তথাপি ঐক্ষবীর হিসাব দেখান ভাল।

১২৯৯ সালে ২০৬৫৩৭৮৩৲; ১৩০০ সালে ১৭৩৭২৫১৮৲; ১৩০১ সালে ২১০২২১২০৲; ১৩০২ সালে ২১৮১০৯১৩৲; ১৩০৩ সালে ২০৭৭২০৪৭৲; ১৩০৪ সালে ২৩০৬৯৫৯২৲।

ছয় বৎসরের হিসাব। আখের চিনিতে বীটের মত ভয়ঙ্করী বৃদ্ধি নাই। তথাপি আখে বীটে বিদেশের চিনি আসিয়াছে গতপূর্ব্ব বৎসর ৪ কোটি ৭০ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকার। এবার ৫ কোটির উপর উঠিবে, বীটেই মাত করিয়া দিবে।

আবার যেমন আমদানী তেমনই শস্তা! ৫ বৎসর পূর্ব্বে মন ছিল এখানে ১০।৫ টাকা। এখন হইয়াছে ৮৶১৫ টাকার অধিক নহে। গড় পড়তা হিসাব, নম্বর-ভেদে তারতম্য। দর যে শস্তা, তাহাতে এখানকার গুড়েও পোষায় না! কিন্তু হেতু আছে। ফরাসী জর্ম্মণরাজ্যের গবরমেণ্ট যে, যত চিনিওয়ালাকে অর্থ-সাহায্য করিয়া থাকেন! সুতরাং চিনিওয়ালারা লোকসানে করিয়াই মাল বেচিয়া থাকেন। সরকারী সাহায্যেই যে, ক্ষতি পূর্ণ হইয়া যায়!

ইংরেজের কোন রাজ্যে এরূপ সরকারী সাহায্য দিবার নিয়ম নাই। আমরিকার পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে—জামেকা ত্রিনিদাদ প্রভৃতি রাজ্যে—এত দিন চিনির কারবারেই ধনাগম ছিল। ওগুলি সমস্তই বৃটিশ রাজ্যে। জর্ম্মণ ফরাসী ও বেলজু চিনির জন্যে ঐ সকল প্রদেশের চিনিকে একেবারেই মাটীতে মিশাইতে হইয়াছে! সুলভতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার যো নাই! জামেকা প্রভৃতির যত চিনিওয়ালা সাহেব বিপদে পড়িয়াছেন। বৃটিশ গবরমেণ্টের কাছে সাহায্য চাহিয়াছেন। সাহায্যও তাঁহাদিগের করিতে হইতেছে; অন্যথা যে, ঐ সকল দ্বীপের সাহেবেরা মার্কিণ রাজ্যে মিশিতে চাহেন; আপনাদের দেশকে মার্কিণরাজ্যের ভিতর ফেলিতে চাহেন।

সংহারে প্রতিকার।

কিন্তু এ ভাবে আর অধিক দিন চলিতেছে না! আমাদের গবরমেণ্টকে পথ দেখিতে হইয়াছে। প্রথমে

প্রস্তাব হইয়াছিল, ফরাসী জর্ম্মণ প্রভৃতি রাজ্যের গবরমেণ্ট যদি পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থসাহায্য রহিত করিয়া না দেন, যদি সরকারী সাহায্যের জন্যে ঐ সকল দেশের চিনি শস্তা থাকে, তাহা হইলে, বৃটিশ গবরমেণ্ট আপনাদের সকল রাজ্যেই ঐরূপ সাহায্য-পুষ্ট চিনির উপর যথেষ্ট আমদানী মাশুল বসাইয়া দর বাড়াইয়া দিবেন, অন্যান্য চিনির সঙ্গে সামঞ্জস্য করিয়া দিবেন। ফরাসী জর্ম্মণ প্রভৃতিকে উদ্বিগ্ন হইতে হইয়াছিল। বেলজিয়মে সকল জাতির জলসা বসিয়াছিল। কিন্তু জলসায় কোন ফল হয় নাই। সুতরাং বৃটিশ গবরমেণ্টকে উপায় চিন্তা করিতে হইতেছিল। পূর্ব্ব হইতে, অনুসন্ধান তদন্ত চলিতেছিল চারিদিকে, সঙ্গে সঙ্গে ভারতেও চলিতেছিল। ভারত-গবরমেণ্টের আদেশে যত প্রদেশীয় গবরমেণ্টকে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল, যত কলেক্টরকে তদন্তে মন দিতে হইয়াছিল। চিনির আমদানী যত বাড়িতেছে, ভারতীয় শর্করাশিল্পের ও সুতরাং ইক্ষুচাষের ততই ক্ষতি হইতেছে। বিদেশী চিনি আসিতেছে ৫ কোটি টাকা। এক সময়ে ত এক কপর্দ্দকেরও আসিত না, বরং ভারতেরই প্রচুর চিনি ইউরোপ আমরিকায় যাইত। যেখানে যাইত, সেখান হইতে আসিতেছে; বৎসরে ৫ কোটি টাকার! বিলাতের হইলে বৃটিশের আপত্তি ছিল না, কেন না বিলাতী কাপড় সূতাও ত আসিতেছে, বৎসরে ৩০।৩২ কোটি টাকার। আমদানীর চিনি ত বিলাতের নহে। আর জর্ম্মণ ফরাসী প্রভৃতি যে, সরকারী সাহায্যের জোরেই আপনাদের চিনি শস্তা করিয়া দিয়াছেন! বিলাতের অবাধ বাণিজ্য এইবার বিপদে পড়িয়াছে। অনেকের মত, আমদানী মাশুলে অবাধ বাণিজ্যের ব্যতিক্রম হইবে। কিন্তু সময় নাই!

নিশ্চিতই ভারতে আখের চাষ কমিয়াছে। পাঁচ কোটি টাকার চিনি আসিতেছে; ঠিক তাহার পরিমাণ মত ইক্ষুর না হউক, অনেকটা মত ইক্ষুর ত অপ্রয়োজন হইয়াছে নিশ্চিত। গবরমেণ্টেরও ক্ষতি, খাজনায় ক্ষতি। আর প্রজার ক্ষতি নানাদিকে। জাতি যাইতেছে, শিল্প যাইতেছে, ধর্ম্ম যাইতেছে, অর্থ যাইতেছে; আবার ভারতের যত চিনির কলকেও বিকল হইতে হইয়াছে। অনেক সাহেবেরও যে, এদেশে চিনির কারখানা আছে। দেশী বিলাতী চিনিওয়ালাদের খাটিতেওছে ত কম টাকা নহে—৩৩।৩৪ কোটি টাকা! জর্ম্মণ প্রভৃতি বাউণ্টিভুক্ত বা সাহায্যপুষ্ট চিনির জন্যেই ভারতকে শর্করা-সঙ্কটে পড়িতে হইয়াছে! কিন্তু প্রতিকারের পথও একটু প্রশস্ত হইয়াছে। ষ্টেট-সেক্রেটরি লর্ড জর্জ্জ হেমিলটনের সহিত পরামর্শ করিয়া আমাদের বড় লাট লর্ড কর্জ্জন জর্ম্মণ প্রভৃতির সাহায্যপুষ্ট চিনির উপর আমদানী মাশুল বসাইয়া দিয়াছেন। জর্ম্মণ, ফরাসী, দিনেমার, অষ্ট্রীয়, বেলজু চিনির উপর বসিয়াছে; দক্ষিণ আমরিকার আর্জেণ্টাইন রাজ্য হইতে যে চিনি আসে, তাহার উপরও মাশুল বসিয়াছে। যে চিনি স্বদেশে সরকারী সাহায্য অধিক পায়, সেই চিনির উপর অধিক মাশুল বসিয়াছে; যে চিনি কম সাহায্য পায়, সেই চিনির উপর কম মাশুল বসিয়াছে। মাশুলের আইনে ভারতের যথেষ্ট উপকার হইয়াছে কিন্তু মরীচ বা ইংরেজের যত মার্কিণ দ্বীপেরও যথেষ্ট উপকার হইয়াছে; ঐ সকল রাজ্যের চিনি এখন ভারতে অনেক আসিবে। মারীচের আসে যথেষ্ট; আসিবে আরও যথেষ্ট। কেন না, কোন বৃটিশরাজ্যের চিনিতেই সরকারী সাহায্য নাই, কোন বৃটিশরাজ্যের চিনিতেই মাশুলও বসে নাই।

ভারতের উপকার হইল, শর্করাপ্রধান আর আর যত বৃটিশরাজ্যেরও উপকার হইল। কিন্তু বিলাতের অনেকে আপত্তি করিতেছেন। বিলাতের অনেকে বলিতেছেন, "যখন ভারতে চিনির উপর আমদানী মাশুল বসান হইল, তখন যত বৃটিশরাজ্যেই বসাইতে হইবে। অন্যথা এক ভারতের বাধায় ত আর জর্ম্মণাদি চিনি বাধা পাইবে না। বাহিরের যত বৃটিশরাজ্যে চিনির মাশুল হইলেই শেষে অগত্যা বিলাতেও বসাইতে হইবে। অন্যথা জামেকা ত্রিনিদাদ বার্ব্বাদো প্রভৃতি বৃটিশরাজ্যের চিনি ত বিলাতে আসিয়া জর্ম্মণাদি চিনির কাছে কলিকা পাইবে না। অথচ চিনির কাটতি বিলাতেই অধিক। অগত্যা বিলা[illegible] ভারতের মত চিনির মাশুল চালাইতে হইবে[illegible] হইলে যে, শুদ্ধ অবাধ বাণিজ্যে আঘাত লা[illegible] নহে, বিলাতে চিনির দরও চড়িয়া উঠিবে[illegible] যত গরীব দুঃখী গৃহস্থ লোকের শর্করা-দুঃখ চ[illegible] কিন্তু বিলাতের লোকের সুবিধার জন্যে যদি [illegible] চিনির মাশুল না বসাও, তাহা হইলে, জামেকা ত্রিনিদাদ প্রভৃতি কোন বৃটিশরাজ্যেরই ত দুঃখ ঘুচিবে না; সর্ব্বত্রই চিনির অবস্থা মন্দ হইয়াই থাকিবে; সকলেই ক্রন্দন করিবে। কোন কোন দ্বীপ ত এখনই মার্কিণ সাধারণ-তন্ত্রের সহিত মিশিতে চাহে। তখন যে, মিশিবার জন্যে আরও জিদ করিবে। তাহাদিগকে যে, ঠাণ্ডা করিয়া রাখা দায় হইবে। শুদ্ধ অর্থনীতির নহে, রাজনীতিরও ঘোর বিভ্রাট ঘটিবে। অতএব, যখন ভারতে চিনির মাশুল হওয়াতেই এতদূর এবং এত অধিক বিভ্রাট ঘটিবে, তখন ভারতেও চিনির মাশুল বসান অন্যায় হইয়াছে। উঠাইয়া দিতে হইবে।"

বিলাতী ধূয়া সহজে থামে না। পার্লেমেণ্টে বারবার পরাজিত হইলেও বিলাতের লোকে জিদ ছাড়েন না। ভারতে চিনির মাশুল বসিয়াছে; অর্থনীতির ব্যতিক্রম হয় নাই, রাজনীতির মর্য্যাদাবৃদ্ধি হইয়াছে, ভারতের যত লোক তুষ্ট হইয়াছে। লর্ড কর্জ্জনও নিজের জিদ সহজে ছাড়িবেন না। আপাততঃ ভয় নাই, যে মাশুল বসিয়াছে, তাহা আপাততঃ উঠিবে না। কিন্তু ভবিষ্যৎ ভয় বজায় রহিল। বিলাতের লিবারেলদলেই ত আপত্তি উঠিয়াছে। দুই দশ জন কনসার্ভেটিভও প্রতিবাদে যোগ

রে বার
র রবিবার
হ এক দিন
তীয় পক্ষের
ঙ দিন

দিয়াছেন। অবাধ বাণিজ্যে যে, সকলেরই বিষম অনুরাগ! রাজ্যভার যখন লিবারেলহস্তে পড়িবে, তখনও যে, ভঙ্গ করিতে হইবে না, এরূপ মনে হয় না। আমাদের হইয়াছে, যখনকার তখন; এখন ত মাশুলের জন্যে আমাদের শর্করা-শিল্পে কিঞ্চিৎ লাভ হইল! যত টুকু লাভ ততটুকুই ভাল! যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমুল্যম্। খড়ের গাড়ীর বলদের মুখে জাল দেওয়া থাকে; তথাপি ত যাইতে যাইতে জালের পাশ দিয়া জিব বাহির করিয়া সে দুই গাছা খড় টানিয়া লয়! কিন্তু প্রকৃত ও স্থায়ী প্রতিকার আমাদের হাতে, নির্ভর করিতেছে আমাদের প্রবৃত্তির উপর। জাহাজী চিনির প্রকৃতি পদ্ধতি উপাদান উপকরণের দিকে একটু অধিক দৃষ্টি রাখিলেই ত আমারাই কিঞ্চিৎ প্রতিকার করিতে পারি। যখন মধুর অভাবেও গুড় চলে, তখন চিনির অভাবে—জাহাজী চিনির বদলে—দলো না চলিবে কেন? দোবরা মহার্ঘ হয়, না হয় গুড়েই মুখ মিষ্ট করিবে। আর সন্দেশ মিঠাইও ত কেবল সাদা হইলেই সুখাদ্য হয় না। নূতন গুড়ের সন্দেশ কি সন্দেশ নহে? একটু চেষ্টা করিলেই আবার বার মাস নূতন গুড় পাইতে পারি, নূতন গুড়ের কাঁচা গোল্লায় বার মাসই নোলার তুষ্টি করিতে খজ্জু...। বলিতেছি, কেবল আইনের উপর নির্ভর করিয়া গুণও আ... চলিবে না। আইন অর্থে রাজবিধি, বিলাতের আলু বীটের ...র্থে কিন্তু পার্লেমেন্টের বিধি। এ বিধির পদে কিন্তু কেম...ন হয়। বিশেষতঃ যে বিধি ভারতের উপর সুদৃশ্য, তাহা...ত পরিবর্ত্তন করিলেই হইল। মুখে যিনি জাহাজে... বলুন, বিলাতী পার্লেমেন্টের মত যে দিকে যাইবে, ভারতের বড় লাটকে—লর্ড কর্জ্জনকে পর্য্যন্ত অগত্যা সেই দিকে যাইতে হইবে। চিনির মাশুলে আজ প্রতিবাদী পক্ষের পরাজয় হইলেও, দুই দিন পরে আবার জয় হইতে পারে। প্রতিবাদীরাও ইহা বুঝেন। শুল্ক যদি ভারতের হিতেই সর্ব্বত্র গ্রাহ্য হইত, তাহা হইলে, আমাদিগকে উদ্বিগ্ন হইতে হইত না। চিনির মাশুলে, ভারতের লাভ হইল যথেষ্ট। রাজা প্রজা উভয়পক্ষেরই লাভ। প্রজার লাভ, দেশীয় চিনির আদর বাড়িবে। রাজার লাভ, তাহা হইলে রাজ্যের আয় বাড়িবে। কিন্তু হাতে হাতেই লাভ মাশুলের নূতন আয়। মাশুলের শত্রু পার্লেমেন্টের ম্যাক্‌লীন বলিতেছেন বটে, "৮ লক্ষ টাকা আয় বাড়িল। এ আট লক্ষ গ্রাহ্য মধ্যে নহে।" দীন হীন আমরা কিন্তু দেখিতেছি, ৮ লক্ষই ৮ কোটি। জর্ম্মণাদি চিনির যদি আমদানী কমিয়া যায়, তাহা হইলে, ভারতের সাক্ষাৎ লাভ অসীম। আর যদি কমিয়া না যায়, তাহা হইলে, এই মাশুলের লাভটা ত আছেই। যদি আমদানী বাড়ে, তাহা হইলে, মাশুলের আয়ও বাড়িবে। সুতরাং নূতন আইনে স্বতঃ পরতঃ, প্রত্যক্ষ পরোক্ষ, অব্যবহিত ব্যবহিত—লাভ। আর এই সুযোগে যদি ভারতের চিনির আদর বাড়িয়া [illegible] নাই। তাহা হইলে লাভ অর্থে—লাভ ধর্ম্মে; লাভ শিল্পরক্ষায়, লাভ জাতিরক্ষায়।

অতএব, চিনির আইনে ভারতসন্তানের কোনরূপ আপত্তি হইতে পারে না। উপসংহারে কিন্তু আর একটা ভয়ের কথাও কহিতে হইতেছে। ভারতে চিনির উপর মাশুল বসায়, জর্ম্মণী অস্ত্রিয়া বেলজিয়ম প্রভৃতি চটিয়া লাল হইয়াছেন। এত গরম হইয়াছেন যে, তাঁহাদের কতক চিনি সরবতে ফেলিয়া তাঁহাদিগকেই পান করান উচিত। স্বার্থে আঘাত লাগিলে মানুষ সত্য সত্যই ক্ষেপিয়া উঠে! ভয় দেখাইতেছেন সকলেই! জর্ম্মণী অস্ত্রিয়ার সঙ্গে বেলজিয়মও নেত্রবঞ্জন করিতেছেন। জব্দ করিবেন,—ভারতকে জব্দ করিবেন! ভারতের যত দ্রব্যেই না হয় মাশুল বসাইবেন! ভগবান্ তাহাই করুন। ভারতের ত শাপে বর হইবে। ভারত নিজের দ্রব্যে নিজের চালাইতে পারে। এমন শিল্প নাই, যাহাতে ভারত সুযোগ হইলে পূর্ব্ববৎ দক্ষতা দেখাইতে না পারে। ভারতীয় দ্রব্যে মাশুল বসিলে ভারতের ক্ষতি নাই। কিন্তু জর্ম্মণী প্রভৃতি ত শুল্ক এইরূপ প্রতিশোধেই নিশ্চিন্ত হইবার পাত্র নহেন, বিলাতের সহিত বিবাদ করিবেন। হয় ত যত বিলাতী মালেও মাশুল বাড়াইবার পন্থা করিবেন। এরূপ হইলে, ভারতের ভয় আছে বৈ কি। ইংরেজের ক্ষতি হইলেই ভারতের ক্ষতি, ইংলণ্ডের ভীতি হইলেই ভারতের ভীতি। তাই বলিতেছি, চিনির মাশুলে অন্তরায় অনেক; ঘরে বাহিরে অন্তরায়। লর্ড কর্জ্জন সাহস দিয়াছেন, তিনি মাশুল রদ করিতে সম্মত হইবেন না। কিন্তু তিনিও ত বিলাতী গবর্ণমেণ্টের বাধ্য; তাঁহার ষ্টেটসেক্রেটরি বাধ্য, তিনিও বাধ্য। আর বিলাতী গবর্ণমেণ্ট ও ত বিলাতী পার্লেমেণ্টের বাধ্য। অদ্য এই পর্য্যন্ত, বাকি রহিল বাউণ্টি বা সরকারী সাহায্যের কথা। সে কথা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে ভাল করিয়া কহিব। শুদ্ধ চিনির বাউণ্টিই বাউণ্টি নহে, বাউণ্টি নানাবিধ এবং নানা প্রকারে প্রদত্ত হইয়া থাকে।

চুম্বনের বাজী।

রসিক পাঠককে আমরা চুম্বনের নীলামে লইয়া গিয়াছি; নীলাম হইয়াছে মার্কিণরাজ্যে। এক প্রসিদ্ধ কিন্তু সুন্দরী ও যুবতী অভিনেত্রী ধর্ম্মশালায় টাকা দিবার তরে নিজের কোমল গণ্ড নীলামে চড়াইয়া দিয়াছিলেন। সর্ত্ত ছিল, এক হাজার ডলারের কমে গাল ছাড়িবেন না। মার্কিণরাজ্য সধন পুরুষে পূর্ণ, বোধ হয় উচ্চ দর খুব উচ্চেই উঠিয়াছিল। এক চুম্বনে যুবতী বোধ হয় ৩০ হাজার টাকা পাইয়া থাকিবেন। সবই কি ধর্ম্মশালায় দিয়াছেন? নিজের কর্ম্মশালায় কি কিছুই রাখেন নাই? ফলতঃ চুম্বনের নীলাম হইয়া গিয়াছে। বোধ হয়—বোধ হয় কেন—নিশ্চিতই আরও অনেক হইবে। আমাদের মনে

হয়; সহরে সহরে নীলামের আড্ডা হইবে। কলিকাতার মেকেঞ্জি লায়াল কোম্পানির উচিত, মার্কিণরাজ্যেও নীলামের আড়ত করা। কেননা, কলিকাতায় হঠাৎ চুম্বনের নীলাম চলিত হইবে না।

পাঠক মার্কিণরাজ্যে চুম্বনের নীলাম দেখিয়াছ, রুষরাজ্যে গেলেই চুম্বনের স্রোতে ভাসিয়া যাইবে। আমরাও ভাসাইয়া দিতে কুণ্ঠিত নহি। চুম্বনের স্রোতও ত আমাদের কলমে প্রবাহিত হইয়াছে; এ বয়সে মুখে প্রবাহিত হয় না, আমাদের সবই এখন কলমে আর প্রবন্ধে। প্রবন্ধেই চুম্বনের স্রোত চলিতেছে; বন্ধ হইবার নহে। এ প্রবন্ধে বাজী দেখাইব—চুম্বনের বাজী। চুম্বনের বাজী বিলাতেও হইয়া থাকে। কোন পুরুষ বাজী রাখেন, আমি ঘণ্টায় হাজার চুম্বন লইব। কেহ বা দেড় হাজারে উঠেন। কেহ কেহ দুই হাজারেও হতসাহস হন না। মধ্যে এক মহাশয় দশ ঘণ্টায় দশ হাজার লইবার বাজী ফেলিয়া তিন হাজারেই হতচৈতন্য ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন! বোধ হয় যুবতীর গালে মাদকতা ছিল। বিষও ত থাকিতে পারে।

"বিষমপ্যমৃতং ক্বচিদ্ভবেদমৃতং বা বিষমীশ্বরেচ্ছয়া।"

কত হাজার দুই হাজার দশ হাজার এক দিনে লওয়া দুঃসাধ্য। অমৃতও ত যত খুসী পেটে পোরা যায় না। খাদ্য নিজের আয়ত্ত হইতে পারে, ক্ষুধা ত নিজের আয়ত্ত নহে। আর দিদীমা বলিতেন, "ভরা পেটে রুই মাছ তেতো তেতো লাগে!" অতিভোজনং রোগমূলং ত বটেই পরন্তু অরুচিকরমেব। রুচি ঠিক রাখিয়া আদায় করা উচিত। তবে কি না, "হাদেখলে" লোকে অপেক্ষা করিতে পারে না। আর

"শস্যঞ্চ গৃহমানীতং।"

বলাও ত যায় না! যদি হাত-ছাড়াই হয়—গাল যদি ঠোঁট-ছাড়াই হইয়া পড়ে! মার্কিণরাজ্যের কান্‌সাস প্রদেশে ডজ সহরে কিন্তু এক ইংরেজ যুবক বড় পাকা বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। শুনিলেই বুঝিতে পারিবে, ব্যাপার খানা কি! এক বিদ্যালয়ের একটী যুবতী শিক্ষয়িত্রী বলিয়াছিলেন, আমার বন্ধু অমুক যুবকই এবার অমুক সহরের তরফে মহাসভার জন্যে নির্ব্বাচিত হইবেন। অনেকগুলি যুবক তখন উপস্থিত ছিলেন। অনেকেই আবার তাঁহার ভক্ত, ভালবাসা পাইবার জন্যে ব্যস্ত। যুবতী শিক্ষয়িত্রী কিন্তু যাঁহাকে বড় ভাল বাসেন, তাঁহার নির্ব্বাচন হইবে বলিয়াই জিদ করিতেছিলেন। মজলিসে আমাদের ঐ ইংরেজ যুবকও ছিলেন। তিনি বলিলেন, না অমুক এবার নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন না। যুবতী বলিলেন, নিশ্চিতই পারিবেন। দুই চারি কথার পর যুবতী উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "যদি ঐ যুবক নির্ব্বাচিত না হন, তাহা হইলে, আমি তোমাকে আমার গালে হাজার চুম্বন লইতে দিব। কিন্তু যদি যুবক নির্ব্বাচিত হন, অর্থাৎ যদি বাজীতে আমার জয় হয়, তাহা হইলে, আমি ত আর তোমার গালে চুম্বন লইব না, তোমাকে এক হাজার ডলার দিতে হইবে। এক এক চুম্বনের মুল্য একডলার।" ইংরেজ যুবক তথাস্তু বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, বাজীর প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিলেন; কয়জনকে ইসাদী করিলেন। সব ঠিক হইয়া গেল, যথাদিনে নির্ব্বাচনকার্য্যও সম্পন্ন হইয়া গেল। যুবতীর সেই যুবক নির্ব্বাচিত হইলেন না, বাজীতে যুবতীই হারিয়া গেলেন। এইবার বাজীর টাকা—না না চুম্বন—আদায় করিতে হইবে। বিলাতী যুবক ঘোর ব্যবসায়ী, ব্যবসায়সূত্রেই আমরিকায় রহিয়াছেন। পূর্ব্বাহ্নেই সর্ত্ত করিয়া লইয়াছিলেন, "যদি জিতি তাহা হইলে তোমায় চুম্বনে কিস্তিবন্দী করিতে হইবে। প্রতি সপ্তাহে কুড়িটী করিয়া চুম্বন লইব।" যুবতীর তখন দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আমারই জয় হইবে; কেন না, আমার যুবকই নির্ব্বাচিত হইবেন। সুতরাং ইংরেজ যুবকের কিস্তিবন্দী সর্ত্তে অসম্মত হন নাই। এখন কিন্তু কিস্তিমাত! প্রতি সপ্তাহে ২০ চুম্বন, হাজার চুম্বনে ৫০ সপ্তাহ। ৫২ সপ্তাহে বৎসর। বল ত এক বৎসরই চলিবে। সুরু হইয়াছে, অভিনয় সপ্তাহে সপ্তাহে চলিতেছে; যুবতীকে প্রতি সপ্তাহে এক দিন বিশ চুম্বন দিতে হইতেছে। রসিক ও মিতব্যয়ী বৃটিশ যুবক নিশ্চিতই শনিবারে বার ফেলিয়াছেন। শনিবারটাই যে, মধুবার, আর রবিবার বিশ্রামের বার, ধর্ম্মেরও বার বটে। সপ্তাহে এক দিন হইলে, শনিবারই প্রশস্ত। গোপাল ভাম্মা দ্বিতীয় পক্ষের গৃহিণীর কাছে সপ্তাহে এক বোতল পাইতেন। ৬ দিন উপবাসে থাকিয়া শনিবারেই বোতলসংহার করিতেন। আমরা বাল্যকালে প্রত্যহ জল খাবারের জন্যে দুইটী পয়সা পাইতাম, সবগুলি জমাইয়া প্রতি শনিবার পেট ভরিয়া খাইতাম! শনিবারটা যে, ভাল বার, তাহা আর এখন ইংরেজের আমলে বুঝাইয়া দিতে হয় না; যত আমোদ আহ্লাদ, সমস্তই শনিবারে হইয়া থাকে। ছেলেদেরও শনিবারে হাফ স্কুল হয়। অনেক আপিশেও শনিবারে হাফ আপিশ। যত বাবুই শনিবারে বাড়ী যান। হাইকোর্টে আপীলের উকিলেরা শনিবারে কাছারী করেন না। শনিবারেই থিয়েটরে অধিক লোক হয়। বঙ্গবাসী শনিবারে বাহির হয়। কলিকাতার বাবুরা শনিবার রাত্রে কসাই কালীর মাংস আনিয়া ভোজন-বিলাস চরিতার্থ করেন। মদের দোকানে এবং হোটেলে শনিবার খরিদদার অধিক হয়। তামাকের দোকানেও শনিবারে ভিড় অধিক। কলিকাতার কয়টা আড্ডেই শনিবারে বাবুর সমাগম অধিক হয়। শনিবারের রাত্রেই খেলা ধূলা অধিক হয়। বাবু ও সাহেব পাড়ার জুয়ার ফড়ে শনিবারেই জমজমা হইয়া থাকে। বৈঠকী গাওনাও শনিবার জমে ভাল। বাবুদের বাগানপার্টির শনিবারেই বোধন বসে। শনিবারে অমাবস্যা পড়িলেই কালী পূজার অধিক চটক। শনিবারই

সুখের বার, আনন্দের বার, উৎসবের বার। অত কথায় কাজ কি, শনিবারে মরিলেও একলা যাইতে হয় না!

অতএব, চুম্বন-বিজয়ী বৃটিশ যুবক যে, শনিবারেই ঋণ দানের দিন ফেলিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু একটা কাজ বড় অন্যায় রকমের করিয়াছিলেন, প্রথম কিস্তীর আদায় করিবার দিন যত যুবক বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সকলের সম্মুখেই যুবতীর কোমল গালে চুম্বন-ভক্ষণ—নানা চুম্বনপান—করিয়াছিলেন। কিন্তু ভক্ষণ বলিলেও দোষ হয় না, অমৃত-ভোজনই ত হইয়া থাকে। আর "বালাস্ত্রী-ক্ষীরভোজনম্।" এইখানে টীকাচ্ছলে একটা কথা বলিয়া রাখি। "বালাস্ত্রী ক্ষীরভোজনং" বলিতে বালা স্ত্রীর দুধ খাওয়া নহে। বালা অর্থাৎ নবযুবতী স্ত্রীই ক্ষীরভোজনের মত সুখদায়িকা এবং বলদায়িকাও বটে। ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়া ভাল, নতুবা হয় ত অনেক যুবক পাঠক "বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যং" বলিয়া দুধ খাইতেই লাগিয়া যাইবেন। সেটা ত আর প্রার্থনীয় নহে। আরও একটা কথা—ব্যাখ্যার উপর ব্যাখ্যা। এস্থলে "বালা" শব্দটার চাণক্য পণ্ডিত ইংরেজি ভাবেই ব্যবহার করিয়াছেন। ইংরেজিতে যেমন আঠারো কুড়ি বৎসরেও বালিকা, চাণক্য পণ্ডিতেরও সেইরূপ আঠারো কুড়ী বৎসরে বালিকা। নব্যেরা চাণক্যকে নজীর করিয়া কন্‌সেণ্ট একটের ওকালতীও করিতে পারেন। কিন্তু ব্যাখায় ত আর কালহরণ করা উচিত নহে, নিশ্চিতই পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি হইতেছে। ইংরেজ যুবক প্রথম সপ্তাহের শনিবারে যুবতীর গালে কুড়িটী চুম্বন লইলেন, কিন্তু পনর কুড়িটী যুবক বন্ধুর সম্মুখে। তাঁহার হইল, স্পর্শনে মুক্তি, তাঁহাদের হইল কেবল দর্শনে। কাজটা ভাল হয় নাই। যুবতীর পক্ষে বলিতেছি না; কেন না, তাঁহার ত দিতেই হইবে। শুধশোধে বরং দুই দশটা সাক্ষী রাখা ভাল! যুবক ত শেষে গরকবুলও হইতে পারেন। "পাই নাই, দেও নাই," বলিতেই বা কত ক্ষণ? আর পুকুর-কাটার কোড়ায় মাটীর সাক্ষী রাখে, চেয়োর মাঝে একটা সুন্দর স্তম্ভই রাখিয়া দেয়। ভারী গঙ্গাজল দিয়া দেওয়ালের গায়ে গঙ্গামৃত্তিকার ফোঁটা দিয়া রাখে। চুণওয়ালা চুণের ফোঁটা দিয়া যায়। বিলাতের এক পরামাণিক যাহাকে কামাইত, তাহারই গালে সাক্ষী রাখিত। অনেক নাপিত অনিচ্ছার সাক্ষী রাখিয়া ফেলে। মার্কিণ যুবতীর গালে ইংরেজ যুবক নিজে ইচ্ছা করিয়া সাক্ষী রাখেন নাই, কেন না, রাখায় তাঁহার স্বার্থ নাই। যুবতীই বা তাঁহাকে বাধ্য করিবেন কি বলিয়া? আর গণ্ডে সেরূপ সাক্ষ্য রাখা ত সর্ত্তের ভিতর নাই! অতএব, কয়টী বন্ধুকে সাক্ষী করিয়া যুবক ভাল কাজই করিয়াছিলেন—নিজের পক্ষে আর যুবতীর পক্ষে বটে। সাক্ষী যুবকদিগের পক্ষে কিন্তু ততটা ভাল হয় নাই! যাহাই হউক, কিস্তি চলিতেছে; ৫০ সপ্তাহের বোধ হয় এখন ২৫ সপ্তাহ বাকি। আরও ২৫টা শনিবার কাটাইতে হইবে, তবে যুবতী ঋণমুক্তা হইবেন। যাঁহার জন্যে বিলম্বি, নির্ব্বাচনে হতাশ হইয়া এখন তিনি কি করিতেছেন? তাঁহাকে যে, এ দিকেও হতাশ হইতে হয়! অগ্রে বাজী শোধ না করিয়া ত যুবতী আর কিছুই করিতে পাইতেছেন না। যুবতীর কিন্তু স্কুলের কাজও চলিতেছে; শনিবার যে, হাফ-স্কুল। চুম্বনের সময়নির্দ্দেশ আছে কি না, ঠিক বলিতে পারি না! আমাদের মার্কিণ সংবাদদাতা সে বিষয়ে কোন কথা খুলিয়া বলেন নাই। সময় ধরিয়া দেওয়া কিন্তু উচিত। কেন না, চুম্বন অল্প সময়ে হইতে পারে, আবার অধিক সময়ও লইতে পারা যায়। বিশেষতঃ সকলে ত আর সমান দক্ষ নহে। যদি গালে সাক্ষী রাখিবার সর্ত্ত না থাকে, তাহা হইলে, মিনিটে চারিটা চলিতে পারে। অন্যথা ঘণ্টায় বারোটা। হারটা ঠিক জানিতে পারিলে পাঠক তুষ্ট হইতেন, জানি; কিন্তু চারা নাই। যদি নিতান্ত জিদ করেন, তাহা হইলে আমাদিগকে অগত্যা মার্কিণ-রাজ্যে টেলিগ্রাফ করিতে হইবে; চিঠীতে বাজীর খবর আনিতে গেলে, বাজী ভোর হইয়া যাইবে।

বাঙ্গলা ভাষার লেখক।

ব

(২)

—পণ্ডিত বীরেশ্বর পাঁড়ে। অধুনাতন যশোহর জেলার অন্তর্গত বনগ্রাম মহকুমার অধীন কায়রাগ্রামে পৈতৃক বাস। ইহাঁরা কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ। প্রায় দশ এগারো পুরুষ হইতে বঙ্গদেশে বাস। পূর্ব্ব পুরুষগণের অনেকেই বিলক্ষণ বুদ্ধিমান্ ও পণ্ডিত ছিলেন। তজ্জন্য কৃষ্ণনগরের রাজগণের নিকট হইতে বহু-পরিমিত ভূমি বৃত্তি পান। বীরেশ্বর বাবুর পিতামহের নাম ৺কনকচন্দ্র পাঁড়ে। ইহাঁর তুল্য দাতা ও অতিথিপ্রিয় লোক বিরল ছিল। তেজারতি ও ভূ-সম্পত্তিতে ইহাঁর আয়ও নিতান্ত কম ছিল না। কিন্তু সমস্ত অর্থ ইনি পূজা ও আতথি-সেবাতেই ব্যয় করিতেন। এই অতিথিসেবার জন্য কনকচন্দ্র সাধারণের নিকট রাজা উপাধি পাইয়াছিলেন। পূর্ব্বদেশের সমস্ত লোক ৺কালে তাঁহাকে রাজা বলিত। ব্রাহ্মণের উপর কনকচন্দ্রের বড়ই ভক্তি ছিল। তদীয় স্ত্রীও তদনুরূপ গুণবতী ছিলেন। সকলেই তাঁহাকে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী বলিত। তিনি পতির সহগামিনী হইয়াছিলেন। যে সময় কনকচন্দ্রের মৃত্যু হয়, তখন ইহাঁর পুত্র মৃত্যুঞ্জয়ের বয়স ষোড়শ বর্ষমাত্র। তিনিই জ্যেষ্ঠ। এই বয়সে তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতৃত্রয় ও ভগিনী দ্বয়কে স্ব-মতে রাখিয়া সংসারের উন্নতি করেন। ইহাঁদের দৌভ্রাত্র ঐ প্রদেশে উপমা-স্থল হইয়াছিল। সকলে ইহাঁদিগকে রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন বলিতেন। ভ্রাতৃগণকে

সর্ব্বপ্রকারে সন্তুষ্ট রাখিয়া পৈতৃক অতিথিসেবার ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া এবং সমস্ত পূজা পার্ব্বণাদির ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াও, প্রভূত পরিমাণ ভূসম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং বাসভবনের জন্য এক বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ বাসভবন,—কলিকাতা জোড়াসাকোর নূতনবাজারের শ্যামচরণ মল্লিকের বাটীর অনুকরণে প্রস্তুত এবং ঐ অপেক্ষা উহা অধিক ছোটও হইবে না। মৃত্যুঞ্জয় নানা গুণে ভূষিত ছিলেন। সংস্কৃত ও পারসী উভয় ভাষাতেই তিনি অধিকারী ছিলেন। জ্যোতিষশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র ও ব্যবহারশাস্ত্রেও তিনি বুৎপন্ন ছিলেন। ঔষধ ও পথ্য বিতরণে বহুতর দরিদ্রের প্রাণ তিনি রক্ষা করিতেন। সর্ব্বত্রই তাঁহার যশঃপ্রচার হইয়াছিল। সকলেই তাঁহাকে ভক্তির সহিত ভাল বাসিত। তাঁহার স্বভাব অতি নির্ম্মল ছিল। ইহাঁর তিন পুত্র ও দুই কন্যা। বীরেশ্বরবাবু পঞ্চম অর্থাৎ তিন ভগিনী ও এক ভ্রাতার পরে বীরেশ্বরবাবুর জন্ম হয়।

কৃষ্ণনগর কলেজে বীরেশ্বর বাবু অধ্যয়ন করেন। কিন্তু ভয়ানক শিরোরোগ উপস্থিত হওয়ায়, ডাক্তারগণের পরামর্শে, ইহাঁকে পাঠত্যাগ করিতে হয়। পরন্তু লেখা পড়ার প্রতি সবিশেষ অনুরাগ নিবন্ধন, সেই রোগের সময়ও অধ্যয়ন করিতে ইনি বিরত হন নাই।

স্বদেশের প্রতি বাল্যকাল হইতেই বীরেশ্বর বাবুর অনুরাগ। সেই অনুরাগহেতু ইনি বাঙ্গলা বহুতর পুস্তক পাঠ করেন ও নিজের যত্নে সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করেন। এই ভয়ানক শিরোরোগের সময়ও বীরেশ্বর বাবু লীলাবতীর ন্যায় কঠিন সংস্কৃত অঙ্কপুস্তক, অন্যের সাহায্য ব্যতীত, নিজে পড়িয়া নিজে অনুবাদ করেন। ঐ লীলাবতীই বীরেশ্বর বাবুর প্রথম মুদ্রিত পুস্তক। ১৭।১৮ বৎসর বয়সে ইনি ঐ পুস্তক অনুবাদ করেন। ইহার পূর্ব্বে, পাঠত্যাগের অব্যবহিত পরেই, বীরেশ্বর বাবু "ভারতবর্ষের বৃত্তান্ত" প্রণয়ন করেন; কিন্তু এই বিষয়ে আরও পুস্তক বাঙ্গলায় প্রকাশিত হইয়াছে শুনিয়া, সে পুস্তক প্রকাশ করেন নাই। কোন পুরাতন বিষয় লিখিতে বা কাহারও সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে ইহাঁর প্রবৃত্তি ছিল না এবং এখনও নাই। এদেশের কাহারও কাহারও ধারণা, Arithmetic-এ যে সকল অঙ্ক আছে এদেশের লোকে তাহা কখন জানিত না; দেশের এই অযথা কলঙ্ক মোচনের জন্য বীরেশ্বর বাবু লীলাবতী প্রচার করেন। বীজগণিত, গোলাধ্যায়, গণিতাধ্যায় প্রভৃতি বিষয় বাঙ্গলায় প্রকাশ করার বলবতী ইচ্ছা তাঁহার ছিল; কিন্তু সে সকল পুস্তক এদেশের লোকে পড়ে না বলিয়া, তিনি তাহা প্রণয়ন করেন নাই। এমন কি বীরেশ্বর বাবুর লীলাবতী বহুকাল পূর্ব্বে সেই একবারমাত্র ছাপা হইয়াছিল, আজিও তাহার কিছু অবশিষ্ট আছে।

ইহার পর বিজ্ঞানসার উপক্রমণিকা, বিবিধার্থ লোকচরিত ও বাঙ্গলাশিক্ষা ১ম ও ২য় ভাগ এই সকল গ্রন্থ বীরেশ্বর বাবু প্রণয়ন করেন। বিজ্ঞানসার ও শিশু-বিজ্ঞান, এই দুই গ্রন্থ ইংরেজির অনুবাদ; কিন্তু ইহার প্রণালী ও পদ্ধতি নূতন ধরণের। স্কুলের ছাত্রগণ কেবল বিদেশীয়গণের জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করে দেখিয়া, স্বদেশীয় মহাত্মাগণের বৃত্তান্ত, বীরেশ্বর বাবু আর্য্যচরিত নামক পুস্তক প্রকাশ করেন। বাঙ্গলাভাষার মূলতত্ত্ব শিক্ষা-সৌকর্য্যের উদ্দেশে "বাঙ্গলাশিক্ষা" গ্রন্থ বীরেশ্বর বাবু প্রণয়ন করেন। পদার্থবিদ্যা ভিন্ন অন্য বিজ্ঞান বাঙ্গলায় ছিল না বলিয়া, পাঁড়ে মহাশয় বিজ্ঞানসার লিখেন। ইহাতে প্রায় সমস্ত দ্রব্য-বিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। এই গ্রন্থে ৩৬ খানি চিত্র আছে।

ইহার কিছু পরে, পাঁড়ে মহাশয়ের স্কন্ধে বৈষয়িক কার্য্যে ভার পতিত হয়। সেই সময় বৈষয়িক অনেক গোলযোগও তাঁহার ঘটিয়াছিল। সেই জন্য পাঁড়ে মহাশয় কয়েক বৎসর যাবৎ সাহিত্যালোচনা করিতে পারেন নাই। তাহার পরে তিনি আর একটী কার্য্যে মন দেন; দেশে স্কুল নাই দেখিয়া, একটী স্কুল স্থাপন করেন। পাঁড়ে মহাশয় যে সময়ে কৃষ্ণনগরে পঠদ্দশায় ছিলেন, সেই সময়ে সেইখানেই দরিদ্রদিগের জন্য একটী বিনা-বেতনের স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহার নাম দরিদ্র বিদ্যালয় ছিল। তিনি চলিয়া আসার পর সেই স্কুলে বেতন লওয়ার নিয়ম হয়। ঐ স্কুল আজিও আছে এবং এক্ষণে ঐ স্কুলই কৃষ্ণনগরের শ্রেষ্ঠ বঙ্গবিদ্যালয়রূপে পরিগণিত হইয়াছে। আপন গ্রামের ও চতুষ্পার্শ্ব গ্রামের বালকদিনের সুবিধার জন্যই তিনি স্কুলস্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি নিজেও ছাত্রগণকে শিক্ষা দিতেন। শিক্ষকগণকে অধ্যাপনকার্য্যে সমধিক উপযোগী করিবার জন্যে তিনি নিজে শিক্ষা দিতেন। এই সমস্ত বিষয়ে ব্যস্ত থাকায়, সাহিত্যালোচনার কিছুমাত্র অবসর তিনি পাইতেন না। কিন্তু এই সময়ে তাঁহার মনে দার্শনিক চিন্তার উদয় হইল। ভ্রমণে, শয়নে, যখন তিনি সময় পাইতেন, তখনই নানারূপ দার্শনিক চিন্তা তাঁহার মনে উদয় হইতে লাগিল।

এই সময় জ্ঞানাঙ্কুর পত্রের সম্পাদক,—পাঁড়ে মহাশয়কে ঐ পত্রে লিখিতে অনুরোধ করায়, পাঁড়ে মহাশয় ঐ সকল চিন্তা,—মানবতত্ত্ব নাম দিয়া জ্ঞানাঙ্কুরে লিখিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু নানা কার্য্যে ব্যাপ্ত থাকায় জ্ঞানাঙ্কুরে তিনি অধিক লিখিতে পারিতেন। কিছুদিন অতিবাহিত হইবার পর পাঁড়ে মহাশয়ের গৃহবিবাদের সূচনা হইল। তাহাতে তিনি পৈতৃক বাসভূমি পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিলেন এবং "নববাস" নামে একখানি দেশী বস্ত্রের দোকান খুলিলেন। একদরে বস্ত্র বিক্রয়ের পথ ইনিই কলিকাতায় প্রথম দেখান এবং

দেশীয় তাঁতিগণের অন্ন সংস্থানের উপায় করেন, তাহার উপায়বিধানজন্য, অল্পমূল্যে দেশীকাপড় বিক্রয় করিতে পাঁড়ে মহাশয় আরম্ভ করেন। এই সময়ে জ্ঞানাঙ্কুর উঠিয়া যায়।

ভূতপূর্ব্ব "আর্য্যদর্শন"-সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ,—পাঁড়ে মহাশয়কে তাঁহার মানবতত্ত্বের অবশিষ্ট অংশ তাঁহার আর্য্যদর্শনে প্রকাশ করিতে অনুরোধ করেন। সে সময়ে নববাসের কার্য্যে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকায়, অবকাশ অভাবে, পাঁড়ে মহাশয় বেশী লিখিতে পারিতেন না। আর্য্যদর্শনের সহকারি-সম্পাদক পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ের বিশেষ উত্তেজনায় একটু একটু করিয়া তিনি লিখিতেন মাত্র। পাঁড়ে মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত নববাস অধিক দিন ছিল না। সরিকি গোলযোগের জন্য তাহা উঠাইয়া দিতে তিনি বাধ্য হন। তাহাতে তাঁহার প্রভূত অর্থ-ক্ষতি হয়। এই সময়ে মানবতত্ত্বের অবশিষ্ট অংশ হস্তে লিখিয়া পুস্তকাকারে তিনি প্রকাশ করিলেন ও কিছুদিন পরে একটী প্রেস করিলেন। এই সময় 'বিজ্ঞানদর্পণ", "সহচরী" ও "জাহ্নবী' নামে তিনখানি কাগজের সম্পাদকতা—একা বীরেশ্বর বাবু করিতে লাগিলেন। মাসিক কাগজে যে বিশেষ আয় হয় না, তাহা অনেকেই জানেন। তথাপি অতিকষ্টে দিবানিশি পরিশ্রম করিয়া কয়েক বৎসরমাত্র, বীরেশ্বর বাবু এই তিনখানি কাগজ চালাইয়াছিলেন।

পরে ধর্ম্মবিজ্ঞান ও অদ্ভুতস্বপ্ন নামক দুইখানি পুস্তক বীরেশ্বর বাবু প্রণয়ন করেন। মানবতত্ত্ব ও ধর্ম্মবিজ্ঞান প্রভৃতি গ্রন্থ মৌলিক উৎকৃষ্ট হইলেও এদেশের এখনও এমন অবস্থা হয় নাই যে, যাহাতে গ্রন্থকারের একটা নির্দ্দিষ্ট আয় হয়। যদিও বীরেশ্বর বাবু একবার এন্‌ট্রান্সের পরীক্ষক হইয়াছিলেন এবং অন্যান্য উপায়ে কিছু উপার্জ্জন করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু পূর্ব্ব দেনা চারি পাঁচগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় পৈতৃক দুই আনা অংশের প্রাপ্ত বিষয় রক্ষা করাও কঠিন হইয়া উঠিল। ৭।৮টী পুত্রের লালন-পালন ও শিক্ষাদি ব্যয়নির্ব্বাহ করা,—কলিকাতার বাসা-খরচ নির্ব্বাহ করা দুর্ঘট হইল দেখিয়া, বীরেশ্বর বাবু স্কুলপাঠ্য পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বে কয়েকখানি স্কুলপাঠ্য পুস্তক লিখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার প্রচলন-চেষ্টা কখন করেন নাই। তিনি দেখিলেন, স্কুলপাঠ্য প্রায় সমস্ত বাঙ্গলা পুস্তকই ইংরেজীর অনুবাদ; দেশীয় বিষয়ের শিক্ষার উপযোগী পুস্তক বাঙ্গলায় অতি অল্প। সেইজন্য তিনি আর্য্যপাঠ, আর্য্যশিক্ষা, নীতিকথামালা প্রভৃতি পুস্তক লিখিয়াছিলেন এবং ভালো বাঙ্গলা ব্যকরণের অভাবে, জষ্টিস শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্ররোচনায়, তিনি একখানি ব্যকরণ প্রণয়ণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে "পাঁড়ে ব্রাদার্স" নাম দিয়া পুত্রগণের জন্য একখানি দোকান করিয়া দিলেন। প্রথমে ঐ দোকানে পুস্তক বিক্রয় হইত, পরে তৎসঙ্গে দেশী বস্ত্র বিক্রয় হইতে আরম্ভ হইল। এক্ষণে কেবলমাত্র বস্ত্রই এই দোকানে বিক্রয় হইয়া থাকে। দেশী বস্ত্র অধিকতর সস্তা করিবার জন্য এখন পর্য্যন্ত তিনি নানাপ্রকার চেষ্টা করিতেছেন। যাহাতে দেশের লোকে দেশী বস্ত্রের অনুরাগী হয়, তাহার চেষ্টা তিনি বিধিমতে করিয়া থাকেন। ধর্ম্মের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা ভক্তি জন্মাইবার জন্য, বীরেশ্বর বাবু তদ্বিরচিত মানবতত্ত্ব, ধর্ম্মবিজ্ঞান প্রভৃতি গ্রন্থে ধর্ম্মের অনেক গূঢ় কথা আলোচনা করিয়াছেন।

যখন মানবতত্ত্ব প্রচারিত হয়, তখন এ দেশ পাশ্চাত্যভাবে পূর্ণ ছিল; তাই সে সময়ের সমস্ত সংবাদপত্র ও সমস্ত বিজ্ঞব্যক্তি,—পাঁড়ে মহাশয়ের পুস্তকের তর্কযুক্তির ভূয়সী প্রসংশা করিয়াছিলেন। হিন্দুধর্ম্মকে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও খৃষ্টীয়ধর্ম্মের কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য, বীরেশ্বর বাবু সর্ব্বপ্রথম এই শ্রেণীর গ্রন্থ লিখিবার চেষ্টা করেন। হিন্দুধর্ম্ম যে নিকৃষ্ট নহে,—পরন্ত একমাত্র শ্রেষ্ঠ মানবীয় ধর্ম্ম, তাহা ইনিই প্রথম হইতেই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

লীলাবতী, বিজ্ঞানসার উপক্রমণিকা, মানবতত্ত্ব, ধর্ম্মবিজ্ঞান, অদ্ভুতস্বপ্ন বা স্ত্রীপুরুষের দ্বন্দ্ব, উনবিংশ্বাব্দার মহাভারত, আর্য্যচরিত, আর্য্যপাঠ, আর্য্যশিক্ষা, নীতিকথামালা, কবিতা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়ভাগ, শিশুবিজ্ঞান, বাঙ্গালা-ব্যাকরণ, শিশুশিক্ষা, বাঙ্গাল শিক্ষা প্রথমভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ প্রভৃতি বহু গ্রন্থ বীরেশ্বর বাবু প্রণয়ন করিয়াছেন। এই সমস্ত পুস্তক অতি উৎকৃষ্ট ও নূতন প্রণালীতে লিখিত। এতদ্ভিন্ন বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শন, জ্ঞানাঙ্কুর প্রভৃতি অনেক পত্রেও বীরেশ্বর বাবু বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। সাবিত্রী লাইব্রেরী প্রভৃতি নানা সভায় অনেক প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতাও তিনি করিয়াছেন। স্বদেশের হিতসাধন ও গৌরববৃদ্ধি,—তৎসমস্তেরই উদ্দেশ্য। বীরেশ্বর বাবুর সমস্ত পুস্তক ও সাবিত্রী লাইব্রেরীতে পঠিত এবং সাবিত্রী নামক পুস্তকে প্রকাশিত "হিন্দুর অবনতি" শীর্ষক প্রবন্ধ এবং সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত "আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য" শীর্ষকপ্রবন্ধ সকলেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য।

বীরেশ্বর বাবু একজন চিন্তাশীল পণ্ডিত ব্যক্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহার মৌলিক চিন্তা ও স্বাধীনভাব,—তাঁহার ধর্ম্মবিজ্ঞান ও মানবতত্ত্বে বিশিষ্টরূপে প্রকটিত। এই গ্রন্থ দুইখানি সাহিত্যের গৌরব। তর্কতত্ত্বেও পাঁড়ে মহাশয় সুপণ্ডিত। তর্কে, সহজে কেহ তাঁহাকে হটাইতে পারে না।

* * *

—বিপিনবিহারী রক্ষিত। পিতা,—৺হরিদাস রক্ষিত; পিতামহ ৺নিত্যানন্দ রক্ষিত; প্রপিতামহ ৺বৈষ্ণবচরণ রক্ষিত; বৃদ্ধ প্রপিতামহ ৺রামনারায়ণ রক্ষিত। সাং মজিলপুর, জয়নগর পোষ্ট, ২৪ পরগনা—কলিকাতার দক্ষিণ। সম্ভ্রান্ত কায়স্থ; দ্বাদশপুরুষ মজিলপুরে বাস।

সুকবি শ্রীমান বিপিনবিহারী,—এই প্রবন্ধ-লেখক, শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিতের কনিষ্ঠ সহোদর। ভাইয়ের নিকট ভাই,—চিরদিন স্নেহভাজন; স্নেহচক্ষে সকলই সুন্দর বোধ হয়। সুতরাং বিপিনবিহারীর সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা আমি যাহা লিখিব, তাহা হয়ত কাহারও কাহারও ভাল না লাগিতে পারে। কিন্তু কি করিব, আমি যে, এই কার্য্যের ভার লইয়াছি।

তা বিপিনবিহারীর জীবন-কথা লিখিবার পূর্ব্বে,—বিপিনবিহারীর, তথা এই প্রবন্ধ লেখকের পুণ্যাত্মা পিতৃপুরুষগণের কাহিনী কিঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ করিব, মনে করিয়াছি।

স্বর্গীয় হরিদাস রক্ষিত মহাশয়,—এই লেখকের পিতৃদেব,—দয়া-ধর্ম্ম-বাৎসল্যের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন। পরের দুঃখমোচনে, পরোপকার-ব্রতে তিনি জীবন ধন্য করিয়া গিয়াছেন। ধনীর সন্তান ছিলেন, নিজেও ধনবান্ ছিলেন, কিন্তু নিষ্ঠুর নিয়তির ছলনায়, শেষদশায় বড় কষ্ট পাইয়াছিলেন। পরন্ত সেই কষ্টেই তাঁহার হৃদয়ের মহত্ত্ব ও উদারত্ব অধিকরূপে প্রকটিত হইয়াছিল। তাঁহার সেই মহৎ আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করিলে, চক্ষে জল আইসে। —এখনও মজিলপুর জয়নগর প্রভৃতি দক্ষিণ অঞ্চলের লোকে তাঁহার গুণগান করিয়া, তাঁহার স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের মহত্ত্ব কীর্ত্তন করিয়া, এই অধম প্রবন্ধ-লেখককে,—কত স্নেহ-আশীর্ব্বাদ করে, সান্ত্বনা ও প্রবোধ দেয়। পুণ্যাত্মা পিতার পুণ্যকাহিনী শুনিয়া, তাঁহার এই অকৃতী পুত্র, অনেক সময় চিত্ত স্থির করে, লক্ষ্যপথে মন দৃঢ় করে, কর্ত্তব্য কর্ম্মে অধিকতর উৎসাহিত হয়;—পক্ষান্তরে—নীচতা, কপটতা, স্বার্থের মলিনতা, হিংসা-দ্বেষ-বক্রতা এবং সত্য-ন্যায়বিগর্হিত কার্য্যে ঘৃণা করিয়া থাকে। কিন্তু এ অধম যে, সকল সময় পিতৃদেবের সেই মহৎ আদর্শ গ্রহণ করিতে পারে,—তাঁহার পদানুসরণ করিয়া সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করিতে সক্ষম হয়,—তাহা নহে; তাহা হইলে মিথ্যা কথা বলা হয়;—তবে তাঁহার ধ্যান-ধারণায়, অনেক সময়, চিত্তের লঘুতা হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে সক্ষম হয় বটে।

স্বর্গীয় হরিদাস রক্ষিত মহাশয় লোক-প্রিয়, লোক-প্রতিপালক, দয়াবান, ধর্ম্মনিষ্ঠ, মহানুভব ব্যক্তি ছিলেন। বিষয়বুদ্ধি তাঁহার প্রখর ছিল না,—কিন্তু ধর্ম্মবুদ্ধি ও পরোপকারে ও আত্মত্যাগে তিনি অনেকের হৃদয় অধিকার করিতে পারিতেন,—অনেকেই তাঁহাকে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত হৃদয়াসনে বসাইতেন। তাঁহার পরোপকার-ব্রতের একটি মাত্র কাহিনী এখানে উল্লেখ করিব;—তাহা হইতে সহৃদয় পাঠক তাঁহাকে চিনিয়া লইবেন। আমাদিগের পৈতৃক বিষয়-আশয় যখন যাইতে বসিয়াছে,—কমলা যখন আমাদের প্রতি বিরূপা হইয়াছেন,—সেই মলিন অবস্থায়, একদিন এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁহার দৈন্যদশা জ্ঞাপন করিয়া, মদীয় পিতৃদেবের নিকট কিছু প্রার্থনা করিলেন; পিতৃদেব তখন শৌচ কার্য্যাদির জন্যে বাহিরে যাইতেছিলেন, হস্তে জলপূর্ণ একটি লোটা ছিল;—ব্রাহ্মণের দুঃখ-কাহিনী শুনিয়া, তিনি একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আজ আমার নিজের সংসারেরই কোন সম্বল নাই,—হাতে একটি পয়সাও নাই,—তা তুমি এই ঘটিটি লইয়া যাও; ইহার বিনিময়ে কিছু পাইতে পারিবে।" এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ সেই ঘটি হইতে জলটুকু ফেলিয়া দিয়া, সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের হস্তে, সেই ঘটিটি দিলেন।—এদৃশ্য আমি স্বয়ং স্বচক্ষে দেখিয়াছি; তখন আমি ৮।৯ বৎসরের বালক মাত্র; তথাপি বেশ মনে আছে, সে দৃশ্যে আমার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়াছিল; আমার চক্ষে জল আসিয়াছিল। আজিও যেন সে দৃশ্য চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি এবং আজিও সে দৃশ্য স্মরণ করিয়া আমি রোমাঞ্চিত হই। উপস্থিত এই মুহূর্ত্তেও আমি, পিতৃদেবের সেই সুঠাম সুন্দর পুণ্যময় সৌম্যমূর্ত্তি দেখিয়া,—পরদুঃখকাতর সে প্রেমপ্রবণ হৃদয়ের মাধুর্য্য উপলব্ধি করিয়া, ভক্তি ও বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইতেছি। এই একটিমাত্র কাহিনী বলিলাম; এমন বহু বহু কাহিনী আজিও লোকমুখে শুনিতে পাই; শুনিয়া অশ্রুসংবরণ করিতে পারি না। সেই পিতার পুত্র আমি ও শ্রীমান্ বিপিনবিহারী;—আমাদের সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা, বোধ করি, ইহাতেই শেষ হইতে পারে। বড় সৌভাগ্যের বিষয়, আমার পূজনীয়া মাতৃদেবীও, সর্ব্বাংশে আমার পিতার অনুরূপা। তাঁহার স্নেহ, মমতা, সরলতা, দয়া, দান,—সর্ব্বাংশেই পিতৃদেবের যোগ্য। লোক জনকে খাওয়াইতে, পাঁচজন লইয়া থাকিতে, পাঁচজনকে প্রতিপালন করিতে ও আশ্রয় দিতে, এখনও,—এই মধ্যবিত্ত অবস্থায়ও তিনি সমুৎসুক। দেব-দ্বিজে শ্রদ্ধা, তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা। মন এত সরল ও পবিত্র যে, একালে অনেক সংসার খুঁজিয়াও তাহা দেখিতে পাই না। মা,—আমাদের সুখে দুঃখে সহায়। তিনি না থাকিলে যে, আমরা কি হইতাম, তাহা বলিতে পারি না।

আমার জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় স্বর্গীয় বিশ্বম্ভর রক্ষিত মহাশয়ও একজন সদাচারসম্পন্ন, নিষ্ঠাবান্, ক্রিয়াবান্, সেকালের বর্দ্ধিষ্ণু হিন্দু-গৃহস্থ ছিলেন। দেব-দ্বিজে ইঁহাদের উভয় ভ্রাতারই বিশেষ অনুরাগ ও শ্রদ্ধা ছিল। পুরুষানুক্রমে ইঁহারা ধর্ম্মভীরু, ঈশ্বর-বিশ্বাসী মহাশয় বলিয়াও লোক-সমাজে সম্মানিত এবং কোথাও কোথাও সম্পূজিত। ধনবান্, বিদ্বান, বিষয়ী ইঁহাদের সমান,—ওদেশে অনেক ছিলেন, ইঁহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠও অনেকে ছিলেন এবং এখনও আছেন,—কিন্তু ইঁহাদের ন্যায় স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, ঈশ্বর-ভক্ত, পরোপকারী ব্যক্তি তখনও অল্প ছিল; এখনও অতি অল্প পরিদৃষ্ট হয়।

বিশেষ, রক্ষিত বংশের ব্রাহ্মণ-ভক্তি—দক্ষিণ অঞ্চলে একরূপ প্রবাদবাক্যের মধ্যে পরিগণিত। স্বর্গীয় বিশ্বম্ভর

রক্ষিত,—এই প্রবন্ধ লেখকের জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়,—এক দিন আপন মহাল হইতে কর্ম্মচারী সমভিব্যাহারে খাজনা লইয়া আসিতেছেন; পথিমধ্যে দেখিলেন, এক ব্রাহ্মণ দেনার দায়ে, গভর্ণমেণ্টের লোক কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হইয়া যাইতেছে;—এ দৃশ্য দেখিবামাত্র, ব্রাহ্মণ-ভক্ত জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়, তৎক্ষণাৎ সেই খাজনার সমুদয় টাকা দিয়া, এবং বাকী টাকা গৃহে আনিয়া দিয়া, ব্রাহ্মণকে উদ্ধার করিলেন। অবিলম্বে গ্রামে এ শুভ-সংবাদ রাষ্ট্র হইল,—গ্রামবাসিগণ অমনি ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

পৈতৃক গৃহদেবতা কৃষ্ণ রায়ের যুগলমূর্ত্তির উপর ইহাঁদের দুই ভায়ের অচলা ভক্তি ছিল। ইহাদের কেহ কখন স্বপ্ন দেখিতেন,—গ্রীষ্মকালে কৃষ্ণরায়ের ছোলা-গুড় নিয়মিতরূপে নিবেদন করা হইতেছে না;—তৎক্ষণাৎ তাহার সন্ধান হইত,—সন্ধানে স্থির হইত স্বপ্ন সত্য বটে;—অমনি ইহাঁরা তাহার সমুচিত ব্যবস্থা করিতেন। কোন দিন বা ইহাঁদের কাহারও মনে হইত, ঠাকুরের ছানা চিনি খাইতে সাধ হইয়াছে; অমনি গয়লা প্রজাদের উপর হুকুম হইত; ভার ভার ক্ষীর-ছানা আসিয়া মজুত হইত এবং যথাকালে তাহা ঠাকুরকে নিবেদন করা হইত। মাতৃদেবীর মুখে শুনিয়াছি,—একবার পিতৃদেব মহাল হইতে অনির্দ্দিষ্ট সময়ে গৃহে ফিরিয়া আসেন; তাঁহার সঙ্গে লোক-স্কন্ধে ন্যস্ত পাকার শ্যামসড়া ইক্ষু। জিজ্ঞাসায় পিতৃদেব বলিলেন,—"আমার একদিন দ্বিপ্রহরে, আমাদের গৃহদেবতা কৃষ্ণরায় ঠাকুর আমার পৃষ্ঠদেশে করাঘাত করিয়া বলিলেন "আমার শ্যামসড়া আখ খাইতে ইচ্ছা হইয়াছে;—তুই এখানে বসিয়া মাথামুণ্ড কি করিতেছিস?" পিতৃদেব,—তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়া,—আমার জেঠাই মাকে—তাঁহার পৃষ্ঠদেশ দেখাইয়া বলিয়াছিলেন,—"দেখ, আমার পিঠ এখনও ফুলিয়া আছে।" এইরূপ এবং আরও অনেকরূপ গল্প আমরা শুনিতে পাই। ফলতঃ ইহাঁরা যে, পুরুষানুক্রমে পরম-ধার্ম্মিক, পরম বৈষ্ণব ও পরম ঈশ্বরভক্ত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

দেব-দ্বিজে ভক্তির ন্যায়, ইহাঁদের গুরুভক্তিও অচলা। গুরুবল,—ইহাঁদের পরম বল। এই গুরু-ভক্তিবলেই, ইহাঁদের পূর্ব্বপুরুষগণ,—অতিমলিন অবস্থা হইতে বিপুল বিত্তের অধিকারী হইয়াছিলেন। গুরুদত্ত অতি সামান্য টাকা অবলম্বন করিয়া,—ইহাঁরা ভক্তি, বিশ্বাস ও বুদ্ধিবলে, জমিদারী অবধি করিয়া যান। মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত শক্তিপুর পোষ্টের অধীন মণিকাহারের "ঠাকুর"-বংশ আমাদের গুরুবংশ। মদীয় গুরুদেবের নাম শ্রীল শ্রীযুক্ত কংসারিলাল ঠাকুর। পরম সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, গুরুদেবদিগের কৃপাদৃষ্টি ও সদয় ব্যবহার,—আমাদের প্রতি আজিও সমভাবেই আছে। আমাদের স্বর্গীয় পিতামহ ও প্রপিতামহ,—নিত্যানন্দ ও বৈষ্ণবচরণ,—পূর্ব্বপুরুষগণের সেই জমিদারীর আয় আরও বাড়াইয়াছিলেন। বিশেষ, স্বর্গীয় ঠাকুরদাদা মহাশয়ের ধর্ম্মবলের সহিত বুদ্ধিবল অসাধারণ ছিল। পিতামহও এ বিষয়ে কম ছিলেন না; তবে পুত্রের নিকট তাঁহাকে হারি মানিতে হইত বটে। ইহাঁদেরও ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী আছে। প্রতিবাসিগণ অভুক্ত থাকিতে ইহাঁরা জলগ্রহণও করিতেন না।

মদীয় প্রপিতামহের এক সহোদর ছিলেন; তাঁহার নাম গোরাচাঁদ রক্ষিত। তিনি আমরণ ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিয়াছিলেন। তাঁহার ঈশ্বর-ভক্তি অতি আশ্চর্য্যরূপ ছিল। স্বপ্নে এক দিন তিনি দর্শন করেন যে, ৺বৃন্দাবনের অমুক কুঞ্জে এক রাধিকামূর্ত্তি আছেন,—সেই রাধিকার সহিত আমাদের পৈতৃক রাসধারী ঠাকুরের বিবাহ দিতে হইবে।—ঠাকুর যেন স্বপ্নে তাহাকে এইরূপ প্রত্যাদেশ করেন। ভগবদ্ভক্ত গোরাচাঁদ অবিলম্বে বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন, এবং নির্দ্দিষ্ট কুঞ্জে উপস্থিত হইয়া, সেই কুঞ্জের অধিকারী "ব্রজবাসীকে" আপন অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। তৎপরে বহু যত্নে সেই রাধিকামূর্ত্তি দেশে আনিয়া, মহা সমারোহে পৈতৃক দেবতা রাসধারী ঠাকুরের সহিত বিবাহ দিলেন। আজিও আমাদের বাটীতে সেই রাধিকামূর্ত্তি আছেন, এবং আজিও পূর্ব্বপ্রথা অনুসারে, তিনিই রাসধারী ঠাকুরের বামে বিরাজ করেন, আর পূর্ব্ব রাধিকা, ঠাকুরের দক্ষিণে শোভা পান। তাই বলিয়া ছি, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই পরম ধার্ম্মিক ও ভগবদ্ভক্ত ছিলেন;—দুর্ভাগ্য আমরা,—তাঁহাদের সেই উচ্চ আদর্শ গ্রহণ করিতে সক্ষম হই না।

লোকের পিতৃদায়, মাতৃদায়, কন্যাদায়,—সকল দায়েই আমাদের পিতৃপুরুষগণ মুক্তহস্ত ছিলেন। বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ—সম্বৎসরে শ্রদ্ধাসহকারে, অন্ততঃ সর্ব্বপ্রকারে পঞ্চাশবার ব্রাহ্মণ-ভোজন ইহাঁরা করাইতেন। ইদানী অবস্থা অতিমলিন হওয়ায়,—দোল-দুর্গোৎসবাদি সকলই বন্ধ হইয়া যাওয়ায়,—মদীয় পিতৃদেব ও জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়, একরূপ জীবন্মৃত অবস্থায় ছিলেন।—তাঁহাদের ইহলোকের কর্ম্মভোগ ফুরাইয়াছিল; তাই যথাদিনে তাঁহারা সাধনোচিত পুণ্যলোকে চলিয়া গিয়াছেন।

২৪ পরগণার অন্তর্গত গোকুলনগর, গরাণহাটী, রাণাঘাট, ঘাড়ী প্রভৃতি স্থানে আমাদের মহাল ও চক্ ছিল;—তাহা সকলই এখন পরহস্তগত হইয়াছে। মদীয় পিতামহ মহাশয়,—আমাদের দেশস্থ সমস্ত কায়স্থসমাজ একত্র করিয়া তিনবার "একজাই" করিয়াছিলেন। ৭২ ঘরের মৌলিক কায়স্থ হইলেও, প্রতিপত্তি ও সম্ভ্রমবলে, অনেক মুখ্য কুলীনের সহিত আমাদের বংশের করণকারণ চলিয়া আসিতেছে। জয়নগরের মিত্র, জমিদারগণ আমাদের মাতুলবংশীয়। মদীয় মাতামহের নাম ৺পার্ব্বতীচরণ মিত্র। মাতুল মহাশয়দ্বয়ের নাম শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ও শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মিত্র। উপস্থিত আমরা তিন সহোদর; আমাদের অগ্রজের নাম শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ রক্ষিত,

গ্রন্থকার ও লেখক না হইলেও, অগ্রজ মহাশয় সাহিত্যামোদী ও কাব্যানুরাগী সদাশয়; সচ্চরিত্র ও শান্তস্বভাব। দুর্ভাগ্যবশতঃ, আমাদের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, উদারচেতা মহেন্দ্রনাথ রক্ষিত ও আমাদের সর্ব্বকনিষ্ঠ সহোদর প্রাণাধিক পূর্ণচন্দ্র এবং জানকীনাথ, ভাই,—কীর্ত্তিমান্ উপেন্দ্রনাথ রক্ষিত অকালে আমাদিগকে কাঁদাইয়া গিয়াছেন।

এই আমাদের সংক্ষিপ্ত বংশপরিচয়। এই বংশেই শ্রীমান্ বিপিনবিহারীর জন্ম। তিনি অনেকাংশে পৈতৃকগুণ পাইয়াছেন;—সচ্চরিত্র, উন্নতমনা, পরদুঃখকাতর ও পরোপকারী বলিয়া, বিপিনবিহারী, অনেকেরই স্নেহ এবং ভালবাসা পান। বিপিনবিহারীর দুই পুত্র,—শ্রীমান্ বিকাশচন্দ্র ও শ্রীমান্ প্রভাসচন্দ্র। আশীর্ব্বাদ করি, প্রাণাধিক বাবাজীউদ্বয় দীর্ঘজীবী হইয়া, ধর্ম্ম ও মনুষ্যত্ব অর্জ্জনপূর্ব্বক, কালে আমাদের বংশের মুখ উজ্জ্বল করিবেন।

এই জন্মভূমিতে, বিপিনবিহারীর বাঙ্গলা লেখার একরূপ হাতে খড়ি হয়। আমিই তাঁহাকে বিশেষ উৎসাহ দিয়া, বহু যত্নে বাঙ্গলা সাহিত্যের আসরে নামাইয়াছি। প্রতিভার কি আশ্চর্য্য শক্তি!—জন্মভূমিতে এক প্রবন্ধ লিখিয়াই—বিপিনবিহারী সর্ব্বত্র সুপরিচিত হন। এক বাণভট্ট-রচিত সংস্কৃত কাদম্বরী গ্রন্থোক্ত মহাশ্বেতা চিত্রের অবতারণা করিয়াই,—সুকবি বিপিনবিহারী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনোযোগ আকর্ষণ করিলেন। তখন কেহ কেহ আমাকেই সেই অপূর্ব্ব সমালোচনপূর্ণ প্রবন্ধের লেখক স্থির করিয়াছিলেন। সমধিক প্রশংসার বিষয় হইলেও সে প্রশংসার অধিকারী আমি নাই,—আমার কনিষ্ঠ সহোদর —সুকবি শ্রীমান বিপিনবিহারী। বিপিনবিহারী লিখিয়াছেন অল্প; কিন্তু যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই সারবান, চিন্তাপূর্ণ ও সাহিত্যের পুষ্টিকারক।

জন্মভূমিতে প্রকাশিত "মহাশ্বেতা", "চিত্রদর্শন", "ছায়া", "প্রেমের পরীক্ষা," "মলিনা" "আক্ষেপ," "সমর্পণ," "বিকাশ;" "রাজা ও রাণী" "উদ্বোধন" প্রভৃতি বহু গদ্য পদ্য প্রবন্ধ এবং সমালোচনা,—শ্রীমান্ বিপিনবিহারীর অপূর্ব্ব লিপি-কুশলতার উজ্জ্বল নিদর্শন। তাঁহার লিখন-ভঙ্গিমা, তাঁহার সদ্‌যুক্তি এবং তাঁহার চিন্তা ও ভাব-সমাবেশ,—অতি অপূর্ব্ব। তাঁহার ভাষা এত মিষ্ট ও কোমল যে, পড়িতে পড়িতে প্রাণ গলিয়া যায়। ফলতঃ এরূপ কবিত্বময়ী ভাষা এবং গভীর চিন্তা ও সুভাবপূর্ণ লিপি-কুশলতা,—বাঙ্গলা সাহিত্যে অতিঅল্পই পরিদৃষ্ট হয়। বিপিনবিহারীর লেখা যে পড়িয়াছে, সেই মুগ্ধ হইয়াছে। নব্যভারতে প্রকাশিত তাঁহার রচিত, "বর্ষার বিরহগাথা" শীর্ষক,—মেঘদূতের সমালোচনা এবং "সঞ্জীবনী" ও "আরতি" শীর্ষক কবিতাদ্বয়, ও অনুসন্ধানে "মেঘদূত" নামে প্রবন্ধ,—তাঁহার কবি-প্রতিভার উজ্জ্বল নিদর্শন। এখন, সাহিত্যের বাজারে কেহ কাহাকে মানে না, কেহ কাহাকে সহজে উচ্চাসন দিতে চাহে না; তাই বিপিনবিহারীর তেমন আদর ও সম্মান হয় নাই; কিন্তু উত্তরকালে যিনি নিরপেক্ষভাবে সাহিত্যের ইতিহাস লিখিবেন, আশা আছে, এই অপূর্ব্ব মৌলিক প্রতিভা সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিবেন, এবং সাহিত্যে বিপিনবিহারীর অদ্ভুত শক্তির কথা, মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিবেন।

গদ্যে পদ্যে,—বিপিনবিহারীর সমান অধিকার। তবে পদ্য অপেক্ষাও গদ্য উৎকৃষ্ট। এগদ্য পদ্যময়। সর্ব্বাপেক্ষা সমালোচন-শক্তিই বিপিনবিহারীকে অধিক যশস্বী করিবে। এমন ভাবুকতাপূর্ণ সমালোচনা—বাঙ্গলার দুই একজন খ্যাতনামা লেখক ছাড়া,—আর কাহাকেও করিতে দেখি না। নহিলে, এক মহাশ্বেতার সমালোচনা লিখিয়াই বিপিনবিহারী সর্ব্বসুপরিচিত হইবেন কেন? তাঁহাকে কখন হাত-মক্স করিতে হয় নাই; পর-উপসনায় এবং অনুরোধ-প্রার্থনাও করিতে হয় নাই;—আমিই তাঁহাকে প্রকৃতির নিভৃতস্থান হইতে একরূপ জোর করিয়া সাহিত্যের আসরে আনিয়াছিলাম। উৎসাহ দিয়া, জেদ্ করিয়া যত্নপূর্ব্বক তাঁহার দ্বারা উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট প্রবন্ধাদি জন্মভূমিতে লিখাইয়াছিলাম; আমার সে শ্রম যে, সার্থক হইয়াছে, ইহাই প্রধান আনন্দ। জন্মভূমির তৃতীয় বর্ষ হইতে পঞ্চম বৎসর পর্য্যন্ত,—এই তিন বৎসরকাল বিপিনবিহারীর অনেক লেখা জন্মভূমির অঙ্গ পরিশোভিত করিয়াছে। ইংরেজী ভাষায় বিপিনবিহারীর বিশেষ অধিকার; সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যেও কম নহে। ইংরেজী নানাশ্রেণীয় নানা গ্রন্থ তিনি বিশেষ যত্নপূর্ব্বক পড়িয়াছেন, এবং এখনও পড়িয়া থাকেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট নন বটে; কিন্তু আজি কালের অনেক গ্রাজুয়েটকেও ইংরেজী পড়াইতে পারেন। সংস্কৃত প্রধান প্রধান কাব্যগুলিও তিনি সমস্ত পড়িয়াছেন। বাঙ্গলার ভালো গ্রন্থও প্রায় সব পড়িয়াছেন। পড়া, যেন তাঁহার একটা নেশা। সে নেশা এত যে, একখানি গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিয়াও আজ প্রায় তিন বৎসরের মধ্যেও তাহা শেষ করিতে পারেন নাই। মদ্বিরচিত সকল গ্রন্থেই তিনি একটু আধটু সাহায্য করিয়াছেন।" "ফুল", "পারিজাতমালা" এবং নব-প্রকাশিত "ফুলের বাগান" গ্রন্থে বিপিনবিহারীর অনেকগুলি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধও প্রকাশিত হইয়াছে।

রয়েল ইনসিওরেন্স কোম্পানীর কলিকাতা ব্রাঞ্চে বিপিনবিহারী চাকরি করেন।

প্রাণাধিক শ্রীমান্ বিপিনবিহারী সুস্থ শরীরে থাকিয়া দীর্ঘজীবী হউন,—এবং আজীবন স্বধর্ম্মে মতি রাখিয়া, মনুষ্যত্ব অর্জ্জনপূর্ব্বক আমাদের বংশের মুখ উজ্জ্বল করুন,—ইহাই তাঁহার জ্যেষ্ঠের আন্তরিক আশীর্ব্বাদ।

সহোদর স্বামী।

ইউরোপে অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হঙ্গেরিরাজ্য সম্প্রতি একটী শোচনীয় ঘটনা হইয়া গিয়াছে। এক দম্পতীর বৈধ মিলনের পূর্ব্বে—ধর্ম্মসম্মত গির্জ্জায় অনুষ্ঠিত বিবাহ হইবার পূর্ব্বে—একটী পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়, পুত্রলাভের পর দম্পতী ধর্ম্মসম্মত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন; তাহার পরে একটী কন্যা জন্মে। নিয়ম আছে, বিবাহের পর পাদরির আদেশে পূর্ব্বজাত পুত্র কন্যার জারজত্ব ঘুচাইয়া লইতে হয়। এদেশেও ত ব্রাহ্ম বিবাহের আইন পাশ হইবার পূর্ব্বে যাঁহারা অসবর্ণ বিবাহ করিয়াছিলেন, আইন পাস হইবার পর, তাঁহারা পূর্ব্বকৃত অবৈধ বিবাহ বৈধ করিয়া লইয়াছিলেন, অবৈধ বিবাহজাত সন্তান সন্ততিরও অবৈধত্ব ঘুচাইয়া লইয়াছিলেন। সুতরাং হঙ্গরিরাজ্যের উক্তরূপ নিয়মে পাঠকের বিস্মিত হইতে হইবে না। কিন্তু বিস্ময়ের ঘটনা সম্প্রতি হইয়াছে। ঐ দম্পতী বৈধবিবাহের পর পূর্ব্বজাত পুত্রের জারজত্ব ঘুচাইয়া লইতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সে পুত্রের নামকরণ হইয়াছিল মাতার নামে, মাতার নামেই পুত্রের জন্ম রেজিষ্টারী হইয়াছিল। নাম তাহার জোহানা জিলগায়ী। কিন্তু কন্যা জন্মিয়াছে, দম্পতীর গির্জ্জায় বিবাহ হইবার পর। তাহার নামকরণ হইয়াছে পিতার নামে, সে এখন পিরোস্কা ভার্গা; পিতার উপাধিই ভার্গা।

যাহাই হউক, অল্প দিন পরেই দম্পতীর মৃত্যু হইল। জারজ পুত্র এবং অজারজা কন্যা অতি শৈশবেই স্থানান্তরে প্রেরিত হইল; দুই জনেই বড় হইল, অতি শৈশবের কথা মনে থাকে না, দুই জনে যে, পিতা মাতার জীবদ্দশায় এক বাড়ীতে ছিল, তাহাও মনে রহিল না। পরস্পর যে, কোনরূপ সম্বন্ধ আছে, তাহাও কেহ তাহাদিগকে বলিয়া দিল না। দুই জনেরই বিদ্যালাভ হাতে থাকিল, দুই জনেরই ক্রমে ক্রমে বয়স বাড়িতে লাগিল, আবার দৈবযোগে দুই জনেরই সর্ব্বদা দেখাশুনা হইতে লাগিল। দেখা শুনায় বন্ধুত্ব হইল, ক্রমে দুই জনেই যৌবনে উপস্থিত হইল, বাল্যের বন্ধুত্ব যৌবনে প্রগাঢ় প্রেমে পরিণত হইল। দুই জনেরই বিবাহ হইল। বিবাহের পর সন্তানও হইল। কিন্তু তখন বিধি বাম হইল, পতি যে, পত্নীর সহোদর ভ্রাতা, তখন তাহা প্রকাশ পাইল। আবার রাজাদেশে এই ভাই বুনের বিবাহ অবৈধ হইয়া গেল, বিবাহের বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল। ভ্রাতার ঔরসজাত পুত্রটী সোরতর জারজ হইয়া পড়িল; ইহার জারজত্ব আর কিছুতেই ঘুচিবে না। এ পুত্র এখন জননীর কাছে। ভাই ভগিনী কিন্তু শোকে অধীর হইয়াছেন, দুই জনেই পূর্ব্ববৎ দাম্পত্য সুখের উপভোগ করিবার জন্যে ক্ষিপ্ত হইয়াছেন। যুবতী ভ্রাতাকে পতিরূপেই নিজের করিয়া রাখিতে চাহেন। ভ্রাতাও নিজ নিজের ভগিনীপতি হইয়া থাকিবার জন্যে জিদ করিতেছেন। ঘটিয়াছিল বিচিত্র ঘটনা। কথায় বলে "দাদার মত ভাতার"; এ যে, হইয়াছিল, "দাদাই ভাতার", মত নহে—সাক্ষাৎ। পাঠক, বিলাতী নাটক নভেলে এরূপ ঘটনা দেখিয়াছ, ইউরোপে কিন্তু এরূপ ঐতিহাসিক নবন্যাসও দেখিতে পাওয়া যায়।

নূতন টেলিগ্রাফ।

মার্চ্চোনির কলে ফল ফলিতেছে। তারের লেটা, তারের খরচ, তার বসাইবার কষ্ট, কোন অসুবিধাই থাকিবে না; দুইটা উচ্চ স্তম্ভ আর দুইটা যন্ত্র হইলেই টেলিগ্রাফে খবর দেওয়া চলিবে; এ বড় কম সুবিধা নহে! ইংলণ্ডের সাউথ ফোরল্যাণ্ড হইতে ফ্রান্সের বুলো সহরের কাছ পর্য্যন্ত খবর দেওয়া লওয়া চলিয়াছিল। দুই স্থানে দুইটী উচ্চ স্থানে দুইটী যন্ত্র রাখা হইয়াছিল। বিলাতে বাতিঘরের উপর যন্ত্র বসান হইয়াছিল, ফ্রান্সে ১৮০ ফুট উচ্চ চঙ বাঁধা হইয়াছিল ৩২ মাইল দূরে সংবাদ চলিয়াছিল। যন্ত্রে সংকেত করা হইয়াছিল, সেই সংকেত বায়ুর ভিতর দিয়া চলিয়া অন্য যন্ত্রে প্রতিহত হইয়াছিল, তাহাতেই সংকেত বুঝা গিয়াছিল, আর সংবাদও ধরা গিয়াছিল। সাধারণ টেলিগ্রাফ-তারেও ত এই কার্য্যই হইয়া থাকে। মার্চ্চোনি বলেন, ইউরোপে একটা আর আমরিকায় একটা—দুই স্থানে দুইটী—১৫০০ ফুট উচ্চ স্তম্ভ বসাইলেই বিনা তারে টেলিগ্রাফ চলিবে; আটলাণ্টিকের ভিতর তার রাখিতে এখন যে কষ্ট ও ব্যয়, তখন আর তাহার কিছুই থাকিবে না। কিন্তু ১৫০০ ফুট উচ্চ স্তম্ভ রাখা সহজ নহে. ফ্রান্সের ঈফেল টাউয়ার এক হাজার ফুটের বড় অধিক নহে; এত উচ্চ স্তম্ভ পৃথিবীতে নাই। কিন্তু মার্চ্চোনি বলিতেছেন, কলের যতই উন্নতি করিতেছি, স্তম্ভের দূরতাও ততই কমিতেছে। দিন কতক পরে আমরিকার জন্য আর ১৫০০ ফুট উচ্চ স্তম্ভের কথা কহিতে হইবে না। আপাততঃ মার্চ্চোনি জাহাজী সংবাদের পথ সহজ করিতেছেন। শত জাহাজ একস্থানে রহিয়াছে, তাহার ভিতর যেখানির সহিত ইচ্ছা মার্চ্চোনি সেই খানির সহিত তারহীন টেলিগ্রাফে সংবাদের আদান প্রদান করিতেছেন। সমুদ্রবক্ষে জাহাজে জাহাজে এইরূপ সংবাদ দেওয়া লওয়ার সুবিধা হইলে বড়ই উপকার হইবে। আর বিশ পঁচিশ ক্রোশ দূরে এখনও বিনা তারে সংবাদ চালাইবার সুবিধা হইবে। মার্চ্চোনির যন্ত্ররহস্য এখনও সাধারণের বিদিত হয় নাই, তিনিও ক্রোড়পতি হইবার চেষ্টায় আছেন। বিলাতে একটী কোম্পানি হইতেছে, ইহারাই মার্চ্চোনির কলের একচেটিয়া করিবেন; আর বিলাত ও আফরিকায় এই কলে নিরন্তর টেলিগ্রাফ চালাইবেন।

৭৯ নং হারিসন রোড, কলিকাতা।

এই মহাশাক্তরূপা বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর সালসা সেবন করিয়া দেহকে এবং মনকে শক্তিসম্পন্ন কর।

ইহা ঠিক্ সালসা নহে, তবে সালসা নাম না দিলে লোকে ইহার গুণাবলীর বিষয় কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন না, সেইজন্য সালসা নাম দিতে হইল। আমরা ইংরেজী-ভাবাপন্ন হইয়া পড়িতেছি; এই আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের নামকরণ তাই বিজাতীয় ভাষায় করিতে বাধ্য হইলাম,—নচেৎ উপায় নাই। বলুন দেখি, সোমরস নাম দিলে, সাধারণে কি বুঝিবেন?

চরক-গ্রন্থ অনন্তরত্নের ভাণ্ডার;—
মহা কল্পতরু-স্বরূপ।
সাধক এবং ভক্ত একান্তমনে যাহা খুঁজিবেন,
উহাতে তাহাই পাইবেন।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর সালসা।

সেই চরক-মহাসাগর মন্থনপূর্ব্বক উত্থিত হইয়াছে।
এ সালসা রোতলকে ধন্বন্তরির অমৃতপূর্ণ
কলস বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর সালসা।

এক মহাতেজঃস্বরূপ। উত্তর চীনদেশ হইতে আনীত কোন লতা-বিশেষের এমনি গুণ যে, এ সালসা সেবনের পাঁচ মিনিট পরেই দেহে এবং মনে মহাস্ফূর্ত্তি অনুভূত হইবে। মনে হইবে, শরীরে যেন কোন বৈদ্যুতিক ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইল। এই মহাশক্তিস্বরূপিণী সালসা-সুধা পানে মনঃপ্রাণ স্বর্গীয় সুখে বিভোর হইয়া উঠিবে। এ সালসা সহজ-শরীরেও সেবনীয়। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, বসন্ত—

কঠোর পরিশ্রমের পর সেবন করিলে
সঙ্গে সঙ্গে শ্রান্তি দূর হয়।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর সালসা

সেবন করিলে নানা রোগ আরাম হয়। তন্মধ্যে প্রধানতঃ সহজে এবং শীঘ্রই এই রোগগুলি দূর হয়;—(১) দূষিত রক্তকে পরিষ্কার করে; (২) সরু হাড়কে মোটা করে; (৩) কৃশ ব্যক্তিকে সবল ও স্থূলদেহ করে; ক্ষুধাবৃদ্ধি হয়; (৫) কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়; (৬) লাবণ্য-বৃদ্ধি হয় (৭) স্মরণশক্তি এবং মেধা-বৃদ্ধি হয়।

বি, বসু, এণ্ড কোম্পানীর সালসা

নিম্নলিখিত রোগে মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে;—(১) নানা প্রকার পারার ঘা; (২) নানা প্রকার চর্ম্মরোগ; (৩) খোষ, চুলকানি; (৪) গর্ম্মির ঘা; (৫) বাতরোগ; (৬) গাঁটের বেদনা ও ফোলা; (৭) শরীরের অন্য স্থানে বেদনা; (৮) অর্শ ও ভগন্দর; (৯) অম্লাদিরোগ; (১০) মেহ আদি প্রস্রাবের পীড়া।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর সালসা

(১) পুরুষত্ব-হানির মহৌষধ; (২) শুক্রের বিবিধ দোষ-নিবারণে ব্রহ্মাস্ত্র; (৩) নানারূপ কাসরোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ; (৪) কৃমি-রোগের মহৌষধ; (৫) জ্বর-রোগে পুনঃপুনঃ আক্রান্ত হইয়া যাঁহারা অতিশয় ক্ষীণদেহ হইয়াছেন, তাঁহাদের ইহা সেবন করা একান্ত বিধেয়। তদবস্থায় সেবন করিলে পুনরায়, জ্বরের আশঙ্কা থাকে না।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর সালসা।

সেবন করিয়া গলিতকুষ্ঠ রোগ পর্য্যন্ত আরাম হইয়াছে। এই কলিকলুষ-নাশক এই মহৌষধ—এই সোমরস—এই মহাশক্তি,—এই আয়ুর্ব্বেদীয় সালসা, একবার সেবন করিয়া দেখুন, হাতে হাতে প্রত্যক্ষ শুভ ফল পাইবেন। অন্তরের সর্ব্বরোগ দূর হইবে।

মূল্যাদি।

	মূল্য	ডাঃমাঃ	প্যাকিং
১নং আধপোয়া শিশি	॥৶০	।০	৶০
২ নং একপোয়া শিশি	১৶০	৸০	৶০
৩ নং দেড়পোয়া শিশি	১॥৶০	১৲	৶০

ভ্যালুপেবলে লইলে মূল্য আরও দুই আনা বা চারি আনা অধিক পড়ে। তিন বা চারি শিশি, ছয় শিশি অথবা এক ডজন একত্র লইলে ডাকমাশুল কিছু কম পড়ে। রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট যাঁহাদের বাড়ী, তাঁহারা রেলপার্শেলে এই সালসা দুই শিশি, চার শিশি, ছয় শিশি বা এক ডজন একত্র লইলে মাশুল আরও কম পড়ে।

অনেকে ডজন-ডজন (অর্থাৎ ১২ টার হিসাবে) এ সালসা লইতেছেন। একেবারে এক ডজন লওয়াই সুবিধা,—কেননা, ইহাতে কমিশন পাওয়া যায়। এক ডজনের কম, এমন কি, ১১ এগার শিশি ঔষধ লইলেও কেহ কমিশন পাইবেন না। ৩ নং অর্থাৎ দেড় পোয়া শিশির ১২ বারটার মূল্য ১৯৷৷০ সাড়ে উনিশ টাকা বাদ কমিশন ২৲ অর্থাৎ সাড়ে সতর টাকাতেই ৩ নং এক ডজন সালসা পাইবেন। কিন্তু ইহার ডাকমাশুল ৮৲ আট টাকা। তবে রেলওয়ে পার্শেলে এ ঔষধ লইলে দূরত্ব অনুসারে মাশুল ১৲, ২৲ বা ৩৲ টাকা পড়িয়া থাকে। ৩ নং এক ডজনের প্যাকিং চার্জ্জ ৸০ আনা ধরা হয়। সুতরাং সাধারণের রেল-পার্শেলে ঔষধ লওয়াই সুবিধা। কোন্ রেলষ্টেশনে ঔষধ পাঠাইতে হইবে, তাহা পত্রে খুলিয়া লিখিবেন; ইহা ব্যতীত আপন নাম, ধাম, পোষ্টাফিস জেলা লেখা আবশ্যক।

২ নং এক ডজন সালসা লইলে (বাদ কমিশন) মূল্য ১২৸০ বার টাকা বার আনা। ইহা ব্যতীত ডাঃমাঃ ৬৲ ছয় টাকা।

১ নং এক ডজন—সালসা (বাদ কমিশন) মূল্য ৬৷৷০ সাড়ে ছয় টাকা; ইহা ব্যতীত ডাঃ মাঃ ৪৲ চারি টাকা। রেল-পার্শেলে লইলে মাশুল কম পড়ে। রেল-প্যাকিং চার্জ্জ স্বতন্ত্র।

১ নং (আধপোয়া) এক শিশি সালসা ৪ দিন সেবনীয়; ২নং (একপোয়া) এক শিশি ৮ দিন সেবনীয়; ৩ নং (দেড়পোয়া) এক শিশি ১২ দিন সেবনীয়। ৪ দিন সেবন করিলেই উপকার জানিতে পারিবেন।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর

ফুলেলা।

ভারতবর্ষ ফুলের ভাণ্ডার। ভারত-কুসুম অমূল্য রত্ন। এ ফুলের তুলনা নাই। সাতটী সদ্গন্ধযুক্ত ফুলের সাররস, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে একত্র মিলাইয়া, (আয়ুর্ব্বেদোক্ত নানা মসলার সহিত) এই ফুলেলা তৈয়ারি হইয়াছে। আপনি ফুলেলা মাখিতে আরম্ভ করুন,—দূরস্থিত পথিক মনে করিবে, একি হইল? হঠাৎ নানাজাতীয় পুষ্পের সৌরভ পাই কেন? নিকটে কি ফুলের উদ্যান আছে? ফুলসমূহ কি এককালেই প্রস্ফুটিত হইয়াছে? এমন মনোহর সৌরভ ত এই মর্ত্ত্যধামের নহে,—বুঝি স্বর্গীয় নন্দনকানন হইতে এ সৌরভ আসিতেছে! আপনার মানময়ী গৃহিণী যদি রাগ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আর কিছুই করিতে হইবে না,—এক শিশি ফুলেলা কিনিয়া তাঁহার হাতে দিন এবং দুই চারি ফোঁটা ফুলেলা লইয়া তাঁহার কপালে মাখাইয়া দিন, গৃহিণীর রাগ দূর হইবে।

ফুলেলায় মনকে প্রফুল্ল রাখে। যে ঘরে ফুলেলা থাকে, সে ঘর সৌরভে সদা আমোদিত হয়। সর্ব্ব দুর্গন্ধ দূর হয়। গৃহস্থের স্বাস্থ্য ভাল থাকে। ফুলেলা দেবী-অঙ্গের ভূষণ।

ফুলেলা-ব্যবহারে চুলের গোড়া শক্ত হয়। চুল কাল এবং চিক্কণ হয়। ফুলেলায় চুল-ওঠা-দোষ দূর হইয়া চুল বৃদ্ধি পায়,—চামরের ন্যায় কেশকলাপ হয়। বহুদিন ধরিয়া ফুলেলা মাখিলে টাকরোগ নষ্ট হয়। ফুলেলায় মস্তিষ্ক শীতল হয়, শিরোঘূর্ণন দূর হয়। হাত-পা-জ্বালা ও গাত্রজ্বালা দূর হয়। মাথার খুস্কি এবং চুলকানি নষ্ট হয়। পেটে মাখিলে পেট ঠাণ্ডা হয়; হজম-শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং দাস্ত খোলসা হয়। প্রমেহাদি রোগও আরোগ্য হয়। শরীরের ময়লা দূর হয়। লাবণ্য বৃদ্ধি হয়।

প্রতি তিন আউন্স শিশি মূল্য ১৲ এক টাকা; প্যাকিং ৵০ দুই আনা; ডাঃ মাঃ ৷৷০ আট আনা; ভিঃ পিঃ কমিশন দুই আনা। যদি কেহ ১২ শিশি ফুলেলা একত্র লয়েন, তবে তিনি ২৲ দুই টাকা কমিশন পাইবেন। অর্থাৎ দশ টাকাতেই ১২ শিশি ফুলেলা পাইবেন। ডাঃ মাঃ তিন টাকা; প্যাকিং চার্জ্জ ৵০ ছয় আনা। ভিঃ পিঃ কমিশন ৷০ চারি আনা। রেল-পার্শেলে ডজন হিসাবে ফুলেলা লইলে মাশুল আরও কিছু কম পড়ে।

ফুলেলার প্রশংসা পত্র।

১ম পত্র।

"মহাশয়! আপনার প্রেরিত এক শিশি 'ফুলেলা' ব্যবহারে অত্যন্ত আরাম বোধ করিয়াছি। অনুগ্রহপূর্ব্বক আর এক শিশি "ফুলেলা" ভিঃ পিঃ ডাকে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। আপনার ফুলেলা অতি চমৎকার হইয়াছে।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দত্ত, মুন্সেফ।
লক্ষ্মীপুর, জেলা নোয়াখালী।

কলিকাতা হাইকোর্টের সূক্ষ্মদর্শী প্রসিদ্ধ উকিল এ টর্ণী শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, বি এল, মহোদয় "ফুলেলা" সম্বন্ধে কি লিখিয়াছেন, দেখুন;—"আপনাদের "ফুলেলা" দুই শিশি ব্যবহার করিয়াই চুল-উঠা সম্বন্ধে অনেক উপকার পাইয়াছি। 'ফুলেলা'র গন্ধ অতি মনোহর,—স্নানের পরও অনেকক্ষণ থাকে।"

জন্মভূমি।

নবম ভাগ—নবম বর্ষ।

(১৩০৭ সালের শ্রাবণ হইতে ১৩০৮ সালের আষাঢ় মাস
পর্য্যন্ত দ্বাদশ সংখ্যা সম্পূর্ণ।)

কলিকাতা,—৩৯ নং মাণিকবসুর ঘাট ষ্ট্রীট,
"জন্মভূমি কার্য্যালয়" হইতে
শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা;
৩৩৬ নং অপার চিৎপুর রোড, 'চৈতন্যপ্রেসে'
শ্রীনীলমণি ধর দ্বারা মুদ্রিত।
সন ১৩০৮ সাল।

[ক মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা।] [ডাকমাশুল ।৵০ ছয় আনা।

সূচীপত্র।

সংখ্যা	বিষয়	লেখক	পত্রাঙ্ক।
১।	অতৃপ্তি (কবিতা)	শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী কবিরত্ন	১৮৭
২।	অনুপমা (গল্প)	„ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ,	১৩৭
৩।	আঁধার মাণিক (কবিতা)	„ শ্রীশচন্দ্র দে	১৫৯
৪।	আর্য্য-জাতির পশু চিকিৎসা	ব্রজবল্লভ কাব্য তীর্থ কাব্যকণ্ঠ বিশারদ	২১৭
৫।	আরতি (কবিতা).	„ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২৮৭
৬।	আয়ুর্ব্বেদে দোষত্রয়	„ অঘোরনাথ শাস্ত্রী	২৯১
৭।	উমা (সমালোচনা)	„ যদুনাথ চক্রবর্ত্তী বি-এ,	৩৪৫, ৩৬৬
৮।	এ নহে সান্ত্বনা (কবিতা)	„ বিহারীলাল রায় বি, এ,	১৫১
৯।	কবিকেশরী	„ দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু	১৩৩, ১৮৪, ২৭৫, ৩৩৪, ৩৭৩
১০।	কাঙ্গালের মণি (কবিতা)	„ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৩২৮
১১।	কাদম্বিনী (গল্প)	„ ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৩৫৬
১২।	কাল ও আজ (কবিতা)	„ কালিদাস চক্রবর্ত্তী	১৫০
১৩।	কালিন্দী (গল্প)	„ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ,	৭০
১৪।	কিম্ভূত-কিমাকার (নক্সা)	„ লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী	৫৩, ২৫০
১৫।	কোন কাজ নাই (কবিতা)	„ দ্বিজেন্দ্রনাথ নিয়োগী বি-এ,	১২৩
১৬।	গীত	„ সুরেশচন্দ্র সরকার এম-এ,	১২৩
১৭।	গীত	„ শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি-এ,	৩৫১
১৮।	গোকুলে শ্রীকৃষ্ণ	„ ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১১২, ১৪৪
১৯।	গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	„ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি	২০২, ২৬০, ২৯৬,
২০।	চিতোর	„ রাজকৃষ্ণ পাল	১১৫
২১।	চিন্তা (কবিতা)	„ ভুবনকৃষ্ণ মিত্র	১২৫
২২।	ছায়াসতী (উপন্যাস)	„ মনুজেন্দ্র দত্ত বি, এ,	৩৯, ১২১, ১৪৮, ২১৫, ২৮৩, ৩২৬

সংখ্যা	বিষয়	লেখক	পত্রাঙ্ক।
২৩।	জননী	শ্রীযুক্ত সম্পাদক	৩১
২৪।	টাকা (কবিতা)	„ ভুবনকৃষ্ণ মিত্র	২২০
২৫।	ত্রিত্ব—দেবত্বে ও কবিত্বে	„ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি	৪২
২৬।	তুমি (কবিতা)	„ কালিদাস চক্রবর্ত্তী	২২৩
২৭।	তুমি কি ?	„ দ্বিজেন্দ্রনাথ নিয়োগী বি-এ,	৩২
২৮।	তোতাপাখি (গল্প)	„ ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	২৬৭
২৯।	দীনের দুর্গোৎসব	„ জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ	৯০
৩০।	দুঃখ	„ পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায়বি-এ,২৬	
		ঐ	৩১০, ৩২৩
৩১।	দোপাটী (গল্প)	„	
৩২।	নভেলের নায়িকা	„ ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৩৪২
৩৩।	নরকদর্শন (গল্প)	„ যতীন্দ্রনাথ দত্ত	২৪৩
৩৪।	নিধিরামের দুর্গোৎসব	„ ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৮১
৩৫।	পার্ব্বত্যপদাবলী	„ কালিদাস নাথ	৭৭
৩৬।	প্রস্তাবনা	সম্পাদক	১
৩৭।	ফুলকুমারী (গল্প)	„ পাঁচকড়ি বন্দ্যো বি-এ,	১০০
৩৮।	বর্ষা (কবিতা)	„ কালিদাস চক্রবর্ত্তী	১১
৩৯।	বসন্ত এবং প্লেগের গো বসন্ত-বীজের টীকার উপকারীতা	হেমচন্দ্র সেন এম, ডি,	২৯৬
৪০।	বসন্ত-বাহার (কবিতা)	„ কালীপদ মুখো বি, এ,	৩০২
৪১।	ব্রহ্মোপাসনা কি ?	„ জয়চন্দ্রসিদ্ধান্ত ভূষণ	২২
৪২।	বাঙ্গালাভাষার লেখক	„ হারাণচন্দ্র রক্ষিত	৬০, ৮৮, ১১৯, ১৮১, ২১২, ২৮১, ৩৩৫, ৩৭৬
৪৩।	বাঙ্গালা সংবাদ-পত্রের ইতিহাস	„ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি	৬৫, ১০১
৪৪।	বিক্রয় কাহাকে বলে ?	সম্পাদক	২৮৯
৪৫।	বিজয়া	„ কৈলাসচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম,এ,	৯
৪৬।	বেলুনে [illegible]	„ জলধর সেন	১৭, ৩৩৯
৪৭।	ভক্তি	„ ক্ষীরোদকুমার দত্তএম-বি,	২৫৭
৪৮।	ভট্ট মোক্ষমুলর	„ অঘোরনাথ শাস্ত্রী	১৫২
৪৯।	ভারত সাররত্ন	„ জয়চন্দ্রসিদ্ধান্ত ভূষণ	৩২৯

সংখ্যা	বিষয়	লেখক	পত্রাঙ্ক।
৫০।	ভাল কিলো বাসিতে জাননা ?	শ্রীযুক্ত কালীপদ মুখো বি-এ,	৮
৫১।	ভিক্টোরিয়া জীবনী-প্রসঙ্গ	„ যদুনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এ,	২২৫
৫২।	মধুকান	„ কালীপদ মুখো বি-এ,	১৬৬
৫৩।	মনোরমা (গল্প)	„ পাঁচকড়ি বন্দ্যো বি, এ,	১৭২
৫৪।	মহাম্মদ্ গজনবী	„ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি	১৬১
৫৫।	মুক্তি	„ নীলকান্ত গোস্বামী	১২৯,১৯৮
৫৬।	মৃত্যু (কবিতা)	„ শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ,	২৬৫
৫৭।	মেডিকেল কলেজ	„ অঘোরনাথ শাস্ত্রী	৩৩১
৫৮।	৺রজনীকান্ত গুপ্ত	„ যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	১২
৫৯।	শকুন্তলা	„ দেবেশ্বর মুখোপাধ্যায়	২০৯, ৩২৯, ৩৬২,
৬০।	শরৎ (কবিতা)	„ কালিদাস চক্রবর্ত্তী	১২৭
৬১।	সমালোচনা	সম্পাদক	১২৭, ১৬০, ১৯২, ২৮৭, ৩৫৩,
৬২।	"সরস্বতী" স্রোতস্বতী	„ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি	৩৫৩
৬৩।	সংযম	„ ঐ ঐ	২
৬৪।	সুর (কবিতা)	শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী	১৮৩
৬৫।	হায় মা ভিক্টোরিয়া	শ্রীযুক্ত ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৯৩
৬৬।	হিন্দু বিবাহ পদ্ধতি	„ পাঁচকড়ি বন্দ্যো বি, এ,	১৩৩
৬৭।	হৃদয়োচ্ছ্বাস—শোক	„ কৃষ্ণগোপাল ভক্ত	৩৭২
৬৮।	হোলী (কবিতা)	„ ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১১৬

সূচীপত্র সমাপ্ত।

জন্মভূমি।

(সচিত্র মাসিক পত্রিকা।)

নবম বর্ষ। } শ্রাবণ, ১৩০৭ সাল। { প্রথম সংখ্যা।

প্রস্তাবনা।

"মূকং করোতি বাচালং, পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং।
যৎকৃপা ত্বমহং বন্দে, পরমানন্দ মাধব॥"

যাঁহার কৃপায় অন্ধের চক্ষুঃ ফোটে—মূক, বাচাল হয়,—পঙ্গু, গিরি লঙ্ঘন করে,—সেই অপার করুণাময় পরমেশ্বরের শ্রীচরণ স্মরণ করিয়া আমরা "জননী-জন্মভূমির" সেবায় নিযুক্ত হইতেছি। সর্ব্বমঙ্গলা, আমাদিগের মঙ্গল করুন।

"জন্মভূমির" নূতন পরিচয় দেওয়া আর দীপালোকে সূর্য্যদর্শন করা, একই কথা। সেই কারণে "জন্মভূমির" সম্বন্ধে কোন নূতন কথা বলা নিষ্প্রয়োজন, বলিয়া মনে করি। যে উদ্দেশ্যে ও কার্য্যসাধনে প্রণোদিত হইয়া "জন্মভূমি" বিগত ১২৯৭ সালে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই উদ্দেশ্যেই কার্য্যক্ষেত্রে এই সুদীর্ঘ ৮ (আট) বৎসরকাল অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছে,—এ গৌরব ব্যক্তিগত নহে, এ গৌরব, সমগ্র বাঙ্গালীর স্বজাতীয় গৌরব। বিশেষতঃ জাতীয় সাহিত্য-ভাণ্ডারে বিবিধ রত্ন সঞ্চয় করিয়া "জন্মভূমি" আরও বঙ্গসাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে "জন্মভূমি" কাহার বিরাগভাজন হয় নাই! "জন্মভূমি" কাহারও প্রতিদ্বন্দ্বিণী নহে। তথাপি বাঙ্গালীর চিরদিনের নিমিত্ত অপর জাতি সাধারণের নিকট এই একটী কলঙ্ক আছে যে, যাহা আমরা আরম্ভ করি, তাহা আর শেষ করিতে পারি না। এই কলঙ্ক অপনোদনের জন্যই

আমরা নবানুরাগে নূতন উৎসাহে, "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী", সতত এই মহানীতির অনুসরণ করিয়া ধর্ম্মপথে বিচরণ করা "জন্মভূমির" জীবনের একমাত্র ব্রত, তাহা যাহাতে অবিকৃতরূপে রাখিতে পারি, সেই বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া জগজ্জননীর শ্রীচরণে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক নব-বর্ষের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম।

সংযম।

ধর্ম্ম-সাধনই, "ভক্ত-জীবনের" প্রাণ। ধার্ম্মিক হইতে হইলে—ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণ হওয়ার আবশ্যকতা হইলে—'সংযম' প্রয়োজনীয়। সেই "সংযম" যেমন সংখ্যায় সম্যক্ অধিক, তাহার অন্তিমও, তেমনই বা তদপেক্ষাও মনোরম। আহার, বিহার, ভ্রমণ, কথোপকথন, গান, ভোজন—সর্ব্বত্রই "সংযমের" প্রয়োজন। ভক্ষ্য-পেয়-বিষয়ের সংযমে, খাদ্যাখাদ্য-বিচারের বিশেষ দরকার। সেই কারণেই, এখানে উহার অবতারণা।

বিশেষ বিশেষ তিথিতে, বিশেষ বিশেষ খাদ্য, কেন নিষিদ্ধ, এইখানে তাহারই আলোচনা হইতেছে।

যজমানকে এবং তাঁহার প্রতিনিধি-স্বরূপ কৌলিক-পুরোহিতকে* জীবনের প্রথম ভাগে—অভাবতঃ, দ্বিতীয় ভাগেও—খাদ্যাখাদ্যের প্রতি, প্রতি-পদ-ক্ষেপেই লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

"কুষ্মাণ্ড-বৃহতীঞ্চৈব পটোলং মূলকং তথা।
শ্রীফলং নিম্বপত্রঞ্চ তালঞ্চাপি তথা শিবং॥
অলাবু-নালিকাঞ্চৈব শিম্বিকাং পূতিকাং তথা।
তিলান্ মাষঞ্চ মাংসঞ্চ প্রতিপদাদিষু বর্জ্জয়েৎ॥"

ইহার বিশদ ব্যাখ্যা, নিম্নে সহজ প্রণালীতে প্রদত্ত হইল। যথা,—

১। প্রতিপদে—'কুষ্মাণ্ড'।
২। দ্বিতীয়ায়—'বৃহতী'।

---

* "অগ্নি" দেবতা, যেমন দেবগণের পুরোহিত এবং প্রতিনিধি-স্থানীয়—কুলপুরোহিতও, গৃহস্থের তদ্রূপ প্রতিনিধি-স্থানীয়।

৩। তৃতীয়ায়—'পটোল'।
৪। চতুর্থীতে—'মূলা'।
৫। পঞ্চমীতে—'শ্রীফল'।
৬। ষষ্ঠীতে——'নিম্ব'।
৭। সপ্তমীতে—'তাল'।
৮। অষ্টমীতে—'শিব' (নারিকেল)।
৯। নবমীতে—'অলাবু' (লাউ)।
১০। দশমীতে—'নালিকা' (কলম্বী শাক)।
১১। একাদশীতে—'শিম্বী' (সিম)।
১২। দ্বাদশীতে—'পূতিকা' (পুঁই)।
১৩। ত্রয়োদশীতে—'বার্ত্তাকু'।
১৪। চতুর্দ্দশীতে—'মাষ-কলাই'।
১৫। { পূর্ণিমায় / অমাবস্যায় }—'মাংস' এবং 'তৈল'।

কয়েকটী প্রচলিত শব্দের অর্থ, পশ্চাৎ নিবদ্ধ হইতেছে। যথা,—

ক। "বৃহতী"—অর্থে 'ছোট বেগুন'।
খ। "তাল" শব্দে—'শ্বেত তাল'।
গ। "নিম্ব" অর্থে—নিম্ব-পত্র; কিন্তু উহার ত্বক্ বা মূল নয়।

উল্লিখিত তিথিতে উল্লিখিত দ্রব্য-ভোজন কেন ঋষিরা, নিবারণ করিয়াছেন,—কেবল কথায় নিষেধ নয়,—উহা ব্যবহার করিলে, কি কি দোষ ঘটে, স্মার্ত্ত গ্রন্থে ও অন্যান্য শাস্ত্রীয় গ্রন্থে, তাহারও সবিশেষ নিষেধাদেশ, অবলোকিত হয়। যথা,—

"কুষ্মাণ্ডে" চার্থহানিঃ স্যাৎ, "বৃহত্যাং" ন স্মরেদ্ধরিং।
বহুশত্রুঃ "পটোলঃ" স্যাৎ, ধনহানিস্তু "মূলকে"॥ ১॥
কলঙ্কী জায়তে "বিল্বে", তির্য্যগ্‌যোনিশ্চ "নিম্বকে"।
"তালে" শরীরনাশঃ স্যাৎ, "নারিকেলে" চ মূর্খতা॥ ২॥
"তুম্বী" গোমাংসতুল্যা স্যাৎ, "কলম্বী" গোবধান্তিকা।
"সিম্বী" পাপকরা প্রোক্তা, "পূতিকা" ব্রহ্মঘাতিকা॥ ৩॥
"বার্ত্তাকৌ" সুতহানিঃ স্যাৎ, চিররোগী চ "মাসকে"।
মহাপাপকরং "মাংসং" প্রতিপদাদিষু বর্জ্জয়েৎ॥ ৪॥"

ইহার অর্থ এই ;—

"প্রতিপদে অর্থহানি, কুষ্মাণ্ড-ভক্ষণে।
দ্বিতীয়ায় বৃহতীতে বিহীন ভোজনে ॥
শত্রুবৃদ্ধি পটোল খাইলে তৃতীয়ায়।
মূলাহারে চতুর্থীতে ধনহানি পায় ॥
পঞ্চমীতে শ্রীফলে কলঙ্ক অতিশয়।
ষষ্ঠীতে খাইলে নিম্ব, পশুযোনি হয় ॥
তালে শরীরের নাশ সপ্তমীর যোগে।
অষ্টমীতে মূর্খ হয়, নারিকেল-ভোগে ॥
অলাবু, গোমাংস-তুল্য নবমী-তিথিতে।
দশমীতে গোমাংস-সদৃশ কলম্বীতে ॥
সিমে মহাপাপ, একাদশীর নিয়ম।
দ্বাদশীতে পুঁই-শাকে, ব্রহ্মহত্যা-সম ॥
ত্রয়োদশী-তিথিতে, বার্ত্তাকু যদি খায়।
সন্তানের হানি হয়, বিধানে জানায় ॥
চতুর্দ্দশী-তিথির দিবসে নরগণে।
চিররোগী হয়, মাষ-কলাই ভক্ষণে ॥
অমাবস্যা-পূর্ণিমায়, যদি খায় মাংস।
পূর্ণরূপে মহানামে প্রকাশে পাপাংশ ॥

পূর্ব্বোক্ত-রূপ নিষেধের তাৎপর্য্য কি? নিষেধাজ্ঞা, প্রগাঢ় না হইলে, তাহা, ফলবতী হয় না বলিয়াই, ঐ ব্যবস্থা, ঋষিগণ কর্ত্তৃক পরিকল্পিত।

ফলতঃ, প্রতিপদে কুষ্মাণ্ডভোজন দোষাবহ ; দ্বিতীয়ায় বৃহতী ভক্ষণ করিতে নাই—ইত্যাদি-স্থলে নিষেধানুমতি, বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক মতের উপর নির্ভর করিতেছে। শ্রুতর্ষি চিকিৎসা-বিজ্ঞান-বিৎ চরক-মুনিও, ভক্ষ্য-পরিবর্ত্তন-কারিণী ব্যবস্থায় সায় দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—অমুক অমুক দ্রব্য, সর্ব্বদা খাদ্যরূপে ব্যবহার করা অবিধেয়। যথা,—

"কূচ্চিকাংশ্চ কিলাটাংশ্চ, শৌকরং গব্যমামিষং।
মৎস্যান্ দধি চ মাষাংশ্চ যবকাংশ্চ ন শীলয়েৎ ॥"

—চরক, সূত্রস্থানং, ৫ম অধ্যায়।

ইহার বাঙ্গালায় অর্থ এইরূপ,—

ছানা, ঘনীভূত দুগ্ধ, শূকর মাংস, গো-মাংস, মৎস্য, দধি, মাষ-কলাই, কুলত্থ কলাই—এই সকল প্রতিনিয়ত ব্যবহার করা অ-বিধি।

এতদ্ব্যতীত অন্যরূপ খাদ্যও, সদাই বর্জ্জনীয়। চরক-মুনি, মাষ-কলাইকে অনিয়মিত ভক্ষ্যের অন্তর্গত করিয়াছেন। স্মৃতি-কর্ত্তারাও, শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয়-পক্ষের চতুর্দ্দশীতেও, উহার ব্যবহার নিবারণ করিয়াছেন। সুতরাং, তাঁহাদের মতে মাস-মধ্যে দ্বি-বার, উহা অব্যবহার্য্য হইতেছে। অতএব মাষ-কলাই যে, নিয়মিত খাদ্যের অন্তর্নিবিষ্ট হইতে পারে না, তাহা, চিকিৎসা-শাস্ত্রীয় ও স্মৃতিশাস্ত্রীয়—এই উভয় মতেই প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছে।

হিন্দুর ধর্ম্মতত্ত্বের মর্ম্মে প্রবিষ্ট হইতে হইলে, বিধর্ম্মীরা, তাহাতে কৃতাবসর হইতে পারেন না। কেবল আহার কেন?—পরিচ্ছদ, চিত্তবৃত্তি, প্রকৃতিও হিন্দুর মত না হইলে, হিন্দুধর্ম্ম-মর্ম্মের মনোমত ফল পাইবার আশা কোথায়?

এখানে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়া অসম্ভব নয় যে, স্মৃতিকারগণের নিষেধিত খাদ্য-দ্রব্য-গুলির তালিকা (মাষকলাই ভিন্ন), তো চরকীয় ঐ বচনে ধৃত হয় নাই! এই প্রশ্নের মীমাংসায় গুরুতর মস্তিষ্ক-সঞ্চালনের আবশ্যকতা কি? উভয় স্থলেই, একই যুক্তি, একই উদ্দেশ্যে কার্য্য করিতেছে। প্রত্যহ এক প্রকার আহার্য্য গ্রহণে উপকার কোথায়? তাহাতে বরং অপকারেরই সম্পূর্ণ অস্তিত্ব। উহাতে চিত্তবিকার সংঘটন হওয়া সম্ভব। যাঁহারা মনস্বত্ব-বিদ্যাধ্যায়ী, তাঁহারাই এই কথা বোঝেন। এস্থলে অনুধাবন করিলে প্রতীতি জন্মিবে, স্মৃতি-সংহিতার উদ্দেশ্যই এই যে, ভোজ্য-দ্রব্যের নিত্য-পরিবর্ত্তন, একান্তই আবশ্যক ও কর্ত্তব্য। যে মধু, এত সুমিষ্ট ও মুখরোচক,—নিত্য-ব্যবহারে তাহারও যেন স্বাদুতা কমিয়া যায়। ক্রমে তাহাতেও, অরুচি ও অপ্রবৃত্তি জন্মে। কিছু দিন উপর্য্যুপরি ক্ষীর-ভোজন বা দুগ্ধপান বন্ধ হইবার পরে পুনরায় পরবর্ত্তী কালে সেই দুগ্ধের কতই মিষ্টতা, কতই স্বাদুতা, কতই মনোহারিতা উপলব্ধি হয় ও তৎসঙ্গেই তাহাতে কি অপরূপ তৃপ্তি জন্মে! যাহাতে দেহের স্ফূর্ত্তি-বিধান না করে, তদ্ব্যবহারে ফলোদয় তো নাই ; বরং আধি-সম্ভাবনা। না হয়, ব্যাধি-সংঘটনেরও কথা বটে। 'ব্যাধি' অর্থাৎ দৈহিক পীড়া। 'আধি' অর্থে মানসিক রোগ। ঐরূপ কার্য্যে অন্ততঃ, মনঃপীড়া ঘটিয়া, দৈহিক ব্যাধি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য মহামুনি চরক, যে যে পদার্থ, নিত্য আহারীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার সহিত স্মার্ত্তগণের নিষেধানুজ্ঞায় মূলতঃ কোনই বৈলক্ষণ্য নাই।

"ষষ্টিকান্ শালি-মুদ্গাংশ্চ সৈন্ধবামলকে যবান্।
আন্তরীক্ষং পয়ঃ সর্পির্জাঙ্গলং মধু চাভ্যসেৎ॥"

—চরক, সূত্রস্থানং, ৫ম অধ্যায়।

উহার তাৎপর্য্যার্থ এই,—

ষষ্ঠি-ধান্য (ষেটি ধান্য), শালি-ধান্য, মুগ-কলাই, সৈন্ধব-লবণ, আমলকী-ফল, যব, আকাশ-নিপতিত নীর, ঘৃত, বন্য-মধু—এ গুলি নিয়ত ব্যবহার্য্য।

স্মৃতিকারেরা, সকল দিনেই একটা না একটা খাদ্যবস্তু নিষেধ করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি দেখ, ঐ নিয়মের সহিত চরকমুনির ব্যবস্থাপিত বিধির কোন বিরোধ-ঘটনাই হইল না। অতএব দৃষ্ট হইল—আয়ুর্ব্বেদে ও স্মৃতিতে নিষেধ-বিধি, পৃথক্ হইলেও, উহাদের মূলগত কোন পার্থক্যই নাই। উভয় শাস্ত্রমধ্যে কেমন সামঞ্জস্য! তদ্ভিন্ন এ ক্ষেত্রে আরও এক কথা বিবেচ্য। সে কথাটা একবার ভাবিয়া দেখিতে হইবে। খাদ্যের সঙ্গে ধর্ম্ম-সাধনার উত্তম সম্বন্ধ, ঘনিষ্ট সংস্রব। সেই জন্যই হিন্দু-বিধবার পক্ষে একাদশীর উপবাস, নিরামিষাহার ও একসন্ধ্যা ভোজন ব্যবস্থা। আর, সধবা-বিধবারা বার-ব্রত-নিয়মের কঠোরতা-পালনে ব্যাকুল থাকেন। ইহাতে হিন্দুরমণীকে শনৈঃ শনৈঃ ধর্ম্মমার্গে প্রধাবিত করে।

কেবল বিধবা-সধবাদের বিষয়ই বা বলি কেন? কি পুরুষ, কি রমণী—সকলকেই শ্রাদ্ধাদির পূর্ব্বে সংযম করিতে হয়। নৈষ্ঠিক ক্রিয়াকর্ম্মের পূর্ব্ববাসরে হবিষ্য করা আবশ্যক। অভাবপক্ষে নিরামিষাহার, একাহার বা প্রাতঃস্নান করাও, একান্ত কর্ত্তব্য বটে।

স্মৃতির শাসনানুসারে প্রতিদিন এক একটী খাদ্য বর্জন করিতে করিতে, ক্রমে প্রিয়-বস্তুতে লোভাভাব ঘটে। রবিবারে মৎস্য-মাংসাহার নিষেধের মূলেও ঐ যুক্তি। রবিবারে কেবল মৎস্য-মাংসাহার পরিহার করা আবশ্যক নয়,—আমিষ বলিয়া পরিগণিত মসূরকলাই প্রভৃতিও ত্যাজ্য। মনে করুন, এক ব্যক্তি অতিরিক্ত পটোলপ্রিয়। একজন বা অত্যন্ত মীনাসক্ত। কেহ কেহ হয় তো আলুর প্রতি দয়ালু। উক্ত শ্রেণীর লোকেরা প্রথম প্রথম পটোল, মৎস্য বা আলু পরিত্যাগে কষ্টানুভব করিতে থাকেন; কিন্তু ধর্ম্মোপদেশে

আদিষ্ট হইলে, বাধ্য হইয়া, দুই চারি বারেই পটোলাদি-পরিহারে তিনি অভ্যস্ত হন। কেবল অভ্যাস নয়, কিন্তু তত্তৎ দ্রব্যে লোভ খর্ব্ব হইবে। অধিক কি, ক্রমে ক্রমে লোভজনক মৎস্যে, মাংসে বা অপরাপর দ্রব্যেও, বিরতি হইয়া আসিলে, হিন্দুর আর কোন ক্লেশই বোধগম্য হয় না। ইহাতে অভ্যস্ত ও প্রস্তুত হইলেই, সাধনার পথ, পরিষ্কৃত হইয়া আসিবে। ভক্ষ্য-পেয়ের সহিত পুণ্যানুষ্ঠানের সম্পর্ক কি, যাঁহারা বলিবেন, তাঁহারা, একবার চিন্তা করিয়া দেখিবেন, ধর্ম্মশিক্ষায়—যোগাভ্যাসে—জগতের মধ্যে, ভারতই, চিরাগ্রসর কেন? হিন্দুজাতিই, অন্যান্য জাতি অপেক্ষা এত দূর ধর্ম্মগত-জীবন কেন? অখাদ্য-ভক্ষণে এবং অপেয়-পানে বিরাগ হইলে, আর ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ থাকিলে, ভারতেতর দেশের এতাদৃশ দুর্দ্দশা ঘটিত কি? চিরজীবন যে ব্যক্তি মাংসাহারী, সে কখনই যোগীর দুর্লভ পদলাভে অধিকারী হয় না। তিথি-বিশেষে একটা দুইটা খাদ্য-বস্তুর পরিবর্জ্জনের প্রসঙ্গ কি বল? যিনি, দুই একটী করিয়া খাদ্য ত্যাগ করিয়া, প্রথমাবধি প্রস্তুত হইতে থাকেন, তিনিই ক্রমশঃ যোগী হইতে পারেন। অভ্যাসের গুণে যোগীকে যথাক্রমে সর্ব্ববিধ খাদ্যেই জলাঞ্জলি দিতে হয়। ভাবিয়া দেখুন, পাঠক! এককালের মহাভোগী কৃতাভ্যাস হইয়া, সর্ব্বত্যাগী যোগী দাঁড়াইলেন। পরিশেষে সর্ব্বত্যাগী যোগী বায়ুভোগীও হইলেন। এই কথাকে এখন আর আজগুবি গল্প বলিয়া, উড়াইয়া দিবার দিন নাই। সে কাল, অধুনা ভূতকালের গর্ভগত। ভূ-কৈলাসের যোগী, রঞ্জিৎ সিঙের দরবারে পরীক্ষিত সন্ন্যাসী হরিদাস সাধুর বর্ণনা, সাহেবেরাও নির্ব্বিবাদে স্বীকার করিয়াছেন। অধিক আর কি কহিব? বেশী দিনের কথা নয়, সেদিন বর্দ্ধমানের রাজা প্রতাপচাঁদও স্বয়ং যোগশাস্ত্রের অদ্ভুত মহিমা কীর্ত্তন করিয়া ও যোগের ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করাইয়া, তাঁহার উকীল সাঁ সাহেবকেও স্তম্ভিত ও মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। উক্ত ইংরেজ, যোগপ্রভাব অস্বীকার করিতে না পারিয়া, নিজে তাহার কার্য্যকারিতা স্পষ্টই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুগণ! খাদ্য-পরিবর্জ্জন ও খাদ্য-পরিবর্ত্তনের মহদভিপ্রায়ের গূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিলেন কি? সম্মুখে কি নিগূঢ়তম অসাধারণ অভিসন্ধি রাখিয়া, আমাদের মহামহোপাধ্যায় প্রাচীন আর্য্য-পিতামহগণ, এই গুর্ব্বর্থ-কর উপদেশ বিধান করিয়া গিয়াছেন! ভাই বঙ্গবাসিগণ! আইস, এক একবার প্রগাঢ় মনোনিবেশ সহকারে, ভক্তিভাবে অনুধ্যান করিয়া দেখি

ও তাঁহাদের চরণাম্বুজরেণু বক্ষে ধারণ করিয়া আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করি। তাঁহারা যাহা কিছু তাঁহাদের এই অকৃতী অধম সন্তানদের নিমিত্তে বিধান করিয়াছেন, ঐ সকলেরই মূলে জ্ঞান, যুক্তি, উপদেশ, সুশিক্ষা বর্ত্তমান। একবার মাত্র তন্ময়চিত্তে যদি আমরা তাঁহাদের মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হই, তাহা হইলেই আমরা চিরশান্তির অধিকারী হইতে পারিব। আর, তাহা হইলেই ভারতে হিন্দুকুলে আমাদের জন্মগ্রহণ সার্থক হইবে। পঞ্জিকার নিষেধ বচন, কোন্ যুক্তির অনুমোদন করিল, পাঠক! এখন তাহা বুঝিলেন কি? ঐ নিষেধটী, কেমন শাস্ত্রসম্মত, স্মৃতি গ্রন্থের অনুগত ও অনুমোদিত, তাহাই দেখান গেল।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

ভাল কি লো বাসিতে জান না?

(১)

এত ভালবাসি তোমা
তুমি ত বাসিলে কই!
মুহূর্ত্তের অদর্শনে
মরমে মরিয়া রই!
না হেরিলে চাঁদমুখ
তিলেক না পাই সুখ,
এ সংসারে প্রিয়তমে!
জানি না যে তোমা বই।
এত ভালবাসি তোমা,
তুমি প্রিয়ে বাস কই?
তাইলো সুধাই তোমা বলনা বলনা,
ভাল কিলো বাসিতে জান না?

(২)

ঘুমায়ে স্বপন দেখি
মুখানি তো হাসি হাসি,
কুমুদে পড়েছে যেন
চাঁদিমা কিরণরাশি!
কি সুন্দর মরি মরি
সে রূপ হৃদয়ে ধরি,
মনে হয় নিরজনে
দেখিগে দিবস নিশি।
তুমি প্রিয়ে বাস কই,
আমি এত ভালবাসি,
তাইলো সুধাই তোমা বলনা বলনা,
ভাল কিলো বাসিতে জান না?

(৩)

তুমি ত ঘুমায়ে থাক
আমি ত জাগিয়ে রই;
সুষুপ্ত সুষমা হেরি
প্রাণে প্রাণহারা হই।

স্তিমিত কমল শোভা
নীলনেত্রে মনোলোভা
দেখিয়ে জীবনে প্রিয়ে
বাসনা মিটিল কই?
এত ভালবাসি তোমা
তুমি প্রিয়ে বাস কই?
তাই লো সুধাই তোমা বলনা বলনা,
ভাল কি লো বাসিতে জান না?

(৪)

ঘামিলে রবির করে
বসনে মুছাই মুখ,
হাঁটিলে চরণে ব্যথা
পাবে বলে পাতি বুক,
বিমনা হেরিলে পরে
চিতবিনোদন তরে
কতই ভাবিয়ে মরি
কিসে তব হবে সুখ।
এত ভালবাসি প্রিয়ে
তবু ত তুমি বিমুখ!
তাই লো সুধাই তোমা বলনা বলনা,
ভাল কি লো বাসিতে জান না?

(৫)

শারদ-গগন-পটে
যবে লো পূর্ণিমা শশী
উদিয়ে কিরণ ধারে
সিক্ত করে দশদিশি;
অমনি প্রেয়সি তোরে
ধরিয়ে হৃদয়'পরে,
অতুলিত সেই শোভা
হেরি গৃহতলে বসি।
তুমি ত বাস না ভাল
আমি এত ভালবাসি।
তাই লো সুধাই তোমা বলনা বলনা,
ভাল কি লো বাসিতে জান না?

(৬)

ফুলের প্রতিমা তুমি
ভালবাস ফুল তাই,
ফুলেতে সাজিতে ইচ্ছা
দেখিতে লো সদা পাই।
তাই ফুল তুলে এনে
গাঁথি মালা সযতনে,
গলায় দোলায়ে দিয়ে
অনিমিখে মুখ চাই।
এত ভালবাসি আমি
তোমা কি বাসিতে নাই?
তাই লো সুধাই তোমা বলনা বলনা,
ভাল কি লো বাসিতে জান না?

(৭)

কত ভালবাসি প্রিয়ে
কত বা কথায় কই,
হাইটী তুলিলে পরে
তুড়িতে ধরিয়া লই;
হাঁচিটী হাচিলে পর
ভীত ভীত এ অন্তর,
শতবার জীব বলি
তবুত শঙ্কিত রই।
এত ভালবাসি আমি
তুমি ত বাসিলে কই?
তাই লো সুধাই প্রিয়ে বলনা বলনা,
ভাল কি লো বাসিতে জান না?

(৮)

নবনীত জিনি প্রিয়ে
সুকুমার তব কায়,
দুগ্ধফেননিভ শয্যা
শয়নে কঠোর হায়!
তাই নব কিশলয়
কুসুমকলিকাচয়
মিশায়ে বিছায়ে পাতি
হৃদয়ে রাখি তোমায়।
আমি এত ভালবাসি
তুমি ত বাস না হায়!
তাই লো সুধাই প্রিয়ে বলনা বলনা,
ভাল কি লো বাসিতে জান না?

(৯)

বহে সুধাধারা প্রিয়ে
অধরে তোমার, হেরি
পিপাসায় ফাটে বুক,
চুমি তাই ধীরি ধীরি,
একটী চুম্বন প্রিয়ে
আদরে ফিরিয়ে দিয়ে
কখন তুষেছ কি না
তোমারে জিজ্ঞাসা করি!
এত ভালবাসি আমি
তোমাতে কিছু না হেরি;
তাই লো সুধাই প্রিয়ে বলনা বলনা,
ভাল কি লো বাসিতে জান না?

(১০)

ধরিয়ে মুখানি তোর
রাখিয়ে হৃদয়'পরে,
মনে হয় সুধা-হ্রদে
ডুবে থাকি চিরতরে।
তোমারে স্মরিয়ে প্রিয়ে
এখনও রয়েছি জীয়ে
জানি না ও নামে বুঝি
সঞ্জীবনী গুণ ধরে।
এত ভালবাসি তোমা
তুমি ত বাসনা মোরে;
তাই লো সুধাই প্রিয়ে বলনা বলনা
ভাল কি লো বাসিতে জান না?

(১১)

দেখ প্রিয়ে চেয়ে দেখ
ভালবাসা বাসি কত,
প্রকৃতির পটে আঁকা
দেখিয়েও দেখনা ত।
সরসে কুমুদী ভাসে
প্রমোদিনী প্রেমোল্লাসে,
হেরি স্বীয় প্রাণনাথে
সুনীল গগনগত।
এত ভালবাসি তোমা
তুমি ত শিখিলে না ত!
তাই লো সুধাই প্রিয়ে বলনা বলনা
শিখিতেও চাহ না চাহ না?

(১২)

অই দেখ তরু-গায়
কেমনে উঠেছে লতা,
কেমন কহিছে শুন
কাণে কাণে প্রেম-কথা!
(অই) দেখ পুন মেঘ-পাশে
কেমন বিজলী হাসে,
শিখাইছে লোক-মাঝে
ভালবাসা যথা তথা।
অনাদরে কত কাঁদি
তুমি কি বোঝ না ব্যথা?
তাই লো সুধাই প্রিয়ে বলনা বলনা,
ভালবাসা তবে কি জান না?

(১৩)

ভালবাস নাহি বাস
সে আশা ত আর নাই,
দিন ত ফুরায়ে এল
এবে এই ভিক্ষা চাই;
যবে দেহ তেয়াগিয়ে
যাবে প্রাণ বাহিরিয়ে,
একবিন্দু অশ্রুজল
প্রেয়সি লো যেন পাই,
জ্বলন্ত অনল-রাশি
বুকে বেঁধে চলে যাই।
অশ্রুবিন্দু শান্তিজল যাচিতেছি তাই,
বঞ্চিত করোনা প্রিয়ে কাতরে জানাই।

শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়।

বর্ষা।

সুশ্যামবরণী ধনী, বিজলী-তিলকা ভালে,
গম্ভীরা মাধুরীময়ী, ঘন ঘোর শ্যামাম্বরা,
নাশিতে নিদাঘ-তাপ দাঁড়াইয়ে তাপহরা;
গম্ভীর ভ্রূভঙ্গি যেন অরি-হৃদে ভীতি ঢালে!
রথচক্রে ভীমনাদ, রথচূড়ে শঙ্খধ্বনি,
মেঘমন্ত্ররূপে ওই রণের বারতা ঘোষে,
আকাশ আবরি' পলে ধনু হ'তে তীর খসে,
আলোক-আঁধারময়ী পলে তাই এ ধরণী।
তুষিতে বাসব তাই মত্ত সুর-বালিকায়,
শ্যামদেহে শান্তিধারা বরষিছে ক্ষণে ক্ষণে,
বালার অঞ্চল-বারি মিলিতেছে সমীরণে,
প্রকৃতির মাঝে তাই শান্তি-শীতলতা তায়।
লো সুন্দরি, লো বালিকে, লো ললনে বীরাঙ্গনা!
মরণের পথে দিও ওই শান্তি অতুলনা!

শ্রীকালীদাস চক্রবর্ত্তী।

৺রজনীকান্ত গুপ্ত। *

এ নশ্বর পৃথিবীর সব যায়; থাকে স্মৃতি, থাকে কীর্ত্তি। কিন্তু স্মৃতি—সেও কালস্রোতে ভাসিয়া যায়; কীর্ত্তি অমর—কীর্ত্তি অবিনশ্বর। রজনীকান্ত আজি এই নশ্বর পৃথিবী হইতে বিদায় লইয়াছেন; তাঁহার স্মৃতি, তাঁহার কীর্ত্তি পশ্চাতে রাখিয়া গিয়াছেন। অকৃতজ্ঞ আমরা—কালে হয় ত তাঁহার স্মৃতিও বিস্মৃত হইতে পারি; কিন্তু তাঁহার অমর কীর্ত্তিই তাঁহাকে এ মরধামে চির-দেদীপ্যমান রাখিবে। মনুষ্যজীবন দুর্লভ, কীর্ত্তি ততোধিক দুর্লভ। এ জীবন লাভ করিয়া যিনি কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারেন, তাঁহারই জীবন সার্থক। রজনীকান্তের জীবন সার্থক হইয়াছে।

পূর্ব্ববঙ্গের কোন অজ্ঞাত-পল্লীতে জন্মগ্রহণ করিয়া, রজনীকান্ত সর্ব্বজন-পরিজ্ঞাত হইয়াছেন; অনাদৃতা-অনাথিনী বঙ্গভাষার সেবা করিয়া, রজনী-

* "বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে এই প্রবন্ধটী পঠিত হয়।

কান্ত সর্ব্বজন সমাদৃত কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। ১২৫৬ সালের ২৯শে ভাদ্র মাণিকগঞ্জ মহকুমার মত্তগ্রামে—মাতুলালয়ে রজনীকান্ত গুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ৺কমলাকান্ত দাসগুপ্ত। তেওতা তাঁহার পিত্রালয়। বাল্যকালে গ্রামস্থ বাঙ্গালা স্কুলে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সেখান হইতে ছাত্রবৃত্তি লাভ করিয়া, কলিকাতাস্থিত সংস্কৃত-কলেজে প্রবেশ করেন। তাঁহার অভিভাবকগণ আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে সংস্কৃত কলেজে প্রেরণ করেন। কিন্তু অভিভাবকগণের সে উদ্দেশ্য সাধিত হয় নাই; ভগবান তাঁহার দ্বারা আরও অধিকতর উচ্চ উদ্দেশ্যসাধন করিবেন বলিয়াই, অভিভাবকদিগের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিলেন। দীনা বঙ্গভাষার উন্নতিসাধনই তাঁহার সংস্কৃত-চর্চ্চার ভিত্তিরূপে পরিগণিত হইল। পাঠ্যাবস্থায় বাঙ্গালা-সাহিত্যে রজনীকান্তের প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মিল। তাঁহার 'জয়দেব-চরিত' ও 'পাণিনী-বিচার' জলন্ত অক্ষরে সে অনুরাগের সাক্ষ্য প্রদান করিল। প্রথম হইতেই বাঙ্গালা ভাষার বিশুদ্ধি রক্ষা এবং ওজস্বিতা সাধনকল্পে রজনীকান্তের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। স্বর্গীয় মহাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় রজনীকান্তের এই অভিনব লিপিচাতুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া 'এডুকেশন গেজেটে' তাঁহাকে প্রবন্ধ লিখিতে অনুরোধ করেন। এই সূত্রে রজনীকান্তের হৃদয়ে বাঙ্গালা রচনায় উৎসাহবারি সিঞ্চিত হইতে লাগিল। সেই বারিসিঞ্চনে যে বীজ অঙ্কুরিত হইল, বাঙ্গালা-সাহিত্য-উদ্যানে তাহাই ফুলপুষ্পসুশোভিত মহান্ মহীরুহে পরিণত হইয়াছে। সেই মহীরুহের প্রধান কাণ্ড—তাঁহার 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস'। 'আর্য্যকীর্ত্তি', 'ভারত-কাহিনী', 'নব্যভারত' প্রভৃতি তাহার শাখা-প্রশাখা। 'প্রবন্ধমালা', 'ভীষ্ম-চরিত' ও 'বোধবিকাশ' প্রভৃতি বিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তকসমূহ এই মহীরুহের ফলস্বরূপ।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাঁহার সকল গ্রন্থের বিশ্লেষণ-সমালোচনা সম্ভবপর নহে। একখানি গ্রন্থেরও যথাযোগ্য আলোচনা অসম্ভব। এস্থলে কেবল তাঁহার 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিব। রজনীকান্তের হৃদয়ে কিরূপ স্বদেশানুরাগ দেদীপ্যমান ছিল, এই 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' তাহার জীবন্ত প্রমাণ। প্রথম—নামকরণ। যে সকল আদর্শ অবলম্বন করিয়া তিনি এই পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাদের অধিকাংশেরই নাম Sepoy Mutiny অর্থাৎ সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস; কিন্তু তাঁহার

গ্রন্থের নামকরণ করিয়াছেন,—'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস'। ভ্রমবশতঃই হউক, কিম্বা অজ্ঞানতাজনিতই হউক, স্বধর্ম্মের জন্য, স্বদেশের জন্য, স্বজাতির জন্য, যাহারা অকাতরে জীবন বিসর্জ্জন দিতে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহাদের সম্বন্ধে তিনি বিদ্রোহ কথা ব্যবহার করিতে আদৌ সঙ্কুচিত হইয়াছেন। কেবল পুস্তকের নামকরণে কেন—আমাদের যতদূর স্মরণ হয়, গ্রন্থমধ্যে কোন স্থলে রণোন্মত্ত সিপাহীদিগকে তিনি বিদ্রোহী আখ্যাও প্রদান করেন নাই।

বাঙ্গালায় প্রকৃত ইতিহাস নাই; প্রকৃত ইতিহাস-চর্চ্চায় বাঙ্গালী বড়ই বীতশ্রদ্ধ। কিন্তু রজনীকান্ত বাঙ্গালীর এই কলঙ্ক মোচন করিয়াছেন। তাঁহার 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস'—বাঙ্গালায় একখানি সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক গ্রন্থ। এই গ্রন্থ রচনার জন্য, তাঁহার অধ্যবসায়, পরিশ্রম এবং অর্থব্যয়ের কথা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' সম্বন্ধে এমন কোনও পুস্তক বা রাজকীয় শাসন পত্র নাই, যাহা তিনি সংগ্রহ করেন নাই। এতদ্ব্যতীত সিপাহী-যুদ্ধ-সংক্রান্ত লৌকিক-বার্ত্তা সংগ্রহেও তিনি অসধারণ যত্ন ও অনুসন্ধিৎসার প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। ফলতঃ 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' কোনও পুস্তক বিশেষের অনুবাদ নহে; উহাকে একখানি নিরপেক্ষ মৌলিক গ্রন্থ বলিলেও বলা যাইতে পারে। আজি ২২ বৎসরের কথা—তিনি 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' লিখিতে প্রথম আরম্ভ করেন, আর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে বিগত বৈশাখ মাসে পাঁচ ভাগে তিনি এই গ্রন্থ শেষ করিয়া গিয়াছেন। এই 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' প্রণয়নই তাঁহার ভারত-ইতিহাস-চর্চ্চার মূলীভূত কারণ। এই উপলক্ষে তিনি ভারত-ইতিহাস সম্বন্ধে যে অসংখ্য পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালী গ্রন্থকারের গৌরবের কথা। আমরা দেখিয়াছি, তাঁহার লাইব্রেরীর মধ্যস্থিত ১০টী প্রকাণ্ড আল্‌মারী, কেবল ভারত-ইতিহাস-সংক্রান্ত গ্রন্থে পরিপূর্ণ। অন্য কোনও গ্রন্থ তাঁহার লাইব্রেরীতে স্থান পায় নাই। কেবল ভারত-ইতিহাস-চর্চ্চাই যে তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত, ইহাই তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি অনন্যমনা, অনন্যকর্ম্মা হইয়া, আজীবন কেবল ভারত-ইতিহাসের আলোচনা করিয়াছেন, ভারত-ইতিহাসেই তাঁহার কৃতিত্ব। বিশাল জ্ঞানতরুর একটী ক্ষুদ্র শাখা অবলম্বন করাই কৃতিত্বলাভের প্রকৃষ্ট উপায়।

পুস্তক প্রণয়ন করিতে হইলে—গ্রন্থকার হইতে হইলে যে অনেক অধ্যয়ন, অনেক অনুসন্ধান, অনেক ত্যাগ-স্বীকার, অনেক মস্তিষ্কচালনা, অনেক সাধনা আবশ্যক করে, রজনীকান্তের জীবনই তাহার প্রধান নিদর্শন। 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' অসম্পূর্ণ রাখিয়া, রজনীকান্ত বহু বিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে মনোনিবেশ করিতেন। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ-লেখকের তাহা অসহ্য হইত। প্রসঙ্গক্রমে সময়ে সময়ে ইহার জন্য তাঁহাকে আমি তীক্ষ্ণবাক্যবাণে বিদ্ধ করিতাম। তখন তিনি ঈষৎ হাসিয়া বলিতেন,—"আমি ইচ্ছা করিয়া 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' রচনায় উপেক্ষা করি নাই। এ গ্রন্থ রচনায় অনেক অধ্যয়ন, অনেক চিন্তা এবং অনেক সংগ্রহের আবশ্যক। কাজেই সময় সাপেক্ষ।" 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' প্রণয়নে আশানুরূপ অর্থ সমাগম হইবে না বলিয়াই, যে উহার প্রকাশ পক্ষে বিলম্ব ঘটিয়াছিল, তাহা নহে; ঈদৃশ গ্রন্থ প্রণয়নে বিশেষ শ্রম, অধ্যয়ন, অনুসন্ধিৎসা আবশ্যক, সেই জন্যই এই বিলম্ব।

সাহিত্যের সহিত মনুষ্যত্বের যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, রজনীকান্তের জীবনে তাহারও নিদর্শন পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে আমার এই ক্ষুদ্র জীবনের এক দিনের একটী ঘটনার উল্লেখ করিলেই, আপনারা বুঝিতে পারিবেন। বুঝিতে পারিবেন—তাঁহার সাহিত্যিক-হৃদয়ে কত উচ্চ মনুষ্যত্বের সমাবেশ ছিল। সন ১২৯৮ সাল, ১৮ই আষাঢ়, শনিবার আমার কন্যার বিবাহ। বিবাহের সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত। কেবল পাত্রকে দেয় নগদ ৫০১৲ টাকার মধ্যে ৩০০৲ টাকার অভাব। যে আত্মীয়ের নিকট ঐ টাকা পাইবার নির্দ্ধারিত কথা ছিল, তিনি হঠাৎ ঐ টাকা প্রদানের অক্ষমতা প্রকাশ করিয়া গেলেন। সহসা আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত পড়িল! আমি আমার বাটীর বহির্দ্বারে আসিয়া, মাথায় হাত দিয়া ভাবিতেছি। বেলা প্রায় প্রহরাতীত। এমন সময় রজনীকান্ত আমার সম্মুখে আসিয়া আমায় সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"এত বিষণ্ণমনে কি ভাবিতেছেন?" আমি চমকিয়া তাঁহার প্রতি চাহিয়া দেখিলাম। ক্রমশঃ তিনি অধিকতর ব্যগ্রভাব প্রকাশ করায়, আমার বিষণ্ণতার কারণ, তাঁহার নিকট আনুপূর্ব্বিক প্রকাশ করিলাম। একজন বন্ধুর এরূপ বিপন্ন অবস্থার কথা শুনিয়া, তাঁহার মনুষ্যত্ব উথলিয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ ঐ ৩০০৲ শত টাকা প্রদানের জন্য শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নামে

আমাকে একখানি বরাতি চিঠি প্রদান করিলেন। সে টাকার কোনও রসিদও গ্রহণ করেন নাই; এবং এক বৎসর পরে সে টাকা পরিশোধ করিলেও, তাহার কোন সুদ লন নাই। জীবনের সেই চিরস্মরণীয় ঘটনা, এ জীবনে কি কখনও ভুলিতে পারিব?

বাঙ্গালা ভাষার বিশুদ্ধি রক্ষার বিষয়ে, তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। বন্ধু-বান্ধবগণের রচনায় ভাষার বিশুদ্ধি রক্ষিত না হইলেও, তাঁহার প্রাণে বড় আঘাত লাগিত। সে সম্বন্ধেও এ প্রবন্ধ-লেখক তাঁহার নিকট অনেক ঋণী। মৎপ্রণীত পুস্তক 'কনে বউ' নামক উপন্যাস যখন এক মাসের মধ্যে প্রথম সংস্করণ সমস্ত বিক্রয় হইয়া গেল, এই নগণ্য লেখকের এক-খানি উপন্যাসের এরূপ সৌভাগ্য দেখিয়া, দ্বিতীয় সংস্করণের সময় তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, পুস্তকখানির ভাষা সম্বন্ধে আমূল সংস্কার করিয়া দিয়া-ছিলেন। এ ঋণও আমি জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না।

খাঁটি সাহিত্যের সহিত, গণিতের যেন চির বৈরীভাব। ইংলণ্ডীয় বহু সাহিত্যবীরের জীবনচরিত আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি, বাঙ্গালারও বহু প্রতিভাশালী পণ্ডিতের নিত্য জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, যিনিই সাহিত্যের উচ্চ আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, গণিতবিষয়ে তাঁহার অপার-দর্শিতা লক্ষিত হইয়া থাকে। বিদ্যালয়ের ছাত্র-জীবনে সে দৃষ্টান্ত প্রতি নিয়তই দেখিতে পাওয়া যায়।

রজনীকান্তের জীবনে সে দৃষ্টান্ত পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত। রজনীকান্তকে কখনও কোনও হিসাব পত্র রাখিতে দেখি নাই। কোনরূপ হিসাব রাখিতে হইলেই, যেন তাঁহার বিশেষ কষ্টবোধ হইত। কি পুস্তক মুদ্রাঙ্কণ ও বিক্রয়ের হিসাব, কি সাংসারিক হিসাব, তিনি নিজে কোনও হিসাবই রাখিতে পারিতেন না। তাঁহার বিশ্বস্ত গ্রন্থপ্রকাশক আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ গুরুদাস বাবুর উপর সমস্ত ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন।

দরিদ্র বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করিয়া গ্রন্থকারগণ জীবনযাত্রা সুখে নির্ব্বাহ করিতে পারেন না বলিয়া, বাঙ্গালা সাহিত্যের একটা কলঙ্ক আছে,—প্রতিভাশালী রজনীকান্তের দ্বারা সেই দুরপনেয় কলঙ্কের মোচন হইয়াছে। রজনীকান্তের পুস্তকের আয়, বাঙ্গালী গ্রন্থকারের পক্ষে গৌরবের বিষয়। গড়পড়তা তাঁহার মাসিক আয় চারিশত হইতে পাঁচ-শত টাকার ন্যূন নহে। এই আয় হইতে তিনি মাসিক দুইশত টাকা

সাংসারিক ব্যয় করিতেন। উদ্বৃত্ত আয়ে এই কলিকাতা মহা নগরীতে ১০।১৫ হাজার টাকার মূল্যের একখানি বাসগৃহ ক্রয় করিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুকালে ১০।১৫ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ রাখিয়া গিয়াছেন, এবং হিন্দু-মেসিন-প্রেসের অর্দ্ধেক সত্বও তাঁহারই উত্তরাধিকারী পাইবেন। ইহা ব্যতীত তাঁহার ভারত ইতিহাসের পুস্তকালয়ের মূল্য ৫।৬ হাজার টাকার ন্যূন হইবে না। বাঙ্গালা সাহিত্যসেবীর পক্ষে, ইহা বড় গৌরবের কথা বলিয়া আমরা অহঙ্কার করিতে পারি।

যে রজনীকান্তের এত গুণ,—যে রজনীকান্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরব, সে রজনীকান্ত আজ কোথায়? প্রতিধ্বনি বলিতেছে—কোথায়? হায়! আজ সেই গৌরব রবি চির অস্ত গমন করিয়াছেন। যে সাহিত্য-পরিষদ রজনীকান্তের প্রাণ, সেই সাহিত্য পরিষদে সমবেত হইয়া, আমরা আজ রজনীকান্তকে দেখিতে পাইতেছি না। রজনী-কান্ত চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্য-গগন আজি রজনীর গাঢ় তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। অক্ষয়-কীর্ত্তিমান অক্ষয় কুমার নাই! সাহিত্য-গগনের প্রদীপ্তভাস্কর বিদ্যাসাগর নাই! সাহিত্যকুঞ্জের কলকণ্ঠকোকিল বঙ্কিমচন্দ্র নাই! বলিতে প্রাণ ফাটিয়া যায়—সে তমসাচ্ছন্ন সাহিত্য-গগনের রজনীকান্তও আজ নাই! কে বলে, রজনীকান্ত নাই? যতদিন 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' থাকিবে—ততদিন রজনীকান্তের অস্তিত্ব লোপ হইবে না। আমার হৃদয়ে—এই সমবেত শোকসন্তপ্ত বন্ধু-বান্ধব আপনাদের হৃদয়ে—সমগ্র বঙ্গবাসীর হৃদয়ে রজনীকান্ত চির জাগরুক থাকিবেন।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

বেলুনে যুদ্ধ।

পিটার লংম্যান একজন ফরাসী সার্কাসওয়ালা, শরীরে অসুরের মত সামর্থ্য। সিংহ, ব্যাঘ্র, নানাপ্রকার কুস্তীওয়ালা জোয়ান, বিবিধ কৌশল-প্রদর্শিকা রমণী সঙ্গে লইয়া ফরাসীদেশের সহরে সহরে তিনি সার্কাস দেখাইয়া বেড়ান।

একদিন সকাল বেলা সামো সহরে তিনি তাঁহার তাম্বুর সম্মুখে বসিয়া আছেন, মুখখানি কিছু বিমর্ষ, পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে সার্কাসে তেমন

লোক হয় নাই; সামো ছাড়িয়া এবার কোথায় যাইবেন, তাহাই চিন্তা করিতেছেন। এমন সময় দুইটী আঠারো উনিশ বৎসরের যুবক আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল। বলিয়াছি, তাঁহার মনের অবস্থা ভাল ছিল না, তিনি কিছু অপ্রসন্নভাবে বলিলেন,—"তোমরা কি চাও?"

যুবকদ্বয় সমস্বরে লংম্যানকে বলিল, "আমরা আপনার সার্কাসের দলে ভর্ত্তি হইতে চাই।"

লংম্যান ভ্রু কপালে তুলিয়া বলিলেন, "বটে!" যুবকদ্বয়ের স্পর্দ্ধার কথা শুনিয়া তাঁহার কিছু বিস্ময় জন্মিয়া থাকিবে, উপেক্ষা ভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কোন্ কর্ম্মের উপযুক্ত?"

যুবকদ্বয় অবলীলাক্রমে বলিল, "যে কর্ম্মে লাগাইবেন, সকল কাজই পারিব।"

"তোমাদের সাহস ত খুব দেখা যাচ্ছে! সার্কাসে কাজ কত কঠিন জানিলে এত সাহস করিতে না।" লংম্যান এই উত্তর করিলেন।

যুবকদ্বয় দমিল না। বলিল, "আমাদের একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন না। আমরা উপস্থিতই আছি।"

"পরীক্ষা! আচ্ছা, ঐ দেখ, একটা নর্দ্দমার মধ্যে একখান পাথর বোঝাই গাড়ী পড়ে আছে। সকালে গাড়ীখান পড়েছে, দুটো ঘোড়া, আর জন পনের লোক হিমশিম খেয়ে গেছে, গাড়ী তুল্‌তে পারে না। ঐ গাড়ীখান পথের উপর তুল্‌বার ক্ষমতা রাখ?"

লংম্যানের কথা শুনিয়া যুবকদ্বয় হাঁ বা না কিছুই বলিল না, ডিক নীচের চাকায় গিয়া কাঁধ বাধাইয়া দিল, ডাক গাড়ীর জোঁয়ালটা তাহার অসুরের মত সবল দুই হস্তে চাপিয়া ধরিল, তাহার পর উভয়ে যুগপৎ এমন একটা ধাক্কা দিল যে, পঞ্চাশ মন পাথর সমেত গাড়ীখান চক্ষুর নিমিষে পথের উপর উঠিয়া পড়িল।

রুমালে হাত মুছিয়া ডাক ও ডিক লংম্যানের সম্মুখে আসিল, এই শ্রমসাধ্য কার্য্যে একবারও তাহাদের ঘনশ্বাস পড়িল না। লংম্যান বিস্ফারিত চক্ষে তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, "হাঁ, দেহে বল আছে, শরীর খেলে কেমন?"

এক মুহূর্ত্তের মধ্যে ডিক ও ডাক ডিগ্‌বাজী দিয়া লংম্যানের মাথার উপর লাফাইয়া উঠিল, এবং তাহার মস্তক স্পর্শ না করিয়াই শূন্যে আর

এক ডিগবাজী দিয়া তাঁহার পশ্চাতে দশহাত তফাতে পড়িল। একসঙ্গে উঠা, একসঙ্গে পড়া—সমস্ত কাজটা যেন কলে হইয়া গেল। লংম্যান স্তম্ভিতভাবে বসিয়া রহিলেন, পাখী ভিন্ন আর কাহারও শরীর এমন করিয়া শূন্যদেশে আশ্রয়হীনভাবে খেলিতে পারে না।

লংম্যান সাব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "তোমাদের বিদ্যা আছে বটে, কি বেতন চাও?" লংম্যান নিস্পন্দহৃদয়ে তাহাদের উত্তরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

"খোরাক পোষাক, টাকাকড়ি সম্বন্ধে আপনার যাহা বিবেচনা হয়, করিবেন, আমাদের আপত্তি হইবে না।" উভয়েরই এক উত্তর।

এবার লংম্যানের বুকের মধ্যে ধপ্ ধপ্ করিয়া উঠিল! এত সামান্য বেতনে এমন খেলোয়াড় লাভ করা কম সৌভাগ্যের কথা নহে। যুবকদ্বয় সেই দিন হইতেই সার্কাসের দলে ভর্ত্তি হইল, লংম্যানকে আর সামো ত্যাগ করিতে হইল না। যুবকগণের খ্যাতির কথা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সহরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, দলে দলে দর্শক আসিয়া সার্কাসের বস্ত্রাবাস পূর্ণ করিতে লাগিল, ক্রমাগত পনের দিন ধরিয়া দর্শকের বিরাম বিশ্রাম ছিল না, হাজার হাজার দর্শক আসিয়া সার্কাস দেখিতে লাগিল, পনের দিনে সহস্র সহস্র স্বর্ণমুদ্রায় লংম্যানের লোহার সিন্দুক ভরিয়া উঠিল।

ডিক ও ডাকের চেহারা অনিন্দ্যসুন্দর। গোঁপের রেখা উঠিয়াছে মাত্র, তাহার উপর পোষাকের শ্রী, ঠিক দেবসন্তান বলিয়া বোধ হয়। দর্শকগণ রঙ্গভূমে বসিয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় তাহাদের ক্রীড়াকৌশল নিরীক্ষণ করেন, একটা সূক্ষ্ম সূত্র দুইটী উচ্চ লৌহদণ্ডে আটকাইয়া তাহারা উভয়ে তাহার উপর ডিগবাজী দিয়া খেলা করে। বহু উচ্চ হইতে একটা তার ঝুলাইয়া দাঁতে মাত্র ভর করিয়া উভয়ে অবলীলাক্রমে শূন্যে উঠিয়া যায় এবং প্রায় পঞ্চাশ ফিট উচ্চ হইতে উভয়ে পরস্পরের দেহের উপর নানাপ্রকার ব্যায়াম কৌশল দেখাইতে দেখাইতে ধীরে ধীরে নামিয়া আসে। দর্শকগণের করতালিতে শ্রবণ বধির হইয়া যায়, দর্শকগণের আনন্দধ্বনিতে দশদিক পূর্ণ হইয়া উঠে।

সার্কাসের দলের সমস্ত লোক, দর্শকগণের সকলে এই রূপবান গুণবান্ যুবকদ্বয়ের প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল; সকলেই তাহাদের ভালবাসিত, তাহাদের মিষ্টকথায় ও সরল ব্যবহারে কে মুগ্ধ না ছিল?

কেবল, একজনের হৃদয় তাহারা হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারে নাই, সে একটী বালিকা, বয়স পঞ্চদশ বৎসর, নাম নেটা। নেটা সার্কাসের অধ্যক্ষ মিঃ লংম্যানের একমাত্র প্রিয়তমা দুহিতা। মাতৃহীনা বলিয়া লংম্যান নেটাকে অধিক পরিমাণে আদর দিতেন।

নেটা সুন্দরী, এমন সৌন্দর্য্য সচরাচর চক্ষে পড়ে না। মুখখানি গোলাপ ফুলের মত, সংসার-সূর্য্যের খরতর উত্তাপ তাহা একটুও ম্লান করিতে পারে নাই, ঢলঢল সুনীলনয়ন, প্রশান্ত তড়াগে যেন নীলপদ্ম ফুটিয়া আছে, সেই সুপ্রশস্ত সুনীল, সুগঠিত নয়নদ্বয় সামান্য ভাব স্পর্শে বিস্ফারিত হইয়া হাসিয়া উঠে, যেমন করিয়া উষাগমে অরুণের প্রথম কিরণধারা সম্পাতে অর্দ্ধস্ফুট যূথিকাকুসুম অরণ্যের অন্তরালে বিকাশিত হয়। তরুণী যখন সুদৃশ্য বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া হাসিতে হাসিতে নাচিতে নাচিতে মেঘনির্ম্মুক্ত চঞ্চলা বিদ্যুতের ন্যায় বস্ত্রাবাসের অভ্যন্তর হইতে সহসা দর্শকগণের সম্মুখে বাহির হইয়া আসে, এবং বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী সহকারে তাহার অভূতপূর্ব্ব সুন্দর ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করে, তখন বিস্ময়াবিষ্ট দর্শকগণের চক্ষুর সম্মুখে সহসা অপ্সর লোকের এক মোহকর বিচিত্র দৃশ্য উন্মুক্ত হইয়া যায়, সকলে নির্নিমেষলোচনে সেই রূপমাধুরী পান করিতে থাকে, কাহারও ধন্যবাদ প্রদানের পর্য্যন্ত অবসর হয় না।

নেটা প্রথম হইতেই ডিক ও ডাককে বিরক্ত করিতে আরম্ভ করে; তাহার ন্যায় চঞ্চলা প্রগল্‌ভা বালিকার পক্ষে ইহা কিছু অস্বাভাবিক নহে, কিন্তু ইহার কারণ কেহ আবিষ্কার করিতে পারিত না, কাহারো কাহারো মনে হইত, হয়ত ইহা ঈর্ষামূলক, কিন্তু নেটা কখন তাহাদের অসাক্ষাতে তাহাদের নিন্দা করিত না, তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে কোন প্রকার হীনতার ভাব ছিল না, সে সর্ব্বদা তাহাদিগের দূরে বাস করিত, তাহার উপেক্ষাপূর্ণ হাস্য কিরূপ মর্ম্মান্তিক ছিল, তাহা বন্ধুদ্বয় বুঝিতে পারিত, কিন্তু সেজন্য তাহাদিগকে কেহ কখন ক্ষোভ প্রকাশ করিতে দেখে নাই। নেটা সর্ব্বদা এরূপ ভাব প্রকাশ করিত যে, সে সার্কাশের অধ্যক্ষের দুহিতা আর ডিক এবং ডাক তাহার পিতার ভৃত্য মাত্র।

কিন্তু ব্যবসায়ের খাতিরে সময়ে সময়ে ডাক বা ডিককে নেটার সহিত এক তারে উঠিয়া ক্রীড়া কৌশল দেখাইতে হইত। নেটার করস্পর্শে

বীণার তারের ন্যায় তাহারা কম্পিত হইত, তাহাদের ওষ্ঠ বিবর্ণ হইয়া উঠিত, কষ্টে তাহারা আত্মসম্বরণ করিতে পারিত; কিন্তু তাহাদের এই বিহ্বলতা দর্শকগণ অনুভব করিতে পারিত না।

এদিকে লিটার লংম্যান অল্পদিনের মধ্যে অগাধ সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। তিনি জানিতেন, তাহার এই ভাগ্যপরিবর্ত্তনের একমাত্র কারণ ডাক ও ডিক। ডাক ও ডিক কোন দিন লংম্যানকে অর্থের জন্য পীড়াপীড়ি করে নাই, দুইটি গুণশালী যুবক, যাহারা যে কোন সার্কাসের অধ্যক্ষকে ভাগ্যবান্ করিয়া তুলিতে পারে, কেন যে এত অল্প অর্থে সন্তুষ্ট থাকে, তাহা লংম্যান কিছুতে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না; বুঝিতে না পারিলেও তাঁহার মনে অশান্তির অভাব ছিল না। তিনি তাঁহার তাম্বু প্রায় তিন গুণ বাড়াইয়া ফেলিয়াছিলেন, ক্রীড়া প্রদর্শনের জন্য তিনি বহুসংখ্যক আরণ্য জন্তু আমদানী করিলেন, ব্যায়াম প্রদর্শকের সংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি হইল। খরচ পত্র অনেক বাড়িয়া গেল, কিন্তু আশ্চর্য্য! ডাক ও ডিক কোন দিন তাঁহার নিকট দুটাকা বেতন বৃদ্ধির জন্যও প্রার্থনা করিল না। তাহারা এরূপ করিত না বলিয়াই তাহার মনে এত অশান্তি ও ভয়, যদি তাহারা তাঁহার নিকট উপযুক্ত বেতনের দাবী করিত, তিনি আহ্লাদের সহিত তাহাদের প্রার্থনা পূরণ করিতেন।

অবশেষে লংম্যান এক মতলব আঁটিলেন। স্থির করিলেন, তাঁহার সার্কাসে তিনি ডাক ও ডিককে অংশীদার করিয়া লইবেন, তাহা হইলে আর সহসা তাহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইবে না। তিনি একদিন কথা প্রসঙ্গে তাহাদিগের নিকট এই প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, ডাক ও ডিক উভয়েই ইহাতে কোন উত্তর করিল না, আহ্লাদিত হওয়া দূরের কথা, তাহাদের সম্মতিমাত্র জ্ঞাপন করিল না। মিঃ লংম্যান তাহাদের এই উপেক্ষা দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন, তাহাদের ব্যবহার তাঁহার নিকট রহস্যময় বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। চিন্তার সমুদ্রে পড়িয়া তিনি ভাসিতে লাগিলেন, কোথাও কুল দেখিলেন না। ইহারা কি উন্মাদ্, অর্থে এমন অবজ্ঞা কেন? অথবা ইহারা কোন ছদ্মবেশী দেবতা তাঁহার শুভগ্রহরূপে তাঁহার স্কন্ধ আশ্রয় করিয়া তাঁহাকে প্রতিদিন অধিক ধনবান্ করিয়া তুলিতেছে।

সহসা লংম্যানের মনে হইল, হয়ত কিছু সুনাম অর্জ্জন করিয়া ইহারা

এক নূতন সার্কাসের দল খুলিবে। সর্ব্বনাশ! তাহা হইলে ত তাঁহার পসার প্রতিপত্তি সমস্তই নষ্ট হইবে, কেমন করিয়া তাহাদের এই ভয়ানক সংকল্প লোপ করা যায়। তাহাদের এই অভিসন্ধিতে বাধা দেওয়া যায়। কোনই উপায় নাই, লংম্যান চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন। চিন্তার অকুল সমুদ্রে পড়িয়া তিনি একগাছি সূক্ষ্ম তৃণও অবলম্বন করিতে পারিলেন না, তাঁহার মনের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিল, সুখ শান্তি সমস্ত অন্তর্ধান করিল। হায় অর্থ!

(ক্রমশঃ)

শ্রীজলধর সেন।

ব্রহ্মোপসনা কি?

এখনও এমন গোঁড়া হিন্দু বসুন্ধরাতিলক বিরাজমান দেখা যায়,—যাঁহারা "ব্রহ্ম" নাম শ্রুতিবিবরে প্রবিষ্ট হইলেই সূচীবেধ ভাবিয়া চমকিয়া উঠেন, আর ভাবেন, যাঁহারা ব্রহ্ম ব্রহ্ম বলেন, তাঁহারা যেন ঘৃণার্হ অহিন্দু; তাঁহারা যেন শিবদুর্গা কালী প্রভৃতিকে উৎখাত করিয়া দিতে চাহেন।

আবার অনেক ব্রাহ্মও আছেন, দেববাদী হিন্দুদিগকে "অব্রাহ্ম" এবং অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন এবং কুসংস্কারাপন্ন মনে করেন, ঘৃণার্হ মনে করেন। এই দুই দলের দলাদলি মিটাইবার জন্যই ভগবান্ বিষ্ণু "বিষ্ণুসংহিতায়" সদুপদেশ প্রদানে দুই দলেরই মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন; ইহাই এই প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইতেছে।—

যাঁহার সকল প্রকার মোহ বিদূরিত হইয়াছে, যাঁহার বর্ণাশ্রমোক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানে অন্তরের মালিন্য অপনীত হইয়াছে, যিনি এ জগতে নিত্য বস্তু কি? অনিত্য বস্তুই বা কি? ইহা নিশ্চয়রূপে বুঝিয়াছেন, যিনি ইহলোকে সুকুমার মল্লিকামালার পরিমলে, কুঙ্কুমাক্ত চন্দনগন্ধে বা কোমলাঙ্গী কমলায়তাক্ষী অবলার লাবণ্য বিলোকনে বীভৎস-দর্শন বমি মূত্র বিষ্ঠা বা শ্লেষ্মভক্ষণের ন্যায় বিরক্ত হইয়াছেন, এবং পরলোকে স্বর্গলোকবর্ত্তি নন্দন-কাননভ্রমণে বা উর্ব্বশী রম্ভা মেনকার সহবাসে বমি-মূত্র পুরীষ বা শ্লেষ্ম ভক্ষণের ন্যায় বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন, যিনি শম দম

উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান এবং শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইতে পারিয়াছেন,* এবং মুক্ত হইবার জন্য যিনি নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছেন, ঈশ্বর যাঁহাকে কৃপা কটাক্ষে অবলোকন করিয়াছেন, একমাত্র সেই সুধন্য পুরুষই চির সুখনিকেতন নিরুপদ্রব, শান্ত, শিব, চিদানন্দ, কেবলানন্দ, অখণ্ডানন্দ, অনিতানন্দ, আনন্দানন্দ, নেত্রের অন্তরে অবস্থিত হইয়াও দর্শন পথের অতীত, করভল-স্পৃষ্ট হইয়াও পরার্দ্ধ পথের অতিক্রান্ত, দুর্লক্ষ্য, হৃদয়ের হৃদয়, নয়নের নয়ন, শ্রবণের শ্রবণ, ঘ্রাণের ঘ্রাণ, প্রাণের প্রাণ, রসনার রসন, ত্বকের ত্বক্, বুদ্ধির বুদ্ধি, মনের মন, জগতের পিতা, জগতের মাতা, ভ্রাতা, সখা, ওঁ তৎসৎ সেই পরব্রহ্মের উপসনা করিতে সমর্থ।

সেই ধন্য উপাসক প্রবরকে ব্রহ্মোপাসনার প্রকার ভগবান্ বিষ্ণু উপদেশ প্রদান করিতেছেন,—

যথা বিষ্ণুসংহিতা ৯৭ অধ্যায়।—

"ঊরুস্থোত্তানচরণঃ সব্যে করে করমিতরং ন্যস্য তালুস্থাচলজিহ্বো দন্তৈর্দ্দন্তানসংস্পৃশন্ স্বং নাসিকাগ্রং পশ্যন্ দিশশ্চানবলোকয়ন্ বিভীঃ প্রশান্তাত্মা চতুর্ব্বিংশত্যা তত্ত্বৈর্ব্যতীতং চিন্তায়ৎ ॥ ১ ॥"

অর্থ—ব্রহ্মোপসাক দুই ঊরুতে উত্তানভাবে উভয় চরণ বিন্যস্ত করিয়া বামহস্তের উপরে দক্ষিণহস্ত স্থাপিত করিয়া, তালুতে জিহ্বা নিশ্চলভাবে রাখিয়া, উভয় দন্তপঙক্তি পরস্পর স্পর্শ না করিয়া, স্বকীয় নাসাগ্রমাত্র অবলোকন করিবে, ইতস্ততঃ অবলোকন করিবে না, চিত্তে কোনও ভয় রাখিবে না, † প্রশান্ত চিত্তে চতুর্বিংশতি তত্ত্বের অতিরিক্ত সেই পরব্রহ্মকে

---

* শম—অন্তরিন্দ্রিয় নিগ্রহ, দম—বহিরিন্দ্রিয় নিগ্রহ, উপরতি—উপরোক্ত শাস্ত্রোক্ত বৈধকর্ম্মের শাস্ত্রানুসারে পরিত্যাগ, তিতিক্ষা—দেহ বিঘটিত না হয় এরূপ প্রকারে শীতোষ্ণাদি যুগল পদার্থ সহ্য করা, সমাধান—ঈশ্বর চিন্তায় নিবিষ্টমন অভ্যাস বশে আবার যদি বিষয়ের প্রতিধাবিত হয়, তখন দোষ বুদ্ধিতে পুনর্ব্বার বিষয় হইতে ফিরাইয়া আনা, শ্রদ্ধা—গুরুবাক্য ও শাস্ত্র বাক্যে দৃঢ়বিশ্বাস। (আত্মানত্ম বিবেক)

† ভগবান্ ব্যাসদেব গীতাতে বিষ্ণু সংহিতারই অনুরূপ শ্লোক বলিয়াছেন—যথা—৬। ১৩—১৪।

সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চান বলোকরন্।
প্রশান্তাত্মা বিগতভী র্ব্রহ্মচারী ব্রতে স্থিতঃ ॥

চিন্তা করিবে অর্থাৎ—পরব্রহ্ম প্রকৃতি, বুদ্ধি, অহঙ্কার, শব্দতন্মাত্র, স্পর্শ তন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র নহেন, পরব্রহ্ম মন শ্রবণ ত্বক্, চক্ষু, রসনা, ঘ্রাণ বাক্‌পাণি পদে পায়ু ও উপস্থ এই একাদশ ইন্দ্রিয় নহেন, পরব্রহ্ম ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ও ব্যোম নহেন—পরন্তু তাহার অতিরিক্ত ॥ ১ ॥

"নিত্য মতীন্দ্রিয় মগুণং শব্দস্পর্শ রূপরস গন্ধাতীতং সর্ব্বজ্ঞ মতি স্থূলং ॥ ২ ॥

অর্থ—পরব্রহ্ম নিত্য—তাঁহার ধ্বংস ও প্রাদুর্ভাব নাই, মনঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়, তাঁহাকে জানে না, কেননা তিনি শব্দ স্পর্শ রূপরস বা গন্ধ নহেন, কিন্তু সকলকেই তিনি জানেন, যে হেতু তিনি মহান্ সকলেতেই ব্যাপক রূপে আছেন ॥ ২ ॥

"সর্ব্বগ মতি সূক্ষ্মং" ॥ ৩ ॥

অর্থ—তিনি সকল বস্তুরই অন্তরে বাহিরে অসুস্যূত, কেন না তিনি অতি সূক্ষ্ম ॥ ৩ ॥

"সর্ব্বতঃ পাণি পাদং সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং সর্ব্বতঃ সর্ব্বশক্তি ॥ ৪ ॥ (*)

অর্থ—তাঁহার সকল দিগে সহস্র সহস্র পাণি, সহস্র সহস্র পাদ, সহস্র সহস্র শির, সহস্র সংস্র চক্ষু ও সহস্র সহস্র মুখ বিস্তারিত রহিয়াছে; সকল দিগেই তাঁহার শক্তি প্রসারিত ॥ ৪ ॥

"এবং ধ্যায়েৎ" ॥ ৫ ॥

অর্থ—এই প্রকারে পরব্রহ্মের ধ্যান করিবে ॥ ৫ ॥

"ধ্যান নিরতস্য সংবৎসরেণ যোগাধির্ভাবো ভবতি" ॥ ৬ ॥

অর্থ—উক্তরূপে ধ্যানে নিরত থাকিলে এক বৎসর কালেই সেই সাধকের যোগ উপস্থিত হয়।

"অথ নিরাকারে লক্ষ্যবন্ধং কর্ত্তুং ন শক্নোতি তদা পৃথিব্যপ্তেজো বাম্বাকাশ মনোবুদ্ধ্যব্যক্ত পুরুষাণাং পূর্ব্বং পূর্ব্বং ধ্যাত্বা তত্র লব্ধলক্ষ্য স্তত্তৎ পরিত্যজ্যাপর মপরং ধ্যায়েৎ ॥ ৭ ॥

অর্থ—যদি নিরকারে লক্ষ্য স্থির করিতে সমর্থ না হও তবে পৃথিবী জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, প্রকৃতি এবং পুরুষের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব পদার্থগুলিকে ধ্যান করিবে, তাহাতে লক্ষ্য স্থির হইলে সেই সেই

* সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তং সর্ব্বতোঽক্ষি শিরোমুখং
সর্ব্বতঃ শ্রুতি মল্লোতে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥

ধ্যেয় পদার্থগুলি ছাড়িয়া পরের পরের ধ্যেয় পদার্থের ধ্যান করিতে আরম্ভ করিবে, অর্থাৎ স্থূল পৃথিবীর ধ্যান করিতে করিতে ভালরূপে আয়ত্ত হইলে অর্থাৎ যেই নেত্র আমীলন করিলে অমনি পৃথিবীর সম্যক্ রূপ আসিয়া হৃদয়ে প্রতিভাত হইল, এইরূপ পৃথিবীর ধ্যান সড় গড় হইলে, তখন পৃথিবীর ধ্যান ছাড়িয়া জলের ধ্যান করিতে প্রবর্ত্ত হইবে, এইরূপে ক্রমশঃ স্থূল ধ্যান ছাড়িয়া সূক্ষ্মের দিগে অগ্রসর হইবে, এবং ক্রমে প্রকৃতি পর্য্যন্ত ছাড়িয়া পুরুষের ধ্যানে প্রবর্ত্ত হইবে ॥ ৭ ॥

"এবং পুরুষ ধ্যানমারভেৎ" ॥ ৮ ॥

অর্থ—এইরূপে পুরুষের ধ্যান আরম্ভ করিবে ॥ ৮ ॥

"তত্রাপ্যসমর্থঃ স্বহৃদয় পদ্মস্যাবাঙ্মুখস্য মধ্যে দীপবৎ পুরুষং ধ্যায়েৎ" ॥ ৯ ॥

অর্থ—উক্তরূপে আত্মার ধ্যান করিতে অসমর্থ হইলে অধোমুখে অবস্থিত হৃদয় কমলমধ্যে প্রদীপবৎ পুরুষের ধ্যান করিবে।

"তত্রাপ্যসমর্থোভগবন্তং বাসুদেবং কিরীটিনং কুণ্ডলিনমঙ্গদিনং শ্রীবৎসাঙ্ক বনমালাবিভূষিতোরস্কং সৌম্যরূপং চতুর্ভুজং শঙ্খচক্র গদাপদ্মধরং চরণমধ্য গততুব্যং ধ্যায়েৎ" ॥ ১০ ॥

অর্থ—পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে যদি পুরুষের ধ্যান করা দুষ্কর মনে হয়, তবে যাঁহার চরণযুগলে ভগবতী বসুন্ধরা মূর্ত্তিমতী হইয়া প্রণতা, যিনি চারিহস্তে শঙ্খ চক্র গদা ও পদ্ম ধারণ করিয়াছেন, অতিশয় সৌম্যমূর্ত্তি, যাঁহার প্রশস্ত বক্ষঃস্থলে বনমালা দোলায়মান, এবং কুটিল রোমরেখা জলাবর্ত্তের মত শোভমান, মুখমণ্ডল কিরীট কুণ্ডলে উদ্ভাসিত, সেই ভগবান্ বাসুদেবের মনোমোহনমূর্ত্তি চিন্তা করিবে। (১)

"যদ্ধ্যায়তি তদাপ্নোতি ধ্যানগুহ্যং" ॥ ১১ ॥

অর্থ—এ প্রকারে যাঁহাকে ধ্যান করা হয়, ধ্যান গম্য সেই পদার্থ লাভ করিতে পারে ॥ ১১ ॥

(১) এ স্থানে বাসুদেব কেবল উপলক্ষণমাত্র, কিন্তু বুঝিতে হইবে, আপন আপন অভিমত দেবতা, কোনও একটী দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া ধ্যানের দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা সাধনাই উদ্দেশ্য, অন্য কিছু নহে, এজন্যই মহর্ষি পতঞ্জলি যোগসূত্রে কহিয়াছেন, "যথাভিমতধ্যানাদ্বা"। ১।৪০।

অর্থ—যে কিছু অভিমত বস্তুর ধ্যানের দ্বারাই চিত্তের একাগ্রতা সাধন করিবে।

"তস্মাৎ সর্ব্বমেব ক্ষরংত্যক্ত্বা অক্ষয়মেব ধ্যায়েৎ ॥ ১২ ॥

উক্ত প্রকারে স্থূল মূর্ত্তিতে লক্ষ্য স্থির হইলে তৎপরে স্থূল পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র অক্ষর পরব্রহ্মকেই ধ্যান করিবে ॥ ১২ ॥

"ন চ পুরুষংবিনা কিঞ্চিদস্মস্তি" ॥ ১৩ ॥

অর্থ—এ জগতে সেই পরব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই অক্ষর অচ্যুত পদার্থ নাই ॥ ১৩ ॥

"তংপ্রাপ্য মুক্তো ভবতি" ॥ ১৪ ॥

অর্থ—তাঁহাকে লাভ করিতে পারিলেই সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে, অন্যথায় আর কিছুতেই নিস্তার নাই ॥ ১৪ ॥

ইহাই আর্য্য শাস্ত্রানুমোদিত ব্রহ্মোপাসনা, ইহারই জন্য আর্য্যগণ স্থূলোপাসনার পথ উদ্ভাবিত করিয়াছেন, এরূপ স্থূলে অভ্যাস লাভ করিয়া শত জন্মান্তেও যদি অখণ্ডানন্দস্বরূপ সেই পরম পুরুষকে লাভ করা যায়, আর্য্যসাধক তাহাতেও কৃতার্থতা লাভ করিবে।

শ্রীজয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ।

দুঃখ।

দুঃখই সংসারের একমাত্র বিভীষিকা। যত কিছু উদ্যোগ, চেষ্টা, ভাবনা, উদ্বেগ এবং পরিশ্রম সকলই দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য। মনুষ্য অসাধ্যসাধন করিতেছেন, গিরি তুলিতেছেন, সাগরের তলস্পর্শ করিতেছেন, কেবল দুঃখকে দূরে রাখিবার জন্য। "চিরদুঃখী হও" ইহার ন্যায় মর্ম্মভেদী অভিসম্পাত মনুষ্য সমাজে আর নাই; মহা শত্রু না হইলে এমন গালি দেয় না। মৃত্যু এত আশঙ্কার ব্যাপার হইত না, যদি উহাকে আমরা মহাদুঃখ—মহাভয় বলিয়া না জানিতাম। কিন্তু দুঃখ কি, কাহাকে দুঃখী বলিতে পারি? কি জানি কি? তুমি, আমি দেশশুদ্ধ লোক এক সময়ে না এক সময়ে দুঃখের আস্বাদ পাইয়াছি, দুঃখী হইয়াছি; পরন্তু সাধারণতঃ দুঃখ পদার্থ কি, তাহা বলা অতি কঠিন। যে দেশে দুঃখ নাই, যে রাজ্যের প্রজা দুঃখ কাহাকে বলে জানে না, কখনও কোন দুঃখী হতভাগাকেও দেখে নাই, তাহাদের কেমন করিয়া বুঝাইব, দুঃখ

কি! যাহা হইলে তুমি নিজকে দুঃখী মনে কর, হয়ত আমি তেমনটি হইলে মহাসুখী হই, আবার তোমার সুখের উপাদানকে অন্যে ঘৃণাকারজনক বলিয়া ত্যাগ করিতে পারে। ধনী শীতকালকে সুখের—বিলাসের সময় বলিয়া মনে করে, দুঃখী দরিদ্র গ্রীষ্মসমাগমে নিশ্চিন্ত হয়, তখন আর বস্ত্রাচ্ছাদনের জন্য উদ্বিগ্ন হইতে হয় না। চাষা বুক্‌ড়ী চালের ভাত খাইয়া, গুড়ুক টানিয়া আমগাছের তলায় মহাসুখে নিদ্রা যায়, আর লক্ষপতি দুগ্ধফেননিভ কার্পাস-শয্যায় শয়ন করিয়া অনিদ্রায় উষ্ণমস্তিষ্ক হইয়া শিরঃপীড়ায় ব্যথিত হয়েন। কিন্তু লক্ষপতি ধনীকে যদি বলা যায় যে, আপনি প্রগাঢ় নিদ্রার প্রার্থনা করেন, আপনি চাষার ন্যায় লুণ মাখিয়া বুক্‌ড়ী চালের ভাত খাইয়া, গুড়ুক টানিয়া এই বৈশাখ মাসের রৌদ্রে আমের শীতলছায়ায় গিয়া শয়ন করুন, আপনার দুঃখ দূর হইবে, আপনি নিদ্রিত হইবেন। তাহা হইলে হয় ত তিনি আত্মহত্যা করা সহজ মনে করেন, এবং এমন ভীষণ চিকিৎসা দূরে নিক্ষেপ করেন। যাহা চাষার পক্ষে সুখ অথবা সুখের কারণ, তাহা ধনীর ভীষণ দুঃখ। তবে কি বলিব, যাহাতে লোকে অসুখী হয়, তাহাই দুঃখ। গৌতমের ন্যায় সূত্রে আছে যে, "বাধনা লক্ষণং দুঃখমিতি" [১ম অ, ১ আ ২১সূ] দুঃখের লক্ষণই বাধা। গতি এবং প্রবৃত্তি এবং অন্যবিধ শারীরক ও মানসিক চেষ্টা বাধিত অথবা রুদ্ধ হইলে দুঃখ হয়। আমি যাহা চাই, তাহা যদি না পাই, অথবা ইপ্সিত বস্তুর প্রাপ্তির পথে যদি কিছু বাধা কিম্বা বিপদ ঘটে, তবেই আমি দুঃখিত হই, মর্ম্মাহত হই। শিশু জল কাদা লইয়া খেলিতে চায়, প্রাপ্তিমাত্রেই সকল পদার্থই বদনে দেয়, বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগের দুই একখানি পাতা চিবাইয়া ভোজন করিবারও এক একবার চেষ্টা করে; কিন্তু তুমি তাহার পিতা, বালকের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তাহাকে এই সকল কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত কর; কিন্তু সে তাহা বুঝে না, মনে মনে অতিশয় দুঃখিত হয়। শেষে মনের বেগ না সাম্‌লাইতে পারিয়া কাঁদিয়া ফেলে। ভিতরে যখন কোন একটা চেষ্টা হয়, যখন আত্মার শক্তি সকল বহির্ম্মুখী হয়, প্রত্যেক স্নায়ুতে একটা যেন তড়িদ্বেগ প্রবাহিত হইতে থাকে, আবেগ এবং উদ্বেগজনিত উৎকণ্ঠায় মন সদাই চঞ্চল থাকে, আশার সামগ্রী পাইবার জন্য আত্মজ্ঞানশূন্য হইয়া আমরা কার্য্য করিতে থাকি। মন, বুদ্ধি, প্রবৃত্তি যেন তদাকারাকারিত হইয়া যায়, তখন যদি কোন

অননুভূত অজ্ঞেয় ব্যাপার সংঘটিত হইয়া আমাদের আশাপথে কণ্টক হইয়া দাঁড়ায়, আর যদি বুঝিতে পারি যে, শতচেষ্টা করিলেও কার্য্যসিদ্ধি হইবে না, তাহা হইলেই যে সকল আত্মশক্তি আমাদের স্নায়ুমণ্ডলকে প্রকম্পিত করিয়াছিল, যে চেষ্টার জন্য আমরা উৎকণ্ঠার ঘোরে আত্মহারা হইয়াছিলাম, তাহারা যেন স্তম্ভিত হইয়া যায়। যাহারা বাহিরের কার্য্যে শতমুখী হইয়া প্রধাবিত হইয়াছিল, তাহারা হঠাৎ প্রতিরুদ্ধ হওয়াতে শরীরেতেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। শরীর এবং মন, কিন্তু এই সংপ্রবাহিত বেগকে মধ্যপথে সম্বরণ করিতে পারে না। স্বাভাবিক নিয়ম এই যে, শক্তি শক্তিদ্বারাই স্তম্ভিত এবং পরাভূত হইয়া থাকে। সুতরাং এই কার্য্যশক্তিকে আত্মস্থ করিতে হইলে, আত্মার আর এক স্বতন্ত্র শক্তি প্রযুক্ত করিতে হইবে। প্রথম চেষ্টায় এবং উদ্যমে শরীরের অন্য শক্তি শ্লথ এবং হীন হইয়াছিল, হঠাৎ এক নূতন এবং বিপরীত শক্তির উদ্ভাবনায় যে আয়াসটুকু করিতে হয়, তাহাতে আরও যেন মন ও স্নায়ুমণ্ডলী এলাইয়া পড়ে। এই বাধাগ্রস্ত এবং শক্তিহীন অবস্থাই দুঃখ। প্রবাসী বাঙ্গালী বাবু ছুটী লইয়া বাটী আসিবেন। অনেক দিনের পরে দেশে ফিরিতেছেন, তাই তথাকার নানাবিধ নূতন সামগ্রী সকল ক্রয় করিতেছেন, সুবর্ণ গহনাও দুই একখানা প্রস্তুত করিতে দিয়াছেন, স্বর্ণকারের বাটীতে প্রতিদিন যাতায়াত করিতেছেন, এবং একখানি ছুটীর দরখাস্ত করিয়াছেন, বড়বাবু সুপারিস করিয়া বড় সাহেবের নিকট উহা পাঠাইয়া দিয়াছেন, সাহেবও প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়াছেন। যাহা কিছু আবশ্যক, তাহা সকলি সংগ্রহ করা হইয়াছে, উৎকণ্ঠায় আবেগে বাবু এখন যাইবার দিন গণিতেছেন, ক্রমে অবসরের দিনও নিকট হইল, বাবু বন্ধু-বান্ধবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াও বিদায় লইয়া আসিলেন। এমন সময়ে যদি তাঁহার জ্বর হয় এবং ডাক্তারে বলে যে, তিনি কোন ক্রমেই দেশে যাইতে পারিবেন না, তাহা হইলে বোধ হয়, যেন তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়, দুঃখে হতাশে শরীর যেন অসাড় নিষ্পন্দ হইয়া পড়ে, চক্ষু ফাটিয়া অশ্রুবিন্দু পড়িতে থাকে। এই বাধিত অবস্থাই দুঃখ। স্বেচ্ছা এবং প্রবৃত্তির বিপরীত যাহা, তাহাই দুঃখ। অর্থাৎ স্বেচ্ছা এবং প্রবৃত্তির বেগ অপ্রতিহত থাকিলে লোকে সুখী হয়। সুখ জীবনের সহজাবস্থা, দুঃখ বাধিত এবং বিরুদ্ধাবস্থা। তাই বলিয়াছিলাম, যাহাতে লোকে অসুখী হয়, তাহাই দুঃখ।

জিজ্ঞাসা করি, যদি প্রবাহিনী সমতল ক্ষেত্রমধ্য দিয়া, সহজে বিনা বাধায় বহিয়া সাগরে গিয়া পড়িত, তাহা হইলে উহা বেগবতী হইত কি না? তাহা হইলে উহা গভীর খাদ বাহিয়া গ্রাম, নগর পল্লী সকলকে সঞ্জীবন প্রদান করিয়া, স্নেহস্নিগ্ধ করিয়া উত্তাল তরঙ্গে ছুটিতে পারিত কি না? মনে হয়, পারিত না। শক্তি বাধা না পাইলে সঞ্চিত হয় না, আবার সঞ্চিত শক্তি ব্যতীত বেগবান অন্য কিছুই নাই। সুতরাং গতি, বাধিত শক্তিতেই জন্মিয়া থাকে। অর্থাৎ যে শক্তি সংবদ্ধ, রুদ্ধ, সংপিষ্ট অথবা দুঃখিত তাহাই প্রবল প্রকাশশালিনী, এবং প্রবলতা না থাকিলে শক্তি কার্য্যহীন স্থাণু। তবেই বলি না কেন, দুঃখ না পাইলে শক্তি প্রকাশিতা হয়েন না। বিন্দু বিন্দু জল পর্ব্বতপঞ্জরে সঞ্চিত হইয়া ধীরে ধীরে পাথর-চাপা বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া রজত সূত্রধারে গলিয়া পড়িতে লাগিল, তাহারা উপলখণ্ডের উপর পড়িয়া উল্‌টি পাল্‌টি খাইতে লাগিল, দুঃখে যেন শুকাইয়া যাইতে লাগিল; শেষে পরামর্শ করিয়া দশজনে এক হইয়া প্রস্তর রাশির উপর আছাড় খাইয়া পড়িল। কত বাধা বিপত্তি উত্তীর্ণ একটু সমতলক্ষেত্রে অনায়াসে বহিয়া যাইতে পাইল, আবার বাধা, আবার বন্ধুর ভূমি, কত স্থানে বিশ্রাম হ্রদ নির্ম্মাণ করিয়া স্থির হইয়া ব্যয়িত শক্তি পুনঃ সঞ্চয় করিল, এত পরিশ্রম চেষ্টা, উদ্যম, চিন্তা, ব্যথা, উৎকণ্ঠা কাটাইয়া, তোমার আমার ন্যায় তৃষিত কাঙ্গালগণকে স্নিগ্ধতা বিলাইয়া, নির্ম্মল পানীয় দান করিয়া, সঞ্জীবিত করিয়া দুঃখে কষ্টে তরঙ্গিণী তবে মহতের—বিশালের অঙ্গে মিশাইয়া যায়। তবে কি দুঃখই নদী সকলের উপাদেয়তার আদি কারণ?

তোমার আমার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবনেও কি এই মহাভয়ের উপকারিতা দেখা দেয় না? দেয় বৈ কি! সে জীবন জীবনই নহে, যাহা দুঃখের—দারিদ্র্যের অগ্নি পরীক্ষায় নির্ম্মলীকৃত না হইয়াছে। সে মনুষ্য মনুষ্যই নহে, যে সদা সুখের ক্রোড়ে নিশ্চিন্ত নিদ্রিত থাকে। সে বুদ্ধি বুদ্ধিই নহে, যাহা অভাবের পেষণে সুশাণিত না হইয়াছে। যেমন নদীজল বাধা পাইয়া, প্রণালীবদ্ধ হইয়া গভীরতা প্রাপ্ত হয়, তেমনি মনুষ্য-প্রকৃতি দুঃখ দৈন্য দরিদ্রতার বিষম বাধা পাইয়া, প্রণালীবদ্ধ হইয়া গভীরতা প্রাপ্ত হয়। গভীর নদী পূতসলিলা, গভীর প্রকৃতি পুণ্য পরিমলযুক্তা। মনুষ্য চিরসুখী হইলে উদ্দেশ্যহীন, দিশাহারা হয়। নদী, সমতলক্ষেত্রে পৌঁছিলে

ছড়াইয়া পড়ে, স্থানে অস্থানে ঢলিয়া যায়, গোষ্পদ-গভীর হয় মাত্র। যেখানে গভীরতা নাই, প্রণালীবদ্ধ কার্য্য নাই, বেগ নাই, অধ্যবসায় নাই, সেখানে উদ্দেশ্য সাধন হয় না, সেখানে বাস করিলে মনুষত্ব হারাইতে হয়, সে দেশ যবন দেশ, নরকজ্ঞানে উহা সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিবে। দুঃখ আমাদের উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দেয়, সংসারের অসারতা অলীকতা দেখাইয়া মহান্ বিশাল প্রকাণ্ড অনন্তের মধ্যে ডুবিতে ইঙ্গিত করে। সংসারে কত বাধা পাও, কত ব্যথা পাও, যাতনায় মুখে রক্ত উঠিতে থাকে, দশদিক্ শূন্য দেখ, তবুও যেন মনে হয়, কে বুঝি কানের কাছে চুপি চুপি বলিতেছে, যাহা খুঁজিতেছ, তাহা এই অনতিদূরেই অবস্থিত। দুঃখের বিরাট জ্বালায় যখন প্রবৃত্তি ও বাসনাবিলাস পুড়িয়া খাক্ হইয়া যায়, তখন কে যেন স্বপ্নের ঘোরে বুঝাইয়া দেয় যে, আমার শীতল সাগর-সঙ্গম এই দৃষ্টির ভিতরে আসিয়াছে। বীরত্ব, মহত্ত্ব, আত্মত্যাগ, বৈরাগ্য, সাহস, উদ্যম এবং ভরসা কোথায় পাইতাম, যদি সংসারের দুঃখ না থাকিত, যদি লোকে দুঃখের বজ্রসূচী বিন্ধনে উন্মত্ত উদ্‌ভ্রান্ত না হইত। যদি বুঝি আমরা দুঃখী, তবেই স্থির জানিও, সুখের ঊষা ফুট ফুট হইয়াছে। আমাদের দুঃখের উপদানের অভাব নাই। যাতনাদায়ক অনুপান সংগ্রহ হইয়াছে, এখন বুঝিতে হইবে, প্রাণে প্রাণে ব্যথিত হইয়া, মর্ম্মে মর্ম্মে আঘাত পাইয়া অনুভব করিতে হইবে আমরা দুঃখী, চিরদুঃখী মহাদুঃখী। তীব্র অনুভূতি হইলেই প্রবাহ আসিবে। সে কোটাল বাণে সব ভাসিয়া যাইবে, জীবনদী উজান বহিবে, মহাসাগরের শীতল জলে দুঃখদাবদগ্ধ হিন্দুহৃদয় কৃতার্থ হইবে। তবে কেন দুঃখকে ভয় করি, কেন দুঃখী দেখিলে সরিয়া দাঁড়াই। এস দুঃখ! ভারতের আপদমস্তক তোমার বিষম বিষ-বেদনায় ব্যথিত করিয়া দেও, তোমার তাড়নায় লোকে যেন অস্থির উন্মত্ত হইয়া উঠে। এস তুমি সর্ব্বমঙ্গলবিধাতা, সর্ব্বসম্পৎদাতা! ভারতের গৃহে গৃহে আসিয়া দেখা দেও। রাজা, মহারাজা, নবাব, উজীর, ছোট, বড়, ধনী, নির্ধন সকলকে তোমার তড়িৎশক্তি দ্বারা বিকম্পিত করিয়া দেও। এ অসাড় নিষ্পন্দ জাতিকে উদ্যম দেও, উত্তেজনা দেও, উন্মত্ততা দেও।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

জননী।

পাঠক! পীড়ায় জর্জ্জরিত হইয়া অনেক ঔষধ সেবন করিয়াছ, কিন্তু মাতার সেবাশুশ্রূষার মত শান্তি ঔষধ পাইয়াছ কি? অসহ্য যন্ত্রণা পাইয়া, উন্মাদের ন্যায় রোদন করিতে করিতে "মা" বলিয়া ডাকিলে, যেমন মন প্রাণ শীতল হয়, সেরূপ আর কিছুতেই হয় না। কারণ, মাতার নিমিত্ত আমরা যেরূপ ব্যাকুল, মাতা সন্তানের জন্য ততোধিক কাতরা। জননীর গর্ভ হইতে এই মরণশীল জগতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর, আমাদিগের নয়ন থাকিলেও কিছুই চিনিতে পারিতাম না। কর্ণ থাকিলেও শব্দের ঘাত-প্রতিঘাত গ্রাহ্যের মধ্যে আসিত না। নাসিকা থাকিলেও কোন দ্রব্যের সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ কিছুই অনুভব করিতে পারিতাম না। কিছুদিন পরেই আর আমাদিগের সে অবস্থা থাকে না। এক দুই করিয়া দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, স্রোতস্বতীর জলপ্রবাহের মত গত হইতে থাকে, আর প্রাণীমাত্রেই পরিবর্ত্তনশীল জগতে ক্রমে ক্রমে এক অভিনব রাজ্যে পদার্পণ করিতে থাকে; তখন আমরা যাঁহার উদরে দশ মাস দশ দিন বাস করিয়াছিলাম, যিনি শরীরের রক্তধারা পীযূষরূপে দান করিয়া আমাদের এই অমূল্য জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন; যিনি রজনীতে অনিদ্রায় ও সন্তানের অবস্থাবিশেষে অনাহারে থাকিয়া সন্তানের মঙ্গল-কামনা করিতেন, এবং যিনি অসহ্য কষ্টে পতিত হইয়াও সন্তানের মুখকমল দর্শন করিয়া সমুদয় ক্লেশ ভুলিয়া যাইতেন; যিনি সন্তানের পীড়া হইলে এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড অন্ধকার দেখিতেন এবং সন্তানের সুখে যিনি স্বর্গ-সুখ লাভ করিতেন; সেই স্নেহময়ী প্রেমময়ী জননীকেই আমরা প্রথমে "মা" বলিয়া ডাকিতে শিখি। সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতার এরূপ সৃষ্টিকৌশল ভেদ করিতে কেহই সক্ষম নহেন।

সকলে স্পষ্টই দেখিতেছেন যে, মাতা সন্তানের নিমিত্ত স্বীয় জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত; মাতার অপত্যস্নেহের সদৃশ স্বর্গীয় সুখকর সামগ্রী এ জগতে আর দ্বিতীয় নাই। মাতা অপেক্ষা পরম পূজনীয় পবিত্র বস্তু পৃথিবীতে আর কোথাও পাইবে না। স্বর্গ যে এত বড় উচ্চ স্থান, যাহার পবিত্রতার সীমা নির্দ্দেশ করা যায় না, মাতা তদপেক্ষা উচ্চ ও পবিত্র। কেন না, কথিত আছে,—"স্বর্গাদপি গরীয়সী।" (ক্রমশঃ)

তুমি কি ?

(কভু) ছুটাছুটি কর হাসি কলরবে
আঁচল উড়ায়ে পবনে,
গোলাপ গুঁজিয়া সুঠাম খোঁপায়,
আল্‌তা পরিয়া চরণে।

(২)

(কভু) আলু'য়িত কেশ লুঠিত আঁচল
গভীর বদন নেহারি,
মুখে কথা নাই চোখে হাসি নাই
চরণ চলে না তোমারি।

(৩)

তুমি কি বালিকা—কুসুম কলিকা
ভাবনা যাতনা জান না ?
সংসারের অলি কতই গুঞ্জরে
সে দিকেও কাণ পাত না ?

(৪)

কিবা চিন্তাশীলা সুগুরু হৃদয়া
আশা নিরাশার কিঙ্করী,
রাগ বিরাগের, সুখের দুখের
এখনি গো তুমি সুন্দরি ?

(৫)

ভালবেসেছিলে ভালবাসে নাই
দুখ দিয়া গেছে পরাণে,
তাই কি ভাব গো কখনো কখন
বিষাদ-বিরস বদনে ?

(৬)

এ বিশ্বমণ্ডলে কে আছে অধম
তোমাকে হেলে যে ললনে,
আশীষের ফুল শিরে না পরিয়া
দূরে কে ঠেলে গো চরণে ?

(৭)

নিরাশ প্রেমের অনল নিশ্বাস
ও কোমল হৃদি দহে না,
পারিজাত ভরা নন্দনকাননে
শিরকোর কভু বহে না।

(৮)

তবে যে কালিমা কভু দেখা যায়
ও মুখে তোমার প্রেয়সি,
(সে) কমলে শৈবালে বিধির বিধানে
মাধুরী বাড়ে গো রূপসী।

(৯)

(তুমি) বালিকা, প্রবীণা চপলা, সুধীরা,
হাসিমুখী কভু মলিনা ;
(আমি) নানারূপে তোমা আরাধনাকরি
প্রেমযোগে কভু টলি না।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ নিয়োগী।

জন্মভূমি।

সচিত্র মাসিক পত্র।

নবম বর্ষ। } ভাদ্র, ১৩০৭ সাল। { ২য় সংখ্যা।

হিন্দু-বিবাহ-পদ্ধতি।

একটি প্রশ্ন।

হিন্দু-গৃহস্থের পক্ষে দশবিধ সংস্কারের মধ্যে বিবাহ একটি প্রধান সংস্কার। স্ত্রী এবং শূদ্রগণের পক্ষে বিবাহই একমাত্র সংস্কার। অসংস্কৃত দেহে হিন্দু কোন কাম্য বা নিত্যকর্ম্ম করিতে পারেন না। শাস্ত্রে বচন প্রমাণ আছে যে,—

"এবমেনঃ শমংযাতি বীজগর্ভ সমুদ্ভবম্।
চিত্রংকর্ম্ম যথানেকৈ রঙ্গৈরুন্মীল্যতে শনৈঃ।
ব্রাহ্মণ্যমপি তদ্বৎস্যাৎ সংস্কারৈঃ বিধিপূর্ব্বকৈঃ॥"

ভাবার্থ—এই যে, বীজ ও গর্ভের দোষ প্রক্ষালন জন্য দ্বিজগণের পক্ষে দশবিধ সংস্কারের প্রয়োজন ; বিবাহ-কার্য্য দেহের শেষ সংস্কার। অতএব নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে, তিনটী উদ্দেশ্যসাধন জন্য বিবাহ সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

(১) বিবাহ একটি প্রধান সংস্কার, এবং এই সংস্কার দ্বারা বীজগর্ভ দোষ সকল প্রক্ষালিত হইয়া যায়। সংস্কৃত না হইলে বীজদেহ অশুচি অবস্থায় থাকে।

(২) পুন্নাম নরক হইতে পরিত্রাতা একমাত্র ঔরসজাত পুত্র। বিবাহ ব্যতিরেকে যথাশাস্ত্র পুত্রোৎপাদন অসম্ভব। অপিচ পুত্র পিণ্ডাদি প্রদান করিয়া পিতৃপুরুষকে পরিতৃপ্ত করে।

(৩) বিবাহ না হইলে, বহুবিধ কাম্যকর্ম্মাদি হইতে বর্জ্জিত থাকিতে হয়। অবিবাহিত গৃহস্থ ব্যক্তিকে বিশেষ বিশেষ যাগ ও যজ্ঞাদি হইতে বিরত থাকিতে হয়। এই কারণে মনু আদেশ করিয়াছেন যে,—

"অনন্তরং সমাবৃত্য কুর্য্যাদ্দার পরিগ্রহম্।" গুরু গৃহ হইতে বিদ্যার্জ্জন সমাপন করিয়া পিতৃগৃহে প্রত্যাগমনান্তর দার-পরিগ্রহ করিবে।

শাস্ত্রোক্ত বিবাহ-পদ্ধতির কথা এইবার বর্ণনা করিব। মনু বলিয়াছেন যে,

"ত্রিংশৎবর্ষঃ বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীম্।
ত্র্যষ্টবর্ষোষ্টবর্ষাং বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ॥"

ত্রিশ বৎসরের যুবা বারো বৎসরের কন্যাকে বিবাহ করিবে, এবং চব্বিশ বৎসরের যুবা অষ্টমবর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করিবে। ইহার পূর্ব্বে বিবাহ করিলে মনুর মতে সেই বিবাহ প্রশস্ত বিবাহ মধ্যে পরিগণিত হইবে না।

যে কন্যাকে বিবাহ করিবে, সে অসগোত্রা, অসপিণ্ডা, বয়ঃকনিষ্ঠা এবং অনন্যপূর্ব্বা হইবে। দান-কর্ম্মের পূর্ব্বে যে কন্যা অন্যের নিকট বাগ্দত্তা হয় নাই, তাহাকে অনন্যপূর্ব্বা কহে। মনু বলেন যে, "সকৃৎকন্যা প্রদীয়তে।" কন্যাকে একবার দান করিবে। বিধবা-বিবাহকে বিবাহ-সংস্কার বলা যায় না, উহা কামজ বিবাহমাত্র। যে কন্যার জ্যেষ্ঠা ভগিনী অবিবাহিতা, তাহাকে বিবাহ করিবে না। যে কন্যার ভ্রাতা নাই, তাহার সহিত বিবাহ-কার্য্য অপ্রশস্ত।

বৈধবিবাহ কার্য্যের তিনটী পর্য্যায় আছে। (১) বাগ্দান; (২) কন্যা-দান; (৩) পাণিগ্রহণ। পাণিগ্রহণের পরে উত্তর বিবাহ ও চরুহোম সমাবর্ত্তন প্রভৃতি। বর ও কন্যাপক্ষের সকলে সম্মিলিত হইয়া যথাবিধি সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনার পর, যখন উভয় পক্ষই বৈবাহিক সম্বন্ধস্থাপনে সম্মতি প্রকাশ করেন, তখন কন্যা-কর্ত্তা কন্যাদান করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করেন, এবং বরকর্ত্তা দত্তাকন্যাকে স্বগৃহে গ্রহণ করিবেন বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করেন, ইহাই বাগ্দান। এই বাগ্দানের পরে যথা-নির্দ্দিষ্ট দিনে শুভলগ্নে কন্যাকর্ত্তা কন্যাদান করিয়া থাকেন। বর সেই দত্তাকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া, তাহাকে নিজস্ব বলিয়া প্রকাশ করেন, পরে বিবাহ-সংস্কার কার্য্য সম্পাদন হইয়া থাকে। সংস্কার কার্য্য পরিসমাপ্ত না হইলে দত্তাকন্যা ধর্ম্মপত্নী পদবাচ্যা হন না। বিবাহ-পদ্ধতি শ্রৌতকার্য্য,

শ্রৌতকার্য্য স্বয়ং করিতে হয়। বিবাহ ব্যাপারে বরই কর্ত্তা; সুতরাং বরকে স্বয়ং সকলকার্য্য পদ্ধতি-অনুযায়ী করিতে হইবে। কেন না, শাস্ত্র বলিতেছেন যে,—

"শ্রৌতং কর্ম্ম স্বয়ং কুর্য্যাদন্যোঽপি স্মার্ত্তমাচরেৎ।
অশক্তৌ শ্রৌতমপ্যন্যঃ কুর্য্যাদাচারমন্ততঃ।"

শ্রৌতকার্য্য কর্ত্তা স্বয়ং করিবে। স্মার্ত্তকর্ম্ম অন্যের দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে। শ্রৌতকার্য্য করিতে কর্ত্তা অপারগ হইলে (রোগাদি দ্বারা অসমর্থ হইলে) অন্যের দ্বারা সে কার্য্যের পরিসমাপ্ত হইতে পারে। তাৎপর্য্য এই যে, শ্রৌতকার্য্য কর্ত্তারই কর্ত্তব্য, প্রতিনিধি দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না। তিনটি লক্ষণে কর্ম্মকর্ত্তার নির্ব্বাচন হইয়া থাকে, যথা,—

"ত্রিধেব জ্ঞায়তে কর্ত্তা বিশেষেণ প্রতিক্রিয়ম্।
যোগ্যত্ব প্রতিষিদ্ধত্ব বিশেষণ পদান্বয়ে॥"

যোগ্যতা, প্রতিষেধ ও বিশেষণ দ্বারা কর্ত্তা নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। স্ত্রী ও শূদ্রের পক্ষে বেদ-মন্ত্র উচ্চারণ নিষেধ আছে। বিবাহকার্য্যে বৈদিক মন্ত্রই সব। অথচ স্ত্রী ও শূদ্রের পক্ষে বিবাহ ব্যতীত অন্য সংস্কার নাই। সুতরাং পুরোহিতের দ্বারা উচ্চারিত মন্ত্রই স্ত্রী ও শূদ্রগণের পক্ষে যথেষ্ট হইবে।

আমাদের বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চ জাতির মধ্যে ব্রাহ্মবিবাহই প্রচলিত আছে।

"আচ্ছাদ্যচার্চ্চয়িত্বাচ শ্রুতশীলবতে স্বয়ম্।
আহূয় দানং কন্যায়াঃ ব্রাহ্মোধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥"

বস্ত্রাচ্ছাদন দ্বারা ভূষিত করিয়া, সালঙ্কৃতা কন্যাকে বেদজ্ঞ এবং সুশীল পাত্রে, স্বয়ং সসম্মানে আহ্বান করিয়া পাত্রসাৎ করিতে হইবে। কন্যার পিতা মনে করিবেন যে, তিনি সৎপাত্রে কন্যাদান করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। ইহাই ব্রাহ্মবিবাহের সামান্য লক্ষণ। আসুর বিবাহে বর কন্যাকর্ত্তাকে কন্যার বিনিময়ে অর্থাদি দান করিবেন। এ দেশের বংশজ এবং কষ্ট-শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত আছে। প্রাজাপত্য বিবাহে বর পক্ষ হইতে কন্যা প্রার্থনা করা হয়। বলা হইয়াছে যে, অসপিণ্ডা কন্যা গ্রহণ করিবে। মনু নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে,—

"অসপিণ্ডা চ যা মাতুরসগোত্রা চ যা পিতুঃ।
সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মনিমৈথুনে॥"

দ্বিজাতিগণের দারকর্ম্ম জন্য এবং পুত্রোৎপাদন উদ্দেশ্যে সেই কন্যাই প্রশস্তা, যে কন্যা বরের পিতার অসগোত্রা এবং মাতামহের সপিণ্ডা নহে। আর একটী বচন দ্বারা সপিণ্ড-সম্বন্ধ নিশ্চয় করা হইয়াছে, যথা,—

"পঞ্চমাৎ সপ্তমাদূর্দ্ধং মাতৃতঃ পিতৃতঃ ক্রমাৎ।
সপিণ্ডতা নিবর্ত্তেত সর্ব্ববর্ণেষ্বয়ং বিধিঃ॥"

অর্থাৎ—সকল বর্ণের জন্য মাতামহ পক্ষে ঊর্দ্ধ পঞ্চম পুরুষ এবং পিতৃপক্ষে ঊর্দ্ধ সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত সপিণ্ডতা বর্ত্তমান থাকে। অপর শুদ্ধিতত্ত্বে আছে যে,—

"সপিণ্ডতা তু সর্ব্বেষাং গোত্রতঃ সাপ্তপৌরুষী।" মোটামুটী নিম্নোক্ত এই কয় প্রকারের কন্যা বিবাহ নিষিদ্ধ ;—

(১) পিতার সপিণ্ডা ও সগোত্রা কন্যা।

(২) মাতামহ বংশের সপিণ্ড সম্বন্ধ পর্য্যন্ত, অর্থাৎ ঊর্দ্ধ পঞ্চম পুরুষ পর্য্যন্ত।

(৩) পিতৃবন্ধু সম্বন্ধে সপ্তম পুরুষ বর্জ্জন করিবে।

(৪) মাতৃবন্ধু সম্বন্ধে পঞ্চমী কন্যা বর্জ্জন করিবে।

পিতৃবন্ধু—পিতার পিসিত ভাই, মাসিত ভাই এবং পিতার মাতুল পুত্র। মাতৃবন্ধু—মাতার মাসিত ভাই, পিসিত ভাই এবং মাতুল পুত্র। আবার বচন আছে যে,—

"সর্ব্বাঃ পিতৃপত্ন্যঃ মাতরঃ, তদ্‌ভ্রাতরোপি মাতুলাঃ, তদ্‌দুহিতরোভগিন্যস্তদপত্যানি ভাগিনেয়ানি তাশ্চবিবাহ্যাঃ॥"

অর্থাৎ পিতার সকল পত্নীই মাতৃতুল্যা, তাঁহার ভ্রাতৃগণ মাতুল তুল্য, তাহার কন্যা সকল ভগিনী তুল্যা এবং তাহাদের অপত্যগণ ভাগিনেয় তুল্য। বিমাতার ভগিনী মাতৃশ্বস্রবৎ সেব্যা—মাতৃতুল্যা। কিন্তু দেশাচার-ভেদে এ সকল শাস্ত্র-বচনের তেমন মান্য নাই।

যথাশাস্ত্র বেদোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শুভলগ্নে সামাজিক মাণ্ডলিকগণের সমক্ষে অগ্নি ও নারায়ণকে সাক্ষী রাখিয়া কন্যাদান কার্য্য সমাধা করিতে হইবে। বর, কন্যা-গ্রহণ স্বীকার করিলে কামস্তুতি করিবেন। যথা,—

"ওঁ ক ইদং কস্মা অদাৎ, কামঃ কামায়াদাৎ কামোদাতা কামঃ প্রতিগ্রহীতা কামঃ সমুদ্রমাবসেৎ, কামেন ত্বাং প্রতিগৃহ্নামি কামৈতত্তে।"

এই বৈদিক কামস্তুতি ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য সকল জাতীয় বরই বঙ্গ-

দেশে পাঠ করিয়া থাকে। ইহার পর বিবাহ-সংস্কার-কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়। এই সংস্কার-কার্য্যের তিনটী স্তর আছে। যথা, পাণিগ্রহণ, উত্তর বিবাহ, এবং শেষ সংস্কার। পাণিগ্রহণের চারিটী অঙ্গ আছে। (১) লাজহোম অর্থাৎ শমীর সহিত লাজ বা খই মিশ্রিত করিয়া হোম; (২) শিলারোহণ; শিলের উপর দাঁড়াইয়া বেদমন্ত্র পাঠ ও অঙ্গীকার; (৩) সপ্তপদী গমন; (৪) অঙ্গুষ্ঠগ্রহণ। উত্তর বিবাহ কার্য্যেরও চারিটী অঙ্গ আছে। যথা,—(১) অনড়ুচ্চর্ম্মোপবেশন; (২) ধ্রুবতারাদর্শন; (৩) অনুরাধা বা অরুন্ধতী দর্শন; (৪) পতিগোত্রাভিবাদন, অর্থাৎ কন্যা পতির সম্মুখে নতজানু হইয়া বসিয়া পতির গোত্রে সগোত্রা হইলাম বলিয়া স্বীকার করিবেন। শেষ কার্য্যের—সমাবর্ত্তনের পাঁচটী অঙ্গ আছে। (১) চরুহোম; (২) ধৃতিহোম; (৩) গৃহপ্রবেশ; (৪) যানারোহণ ও সমাপনহোম; (৫) চাতুর্থহোম। এই কয়টী কার্য্য শেষ হইলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ স্থির হইবে; স্ত্রী বা রমণী তখন ধর্ম্মপত্নী পদবাচ্যা হইবেন। ইহার পর সামাজিক কর্ম্ম—পাকস্পর্শ। স্বগৃহে এবং স্বগোত্রে ত বরকর্ত্তা কন্যাকে গ্রহণ করিলেন, যথাবিধি শ্রৌতকর্ম্ম করিলেন; কিন্তু জ্ঞাতিগণ এবং স্বসমাজের সামাজিকগণ তাহা গ্রাহ্য করিলেন কি না, তাহা ব্যক্ত করিবার উদ্দেশ্যে পাকস্পর্শের ভোজ। পাকস্পর্শ শেষ হইলে আপাততঃ সকল কার্য্য শেষ হইল বটে, কিন্তু গর্ভাধান সম্পন্ন না হইলে স্বামী-স্ত্রী এক গৃহে পতি-পত্নীরূপে বাস করিতে পারিতেন না। নবোঢ়া কন্যার কন্যকাকাল উত্তীর্ণ হইলে, গর্ভাধান সংস্কার শেষ হইলে তবে সে পতিমুখ সন্দর্শন করিতে পাইত। ইহার পূর্ব্বে স্বামী-স্ত্রীর সাক্ষাৎকার ও সম্ভব হইত না। এখন সে সব আর নাই।

একটি প্রশ্ন।

এখন আমার একটু জিজ্ঞাস্য আছে। আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ, এই তিন প্রধান জাতি। কেবল ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যের মধ্যে বিবাহ সংস্কারের সকল পদ্ধতি অনুযায়ী কার্য্য করা হয়। কায়স্থগণের মধ্যে সম্প্রদান ব্যতীত বিবাহের অন্য কোন কার্য্যই যথাবিধি করা হয় না। আমি কায়স্থগণকে হীন শূদ্র বলিতে প্রস্তুত নহি; বোধ হয় শাস্ত্র-বচন প্রমাণে তাঁহাদিগকে শূদ্র প্রতিপন্ন করা কঠিন হইবে। শূদ্র হইলেও

কেবল বিবাহ তাঁহাদের পক্ষে একমাত্র সংস্কার। হিন্দু-সমাজে থাকিয়া সে সংস্কার কার্য্য যথাবিধি প্রতিপালিত কেন না হইবে? কেবল খড়ের উপর খই দগ্ধ করিলে এবং টোপরপরা বরের চারিপার্শ্বে সাতবার পাক দিলেই কি বৈবাহিক অধ্যাত্ম সম্বন্ধ স্থির হইবে? যাহা না করিলে বীজগর্ত্ত দোষ প্রক্ষালিত হয় না, যাহা না করিলে গৃহস্থ পদবাচ্য হওয়া যায় না, যাহা না করিলে কোন কাম্যকর্ম্মে অধিকার হয় না, যাহা না করিলে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে কেবল পাশব কামজ সম্বন্ধই স্থির থাকে, অধ্যাত্ম সম্বন্ধ হয় না—সেই বিবাহ-সংস্কার কার্য্য কায়স্থগণের মধ্যে যথা-বিধি প্রতিপালিত হইবে না কেন? পশ্চিমোত্তর এবং পঞ্জাব প্রদেশের কায়স্থগণের সহিত বাঙ্গালার কায়স্থগণের ব্যবহারিক পার্থক্য অত্যধিক। ইংরাজি আইনের দৃষ্টিতে বাঙ্গালার কায়স্থ শূদ্র; সামাজিক দৃষ্টিতে—অশৌচাদিব্যবস্থায় বাঙ্গালার কায়স্থ শূদ্রাচরণশীল। তাই বলিয়া কি শূদ্রের পক্ষেও একমাত্র কর্ত্তব্য বিবাহ-সংস্কার কার্য্যে কায়স্থগণের এমন অনধিকার থাকিবে? শ্রাদ্ধাদিকর্ম্মে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়, কায়স্থগণ শূদ্রবৎ হইলেও তাঁহাদের পিতৃ-মাতৃশ্রাদ্ধ কার্য্যের কোন অঙ্গহানি হয় না; যথানির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থামত কার্য্য হইয়া থাকে। যত গোল এই বিবাহের কুশণ্ডিকায়। যথাবিধি বিবাহ-সংস্কার না হইলে, সেই স্ত্রীগর্ত্তজাত পুত্রকে কামজপুত্র বলিতে হইবে। কামজপুত্র পিতৃপিণ্ডাধিকারী নহে। এই কথা কায়স্থগণ স্বীকার করিলে আইনের অনেক গোল উঠিবে। যদি বলা যায় যে, দেশাচার মান্য, এবং দেশাচার জন্যই বাঙ্গালার কায়স্থগণের মধ্যে বিবাহ-পদ্ধতির বিষম অঙ্গহানি হইয়াছে। তাহা হইলে শাস্ত্র-বচনকে প্রামাণ্য বলিয়া শিরোধার্য্য করা অপ্রয়োজন। সম্প্রতি আইনের আন্দোলনের সময় বাঙ্গালার বহু ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ বিবাহের অধ্যাত্মিকতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য সবিশেষ যত্নবান্ হইয়াছিলেন; কিন্তু বাঙ্গালী কায়স্থগণের মধ্যে যে ভাবে বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহাতে নবোঢ়া স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে শ্রৌত অধ্যাত্ম সম্বন্ধ জন্মিতে পারে না। আমি জানি, বাঙ্গালার—বিশেষ কলিকাতার দুই একটী প্রসিদ্ধ কায়স্থগৃহে বিবাহ কার্য্য সার্ব্বাঙ্গীন সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। অন্যের পক্ষে তাহা হইবে না কেন?

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

ছায়াসতী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বালিকা-বিদ্যালয়।

"আহা, বহিগুলি চারিদিকে মম,
ছড়িয়ে পড়িয়ে র'য়েছে আজ।
অতি দুঃখিনী বালিকার সম,
ধূলায় ধূসর মলিন সাজ॥"—বঙ্গসুন্দরী।

গঙ্গার পশ্চিম তীরবর্ত্তী হাবড়া গ্রামের বালিকা বিদ্যালয়ের একটি গৃহে বিংশতিটী বালিকা পাঠ ও সীবনশিক্ষা করিতেছে, দুইজন শিক্ষয়িত্রী শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বালিকাদিগের বয়ঃক্রম অষ্টম হইতে দ্বাদশাবধি। বিদ্যালয়স্থ ঘটিকায় চারিটা বাজিল, বালিকাগণ আপন আপন বহি ও সূচীকর্ম্ম নিজ নিজ বাক্সে রাখিল, এবং তিনটি বালিকা ব্যতীত সকল বালিকাই বিদ্যালয় হইতে প্রস্থান করিল। প্রধানা গুরুমাতা সস্মিতাননে কহিলেন, "আমার ইন্দ্রপ্রিয়ার মত কেহই পরীক্ষা দিতে পারে নাই।" উপস্থিত তিনটি বালিকার মধ্যে একটির নাম ইন্দ্রপ্রিয়া। ইন্দ্রপ্রিয়া দ্বাদশ বর্ষীয়া নিরুপমা সুন্দরী, যেন একটি মোমের পুত্তলি, সেরূপ বর্ণের তুলনা সহজে পাওয়া যায় না। সে সুন্দর নয়নে নয়ন মিলিত হইলে সহজে অপসৃত হয় না। বলা বাহুল্য, ইন্দ্রপ্রিয়ার প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই অনুপম-লাবণ্য-জড়িত। গুরুমাতার কথা শুনিয়া ইন্দ্রপ্রিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "মাসীমা, অন্য লোকে বলিবে যে, আমি আপনার স্নেহপাত্রী বলিয়া, অধিকতর যত্নে শিক্ষিত হইয়াছি।" দ্বিতীয়া গুরুমাতা বলিলেন, "না ইন্দ্র-প্রিয়া! তাহা হইলে মিস্ মিচেল্ কেন তোমার গীতবাদ্যের এত প্রশংসা করেন? বলেন, তোমার মত সুন্দররূপে হারমোনিয়ম্ বাজাইতে অনেক সুশিক্ষিতা ইংরেজ মহিলাও পারেন না।" ইন্দ্রপ্রিয়া হাস্যমুখে সঙ্গিনী বালিকাদ্বয়কে বলিল, "মতি! রজনী! এস ভাই! আমরা কাপড় কাচিগে, বেলা গেল।" বালিকাগণ প্রস্থান করিলে দ্বিতীয়া গুরুমাতা বলিলেন,

"ইন্দ্রপ্রিয়ার মত সরলা বালিকা আজকাল প্রায় দেখা যায় না, এবং অত সুন্দরী ও সরলা হইলে বিপদ পদে পদে ঘটে।" প্রধানা চিন্তিত অন্তরে বলিলেন, ঈশ্বরানুগ্রহে আমাদের বিদ্যালয়ের স্থাপনাবধি কোন বিপদই ত ঘটে নাই, তাহার কারণ, বালিকারা কেহই এখানে বাস করিত না। দ্বিতীয়তঃ দ্বারবান ও আমাদের দুইজনার প্রাচীন স্বামী ব্যতীত অপর কোন পুরুষ এখানে থাকে না, সকল কর্ম্মচারীই স্ত্রীলোক। এক্ষণে উপস্থিত চিন্তা এই যে, ইন্দ্রপ্রিয়াকে সত্বর তাহার মাতার নিকট পাঠাইতে পারিলেই স্বচ্ছন্দ হই। কারণ, বালিকা যৌবনোন্মুখী হইয়াছে, তোমার ভাইজী দুইটী আরও দুই তিন বৎসর শিক্ষা করিতে পারিবে, যেহেতু উহারা খর্ব্বাকৃতি ও ইন্দ্রপ্রিয়া অপেক্ষা বয়োকনিষ্ঠা।" এইরূপ কথোপকথনের পর গুরুমাতাদ্বয় নিজ নিজ কর্ম্মে প্রস্থান করিলেন।

একদিবস ইন্দ্রপ্রিয়া আহারাদি সমাপনান্তে বৈকালে নিজ শয়নকক্ষস্থ বাতায়নে উপবিষ্ট হইয়া গলাবন্ধ বুনিতেছে, মন অন্যমনস্ক, তাহার পুস্তকগুলি এদিক ওদিক পতিত রহিয়াছে। এক একবার ক্লিষ্টমনে সেইদিকে চাহিয়া দেখিতেছে, যে কাজ করিতেছে, তাহাও ঠিক হইতেছে না, এক একবার দুই চারিটা ফাঁস তুলিয়া নতমুখে ভাবিতেছে। সহসা তাহার করস্থ পশমের গোলা হস্তচ্যুত হইয়া নিম্নে পার্শ্বস্থ উদ্যানে পতিত হইল। বালিকা উৎকণ্ঠিতামনে সেই দিকে চাহিল। দুইজন যুবক উদ্যানে পদচারণ করিতেছিলেন, তন্মধ্যে বয়োকনিষ্ঠ ব্যস্ত হইয়া গোলাটী তুলিয়া দিতে আসিলেন। ইন্দ্রপ্রিয়া যে বাতায়নে বসিয়াছিল, যদিও তাহা ঐ উদ্যান হইতে অধিক উচ্চে স্থিত নহে, তথাপি দাঁড়াইলে তথায় হস্ত পৌঁছে না, সুতরাং গোলাও পৌঁছিল না। এইজন্য যুবক দ্বিতীয় যুবককে বলিলেন, "অতুল! ঐ চিনের মোড়াটা আনিয়া দাও।" দ্বিতীয় যুবক তাহা আনিতে সত্বর প্রস্থান করিল।

বয়ঃকনিষ্ঠ যুবকের বয়ঃক্রম ১৭।১৮ বৎসর, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, মনোহর মুখ, হস্ত-পদগুলি রূপের উপযুক্ত সৌষ্ঠববিশিষ্ট, অঙ্গুলিতে হীরকাঙ্গুরী, হস্তে সুবর্ণমণ্ডিত ছড়ি এবং পরিধানে সাটীনের জামা, তাহাতে ঘড়ির চেন লম্বিত। যুবককে দেখিলেই উচ্চ বংশজ ও ধনাঢ্য বলিয়া প্রতীতি হয়। বয়ঃজ্যেষ্ঠ দ্বিতীয় যুবক, প্রথম যুবকের চাটুকার—শ্যামবর্ণ, কুটিল চক্ষু খোঁচা খোঁচা চুলে চক্‌চকে, বাঁকা সিঁতা কাটা, কুৎসিৎ দাড়ি, দেখিতে

কতকটা বোকা ছাগলের মত। সে হুকুম অনুসারে মোড়া আনাতে ইন্দ্রপ্রিয়া পশমের গোলা পাইল, কিন্তু লজ্জিতমুখে গোলা লইতে গিয়া করস্থিত রুমাল পতিত হইল। পূর্ব্বোক্ত বয়োকনিষ্ঠ যুবক পুনরায় অনুগত ভৃত্যের ন্যায় রুমাল তুলিয়া দিতে দিতে হাস্যমুখে মৃদুস্বরে বলিলেন, "সুন্দরি! অধীনকে কিছু পুরস্কার করিও।" যুবকের কোমলস্বর ইন্দ্রপ্রিয়ার কর্ণে বীণার ঝঙ্কার দিল, সরলা বালিকা লজ্জারক্তিমমুখে বাতায়ন হইতে প্রস্থান করিল। অতুল হাসিতে হাসিতে বলিল, "কুমার! ভুলাতে পারিলে না? রমণীমোহন নামে কলঙ্ক রাখিলে?" কুমার অন্যমনস্কভাবে উত্তর করিলেন, "না ভাই! ওরূপ অতুলনীয়া সুন্দরী ললনাকে পাপপঙ্কে ফেলিব না, ইচ্ছা হইতেছে, বিবাহ করি।"

অতুল মনে মনে দুঃখিত হইল, কারণ কুমারের করচ্যুতরত্ন তিনিই ভোগ করিয়া থাকেন, বিবাহ হইলে তাহার আয়ত্তের বাহিরে হইবে, সুতরাং বলিল, "হুঁ! রাজা কি ঐ সামান্য বালিকাকে বিবাহ করিতে মত দিবেন? আমি তোমার আগে সন্ধান লইয়াছি, ঐ সুন্দরী কোন্নরের জনৈক কুলীন কায়স্থের কন্যা, উহাদের বিশেষ কোন সম্পত্তি নাই। সামান্য একটু তালুক আছে, তাহাতেই উহাদের জীবিকা-নির্ব্বাহ হয়। বালিকার পিতাও নাই, কেবল একটী ভ্রাতা আছে, প্রায় দুই বৎসর হইল, এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা করিতে আসিয়াছে, বিদ্যালয়ের কর্ত্রী উহার মাসী হয়।" কুমার ধীরে ধীরে বলিলেন, "তুমি এ সব সন্ধান কোথায় পেলে?" অতুল বলিল, "ঐ বালিকার সহিত এক বৃদ্ধা পরিচারিকা আসিয়াছে, তাহার সঙ্গে আমার কথাবার্ত্তা হইয়াছে।" কুমার সস্মিতাননে কহিলেন, "সেই দাসীকে একবার ডাক্‌তে পার?" অতুল ত্বরিতপদে উদ্যান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমনুজেন্দ্রনাথ দত্ত।

ত্রিত্ব—দেবত্বে ও কবিত্বে।

(ত্রিত্বেই একত্ব—একত্বেই ত্রিত্ব।)

হিন্দুর শাস্ত্র, ত্রিত্বে পরিব্যাপ্ত। জগৎসৃষ্টিতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—তিন দেবতার প্রভুত্ব, অত্যন্তই অব্যাহত। রজঃ, সত্ত্ব, তমঃ—এই ত্রিগুণও, যথা-ক্রমে তাঁহাদেরই গুণদ্যোতক। শঙ্কর, ত্রিনেত্রের অধিকারী বলিয়াই, তাঁহার এক নাম—'ত্রিলোচন'। শঙ্করীও, সেই কারণেই 'ত্রিনয়না'। অধিক কি, ঋক্, যজুঃ ও সামেই—বেদশাস্ত্রের সর্ব্বত্রই পরিপূর্ণ। হিন্দুর মহারাধ্যা, পরমপূজ্যা—বেদবিদ্যা বা "শ্রুতি"। শ্রুতিশাস্ত্রও, "ত্রয়ী" বলিয়াই বিদিত। "বেদেরই" নামান্তর "শ্রুতি"। শিষ্যশ্রেণীর শ্রবণ-পরম্পরায় "বেদের" উপ-দেশ ও শিক্ষা, অধ্যয়ন ও অধ্যাপন, সুসম্পন্ন হইত বলিয়াই তো, 'বেদবিদ্যা' ঐ আখ্যা পাইবার অধিকার লাভ করিয়া আসিয়াছে।

বৈদিক গ্রন্থ ও বৈদিক সমস্ত সাহিত্য, বিঘোষিত করিয়া দিয়াছে,—পরমাত্মা, ঐ তিনেরই সমষ্টি ও ব্যষ্টি। অর্থাৎ একেই তিন—অথবা তিনেই, এক—এই মতটী, বেদাদি শাস্ত্র, সমর্থিত করিয়া দিয়াছেন।

ঋগ্বেদ-সংহিতায় স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে,—

"একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি,
ইন্দ্রং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ।"

অর্থাৎ ঈশ্বর, একমাত্র ও অদ্বিতীয়; কিন্তু বেদজ্ঞ বিপ্রবর্গ, তাঁহাকে কেহ, "ইন্দ্র"—কেহ, "যম"—কেহ বা, "পবন" বলিয়া থাকেন। পরবর্ত্তি গ্রন্থকার-নিকর, উক্ত মহাধ্বনির প্রতিনিধিমাত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক তার-স্বরে গগন-বিদারণানন্তর নির্ভীক অন্তরে ঘোষণা করিয়াছিলেন,—পুরাণতম পরমপুরুষ, ত্রিধা বিভক্ত। যথা,—

(ক) **"ত্রিস্র এব দেবতাঃ।"**—শ্রুতিঃ।

(খ) **"স এতাস্তিস্রো দেবতা অভ্যতপৎ।"**

—ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৪।১৭।২।

(গ) **"ইমাস্তিস্রো দেবতাঃ।"**—ঐ, ৬।৩।২।

(ঘ) ঐ ঐ ।—ঐ, ৬।৩।৩।

(ঙ) ঐ ঐ ।—ঐ, ৬।৩।৪।

(চ) **"ইমাস্তিস্রো দেবতাঃ।"**—ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৬।৪।৭।

(ছ) ঐ ঐ ।—ঐ, ৬।৮।৬।

'ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর'—এই দেবতা-ত্রিতয়, পরমাত্মা ভগবানেরই সমষ্টি *। ব্যষ্টি-ভাবেও দেখিলে, ঐ তত্ত্বই, নিগূঢ় দৃষ্টিতে অভিব্যক্ত হইবার কথা বটে। যথা,—

(১) বিষ্ণুপুরাণ-কার, বলিয়া গেলেন;—

"সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ।"

(২) মহর্ষি ভগবান্ কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন "মহাভারতে" বলিয়া গিয়াছেন,—

"সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ।"

(৩) অধিক কি, অতি অধিক কালেরও নয়, ভগবানের মহান্ ভক্ত কবি রামপ্রসাদও, ভাব-গদ্গদ চিত্তে আত্মহারা হইয়া গাহিয়াছিলেন;—

"মন ক'রো না দ্বেষাদ্বেষি।
যদি হবি রে কৈবল্যবাসী॥
রামরূপে ধর ধনু, কৃষ্ণরূপে বাজাও বাঁশী,
শিবরূপে ধর শিঙ্গা, কালীরূপে ধর অসি॥"

(৪) আবার কমলাকান্তের একটি গীতে আছে,—

"জান না রে মন পরম কারণ, শ্যামা শুধু মেয়ে নয়,
মেঘের বরণ করিয়া ধারণ, কখন কখন পুরুষ হয়।
কভু বাঁধে ধড়া, কভু বাঁধে চূড়া, ময়ূরপুচ্ছ শোভিত তায়।
কখন পার্ব্বতী, কখন শ্রীমতী, কখন জানকী হয়॥
যেরূপে যে জন, করে রে সাধন, সেইরূপে তার মানস রয়।
কমলাকান্তের হৃদি সরোবর, কমলে কামিনী হয় উদয়॥"

(৫) তালা-দামিন্যায় (বর্দ্ধমান জেলার দক্ষিণ ভাগে) কবিকঙ্কণ ৺মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তি-বংশীয়দিগের বাড়ীতে কবিবরের যে নিজের পূজ্য পিত্তলনির্ম্মিত ইষ্টমূর্ত্তি আছে, তাহার এক দিকে কালীমূর্ত্তি, অপর দিকে

---

* এই তিন হইতেই, আবার তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীর উদ্ভব হইয়াছে। অক্ষয়কুমার দত্ত বাবুর সঙ্কলিত "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" প্রথম ভাগ দেখ।

কৃষ্ণমূর্ত্তি। কোন্ দিক্ সম্মুখ, কোন্ দিক্ পশ্চাৎ, বুঝিবার যো নাই! কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতেও লিখিত আছে ;—

"এক দেব নানামূর্ত্তি হইল মহাশয়।
হেম হ'তে বস্তুতঃ কুণ্ডল ভিন্ন নয়॥"

(৬) অন্নদামঙ্গলে হরিহরের অভেদত্ব-সম্বন্ধে ব্যাসদেবের উপলক্ষে অনেক কথাই আছে। ফলতঃ, সাধারণ বাঙ্গালীকে এ বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য সেই প্রাচীন কাল হইতে আর ৺ রামকৃষ্ণদেবের সময় পর্য্যন্ত বরাবরই ঐ চেষ্টা চলিতেছে। শাস্ত্রবাক্যের ভাষান্তর করিয়াই যে কবি ও সাধকগণ, গান রচনা করিয়াছিলেন, তাহা শাস্ত্রদর্শীরাই বুঝেন।

(৭) মহাপুরাণ ব্রহ্মবৈবর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মখণ্ডে লিখিত হইয়াছে ;—

"প্রভবোঽহঞ্চ সর্ব্বেষামীশ্বরঃ পরিপালকঃ।
তথাপি ন স্বতন্ত্রোঽহং ভক্তাধীনো দিবানিশম্॥
গোলোকে বাথ বৈকুণ্ঠে দ্বিভুজঞ্চ চতুর্ভুজম্।
রূপমাত্রমিদং সর্ব্বং প্রাণা মে ভক্তসন্নিষ্টে॥"

অর্থাৎ আমি, সকলের প্রভু, নিয়ামক এবং পরিপালক হইলেও, স্বাধীন নহি। কারণ, আমি সততই ভক্তের অধীন। আমি গোলোক অথবা বৈকুণ্ঠে দ্বিভুজ, অথবা চতুর্ভুজ যে মূর্ত্তিতেই থাকি না কেন, সেই সমস্তই, আমার রূপ মাত্র। আমার প্রাণ, কিন্তু ভক্তের নিকটেই থাকে।

(৮) গীতায় লিখিত আছে ;—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ! সর্ব্বশঃ॥"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি, আমাকে যেরূপে ভজনা করে, আমি তাহাকে সেই-রূপেই দর্শন দিয়া থাকি। হে পৃথা-পুত্র অর্জ্জুন! মনুষ্যগণ, আমার পথই অনুসরণ করিয়া থাকে।

(৯) আবার এক স্থলে আছে ;—

"সৌরাশ্চ শৈবা গাণেশাঃ বৈষ্ণবাঃ শক্তিপূজকাঃ।
মামেব তে প্রপদ্যন্তে বর্ষাম্ভঃ সাগরং যথা।
একোঽহং পঞ্চধা জাতঃ ক্রীড়ার্থাং নামভিঃ কিল॥"

অর্থাৎ বৃষ্টির জল, যে দিক্ দিয়াই গমন করুক না কেন, অবশেষে যেমন সমুদ্রে মিলিত হয়, সেইরূপ শৌর, শৈব, গাণপত্য, বৈষ্ণব এবং শাক্তগণ, আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আমি (পরমা গতিঃ), এক হইয়াও, লীলার জন্য নানারূপ নামধারণ করিয়াই, পঞ্চমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া থাকি।

(১০) "যথা শিবস্তথা দুর্গা যা দুর্গা বিষ্ণুরেব সঃ।
অত্র যঃ কুরুতে ভেদং স নরো মূঢ়দুর্ম্মতিঃ॥
দেবী-বিষ্ণু-শিবাদীনামেকত্বং পরিচিন্তয়েৎ।
ভেদকৃন্নরকং যাতি রৌরবং নাত্র সংশয়ঃ॥"

অর্থাৎ শিব যেরূপ,—দুর্গাও সেইরূপ। যিনিই দুর্গা, তিনিই বিষ্ণু। এ বিষয়ে যে ব্যক্তি, ভেদজ্ঞান করে, সে অতি মূঢ় এবং দুর্ম্মতি। শিব, শক্তি, বিষ্ণু-প্রভৃতির অভেদ ভাবনা করিবে। ভেদকারী ব্যক্তি, রৌরব নরকে গমন করিয়া থাকে ; ইহাতে আর সন্দেহ নাই।

খ্রীষ্টধর্ম্মেও ত্রিত্ব, সুব্যক্ত। যথা ;—

(1) God the Father (পিতা—ঈশ্বর)।
(2) God the Son (ঈশ্বর—পুত্রস্থানীয়)।
(3) Holy Ghost (পবিত্রাত্মা)।

১। ভারতীয় ভারতীতে কবিত্বেও দেখ, ত্রিত্বের কতই বা সুন্দর প্রভুত্ব, সুস্পষ্ট প্রকটিত! একটী কবির রচনা, পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইতেছে। কবিতা, বীণাপাণির বদন-নিঃসৃত বাণী বলিয়া বিখ্যাত।

"জাতে জগতি বাল্মীকৌ, কবিরিত্যভিধাভবৎ।
কবীতি তত্তো ব্যাসে, কবয়স্ত্বয়ি দণ্ডিনি॥"

বাগ্‌বাদিনী, কবি দণ্ডীকে বলিয়াছিলেন ;—

বাল্মীকির জন্মগ্রহণে ধরাধামে এক কবির উদ্ভব হয়। তাহার পর মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাস, যখন ভূমিষ্ঠ হন,—ক্ষিতি, তখন দুই কবির অস্তিত্বে গৌরবান্বিত। আর এক কবি তুমি "দণ্ডী"। তোমারই আবির্ভাবে কবি-পদবীর ত্রিত্ব! কিন্তু পশ্চাৎ দৃষ্ট হইবে, ত্রিত্বই, আবার বহুত্বের বিনাশক।

২। প্রবাদ আছে,—দিগ্বিজয়-ব্যাপারে এক বার মহকবি কালিদাস, বহির্গত হইয়া, কর্ণাট-সম্রাট্-পুরীতে মহারাজকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। তখন মহিষীর বদন হইতে বহির্গত হইল,—

"একোঽভূন্নলিনাৎ, পরস্তু পুলিনাৎ, বল্মীকতশ্চাপর-
স্তে সর্ব্বে করয়স্ত্রিলোক-গুরবস্তেভ্যো নমস্কুর্ম্মহে।
অর্ব্বাঞ্চো যদি গদ্য-পদ্য রচনৈশ্চেতশ্চমৎকুর্ব্বতে,
তেষাং মূর্দ্ধ্নি দধামি বামচরণং কর্ণাটরাজপ্রিয়া॥"

(১ম) "নলিন" (কমল) হইতে এক কবির উৎপত্তি। পদ্মযোনি বিরিঞ্চিই, সুতরাং ভারতের প্রথম ও আদিম কবি। (২য়) "বল্মীক" হইতে আর এক কবির আবির্ভাব। অতএব "বল্মীকি" দ্বিতীয় কবি। (৩য়) "পুলিনে" অপর কবির উদয় হয়। তিনিই কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব। তাঁহাকেই "তৃতীয় কবি" এই মহতী আখ্যা প্রদত্ত হয়। তাঁহারা তিন-জনেই তো স্ব স্ব গুণে ও জ্ঞানে—মানে ও জীবনে, জগৎ-পূজ্য—ত্রৈলোক্য-গুরু! তাঁহাদের চরণে বার বার নমস্কার করি। এতদ্ভিন্ন অন্য কাহারও কাহারও পদ্যগদ্যময়ী রচনায় যদি লোকের অন্তর, চমৎকৃত হয়, তাহা হইলে, কর্ণাট-সম্রাট্ আমি, তাহাদের শিরে বামপদ প্রদান করি। অথবা তাঁহাদের দক্ষিণেতর (বাম) চরণ, শিরে ধারণ করি।

কবিতার শেষ ভাগে ব্যাখ্যার যে বৈপরীত্যই হউক, এখানেও তিন কবি। বাল্মীকি ও বেদব্যাস, উভয়ত্র সমান। প্রথম শ্লোকে "দণ্ডী" তৃতীয় কবি। আর, এখানে "ব্রহ্মা" প্রথম কবি। এইটুকুই অমিল। আসলে অসাম্য কোথায়?

৩। এই বার আসরে আবার অপর ধরণের কবির সমাগম। এক উদ্ভট কবি, লিখিলেন,—

"তাবদ্ভা ভারবের্ভাতি, যাবন্মাঘস্য নোদয়ঃ।
উদিতে নৈষধে কাব্যে, ক্ব মাঘঃ ক্ব চ ভারবিঃ॥"

এ-স্থলেও তিন জনেই, প্রধান ও সর্ব্বেসর্ব্বা। ভারবি, মাঘ ও শ্রীহর্ষ—এই তিন কবি। কবিত্রয়ের পরিচয় এই,—মাঘ কবির "শিশুপালবধ"-কাব্যের পূর্ব্বে ভারবির "কিরাতার্জ্জুনীয়ের" গৌরব ছিল। শ্রীহর্ষের উদয়ে ও অভ্যুদয়ে, "নৈষধচরিতরে" আবির্ভাবে কোথায় কবি "ভারবি" আর কোথায়ই বা "মাঘ" মহাকবি? পাঠক দেখিতে পাইলেন, বাল্মীকি বেদব্যাসের সুনাম এই ক্ষেত্রে অনুল্লিখিত! লিপিটী "নৈষধচরিতের" গোঁড়া ভক্তেরই যোগ্য।

ইয়ুরোপ ভূমিও, কবিত্বের ত্রিত্ব বাদে অবাধে ভারতের ভারতীতে সায় দিয়া গিয়াছেন। স্বয়ং স্বাক্ষর করিতে অক্ষম হওয়ায়, যেন সুকেশী ইয়ুরোপ-ভূমির বকলম দেওয়া বা ঢেরা সহি করা দস্তখত, আমাদের নিকট উপস্থিত,—

"Three poets in three distant ages born,
Greece, Italy, and England did adorn;
The first in majesty, the second in loftiness of thought.
The force of nature could no longer go,
And to make a third she joined the first two."

— *Ode to Vergil by Dante.*

ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ইয়ুরোপে কবি-ত্রয়ের উদয় হয়। তাহাতে উক্ত মহাদেশের কি অভ্যুদয়ই হইয়াছিল! সেই কবি-ত্রিতয়ে গ্রীস, ইতালী ও ইংলণ্ডের মুখমণ্ডল, কিরূপ উজ্জ্বলই হইয়াছিল! গ্রীসে হোমর, ইতালিতে বার্জ্জিল্ ও ইংলণ্ডে মিল্টনের জন্ম। গরিমা ও মহিমায়, গ্রীক্-কবি-বরেরই চমৎকারজনক গৌরবময় সমাদর। দ্বিতীয় কাব্য-কারক, ভাবের উচ্চতায় প্রখ্যাতিমান্। প্রকৃতি-সতী, প্রকৃতির প্রিয়পুত্র দুইটীকে প্রাগুপ্ত শক্তিদ্বয় সমর্পণ করিয়া, সামর্থ্যহীন ও নিঃসম্বল হইয়াছিলেন। নূতন ক্ষমতার অভাবে প্রথম ও দ্বিতীয়ের গুণই, অগত্যা তৃতীয়ে আরোপিত করিয়া দিয়া, প্রকৃতি-দেবী, নিশ্চিন্ত হইলেন! সুতরাং, বুঝিতে হইবে—মিল্টন্, দ্বিগুণশক্তিশালী ছিলেন।

মিল্টনানুরাগী কোন কবির এতাদৃশী উক্তি! সুতরাং এখানে যেন সেক্সপীয়র্ও, কেহই নহেন। ওদিকে হোমর এবং বার্জিল, পীর ও পয়গম্বর।

৪। আরও এক কবির সন্দর্শন পাওয়াও, আবশ্যক হইতেছে। সেই কবির কথাগুলির এক্ষণে বিচারের প্রয়োজন হইয়াছে।

"উপমা 'কালিদাসস্য' 'ভারবে'রর্থগৌরবং।
'নৈষধে'পদ-লালিত্যং, 'মাঘে' সন্তি ত্রয়ো গুণাঃ॥"

এইখানেই কবি-চতুষ্টয়ের সঙ্গে পাঠককুলের এই প্রথম সাক্ষাৎ! তাঁহাদের নাম, যথাক্রমে—কালিদাস ও মাঘ, ভারবি ও শ্রীহর্ষ। এইখানেই ঐ কবিদের সঙ্গে সম্বন্ধ-ত্যাগ হইল। এখন তাঁহাদের নাম ছাড়িয়া, তাঁহাদের কাব্যের গুণাগুণের বিচার চলুক। উপমায় কালিদাস; অর্থগুরুত্বে ভারবি; নৈষধকার

শ্রীহর্ষের ভূরি ভূরি পদমাধুরী। কিন্তু মাঘকাব্যে একাধারে "উপমা" "অর্থ-গৌরব" এবং "পদবিন্যাস-লালিত্য" এই ত্রিগুণের সমষ্টি।

"নৈষধ-চরিত" দার্শনিক কাব্য। দর্শনশাস্ত্র-ভক্ত কবির প্রাণে নৈষধের রচনার লালিত্য ও মধুরত্বের ধারা—স্রোতঃ বহিয়াছে। বস্তুতঃ, "শিশুপাল-বধেই" বা ঔপম্যালঙ্কার, অর্থ-গাম্ভীর্য্য, পদাবলীর মাধুর্য্য—এই তিন গুণের সমাবেশ কোথায়? এস্থলে মাঘের কাব্যে যথেষ্ট অতিভক্তি—অযথা শ্রদ্ধা, অত্যন্তই অভিব্যক্ত।

৫। আর এক কবির ভাবও, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অভাবনীয়-ভাবে একান্ত প্রযুক্ত হইবার পক্ষে সুযোগ্য। সেই সুন্দর সন্দর্ভটী পাঠক দেখুন।

"পুষ্পেষু জাতী, নগরেষু কাঞ্চী, নারীষু রম্ভা, পুরুষেষু বিষ্ণুঃ।
নদীষু গঙ্গা, নৃপতৌ চ রামঃ, কাব্যেষু মাঘঃ, কবি-কালিদাসঃ॥"

জাতী তাবৎ জাতীয় পুষ্পের রাণী। "কাঞ্চী" না কি 'বিরিঞ্চি'-বাঞ্ছিত নগরী! সুতরাং "কাঞ্চীকে" অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করা, অসাধু-উদ্দেশ্যমূলক। ফলে, উহা বিগর্হণীয় নয়। বরং কাঞ্চী, মনোহরী "পুরী"-রাজ্যের মহা-রাজ্ঞী-স্বরূপা। রম্ভা, সৌন্দর্য্যাড়ম্বরশালিনী রমণী-জনাগ্রগণ্যা। বিষ্ণুই, পুরুষ-সত্তম। মন্দাকিনী, তটিনীকুলের ও সর্ব্বসাধারণের পাবনা ও মোক্ষদায়িনী। রাঘবই, গরিষ্ঠ ও রাজশ্রেষ্ঠ।

"মাঘ" কাব্য—তাবৎ কাব্যের শীর্ষস্থানীয়। কালিদাস, কবি-শিরোমণি ও কবি-পিক-চূড়ামণি। স্বয়ং বাগ্বাদিনীর সাক্ষাৎ বাণীই, উক্ত ধ্বনির প্রতি-ধ্বনিকারিণী।

এই বার অদ্বিতীয় কবির কথাই কহিতে হইতেছে। তাহা হইলেই ত্রিত্ব হইতে কিরূপে একত্ব, সংঘটিত হইতেছে, তৎ-প্রসঙ্গ, সমর্থিত হইয়া যাইবে।

১। একটী সুরসজ্ঞ সদ্ভাবুক কবি, শ্লেষে শেষে কালিদাসের অশেষ যশোঘোষণার্থে কেমন মনোবিমোহন বচন বিন্যাস করিতে পারিয়াছিলেন, নিম্নে পাঠক, তাহার নিদর্শন নিরীক্ষণ করিয়া দেখুন না কেন,—

(ক) "কবয়ঃ কালিদাসাদ্যা মহাকবির্বররুচিঃ।
তরবঃ পারিজাতাদ্যাঃ স্নুহীবৃক্ষো মহাতরুঃ॥"

২। 'প্রসন্নরাঘব'-প্রণেতা "জয়দেব" †, একজন সুকবি। সেই সৎকবিও, কালিদাসকে "কবিকুল-গুরু" বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। সুস্পষ্টই তিনি বলিয়াছেন,—

(খ) "যস্যাশ্চোরশ্চিকুর-নিকরঃ কর্ণপূরো ময়ূরো,
ভাসো হাসঃ 'কবি-কুল-গুরুঃ' কালিদাসো বিলাসঃ।
হর্ষো হর্ষো হৃদয়বসতিঃ পঞ্চবাণস্তু বাণঃ,
কেষাং নৈষা ভবতি কবিতাকামিনী কৌতুকায়॥"

"চোর"-নামক এক কবি, কবিতা-কামিনীর চিকুর (কেশ)-স্বরূপ; "ময়ূরভট্ট"—কর্ণপূর (কর্ণভূষণ)-স্বরূপ; "ভাস" কবি, হাস্যস্বরূপ; "হর্ষ"-নামা কাব্যকার,—আনন্দ-স্বরূপ; তিনি কবিতা-কামিনীর হৃদয়বাসী; "বাণভট্ট"—পঞ্চবাণ-স্বরূপ। আর, "কালিদাস"—"কবিকুলগুরু"। অতএব কবিতা-কামিনী, কোন্ জনেরই বা কৌতুকবিধায়িনী নহে?

আরও এক কবি, বলিয়া গিয়াছেন,—

(গ) বল্মীকেরজনি প্রকাশিতগুণা, লীলাবতী বৈদর্ভী
কবিতা স্বয়ং বৃতবতী শ্রীকালিদাসং বরং।
যাসূতামবসিংহ-শঙ্কু-ধনিকান্, সেয়ং জরানীরসা
শূন্যালঙ্করণা স্খলন্মৃদুপদা কং বা জনং নাশ্রিতা॥"

হে কবিতা-দেবী! তুমি মহামুনি বাল্মীকির কন্যা। বেদব্যাস-দেব, তোমার গুণাবলীর প্রচারকর্ত্তা। সুরসিক কালিদাস, তোমার স্বামী। অমরসিংহ, শঙ্কু, ধনিক প্রভৃতি কবিকুল, তোমার অতি কৃতী সন্ততি। এখন তুমি জরাজীর্ণা ও ক্ষীণা, দীনা ও অশোভনা। তাই বুঝি, তুমি স্খলিতগতি হইয়া, যার তার আশ্রিতা হইয়াছ?

কালিদাস ও বররুচি—এই উভয়ের মধ্যে মহাকবি কে, এই বিষয় লইয়া সর্ব্বদাই বিবাদ বাধিত। একদা উভয়ে, এক স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া, উদ্ধতস্বরে বিতণ্ডা করিতেছেন, এমন সময়ে প্রাচীন স্ত্রীলোকের আকৃতি ধারণ করিয়া, সরস্বতীদেবী, তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি সস্নেহ বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাপু! তোমরা কি জন্যে উন্মত্তপ্রায় হইয়া, এত বিবাদ

† "গীতগোবিন্দ"-প্রণেতা, আর এক "জয়দেব"।

ও বাদানুবাদ করিতেছ। তখন তাঁহারা বলিলেন, আমাদের উভয়ের মধ্যে কবি কে, এই বিষয়ের মীমাংসার জন্য, আমরা বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তখন বৃদ্ধবেশা সরস্বতীদেবী, বলিলেন—তোমরা প্রত্যেকে, তাম্বূল ভক্ষণ উপলক্ষ করিয়া, এক একটী শ্লোক রচনা কর। সেই শ্লোক শুনিয়া তোমাদের মধ্যে প্রকৃত কবি কে, আমি, তাহার মীমাংসা করিয়া দিব। তদনুসারে বররুচি, যে একটী শ্লোক রচনা করেন, নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল,—

"তূর্ণমানীয়তাং চূর্ণং পূর্ণচন্দ্র-নিভাননে!
পর্ণানি স্বর্ণবর্ণানি শীর্ণান্যাকর্ণলোচনে॥"

হে পূর্ণেন্দুবদনা! শীঘ্র চূর্ণ আনয়ন কর। কেন না, সুবর্ণবর্ণ-সদৃশ পর্ণ (পান), বিশীর্ণ হইয়া যাইতেছে।

কালিদাসকেও, তাহার অব্যবহিত পরেই একটী কবিতা রচনা করিতে হইয়াছিল। তৎপ্রসঙ্গও, এই সঙ্গেই বিবৃত হইল,—

"বিনা খদিরসারেণ, হারেণ হরিণীদৃশাং।
নাধরে জায়তে রাগো, নাম্বুরাগঃ পয়োধরে॥"

উহার তাৎপর্য্যার্থ পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইতেছে।

খদির-সার (খয়ের) বিনা হরিণাঙ্গনাগণের অধরের অঙ্গরাগ ঘটে না, এবং পয়োধরেরও অপূর্ব্ব শোভা হয় না।

কালিদাস, এই শ্লোক শুনাইলেন। শ্লোক শুনিয়া, সরস্বতীদেবী, বলিলেন—

"কবির্বররুচিঃ।"

তখন কালিদাস, সাতিশয় অসন্তোষ প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিলেন, তবে আমি কি? সরস্বতী, অতীব হাস্য করিয়া বলিলেন,—

"ত্বমহং।"

কালিদাস, তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? এই জিজ্ঞাসা শুনিয়া সরস্বতীদেবী, জরতীমূর্ত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বমূর্ত্তিপরিগ্রহ করিলেন। তখন তাঁহারা, বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন। তাঁহাদের যুগ্মমূর্ত্তিই, পুলকিত-কলেবর হইয়া, প্রভূত ভক্তিযোগ-সহকারে বাগ্বাদিনীকে বার বার প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিলেন। তাঁহারা, অঞ্জলিবদ্ধ পূর্ব্বক সরস্বতীদেবীর স্তব করিতে লাগিলেন।

ফলতঃ, কালিদাসের কবিত্ব, এই মধুরত্বময়! সেই মধুরতায় সবাই, সায় দিবেন কি না, জানি না। সেই সন্দেহেই উপসংহারে আর কয়েকটী কথা বলিয়া লইতে চাই।

এস্থলে সাদৃশ্য-মূলক তুলনা দ্বারা বুঝাইয়া দিতেছি, কালিদাসের কবিতা, কত মধুরতাময়ী! ভারতীয় অন্যান্য অগণ্যপ্রায় কবি-সমুদায়ের উক্তি ও কালিদাসের মধুর-রস-নিঃস্যন্দিনী বাণী, পার্শ্বাপার্শ্বিভাবে সুপ্রণালীসম্মত সুন্দর-প্রথা-ক্রমে পশ্চাৎ প্রদর্শিত করিলাম। যাহাতে পাঠক-পাঠিকা-কুলের তত্ত্ব-নির্ণয়ে ব্যাকুলতা বা ব্যাঘাত না ঘটে, তদুদ্দেশেই আমাদিগকে এই অভিনব উদ্দেশ্যের আশ্রিত হইতে হইয়াছে। বাম ভাগে অন্যান্য আর কবিদের বর্ণনা দক্ষিণ দিকে কালিদাসের বর্ণনা, পাঠক-কুলের চক্ষের সমক্ষে প্রত্যক্ষীভূত হইবে। সচরাচর ইহাই দেখিতে ও শুনিতে পাই, দক্ষিণ বায়ু লোকের প্রীতিকর; সুতরাং উপকারকও বটে! ঐ ঘটনার উদাহরণ হইতেই "দক্ষিণ" চিরদিন সুশোভন ও অনুকূল। তাহারই নিমিত্ত আমরাও, বক্ষ্যমাণ প্রকরণে দক্ষিণ ভাগে আমাদের প্রবন্ধের অভিধেয় প্রিয় পদার্থকেও (কালিদাসকেও) বসাইলাম।

'সম্মুখে শুষ্ককাষ্ঠ দৃষ্ট হইতেছে' এই বিষয়ে এক শ্লোক রচনা করিতে, মহাবিক্রম মহারাজ বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া "ঘটকর্পর" এবং "কালিদাস" যে যে শ্লোকার্দ্ধ রচনা করিয়াছিলেন, সেই প্রসঙ্গ এই বিষয়ের সঙ্গে সম্যক্ প্রাসঙ্গিক। সুতরাং তাহার বর্ণনা, কেনই না এক্ষণে এখানে সুশোভনা হইবে?

ক। "শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে" —ঘটকর্পর।	ক। "নব-নীরস-তরুরিহ পুরতো ভাতি।"—কালিদাস।

কতিপয় কবি ও কালিদাস, একদা 'যশের' বর্ণনা এইরূপ করিয়াছিলেন—

খ। "দধিবৎ"—উদ্ভট কবি।	খ। "রাজংস্তব যশো
গ। "খদিবৎ"—ঐ।	গ। ভাতি, শরচ্চন্দ্র-
ঘ। "চড়দ্‌গঙ্গ-মড্‌ডিবৎ"-ঐ।	ঘ। মরীচিবৎ।"—কালিদাস।

কোকিলের রবে কুঞ্জবন, প্রতিধ্বনিত—এতদ্বিষয়ক "বররুচি" এবং "কালিদাসের" কবিতা দেখুন,—

ঙ। "অন্যোৎপুষ্ট-ধ্বনিতাক্রীড়ং।" —বররুচি।	ঙ। "কোকিল-কাকলী-কূজিত-কুঞ্জ।"—কালিদাস।

কবি কালিদাসের কবিত্বের মধুরত্বের কত পরিচয় দিব? বঙ্গের অতি বড় এক গ্রন্থকার*, কেমন শোভন ভাবে মিষ্টভাষায় তৎসম্পর্কে বলিয়াছেন,—

"কালিদাসের নামোচ্চারণমাত্র তদীয় গুণগ্রাম স্মরণ হইয়া, শরীর ও মনঃ পুলকিত হইয়া উঠে। পূর্ব্বকালে ভারত-মণ্ডলে যত বিষয়ের যত গ্রন্থ, রচিত হয়, তাহার মধ্যে সাহিত্যবিষয়ক রঘুবংশ ও অভিজ্ঞানশকুন্তল-সদৃশ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নিষ্কলঙ্ক প্রধান পুস্তক, কোন বিষয়েই বিদ্যমান নাই। ঐ উভয় পাঠ করিতে করিতে, নিরন্তর একরূপ অপূর্ব্ব চিত্তচমৎকার উপস্থিত হইয়া, নিরুপম সুনির্ম্মল স্বর্গসুখ অনুভূত হইতে থাকে। তাঁহার উপমার তো উপমা নাই। অবনীমণ্ডলে উটি একটী অদ্বিতীয় পদার্থ হইয়া রহিয়াছে। উৎপ্রেক্ষাও, সেইরূপ। তাঁহার স্বভাব-বর্ণন, অতীব মনোহর। স্বদীয় বলবৎ ভ্রমণোৎসাহ ও নৈসর্গিকবস্তু-পর্য্যবেক্ষণ-বাসনাও, তাঁহার অসাধারণ প্রকৃতির পরিচায়ক। ভারতবর্ষে এখন তাদৃশ পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি, বুঝি আর বিদ্যমান নাই। ফলতঃ, তিনি ভারতভূমির অসাধারণ শ্লাঘা-স্থল।

কেহ কেহ, তদীয়গুণে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহাকে কবিত্বগুণের সর্ব্বাংশে সমানরূপ প্রধান-শক্তি-শালী বলিয়া বর্ণন করেন। এমন কি, ভূমণ্ডলের কোন কবি, কোন বিষয়ে তাঁহার অপেক্ষা অধিকতর শক্তি প্রাপ্ত হন নাই। কিন্তু—

(ক) মানবীয় মনের তলস্পর্শী সেক্সপীয়র,

(খ) গাম্ভীর্য্য মহার্ণব মিল্টন,

(গ) প্রচণ্ড তেজশ্চুল্লী ঔৎসুক্যশালী বায়রন,

(ঘ) করুণ, গাম্ভীর্য্য, রৌদ্রাদি বিবিধ রসসিন্ধু সারল্যনিধান বাল্মীকির, নাম বিদ্যমান থাকিতে, উল্লিখিত অভিপ্রায়ে অনুমোদন করিতে পারা যায় না। কিন্তু মধুরতা-বিষয়ে কালিদাস, কোন দেশের কোন কবি অপেক্ষা ন্যূন নন। রঘুবংশ ও অভিজ্ঞানশকুন্তলের সুধাময় স্বভাব-বর্ণনাদি অধ্যয়ন করিতে করিতে, সংশয় হয়, কালিদাস, কি ভারতবর্ষীয়? যদি সংস্কৃত সারসিক কাব্য-প্রণেতা অপরাপর সমস্ত কবি, ভারতবর্ষীয় হন, তবে কালিদাস ইয়ুরোপীয়! কিন্তু ইয়ুরোপীয় কবিতা কি এতই মধুর? ফলতঃ, কবিত্ব-সামগ্রী-পরিপূর্ণা রসবতী ভারতভূমিতে ইয়ুরোপীয় বুদ্ধির সমাবেশ হইলে, যেরূপ চমৎকারিণী হওয়া সম্ভব, কালিদাসের কবিতা, সেইরূপই! ইয়ুরোপীয় স্থপতিগণেই, অদ্বিতীয় আগরার তাজ প্রস্তুত করিয়াছে!"

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

* সুপণ্ডিত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত।

কিম্ভূত-কিমাকার।

প্রস্তাবনা।

(নটের প্রবেশ।)

গীত।

কি শিখালে তোমারে ভাই, বিলাতী এডুকেশন?
শিখ্‌লে কি কেবল তুমি শ্বসনের সন্ সন্?
শিখিয়াছ অ্যাজিটেশন,
সোশ্যাল রিফর্‌মেশন,
শিখেছ ফ্যাশন আর ফিমেল্-ইম্যান্‌সিপেশন!

(গীতান্তে)

নট। অদ্য মাঘীপূর্ণিমা, রজনী পূর্ণচন্দ্রমাশালিনী, চতুর্দ্দিক শুভ্র-জ্যোৎস্নায় অলঙ্কৃত, সভার কি অপূর্ব্বশোভা সম্পাদিত হইয়াছে। অসংখ্য সম্ভ্রান্ত দর্শকগণ বিবিধবর্ণের বিচিত্র শীতবস্ত্রাবৃত হইয়া উৎসুকনয়নে রঙ্গমঞ্চের দিকে চাহিয়া আছেন। আর বিলম্ব করা হইবে না, এখনই অভিনয় আরম্ভ করিতে হইতেছে; এখনকার দর্শকদিগের রুচির অনুরূপ যাহা কিছু একটার অবতারণা করিতে হইবে। অতএব প্রিয়াকে আহ্বান করি, তাহার সহায়তা ভিন্ন আমার ক্ষমতা কি এই দুরূহব্যাপারে—এখনকার এই বিকৃতরুচি উদ্দাম যুবকবৃন্দের তৃপ্তিসাধনে একপদ অগ্রসর হই। প্রিয়ে! সাজসজ্জা সমাধা হইয়া থাকে ত একবার এদিকে এস!

(গান করিতে করিতে নটীর প্রবেশ।)

গীত।

বাঙ্গালা যায় গো রসাতল!
বাঙ্গালী নিজের দোষে হারালে সকল।
চাষ ক'রে খে'ত যারা,
সাহেব সেজেছে তারা,
কাঙ্গালের বিলাসিতা প্রমাদ কেবল।

বাঙ্গালা যায় গো রসাতল!
দেশাচার ছাড়িতেছে,
হাহাকার বাড়িতেছে,
স্বভাব ভুলিয়া তুলিতেছে হলাহল!
বাঙ্গালা যায় গো রসাতল!

(গীতান্তে)

নটী। অনুমতি করুন, কোন্ নাটকের অভিনয় কর্‌তে হবে?

নট। প্রিয়ে! এখনও কি তোমার নাটকাভিনয়-প্রবৃত্তি তিরোহিত হয় নাই? নাটকের নাম উল্লেখ ক'রে মহাকবিগণের অবমাননা কর কেন? শকুন্তলার অভিনয় ক'রেছ, উত্তর-চরিতের অভিনয় ক'রেছ, সে দিন মৃচ্ছকটিকের অভিনয় ক'রেছ; বল দেখি, কয়জন দর্শক সে সকল দৃশ্য-কাব্যের রসাস্বাদনে সমর্থ হয়েছেন? অতএব নাটকাভিনয়ের কথা আর ব'ল না। বাঙ্গালী যুবক নাটক চাহেন না, চাহেন—কেবল রং ঢং সং। আমি আর নিত্য নিত্য ওঁদের নিমিত্ত রংদার, সংদার, মজাদার, মসালা-দার, ইয়ারোঁফা 'বাগ-ও-বাহার'—নাট্যাপচার বা পঞ্চরং প্রস্তুত কর্‌তে পার্‌ছি না।

নাচ গান হাসি,
ওঁরা চান রাশি রাশি,
বলেন, নাটক নভেলে কৃষ্ণকথা,
যেমন স্নানযাত্রায় মাসী।

নটী। কেন? নাটক, নভেল কি সাহিত্যের অন্তর্গত নয়? যদি হয়, তবে ঐ সকল কাব্যে ধর্ম্মকথা, তত্ত্বকথা, কৃষ্ণকথা থাক্‌বে না কেন?

নট। ঠিক কথা—চিত্তরঞ্জনচ্ছলে উচ্চভাব, ধর্ম্মভাব, দেবভাব, পাঠক বা শ্রোতার হৃদয়ে অঙ্কিত ক'রে দেওয়াই ত কাব্যের উদ্দেশ্য—যে কাব্যে সে উদ্দেশ্য সাধিত না হয়, সে কাব্য কাব্যই নয়—সে কাব্য অশ্রাব্য—অপাঠ্য, সে কাব্য বিষতুল্য—সে কাব্য সমাজের ঘোরতর অহিত, অনিষ্ট ও অবনতি সাধন করে। মনুষ্যের সম্যক্ হিতসাধন করাই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। কেবল হাস্‌লে, কেবল টপ্পা শুন্‌লে, কেবল পীরিতের উড়ন পাড়নে কাল কাটালে কি মনুষ্যের মনুষ্যত্ব থাকে? আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যের কোনও স্তরে এ প্রকার পীরিতের বাইশ ফেরের পরিচয়

পাওয়া যায় কি? ঢেউর উপর ঢেউ, তার উপর ঢেউ, পীরিতের উত্তাল তরঙ্গলীলায় বাঙ্গালা সাহিত্য প্লাবিত হ'য়ে গেল! কুক্ষণে বাঙ্গালায় কবি-প্রতিভা প্রতিভাত হয়েছিল। অতএব প্রিয়ে, আর নাটকের নাম করে কাজ নাই, সম্প্রতি হংকং হ'তে যে কিম্ভূত-কিমাকারের আমদানী করেছি, তারই অভিনয় কর।

নট-নটীর নৃত্য করিতে করিতে গীত।

হেস না আর বঙ্গবাসি, তোমার হাসি দেখে কান্না পায়।
ভাত জোটে না যার ঘরে, সে তুড়ি মেরে টপ্পা গায়!
রাগে অঙ্গ জ্বলে যায়!
বক্তৃতা ব্যাপকতা, কেবল তোমার বাচালতা,
বল বুদ্ধি হ'ল ভোঁতা, তোমার খেটে খাওয়া হ'ল দায়।
রাগে অঙ্গ জ্বলে যায়!

নটী। ঐ বুঝি সেই কিম্ভূত-কিমাকারা হাড়িণীরা আস্‌ছে। এখন আমরা যাই, চলুন। [প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

হাড়িপাড়ার রাস্তা।

(ঝাঁটাহাতে গান করিতে করিতে হাড়িণীগণের প্রবেশ।)

গীত।

আয়লো আয় প্রাণস্বজনি, সজ্‌নে ফুল কুড়্‌তে যাব।
চিংড়িমাছ ফুলবড়ি দিয়ে হজ্-পজ্ বানায়ে খাব।
রসুন পিঁয়াজ কুচিয়ে দিব,
চর্ব্বি দিয়ে সম্বরিব,
পোকাপড়া পচা পনির ফোড়ন দিব তায়,
ন্যাষ্টি শুক্ত শাকের ঘণ্টের রন্ধন ঘুচাব।

(ময়রাবাড়ীর বারাণ্ডায় ঝালাফালা ও ঈশাবালার প্রবেশ।)

১ম হাড়িণী। ছি ভাই, তুমি ঠাট্টা ক'র্‌ছ? (হাস্য)।
২য় ঐ। কেন ভাই, তুমি এমন কথা ব'ল্‌ছ?
১ম ঐ। ঐ দেখ, ময়রাদিদির মেয়েরা রাগ কর্‌ছে।
ঈশা। আ মোলো, বেহায়া মাগীদের রকম দেখ্!
ঝালা। ঝাড়ু মার, ঝাড়ু মার।

হাড়িণীদিগের নৃত্য ও গীত।

ময়রাবালা তোমরা কি ধর্‌বে আবার ঝাড়ু?
ঝাঁট পাঁট দিবে আবার মাজ্‌বে কল্‌সী গাড়ু?
আর কি রান্নাঘরে যাবে,
ভাসুর দেখে ঘোম্‌টা দিবে,
লিলি হাতে বাটনা বেটে বাজাইবে খাড়ু?
সোণার গহনা ফেলে দেছ,
নেক্‌ড়া কানি সার ভেবেছ।
সামিজ পরে আয়া সেজে নাড়্‌বে কি আর তাড়ু?

ঈশা। দিদি, তুমি এই অপমান সহ্য কর্‌বে?

ঝালা। Certainly not, the conduct of these detestable wretches is simply intolerable, they must not go unscathed. Harlie, my dear!

হাড়িণীগণ। (করতালি দিয়া) হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হার্‌লি! কানাপুতের নাম পদ্মলোচন—হারাধন হ'ল হার্‌লি!

[প্রস্থান।

(হারাধন হাবনবিশের প্রবেশ।)

হারা। Your pleasure, my sweet?

ঝালা। Wonderful! তুমি শুনিতে পাও নাই, ঐ মাগীগুলা কি গান করিল?

হারা। Excuse me my dear, I was so engaged with a treatise on technical education.

ঝালা। Pox on your technical education, এখন যা বলি, তা শুন, ঐ মাগীগুলা আমাদের যৎপরোনাস্তি অপমান করিয়াছে, উহারা প্রচণ্ড-রূপে দণ্ডার্হ হইয়াছে, they must be horsewhipped, do you hear me? Go and obey my behest.

হারা। But my love,—

ঝালা। No, no, এ but কিন্তুর কাজ নয়; কিন্তু মিন্তু চলিবে না, যাহা বলিয়াছি, তাহা করিতেই তোমায় হইবে।

হারা। I am settled, and bend up each corporal agent to this terrible feat.

[হারাধনের প্রস্থান।

ঝালা। Bravo! a Macbeth indeed!

ঈশা। চল, এখন আমরা ঘরের ভিতর যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ময়রাবিবিদের (Bondoir)

(ঝালাফালা ও ঈশাবালা উপস্থিত।)

ঝালা। ভগিনি, আমি হারমোনিয়মে সুর দিই, তুমি একটী গান কর।

ঈশাবালার গীত।

বোলোনা আমারে দিদি, গাহিতে বোলোনা;
সাগর গভীর মম হৃদয়-বেদনা!
সে যে শুনায়েছে গান,
সে গানে আকুল প্রাণ,
গান শুনে ম'রে গেছি দিদিগো, এ হেন ছলনা। (রোদন)

ঝালা। চুপ কর ভগিনী, চুপ কর, তোমার গান শুনিয়া বুক-ফাটা

দুঃখে প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে, তোমার গানের প্রতিচরণে যেন করুণা-মাখান রহিয়াছে। যাউক, যাইতে দাও, ও বিষাদজনক ভৈরবী ছাড়িয়া দাও, প্রাণ প্রফুল্ল কর, কালাংড়া রাগিণীতে একটি গান গাও—হৃদয় মাতাইয়া দাও।

ঈশাবালার গীত।

মুখানি তার হাঁসি হাঁসি ফোটা-পদ্মফুল।
ভাব-ভরা আঁখি দুটি করে ঢুল ঢুল॥
অঙ্গের বা কি বাহার,
কোট-আঁটা চমৎকার,
ঘাড়ছাঁটা টেরিকাটা ফ্যাশানের চুল।
মুখানি তার হাঁসি হাঁসি ফোটা-পদ্মফুল॥
সে রূপের চকোর আমি,
সে হবে আমার স্বামী,
রূপের জ্যোছনারাশি করে গো আকুল।
মুখানি তার হাঁসি হাঁসি ফোটা পদ্মফুল॥

ঝালা। সুন্দর গান, সুন্দর ভাব, এমন সুন্দর গানে তুমি 'ফ্যাশন' শব্দটার প্রয়োগ কর্‌লে কেন?

ঈশা। Because it is expressive.

ঝালা। সে যাহা হউক, কিন্তু তোমার ঐ দাঁতছরকটা ফোটা-পদ্ম-ফুলের উপমাটা বড় ভাল লাগিল না।

ঈশা। অন্ধের চক্ষে সকলই অন্ধকার, দিদি! বড়ই দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, নিভাঁজ প্রকৃত কবিত্ব অর্থাৎ Pure genuine Poetry বুঝিবার তুমি অধিকারিণী নও। কবিতা ভাবময়ী; ভাব অর্থাৎ Idea কবিতার জান্, কবিতার প্রাণ। ভাবুক না হইলে কবিভাব বুঝিবে কে? যে ভাবুক, সে বুঝিয়া লয়; সকলের ভাগ্যে সে ভাবানুভূতির স্বর্গীয় সুখ ঘটিয়া উঠে না। রসিক না হইলে রসগ্রহণে সমর্থ কে?

ঝালা। You are waxing eloquent my dear but. আমার ধারণা, সুন্দর ভাবের সুন্দর অভিব্যক্তিই কবিতা।

নেপথ্যে। You are perfectly right my dear.

(হারাধন হাবনবিশের প্রবেশ।)

হারা। সুন্দর ভাব, সুন্দর ভাষায় পরিষ্কার করিয়া যে বলিতে পারে, সেই কবি।

ঝালা। থাক্ ও কবিতার কথা—কবিদিগের কথা! ভাব-ভাবুকতা ideality আমি বড় বুঝি না, বুঝে আমাদের ঈশাবালা, আমি বুঝি reality, এখন প্রকৃত বিষয়ের প্রকৃত কথা বল দেখি, সে মাগীগুলোকে উত্তম মধ্যম দেওয়া হয়েছে ত?

হারা। আমায় কিছুই করিতে হয় নাই, সূর্য্যোদয়ে যেমন শিশিরবিন্দু সজ্য অদৃশ্য হইয়া যায়, সেইরূপ আমায় দেখিবামাত্র তাহারা কর্পূর হইয়া গেল—উপিয়া গেল।

ঝালা। বাহবা! এমন সুন্দর বাঙ্গালা কোথায় শিখিলে? সুন্দর! অতি সুন্দর! কোনখানে চর্চ্চের ষ্টিপ্‌ল্, কোন স্থানে মস্‌জিদের মিনারেট্, কোনস্থানে দেবমন্দিরের ত্রিশূল-চক্র, আর কোথাও বা উইয়ের ঢিপি বা গোবরগাদা বিরাজমান রহিয়াছে।

হারা। হায়! হায়! "গুণ হয়ে দোষ হ'ল বিদ্যার বিদ্যায়।" তুমি যে একেবারে আকাশ থেকে পড়্‌লে দেখ্‌তে পাচ্চি, এখন ত আমাদের সকল বিষয়েই এইরূপ হইতেছে, এইরূপই হইবে—এইরূপ হওয়াই ত চাই; এই যে জামাটা আমি পরিয়া রহিয়াছি, এটা কি? ইহার পিছনটা পার্শিকোট, সামনেটা চিনেকোট, গলাটায় ইংরেজী কলার, আর হাতা দুটো পঞ্চনদ-প্রদেশীয়—এইরূপই হইবে, ইহা indispensable, গুরুচণ্ডালী প্রয়োগে ভাষার ওজস্বিতা বৃদ্ধি হয়, composite dressএ, পর্‌নেওয়ালার তেজস্বিতা প্রকাশ পায়।

ঝালা। তুমি যত তেজী পুরুষ তা ত দেখ্‌লাম, দুটা মেয়ে-মানুষের সাম্‌নে এগুতে পার্‌লে না—ধিক্ তোমায়! যাও, এখন মানহানির নালিস রুজু করগে যাও, যতক্ষণ তা না কর্‌বে, ততক্ষণ আমি আর তোমার মুখদর্শন কর্‌বো না; এই আমি চল্লেম।

[প্রস্থান।

হারা। আঃ কি সর্ব্বনাশ! বলি শুন, শুন,—এত রাগ কেন? শুন না, (ঝালাফালার অনুসরণ।)

[ক্রমশঃ]

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী।

বাঙ্গালা ভাষার লেখক।

প

(৫)

—প্রবোধচন্দ্র সরকার। পিতা ৺ ঈশ্বরচন্দ্র সরকার। বয়স ৪৪।৪৫ বৎসর। উত্তরাঢ়ি কায়স্থ। নিবাস চন্দ্রকোণা, জেলা মেদিনীপুর।

সরকার মহাশয় নিজে তাঁহার যে জীবনী লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, আমরা তাহাই পত্রস্থ করিলাম ;—

"আমার সহধর্ম্মিণী আজ প্রায় দশ বৎসর হইল, ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। আমি দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করি নাই। আমি নিঃসন্তান।

"অল্পবয়সেই আমার কবিতা লিখিবার ঔৎসুক্য জন্মে। পঠদ্দশায় আমি চারিটী কবিতা লিখিয়াছিলাম। ১২৮১ সালে "পাণিপথের যুদ্ধ" নামক একখানি কাব্যপুস্তক লিখি। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার সে সকল হস্তলিখিত কাগজপত্র হারাইয়া গিয়াছে।

"১২৮৫ সালে আমি "মানসরঞ্জিনী কাব্য" নামে আর একখানি ছোট ছোট কবিতাপূর্ণ পুস্তক প্রণয়ন করিয়া মুদ্রিত ও প্রকাশিত করি। তাহার পর মধ্যে মধ্যে "সহচর" সংবাদ পত্রে দুই একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছি। ১৮৮৫।৮৬ অব্দে "বঙ্গবাসী" ও "দৈনিক" সংবাদপত্রে আমি কতকগুলি সঙ্গীত লিখিয়াছিলাম। ১৮৮৭ অব্দের জানুয়ারি মাসে দৈনিকের লেখক-শ্রেণীভুক্ত হই, এবং ঐ সময় হইতে ১৮৮৮ অব্দের ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত দৈনিক স্তম্ভে কয়েকটী জাতীয় সঙ্গীত ও কতকগুলি গদ্যময় প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম।

"নানাকারণে আমি ১৮৮৮ অব্দের মার্চ্চ মাস হইতে সংবাদ পত্রে লিখিতে বিরত হই। কিন্তু লেখার নেশা ছাড়িতে পারি নাই। গত বৎসর জুন মাসে "বিবিধ সঙ্গীত" নামে একখানি গানের বই প্রকাশ করিয়াছি। সম্প্রতি "শালফুল" নামক একখানি উপন্যাসও প্রণয়ন করিয়াছি।"

* * * * *

—প্রসন্নকুমার পাল। পিতার নাম ৺দ্বারকানাথ পাল। সাকিম মাজিদা, জেলা নদীয়া ;—পূর্ব্ববঙ্গ রেলষ্টেসন হালসা হইতে মাজিদা তিন মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। জন্ম সন ১২৫৯ সালের ১৯এ কার্ত্তিক, দিবা দেড় প্রহর।

মাজিদার পালবংশ সদাব্রত ও অতিথিসেবার জন্য প্রসিদ্ধ। স্বর্গীয় দ্বারকানাথ পাল মহাশয় একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি ছিলেন। বিপন্নের বিপদ দূর করা সাধ্যাতীত হইলেও, সমধিক চেষ্টা করিতে তিনি পরাঙ্মুখ হইতেন না। প্রসন্নকুমার সেই দ্বারকানাথের বংশধর। তিনি পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান ও কার্য্যকুশল। "গয়ায় পিণ্ডদান পদ্ধতি" ও "গয়া মাহাত্ম্য" নামে দুইখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। মধ্যে ৺গয়াধামে, "সুলভ যাত্রীনিবাস"ও স্থাপিত করিয়াছিলেন। সেখানে ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুগণ অপেক্ষাকৃত স্বল্পব্যয়ে পিতৃকার্য্যাদি সম্পন্ন করিতে পারিতেন। এই সূত্রে পাল মহাশয় অনেকের নিকট সুপরিচিত হইয়াছেন।

ফ

ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়। ইনি বিলাত-প্রত্যাগত একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। হুগলী কলেজে প্রফেসরী করিতেছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে ইহাঁর অনুরাগ আছে। ইহাঁর লিখিত বিজ্ঞানবিষয়ক কয়েকটী উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ ভারতীতে প্রকাশ হইয়াছিল। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ন্যায় কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের বাঙ্গালাসাহিত্যে অনুরাগ,—বড়ই আহ্লাদের বিষয়, সন্দেহ নাই।

ব

(১)

বিহারিলাল সরকার। পিতার নাম ৺ উমাচরণ সরকার। পিতামহ ৺বেচারাম সরকার। অগ্রজ ৺নীলকণ্ঠ সরকার। মাতামহ,—হুগলী জেলার অন্তর্গত মথুরাবাটী-নিবাসী ৺ রামচাঁদ মিত্র। মাতুল শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মিত্র। বিহারী বাবুর জন্মস্থান—পৈতৃক বাসস্থান, হাওড়া জেলার অন্তর্গত আন্দুলগ্রাম ; হাল সাকিম কলিকাতা, দর্জ্জিপাড়া, ১০নং রামচাঁদ নন্দীর গলি।

শ্রীযুক্ত বিহারিলাল সরকার মহাশয়,—আজিকার দিনে,—বঙ্গের এক-জন খ্যাতনামা লেখক। শক্তিশালী সুলেখক বলিয়া সর্ব্বত্র তাঁহার প্রতি-পত্তি ও সম্মান আছে। তিনি একাধারে ঐতিহাসিক, সমালোচক, জীবনীকার ও একজন প্রধান প্রবন্ধ-লেখক। কবি-পদ-প্রাপ্ত না হইলেও, কবি-প্রতিভা তাঁহাতে আছে। তাঁহার প্রায় সকল লেখাতেই একটু না একটু কবিত্বের লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। একাধারে এত গুণের অধিকারী

হওয়া বড় কম সৌভাগ্যের বিষয় নহে। তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ "বিদ্যাসাগর", তাঁহার অদ্ভুত কাব্য-সমালোচন "শকুন্তলা-রহস্য"—তাঁহার গভীর গবেষণা ও অপূর্ব্ব সংগ্রহপূর্ণ "ইংরেজের জয়",—তাঁহার তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানের নিদর্শন "তিতুমীর",—আজিকার দিনে পাঠ না করিয়াছেন কে? তাঁহার গম্ভীর অথচ সরল,—মর্ম্মস্পর্শিনী অথচ বিশুদ্ধ,—লীলাময়ী অথচ উশৃঙ্খলতাশূন্য ভাষায় মুগ্ধ নয় কে? দীর্ঘকাল হইতে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত বঙ্গবাসী সংবাদ পত্রের সহকারী সম্পাদকের পদে আসীন হইয়া, অক্লান্ত শ্রমে, অসাধারণ অধ্যবসায়ে,—অবিচলিত কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় সকলকে মুগ্ধ করিয়া আসিতেছেন। বঙ্গবাসীতে নানাশ্রেণীর রাশি রাশি প্রবন্ধ তিনি প্রকটিত করিয়াছেন। তাঁহার লেখা খুব উচ্চশ্রেণীর।

৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনী প্রণয়ন করিয়া, বিহারী বাবু বঙ্গের বসওয়েল হইয়াছেন। একাধারে এমন সংগ্রহ, এমন নির্ভীক ও স্বাধীন-ভাবে মতামত প্রকাশ, এমন অদ্ভুত শক্তির সহিত বিরুদ্ধমত-খণ্ডন,—বাঙ্গালা ভাষায় অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। তারপর বিহারীলালের শকুন্তলা-রহস্য, চিন্তাশীল বিদ্বৎ সমাজের প্রিয় গ্রন্থ। এই গ্রন্থে তিনি পদ্মপুরাণ হইতে নানা প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, মহাকবি কালিদাস তাঁহার অপূর্ব্ব শকুন্তল-প্রতিমার কাঠামো,—পদ্মপুরাণ হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন,—মহাভারত হইতে নহে। "ইংরেজের জয়" গ্রন্থে, ঐতিহাসিক বিহারীলাল, হতভাগ্য সিরাজউদ্দৌলার কলঙ্ক-কালিমা অনেকাংশে বিদূরিত করিয়াছেন, এবং নানা সমীচীন মত ও বিশিষ্ট প্রমাণ প্রয়োগপূর্ব্বক,—বাঙ্গালায় সর্ব্বপ্রথম দেখাইয়াছেন যে, অন্ধকূপহত্যার মূলে কোন সত্য নাই, পরন্তু উহা একদেশদর্শী ইংরেজ লেখকগণের বিকৃত কল্পনামাত্র। এই ঐতিহাসিক সত্য প্রচার করিয়া, বিহারীবাবু সকলেরই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। সহৃদয় সাহিত্যামোদী ব্যক্তিমাত্রেই এজন্য বিহারীবাবুর নিকট কৃতজ্ঞ। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন কোন অনভিজ্ঞ পাঠক ও সমালোচক, এবং পর কৃতিত্ব-গোপনেচ্ছু কোন কোন লেখক, বিহারী বাবুর এই কৃতিত্ব স্বীকারে কুণ্ঠিত হন। তাঁহারা বলেন, অন্ধকূপহত্যা বা ব্লাকহোল, সর্ব্বপ্রথম বাবু উড়াইয়া দেন নাই,—ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র উড়াইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা বিশেষরূপ অবগত আছি, আজ পাঁচ ছয় বৎসর হইল, বিহারী বাবু জন্মভূমিতে সর্ব্বপ্রথম এই তত্ত্ব আবিষ্কার

করেন। যাহা হউক, এ বিষয়ের প্রমাণের ভার আমরা সাহিত্যবিদ্ সুধীগণের উপর দিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। আমরা সাহিত্যের ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি; সুতরাং প্রকৃত সত্য প্রকাশ করিতে আমরা ধর্ম্মতঃ বাধ্য;—তাই এ অবান্তর ঘটনার উল্লেখ করিলাম।

বিহারী বাবুর সাহিত্য-জীবনের ইতিহাস,—এবং সুখ দুঃখময় জীবনের দুই চারি কথা বলিয়া আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

১৭৭৭ শকাব্দাঃ ১লা কার্ত্তিক,—শারদীয়া মহাষ্টমীর পুণ্যময় মুহূর্ত্তে,—বঙ্গের সুসন্তান বিহারীলাল জন্মগ্রহণ করেন। বিহারী বাবুর পৈতৃক বাটীতে ৺ শারদীয়া পূজা হইত। সপ্তমীর দিন,—বিহারীলালের মাতৃদেবীর প্রসব-বেদনা উপস্থিত হয়। বিহারীলালের ধর্ম্মপ্রাণ পিতামহ জগন্মাতা জগদম্বার নিকট এই মর্ম্মে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন যে, "হে মা দুর্গে! সর্ব্বসিদ্ধিদায়িনি! আমার সংকল্পে যেন মা বিঘ্ন না হয়! পূজারম্ভের পরে আমার নামে সংকল্প হইয়া গেলে যেন সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। দোহাই মা, শুভ অশৌচে তোমার পূজা যেন পণ্ড না হয়।" তার পর সেই ধর্ম্মপ্রাণ বৃদ্ধ,—পুত্রবধূকে লক্ষ্য করিয়া এই মর্ম্মে বলেন যে, "দেখো মা, মুখ রেখো।—সংকল্পের পর যেন তোমার সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়।" ভক্তের কাতর ক্রন্দন, জগদম্বার চরণে স্থান পাইল;—সন্ধিপূজা সমাপ্ত হইবার কয়েক মুহূর্ত্ত পরে বিহারীলাল ভূমিষ্ঠ হইলেন। মহাতিথিতে, পুণ্যলগ্নে জন্ম বলিয়াই বুঝি বিহারীলালের জীবনে ধর্ম্মের এমন মধুর মনোহর ভাব দেখিতে পাই। বিহারীলাল, স্বধর্ম্মনিরত, আচারবান্, ধর্ম্মভীরু ও ঈশ্বর-বিশ্বাসী। সেই জন্যই বিহারীলালের চরিত্র নির্ম্মল, প্রকৃতি অহমিকাশূন্য ও মাৎসর্য্যবিহীন। সেই জন্যই বুঝি বিহারীলাল সহৃদয়, পরদুঃখকাতর, সুরসিক ও পর-উপকারেচ্ছু। এইরূপ এবং আরও অনেকরূপ গুণগ্রামে বিহারীলাল সকলেরই প্রিয়।

বাল্যকালে বিহারীলাল,—দেশে পীতাম্বর গুরুমহাশয়ের পাঠশালে নিযুক্ত হন। এই পাঠশালাতেই তাঁহার বাল্য-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। কড়ানিয়া, শতকিয়া প্রভৃতি গণিত,—তিনি একদিনের মধ্যেই এক একটী কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিতেন। সাত আট বৎসর বয়সে বিহারিলাল কলিকাতায় আগমন করেন। তাঁহার পিতৃব্য তখন সার্ভেয়ায় জেনারল আফিসে চাকরি করেন; বাসা বহুবাজার উড়ে পাড়া। বহুবাজার বাঙ্গালা স্কুলে (এক্ষণে এই স্কুল গবর্ণমেণ্টের হইয়াছে) ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত বিহারিলাল পাঠ করেন। ক্লাসের তিনি ভাল ছাত্র ছিলেন। তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত তিনি

প্রথম পারিতোষিক পান। যথাসময়ে বিহারীবাবু ইংরেজী স্কুলে ভর্ত্তি হন। একেশ্বরবাদী খৃষ্টান মার্কিণ ডল্ সাহেবের আর্টস্কুলে ভর্ত্তি হন। এখানে ষষ্ঠশ্রেণী হইতে তৃতীয়শ্রেণী পর্য্যন্ত পাঠ করেন। বরাবর প্রথম পারিতোষিক পাইয়াছিলেন। ১৮৭৪ সালে বিহারীবাবু জেনেরল এসেমব্লি কলেজে নিযুক্ত হন, এবং ৭৭ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

ডল স্কুলে বিহারীবাবু তৃতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে,—লর্ড মেয়োর মৃত্যু হয়। তদুপলক্ষে বিহারীবাবু এক সঙ্গীত রচনা করেন। এই তাঁহার প্রথম রচনা। এই প্রথম রচনাতেই তিনি বাহবা পান। তাঁহার পরলোকগত পিতা ও প্রসিদ্ধ সঙ্গীত-রচয়িতা রূপচাঁদ পক্ষী বলেন, "কালে বিহারীলাল কবি হইবেন।" তাঁহাদের সেই ভবিষ্যদ্বাণী প্রকারান্তরে সফলা হইয়াছে।—কবি পদবাচ্য না হউন, প্রগাঢ় ঐতিহাসিক ও বিশিষ্ট প্রবন্ধলেখক বলিয়া, বিহারীলাল আজ বিখ্যাত হইয়াছেন। জেনারল এসেম্‌ব্লি কলেজে বিহারীলাল এফ, এ পর্য্যন্ত পাঠ করেন। কিন্তু শিরঃপীড়াবশতঃ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। তারপর আজ পর্য্যন্ত সমান আগ্রহে ও সমান যত্নে তিনি নানা ইংরেজী গ্রন্থ পাঠ করিয়া আসিতেছেন। ইতিহাস ও সাহিত্যপাঠে তাঁহার বিশেষ আনুরক্তি। কলেজ পরিত্যাগ করিয়াও বিহারিলাল ঘরে বসিয়া বি, এ ক্লাসের ছাত্রদের সহিত ইংরেজী সাহিত্য ও ইতিহাস পাঠ করিতেন। ফাষ্টইয়ারে পাঠকালে, বহুবাজার হলধর বর্দ্ধনের লেন হইতে প্রকাশিত ৺সীতানাথ দাসের "মানসমোহিনী" পত্রিকার "সূচনা" বিহারিলাল লিখিয়াছিলেন। সেই তাঁহার প্রথম গদ্য রচনা। ন্যাশন্যাল পেপারের ৺ নবগোপাল মিত্রের প্রতিষ্ঠিত চৈত্র-মেলায় বিহারিলাল ভারত বিষয়ে এক কবিতা পাঠ করেন। তখন "ভারত" "ভারত" রবে চারিদিক প্রতিধ্বনিত হইত। সেই কবিতায় বিহারীবাবু আরও বাহবা পান। উক্ত মেলার সভাপতি দার্শনিক-লেখক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বিহারিলালের যথেষ্ট প্রশংসা করেন, এবং সাধারণীর সেই স্বনামধন্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় খুব বাহবা দিয়া বিহারী বাবুর সেই কবিতা সাধারণীতে প্রকাশ করেন। চৈত্রমেলা হইতে বিহারীবাবু একখানি রূপার পদক পুরস্কার প্রাপ্ত হন। নবগোপাল বাবুর এই চৈত্র-মেলা কালে "হিন্দুমেলা" নামে অভিহিত হইয়াছিল। টাউনহলে উক্ত মেলার অধিবেশনেও বিহারী বাবু এক কবিতা পাঠ করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। (ক্রমশঃ)

জন্মভূমি।

(সচিত্র মাসিক পত্র।)

নবম বর্ষ। } ১৩০৭ সাল, আশ্বিন। { ৩য় সংখ্যা।

বাঙ্গালা-সংবাদ-পত্রের ইতিহাস। *

(পঞ্চদশ প্রস্তাব।)

৬৪। কৌস্তুভকিরণ।

(১২৫৫ সাল—১৮৪৮ খৃষ্টাব্দ)

ঘোষ মহেশচন্দ্র, "কৌস্তুভ" বক্ষে ধারণ করিয়া, দিন-কতকের তরেও সুখ-সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েন। ভগবানের বক্ষঃস্থ কৌস্তুভমণি, যেমন পবিত্র, তেমনই শোভাসম্পদেও, উহা, অতুল। স্বয়ং চিন্তামণি এবং ঋষি-মুনিগণই, উক্ত মণির গুণই অবগত। সপ্তাহান্তর "কৌস্তুভের" কিরণ, বঙ্গের সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইত।

—০*০—

৬৫। সত্য-ধর্ম্ম-প্রকাশিকা।

(১২৫৬ সাল, ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দ)।

"সত্যধর্ম্ম-প্রকাশিকা" সত্য সত্যই কি, যথার্থ ধর্ম্মমত-ঘোষণায় ব্রতী হইয়াছিলেন, কিংবা তদ্বিপরীত রীতি-নীতিতে তাঁহার মতির গতি, প্রধাবিত হইয়াছিল, পশ্চাদ্বর্ণিত বৃত্তান্তে তাহা ব্যক্ত হইবে। "কর্ত্তাভজা"-সম্প্রদায়ের

---

* "বঙ্গবাসীর" সম্প্রদায়, যখন "জন্মভূমির" পরিচালন করিতেন, তখন পর্য্যন্ত এই সন্দর্ভের ১৪শ (চতুর্দ্দশ), অংশ প্রকাশিত হয়। সুতরাং বর্ত্তমান প্রস্তাবটী, ১৫শ প্রবন্ধ।

মতামত-সমর্থনই, ইহার লক্ষ্য ছিল। সম্পাদক মহাশয়ের উদ্যম, অনলসতা বা অধ্যবসায়, তাদৃশ প্রশংসাযোগ্য ছিল না। কিসেই বা উত্তম উদ্যম হইবে, বল! একটীমাত্র সংখ্যা-প্রচারের পরেই, উহা রহিত হইয়া যায়। এই বর্ষের অধিকার-সীমাতেই না কি—

—০*০—

৬৬। "ভৈরব দণ্ড।"

৬৭। "সুজন-বন্ধু।"

৬৮। "জ্ঞানচন্দ্রোদয়।"

এই ৩ (তিন) জন, আবির্ভূত হয়েন? "ভৈরব দণ্ড" তো এক হরেরই জানি। এ আবার কাহার ভীষণ যষ্টি? প্রথম প্রথম, বিষয়টী, বিদিত হইবার পথে তীক্ষ্ণ কণ্টক-জাল নিক্ষিপ্ত ছিল। উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য, কাশীধাম হইতে উহার প্রচারারম্ভ করেন। "রসমুদ্গরের" সঙ্গে ভীষণ রণের কারণেই উহার জীবন-হরণ হয়! "ভৈরব-দণ্ডের" পরই "সুজন-বন্ধু"র আবির্ভাব, একান্তই স্বাভাবিক। সজ্জন-বান্ধব হইবার অবশ্যম্ভাবি-ফল—"জ্ঞানচন্দ্রোদয়" বটে।

ইহাদের সম্যক্ পরিচয়,অত্যন্ত অপরিচিত। এই অবস্থাতেই ১২৫৬ সালকে (১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দকে) বিদায় দিতে হইল! এটী তেমন সুখাকর সমাচার নয়।

—০*০—

৬৯। সর্ব্বশুভকরী।

(১২৫৭ সাল, ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ।)

প্রত্যেক মাসে একটীমাত্র 'সিকি' দক্ষিণা দিলেই, "সর্ব্বশুভকরী" প্রসন্ন-চিত্তে লোককে দর্শন না দিয়া, নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না। প্রতি সংখ্যার অবয়ব, ১০ (দশ) পৃষ্ঠা।

(ক) শৈশব বিবাহ,

(খ) রামাগণের বিদ্যাশিক্ষা,

(গ) মানবগণের সমত্ব,

(ঘ) সুরা-সেবন-নিষেধ,

(ঙ) গঙ্গাযাত্রা-মৃত্যু,

(চ) চড়ক পূজা ও পার্ব্বণ,

ইত্যাকার প্রবন্ধ-নিকরেই এই সাপ্তাহিক পত্রিকাখানির অঙ্গ, সুদৃশ্য ও

সুন্দর দেখাইত। কলিকাতাস্থিত ইংরাজী-শিক্ষিত দলের অগ্রণী ছিল,—এই "সর্ব্বশুভকরী" পত্রিকা। অনন্ত ব্যোমে যেমন জ্যোতিঃ-পদার্থ, ক্ষণপ্রভাবৎ স্বল্পকাল কিরণ, বিকিরণ করে এবং যেমন অল্পক্ষণেই তাহা, বিনাশ প্রাপ্ত হয়, "সর্ব্বশুভকরীরও" সেই দশা। মতিলাল চট্টোপাধ্যায়, ইহার পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন। †

—০*০—

৭০। ধর্ম্ম-মর্ম্ম-প্রকাশিকা।

(১২৫৭ সাল, ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ।)

এটী উপনগরীয় পত্রিকা। "কোন্নগর"-স্থিত সভা-বিশেষের মুখ-পত্র এটী। কিন্তু সংবাদ, ঐ পর্য্যন্তই। ইহার জীবন, অধিক দিন-স্থায়ী হয় নাই। সকলই মনস্তাপের বিষয়।

—০—

৭১। সত্য-প্রদীপ।

(১২৫৭ সাল, ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ)।

"ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া" ইত্যাদির সহায়তায় ও অনুকূলতায় "সত্য-প্রদীপের" দীপ্তি, আমাদের অনুভূত হইয়াছে। টাউন্‌সেণ্ড, এই "প্রদীপের" প্রভূত পরিচর্য্যায় ব্যাপৃত ছিলেন। 'শ্রীরামপুর' হইতেই, এই "প্রদীপ", প্রজ্বলিত হইত। ৭ (সাত) দিনের মধ্যে কোন এক দিনে "প্রদীপ" প্রকাশ পাইত না। সপ্তাহে সপ্তাহে এই "প্রদীপ" জ্বলিত। দ্বাদশ মাস ব্যাপিয়া, এই "সত্য-প্রদীপ" অবিচ্ছেদে জ্বলিয়াছিল। তাহার পর "প্রদীপ" নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছিল। স্নেহে (যত্নে) সকল পদার্থেরই সংবর্দ্ধনা হয়। আর, স্নেহেই (তৈলেই এবং যত্নেই) দীপও, উজ্জ্বল হইয়া থাকে। পাদরিদের স্নেহা-ভাবেই, এই "সত্য-প্রদীপ" প্রথমতঃ ক্ষীণজ্যোতিঃ হইয়া, বর্ষান্তে নির্ব্বাপিত হইয়াছিল।

"প্রদীপের" আলোক-অবলোকনে অনেকেরই অতীব অনুরাগ জন্মিয়াছিল। "প্রদীপ"-সন্দর্শক-বৃন্দের সংখ্যা, বুঝিবার জন্য পাঠকবর্গকে আমরা, পশ্চান্নিবদ্ধ তালিকায় নেত্র-নিক্ষেপে অনুযোগ করি। যথা,—

† পশ্চাৎ যথাসময়ে দৃষ্ট হইবে, "শুভকরী" নামে এক পত্রিকা ছিল।

ক।	হিন্দু	...	১৭৬ (একশ ছিয়াত্তর) জন।
খ।	ইয়ুরোপীয়	...	৪৮ (আটচল্লিশ) জন।
গ।	মুসলমান	...	৪ (চারি) জন।
ঘ।	এ-দেশীয় খৃষ্টান	...	২ (দুই) জন।
	মোট সংখ্যা	...	২৩০ (দুই শত ত্রিশ) জন।

"সত্য-প্রদীপ" প্রয়োজনীয় পদার্থসমূহে পরিপূর্ণ থাকিত। সংবাদ, প্রেরিতপত্র, প্রাকৃতিক বস্তু ও শিল্প জ্ঞানের বিবরণ ও তাহাদের চিত্রময় প্রতিরূপ—ইত্যাদিতে পত্রিকার কলেবর, সুসজ্জিত থাকিত। আকৃতি, কোয়ার্টো (Quarto) অর্থাৎ চারি-পৃষ্ঠা-পরিমিত। ৬ (ছয়খানি) কাগজে ৪ (চারি পৃষ্ঠায়) বিষয়গুলি, মুদ্রিত হইত। বার্ষিক দর্শনী ৬৲ (ষট্) মুদ্রা।

এই বৎসরের আরও ৩ (তিন) খানা সমাচার-পত্রিকার সমাচার না দিলে, পাঠক মহাশয়েরা, আমাদিগকে অব্যাহতি দিবেন না। সে গুলির নাম, যথাক্রমে বলিতে গেলে, অগ্রেই "সুধাংশু"-পত্রটী, স্মৃতি-পথে সমুদিত হয়। তৎপরেই "বর্দ্ধমান-চন্দ্রোদয়" এবং "বর্দ্ধমান-সংবাদ" মফস্বলের এই ২ (দুই) পত্রিকার নাম, উল্লেখ করিতে হয়। সুতরাং সংখ্যানুসারে—

(ক)। সুধাংশু।
(খ)। বর্দ্ধমান-চন্দ্রোদয়।
(গ)। বর্দ্ধমান-সংবাদ।

ইহাদের সঙ্গেই, ১২৫৭ সালকেও (১৮৫০ খৃষ্টাব্দকেও) বিষম বিপাকে পড়িয়াই, যেন বিদায় দিতে হইল। নিম্নে ঐ ৩ (তিন) বিবরণ দিলাম।

—*—

৭২। সুধাংশু।

(১২৫৭ সাল—১৮৫০ খৃষ্টাব্দ)।

"সুধাংশুর" কিরণ, বর্ষণ হইয়াছিল—এক বর্ষ-ব্যাপক কাল। কৃষ্ণমোহন বসুজ, "সুধাংশুর" জনক। খৃষ্টানি মতের পরিপুষ্টির নিমিত্তেই ইহার উৎপত্তি। সাহিত্যে ও সমাচারে উহার অঙ্গসৌষ্ঠব বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

—*—

৭৩। বর্দ্ধমান-চন্দ্রোদয়।

(১২৫৭ সাল হইতে ১২৫৮ সাল পর্য্যন্ত
অর্থাৎ
১৮৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত)।

রামতারণ ভট্টাচার্য্যের অধিনায়কত্বে "বর্দ্ধমান-চন্দ্রোদয়" অভ্যুদয় পায়। তিনি একাধিক বর্ষও, উহাকে সজীব রাখিতে সমর্থ হয়েন নাই। সুতরাং তদ্দ্বারা অধিকতর কার্য্য-সম্পাদন, কিরূপেই বা সম্ভাবিত হইবে ?

—*—

৭৪। বর্দ্ধমান-সংবাদ।

(১২৫৭ সাল—১৮৫০ খৃষ্টাব্দ)।

যেমনই "বর্দ্ধমান-চন্দ্রোদয়" প্রকাশিত হইতে থাকিল, অমনই "বর্দ্ধমান-সংবাদ" আসরে নামিলেন। তদানীন্তন বর্দ্ধমান-মহারাজ, এই নবপ্রকাশিত শিশুর লালনাদির ভার লইয়াছিলেন। কিন্তু, বড় মানুষের খেয়াল, কত কাল চলে ? আমরাই বলিয়া দিতেছি,উহার জীবনের সত্তা,বহুদিন বর্ত্তমান ছিল না।

—*—

এই আবার উত্তর-কালে (পরবর্ত্তী সময়ে) গিয়া উপস্থিত হইলাম।

৭৫। জ্ঞানোদয়।

(১২৫৮ সাল, ১৮৫১ খৃষ্টাব্দ)।

কোন্নগর-নিবাসী চন্দ্রশেখর কর্ত্তৃক "জ্ঞানোদয়" চালিত হইত। "জ্ঞানোদয়"- অধ্যয়নে কত লোকের কত উপকার হইয়াছিল, কিছুই জানিবার উপায় নাই। পরমায়ুর অল্পতা-হেতুই পত্রিকার ঐ দশা ঘটে। সম্পাদক এই "চন্দ্রশেখর" স্বনামখ্যাত "ব্রাহ্মধর্ম্মাশ্রিত" ডেপুটী কালেক্টার বাবু "চন্দ্রশেখর দেব" বৈ আর কেহই নহেন।

—*—

৭৬। জ্ঞানদর্শন।

(১২৫৮ সাল হইতে ১২৫৯ সাল পর্য্যন্ত
অর্থাৎ
১৮৫১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত)।

ইহার- উৎপত্তি-ক্ষেত্র, কিছু জটিলতাময়। "চন্দ্রিকাযন্ত্রালয়ই"—এই

"জ্ঞান-দর্শনের" উদ্ভবস্থল। মতান্তরে—পবিত্র বারাণসীর কোন "লিথোগ্রাফ প্রেসে" "জ্ঞান-দর্শনের" অঙ্গরাগ ঘটিত। এই ঘটনা-দ্বয়ের মধ্যে কোন্ মতটী যে, সমীচীন, তাহার স্থিরতা নাই। নিশ্চয় জানিয়াছি—শ্রীপতি মুখোপাধ্যায় মহাশয়, "জ্ঞানদর্শনের" পরিচালনে ব্রতী ছিলেন।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

কালিন্দী।

রূপ-কথা।

(১)

"বাঙ্গালায় কি রূপসী নাই? কিংবা বাঙ্গালার পুরুষগুলা, অবগুণ্ঠনবতী কামিনী দেখিলেই, রূপের কলসী অনুমান করে; আমরা চিকের ভিতর হইতে, গাড়ীর খড়খড়ির মধ্য হইতে, থিয়েটারের শান্তিপুরে-জালের অন্তরাল হইতে, পুরুষসকলকে দেখি;—ভাল করিয়াই দেখি,—নিভৃতে মনে মনে একাগ্রচিত্তে দেখি—দেখিয়া, তুলনায় সমালোচনা করি। আমরা জানি, বাঙ্গালায় কয়েকটা পুরুষ সুন্দর, ও কয়েকটা কুৎসিৎ। কিন্তু পুরুষেরা কেমন করিয়া জানিবে—আমাদের মধ্যে কে রূপসী, কেইবা কুৎসিতা? গঙ্গা-স্নানের সময় তাহারা চপলা-বিকাশের ন্যায়, একবার এক নজর আমাদিগকে দেখিয়া লইতে চেষ্টা করে, কিন্তু দেখার মত দেখা হয় না। তাহারা—

কি জানি কি ঘুম ঘোরে
কি চোখে দেখেছি তোরে,—

এই ভাবে আমাদিগকে দেখে, আর কেবল সুন্দরী দেখে। এক একটা পুরুষ আবার এমন সৌন্দর্য্য-পাগলা যে, পুরুষমানুষকেই সুন্দরী সাজাইয়া তাহার সৌন্দর্য্যে বিভোর হইয়া পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথকে হরিদাসী বৈষ্ণবী সাজাইয়া, তাহার রূপে পাগল হইয়াছিলেন;—সে রূপ বর্ণনা করিতে করিতে বঙ্কিমচন্দ্রের দেড়সের লাল-পড়িয়াছিল। গলায় দড়ি! বাঙ্গালাদেশে কি আর মেয়েমানুষ ছিলনা গা!

আবার এক রকমের পুরুষ আছে, যাহারা ঘোমটার উপর চটিয়া, অবরোধ প্রথার উপর অভিমান করিয়া বলে, যে স্ত্রীলোক সুন্দরী নহে,—সৌন্দর্য্য

স্ত্রীলোকের একচেটিয়া নহে, রূপবান পুরুষই। এই দলের মধ্যে শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার চাঁই। তিনি বলেন, পুরুষের দাড়ি আছে, গোঁপ আছে, পুরুষ সিংহের কেশর আছে, পুরুষ ময়ূরের নানা বর্ণের পাখা আছে, পুরুষ কোকিলের স্বর আছে, পুরুষ বুলবুলীর ঝুঁটি আছে, পুরুষ বৃষের ককুৎ আছে, পুরুষ হস্তির দাঁত আছে, সুতরাং পুরুষ সুন্দর, পুরুষ রূপবান। এ সকল কথা নিরাস-প্রাণের কথা। দেখনা, দেখিতে পাওনা, দেখিতে জাননা;—তাই বুঝনা, আমরা কেমন, কত সুন্দর! আমাদের মন হরণ করিবার জন্য, আমাদের সেবা করিবার জন্যই তোমাদের রূপ, তোমাদের ঐশ্বর্য্য! আমরা যাহাই হই না কেন, আমাদের পায়ের তলায় পড়িয়া থাকিবার জন্য তোমাদের জন্ম।"

(২)

"এইবার আমার কথা বলিব। আমার নাম কালিন্দী; আমার রূপ নাই, কেননা আমার আরসী আছে, সে মুকুরে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিতে আমি জানি, তাই বলিতেছি, আমার রূপ নাই। আমার কপাল আছে, কপোল আছে, নাক আছে, কাণ আছে, ঠোঁট আছে, অধর আছে, চক্ষু আছে, চিবুক আছে, গণ্ড আছে, বক্ষ আছে, শ্রোণী আছে, জানু আছে, আছে সবই, কিন্তু রূপ নাই; সপ্তদশ বর্ষে পদার্পণ করিলে কামিনীর যাহা যাহা থাকা আবশ্যক, আমার সে সব আছে, কেবল নাই রূপ। তাই আমার নাম কালিন্দী; এ বয়সে গর্দ্দভীর রূপ থাকে, অশ্বীরও রূপ থাকে, মানুষীরত থাকিবারই কথা; কিন্তু আমার নাই।—নাই বলিয়া তোমরা পুরুষ-পাঠক আমার এই রূপ-কথা না পাঠ কর, তাহা হইলে আমি দুঃখিত হইব না; এই দুর্ভিক্ষের দিনে, পূজার মরসুমে, বিসর্জ্জনের আন্দোলনে তোমাদিগকে পাগল করিয়া তুলিবার আমার সাধ নাই। তাই আমার দুঃখও নাই।"

"আমার রংটা কাল, জুতার বুরুষের মত কাল নহে, রাণীগঞ্জের কয়লার চাপের মত কাল নহে, বাবুর মাথার পোমেটম মাখা চুলের মত কাল নহে, বাঙ্গালার জনকয়েক নাম-জাদা সাহিত্য-সেবির গায়ের চামড়ার মত কাল নহে, আমার কাল রং আমারই মত কাল। যখন তোমাদের গৃহিণী পূজার সময় অলঙ্কারের ফরমাইস্ করিয়া রোষবিকাশ করেন, তখন তোমরা যেমন কক্ষপূর্ণ অন্ধকার দেখ, আমার রংটাও তেমনি অন্ধকার মাখান।"

"বলাবাহুল্য, আমার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, আমার স্বামী আমাকে ভালবাসেন কি না? সে সংবাদ লইবার আমার অবসর নাই; তবে তিনি আমাকে প্রায়ই পাকানেবু রংঙ্গের বা জাফ্‌রাণের রংঙ্গের বোম্বাই সাড়ী এই পূজার সময় খরিদ করিয়া দেন; কাজেই আমি ভাবি, আমি কাল। আর আদর সোহাগের কথা যদি বল, পুরুষ ত সে সব কারে পড়িয়াই করিয়া থাকে, সুতরাং তাহার মূল্য নাই। আমার নাম কালিন্দী, আমার নিবাস কালীঘাটে, আমার পিতা কালী ঘোষ, আমার স্বামী কালাচাঁদ, আমি কাল নই? বিশেষ ইংরেজের আমলে আমাদের দেশটা কালা আদমীর দেশ হইয়াছে। কালা-কুলীর ঘরণী, কালিন্দী হইবেই ত! ভগিনি পাঠিকে (চটিও না ভাই) তোমরা পুরুষের মন-মজান কথায় আত্মহারা হইয়া আছ, আমার এ কাটা-কাটা বুলী তোমাদের ভাল না লাগিতে পারে, কিন্তু সময় বিশেষে সত্য কথা শুনিয়া রাখা ভাল। আমি কুরূপা।"

(৩)

"স্বামী আমার উকীল। পূজার ছুটিতে তিনি বাড়ী আসিয়াছেন, আসিয়াই থিয়েটার দেখিবার ঝোঁক হইয়াছে, বিশেষতঃ শ্যালিকা, শ্যালকজায়া প্রভৃতির তাঁহার উপর একটা অধিকার আছে, সেই অধিকার জন্য আব্‌দারও চলে, সেই আব্‌দার রক্ষা করিবার জন্য, থিয়েটার দেখিবার কথা স্থির হইল। আমরা "কৃপণের ধন" অভিনয় দেখিতে যাইব, দুইখানি গাড়ীও ভাড়া করা হইল, একখানিতে বালক-বালিকা ও প্রবীনারা যাইবেন, অন্য-খানিতে আমি ছোট-দিদি, মেজ বউ, এবং আমার স্বামী, এই কয়জন যাইব; এই ব্যবস্থামত দুইখানি গাড়ীও ছাড়িল, কালীঘাট হইতে হাতি-বাগান বহুদূর, ঘোড়ার গাড়িতে যাইলেও এক ঘণ্টা লাগে; এই এক ঘণ্টার মধ্যে আমি বুঝিয়াছিলাম, যে আমি কুরূপা, কেননা আমার অবগুণ্ঠন ছিলনা, বিশেষ আমার অবগুণ্ঠন-অন্তরালস্থিত আমার যাবৎ বৈভবই স্বামির সুপরিচিত, আর মেজ-বউ, ঘোমটা টানিয়া মুচ্‌কি হাসির চন্দ্রিকা ছড়াইয়া নন্‌দাইএর সম্মুখে গাড়িতে বসিয়াছে, সেত কখন মুকুরে মুখ দেখে না, তাই তাহার লাবণ্য নবশিশির সিক্ত সেফালীর ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে চারিদিকে যেন ছড়িয়া পড়িতেছিল। আমার স্বামী বুঝিয়াছিলেন, সে সুন্দরী, তাই আমিও বুঝিয়াছিলাম, সে রূপসী লাবণ্যময়ী। বিশেষ আমি ভয় বিহ্বলা হইয়াছিলাম, আমার "কৃপণের ধন" হারাইবার ভয়ে দিশেহারা হইয়াছিলাম, তাই সে রাত্রে মেজবউকে অতি

সুন্দর দেখিয়াছিলাম, সুতরাং আমি যে কুরূপা, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

"পরদিন প্রাতে আমার স্বামী ট্রঙ্ক খুলিয়া আমাকে একখানি বেনারশি কাপড় দিলেন, সে কাপড়ের রং বসুন্তি, একটি ভাল মখমলের সল্মার কাজ-করা বডি দিলেন, মখমলের রং বেগুণে, আমি বুঝিলাম, আমি কাল।"

(৪)

"দেবী পক্ষের পূর্ব্বে অপর পক্ষ বা তর্পণ পক্ষ, কেন হয় জান? আমি দাসী হইলেও দেবীর মর্ম্ম বুঝি, তাই সে কথাটা আগে বলি। এখন যে রকম ঘরে ঘরে দেবীর পূজা হয়, তাহাতে পিতৃপুরুষের শুষ্কমুখে তিলাঞ্জলি দানটা পূর্ব্বেই করিয়া রাখা ভাল। নইলে সে কাজটা সারা বছর আর হইবে না, দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিলে হওয়া সম্ভবও নয়। দেবীর আরাধনা শুক্লপক্ষে হয়, তাই গৃহদেবী যাহাই হউন না কেন, তিনি চারুচন্দ্রিকা দীপ্তি-ময়ী, আর পিতৃকার্য্য কৃষ্ণপক্ষে হয়—কালা আদমীর কার্য্য কি না!"

"পূজা আসিয়াছে, স্বামীও নিকটে আসিয়াছেন, জেলা আদালতের ছুটিও একমাসব্যাপী, কিন্তু ঐ দেখনা, তিনি দারজিলিং যাইবেন বলিয়া গ্লাড-ষ্টোন ব্যাগে কাপড় গুছাইতেছেন। তবে কেন না বলি, আমি কুরূপা! দারজিলিঙ্গে তুহিন-বিমণ্ডিত চিরস্থায়ী কাঞ্চনজঙ্ঘা আছে, তুহিন-ধবল-কান্তি বিদেশিনী বিহার করিতেছে, সে দেশে পুরুষ যাইবে না কেন? আবার এখনও কি বলিব, আমি কুরূপা!"

"কিন্তু আমার রূপ আছে, সে রূপ আমার রূপ কি আমার অবগুণ্ঠনের রূপ, জানিনা, কিন্তু পাড়ার অনেক মরকটই অবগুণ্ঠনবতী আমার প্রতি কি জানি কেমন ভাবে মাঝে মাঝে তাকাইয়া থাকে। যখন তাকায়, তখন আমাতে দেখিবার কিছু আছে। পুরুষের রূপ দেখিবারই আকাঙ্ক্ষা, যখন আমাকে দেখিয়া রূপের অন্বেষণ করে, তখন বোধ হয়, আমাতে রূপ আছে, কিন্তু সে রূপ সংসারে দৃষ্টিতে বি—রূপ, কাজেই ভয় হয়, আমার রূপ নাই!"

রূপের কথা এত বলিলাম কেন, জান? পুরুষ-লিখিত নাটক নভেল প্রভৃতি সকল পুস্তকেই স্ত্রীলোকের রূপ-বর্ণনা বাহুল্য দেখা যায়। আর আমার এই কামিনী-কলম-কলঙ্কিত কালিন্দী-কথায় রূপের উল্লেখ কেননা থাকিবে! পুরুষ নিজের রূপ বর্ণনা করে না, আমি কিন্তু আমার রূপের বর্ণনা করিলাম।"

(৫)

"স্বামী দ্বারজিলিং গিয়াছেন, আজ পূজার পঞ্চমী, পোটো মায়ের মুখে ঘাম তেল মাখাইতেছে, ফরাস পাল টাঙ্গাইতেছে, পূজার দালান পরিস্কৃত পরিমার্জ্জিত হইতেছে, বাড়ীতে সকলেই ব্যস্ত, কাজ নাই কেবল আমার। আমি পুত্রবতী নহি, আমার বড়দাদা বিপত্নীক, তাহার পুত্র নাই, মেজ বউ আমার মতন,—মেজদাদা এখনও বিদেশ হইতে বাড়ী ফিরেন নাই; সুতরাং আমাদের কাহারই কোন কাজ নাই। পূজার কার্য্যে জেঠাইমা খুড়ীমা মা,—বর্ষীয়সী সকলেই ব্যস্ত আছেন, আর আমরা নিজেদের বয়স লইয়া বসিয়া আছি, কাজেই বলিতে হয়, আমি কুরূপা; মেজ বয়ের খবর কেন দিব, সে নিজের ভাবেই নিজে মগ্ন আছে, আর যদি মেজদাদা বাড়ী আসিয়াই দারজিলিং বেড়াইতে যাইত, তাহা হইলে বলিতাম, মেজবউও কুরূপা।"

"পঞ্চমীর সন্ধ্যার সময় মেজবয়ের নামে একখানি পত্র আসিল, লেফাফার উপর হস্তাক্ষর দেখিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম, কারণ সে হস্তাক্ষর আমার স্বামীর, পত্রখানি পাঠ করিয়া মেজ বউ আমাকে দেখাইল, আমি কুরূপা কালিন্দী বলিয়াই দেখাইল। পত্রে লেখা আছে, "মেজ বউ, আসিবার সময় তোমার মুখখানি দেখিয়া আসিতে পারি নাই, তোমায় কিছু দিয়া আসিতে পারি নাই, অপরাধ লইওনা, দারজিলিং হইতে কোন্ সামগ্রী লইয়া যাইলে তুমি সুখী হও, পত্র পাঠ আমাকে লিখিয়া পাঠাইবে" ইত্যাদি ইত্যাদি। বল দেখি ভাই, এখনও কি আমি সুন্দরী!

"পরদিন ষষ্ঠির প্রাতঃকালে নগেন্দ্র আমাদের বাড়ী আসিল, নগেন্দ্র আমার শ্বশুরের প্রতিপালিত দরিদ্র সন্তান; দূর সম্পর্কে শ্বশুরের ভাগীনেয়। নগু ঠাকুরপো আসিয়াই হাত মুখ না ধুইয়াই আমাকে বলিয়া পাঠাইলেন, "বউঠাকরুন, আপনাকে আজ আমার সঙ্গে সুকচরে যাইতে হইবে, আমি টানা গাড়ীতে লইয়া যাইব।" এ কথার উপর উত্তর নাই, হিন্দু রমণীর শ্বশুর গৃহই সর্ব্বস্ব, সুতরাং আমাকে সেই দিনেই যাইতে হইল।

"আবার সেই ঘোড়ার গাড়ী! একদিন সন্ধ্যার সময় এই ঘোড়ার গাড়ীতে চড়িয়া মেজবউকে বড় সুন্দরী দেখিয়াছিলাম, আর আজ অপরাহ্ণে ঘোড়ার গাড়িতে চড়িয়া নগেন্দ্রকে অতি সুন্দর দেখিতেছি, এক একবার মনে হইতেছে, যে আমার এই পাঁস ঢাকা কুরূপ কোথাকার মলয় পবনের ফুৎকারে যেন নূতন ভাবে জ্বলিয়া উঠিয়াছে।"

"কেন এমন হয়;—অতি-পরিচয়ে রূপের অভাব-বোধ, অপরিচিতের কাছে রূপের এমন প্রভাব বোধ—কেন হয়? পথে যাইতে যাইতে নগেন্দ্র একবার আমাকে বলিয়াছিল, "বউ, তোমার নাম কালিন্দী কেন হইল, তোমার ত বেশ রূপ, দাদাই বা দারজিলিং গেলেন কেন?" এই কথাগুলি শুনিয়া শুষ্ক ভূমিতে জলবিন্দু পাতের মত কি যেন একটা স্নেহশিক্ত শীতল ভাব হৃদয়ের মধ্যে ডুবিয়া গেল। আমি মরিলাম—রূপে মরিলাম, মোহে মরিলাম, ক্ষোভেও মরিলাম।"

"পূজার তিন দিন শ্বশুর-গৃহে অবগুণ্ঠনবতী হইয়া থাকিতে হইল; আর বাড়ীর সকলে আমার রূপের ব্যাখ্যা করিতে লাগিল, আমার শাশুড়ী পাড়ার প্রতিবেশিনীগণের কাছে কেবলই বলেন, "বউমার আমার কেমন মাজা রং, কেমন মানান সই গড়ন, ধীর চলন, বড় বড় চোখ, পাতলা পাতলা ঠোঁট, আর অষ্ট প্রহরই ভয়ে যেন জড়সড় হইয়া আছে। মা আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মী।" আমি শাশুড়ীর মুখে এই কথা শুনিয়া পূর্ব্বের মত আরসীতে মুখ দেখিতে ভুলিয়া গেলেম, শাশুড়ীর দেখান প্রতিবিম্ব অহরহ আমার নয়ন-কোনে নাচিতে লাগিল। আর নগেন্দ্র, সে কেবলই আমার প্রতি চাহিয়া থাকে, এক গলা ঘোমটার মধ্য হইতে সে দৃষ্টির ভঙ্গি দেখিতে পাই না বটে, কিন্তু সকল সময় তাহা বুঝিতে পারি। তবে কি আমি রূপসী।—না, না—আমি পোড়ার মুখী!"

"সকলের পকেটে ঘড়ী থাকে, কিন্তু সকলের ঘড়ি এক যায় না, একটু তফাৎ চলে। সকলের কপালের উপর এক জোড়া চক্ষু আছে, কিন্তু সকলের চক্ষুই এক সামগ্রী, এক সময়ে এক দেখে না, একটু তফাৎ দেখে। আমার রূপও—কাপড়-ঢাকা বলিয়া সকলে সমান দেখিত না; আমার স্বামী যাহা দেখিতেন, নগেন্দ্র তাহা দেখিত না, আমার মা যাহা দেখিতেন, আমার শাশুড়ী তাহা দেখিতেন না। গোল ত এইখানেই;—সর্ব্বনাশ ত এই বৈষ্যমেই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু বৈষ্যমই মনুষ্য-সমাজের ব্যবস্থা। বৈষম্য-বৈচিত্র লইয়াই মনুষ্য চরিত্রের পুষ্টি; আমার পোড়া কপাল যে, আমি মানুষ, রক্তমাংস দিয়াই আমার দেহ গঠিত।"

"আর আমার রক্তমাংসের দেবতা, আমার ভিক্ষার ঝুলি, দারিদ্র্যের ছিন্ন কন্থা, পিপাসিত পথিকের জলপাত্র, অন্ধের যষ্টি, ইহকালের ঐশ্বর্য্য, পরকালের সুখ,—আমার স্বামী; এখন দার্জ্জিলিঙ্গে। আমার খেলা ঘরের পুতুল,

বাক্সের আতরের শিশি, চক্ষের অঞ্জন, সীমন্তের সিন্দূর, অঞ্চলের চাবি, হৃদয়ের নিধি, আমার স্বামী এখন দার্জিলিঙ্গে! আর আমি বাপের আদরের মেয়ে, শাশুড়ীর সোহাগের বধূ, প্রতিবেশিনীর গৌরবের ধন, নগেন্দ্রের ইপ্সীত পারিজাত কুসুম—আমি সোহাগে গলিয়া নর্দ্দামায় গড়াইয়া পড়িলাম। আকাশের শিশির বিন্দু হইয়া ক্লেদ-কর্দ্দমে মিশিলাম।"

(৬)

"যাহা আমার নয়, তাহাই কি মিষ্টি? যাহা পূর্ব্বে পাই নাই, তাহাই ত অপূর্ব্ব। মেজবউ আমার স্বামীর দৃষ্টিতে অপূর্ব্ব, আর আমি আমার দৃষ্টিতে অপূর্ব্ব,তাই আমার সর্ব্বস্ব,আমি ধূলি মুষ্টিময় বায়ুপ্রবাহ-মুখে উড়াইয়া দিয়াছি।

যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিয়াছে, যাহা নিয়তিতে ছিল, তাহাই হইয়াছে।

কিন্তু এমন কেন হয়? তোমরা পুরুষ, তোমাদের জন্য সংসার, তোমাদের জন্য আমরা—তোমরা কেন এমন হইতে দাও? নাটের গুরু নটবর,কখন ফুল মাথায় রাখে,কখন বা সেই ফুল ছিঁড়িয়া দেখে; আমাকে এখন সংসার ছিঁড়িয়া দেখিতেছে। ছেঁড় তোমরা, দেখও তোমরা, শেষে নিন্দা করও তোমরা। আর সেই নিন্দার প্রতিশোধ-স্বরূপ প্রেতনীর আকার ধারণ করিয়া আমরা সমাজের স্কন্ধে অজমুণ্ড বসাইয়া দিই, এবং মনুষ্য মস্তকটি লইয়া চিবাইয়া খাই। দোষ কাহার? দোষ ত আমার নয়, আমি সংসারে ছিলাম, এখনও আছি, আমাকে সংসার যেমন করিয়া গড়িয়াছে, আমি তেমনিই হইয়াছি। যে সংসারে আমার স্বামীর স্থান ছিল, সেই সংসারে নগেন্দ্রও ছিল; যে সংসারে আমার মা ছিলেন, সেই সংসারে আমার শ্বশ্রূও ছিলেন, আর সেই সংসারে আমিও আছি। তাই কি আমি এমন হইলাম?"

"তোমরা সকলে হাততালি দিয়া আমাদের নাচাইও না—নাচিতে আরম্ভ করিলে আমরা সমাজ-হৃদয়কে মথিত করিয়া ফেলিব।"

"আমাদের ভরসা শ্রীগৌরাঙ্গ, কেননা পতিতের অবলম্বন শ্রীগৌরাঙ্গ। যিনি পিশাচীকে নাম-সুধাপানে অধিকার দিয়াছেন, তিনিই আমাদের ত্রাণের পথ পরিষ্কার করিয়াছেন। তোমরাও পতিত—শিক্ষার দোষে সময়ের দোষে তোমরা **পুরুষ-বেশ্যা**। বারাঙ্গনা-বিলাস-বিভ্রম-বিমূঢ়তায় পুরুষ দিশেহারা;—আর পতিত পুরুষের কামকটাক্ষ কজ্জলে আমরা চির-কলঙ্কিনী।"

আমাদের উভয়ের ভরসা কলির দেবতা শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

পার্ব্বত্য-পদাবলী।

অনেকের স্থূল সংস্কার এইরূপ, সমস্ত ছোটনাগপুর প্রদেশ ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি পূর্ণ অরণ্যে ও পর্ব্বতমালায় সমাকীর্ণ। ঐ সকল অরণ্যে ও পার্ব্বত্য প্রদেশে যে সকল লোক বাস করে, তাহারাও অরণ্যজন্তুবৎ অজ্ঞান ও অসভ্য;—যৎসামন্য কৃষি ও শিল্পের অনুষ্ঠান দ্বারা কথঞ্চিৎ জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ছোটনাগপুরের অন্তর্গত মানভূম, বরাভূম, পাতকুম প্রভৃতি স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি অনেকগুলি রাজা আছেন বটে, কিন্তু তাঁহারাও শিক্ষা-দীক্ষা-ধর্ম্ম-কর্ম্মবিহীন পশুরাজবৎ অসভ্য জনগণের অধিপতি মাত্র। তবে কয়েক বৎসর হইতে সুসভ্য ইংরাজের কল্যাণে তথায় স্কুল-পাঠশালার সৃষ্টি হওয়ায় সাধারণ সুশিক্ষার বিস্তার হইতেছে, এবং বহুকাল হইতে অন্ধতমসাবৃত অরণ্য ও গিরিকন্দর মধ্যে পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোক প্রবেশ করিতেছে, কিন্তু প্রকৃত ঘটনা এরূপ নহে। বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, তত্রত্য নরপতিগণের রাজ্যাধিকার অল্পায়ত হইলেও তাঁহারা সকলেই ক্ষত্রিয় এবং তাঁহাদিগের আচার-ব্যবহার, ধর্ম্ম-কর্ম্ম, রাজনীতি সকলই পূর্ব্বতন হিন্দুরাজগণের সদৃশ। সাধারণ প্রকৃতিপুঞ্জ দরিদ্র ও তাহাদিগের বর্ত্তমান আচার-ব্যবহার কিয়ৎ পরিমাণে ভ্রষ্ট হইলেও তাহাদিগের মধ্যে এককালে সুশিক্ষা ও সদ্ধর্ম্মের আলোচনা ছিল, তাহার ভূরি নিদর্শন অন্তঃসলিলা নদীর ন্যায় সেই প্রদেশের স্থানে স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে।

সম্প্রতি আমরা পুরুলিয়া জেলার নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া ঐ নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অধিকন্তু এরূপ প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে, যাহারা এখন অরণ্যবাসী অশিক্ষিত বলিয়া পরিচিত, এককালে তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা সংস্কৃত হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় সুশিক্ষিত ছিলেন, এবং পবিত্র বৈষ্ণব ধর্ম্মের উচ্চ সোপানে উপবিষ্ট হইয়া প্রেমধর্ম্মের অনুশীলন করিতেন। ঐ জিলার অধিকাংশ লোকই আপনাদিগকে বৈষ্ণব এবং শ্যামানন্দের পরিবার বলিয়া স্বীকার করে। কিন্তু শ্যামানন্দ কে, তাহার কিছুই তাহারা অবগত নহে। ঐ প্রদেশের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত জানিতে পারা যায় এরূপ কোন পুস্তকাদি, কি কোন প্রকার নিশ্চিত নিদর্শন কিছুই তাহারা দিতে পারে না; কেবল রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক কতকগুলি পদ অশুদ্ধ ভাষায় মুখে মুখে আবৃত্তি করিতে পারে। ঐ সকল পদ আলোচনায় জানা যায়, বর্জ্জু বা ব্রজনাথ, দীনু বা দীননাথ,

নরু বা নরোত্তম, রঘুসিং, গৌরসিং প্রভৃতি কয়েকটী পণ্ডিত ও কবি ঐ জিলায় বিদ্যমান ছিলেন, এবং তাঁহারা নিতান্ত প্রাচীন নহেন। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য আমরা কয়েটী পদ, পদকর্ত্তাগণের জীবিতকাল নিরূপণের সহিত প্রকাশ করিলাম।

ঐ পর্ব্বতময় আরণ্য প্রদেশে কিরূপে উচ্চ অঙ্গের বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রচার হইয়াছিল, বোধ হয়, তাহা জানিবার জন্য অনেকেরই কৌতূহল জন্মিতে পারে। সুপ্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা গোবিন্দ দাস স্বরচিত কোন পদের মধ্যে বলিয়াছেন,—

"—ভকত কল্পতরু, অন্তরে অন্তরু,
রোপই ঠামহি ঠাম।—"

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব কলিজীবের কুশলকামনায় ভক্তরূপ কল্পতরু সকল স্থানে স্থানে রোপণ করিয়াছিলেন। তাঁহারই প্রেরণায় অন্যতম 'ভক্তকল্পতরু' শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু উড়িষ্যা ছোটনাগপুর প্রভৃতি দক্ষিণ পশ্চিম বিভাগে অবস্থান করিয়াছিলেন। শ্যামানন্দ এবং তাঁহার সাক্ষাৎ শিষ্য রসিকানন্দ প্রভৃতি দ্বারাই ছোটনাগপুর অঞ্চলের লোকেরা প্রেমময় বৈষ্ণবধর্ম্ম পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থ-পাঠে জানা যায়, শ্যামানন্দ প্রভু, শ্রীনিবাস আচার্য্য এবং নরোত্তম ঠাকুর এই তিনজনে এক সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং তিন জনেই একসঙ্গে দেশে আসিয়া, শ্রীনিবাস বাঁকুড়া অঞ্চলে, নরোত্তম মালদহ অঞ্চলে এবং শ্যামানন্দ উড়িষ্যা অঞ্চলে অবস্থান করেন। এই ঘটনা ন্যূনাধিক সার্দ্ধতিনশত বর্ষ পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল।

নিম্নলিখিত পদটী রাজা রঘুনাথ সিংহ বিরচিত, ইনি পুরুলিয়ার অন্তর্গত জয়পুরের রাজা ছিলেন। রঘুনাথ সিংহ বর্ত্তমান উনিশ শত খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে জন্মগ্রহণ করেন। এই সকল পদাবলী তত্তদ্দেশে ঝুমুর নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

শ্রীরাধার বিরহ বর্ণন।

যবে হরি পুরী মথুরা গেল, দুখ দিয়ে তনু ধিক ভেল,
সব সুখ গেও দূরে।
এ নব যৌবন বিফলে গেল, ভাবি গুণি তনু ঝুরে গো
আজু মোর নাগর মনে পড়ে॥ ধুয়া॥

আর কারি বামে দিয়ে গো ঠেশ, উরুতে বসিয়া বাঁধিব কেশ,
অভাগিনী পাপিনীরে।
আইস বিরহিনি, শ্যাম সোহাগিনি,
আনিয়া বসাইত কোরে গো।
কল্পে (?) যখন হইত মান, কাতরে ধরণী লোটাইত শ্যাম,
গৌরবে না হেরি তারে।
সেই অভিশাপ ফলল সজনি, পিয়া ছাড়ি গেল মোরে গো।
শুনলো সজনি বচন সার, ব্রজে কি নাগর আসিবে আর,
মুঞে তেজল নটবরে।
গাওত রঘুনাথ নৃপতি সাজত হলধরে গো
শ্যাম সাজত হলধরে॥

নিম্নলিখিত পদটী গৌর সিংহের রচিত। এই গৌরসিংহ শিলির রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। শিলিনগর পাতকুম হইতে বিশ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। অনুমান পঞ্চাশ বর্ষ পূর্ব্বে ইনি বর্ত্তমান ছিলেন।

কলহান্তরিতা নায়িকার প্রতি সখীবাক্য।

মান গৌরবি দুর্জ্জয় মানী মানেতে কি মন মজিল।
সাধের মান কি করিলে গো মন-মোহিনি।
(এখন) দগধনে মনবেদনে প্রাণ যাইতে বসিল॥ ধুয়া॥
ত্রৈলোক জীবন, শ্যাম নবঘন, যখন চরণে পড়িল—
তখন দুনয়নে না হেরিলে গো (মনমোহিনী)।
বিমুখ হ'য়ে, শ্যাম কান্দিয়ে, তোমার নিকট তেজিল।
এখন বিরহ জ্বলিল গো (মনমোহিনি)।
তুমি বল শ্যাম আনিতে, মোদের সাধ্য না হৈল—
তখন গৌরাঙ্গিয়া কি বলিল গো (মনমোহিনী)।

এই পদটী বর্জ্জু বা ব্রজরামের রচিত, ইনি জাতিতে তন্তুবায়, ইহার প্রপৌত্রগণ এখন বর্ত্তমান আছেন। ঐ দেশীয় তন্তুবায়গণ প্রকাশ্যরূপে কুক্কুট মাংস ও পলাণ্ডু ভোজন করিয়া থাকে। তন্তুবায়গণ অতিশয় নিম্নশ্রেণীর জাতি বলিয়া পরিগণিত।

গৌর-সন্ন্যাস।

পূর্ণিমার নিশি ছিল কৃষ্ণপক্ষ ক'রে গেল,
বিষ্ণুপ্রিয়া মা জননী কেন্দে কেন্দে আকুল হ'লো।
সোণার বরণ গৌর চান্দ আমার কোথায় গেল ॥ ধুয়া ॥
গৌরকে দেখেছ যা'তে, পদচিহ্ন আছে পথে ?
কাল সকালে নিশিভোরে ও মা বোলে ডেকে ছিল।
ভারতে কি জন্যে এল, কিবা মন্ত্র দিয়ে গেল,
রাধার ভাবে অনুরাগে চাঁচর কেশ মুড়াইল ॥
বলে ব্রজরাম বাণী, শুন মাতা ঠাকুরাণী,
তোর গৌরকে দেখে এলাম ন'দেয় দণ্ডধারী হ'ল ॥

পূর্ব্বোক্ত ব্রজরামের পুত্র গোবিন্দরামের একটী পদ।

মান।

ললিতা বলিছে বাণী, শুন গো রাই কমলিনি,
আইল চিকণ কালা কমল নয়নে।
মান কর কেনে, হের গো রাই শ্রীবংশী বদনে ॥ ধুয়া ॥
শিরে শিখিপুচ্ছ চূড়া, তায় বন-ফুল বেড়া,
শ্রীঅঙ্গে চন্দন পীতাম্বর পরিধানে।
গলেতে বসন করি, দাড়া'য়ে রয়েছেন হরি,
বহিছে প্রেমের ধারা সেই কমল নয়নে ॥
কেনে গো করিলে মান, (প্যারি) যা বিনে না বাঁচে প্রাণ,
অধম গোবিন্দ বলে সেবি সে চরণে ॥

নরোত্তম, দীননাথ প্রভৃতির পদগুলি বারান্তরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীকালিনাথ নাথ।

নিধিরামের দুর্গোৎসব।

পঞ্জিকায় এ বৎসর ভারি গোল। কয়েকখানি পঞ্জিকার মতে দুই দিন পূজা, নবমীতে বিসর্জ্জন; কোন কোন পণ্ডিতের মতে ব্যবহারসিদ্ধ তিন দিন পূজা, দশমীর প্রভাতে বিসর্জ্জন। নিধিরাম এখন কি করিবেন? বাড়ীতে প্রতিমা নির্ম্মিত হইয়াছে, পূজা অবশ্যই করিতে হইবে, দুর্গাভক্ত সাহেববিবিগুলিকেও অবশ্য আমন্ত্রণ করিতে হইবে; কিন্তু কোন্ মতে?

নিধিরাম বাবু কোন প্রকার মতামতের ধার ধারেন না; নিজের মতেই কার্য্য করিতে ভালবাসেন। এ বৎসর পঞ্জিকার মতে পূজা করিতে পারিবেন, কিন্তু বিজয়াতে যখন গোল, তখন তিনি কোন মতেই বিসর্জ্জন করিতে পারিবেন না;—বিসর্জ্জন করিবেন না। তবে তিনি কি করিবেন?

নূতন প্রকারে নিধিরাম ঠাকুর মহানবমীর দিন মা দুর্গার একটী স্তব করিবেন। দিন থাকিতে থাকিতে সেই স্তবটী তিনি রচনা করিয়া রাখিয়াছেন। ১৩০৭ সালের নূতন পঞ্জিকার গণনায় ১৭ই আশ্বিন বুধবার নবমী ৫ দণ্ড ২৯ পল ১৮ বিপল। ঐ সময়ের মধ্যেই মহানবমী পূজা, বলিদান, এবং হোম সমাপন করিয়া নিধিরাম মহাশয় মা দুর্গার স্তব করিবেন; বিসর্জ্জন করিবেন না। নিধিরামের স্বরচিত স্তবটী নিম্নভাগে বর্ণবদ্ধ করা হইল।

নিধিরামের দুর্গাস্তোত্র।

শারদে! অভয়পদে নমি নতশিরে,
হৈমবতি! বিশালাক্ষি! হরমনোহরা,
ভবানি! ভবেশজায়া, মহিষমর্দ্দিনি!
কৃপাময়ি! কৃপাদৃষ্টি কর দীনদাসে।
মা তোমার আশীর্ব্বাদে করি সমাপন—
শারদীয়া মহাপূজা, সুখদ শরতে,
ভক্তিভাবে ভবরাণি! শঙ্করমহিষি!
নবমী আজি মা দুর্গে! মহাপুণ্য-তিথি!
পঞ্জিকার পণ্ডিতেরা শাস্ত্রসিন্ধু মথি,
বিধি দিয়াছেন দেবি! এ নব বৎসরে—

নবমীতে বিসর্জ্জন হবে মা তোমার!
এ কি বিড়ম্বনা মাগো, দুর্গতিনাশিনি ?

একি মা আনন্দময়ি! আনন্দপ্রসূতি
ভবে তুমি, ভবাঙ্গনা, দেবী মহামায়া,
নিরানন্দ আনিবে কি নবমী বিকালে ?
মহোৎসবে মহালক্ষ্মি! হবে কি বিজয়া ?
হয় হোক্, ইচ্ছা তব, ইচ্ছাময়ী তুমি ;
কে লঙ্ঘিবে তব ইচ্ছা, এ ভবসংসারে ?
যে পারিবে সে করিবে বিজয়া-নবমী,
বিজয়া দশমী বাক্য ভুলিবে যাহারা,
নিষ্ঠুর তাহারা তারা, ইহ বঙ্গভূমে!
আমি কিন্তু পারিব না (ক্ষম ক্ষেমঙ্করি!)
আচরিতে নিষ্ঠুরতা কভু পারিব না
নবমীতে মা তোমারে দিতে বিসর্জ্জন!
বিসর্জ্জন করিব না, রাখিব মন্দিরে।
দ্বিতীয় বরষে দেবি, পূজিব আবার,
ভবের ভকতবাঞ্ছা রাঙা পা দুখানি!

থাকো মা কৈলাসেশ্বরি! দাসের ভবনে,
যেওনা কৈলাসে দেবি, এ মম মিনতি!
অসভ্য এ বঙ্গদেশ, গণেশ কার্ত্তিক
অসভ্য রূপেতে দেখা দেন চিরদিন ;
মূষিকবাহনে চড়ি ফুলাইয়া ভুঁড়ী,
শুঁড় নেড়ে খেতে যান কদলীর পাতা,
(কলাবউ লজ্জা পান ঘোম্‌টা টানিয়া,)
এই কাজে পটু মাগো, তব গজানন!
পক্ষীপৃষ্ঠে আরোহিয়া উড়িয়া উড়িয়া,
বেড়ান কার্ত্তিক বীর, ধনুঃশর করে!

অসভ্য পাহাড়ী বন্য, কার্ত্তিক গণেশে
বিলাতে পাঠাব আমি সভ্য করিবারে!
ভাল ভাল স্বর্ণকেশী সুন্দরী সুন্দরী—
বিবি বিয়ে করাইব, পরাইব হ্যাট্।
পালাবে পিকক্ পাখী, লুকাইবে র‍্যাট্।

কলামুখী কলাবউ, সাজিবেন বিবি।
খুলিবেন গণপতি, বিবিদের লিবি।
ষড়ানন ইঙ্গভূমে তুষি ইঙ্গগণে,
অবশ্য দিবেন তথা ব্যারিষ্টারী পাশ!
অথর্ব্ব গণেশ দাদা, সাদাদের দলে,
লভিবেন ইহবঙ্গে সিবিল সার্ভিস্।
কত সুখী হবে তুমি হিমাদ্রি-নন্দিনি!
হেরিয়া তনয় দুটী বৎসরেক পরে!
তোমারেও মহাদেবি! সুবেশে সাজাব।
ছি ছি মাগো একি সজ্জা! ও বরাঙ্গ তুমি,
ঢাকিতেছ বঙ্গে এসে ডাকের ভূষণে!
কি লজ্জা! গিরীন্দ্রবালা! নিধিরাম আমি,
মহানিধি দিয়ে আমি সাজাব তোমারে,
দূর করি ফেলে দিব ডাকের গহনা ;
গাউনে ঢাকিব বপু, কষিত কাঞ্চন,
বনেটে সাজাব দুর্গা মস্তক তোমার ;
কত ফুল, কত পাখী, শোভিবে বনেটে,
কত শোভা বিকাসিবে তব চন্দ্রানন।

যেওনা মা হরধামে, করি নিবারণ,
থাকো মা আমার ঘরে বৎসরের তরে,
বাসনা পূরাও মাগো, এই আকিঞ্চনে—
কাতরে মিনতি করে ভক্ত নিধিরাম।

নিধিরাম আমি দেবি! সিদ্ধিবিধায়িনি,
সিদ্ধ কর সিদ্ধেশ্বরি! মনের বাসনা।
অহরহ পূজির মা শ্রীপদ তোমার,
বিজয়া আমার নাই বিজয়া পিপাসী—
নহি আমি সুরেশ্বরি! বিজয়া উৎসব
করেছিলা রামচন্দ্র ত্রেতা অবতারে,
বধিবারে লঙ্কেশ্বরে সমুদ্রপুলিনে,
পূজে ছিলা যবে দুর্গা; অকালে বোধন
সঙ্কল্পিয়া ষষ্ঠীদিনে ভক্তি উপচারে,
দশভুজা দেবীমূর্ত্তি মঙ্গলরূপিণী;
দশমীতে করেছিলা বিজয়া তোমার,
বিসর্জ্জিয়া সিন্ধুজলে সোণার প্রতিমা!
পুণ্যবান পুণ্যভূমে দাশরথী রাম,
নিধিরাম সে রামের দাসযোগ্য নয়!
রামদাস ছিল যত ভল্লুক বানর।
নিধিরাম রামদাস হইতে কলিতে,
করিতেছে বড় সাধ; কিন্তু মা বিজয়ে!
বিজয়াটী করিবে না তৃতীয় দিবসে।

রাখিব প্রতিমা তব পূর্ণ সম্বৎসর,
হনুমান সম রব ভূমে লুটাইয়া,
পুষ্পাঞ্জলি দিব পদে মাথায়ে চন্দন,
থাকো মা সদয়া হয়ে দাসের কুটীরে।
ভাগ্যবতী কলাবউ এ নব বৎসরে
প্রসবিবে মোচা ফল ফলিবে কদলী,
টপাটপ খাব কলা লুফিয়া লুফিয়া,
বড় রম্ভা বড়ই খাইতে ভালবাসি।
পঞ্জিকা ভাসায়ে দিব সাগরের জলে,
নবমীতে বিসর্জ্জন হবে না ধরায়,
যেওনা কৈলাসাচলে কৈলাসবাসিনি!

তব সহ থাকিবেন দেব শূলপাণি
মহেশ্বর; কৃপা করি নিধিরাম ধামে।
বিহর মহেশরাণি! আশ্রমে আমার,
হৃদয় পাতিয়া দিব কোকনদ পদে,
আরাধিব মহাদুর্গা এই আকিঞ্চন।
থাকিবেন বীণাপাণি, জলধি দুহিতা
লক্ষ্মী; মহাবিশালাক্ষি চঞ্চলা কমলা;
থাকিবে মহিষাসুর, থাকিবে কেশরী,
থাকিবে শ্রীপদপ্রান্তে ইন্দুর ময়ুর;
সবারে করিব পূজা মনের উল্লাসে,
কৃতার্থ হইয়া যাব প্রসাদে তোমার।

বিলাত হইতে ফিরি আসিবেন যবে,
কালাপাণি পার হয়ে জাহাজে চড়িয়া,
বিলাতি পোষাক পরি গুহ গজানন,
হাটে বিভূষিয়া শুণ্ড, কোটে ঢাকি ভুঁড়ি,
কিবা শোভা ধরিবেন ঠাকুর গণেশ;
হাট কোটে শোভিবেন কুমার কার্ত্তিক,
ব্যারিষ্টারি পাশ দিয়া ঝুলায়ে গাউন,
ধনুঃশর তেয়াগিয়ে ধরিবেন ব্রিফ্,
তোমার চরণে আসি করিবেন নতি।
লবেন আমার পূজা প্রফুল্লবদনে,
সর্ব্বরূপ হেরিব মা সর্ব্ব সুখময়,
সম্মুখে নাচিব আমি ফুলায়ে লাঙ্গুল।
লাঙ্গুল ভরসা মম লাঙ্গুলী উপাধি
পাইয়াছে কবি করে বীর হনুমান,
আমিও তাহাই দুর্গে, তব শ্রীচরণে
রামদাস রূপীদাস, ক্ষুদ্র হনুমান।
নাম শুধু নিধিরাম, দেহ মানবের
এই মাত্র ভেদ ভিন্ন ভাবান্তর নাই।

তাই বলিতেছি মাগো, দাসে কৃপা করি
থাকো মা ভবানীপুরে, শঙ্করী ভবানি !

চতুর্ব্বর্গ ফল ফলে শ্রীদুর্গা পূজায়,
আমার কেবল লাভ পাকা রম্ভা ফল।
রম্ভাপ্রাপ্ত নিধিরাম, বলিবে সবাই,
বর দেহ, নিত্য নিত্য রম্ভা যেন পাই।
বিজয়া ভুলিয়ে গিয়ে, সপ্তমী অষ্টমী
নবমীর পুণ্যতিথি, নিত্য যেন শিবে,
বিরাজে দাসের গৃহে ; পূর্ণানন্দে যেন
নিত্য নিত্য পূর্ণ হয় মহা মহোৎসব।
নিত্য নিত্য নব নব কুসুম সৌরভে,
সুবাসিত থাকে যেন দাসের ভবন ;
সুবাসিত ধূপ ধুনা সুবাস বিতরি,
নিত্য নিত্য শোভে যেন তোমার সম্মুখে।
প্রেমপদ্ম নীলপদ্ম পূর্ণ বিকাশিয়া,
অগুরু চন্দন মাখি শত শত দলে,
পাদপদ্মে নিত্য যেন করে নমস্কার।
শঙ্খ ঘণ্টা জগঝম্প বীণা সপ্তস্বরা,
নিত্য নিত্য বাজে যেন তব শ্রীমন্দিরে,
নিত্য যেন শোনা যায় মহোৎসব রব।
রাঙ্গা পদে এই বর মাগে নিধিরাম,
এই মহোৎসব যাচে কৃতাঞ্জলিপুটে।

—*—

নিদয়া হয়োনা দেবি ! দয়াময়ী তুমি,
ছোলা কলা পানিফল আতপ তণ্ডুল,
দিবনা তোমারে শিবে, দিতে পারিব না,
তোমার বিশ্বের বস্তু কি দিব তোমায় ?
ছাগশিশু বলিদান হবেনা এখানে,
সে বিধিটি নিধিরাম রাখেনা পূজায়।

তোষামোদে ঘুস খেয়ে তুষ্ট মহামায়া,
অজ্ঞানেই ভাবে ইহা ; ভক্তের ভাবনা
সে রকম কভু নয়, কভু নয় নয়।
আমিও অজ্ঞান মূঢ়, তবু শিবেশ্বরি !
তত হীন মতি মম কদাচ হবে না।
সচন্দন বিল্বদল পুষ্প গঙ্গাজল,
তাহাও তোমার বস্তু ; কি আছে আমার ?
কি দিয়া পূজিব তবে শ্রীদুর্গা চরণ ?
বস্তু আছে ব্রহ্মময়ি ! তাহাই অর্পিব।
ভক্তি বিল্ব, ভক্তি গঙ্গা, শ্রদ্ধার চন্দন।
মনফুলে মিশাইয়া অর্পিব চরণে,
নিয়ত ইহাই বাঞ্ছা, বাঞ্ছাপ্রদায়িনি !
বাহিরে উৎসব থাকে, থেকে থাকে তাহা,
আনন্দে আনন্দময়ী তুষ্ট চিরদিন।
বাহ্যানন্দে ভক্ত যদি ভক্তি নাহি ভুলে,
পূজা করে মা তোমারে, তুষ্ট তুমি তাহে।

—*—

নিধিরাম বোঝেনা মা অন্তর বাহির,
দয়া করি দয়াময়ি, দিও বুঝাইয়া,
যেওনা কৈলাসাচলে মিনতি আবার,
থাকো মা দীনের বাসে, দীনদুঃখহরা,
বৎসরেক থাকো পুনঃ দ্বিতীয় বৎসরে
পূজিব শ্রীপাদপদ্ম মানসোপচারে।
যেওনা থাকো মা দুর্গে, দুর্গতিবারিণি !
পুনঃ পুনঃ এই বর যাচে নিধিরাম।

সমাপ্ত।

বাঙ্গালা ভাষার লেখক।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বিহারিলাল যখন সেকেণ্ডইয়ারে পড়েন, তখন ২৪ পরগণার অন্তর্গত বারুইপুরে তত্রত্য জমিদার চৌধুরী মহাশয়দেরও ঐরূপ একটী হিন্দুমেলা হইত। বিহারী বাবু জনৈক বন্ধুর আগ্রহে ঐ মেলাতেও একটি কবিতা পাঠ করেন। সেখানেও তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা হয় এবং পুরস্কারস্বরূপ সেখানে তিনি একখণ্ড "মেঘনাদবধকাব্য" উপহার পান। এই সূত্রে বিহারী বাবু যে আর একটি অমূল্যনিধি লাভ করেন, কথাপ্রসঙ্গে এখানে সে কথাটি বলিতেও ইচ্ছা হইতেছে। বারুইপুরের মেলায় কবিতা পড়িতে গিয়া বিহারী বাবু এক কন্যারত্ন দেখিয়া আসেন। সেই কন্যারত্নকে দেখিতে যান, অন্য কোন পাত্রের জন্য; কিন্তু প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে, যথা-দিনে নিজেই সেই কুমারী কন্যাকে লাভ করেন। সেই গুণবতী রমণীরত্ন এখন সন্তানবতী হইয়া স্বামীর গৃহ উজ্জ্বল করিয়া আছেন। উপস্থিত বিহারী বাবুর দুই পুত্র ও এক কন্যা।

পঠদ্দশার পরেই বিহারী বাবু বিষয়কর্ম্মে নিযুক্ত হন। কলিকাতা আহিরীটোলা-নিবাসী ৺রাজমোহন মুখোপাধ্যায়ের কলিকাতা প্রেসের ম্যানেজারীপদ তিনি পান। দিবাভাগে ঐ কাজ করিয়া রাত্রে বিহারী বাবু সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করেন। তাঁহার সংস্কৃত-সাহিত্যের গুরু,—কলিকাতা হাতিবাগান-নিবাসী,—সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ কালিদাস দাস রায় মহাশয়ের সুযোগ্যপুত্র পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল কবিরত্ন মহাশয়। এই সময় বিহারী বাবু মধ্যে মধ্যে মিরর ও ষ্টেটসম্যান পত্রে পত্রাদি লিখিতেন।

"প্রভাতী" নামে একখানি প্রাত্যহিক পত্রের সেই সময় জন্ম হয়। বিহারী বাবু কলিকাতা প্রেসের ম্যানেজার হইলে,—প্রেসের সত্ত্বাধিকারী রাজকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত "প্রভাতী" পত্রিকার সত্ত্বগ্রহণ করেন। সে সময় প্রভাতীর সম্পাদক ছিলেন,—৺পশুপতি মুখোপাধ্যায়। ইনি,—পাউয়ার গার্জ্জনের শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের অগ্রজ। এক বৎসর পরে, বাঙ্গালা সংবাদপত্র-সম্পাদকের একজন মহারথ উক্ত প্রভাতীর সম্পাদক নিযুক্ত হন। তিনি আমাদের বিজ্ঞ, বহুজ্ঞ, সুপণ্ডিত, লেখকশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন সেন গুপ্ত মহাশয়। সেন গুপ্ত মহাশয় অনেককে মানুষ

করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। তাঁহার বহু শিষ্যশাখা আছে। আমাদের বিহারী বাবুও তাঁহার একজন শিষ্য। ক্ষেত্র বাবুর আমলে বিহারী বাবু "কন্যাদায়" সম্বন্ধে প্রভাতীতে এক পত্র লিখেন। প্রভাতীতে বিহারিলালের এই প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়। সেই হইতেই বিহারী বাবু "প্রভাতীর" নিয়মিত লেখক হইলেন। ক্ষেত্র বাবুর পর শ্রীযুক্ত তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রভাতীর সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করেন। তিনি সম্পাদক হইলেন বটে, কিন্তু প্রভাতীর প্রায় যাবতীয় কার্য্য বিহারী বাবুই সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। প্রভাতীতে তাঁহার বহু প্রবন্ধ প্রকটিত হইতে লাগিল। প্রভাতী আপিস পূর্ব্বে রাধাবাজারে ছিল; কিছু দিন পরে উহা রাধাবাজার হইতে উঠিয়া রাজমোহন বাবুর নিজ নিমতলার বাটীতে আসে। এইখানে ঘটনাক্রমে এক সময় কম্পোজিটরগণ অনুপস্থিত হয়। কার্য্যকুশল বিহারিলাল মুখে মুখে রচনা করিয়া, নিজহস্তে সেই রচনা কম্পোজ করিয়া "প্রভাতী" প্রকাশ করেন। সুতরাং সে সময় কম্পোজিটরীও বিহারিলাল কিছু কিছু শিখিয়াছিলেন। একাধারে এত শক্তি বড় সহজ নয়।

ইহার চারি পাঁচ বৎসর পর প্রভাতী উঠিয়া গেল।

এই সময় "বঙ্গবাসী" প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গবাসীর একমাত্র সত্ত্বাধিকারী,—গুণী ও গুণগ্রাহী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুজ মহাশয়,—বহু গীতিনাট্য-প্রণেতা শ্রীযুক্ত রাধানাথ মিত্রের নিকট বিহারী বাবুর গুণের পরিচয় পাইয়া, বঙ্গবাসী আপিসের প্রেস-বিভাগে বিহারী বাবুকে নিযুক্ত করিলেন। তখন বঙ্গবাসী ছাপাখানা-বিভাগের বড়ই বে-বন্দোবস্ত ছিল। তখন দৈনিক প্রকাশিত হইয়াছে, সুতরাং কার্য্যের বড়ই ঝঞ্ঝাট। স্বত্ত্বাধিকারী মহাশয় বিহারী বাবুর উপর প্রেসের যাবতীয় ভার ন্যস্ত করিলেন। কার্য্যকুশল,—প্রেসের অধ্যক্ষতায় দক্ষ বিহারিলাল অল্পদিনের মধ্যে প্রেসের সুশৃঙ্খলা সম্পাদন করিলেন; অযথা ব্যয় কমাইয়া আয় বাড়াইলেন; আরও অনেকরূপ উন্নতি করিলেন।

প্রেসের অধ্যক্ষতার কাজ করিতে করিতেও বিহারী বাবু মধ্যে মধ্যে দৈনিকে লিখিতেন। এক বৎসর পরে বঙ্গবাসীতেও লিখিতে আরম্ভ করিলেন। দৈনিক জন্মগ্রহণের তিন বৎসর পরে সুকবি স্বর্গীয় বামদেব দত্ত মহাশয় দৈনিকের সম্পাদক নিযুক্ত হন; সেই সময় বিহারী বাবু তাঁহার সহকারী হইলেন। ক্ষেত্রবাবু তখন দৈনিকের লেখক ছিলেন,—সম্পাদক নন কিন্তু দৈনিকের শেষ দশবর্ষ কাল, ক্ষেত্রবাবুই একমাত্র সম্পাদক ছিলেন। সম্প্রতি দৈনিক উঠিয়া গিয়াছে;—ক্ষেত্র বাবু বঙ্গবাসীতে নিযুক্ত হইয়াছেন।

অতঃপর যখন শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গবাসীর সম্পাদক হইলেন, রামবাবু তখন দৈনিক হইতে বঙ্গবাসীতে আসিলেন এবং ক্ষেত্র বাবুই তখন দৈনিকের ভার লইলেন। এই সময় বিহারী বাবু বঙ্গবাসীর "শাস্ত্র-প্রকাশ" বিভাগে নিযুক্ত হইলেন। বিহারী বাবুর সে সময়কার অগাধ পরিশ্রম ও অসাধারণ অধ্যবসায়ের কথা স্মরণ করিলে মুগ্ধ হইতে হয়। শাস্ত্রপ্রকাশের গ্রাহক সংগ্রহের জন্য তিনি যেরূপ উৎকট পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহাতে আজ অবধিও সকলেই তাঁহার কার্য্যকুশলতার প্রশংসা করিয়া থাকেন। বামদেব বাবুর সহিত বঙ্গাবসীর সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে, বিহারী বাবু বঙ্গবাসীর সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হন এবং ঈশ্বরেচ্ছায় আজিও সেই পদে প্রশংসার সহিত কার্য্য করিতেছেন।

বঙ্গবাসীতে বিহারী বাবুর প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, "নেপাল"; এবং জন্মভূমিতে প্রথম প্রকাশিত হয়,—"পঙ্গপাল।" এই দুই প্রবন্ধেই বিহারী বাবু সুধী-সমাজের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। সেই মনোযোগ এখন সহস্র সহস্র পাঠককে আকর্ষিত করিতেছে।

বিহারী বাবু সুস্থ শরীরে থাকিয়া দীর্ঘজীবী হউন,—ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।

দীনের দুর্গোসব।

মা দুর্গে! এই জগতে হীন দীন কৃপণ রুগ্ন মানব, আর অমর নরপতি যোগী বা ভোগী, সকলেরই একমাত্র সুখই মুখ্য লক্ষ্য, মানবের মন! সদা সুখের জন্যই লালায়িত, কিসে সুখী হইবে, এই আশায়ই প্রাণিদিগের মন ছুটাছুটী করিতে থাকে। যাহা কিছু দৈনিক আহার বিহারাদি মানব করিয়া থাকে, তৎসমুদয়ই কেবল আপন সুখের জন্যই।

ধন রাজ্য ঐশ্বর্য্য পুত্র ক্ষেত্র কলত্র মিত্রাদি লাভ করিয়াও, ক্রমশ পর্ণকুটীর হইতে একতল দ্বিতল ত্রিতল প্রাসাদ, বসন ভূষণ যান আসন, অধিক কি বলিব, দেবত্ব লাভ করিয়াও মানবের মন শান্ত বা তৃপ্ত হইতেছে না।

যেন ইহার পরেও আরও কি জানি একটা সুখ আছে, সেই সুখের জন্য মানব মন অহর্নিশ পরিভ্রমণ করিতেছে।

মা! এই বিষয় একটী মাত্রই কারণ অনুভূত হইতেছে যে, পূর্ব্বোক্ত

ধনাদি দ্বারা নিত্য নিরতিশয় সুখের সম্ভাবনা নাই, ফলতঃ, সেই সকল ধন ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি বিষয় কৃত্রিম দুঃখানুবিদ্ধ সুখেরই হেতু পরিলক্ষিত হয়। মানবের মন দুঃখসংসৃষ্ট অনিত্য সুখের স্পৃহা করে না, ক্ষণ বিনশ্বর সুখ লাভে মানবহৃদয় কৃতার্থ হয় না, শান্ত হয় না, এই নিমিত্তই ধনৈশ্বর্য্যাদির দ্বারা শান্তি লাভে অকৃতার্থ হইয়া মানব মন বিস্রস্ত হইয়া পড়ে।

জগজ্জননি! সেই দিন সেই মুহূর্ত্তেই মানবাত্মা কৃতার্থন্মন্য হইবে, বীতলিপ্স হইবে, প্রশান্ত হইবে, যে দিন যে মুহূর্ত্তে অখণ্ডানন্দ নিত্য নিরতিশয়ানন্দ লাভ করিবে, সে দিন স্ত্রী পুত্র গৃহ ক্ষেত্র রাজ্যৈশ্বর্য্য সুখ সেই মহা সুখের এক কণিকামাত্রও মনে করিবে না।

মা আনন্দময়ি! সেই অনির্ব্বচনীয় মহামন্দ লাভে কেবল তোমার চরণারবিন্দ সাক্ষাৎকারই মুখ্য কারণ বেদাদি শাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে। তা ছাড়া যুগ সহস্রের চেষ্টায়ও সেই অখণ্ডানন্দ লাভ আকাশকুসুমবৎ সম্পন্ন হইবে।

মা পূর্ণানন্দময়ি! আমাদের সকল সুখের আকর তোমার সাক্ষাৎকার অনায়াসলভ্য নহে। কেননা, মা! তুমি এই দৃশ্য ক্ষিতি জলঅনল অনিল বা আকাশ নহ, তুমি গন্ধ রস রূপ স্পর্শ বা শব্দ নহ, তুমি তাহার অতিরিক্ত, সুতরাং তোমায় নাসা আঘ্রাণ করিতে পায় না, রসনা স্বাদ করিতে অপটু, নয়ন দর্শনে শক্তিহীন, ত্বক্ স্পর্শ করিতে পারে না, শ্রুতি শুনিতে অসমর্থ, মা তুমি অণু হইতে অণুতর, মহৎ হইতে মহত্তর, কাজেই মনও তোমায় ধরিতে পায় না।

মা ব্রহ্মময়ি! তুমি অবাঙ্মনস গোচর, মা! তোমায় মন জানেনা, মনকে তুমি জান, শ্রবণ তোমায় শুনেনা, শ্রবণকে তুমি শুন, বাক্য তোমায় কহিতে পারে না, বাক্যকে তুমি কহিতে পার, চক্ষু তোমায় দেখেনা, তুমি চক্ষুকে দেখিয়া থাক, মা! তুমি প্রাণিমাত্রেরই হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, মা! তোমার কোন ক্রিয়া নাই, অথচ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তুমিই করিতেছ, মা! তুমি অতি দূরে আছ, অথচ অতি নিকটে নয়ন-পুত্তলির মধ্যেও আছ, মা! তুমি সকলের বাহিরে আছ, সকলের অন্তরে আছ।

মা! তোমায় আস্তিক মাত্রই "সর্ব্বকর্ত্রী" বলে, ইহাতে কাহারও বিমতি দেখা যায় না।

অদ্য "সর্ব্বকর্ত্রী" এই শব্দটীর তাৎপর্য্য বিচার পূর্ব্বক তোমার সাক্ষাৎকার দুর্লভ নহে ইহাই বুঝিতেছি, "সর্ব্বকর্ত্রী" এই শব্দের অন্তর্গত সর্ব্ব শব্দের অর্থ কি? না, চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত সমস্ত বস্তু, সেই সকল বস্তুর মধ্যে কল্পনাও একটী বস্তু ধরিতে হইবে।

কল্পনা কি ? না, এক বস্তুতে অপর বস্তুর আরোপ কল্পনা; যেমন ঘটে বা পটে দেবতা বুদ্ধি, মা! উক্ত কল্পনাও সর্ব্বকর্ত্রী তোমারই সৃষ্ট পদার্থ, যদি তোমা ব্যতীত অপর কেহ কল্পনা সৃষ্টি করিয়া থাকে, তবে তোমার সর্ব্বকর্ত্রীত্ব বিনষ্ট হইয়া যায়।

জগজ্জননি! ইহাও বলা উচিত হয় না, যে তুমি নিষ্প্রয়োজনে কল্পনা পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছ, যদি তাহাই হয়, তবে নিষ্ফল সৃষ্টি করিয়াছ বিধায় তোমাকে দোষগ্রস্ত হইতে হয়, অতএব কল্পনার একটা ফল আছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

মা! তোমার সৃষ্ট "শব্দ," কৈ, শব্দের ত কোনও আকার নাই, ত্রিকোণ বর্ত্তুল চতুষ্কোণ বা নীল পীত লোহিত বা কপিশ, ইত্যাদি কিছুই দেখিতে পাই না।

ফলতঃ, বর্ণাত্মক শব্দের কোন আকৃতি না থাকিলেও "ক" "খ" "গ" "ঘ" ইত্যাদি ত্রিকোণ কুণ্ডলীবিশিষ্ট "ক" বকতুণ্ডবৎ "খ" এইরূপে কল্পিত আকার পত্রে আরূঢ় করিয়া দেশান্তর স্থিত বন্ধুদিগের বার্ত্তা নিশ্চয়-রূপে জ্ঞাত হইতেছে, সুতরাং "কল্পনা" নিষ্ফলা, ইহা কখনই বলা যায় না।

অতএব আবহমান কাল হইতে প্রচলিত নিরাকার তোমার কল্পিত ঐ দশভুজা সিংহারূঢ়া মহিষমর্দ্দিনী রূপের দ্বারা নিরাকার শব্দের কল্পিত ক কারাদি রূপের ন্যায় যথাবিধি পূজা করিয়া নিশ্চয়ই আমরা অভীষ্ট লাভ করিতে পারিব।

মা! যাহার কোনও নাম নাই, তাঁহাকে সকল নামই দেওয়া যায়, যাহার কোনও রূপ নাই, তাঁহাকে সকল রূপেই ডাকা যায়।

মা! তোমার স্বরূপ যে কি ? তাহা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ইন্দ্র বায়ু বরুণ প্রভৃতিও জানে না, আমরা ত কীটাণু।

মা! আরও বলি, তুমি ত নিরাকারা, ইহা সর্ব্ববেদাগমের সিদ্ধান্তিত কথা, আবার এ কথাও শাস্ত্রে পাওয়া যায়, যে তুমিও আমাদের মত শ্রদ্ধা ভক্তি স্নেহ প্রেম শ্রবণ মনন ধ্যানের দ্বারা সাক্ষাৎ হইয়া থাক, এবং আমরাও তোমা হইতে জল অনল ও দিন রাত্রির মত অত্যন্ত ভিন্ন নহি, কিন্তু আমরাও চৈতন্যময়ী তোমরই একটী কণা, অজ্ঞানানুবিদ্ধ চৈতন্যের প্রতিবিম্ব, বা ক্লেশ কর্ম্ম বিপাকও আশয়ে সংসৃষ্ট চিতিশক্তি তুমিই আমরা হইয়াছি, সেই অজ্ঞানের আবরণ শক্তির মাহাত্ম্যেই আমরা নিত্য সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়াছি।

আমরা ত এই প্রকারই বুঝিতে পাই যে, আমরা জন্ম হইতে অদ্য যাবৎ সাকারেই ত স্নেহ ভালবাসা শিক্ষা করিয়াছি, বিনা শিক্ষায় বা জন্মান্তরীণ

সংস্কারাভাবে কোন কার্য্যইত এ জগতে নিষ্পন্ন হইতেছে না, বা হইতে পারে না।

যেমন, আমরা জন্মিয়াই জীবনের ঔষধরূপ মাতৃস্তন্যেই স্নেহধারা শিক্ষা করিয়াছি, তখন ত আর কিছুই ভালবাসিতাম না, মাত্র মাতৃস্তন্য, পরন্তু তাহারও একটা আকার আছে, স্তন্য শুক্লবর্ণ মধুর রসবিশিষ্ট, ও কবোষ্ণ, এজন্যই স্তন্য ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য এবং প্রত্যক্ষিত।

তৎপরে বাল্যদশাপন্ন আমরা দেখিলাম, এ জগতে মা ভিন্ন আর আমাদের কেহ নাই, আমরা ক্ষুধার্ত্ত হইয়া রোদন করি, স্নেহময়ী মা অমনি বক্ষে ধারণ করিয়া অমৃতায়মান স্তন্য দান করেন, বিবিধ ক্লেশ বিবিধ ভয় হইতে ত্রাণ করেন, তাই মায়ের উপরেই আমাদের উত্তরোত্তর শ্রদ্ধা ভক্তি স্নেহের উৎস খুলিয়া পড়ে! সেই মা, আমাদের মূর্ত্তিময়ী, তবেই ত এমন ভালবাসিতে পারিয়াছি।

তৎপরে সংস্কার এবং সংসর্গবশে সর্ব্বদা আহার বিহারজনিত যে প্রেম করা, তাহাও সাকার বস্তুর সহিতই হইয়াছে, নিরাকার বস্তু কখনো ইন্দ্রিয়-গোচর নয় বলিয়াই তাহা আমরা ভালবাসিতে শিখি নাই, সুতরাং নিরাকার বস্তু আমাদের প্রেমভাজন হইতে পারে না।

মা! নিরাকারা, তোমার দ্বারা আমাদের সুখের আশা সুদূরপরাহত, ইহা নিশ্চয়। মা! তোমার নিরাকার নিয়া তুমি থাক, আমাদের তাহাতে কোন প্রয়োজন নাই।

বিশ্বজননি! যেমন ভূগর্ভে নিহিত কত স্থানে কত কত মণিরত্ন প্রোথিত রহিয়াছে, কিন্তু তাহা আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে গতিকেই তদ্দ্বারা আমরা সুখী হইতে পারিতেছি না, তেমন মা! তুমি সূক্ষ্মরূপে সদা সন্নিহিত থাকিলেও স্থূলদর্শী আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হওনা বলিয়াই মন প্রীত হইতেছে না।

আমরা ইহাই বুঝি, শ্রদ্ধা স্নেহ ভক্তির দ্বারা লব্ধব্য বস্তু, অন্যোপায় দ্বারা লাভ করিতে শক্য হয় না, গন্ধ গ্রহণে নাসাই পটীয়সী, কিন্তু সহস্র পদ্ম চক্ষু নহে, পাতাল মূলে স্থিত বস্তু গিরি শিখরে কখনও পাওয়া যায় না, দক্ষিণ সাগরে প্রাপ্য বস্তু, ক্রমাগত যুগসহস্র বৎসর উত্তর দিগে অনুসন্ধান করিলে কখনই পাইবার নহে। জলের কর্ম্ম অনলে, ও অনলের কার্য্য জলে, কখনই নির্ব্বাহিত হইতে পারে না।

বিশেষতঃ, যে বস্তু লাভে যেমন প্রক্রিয়া, যেমন স্থান, যেমন সময়ের আবশ্যক, তাহা ছাড়া অন্য প্রক্রিয়া অন্য স্থানে বা অন্য সময়ে কিছুতেই সেই বস্তু লাভ হইতে পারে না।

শাস্ত্রে আছে, "গবাং সর্ব্বত্রগং ক্ষীরং স্রবেৎ স্তনমুখাদ্ যথা।" গাভীর সর্ব্ব শরীরেই দুগ্ধের সঞ্চার আছে, কিন্তু হস্তদ্বারা আপীন আকর্ষণ করিলেই দুগ্ধ নির্গত হয়, ছেদনে রুধির বহির্গত হয়, কেন? না, দুগ্ধ বহিষ্করণে আপীনাকর্ষণেই সম্যগুপায়, ছেদন নহে, আবার আপীনাকর্ষণেই দুগ্ধ বাহির হইয়া থাকে, জিহ্বাদোহনে কেবল ক্লেদই বাহির হয়, কেন? না, জিহ্বা দুগ্ধ বাহিরের স্থান নহে, যথা নির্দ্দিষ্ট সময়েই দুগ্ধের প্রবাহ হয়, সময় উত্তীর্ণ হইলে আর দুগ্ধ তেমন হয় না। সেরূপ ভক্তি বিশ্বাস স্নেহ শ্রদ্ধার দ্বারা এবং শাস্ত্রোক্ত পূজার দ্বারাই মা! তোমাকে আমরা পাইব, তাছাড়া! যুগসহস্রের চেষ্টায়ও কখনও পাইব না।

এজন্যই মা! নিরাকার শব্দের কল্পিত আকারের ন্যায়, এই শরৎকালে মনোহর মণ্ডপে ভক্তিশ্রদ্ধা ও বিবিধোপহারে শাস্ত্রোক্ত মার্গে তোমার দশভূজা মূর্ত্তি সাক্ষাৎ করিব।

অন্তর্যামিনি! মা! তুমি আমাদের মন জান, আমরা কি করি, না করি সব জান, মা! তুমি যে সর্ব্বজ্ঞা, ধূর্ত্তভক্ত আমরা কেবল মুখে দুর্গা বলিয়া চীৎকার করিলে, স্তোত্র পাঠ করিলে, ললাটে ভস্ম ত্রিপুণ্ড্র, তদুপরি রক্তচন্দন তিলক ধারণ করিলে, সর্ব্বাঙ্গে রুদ্রাক্ষমালা জড়াইলে,প্রভূত নৈবেদ্য সাজাইলে, অসংখ্য ছাগ শাবকের প্রাণ সংহার করিলে, এবং দীর্ঘ শিখা দোলাইলে কখনই তোমায় ভুলাইয়া প্রসন্ন করিতে বা সাক্ষাৎ করিতে পারিব না।

সপ্তাহে এক দিন কেশ শ্মশ্রু বিন্যাস করিয়া বিলাসিবশে আপনাকে কন্দর্পরূপে পরিণত করিয়া, পট্ কিড়্ মিড়্ শব্দরহ চর্ম্ম পাদুকা ধারণ করিয়া, উচ্চাসনে আসন্দীতে দীর্ঘ বর্ত্তুল কাষ্ঠাসনে মন্দুরাস্তৃত কুট্টিম উপাসনা গৃহে প্রবেশ করিয়াই চক্ষু মুদ্রিত করিয়াই অমনি হে নাথ! হে জগৎ পিতঃ! হা দীনবন্ধো! তুমি নির্ব্বিকার নিরঞ্জন, তুমি প্রতিক্ষণে সহস্র সূর্য্যের ন্যায় আমাদের পুরো বিরাজিত রহিয়াছ, কিন্তু হে বিভো! হে ভূমন্! অজ্ঞানান্ধ আমরা তোমায় দেখিতে পাইতেছি না, ইত্যাদি জল্পনা বাক্যে মা তোমাকে আমরা কখনই ভাঁড়াইতে পারিব না।

পরন্তু, মা! সেই মুহূর্ত্তেই তুমি অভিলষিত দশভূজা মূর্ত্তিতে আমাদের সাক্ষাৎ উপস্থিত হইবে। যখন আমরা দরবিগলিত নেত্রে ভক্তি শ্রদ্ধা স্নেহের উৎস খুলিয়া শাস্ত্রোক্ত নিয়মে—

মা আনন্দময়ি! মা চৈতন্যরূপিণি! মা! তোমা বিনা ক্ষণকালও আমরা অন্য জানি না, অন্য চাহি না, অন্যে স্নেহ করিনা, অন্যে শ্রদ্ধা করিনা, আমাদের অন্য আর লক্ষ্য নাই, অন্য শরণ নাই, মা! তোমাকেই আত্ম

বিসর্জ্জন করিলাম, ইত্যাদি আভ্যন্তরীণ ভাব বিশ্বস্তসূত্রে তোমায় জানাইতে পারিব। তখন মা! বালকের আর্ত্তনাদে কখনই নিশ্চিন্ত থাকিতেপারিবে না।

জগন্ময়ি! যে তুমি নিজের শক্তিতে উত্তুঙ্গশৃঙ্গ শৈল হইতে পারিয়াছ, যে তুমি অপার পারাবার হইতে পারিয়াছ, যে তুমি "অণোরণীয়ান্ মহতো-মহীয়ান্" হইতে পারিয়াছ, সেই তুমিই আমাদের অকৃত্রিম ভক্তি দ্বারা আরাধ্যা হইয়া এই মহিষমর্দ্দিনীরূপে সাক্ষাৎ উপস্থিত হইতে পারিবে না? ইহা অশ্রদ্ধেয় কথা, যদি না পার, তবে তোমায় সর্ব্বকর্ত্রী সর্ব্বজ্ঞা সর্ব্বান্তর্যামিনী বলিয়া কিরূপে মনে করিব? কেনই বা তুমি ভক্তানুগ্রহ কাতরা এই বুঝিয়া পূজা করিব?

মা! তুমিই ত আমাদের ইন্দ্রিয়বর্গের এমনি স্বভাব দিয়া সৃষ্টি করিয়াছ যে, স্থূলালম্বন ব্যতীত সূক্ষ্ম প্রত্যক্ষ করিতে পারে না, যেমন অনাকৃতি শব্দ স্থূল কণ্ঠ তালু দন্ত ওষ্ঠাদি অবলম্বন বিনা প্রত্যক্ষ পথে আসিতে পারে না। তেমন রূপও পৃথক্‌রূপে আমাদের নয়নগোচর হয় না, কিন্তু ঘট পটাদি স্থূল বস্তুকে অবলম্বন করিয়াই শুক্ল পীত নীল লোহিতাদি রূপ নেত্রগোচর হইয়া থাকে।

মা! যদি আমরা জলীয়কীটাণু দেখিতে ইচ্ছা করি, তবে তা কি চর্ম্ম চক্ষুতে পারি? কিন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেই তাহার প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হই। সেই প্রকার আলোক সাধারণ মনোনয়নকমনীয় তোমার এই দশভূজা মূর্ত্তি পুরোভাগে স্থাপন করিয়া শাস্ত্রানুসারে পবিত্র ভাবে একাগ্রচিত্তে আমীলিতনেত্রে প্রথমে তোমার বাহিরের এই দশভূজা মূর্ত্তি চিত্তক্ষেত্রে দৃঢ় অঙ্কিত করিব,—তোমায় হৃৎপদ্মে বসাইব, বিনয়কাতরে জিজ্ঞাসা করিব—মা! এথায় আসিতে তোমার কোন কষ্ট হয় নাই? সুখে আসিয়াছ ত? পরে সহস্রারচ্যুত অমৃত সলিলে পাদুখানি ধোয়াইয়া দিব, চঞ্চল মন শিরো-ভূষা পরাইয়া দিব, মন্দ মন্দ সমীরে তাহা দুলিতে থাকিবে, সেই অমৃত সলিলে মুখ ধোয়াইয়া দিব, স্নান করাইয়া দিব, এই নক্ষত্রখচিত আকাশ বস্ত্র প্রদান করিব, আমার গন্ধ তত্ত্ব কুঙ্কুমচন্দনে তোমায় অনুলিপ্ত করিব, চিত্ত কুসুমমালা গলায় দোলাইব, পঞ্চ প্রাণ পঞ্চাঙ্গ ধূপ দিব, তেজস্তত্ত্ব প্রদীপ জ্বালিব, সুধাসমুদ্রতীর প্ররূঢ় কল্প পাদপ হইতে নানাবিধ সুস্বাদু খাদ্য প্রদান করিব, অনাহত ঘণ্টা বাদন করিব, সহস্রার ছত্র ধরিব, আর শব্দ তত্ত্বে গান ধরিব—

"দাড়া গো কুল কুণ্ডলিনি! মা আমার অন্তরে।
তোমার অন্তরেতে রাখি, নিয়ত নিরখি, অন্তর না করি দিবা রজনি?
ভক্তি পুষ্প করি, শ্রদ্ধা সুচন্দন, তদঞ্জলি করি চরণে অর্পণ,
নেত্র মুদে মন সাধে তোমার রূপ করি নিরীক্ষণ
কামাদি ছয় বলি, দিবগো করালি।
বিবেক অসি করে ধারণ করি,
পরে জ্ঞানাগ্নি জ্বালিব, হিংসা আহুতি দিব,
পরে প্রবেশিব ঘটে শিবানি!

আর আত্ম নিবেদন করিব—

মা! করুণাময়ি! মা! তোমার জন্য তোমায় পূজা করিতেছি না, এ আমার আনন্দের জন্য, সুখের জন্য, শান্তির জন্য, মা! তুমি অন্নপূর্ণা, অন্ন প্রদানে ত্রিলোক পালন করিতেছ, আমি অকিঞ্চন, তোমায় কি অন্ন দিব? মা! তুমি জগদ্ব্যাপিনী, তোমায় বিতস্তি পরিমিত বস্ত্র দানে তোমার অঙ্গাবরণ কিরূপে করিব? মা! কিন্তু সকলই হইতে পারে, যদি মা! তুমি আমার মনের মতন হও, আমরা মন, প্রাণ, বুদ্ধি তোমায় সমর্পণ করিয়া ব্যাকুলচিত্তে মা! মা! বলিয়া কাঁদিব, অশ্রুজলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিব, আর গদ্‌গদ রবে বলিব,—মা! এই পবিত্র শরৎকালে, এই দুঃখপূর্ণ ধরাতলে, তুমি পদার্পণ করিবে বলিয়া চিত্তহীন জড়বর্গও তোমায় পূজা করিতেছে—সুধাকর অমৃতময় কিরণ বিকীর্ণ করিতেছে, সরোবর নির্ম্মল জলে, নভোমণ্ডল নক্ষত্রমালায়, প্রভাকর প্রফুল্ল পঙ্কজ ব্রজে তোমার পূজা করিতেছে, আর আমরা হতভাগ্য মানবকুল চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব? কখনই না, তাই ডাকিতেছি, মা! দুর্গে!

"শরণাগতদীনার্ত্ত পরিত্রাণপরায়ণে! মা! প্রদীদ, আর সহ্য হইতেছে না, দুঃখের চরমসীমায় আসিয়াছি, মা! দেখা দেও, মা! আমি এইত দেখিতেছি,

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা।"

আর দেখিতেছি,—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনে ত্যভিধীয়তে।"
আর দেখিতেছি,—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা।"
আর দেখিতেছি,—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু নিদ্রারূপেণ সংস্থিতা।"
আর দেখিতেছি,—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা।"
আর দেখিতেছি,—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা"
আর দেখিতেছি,—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু তৃষ্ণারূপেণ সংস্থিতা।"
আর দেখিতেছি,—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ক্ষান্তিরূপেণ সংস্থিতা।"
আর দেখিতেছি,—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু জাতিরূপেণ সংস্থিতা।"
আর দেখিতেছি,—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু লজ্জারূপেণ সংস্থিতা।"
আর দেখিতেছি,—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা।"
আর দেখিতেছি,—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শ্রদ্ধারূপেণ সংস্থিতা।"
আর দেখিতেছি,—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু কান্তিরূপেণ সংস্থিতা।"
আর দেখিতেছি,—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বৃত্তিরূপেণ সংস্থিতা।"
আর দেখিতেছি,—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা।"
আর দেখিতেছি,—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা।"
আর দেখিতেছি,—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু তুষ্টিরূপেণ সংস্থিতা।"
আর দেখিতেছি,—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।"
আর দেখিতেছি,—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা।"

শ্রীজয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণঃ।

জন্মভূমি।

(সচিত্র মাসিক পত্র।)

নবম বর্ষ। } কার্ত্তিক, ১৩০৭ সাল। { ৪র্থ সংখ্যা।

বিজয়া।

মহামায়ার এমনি দুশ্ছেদ্য মায়াজাল যে, উহাতে জড়িত হইয়া জীব একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়ে। ভারত এখন অতি শোচনীয় অবস্থায় পতিত। ভারতবাসিগণ অন্নাভাবে জীর্ণ শীর্ণ, তাহার উপর আবার এ বৎসরের অতিবৃষ্টি, বন্যা, শস্যহানি প্রভৃতিতে সকলেই কণ্ঠাগতজীবন হইয়াছেন। এত ঘোর কষ্টভোগ করিতে করিতেও ক্ষণকালের জন্য ভারতবাসী সুখ-সাগরে ভাসিতেছিল। মহামায়ার মোহিনী শক্তিতে জীব সাংসারিক ক্লেশাদি বিস্মৃত হইয়া দিনত্রয় আনন্দময়ীর আনন্দময়ী ছবি মানসপটে অঙ্কিত করিয়া অলৌকিক আনন্দ অনুভব করিতেছিল, কিন্তু দেখিতে দেখিতে নিমেষ মধ্যে আনন্দময়ী অন্তর্হিতা। সুখের দিন কখনই দীর্ঘস্থায়ি হয় না; তাহাতে আবার দুর্ভাগ্য ভারতীয়গণের অদৃষ্ট, সুতরাং সুখের দিন আসিতে না আসিতেই অতীত হইল। আনন্দময়ী নিরানন্দ ভারতবাসিগণের হৃদয়ে তিন দিবস অলৌকিক বিমল আনন্দের উৎস প্রবর্ত্তিত করিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। জীবগণ আজ মহামায়ার অদর্শনে বিষাদ সাগরে নিমগ্ন। আবার সম্বৎসর অতীত হইলে, ভক্তগণ ভবভয়হারিণী, ত্রিতাপনাশিনীর অভয় পাদপদ্ম দর্শন করিবার আশায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। আশাই জীবের প্রধান অবলম্বন।

তিথিনক্ষত্রাদিযোগে দিনবিশেষের বিজয়া সংজ্ঞা শাস্ত্রকারগণ প্রদান করিয়াছেন, শুক্লপক্ষীয় সপ্তমী তিথিতে রবিবার যোগ হইলে তাহাকে বিজয়া নামে অভিহিত করা যায়। যথা—

"শুক্লপক্ষস্য সপ্তম্যাং সূর্য্যবারো যদা ভবেৎ।
সপ্তমী বিজয়া নাম তত্র দত্তং মহাফলং॥" তিথ্যাদিতত্ত্বে।

অর্থাৎ শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথিতে যদি রবিবার হয়, তাহা হইলে সে সপ্তমীকে বিজয়া নামে অভিহিত করা হয়, সে দিন দানাদি করিলে মহাফল হয়। এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, তিথিবিশেষের সংজ্ঞা বিজয়া হইয়া থাকে। কিন্তু অদ্য আমরা যে বিজয়ার উল্লেখ করিতেছি, তাহা বিজয়াদশমী। বিজয়া বলিলেই সাধারণে যাহা বুঝিয়া থাকে, অদ্য সে সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিব। বিজয়া বলিলেই প্রায় সকলেই বুঝিয়া থাকেন যে, দুর্গাপূজার পর যে দশমী, তাহাই কথিত হইতেছে। এই দশমীকে শাস্ত্রকারগণ বিজয়া বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। যথা—

"উদয়ে দশমী কিঞ্চিৎ সংপূর্ণৈকাদশী যদি।
শ্রবণর্ক্ষং যদা কালে সা তিথির্বিজয়াভিধা॥"

হেমাদ্রৌ কশ্যপঃ।

অর্থাৎ উদয়কালে যদি কিছু দশমী থাকে, তাহার পর সমস্ত একাদশী হয়, তাহা হইলে সেই তিথিকে বিজয়া দশমী বলিতে হইবে। যদি শ্রবণা-নক্ষত্র লাভ না হয়, তাহা হইলে কেবল দশমীকেও বিজয়া আখ্যা দেওয়া হইবে। নক্ষত্রযোগ হইলে ফলাধিক্য হয়, ইহাই শাস্ত্রকারগণের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে।

এই তিথিতে রাজগণ পূর্ব্বে যুদ্ধযাত্রা করিতেন, ইহাতে যুদ্ধযাত্রা করিলে জয়লাভ নিশ্চিত। পূর্ণব্রহ্ম সনাতন শ্রীরামচন্দ্র রাবণবধের নিমিত্ত মহা-মায়ার অকাল পূজা সমাপন করিয়া এই বিজয়া দশমীতে যুদ্ধযাত্রা করিয়া-ছিলেন, এই কারণেই সমস্ত হিন্দুরাজগণ সেই প্রথা অবলম্বন করিয়া বিজয়া দশমীতে যুদ্ধযাত্রা করিয়া থাকেন।

হেমাদ্রিধৃত কশ্যপবচনে লিখিত হইয়াছে ঃ—

"শ্রবণর্ক্ষে তু পূর্ণায়াং কাকুৎস্থঃ প্রস্থিতো যতঃ।
উল্লঙ্ঘয়েয়ুঃ সীমানং তদ্দিনর্ক্ষে ততো নরাঃ॥"

অর্থাৎ আশ্বিন শুক্লদশমীতে শ্রবণানক্ষত্রযোগে শ্রীরামচন্দ্র যেহেতু যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন, সেই নিমিত্ত জনগণ সেই দিনে এবং সেই নক্ষত্রে যুদ্ধযাত্রা নিমিত্ত দেশের সীমাতিক্রম করিবেন; রাজগণের বিজয়দান করেন বলিয়া, এই তিথিকে বিজয়া নামে অভিহিত করা হইয়াছে। সেই জন্যই

শাস্ত্রকারগণ বিশেষ করিয়া উপদেশ দিয়া গিয়াছেন যে, এই দিবসেই রাজগণ যুদ্ধযাত্রা করিবেন। এই দিনে যুদ্ধযাত্রা না করিলে সম্বৎসর কোথাও বিজয়-লাভ হইবে না। যথা—

"দশমীং যঃ সমুল্লঙ্ঘ্য প্রস্থানং কুরুতে নৃপঃ।
তস্য সম্বৎসরং রাজ্যে ন ক্বাপি বিজয়ো ভবেৎ"॥

অর্থাৎ যে রাজা বিজয়া দশমী অতিক্রম করিয়া যুদ্ধযাত্রা করেন, তাঁহার রাজ্যে সম্বৎসর মধ্যে কোথাও বিজয় লাভ হয় না।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, যদি রাজা কোনও প্রতিবন্ধকবশতঃ বিজয়া দশমীতে যুদ্ধার্থ নির্গত হইতে না পারেন, তাহা হইলে সম্বৎসর তাঁহার কি কোথাও জয়লাভ হইবে না? শাস্ত্রের অতি কঠোর ব্যবস্থা। শাস্ত্র বলিতেছেন, এই দিন ভিন্ন অন্য দিন যুদ্ধযাত্রা করিলে সমস্তই নিষ্ফল হইবে। তজ্জন্য সেই শাস্ত্রই আবার ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, ঐ দিনেই যুদ্ধযাত্রা করিতে হইবে; তবে রাজা যদি কোন বিঘ্নাদিবশতঃ স্বয়ং যুদ্ধার্থ নির্গত হইতে না পারেন, তাহা হইলে ছত্রখড়্গাদি কোন একটী রাজোপ-করণকেও অন্ততঃ সেই দিন যুদ্ধার্থ নির্গমিত করিতে হইবে। রাজমার্ত্তণ্ডে লিখিত হইয়াছে ঃ—

"কার্য্যবশাৎ স্বয়মগমে ভূভর্ত্তুঃ কেচিদাহুরাচার্য্যাঃ।
ছত্রায়ুধাদ্যমিষ্টং বৈজয়িকং নির্গমে কুর্য্যাৎ॥"

অর্থাৎ কোনও কার্য্যবশতঃ রাজা যদি স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করিতে না পারেন, তাহা হইলে খড়্গ কিম্বা ছত্রাদি কোনও ইষ্ট বস্তুকে যুদ্ধার্থ নির্গমিত করিবে।

এই বিজয়া দশমী রাজাদিগেরই বিশেষ উপযোগিনী। জয়লাভের উদ্দেশ্যে শাস্ত্রকারগণ এই দিবসে নানারূপ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই দিবস অপরাজিতা দেবীর পূজা করিতে হয়। ইহার উদ্দেশ্যও বিজয়াদি লাভ। স্কন্দপুরাণে কথিত হইয়াছে ঃ—

"দশম্যাং তু নরৈঃ সম্যক্ পূজনীয়াপরাজিতা।
ঐশানীং দিশমাশ্রিত্য অপরাহ্ণে প্রযত্নতঃ॥
নবমীশেষযুক্তায়াং দশম্যামপরাজিতা।
দদাতি বিজয়ং দেবী পূজিতা জয়বর্দ্ধিনী॥

অর্থাৎ বিজয়া দশমীতে ঈশান কোণে অপরাহ্ণকালে অতি যত্নসহকারে জনগণ সম্যক্ প্রকারে অপরাজিতা পূজা করিবে।

নবমীর শেষভাগযুক্ত দশমীতে জয়বিবর্দ্ধিনী অপরাজিতা দেবী পূজিতা হইলে বিজয় প্রদান করেন।

এই সমস্ত বচন হইতে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, বিজয়াদশমী রাজাদিগের বিশেষ মঙ্গলদায়িনী। রাজার মঙ্গলেই প্রজার মঙ্গল, এজন্য আমরা সতত রাজার মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া, বিজয়া দশমীর অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। রাজার বিজয়দায়িনী বলিয়া আমরা সকলেই এই বিজয়া দশমীতে শুভক্ষণে সকলেই স্ব স্ব কার্য্যের সূত্রপাত করিয়া থাকি। হিন্দুগণের কথা আর কি বলিব, আমাদিগের দেশে যে সমস্ত বৈদেশিক অন্যধর্ম্মাবলম্বী ব্যবসায়ি বণিক্‌গণ আছেন, তাঁহারাও এই শুভ বিজয়া দশমীতে কোন না কোন রূপ কার্য্যের সূত্রপাত করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগেরও দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই শুভ বিজয়া দশমীতে কার্য্যের সূত্রপাত করিলে সম্বৎসর কাল স্বীয় কার্য্যে বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ হইবে। নতুবা তাঁহারা এরূপ অনুষ্ঠান করিবেন কেন?

শ্রীকৈলাসচন্দ্র শর্ম্মা।

ফুল-কুমারী।

রূপ-কথা।

"আমি রূপসী;—এত রূপ, এতই লাবণ্যপ্রভা যে, আমার জন্য আমার শ্বশুর শাশুড়ী ননন্দা প্রভৃতি আত্মীয়স্বজনগণ সদাই ব্যস্ত ও চিন্তিত থাকেন। আমি খিড়কির পুকুর ঘাটে কাপড় কাচিতে যাইলে শাশুড়ী সঙ্গে যান, আমি সন্ধ্যার পূর্ব্বে ছাতের উপর উঠিলে, ননদ তীব্র ব্যঙ্গ বিদ্রূপস্বরে আমাকে বারণ করেন। সার্কাস দেখিতে যাইবার আমার অনুমতি নাই; আজন্ম কলিকাতায় রহিলাম, কখন থিয়েটার দেখিলাম না।

আর আমার স্বামী,—তিনি ত কেবল অনিমিষ নয়নে আমার প্রতি তাকাইয়া আছেন, আমার চুল দেখিতেছেন, চোখ্ দেখিতেছেন, আর আমার হাতের আঙ্গুলগুলি লইয়া নিশিদিন খেলা করিতেছেন। আমার রূপের জ্বালায় তাঁহার লেখা পড়া বন্ধ হইয়াছে; তিনি চাকরির চেষ্টা করেন না, বন্ধু বান্ধবের সহিত সন্ধ্যাকালে বেড়াইতেও যান না। মন্ত্রমুগ্ধ

ফণীর মত নির্নিমেষ নয়নে কেবল আমার প্রতি তাকাইয়া আছেন, আমার রূপ তাঁহার পক্ষে কাল হইয়াছে।

২

আমার রূপ আমার পক্ষেও কাল হইয়াছে। ঘেরাটোপ ঢাকা পিঞ্জরা-বদ্ধ বুলবুলীর মত মানুষ কি চিরকাল থাকিতে পারে? রান্না ঘরে যাইবার আমার অনুমতি নাই;—পাছে বামুন ঠাকুর আমায় দেখিয়া ফেলেন। সংসারে এটা-ওটা-সেটা বাজে কাজ করিবার আমার অধিকার নাই;—পাছে খান্‌সামারা আমাকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়ায়।

স্বামিসেবাও আমি করিতে পারি না, কারণ বলিতে লজ্জা করে, স্বামীই আমার সেবা করেন, সে সেবার পরিচয় কি দিব?—কৃতদাসীও যে সেবা করিতে পারে না, আমার ইহকাল ও পরকালের দেবতা হইয়া আমার স্বামী সানন্দচিত্তে সেই প্রকার সেবা করিয়া থাকেন; শ্বশুরের চরণসেবা করিবার আমার অবসর হয় না, স্বামী আমার কখনই কাছ ছাড়া হন না; শাশুড়ীও শ্বশুরের কাছে যাইতে দেন না। আর শাশুড়ীর সেবা—সেত হইবারই যো নাই, তাঁহার দুই কন্যা অনবরত তাঁহার সেবা করিতেছেন; আমি কাছে গিয়া বসিলে তিনি আমার চিবুক ধরিয়া বলেন, "মা আমার ভুবন মোহিনী, দেহটা যেন ননী দিয়ে গড়ান, তুমি মা আমার কি সেবা করিবে? তোমার সেবা করিবার বয়স হউক, তখন করিও, এখন ঘরে গিয়ে বস, আমার ঘর আলো করে থাক, নহিলে পরেশ রাগ করিবে, তুমি মা পরেশেরই সেবা কর।" শাশুড়ীর এই সকল কথা শুনিলে আমার হাসি পাইত, তাঁহার পরেশের সেবা করা ত দূরে থাকুক, পরেশই আমার সেবা করিয়া আমাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত।

৩

ছাই রূপ! এ রূপ আমার কেন হইল? আমার খাইতে সোয়াস্তি নাই, বসিতে সোয়াস্তি নাই, সাধ-সখ মিটাইবার উপায় নাই; দশটা স্থানে যাইয়া দশ রকম সামগ্রী দেখিবারও অনুমতি নাই। দুই বেলা দুই পাথর ভাত খাই, তাহা হজম করিবার জন্য সংসারে দশটা পরিশ্রমের কাজ করিবারও অবসর নাই। এমন ভাবে কি মানুষ বাঁচিতে পারে? আর স্বামী! তিনিত স্বামীই নন,—স্বামী সঙ্গে স্ত্রীলোকের যে সকল বাসনা পূর্ণ হয়, স্বামীর সহিত কুলাঙ্গনা যে সকল আমোদ-আহ্লাদ করিয়া সুখী হয়,

আমার তাহার কিছুই হয় নাই। স্বামী কেবলই আমায় দেখিতেছেন, চাঁদের আলোয় দেখিতেছেন, বাতির আলোয় দেখিতেছেন, বিদ্যুতের আলোয় দেখিতেছেন, প্রথম প্রভাত-আলোয় দেখিতেছেন, প্রদোষকালেও দেখিতেছেন; আর নানা রঙ্গের নানা রকমের কাপড় পরাইয়া, আমার রূপের প্রভা দেখিতেছেন। এত দেখা কি আমার সহ্য হয়? আমি দেখিতে পাই কই? আমার সুকান্ত স্বর্ণবর্ণ, সুগঠিত স্বামিমুখ আমি দেখিতে পাই কই? কেবলই যদি দেখাইব, কেবলই যদি নিজের রূপের দোকান খুলিয়া বসিয়া থাকিব, তবে আমার দেখার সাধ মিটিবে কেমন করিয়া?

হায়! হায়! এ পোড়া রূপের জ্বালায় আমার জীবন-যৌবন সবই বৃথা হইল!

৪

কতবার আমি আরসীতে মুখ দেখিয়াছি! আমার কক্ষ-প্রাচীরের উপর একটা প্রকাণ্ড আরসী টাঙ্গান আছে, আমি নিশিদিন বসিয়া বসিয়া সেই আরসীতে আমার দেহের প্রতিবিম্ব দেখিয়া থাকি। আমার যেমন নাক কান চোখ আছে, কপোল কপাল গণ্ড আছে, উরু ভুরু বক্ষ আছে, অন্য সকল স্ত্রীলোকেরইত তেমনি আছে। গৌরবর্ণটা, কিছু আমার এক চেটিয়া নহে, আমিই যে পল্লীর মধ্যে সুগঠিতা, তাহাও নহে। আমার মত যুবতী বাঙ্গালা দেশে অনেক আছে, অনেক ছিল, অনেক হইবেও; তবে কোন্ পাপে আমি এমন ভাবে মোহপাশবদ্ধ হরিণীর ন্যায় দুঃখ পাইতেছি? আমার স্বামী বলেন, তাঁহার চক্ষু লইয়া দেখিলে আমি নিজেকে অসামান্যা রূপসী দেখিব; তাহাতে আমার লাভ কি? আর তাহাই কি রূপ? ইহার জন্যই আমার স্বামী পাগল! আমার শাশুড়ী সদাই ত্রস্ত! নিশ্চয় বলিতে পারি, প্রকৃত রূপ আমার দেহে নাই, তাঁহাদের নয়নে আছে। রূপটা কেবল দৈহিক সামগ্রী হইলে আমি সে রূপ দেখিয়া আমার স্বামীর মতন বিমূঢ়া হইয়া থাকিতাম। কিন্তু রূপ যে নয়নের সামগ্রী! সকলকে দেখিয়া সকলের নয়নে একরকম রূপের জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠে না। মেজ ঠাকুর-পোর বৌ কাল, তিনি সেই কাল বৌ লইয়া বেশ সুখে আছেন, আমোদ-আহ্লাদ করিতেছেন; মেজবউকেও ভাল বাসেন। মেজঠাকুর-পো ত আমাকে দেখিয়া আমার স্বামীর মত বিহ্বল বিমূঢ় হইয়া থাকেন না; কেবল এক একবার হাসিয়া বলেন, "বড় বউ, রৌদ্রে বাহির হইও না, তোমার

রঙের গোলাপী আভাটুকু শুকাইয়া যাইবে।" পুরুষের মুখে এ সকল কথা, আমরা যুবতী বেশ বুঝিতে পারি; কিন্তু আমার স্বামীর ভঙ্গিটা বুঝা যায় না, বুঝিয়াও লাভ নাই।

ফলে, ধীরে ধীরে আমার মনে একটা বিরক্তির ভাব জাগিয়া উঠিল। এ মোহবন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য মনে মনে একটা সংকল্পও হইল।

৫

আমার শ্বশুর ডেপুটী কালেক্টার, গবর্ণমেণ্টের হুকুমে তিনি আরায় বদলী হইলেন। আমরা সকলেই আরায় যাইলাম। চাটুর্য্যে বাড়ীর একটি ছেলে শিশুদের পণ্ডিত হইয়া আমাদের সঙ্গে আরায় যাইল। কিছুকাল আরায় আমি বেশ সুখে ছিলাম। নূতন স্থান, নূতন ব্যবস্থা—নবীনত্বে আমি আমোদ পাইলাম, পরন্তু আমার স্বামীর সেই পুরাতন মোহ পূর্ব্ববৎই প্রবল রহিল। আরায় আমি একটি কন্যা প্রসব করিলাম। কন্যার মা হইয়া আমার স্বাধীনতাও একটু লাভ হইয়াছিল।

ছেলেদের পণ্ডিতটির নাম রাজকৃষ্ণ; বর্ণ ঘোর কৃষ্ণ, ঠোঁট দুটী খুব মোটা, চক্ষু দুইটি গোল গোল, আর দেহ—সেত লোহের ভাঁটা—সুসংবদ্ধ কেবল মাংসপেসীজড়িত, একটুও কোমলত্ব নাই, যেন ঠিক চোয়াড়ে। রাজকৃষ্ণ আমার অনেক কাজ করিত, অনেক ফরমাইস্ খাটিত, আর মাঝে মাঝে আমাকে ধমকাইত; আমি রাজকৃষ্ণকে ভয় করিতাম, একটু ভালও বাসিতাম।

আমার এক ননদের স্বামী গয়ায় মুন্সেফ ছিলেন, আমরা আরায় আসিয়াছি শুনিয়া, বড়দিনের ছুটিতে তাঁহারা স্বামী-স্ত্রী আমাদিগকে দেখিতে আসিলেন। মুন্সেফ ঘরণী আমার এই ননদিনী, আরায় আসিয়া অবধি আমাকে দুই চক্ষের বিষ দেখিতে লাগিলেন; তাঁহার নিন্দা-পরিবাদ—তিরস্কার-গঞ্জনা প্রথম প্রথম আমার ভাল লাগিত। কেননা বিবাহ হইয়া অবধি, আমি কেবল আদর খাইয়াছি—আদর পাইয়াছি, আদরে আমার বিতৃষ্ণা হইয়াছিল, তাই ননদের তিরস্কার প্রথম প্রথম ভাল লাগিয়াছিল।

কিন্তু এই ননদিনী শেষে আমার কালস্বরূপিনী হইলেন।

৬

আমি যে কক্ষে শয়ন করিতাম, সেই কক্ষের পার্শ্বে একটি বাথরুম ছিল। বাথরুমের পূর্ব্বদিকেই রাজকৃষ্ণের শয়নকক্ষ ছিল। ১লা জানুয়ারী ইংরাজী নূতন বর্ষের নূতন দিন। আমার স্বামী বাঁকিপুরে গিয়াছেন,

আমি এবং আমার প্রথরা ননদিনী, আমরা দুই জনেই কক্ষে শয়ন করিয়া আছি। রাত্রি বারটা বাজিয়া গিয়াছে, একটু ঝির ঝির করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। পৌষ মাসের শেষ, পশ্চিম বেহারের ভীষণ শীতে আমরা কাঁপিতেছি। অমি একবার বাথরুমে যাইলাম, ফিরিয়া আসিয়া আগুনের আংটার কাছে আগুন তাপিতে বসিলাম। আমার ননদিনী উঠিলেন, তিনিও বাথরুমে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া, আমার প্রতি তীব্র দৃষ্টি করিয়া তীরস্কারের স্বরে বলিলেন, "বউ! নাইবার ঘরে এত রাত্রে রাজকৃষ্ণকে দেখিলাম কেন? তুইত ওখানে গিয়েছিলি?" আমি উত্তর করিলাম, "তুমিও গিয়েছিলে ঠাকরুণ? রাজকৃষ্ণ কার জন্য এসেছিল, কে জানে? আর যদিই আমার খোঁজে এসে থাকে, তাতে তোমার ক্ষতি কি? পাঁচ ভায়ের উপর না হয় তোমার আর একটি ভাই হইল।"

আমার ব্যঙ্গ বিদ্রূপের কথা শুনিয়া ননদিনী ব্যাঘ্রীর ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলেন, তীব্রবেগে মায়ের কক্ষের দিকে যাইলেন। উচ্চকণ্ঠে আমার কলঙ্কের কথা মাকে বলিলেন, বাবাকে বলিলেন, বাড়ীতে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল।

পরে আমার শাশুড়ী যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন আমি বলিলাম, "রাজকৃষ্ণকে আমি দেখি নাই।" কিন্তু আমার কথা কেহ বিশ্বাস করিল না। পরদিন প্রত্যূষে রাজকৃষ্ণের খোঁজ হইল, তাহার কক্ষে তাহাকে কেহ পাইল না, সন্দেহের উপর সন্দেহ হইল। আমার এতদিনের এত আদর, এত সোহাগ, সব এক কলঙ্কের বন্যায় ভাসিয়া গেল। বাঁকিপুর হইতে স্বামী আসিলেন, শ্বশুর মহাশয় তাঁহাকে বিলক্ষণ তিরস্কার করিলেন, শাশুড়ী ঠাকুরাণী তাঁহাকে স্পষ্ট ভাষায় বলিলেন, "দেখ্ পরেশ! তুই এমন স্ত্রীকে ত্যাগ কর, আমি অমন কালামুখীকে সংসারে রাখিব না।" শ্বশুর পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তোমার সুন্দরী স্ত্রী যদি ত্যাগ করা কষ্টকর বোধ হয়, তুমি স্ত্রী লইয়া অন্যত্র থাকিতে পার, কিন্তু আমার সংসারে তোমাদের উভয়ের স্থান হইবে না।" আমার ননদিনী বলিলেন, "তা কেন, ও অভাগী দূর হউক, আমি আমার ভায়ের বিবাহ দিব।"

আমার বড় যত্নের রূপের কুসুমস্তর একেবারেই শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িল।

৭

রাজকৃষ্ণের মনে পাপ ছিল কিনা, আমি জানি না। আমি তাহাকে

বাথরুমে দেখি নাই, তাহাকে ভাল বাসিতাম বটে, অনুগত চাকরকে যে ভাবে স্নেহ করে, আমি সেই ভাবে স্নেহ করিতাম। আমার মনে পাপ ছিলনা, কিন্তু আমার ললাটে পাপের কলঙ্ক লেখা আছে, আমি মনে যতই সতী হইনা কেন, আমার অসতীত্বের নিন্দা অচিরে চারিদিকে রটিয়া গেল।

স্বামী আমার শয়ন কক্ষে আসিলেন, আসিয়াই গদ্‌গদ্‌কণ্ঠে বলিলেন, "ফুল! আজ তোমাকে বাপের বাড়ী যাইতে হইবে, আমি ষ্টেশনে পৌছাইয়া দিব। তোমার ভাই আসিয়া তোমাকে লইয়া যাইবেন।"

আমি।—আমার কি অপরাধ যে, আমাকে আমার এই আঠার বৎসর বয়সকালে তুমি ত্যাগ করিতেছ, তোমার কন্যা সুবালার মুখের দিকে একবার তাকাও। আমি যাব না।

স্বামী।—তোমাকে জোর করিয়া পাঠাইয়া দিবার কথা হইতেছে, আমার সঙ্গে যাইলে তোমার মান থাকিবে! আর দরোয়ানের সঙ্গে তোমাকে তাড়াইয়া দিলে তোমার মান থাকিবে না। আমার কথা শোন, তোমার সামগ্রী পত্র সব গুছাইয়া লও।

আমি।—যখন সংসারের সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া যাইতে হইল, তখন আবার গুছাইব কি? আমি এক বস্ত্রে যাইব।

স্বামী।—সুবালাকে আমি যে সব জামা কাপড় খরিদ করিয়া দিয়াছি, তাহা লইয়া যাও; আমাকে কষ্ট দিও না, আমি তোমাকে যে সকল সামগ্রী খরিদ করিয়া দিয়াছি, তুমি তাহাও লইয়া যাও।

আমি।—বিবাহের পর ছয় বৎসর আমি তোমার চরণ ধরিবার অবসর পাই নাই, তুমিই দাও নাই। আজ সেই চরণ ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, বল, একবার বল, আমার মুখের দিকে তাকাইয়া একবার বল, আমার শিশুকন্যার মুখের দিকে তাকাইয়া একবার বল, আমার মাথায় হাত দিয়া একবার বল,—আমি তোমার দৃষ্টিতে নিরপরাধিনী কিনা? তুমি একবার বলিলে আমার সকল জ্বালা জুড়াইবে, আমি সকল দুঃখ পাসরিব। বল নাথ, একবার বল।

স্বামীর চরণ ধরিয়া আমি ঊর্দ্ধমুখ হইয়া কাঁদিতে ছিলাম। আমার মুখের দিকে চাহিয়া স্বামী ধপ করিয়া বসিয়া পড়িলেন, দুই করে আমার দুই গণ্ড চাপিয়া ধরিয়া অধরের উপর একটী চুম্বন দিয়া, কোঁচার কাপড়ে আমার নয়ন-যুগল কপোল ও বক্ষ মুছাইয়া দিয়া, রোদনের স্বরে স্বামী

বলিলেন, "ফুল! অমন করিয়া কাঁদিও না, তোমার মুখ দেখিলে আমার বুক ফাটিয়া যায়, তোমার কথা শুনিলে আমি পাগল হইয়া উঠি; শেষে কি আফিং খাইয়া মরিব? ফুল! তুমি আমার সর্ব্বস্ব; সুখ ঐশ্বর্য্য বিভব বিলাস জীবন যৌবন—আমার সর্ব্বস্বই তুমি। তুমি সতী, তুমি সাধ্বী; আমার দৃষ্টিতে তুমি আমার ইষ্টদেবী, তোমাকে ছাড়িতে, তোমাকে ত্যাগ করিতে আমার যে কত কষ্ট হইতেছে, আমার হৃৎপিণ্ড কি ভাবে ছিঁড়িয়া পড়িতেছে, তাহা কেমন করিয়া তোমাকে বুঝাইব। আমার মুখের দিকে একবার তাকাইয়া দেখ, আমি একদিনেই পঞ্চাশ বৎসরের বুড়া হইয়া পড়িয়াছি।"

আমি।—তবে আমায় পায়ে ঠেলিতেছ কেন? প্রভু, চল দুজনে দেশান্তরে যাই, ভিক্ষা করিয়া খাইয়া দিন যাপন করি।

স্বামী।—ছি! ওকথা বলিতে নাই; ঈশ্বর নিরাকার অজ্ঞেয় পুরুষ; কিন্তু এ জগতে পিতা-মাতা সজীব ও সাকার দেবতা। আমার সেই দেবতাই তোমাকে ত্যাগ করিতে বলিতেছেন; তুমি যাহাই হও না কেন, সতী হও, সাধ্বী হও, পতিব্রতা হও,—তুমি আমার পিতা-মাতার পরিত্যক্তা, তোমাকে লইয়া আমি আর সংসার সুখে সুখী হইতে পারিব না। তুমি যাও, মনে রাখিও, তোমার পরেশ মরিয়াছে, তুমি বিধবা হইয়াছ। আমার এ দেহ আমার নহে, পিতা-মাতার, তাঁহাদের যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবেন। আমাকে হয়তঃ আবার বিবাহ করিতে হইবে; ক্ষত স্থানকে আবার ছেদ করিয়া লবণ প্রলেপ দিতে হইবে।

এই কথা বলিয়া স্বামী কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, আমি ছিন্ন মূল ব্রততীর ন্যায় ধূলায় লুটাইয়া পড়িলাম।

৮

আমি এখন পিত্রালয়ে। আমার স্বামী আবার বিবাহ করিয়াছেন, তাঁহার দুটী পুত্রসন্তান হইয়াছে, তিনি এখন চাকরি করিতেছেন।

আর আমি সধবা হইয়াও বিধবা হইয়া আছি; আমার সে রূপ নাই, সে লাবণ্য নাই, সে আদর নাই, সে সোহাগ নাই। জীবনের অবলম্বনের মধ্যে আমার কন্যা, সে আমার কাছে আছে;—আর পূর্ব্বেকার সে সুখ-স্বপ্নের সুখ-স্মৃতি আমাকে সজীব করিয়া রাখিয়াছে। অতীত জগতে আমার অধিষ্ঠান, আমার পক্ষে বর্ত্তমানও নাই আর ভবিষ্যতও নাই।

ছাই রূপ! রূপের জন্যই ত এত হইল! সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতম্। আমার রূপের অত্যন্ত আদর হইয়াছিল; তাই সে পোড়া রূপের জন্য আমি এখন ধূলায় লুটাইতেছি। স্বর্গের দেবতা আমার চরণতলে বসিয়া আমার মুখেন্দু-প্রভা দেখিতেন, আর এখন আমি, স্বর্গের দ্বার কবে খুলিবে, তাহারই অপেক্ষায় দিন গণিতেছি।

ছাই রূপ। রূপ না থাকিলে হয়ত এতটা হইত না। আমার স্বামী পূর্ব্বে আমার রূপপূজা করিতেন, আর আমি তাঁহার দিবানিশি রূপ পূজার ধূম দেখিয়া মনে মনে কেবল বিরক্তি প্রকাশ করিতাম; এখন তাহারই প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি।

রূপের এ তুষানল, রাবণের চিতার ন্যায়, আমার দেহের উপর আমরণ জ্বলিবে। আমি মরিব না,—কিন্তু বাঁচিতে পারি কৈ?

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাঙ্গালা সংবাদপত্রের ইতিহাস।

(ষোড়শ প্রস্তাব)।

৭৭। সংবাদ-লস্কর।

(১২৫৮ সাল—১৮৫১ খৃষ্টাব্দ)।

নীলকমল দাস, "সংবাদ-লস্কর"-নামক একব্যক্তি, সমাচার-পত্র-পারাবারের কাণ্ডারী ছিলেন। এটী, একটী সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ। ইহার স্থায়িত্ব, মূল্যের পরিমাণ, প্রাতিপাদ্য বিষয়-সমুদয়—ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারই, এত কালের ব্যবধানের পর আমাদের সম্যক্ অগোচর।

৭৮। বঙ্গ-বার্ত্তাবহ।

(১২৫৯ সাল—১৮৫২ খৃষ্টাব্দ)।

ইহাই, পাক্ষিক পত্রিকা-সমূহের অগ্রণী। ইংরাজী-ভাষায় সুশিক্ষিত কতিপয় যুবক, "বঙ্গ-বার্ত্তাবহের" প্রবর্ত্তক। পঞ্চদশ দিবস ব্যবধানে ইহার প্রচারণ হইত। এক পক্ষ কালের তাবৎ সমাচারেরই সার-সংগ্রহ,

এই "বার্ত্তাবহ" অকাতরে বহন করিতেন। সাময়িক ঘটনাবলীর উপর মতামত প্রকটিত ও অভিব্যক্ত করিতেই ইহার মুখ্য লক্ষ্য থাকিত।

৭৯। কাশীবার্ত্তা-প্রকাশিকা।

(১২৬০ সাল—১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ)।

নামেই প্রকাশ—পবিত্র বারাণসী-ধামের সংবাদ-প্রচারই, এতৎ-পত্রিকার প্রধান উদ্দেশ্য। উহাকে এক প্রকৃষ্ট লক্ষ্য বলিতে হইবে। বারাণসীর বার্ত্তার কত মাহাত্ম্য, প্রকৃত ভক্ত ব্যতীত আর কে, তৎ-সমস্ত বিদিত হইতে শক্ত হইবে, বলি দেখি? কিন্তু দুঃখ এই—অদ্যাবধি নির্দ্দিষ্ট নিদর্শন কিছুই মিলিল না।

৮০। জ্ঞানারুণোদয়।

(১২৬০ সাল—১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ)।

রবির আবির্ভাবে অন্ধকার, দূরীভূত হইয়া যায়। জ্ঞান-রূপ অরুণের উদয়ে অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হয়। কর্ম্মকার কেশব, ইহার কর্ণধার। "জ্ঞানারুণোদয়ের" সন্দর্শন জন্য প্রত্যেক মাসে ।০ (চারি) আনা মাত্র পয়সার প্রয়োজন হইত। সুতরাং বৎসরে বৎসরে মুদ্রাত্রয় (তিনটী টাকা) কেবল দিলেই, "জ্ঞানারুণোদয়ের" সঙ্গে লোকের দেখা সাক্ষাৎ ঘটিত। কিন্তু এক অব্দও, নিঃশব্দে বা সশব্দে, "জ্ঞানারুণোদয়ের" প্রকাশ হইয়াছিল, অথবা উহার কোন বিশেষ বিপদ্ ঘটিয়াছিল কি না, সংশয় হয়। তাহার কারণ, উক্ত বৃত্তান্তের সম্যক্ বিবরণের একান্ত অসদ্ভাব।

অতঃপর পরবর্ত্তী বর্ষের অধিকারে গিয়া পড়িতে হইতেছে। পশ্চাৎ পাঠক-পুঞ্জের দৃষ্টিপথে ইহাই নিপতিত হইবে যে, তখন এক অভিনব যুগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

৮১। সুধাবর্ষণ।

(১২৬১ সাল—১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ)।

এত ক্ষণের পর ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের বর্ণনায় ব্যাপৃত হইতে হইবে। সংবাদ-পত্র-মহলে "সুধাবর্ষণ"কে সার্থক নাম লইয়া, স্বীয় অব্যর্থ সামর্থ্য অভিব্যক্ত করিতে দেখিলে, কি শুনিলে, কেই বা না পরম পুলকিত

হয়, বলুন দেখি? যে কারণত্রয়ে "সুধাবর্ষণ" অন্বর্থতা প্রাপ্ত হইয়াছিল—এই স্থলই, তাহার বিবরণের অপ্রতিকূল। প্রথমতঃ, এটী একটী আহ্নিক পত্রিকা। দ্বিতীয়তঃ, বাণিজ্য-ব্যাপার-মূলক বিষয়েই, এতৎ-পত্র, সম্পূর্ণ শক্ত ও সমর্থ। তৃতীয়তঃ, বাঙ্গালা ও হিন্দী ভাষায় যাহার পরিচালনা চলিয়াছিল, তাহাকে উপেক্ষার সামগ্রী মনে করা অসাধু। মাসে মাসে ১৲ (এক মুদ্রার) সাহায্য দ্বারা লোকের ঘরে ঘরে প্রতি দিবস ইহা কর্ত্তৃক অমৃত বৃষ্টি হইত।

৮২। বঙ্গবিদ্যা-প্রকাশিকা।

(১২৬১ সাল—১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ)।

ইহার বিস্তারিত বৃত্তান্ত, একান্তই অপরিজ্ঞাত। এতাবৎ-কাল পর্য্যন্ত যাবৎ পত্র, জাত ও মৃত হইয়াছিল, তাহাদের ব্যাপার, সর্ব্বসাধারণের অগোচর রাখি নাই। "বঙ্গবিদ্যাপ্রকাশিকা" পত্রিকা, ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া, কি কি সুকার্য্য বা কুকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তত্তাবৎ ব্যাপার, নর-লোকের জ্ঞানগোচর হইতে পায় নাই—এইটীই, আমাদের নিতান্ত মনস্তাপের নিদান। তবে নাম দেখিয়া, মনে হয়—বঙ্গের জ্ঞান-রত্নের কতকটা প্রচার, ইহার চেষ্টায় হইয়াছিল।

৮৩। সংবাদ-চারু-চন্দ্রোদয়।

(১২৬৩ সাল, অগ্রহায়ণ—১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ নবেম্বরের শেষার্দ্ধ ও ডিসেম্বরের প্রথমার্দ্ধ)

যে যে বিষয়, জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে, তাহা এই,—

ক। সম্পাদক—বাবু নিমাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়।

খ। মাসিক মূল্য—।০ (চারি) আনা।

গ। বাৎসরিক মূল্য—২৷৷০ (আড়াই) টাকা।

ইহার অনুষ্ঠান-পত্র-সম্বন্ধে "সংবাদ-প্রভাকরে" নিম্নলিখিত কয়েক পঙ্‌ক্তি লিখিত হইয়াছিল,—

"কতিপয় বিদ্যানুরাগী যুবক, আগামী অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমাবধি "সংবাদ-চারুচন্দ্রোদয়" নামে একখানি নূতন সাপ্তাহিকপত্র প্রকাশকরণে

স্থিরসঙ্কল্প হইয়া, তাহার অনুষ্ঠানপত্র প্রকাশ পূর্ব্বক গ্রহণেচ্ছু মহাশয়-দিগের স্বাক্ষর গ্রহণ করিতেছেন।" (১)

উল্লিখিত লিপির প্রচারের অষ্টাদশ দিবস পরে "প্রভাকর"-সম্পাদক কবিপ্রবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়, পুনরায় লিখিয়াছিলেন,—

"আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম যে, "সংবাদ-চারু-চন্দ্রোদয়" নামে এক-খানি সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র, এতন্নগরে কোন বিদ্যানুরাগী যুবক কর্ত্তৃক প্রকটিত হইবেক। অধুনা আমরা, তাহার অনুষ্ঠানপত্র প্রাপ্ত হইয়া, নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম। কোন্ দিবসাবধি ঐ পত্র, প্রকাশারম্ভ হইবেক, তাহা এ পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হয় নাই। বোধ হয়, শতাধিক লোকের স্বাক্ষর না হইলে, প্রকাশক, পত্র-প্রকাশে সাহসিক হইবেন না।" (২)

"অনুষ্ঠানপত্র।

"জ্ঞান-ইন্দীবর আছে হৃদি-সরোবর।
অজ্ঞান-ভাস্করে তারে জর জর করে॥
মুকুলিত ছিল যাহা বিকসিত হয়।
অঘন গগনে হেরি 'চারুচন্দ্রোদয়'॥"

"পূর্ব্বাপেক্ষা বর্ত্তমান সময় এই বঙ্গদেশবাসী ব্যক্তিবৃন্দ, বঙ্গভাষানু-শীলন-বিষয়ে বিলক্ষণরূপে যত্নবান্ হইয়াছেন। অতএব আমরা বর্ত্তমান সময়কে জ্ঞান-সময় বিবেচনা করিয়া "সংবাদ-চারু-চন্দ্রোদয়" নামে এক-খানি অভিনব সংবাদ-পত্র-প্রকাশকরণে স্থিরসংকল্প হইয়াছি। ঐ পত্র, "সংবাদ-প্রভাকরের" ন্যায় নানা দিগ্‌দেশীয় সমাচার ও গদ্য-পদ্য পরি-পূরিত বিবিধ দেশহিতজনক প্রবন্ধ ও ইংরাজী গ্রন্থ হইতে নানাপ্রকার উত্তম বিষয়ের অনুবাদ প্রকাশ করিবেন। আমরা, এই অনুষ্ঠান-পত্রে অন্য কোন প্রকার প্রতিজ্ঞা করিতে ইচ্ছা করি নাই। কার্য্যের দ্বারাই সকলে, আমাদিগের অভিপ্রায় ও পরিশ্রমের প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হইবেন। পরন্তু সাধারণ বিদ্যানুরাগী মহোদয়গণের বিহিত সাহায্য ব্যতীত এত-ন্মাঙ্গলিক বিষয়, কোনরূপেই সুসম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। এ কারণে

(১) সংবাদ প্রভাকর, ১২৬৩ সাল, ৫ই কার্ত্তিক।

(২) সংবাদ-প্রভাকর, ১২৬৩ সাল, ২৪শে কার্ত্তিক।

বিনীত ভাবে নিবেদন করিতেছি যে, তাঁহারা, আমার নবীনোৎসাহ বর্দ্ধনার্থ এই অনুষ্ঠানপত্রে আপন আপন নাম স্বাক্ষর করিবেন। আমরা সাধারণের পাঠ-সুলভ নিমিত্ত "সংবাদ-চারু-চন্দ্রোদয়ের" মাসিক মূল্য ।০ (চারি) আনা অথবা বার্ষিক অগ্রিম ২৷৷০ টাকা নির্দ্ধারণ করিয়াছি।"

শ্রীনিমাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদক।

মধ্যে এক বৎসরের ব্যবধান। ১২৬২ সাল, (১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দ) বিনা কার্য্যেই অতীত হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর "জ্ঞানদর্পণ" দশজনকে দর্শন দিয়াছিলেন।

৮৪। জ্ঞানদর্পণ।

(১২৬৩ সাল, ৯ই পৌষের অর্থাৎ ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বরের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়।)

"সংবাদ-প্রভাকর" না কি আমাদের শুভাদৃষ্টক্রমে সুপ্রসন্ন ছিলেন, সুতরাং "জ্ঞানদর্পণের" বিবরণ, আমাদের সকলের সন্দর্শনযোগ্য হইল। প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতিরেকে কেইবা মৌখিক একটা উক্তিতে ভক্তিমান্ হয়? আমরা প্রমাণবলে বলীয়ান্ হইয়াছি, সুতরাং নিম্নে তাহার নিদর্শন লিপিটী, নিবদ্ধ করিয়া দিলাম,—

"আমাদিগের (৩) বন্ধুবর পূর্ব্বতন "জ্ঞানদর্পণ"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়, এই কর্ম্মের (ভদ্রলোকদিগকে বর্দ্ধমান ষ্টেশন হইতে ঠিক বর্দ্ধমান সহরের ভিতর আনয়নের) অধ্যক্ষ"। (৪)

জানা গেল—সম্পাদকের নাম ছিল—বাবু "উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য"। মতান্তরে ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে (১২৫৪ সালে) ইহার প্রথম প্রকাশ। বার্ষিক মূল্য ৪।০ (চারি টাকা চারি আনা) বৈ নয়। পত্রিকাটী সাপ্তাহিক।

আগামী বারে "সোমপ্রকাশ", "এডুকেশন গেজেট" প্রভৃতি অন্যান্য সংবাদ-পত্রের বিষয় আলোচিত হইবে।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

(৩) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের। কেন না, উক্ত উদ্ধৃত অংশ, উক্ত কবি-পুঙ্গব গুপ্ত মহোদয়ের 'ভ্রমণবিবরণ' সন্দর্ভের সারাংশ।

(৪) সংবাদ প্রভাকর, ১২৬৩ সাল, ৯ই পৌষ।

গোকুলে-শ্রীকৃষ্ণ।

ভক্তবৃন্দের মধ্যে যাঁহারা অভিনিবেশ পূর্ব্বক বিবিধ পুরাণ শাস্ত্রে কৃষ্ণলীলা পাঠ করিয়াছেন, কবি কল্পনার যথেষ্ট মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াও তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের সারসংগ্রহ করিতে বোধ হয় সম্পূর্ণরূপেই সমর্থ হইয়াছেন।

কৃষ্ণলীলা অনেক প্রকার।—ঋষিপ্রণীত কৃষ্ণলীলা, গোস্বামী প্রণীত কৃষ্ণলীলা, বৈষ্ণবপ্রণীত কৃষ্ণলীলা, গোঁড়াপ্রণীত কৃষ্ণলীলা, ইত্যাকার নানা শ্রেণীর নানাজনপ্রণীত কৃষ্ণলীলার পুস্তক আমাদের দেশে অনেক আছে। এতদ্ব্যতীত এতদ্দেশীয় ওস্তাদী কবিতে এক এক প্রকার কৃষ্ণলীলা গীত হয়;—এতদ্দেশীয় যাত্রাতে, আধুনিক থিয়েটারগুলিতে এক এক প্রকার কৃষ্ণলীলার সুন্দর সুন্দর চিত্র প্রদর্শন করা হয়;—আমাদের প্রেমাস্পদ আদরণীয় অকালমৃত সাহিত্য-বন্ধু বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কৃষ্ণসাগর মন্থন করিয়া একখানী কৃষ্ণ চরিতামৃত তুলিয়া রাখিয়া গিয়াছেন; এই সকল ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে এবং যাত্রাদির অভিনয়ে পরস্পর কতদূর প্রভেদ, আবিষ্টচিত্ত পাঠক ও দর্শক মহাশয়েরা তাহা অবশ্যই বুঝিয়া লইয়াছেন।

এদেশে কৃষ্ণলীলার পাঠক অনেক, অভিনয়-ক্ষেত্রে দর্শকও অনেক; কিন্তু কৃষ্ণ বাস্তবিক কি, দেশের সকলে তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন, দুঃসাহসে তেমন মিথ্যা কথা আমরা বলিতে পারিব না। শ্রীকৃষ্ণের রূপ কি, প্রকৃতপক্ষে অবশ্যই তাহা পরিজ্ঞাত হইবার উপায় নাই। কৃষ্ণ অবতারের পূর্ব্বে কৃষ্ণের কি প্রকার রূপ ছিল, ভারতের সাময়িক কবিকুল তাহা এক এক প্রকারে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কজন লোক, ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখিয়া সহসা সেই সকল রূপকে কৃষ্ণ বলিয়া চিনিতে পারেন? ময়ূরপুচ্ছশোভিত মোহনচূড়া, নানাবর্ণ রঞ্জিত পীতধড়া, গোপিকারঞ্জন মোহনমুরলী ঠাম ত্রিভঙ্গ, বক্ষে ললাটে সুগন্ধ শুভ্রচন্দন, এই গুলির একত্র মিলন না হইলে, এখনকার কৃষ্ণভক্তেরা এখন কৃষ্ণকে কৃষ্ণ বলিয়া চিনিতে পারেন না। কৃষ্ণ যখন ব্রজধামে, চূড়াধড়া পরিয়া গোচারণ করিতে প্রবৃত্ত হন নাই, তাহার বহু পূর্ব্বে ধ্রুব, প্রহ্লাদের সিদ্ধিলাভ। প্রচলিত প্রমাণানুসারে ভক্তশ্রেষ্ঠ ধ্রুব প্রহ্লাদও সেই সত্য-

যুগেও ব্রজরাজরূপী ত্রিভঙ্গিমঠাম কৃষ্ণরূপ দর্শন করিয়াছিলেন, ইহাই স্বীকার করিতে হয়। কৃষ্ণকে ভগবানের অবতার বলিয়া স্বীকার করিলে, বাস্তবিক তাহার প্রকৃত রূপ নির্ণয় করা অসাধ্য। যিনি হরি, যিনি নারায়ণ, যিনি নৃসিংহ, যিনি অসীম, অনন্তনামধারী, তিনিই কৃষ্ণ; ভক্তের মনে এইরূপ বিশ্বাস; ধ্যান করিবার সময় কিন্তু তাঁহারা গোপিনীরঞ্জন কৃষ্ণরূপ ভিন্ন আর অন্যরূপ ভাবিতে পারেন না।

কৃষ্ণ বাস্তবিক কি?—রূপে যেমন মানুষের ভ্রম হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রেও সেইরূপ প্রবল ভ্রম থাকা বিচিত্র নহে। এখনকার সাধারণ সংস্কার, প্রায় এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, কৃষ্ণ একটি গোপান্নপালিত, মাখনচোরা, বসনহরা, লম্পট বালক ছিল। ব্রাহ্মণ কায়স্থের—অপর জাতীয় নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা বিশেষতঃ স্ত্রীলোকেরা কৃষ্ণকে, সত্য সত্যই, গোপালবালক বলিয়া জানে; শৈশব চরিত্রও কলঙ্কিত মনে করে। ভক্তের পক্ষে এ প্রকার গুরুতর ভ্রম থাকা কদাচ মঙ্গলসূচক নহে; অতএব অতি সংক্ষেপে এইখানে আমরা অদ্য কৃষ্ণের শৈশব লীলাটি দর্শন করিবার চেষ্টা পাইব।

একাদশ বর্ষকাল গোকুলে আর বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের অবস্থান। তাহার অধিক নহে। দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে অক্রূরের রথে কৃষ্ণ বলরাম মথুরায় কংসযজ্ঞে নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন; তাহার পর আর গোকুলে অথবা বৃন্দাবনে ফিরিয়া যান নাই। একাদশ বর্ষ মাত্র ঐ দুই স্থানে অবস্থিতি। সেই একাদশ বৎসরের মধ্যে কদিন গোপের অন্ন শ্রীকৃষ্ণের উদরস্থ হইয়াছিল, সাধারণ অন্তরে সেই নিগূঢ় তত্ত্বটি নিরূপণ করিবার ইচ্ছার উদয় হয় না;—গোপালয়ে কৃষ্ণ ছিলেন, গোপের অন্ন ভক্ষণ করিয়াছেন, ইহাই সাধারণ লোকে আপন আপন মনে সিদ্ধান্ত করিয়া লয়। এ সিদ্ধান্তে ভ্রম কোথায়, তাহাও আমরা এই স্থলে দেখাইবার প্রয়াস পাইব।

শ্রীকৃষ্ণ গোপের অন্ন ভক্ষণ করেন নাই। একাদশ বৎসর কেবল ক্ষীর সর নবনী ভোজন করিয়াই পরিপুষ্ট হইয়াছিলেন। দুটি দিন মাত্র অন্ন ভোজনের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে দিন মহর্ষি গর্গ নন্দালয়ে আগমন পূর্ব্বক পায়সান্ন রন্ধন করিয়াছিলেন, সেইদিন এক আশ্চর্য্য দৃশ্য সংঘটিত হইয়াছিল। ঋষি যখন নারায়ণায় নমঃ বলিয়া পায়সান্ন উৎসর্গ করিয়া দেন, শিশু কৃষ্ণ তখন হামাগুড়ি দিয়া গিয়া সেই অন্ন ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করেন; যশোদা অত্যন্ত ভয় পান রন্ধনের সময়

কৃষ্ণকে, নিকটে যাইতে দেন না। ঋষি পুনর্ব্বার রন্ধন করেন, নিবেদন করিবামাত্র কৃষ্ণ আসিয়া অগ্রে আহার করিতে বসেন। তিনবার এইরূপ হয়। চতুর্থবারে নন্দরাণি সক্রোধে কৃষ্ণকে একটা ঘরে আবদ্ধ করিয়া দ্বারে চাবি দেন। চতুর্থবার গর্গ ঋষি নূতন পায়সান্ন উৎসর্গ করিবামাত্র কৃষ্ণ আসিয়া ভোজনপাত্রের সম্মুখে উপবিষ্ট। অজ্ঞান শিশুর কার্য্য ভাবিয়া পূর্ব্বে পূর্ব্বে যাহারা পুনঃ পুনঃ ভীত হইয়াছিল, এবারে তাহাদের সকলেরই মহাশ্চর্য্য জ্ঞান হইল। একদ্বারী গৃহ; চাবিবদ্ধ বালক; চাবি অভগ্ন; বালক কি প্রকারে ঋষি সন্নিধানে উপস্থিত হইল?

বার বার আশ্চর্য্য ক্রিয়া সন্দর্শনে ঋষির মনে সংশয় জন্মিল; ঋষি তখন ধ্যানে বসিলেন। ধ্যানে জানিলেন, কৃষ্ণ কে?—তখন তিনি প্রেমানন্দপূর্ণ রোমাঞ্চিত কলেবরে অগ্রে স্বহস্তে কৃষ্ণকে, পায়সান্ন ভক্ষণ করাইয়া, তদনন্তর স্বয়ং ভক্তিভাবে সেই প্রসাদ ভোজন করিলেন। অপরাধ ক্ষমা পাইবার জন্য যশোদা আসিয়া ঋষিবরের পায়ে ধরিলেন; ঋষিবর তাঁহারে নিগূঢ় তত্ত্ব বলিলেন। মায়াবশে নন্দরাণী সে তত্ত্ব অতি শীঘ্র ভুলিয়াই অভ্যাসসিদ্ধ পুত্রস্নেহে শ্রীকৃষ্ণকে কোলে তুলিয়া লইলেন।

শ্রীকৃষ্ণের অন্ন ভোজনের এই একটি প্রমাণ। দ্বিতীয় প্রমাণ, বনমাঝে অন্নভিক্ষা। রাখালরাজ একদিন রাখালমণ্ডলীতে পরিবেষ্টিত হইয়া অন্ন ভোজনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন; ঋষিকন্যাগণের নিকট হইতে অন্ন ভিক্ষা করিয়া আনিবার নিমিত্ত শ্রীদাম সখা প্রেরিত হন; ঋষি কন্যারা স্নেহানন্দে বিভোর হইয়া স্বয়ং স্বয়ং বন মধ্যে আগমন পূর্ব্বক কৃষ্ণকে কোলে লন, মনসাধে অন্ন ভোজন করান; কৃষ্ণের সহিত রাখালেরাও পরমপুলকে সেই অন্ন ভোজন করে।

এই দুই প্রমাণে বিলক্ষণ প্রতীতি জন্মিবে, ঐ দুই দিবস ব্যতীত কৃষ্ণ আর একদিনও গোপগৃহে অন্ন গ্রহণ করেন নাই। তাহা যদি করিতেন, নিত্য নিত্য অন্ন ভক্ষণ করা তাঁহার যদি অভ্যাস থাকিত, তাহা হইলে পুরাণে ঐ দুই দিবসের এত মাহাত্ম্যমূলক বিশেষ উল্লেখ থাকিত না। যাহারা নিত্য নিত্য অন্ন ভোজন করে, তাহাদের দুই একটা উপলক্ষের কথা কেহই ধরে না। নিত্য অন্নভোজী হইলে কৃষ্ণের ঐ দুই দিবসের তত ব্যগ্র তৃষ্ণার আবির্ভাব হইত না। (ক্রমশঃ)

শ্রীভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

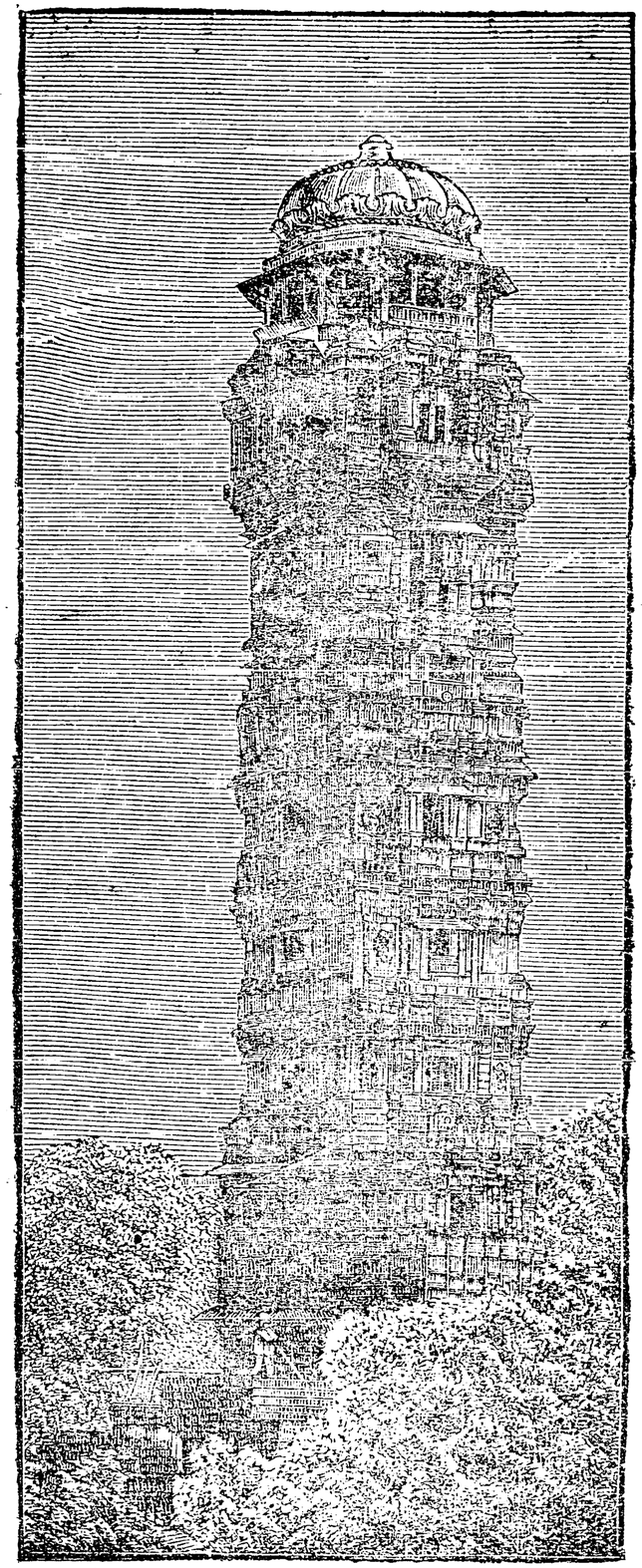

চিতোর।

সূর্য্যবংশের কোশল রাজ্যে প্রধান অধিষ্ঠান; এবং তাঁহাদিগের রাজধানী অযোধ্যা। তাই সূর্য্যবংশাবতংস রাজা রামচন্দ্রের রাজধানী

অযোধ্যানগরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি রাজকার্য্য পরিচালনে আদর্শ-পুরুষ ছিলেন। কুশ এবং লব নামক তাঁহার দুই পুত্র ছিল। তৎপরে রাজা রামচন্দ্রের বংশ-স্রোতের কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া গেলেও, পর্য্যায়ক্রমে তাহার ধারাবাহিক ইতিহাস সাধারণের সম্পূর্ণ বিদিত নহে; তবে মিবারের রাণাগণ আপনাকে সূর্য্যবংশীয় বলিয়া পরিচিত করায়, এই স্থানে অদ্য চিতোরের কথা কিছু বলা যাইতেছে।

রাজা রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুশের পবিত্র বংশে বাপ্পারাও নামক এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন; ইনিই ৭২৮ খৃষ্টাব্দে—"চিতোর-গড়" নির্ম্মাণ করিয়া তথায় রাজধানী স্থাপন করেন। উপস্থিত এই দেশে যাইতে হইলে, রাজপুতানার অন্তর্গত উদয়পুরে হোলকার সিন্ধিয়া ষ্টেট রেলওয়ের একটী ষ্টেশন আছে।

পূর্ব্বে এই দেশের নাম ছিল "চিত্রকূট"; ইহার উল্লেখ রামায়ণ-গ্রন্থেও দেখিতে পাওয়া যায়। সেই রামায়ণের "চিত্রকূট" পর্ব্বত কালে পরিবর্ত্তন হইয়া চিতোর হইয়াছিল;—ইহাই অনেকের ধারণা। এই চিত্রকূট দিয়া রাক্ষসরাজ রাবণ সীতাহরণ করিয়া লইয়া যান, এবং এখানে জটায়ু পক্ষীর সঙ্গে রাবণের যুদ্ধ হয়। ইহা দ্বারা এই বুঝা যায় যে, সিংহলে যাইবার পথ চিত্রকূট দিয়া ছিল। এবং উক্ত পাহাড়ের উপর তখন কোন রাজার অধিকার ছিল না; কেবল অসভ্য পাহাড়ী-দিগের এবং পশু পক্ষিগণের বাস ছিল। বস্তুতঃ এই বন জঙ্গলময় পার্ব্বত্য প্রদেশ কালে চিতোর নগরে পরিণত হইল। *

চিতোর গড়টী দূর হইতে দেখিতে ইংলণ্ডের উইণ্ডসর প্রাসাদের মত। যাঁহারা এই নগর দেখিয়াছেন, তাঁহারা ভারতের অমরাবতী বা গোলকের চিত্র হৃদয়পটে অঙ্কিত করিয়াছেন! যাঁহারা দেখেন নাই, তাঁহাদের কল্পনাবলে দেখাইবার চেষ্টা করা বৃথা। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে, একটী সুবৃহৎ ক্রমোচ্চ পর্ব্বতের গাত্রে যেন, স্থানে স্থানে সুবৃহৎ জলাশয়, স্থানবিশেষে বনরাজি, কোথাও বা অট্টালিকাশ্রেণী। এই

* অনেকেই আবার চিত্রকূট দাক্ষিণাত্যে বলিয়া, তাহার সংস্থানের বিপর্য্যয় ঘটাইয়া, ইহাকে চিত্রগূঢ় বা চিত্রগড়ের অপভ্রংশ নাম চিতোর বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ স্থানে যে সুবৃহৎ নয়নরমণ হর্ম্ম্য, তাহাই রাজপ্রাসাদ, এবং উহার অপর নাম চিতোর গড়।

চিতোর গড়ের দীর্ঘ ৫৭৩৫ গজ এবং প্রস্থ ৮৩৬ গজ। ইহার ভিতর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জলাশয় আছে, দুর্গ আছে, কতকগুলি কীর্ত্তিস্তম্ভ আছে, শস্য-ক্ষেত্র আছে, তথায় গোধূম এবং চণকের কৃষি ও উৎপত্তি বিশিষ্টরূপ; এমন কি, অনেক খ্যাতনামা মুসলমানদিগকে পর্য্যন্ত রাখি দিয়া ধর্ম্মভ্রাতা পাতাইয়া রাখিতেন। যে সকল অপরিচিত পুরুষদিগকে স্ত্রীলোকেরা রাখি দিত, তাঁহারা অনেকে সে সকল কামিনীদিগের মুখ দর্শনও করেন নাই। পরন্তু এই সম্মান পাইয়া তাঁহারা বিপদের সময় ঐ সকল হইয়া থাকে, কিন্তু গবাদি পশুদিগের খাদ্য তৃণের বড়ই অভাব। পরন্তু গড়ের ভিতর অনেক দেব দেবীর মন্দির আছে। তন্মধ্যে "মোকল-জীর মন্দির" সুদীর্ঘ।

মোকলজীর মন্দির ৭২ ফিট্ দীর্ঘ এবং উত্তর দক্ষিণ ৬০ ফিট। ইহাকে গিরিমন্দির বলা যাইতে পারে। পর্ব্বতের উপর নির্ম্মিত ও প্রকৃতই যেন পর্ব্বতের গুহারূপে তাহার তোরণ রচিত করিয়া দিয়াছেন। এবংবিধ পার্ব্বত্য মন্দিরের নির্ম্মাণ কৌশল প্রকাশ করিতে গেলে বলিতে হয়, পর্ব্বতের গাত্র কাটিয়া ক্রমে সহজভাবে যেন একটী রথ প্রস্তুত করা হইয়াছে; সেই রথসদৃশ মন্দিরটী দেখিতে অতি সুন্দর; সেই সৌন্দর্য্য আরও পরিস্ফুট হইয়াছে, প্রকৃতির গাম্ভীর্য্যময় অতি ভয়াবহ স্থানে বলিয়া। এই বৃহৎ মন্দিরের ভিতর দিবালোক প্রবেশ করে না। অন্ধকারময় স্থান। মন্দিরের গাত্রে নগরের অবস্থাজ্ঞাপক অনেক চিত্র আছে।

চিতোর গড়ের স্তম্ভগুলির মধ্যে "জয়স্তম্ভ" বিশেষ উল্লেখযোগ্য; এটী বিশেষ কারুকার্য্যযুক্ত অথচ কলিকাতার মনুমেণ্টের মত উচ্চ। ১৪৫৮ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রস্তুত হয়। ইহার গাত্রে বিবিধ শ্লোকে নগরের অবস্থা লিখিত আছে। এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে "জয়স্তম্ভের" চিত্র দেওয়া হইয়াছে।

চিতোর গড়ের কেল্লার ভিতর শস্য ক্ষেত্র আছে, জলাশয় আছে এবং কেল্লার দক্ষিণ ভাগের প্রাচীর ১৮১৯ ফিট উচ্চ। উত্তর ভাগে ১৭৬১ ফিট উচ্চ প্রাচীর। এই দুর্গের তিনটি দ্বার। এখন এই কেল্লা

হোলকার মহারাজের অধিকার ভুক্ত। সময়ে, ইহা আকবরের অধিকার-ভুক্ত ছিল।

এই সকল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পল্লী লইয়া চিতোরের রাজধানী। এবং এই রাজপ্রাসাদ-বেষ্টন প্রাচীরে বহু তোরণ-দ্বার আছে। এখন যেমন লৌহের রেলিং হইয়াছে, তখন তাহা ছিল না; তখন প্রাচীর ছিল, এবং প্রাচীর-বেষ্টিত প্রাসাদকে "গড়বন্ধী" বা "গড়" বলিত।

চিতোরগড় শৈলোপরি ৩।৪ মাইল উর্দ্ধে শিখরদেশে বনের ভিতর। এই স্থান হইতে শৈলের নিম্নস্থ নগর ইত্যাদি কামানের দ্বারা অনায়াসে নষ্ট করা যায়। এই শৈলের ৩।৪ মাইল নিম্নে "চিত্রকূট" দেশ। এখন এই দেশকে "তলহাটী" কহে। এই পর্ব্বতের সমতল হইতে ৪৫০ ফিট উচ্চে চিতোর গড়।

রাণা বাপ্পরাওয়ের বংশীয়গণ রাজপুত ক্ষত্রিয়গণের শিরোরত্ন। সূর্য্য-কুলতিলক মহাবীর রামচন্দ্রের বংশধরগণ ক্রমবিক্ষেপে রাজপুতরূপে পর্য্যবসিত। পরন্তু ইহাঁরা বহুদিন পর্য্যন্ত চিতোরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ৭২৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাণাগণ চিতোরে রাজত্ব করেন। এই কাল মধ্যে চিতোরে অনেক বীরপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে মহাবীর সমরসিংহ, প্রতাপসিংহ, বাদলসিংহ, কুম্ভরাণা এবং ভীমসিংহ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট আকবর উদয়সিংহের নিকট হইতে এই নগর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া পাইয়াছিলেন।"

মিবারের রাজপুতগণের স্বাধীনতা রক্ষার চেষ্টা—তজ্জন্য যুদ্ধে আত্মোৎসর্গ বিশেষ অতুলনীয়। এইরূপ আত্মরক্ষার্থক কোন একটী ভীষণ সংগ্রামে, এত রাজপুতের প্রাণ উৎসৃষ্ট হইয়াছিল যে, উহাদের উপবীত ওজন করিয়া ৭৪৷৷০ মন হইয়াছিল। তাই অদ্যাপিও হিন্দুরা কোন গোপনীয় পত্রের পৃষ্ঠে ৭৪৷৷০ দাগ দিয়া থাকে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, "অপর যিনি এই পত্র খুলিবেন, তিনি ৭৪৷৷০ মন উপবীতধারী দ্বিজহত্যার পাপ গ্রহণ করিবেন।"

সহজে চিতোর বশীভূত হয় নাই। যুদ্ধে পরাজিত হইয়াও, অনেক রাজপুত প্রধান গুপ্তভাবে পর্ব্বত গহন কাননাদি আশ্রয় করিয়া, অবসর-ক্রমে মুসলমানদিগের অনেক ক্ষতি করিয়াছিলেন। এমন কি, ইহাঁরা মোগল রাজধানী দিল্লী পর্য্যন্ত আসিয়া লুট তরাজ করিয়াছিলেন।

ইহারা ধর্ম্মাবলম্বনে মোগল বাদসাহের নিগ্রহ করিয়াছিলেন। যুদ্ধে অবতরণ করিয়া ইহাঁরা উন্মাদবৎ হইয়া উঠেন, তাই রক্ষোবংশ ধ্বংসের ন্যায় যবনবিনাশেও ইহাঁদের দ্বারা অনেক অভিনীত হইয়াছিল। আজ কাল যেমন পল্লীগ্রামের ভিতর সাহেব দেখিলে, তথাকার লোকেরা অনেকটা ভয় পায়, তখন ইহাঁদের দেখিলে মুসলমানগণ বলিত, "রাজ-পুতকা তলবার, আউর রাজপুত সোয়ার। মাত ঠার হুঁসিয়ার!!" ইহা বড় ভয়ের কথা ছিল।

রাজপুত স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত অসময়ে অথবা প্রয়োজন হইলে যুদ্ধ করিতে বাহির হইতেন। পরন্তু আমাদের দেশে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া এবং এই দেশের "রাখি বাঁধা" প্রথা অনেকটা উদ্দেশ্যে কারণগত ঐক্য দেখা যায়। এখনকার "রাখি বাঁধা" যেমন বৎসরের এক সময়ে হয়, তখন এ প্রথা ছিল না। রাজপুত কামিনীরা এবং অধ্যাপকেরা প্রয়োজন হইলে, অন্যের সঙ্গে "রাখি" সূত্র প্রদান করিয়া, তাঁহার সঙ্গে ধর্ম্ম ভ্রাতা সম্পর্ক পাতাইয়া রাখিতেন, দেশের মঙ্গলের জন্য এবং বিপদ আপদের জন্য; কিন্তু এখনকার "রাখি সূত্র" যে সে যাহাকে তাহাকে দিয়া থাকে, বিশেষতঃ নিম্নশ্রেণীর হিন্দুস্থানীরা পার্ব্বণীর লোভে "রাখি" আনিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু রাখির এ নিয়ম নহে। তখনকার রাজপুত হিন্দু-রমণীরা অন্তঃপুর হইতে দেশের প্রসিদ্ধ যোদ্ধা বা ধনী মহাজনদিগকে ধর্ম্ম ভগিনীদিগকে স্বীয় প্রাণ দিয়া রক্ষা করিতেন। এখনকার রাখি-সূত্র যেমন রেশম নির্ম্মিত, তখনকার রাখি বলয় ছিল স্বর্ণ, রৌপ্য এবং হীরকে নির্ম্মিত।

শ্রীরাজকৃষ্ণ পাল।

বাঙ্গালা ভাষার লেখক।

—বিষ্ণুচন্দ্র মৈত্র। বয়ঃক্রম ৪৮ বৎসর। বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ,—আঢ্যকাপ-সাতোটার মৈত্র। পূর্ব্বপুরুষেরা ভট্টাচার্য্য উপাধিতে অভিহিত হইতেন। নিবাস,—বর্দ্ধমানজেলার অন্তঃপাতী গঙ্গাতীরবর্ত্তী মাজিদা-গ্রাম। পিতার নাম ৺রাজনারায়ণ ভট্টাচার্য্য। রাজনারায়ণ অতি কৃত-বিদ্য ও ধীমান্ ছিলেন। তাঁহার পিতা ৺হরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য তেজস্বী ও ধর্ম্মশীল ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অতি যত্নসহকারে পুত্র রাজনারায়ণকে বাঙ্গালা ও ইংরেজী শিক্ষা দিয়াছিলেন। বয়োবৃদ্ধি সহকারে, অধ্যবসায়-

বলে, রাজনারায়ণ সংস্কৃত ভাষাতেও বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বাল্যকালে পিতা মাতার অজ্ঞাতসারে এক বন্ধুর সহিত দেশ-ভ্রমণে বহির্গত হন, এবং উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাবের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া দেশে প্রত্যাগত হন, এই সময়ে ঐ বন্ধুর অনুরোধে তিনি "রসিকরঞ্জন" নামক কাব্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থ আদিরস-ঘটিত এবং পূর্ব্বে ইহার বহুল প্রচার ছিল। কিছুদিন বাটীর নিকটবর্ত্তী দুই এক স্থানে বিষয়কর্ম্ম করিয়া অবশেষে তিনি কলিকাতা নগরীতে আগমন করেন। সে সময়ে ৺ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "সমাচার চন্দ্রিকা" প্রকাশিত হইয়াছে। রাজনারায়ণ, ভবানীচরণের জীবিতকালে ও মৃত্যুর পরে "চন্দ্রিকার" লেখক ও "রত্নাবলী" নামক সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিলেন। ১২৫৪ সালে তাঁহার "পঞ্জাবেতিহাস, প্রকাশিত হয়। এই সময়ে কলিকাতায় ভূম্যধিকারীসভা বা "Land-holders" Association সংস্থাপিত হয়। ১২৫৬ সালে রাজনারায়ণ "ভূম্যধিকারী সভার" শাখা সংস্থাপনার্থ রঙ্গপুরে গমন করেন। কিছুদিন রঙ্গপুর ভূম্যধিকারী সভার সম্পাদকের কার্য্য সম্পাদনের পর ১২৫৭ সালের কার্ত্তিক মাসে ৪৩ বর্ষ বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

রাজনারায়ণের মৃত্যুকালে বিষ্ণুচন্দ্র জননীর ক্রোড়ে। পিতার যত্নে তাঁহার যেরূপ শিক্ষা ও মানসিক উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, তাহা হয় নাই। তাঁহার শিক্ষার ভার তাঁহার পিতামহ হরচন্দ্র ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মধুসূদনের উপর ন্যস্ত হয়। তাঁহার বাল্যকাল পিতামহের নিকট অতিবাহিত হয়। প্রাথমিক শিক্ষাও বিষ্ণুচন্দ্র পিতামহের নিকট প্রাপ্ত হন। পিতামহের চরিত্র প্রভাবে ভক্তি ও বিশ্বাসের বীজ তাঁহার হৃদয়ে নিহিত হয়। শিক্ষার্থ পিতামহ বিষ্ণুচন্দ্রকে কোন পণ্ডিতের টোলে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এখানে বিষ্ণুচন্দ্র ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মধুসূদন তাঁহাকে টোল ছাড়াইয়া ইংরেজী শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। এ সময়ে মধুসূদন কলিকাতায় "ভাস্কর" "প্রভাকর" প্রভৃতি সংবাদপত্রের সহকারী সম্পাদকতায় নিযুক্ত ছিলেন। যে সময়ে "ভাস্কর"-সম্পাদক ৺গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য কারারুদ্ধ হন, সে সময়ে "ভাস্কর" পত্রের সমস্ত ভার মধুসূদনের হস্তে ন্যস্ত ছিল। [ক্রমশঃ]

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।

ছায়াসতী।

(২)

রাজকুমার রমণীমোহন উদার ও সরলস্বভাব ছিলেন, তাঁহার কপটবন্ধু অতুল নিজ স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য তাঁহাকে কুপথে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতে-ছিল; সুতরাং মন্দবন্ধুর সংসর্গে ও পরামর্শে রাজকুমার বাল্যসীমা অতিক্রম করিতে না করিতে অমিতব্যয়িতায় ও লাম্পট্যদোষে দূষিত হইয়া স্বীয় পিতার বিরগভাজন হইয়াছিলেন; কেবল একমাত্র পুত্র বলিয়া অপরিত্যক্ত হইয়াছিলেন।

অতুল প্রস্থান করিলে কুমার উৎসাহিত ভাবে উদ্যানে পাদচারণা করিতে করিতে বারংবার বাতায়নের দিকে চাহিতেছিলেন। বালিকা ইন্দ্র-প্রিয়াও অল্প বয়সেই সংসার-সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছে, রাজকুমারের সর্ব্বদা দর্শনে তাহার কোমল মন প্রণয়পরবশ হইয়াছিল, তাহার আর পুস্তকে যত্ন নাই, সূচীকর্ম্মে অমনোযোগ, সর্ব্বদা উদাসভাবে গবাক্ষে বসিয়া থাকে; এবম্প্রকার রমণীমোহনের মোহন রূপ দর্শনে দিন দিন প্রণয়াঙ্কুর বর্দ্ধিত হইতেছিল। কুমার কথা কহিতে যদিও ইন্দ্রপ্রিয়া উঠিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু অধিকক্ষণ থাকিতে না পারিয়া পুনরায় তাঁহার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় ধীরে ধীরে বাতায়ন সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; কুমারের নয়নে নয়ন সম্মিলন হইল, লজ্জায় নতমুখে বসিয়া পড়িলেন, হৃদয় ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল। রমণীমোহন অবসর বুঝিয়া সসম্ভ্রমে কহিলেন;—"অমরমোহিনি, সামান্য মানবজ্ঞানে যদি ঘৃণা না কর, তবে কিছু আবেদন করি;—ঐ স্বর্গীয়-রূপ-নগরীর দ্বারে এ অধীন ভিখারী বরমাল্যের ভিক্ষার্থী; এক্ষণে তোমার কৃপায় প্রার্থিতলাভে ধনী হইতে অভিলাষী।" লজ্জিতা ইন্দ্রপ্রিয়া তড়িতের ন্যায় তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। কুমারের অতৃপ্ত রসনা নিরুপায় হইয়া নিস্তব্ধ হইল, কুমারও সুতরাং অতুলের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে অতুল ও একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক কুমারের নিকট আসিল। কুমার "এই কি সেই স্ত্রীলোক?" ইহা অতুলকে জিজ্ঞাসা করাতে অতুল মাথা নাড়িয়া কুমারের কথায় সায় দিল। কুমারও ক্রমে ক্রমে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন,—"তোমার নাম কি? কোথায় কর্ম্ম

কর—কাহার সঙ্গে এখানে আসিয়াছ ইত্যাদি"। পরিচারিকা উত্তর করিল, "আমার নাম যশোদা, আমি কোন্নগরের নীরেন্দ্রলাল বাবুর বাড়ী তাঁহার ভগিনী ইন্দুকে লালনপালন করিতাম; এক্ষণে সে এখানে তাহার মাসীর বাড়ীতে লেখা পড়া করিতে আসিয়াছে; আমিও তাই তার সঙ্গে এসেছি। কেন মশায় আমায় এ সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন?" রমণীমোহন ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "ইন্দ্রপ্রিয়াকে যদি আমায় দিতে পারিস্, তোকে হাজার টাকা বক্‌সিস করিব।" বৃদ্ধা হাজার কাহাকে বলে তাহা বুঝিত না, শিহরিয়া উত্তর করিল, "না বাবু, আমি তা পারবো না। বাপ্‌রে! তা কি হয়? ঐটি পেটে ওর মা বিধবা হয়েছিল। তাই তিনি মেয়েকে চক্ষে হারান্! তাহা হইলে মা মরে যাবেন! বড় আদারের মেয়ে গো! হাতে হাতে বেড়ায়! কেবল মা বড় লেখা পড়া ভালবাসেন বলে, তাই শেখাতে এখানে পাঠাইয়াছেন!" রমণীমোহন ব্যগ্রভাবে বলিলেন, তোমায় পোনের শত টাকা দিব, তুমি ইন্দ্রপ্রিয়াকে বলিও যে, "রমণীমোহন রায় বলে এক জন তোমায় বিবাহ করিতে চাহে; কিন্তু লুকিয়ে।" কারণ আমার বাপ আছেন; তিনি জানিতে পারিলে বিবাহ হইতে দিবেন না। তোমার ইন্দু আমাকে চেনে, বলিও, "যাকে তুমি তোমাদের বাটীর পার্শ্বের বাগানে সর্ব্বদা দেখিতে পাও, ও যে তোমাকে তোমার গোলা তুলিয়া দিয়াছিল। তিনি যদি রাজী হন, তাহা হইলে আমার একটি বন্ধু গড়পারে থাকেন, সেইখানেই আমাদের বিবাহ হইবে। "দেখ ঝি, এ কথা যেন ইন্দ্রপ্রিয়ার মাসীও না জান্তে পারেন। অতুল বৃদ্ধাকে উৎসাহ দিয়া বলিল, "দেখ ঝি, তুমি যদি ইন্দ্রপ্রিয়াকে বাবুকে দিতে পার, তা হইলে সেত রাণী হবেই, আর তোমার যে যেখানে আছে, কাহাকেও কখন খেটে খেতে হবে না।" বৃদ্ধা শত টাকা বুঝিত; পোনের শ টাকা শুনিয়া তাহার মস্তক ঘুরিতে লাগিল! কুমারকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া টাকার স্বপন দেখিতে দেখিতে ও কুমারের প্রদত্ত ১০৲ টাকা অঞ্চলে বাঁধিতে বাঁধিতে উদ্যান হইতে বহির্গত হইল। কুমারও অতুলের সহিত উদ্যান হইতে গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীমনুজেন্দ্র দত্ত।

গীত।

ভজ'রে মন, হরি জনার্দ্দন,
কংসধ্বংসকারী—শ্রীমধুসূদন।
জ্ঞান-লোচন, করি উন্মীলন,
প্রাণভরে তাঁরে কর দরশন॥
চরণে নূপুর বনমালা গলে,
পরিধান পীতাম্বর, তিলক ভালে,
করে মোহন বাঁশী, মুখে মধুর হাসি,
বামে হেলা চূড়া, বঙ্কিম নয়ন॥
বামে যাঁর শোভে বিজলী-বরণী,
বৃষভানু-সুতা রাধা বিনোদিনী,
ভাব তাঁর পদ, পাবে মোক্ষপদ,
যাইতে না হ'বে শমন সদন॥

শ্রীসুরেশচন্দ্র সরকার।

মালঞ্চ।

কোন কাজ নাই।

(১)

তোমাকে, আমার কোন কথা নাই,
কোন আশা নাই, তোমার কাছে—
এই ভব পথে চলিতে চলিতে
দৈববশে দোঁহে দেখা হয়েছে।

(২)

দুদিনের দেখা—দুদিনে ভুলিবে
কেবা কোথাকার রবেনা মনে,
তুমি, গরবিনি, রহিবে এমনি
আমি গো লুটাব ধূলি শয়নে।

(৩)

তোমাতে আমাতে দূর—বড় দূর
কত বাধা আছে পথ মাঝারে—
(তুমি) ধনীর ঝিয়ারী, আমি গো ভিখারী
তুমি বিদ্যালোকে আমি আঁধারে।

(৪)

তুমি গো রূপসী মধুরিমাময়ী
সুবেশা, সুভূষা তুমি গো বালে,
আমি কদাকার কঠোরতা সার
চীর বিমলিন আমার ভালে।

(৫)

তুমি সুরসিকা, সুসভ্যা, তরুণী ;
আমি অমার্জ্জিত বিশুষ্ক প্রাণ ;
তুমি বাঞ্ছনীয়া, তুমি বরণীয়া
আমি হেলনীয় সবারি স্থান।

(৬)

যে তোমা' হেরেছে মানস-মোহিনি,
সেই পদতলে পড়েছে গো ;
(কত) ধীমানে শ্রীমানে সজল বয়ানে
দাঁড় করে দ্বারে রেখেছ গো।

(৭)

মানস-সরসে সাঁতরে মরাল
বলাকা লুটায়ে কাদায় কুলে ;
তুমি কি সুভগে, মরালে তেয়াগি
বলাকাকে হৃদে লইবে তুলে ?

(৮)

কভু আঁখিকোণে হেরনি আমায়
কভু ভাব নাই দাসের কথা—
কখনো সাহসে বলিনি সকাশে
এ হৃদয়ে, দেবি, কতই ব্যথা।

(৯)

কি হবে বলিয়া ? কি আছে গো আশা—
কি ভরসা বল আমার আছে ?
(আমি) নীরবে সহিব, নীরবে পূজিব,
বলি দিব হৃদি তোমার কাছে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ নিয়োগী।

চিন্তা।

হৃদিবিদারিণি চিন্তে ! নর হৃদিমঠে
চিরবাস তব। কহ বিশ্ব-বিমোহিণি,
যে জন তোমারি রক্ষক, ভক্ষক তা'র
কি দোষে বা হও ? তক্ষক সদৃশ দংশ
হৃদিপিণ্ডে তা'র ; দিবানিশি জ্বলে মরে
অভাগা সে জন, নিদারুণ চিন্তা-জ্বরে।
তব জ্বর নহে সোজা কথা, মৃত্যুবাণ
সম মানবের পক্ষে। ভাব দেখি চিন্তে,
যে জন যতনে হৃদে, করে সংরক্ষণ ;
যাহার আশ্রয়ে থাকি দিবস রজনী
দিন দিন বৃদ্ধি হও, মানস-মন্দিরে ;
হায়রে ! নারীর রীতি এত কি কঠিন !
অবিশ্বাসী, আততায়ী, কৃমিকীট সম,
দিন দিন হৃদিপিণ্ড, করি খণ্ড খণ্ড,
যাতনার মহাকূপে, কর গো নিক্ষেপ !
আহা ! যেবা রূপবান্ মদনমোহন,
কভু, রূপবতী, রতি জিনি কান্তি যা'র ;
সেও হয় একদিন তোমার পরশে
কান্তিহীন তনু, নারকীয় জীব সম
কুৎসিত-আকার, চেনা ভার লোক মাঝে।
শুন বিশ্ব-রাজরাণি ! এ ভুবন তব

পদানত। রোগী, ভোগী, কভু বা সন্ন্যাসী,
রাজা হ'তে প্রজাপুঞ্জ, তব আজ্ঞাধীন।
কহ লো সুন্দরি! কেবা মুক্ত তব হ'তে?
ভাব দেখি মনে, সেই কুরুক্ষেত্র রণে,
কৃষ্ণ, মিত্র পার্থ সহ, হায়! কতদিন
স্মরে'ছে তোমায়? হেন দৃষ্টান্ত অপার
রহে'ছে ভারতে গাঁথা, কিংবা রামায়ণে।
শুন চিন্তে! তুমি নও, সামান্য সে নারী;
মূঢ় আমি, তব লীলা বুঝিতে না পারি!
কোটী কোটী নতি তব পায়, এ ভুবন
চায়, ক্ষণমাত্র মুক্তি পেতে তব হ'তে।
তুমি লোকে পার জানি, হাসাতে কাঁদাতে,
কভু পার কা'রে উঠা'তে স্বরগে; কভু
ফেল কারে কৃমিময় নরকের হ্রদে।
সাবাস! সাবাস! অচিন্ত্য মহিমা তব।
শুন বিশ্বরাণি! জানি আমি সবিশেষ,
শমনদুহিতা তুমি—রোগ, মৃত্যু, জরা,
এ তিন সোদর তব। যেই মহাপাপী,
আর অনর্থের মূল অর্থ, এ'রা দুই
সাধের কিঙ্কর তব, ষড়রিপুগণ
সখা লো তোমার, ঘুরে তব আশে পাশে।
ক্ষম মম দোষ, যদি কর রোষ, ত্যজ মোরে
যত শীঘ্র পার, এই মম নিবেদন।
কালভুজঙ্গিণি! এ ভুবন তবাশ্রিত;
তেঁই কহি শুন মন দিয়া, যত দিন
রহে এ জীবন, কোরো'না বঞ্চিত যেন,
বিভু ধ্যান জ্ঞানে, কিংবা সাধু দরশনে॥

শ্রীভুবনকৃষ্ণ মিত্র।

শরৎ।

পূরবে অরুণ-রেখা এমনি জাগিয়েছিল,
এমনি প্রভাত-রবি রাঙামুখে চেয়েছিল,
এমনি বিজলে ঊষা ঘোম্‌টাটী খুলেছিল,
এমনি নলিনী তা'র মুখখানি তুলেছিল,
এমনি শরতে সেহ বরিষা-বারি-চুল
লুকাইয়েছিল পিছে ধরণী সরমাকুল;
এমনি জগৎ-রূপ, রবি-করে ফুটেছিল,
হীরার আঁচলখানি নিশীথ-গগনে ছিল।
এমনি—এমনি ভোরে এই আমি এসেছিনু,
অতীত শরতে কোল সমাদরে দিয়েছিনু।
আজো সেই দীপ্তিমাখা দেখিয়ে নীল আকাশ,
আজো সেই শুভ্রমেঘে শরতের পূর্ণাভাস,
তাই এই আবাহনে আনিয়াছি ফুল-ডালি;
যা'বে নাকি পূজা?—দেবি! যা'বে নাকি পুষ্পাঞ্জলি!

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী।

বঙ্গ সাহিত্যে-বঙ্কিম।

সমালোচনা।

শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত। মূল্য ১।০। কালিকা-যন্ত্রে মুদ্রিত, বর্দ্ধিত আয়তনে দ্বিতীয় সংস্করণ, পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত ও পুনর্লিখিত, পরিমাণ ২২৩ পৃষ্ঠা।

বাঙ্গালার সাহিত্যগৌরব মহারথ, স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী, বংশ পরিচয়, বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম, শৈশব, কৈশোর, যৌবন, বিদ্যাশিক্ষা, এবং প্রতিভাযুক্ত কৃতিত্বের বিবরণ বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক,—বাবু হারাণচন্দ্র রক্ষিত, মহাশয়, এই পুস্তকে স্বগৌরবে লিপিবদ্ধ করিয়া আমাদিগের বিশেষ কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন; ইতিপূর্ব্বে

আমরা হারাণবাবুকে একজন উৎকৃষ্ট উপন্যাসিক, লেখক, ও কবি বলিয়া জানিতাম। "বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিমপাঠে" তাঁহার সমালোচনা, সূক্ষ্ম অনুসন্ধান, গভীর গবেষণা ও পাণ্ডিত্য যথেষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে। যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত, কিছুমাত্রও সম্বন্ধ রাখেন, সাহিত্যের গৌরব জানেন, এই পুস্তক পাঠ করিয়া তাঁহারা সকলেই বুঝিবেন, গ্রন্থকার বাঙ্গালা সাহিত্যের মহারথ বঙ্কিমচন্দ্রকে পদে পদে;—তেজোময়ী অপূর্ব্বা প্রতিভাকে সুমধুর তালে নৃত্য করিয়া গিয়াছেন। এরূপ এক সম্প্রদায় আছেন, তাঁহারা স্পর্দ্ধা করিয়া বলেন, গদ্য লিখিতে কবিত্বের সহায়তার প্রয়োজন কি? সেই সম্প্রদায় আমাদের বঙ্কিমচন্দ্রকে কবি বলিয়া সম্মান দিতে কখনই সম্মত নহেন। যিনি যাহাই বলুন, আমাদের বিশ্বাস, তাঁহাদের ইহা কতদূর ভ্রান্তি তাহা তাঁহারা বুঝিতে, একেবারেই অক্ষম! প্রকৃতই যাঁহারা সাহিত্যসেবক, তাঁহাদের পুস্তকাদিতে, গদ্য রচনায় বর্ণে বর্ণে কবিত্বের সৌরভ থাকে। আরব্য উপন্যাস, এবং বেতাল পঞ্চবিংশতি, প্রভৃতি অদ্ভুত অদ্ভুত উপন্যাস পুস্তকেও উচ্চাঙ্গের কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীতে স্তরে স্তরে, অনুপম কবিত্ব বিরাজমান। হারাণবাবু অতি সুন্দরভাবে পরিস্ফুটরূপে সাধারণ পাঠককে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া, তাহাতে সম্পূর্ণরূপেই কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

বিশেষতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের সুমধুর কবিতা, ও সঙ্গীত অনেক আছে, দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, এবং মৃণালিনী, প্রভৃতি কয়েকখানি চিত্তরঞ্জন উপন্যাসের মধ্যে মধ্যে নূতন নূতন, সঙ্গীতে এবং পদবদ্ধ রচনাবলীতে, তাঁহার কবিত্বের বিলক্ষণ পরিচয় আছে। বাঙ্গালার প্রায় অধিকাংশ নর নারী তাঁহার বিরচিত সঙ্গীতে বিমুগ্ধ।

বাবু হারাণচন্দ্র রক্ষিত, বর্ত্তমান সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার অধিকারী হইয়া, প্রকৃষ্টরূপেই তাঁহার প্রতিভার সজীব চিত্র, প্রদর্শন করিয়াছেন। যদিও ইহা একখানি—মৌলিক গ্রন্থ নহে, তথাপি আমরা বলিতে বাধ্য, ভাষার লালিত্যে, "বঙ্গ সাহিত্যে বঙ্কিম" উপন্যাসের ন্যায় চিত্ত আকর্ষক হইয়াছে। পুস্তকখানি আমরা মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছি। "বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম" বাঙ্গালা সাহিত্যের উপাদেয় গ্রন্থ। হারাণবাবুর পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে।

জন্মভূমি।

(সচিত্র মাসিক পত্র।)

নবম বর্ষ। } ১৩০৭ সাল, অগ্রহায়ণ। { ৫ম সংখ্যা।

মুক্তি।

যখন দুই, তিন, চারি বা ততোধিক বিরুদ্ধ মতের পরস্পর সামঞ্জস্য করিতে হয়, তখন কোনও মত বিশেষের পক্ষপাতী হইলে প্রকৃত কার্য্যে কৃতকার্য্য হওয়া যায় না। পক্ষপাত শূন্য হইয়া প্রকৃত সত্যের অনুসন্ধান করাই সামঞ্জস্য-কারের কর্ত্তব্য। আমরা সত্যের অনুসন্ধান বা আবিষ্কার করিতে সমর্থ হই বা নাই হই, সত্য নির্ব্বাচন করিতে একবারেই অসমর্থ নহি। যদিও প্রাকৃত মনুষ্যে পূর্ণজ্ঞান সম্ভাবনা সুতরাং পারলৌকিক বিষয়ের সত্য নির্ব্বাচন করাও প্রাকৃত মনুষ্যের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব, তথাপি যদি অসত্যকে প্রকৃতই সত্য বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে সেই অসত্যের সত্যতা নিরূপণও তাদৃশ দোষাবহ হয় না। কিন্তু অসত্যকে অসত্য জানিয়া যদি তাহার সত্যতা সংস্থাপন পূর্ব্বক জিগীষা বা বিপ্রলিপ্সার তৃপ্তিসাধন করা হয়, তবে ইহলোকে অকীর্ত্তি ও পরলোকের জন্য মহাপাতক সঞ্চয় করা মাত্র। লৌকিক বিরোধের সমাধান অতি সহজ কিন্তু অলৌকিক অতীন্দ্রিয় বিষয়ে বিরোধ উপস্থিত হইলে তাহার সমাধান করিয়া ঐকমত্য স্থাপন করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। যিনি তপঃপ্রভাবে অলৌকিক বিষয় অনুভব করিতে সমর্থ, তাঁহার কথা পৃথক্, কিন্তু যিনি সংসারের ক্রীতদাস ও ইন্দ্রিয়গণের আজ্ঞাবহ, এরূপ অযোগ্য বিষয়ে হস্তার্পণ করা তাঁহার সাহসমাত্র। যেমন সাংসারিক কোন বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইলে প্রাচীন পিতার অনুমতি লইয়া কার্য্য করিতে হয়, সেইরূপ অলৌকিক বিষয়ের সন্দেহ ভঞ্জনার্থ অপেক্ষাকৃত প্রাচীনতম আপ্ত বাক্যের অনুসরণ করাই

কর্ত্তব্য। অসংখ্য আর্য্যশাস্ত্রের মধ্যে উপনিষৎ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম, সুতরাং শাস্ত্র মাত্রেরই পিতৃস্থানীয়। যেমন পুত্রের আপাদমস্তক সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই পিতা হইতেই উদ্ভূত, সেইরূপ সমস্ত আর্য্যশাস্ত্রই একমাত্র উপনিষদের অনুকরণমাত্র। যেমন মহাসাগরের সত্তা অবলম্বন করিয়াই পৃথিবীস্থ সমস্ত নদ নদী প্রভৃতি জলাশয়ের সত্তা, সেইরূপ শাস্ত্র সাগর উপনিষদের অভিপ্রায় অবলম্বন করিয়াই দর্শনাদি সমস্ত আর্য্যশাস্ত্রের অস্তিত্ব। যেমন অনন্ত আকাশব্যাপী অনন্ত বায়ু পৃথিবীস্থ সমস্ত জীবের উপজীব্য, সেইরূপ একমাত্র উপনিষৎ সমীরণই অসংখ্য আর্য্যশাস্ত্রের জীবনস্বরূপ। যেমন কোন কোন বংশধর সন্তান বস্ত্রালঙ্কারের বাহ্য শোভায় সুশোভিত হইয়া মলিনবাসা বৃদ্ধ পিতাকে পিতা বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করেন, সেইরূপ যে সকল গ্রন্থ শব্দালঙ্কারের বাহ্যড়ম্বর দেখাইয়া উপনিষৎ অগ্রাহ্য করেন, ঐ সকল গ্রন্থকে অসদ্ গ্রন্থ না বলিয়া থাকিতে পারা যায় না। যেমন আপাতদর্শী অর্দ্ধ শিক্ষিত পুত্র সুশিক্ষিত প্রাচীন পিতার দীর্ঘদর্শিতার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া সুপণ্ডিত পিতাকে নির্ব্বোধ বলিতেও কুণ্ঠিত নহেন, সেইরূপ কোন কোন পণ্ডিতাভিমানী মহাপুরুষ উপনিষদ্ বাক্যের অগাধ অন্তস্তল স্পর্শ করিতে না পারিয়া ঐ অপৌরুষের ঈশ্বর বাক্যের ভ্রান্তি প্রদর্শন করিতেও লজ্জা বোধ করেন না। যদি স্বতঃ প্রমাণ বেদবাক্যেও ভ্রান্তি থাকা সম্ভব হয়, তবে ভ্রান্তি প্রদর্শকদিগের ভ্রান্তি প্রদর্শন কি ভ্রান্তিমূলক হইতে পারে না? যে সকল অর্দ্ধ শিক্ষিত যুবক আপন আপন বৃদ্ধ পিতাকে ভ্রান্ত বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের বার্দ্ধক্য হইলে তাঁহাদের পুত্রগণ তাঁহাদিগকে ভ্রান্ত বলিবে না এ কথা কে বলিতে পারে। কবিবর ভবভূতি মালতীমাধব নামক নাটকের প্রথমেই বলিয়াছেন—

"যে নাম কোচিদিহনঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং।
জানন্তিতে কিমপি তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ।"

উপনিষৎ সম্বন্ধে আমিও তাহাই বলি। অতএব উপনিষদের ভ্রান্তি প্রদর্শন না করিয়া আপন আপন সূক্ষ্মদর্শিতার অভাব স্বীকার করাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য।

এইরূপে উপনিষদের উৎকর্ষ স্বীকার করিয়া সকল শাস্ত্রের তদনুরূপ ব্যাখ্যা করাই প্রকৃত সামঞ্জস্য এবং ইহাই আমাদের সত্য নির্ব্বাচনের একমাত্র উপায়। উপনিষদের সহিত যে সকল শাস্ত্রের আপাততঃ শব্দগত বিরোধ

দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার শব্দার্থমাত্র গ্রহণ না করিয়া তাৎপর্য্য গ্রহণপূর্ব্বক উপনিষৎ বাক্যের সহিত ঐক্য সংস্থাপন করিলেই যথার্থ সমাধান হইয়া থাকে। উপনিষদের সপ্রামাণ্য রক্ষা করিবার জন্য অন্য শাস্ত্রের অর্থান্তর স্বীকার করা যাইতে পারে। কিন্তু অন্য কোনও শাস্ত্রের সম্মান রক্ষার জন্য উপনিষদের অর্থান্তর কল্পনা করা আমার বিবেচনায় নিতান্ত দোষাবহ। আমি সাংখ্যের পক্ষপাতী, অতএব উপনিষদের তদনুরূপ অর্থান্তর কল্পনা করিয়া সাংখ্যের সম্মান রক্ষা করিলাম, আবার এক ব্যক্তি বৈশেষিক দর্শনে অত্যন্ত অনুরক্ত, তিনিও উপনিষদের প্রকারান্তরে ব্যাখ্যা করিয়া বৈশেষিক দর্শনকে উচ্চ আসন প্রদান করিলেন। এইরূপ সকলেই যদি আপন আপন উপজীব্য শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য অসহায় উপনিষদ্‌কে নানাস্থানে আকর্ষণ পূর্ব্বক নিজ নিজ অভীষ্ট সাধন করিয়া লইলেন, তবে আর উপনিষদের স্বতঃপ্রামাণ্য রহিল কোথায়? এবং সামঞ্জস্যই বা হইল কি? আদর্শ স্বরূপ একখণ্ড বিমল সুবর্ণ নিকষোপলে ঘর্ষণ করিলে যে স্বর্ণাভ রেখা উৎপন্ন হয়, সুবর্ণ বণিকেরা অন্যান্য স্বর্ণালঙ্কারের বিমলত্ব বুঝিবার জন্য নিকষোপরি ঘর্ষণ করিয়া ঐ আদর্শ রেখার সহিত মিলাইয়া থাকেন। যে স্বর্ণালঙ্কারের রেখা আদর্শ রেখার সদৃশ হইল না, অগ্নি সংযোগে তাহার মালিন্য দূর করিয়া আদর্শ সদৃশ করিয়া লয়েন। অলৌকিক বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিবার সময় উপনিষদই আমাদের ঐরূপ আদর্শ অর্থাৎ উপনিষদের সহিত যে কোন গ্রন্থের আপাততঃ অনৈক্য দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ সকল শব্দার্থগত অনৈক্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাৎপর্য্যার্থে উপনিষদের সহিত সমানার্থ করিলেই প্রকৃত সিদ্ধান্ত ও সামঞ্জস্য হইল। আমার একটী স্বর্ণালঙ্কার আছে, উহা বিমল সুবর্ণ বলিয়া আমার বিশ্বাস; কিন্তু নিকষোপলে ঘর্ষণ করিয়া দেখিলাম, উহার রেখাগত বর্ণাভা আদর্শ সুবর্ণের রেখাগত বর্ণাভার সদৃশ হইল না, তখন আপন অলঙ্কারের মালিন্য অপাকরণ না করিয়া অগ্নি সাহায্যে আদর্শ স্বরূপ বিমল সুবর্ণে ধাত্বন্তর মিশ্রিত করিয়া নিজালঙ্কারের গৌরব রক্ষা করা আর উপনিষদের অর্থান্তর কল্পনা করিয়া আপন উপজীব্য শাস্ত্রের সম্মান রক্ষা করিতে সমুদ্যত হওয়া সমান কথা। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন:—

"আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেণ সমাধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ॥

যিনি বেদ-শাস্ত্রের অনুকূল তর্কদ্বারা ঋষি-প্রণীত ধর্ম্মোপদেশের সমাধান করেন, তিনিই ধর্ম্মতত্ত্ব জানেন, অন্যে জানেন না।

আমিও যে সমগ্র ধর্ম্মতত্ত্ব অবগত হইয়াছি তাহা নহে, কেবল মন্মাদি মহাপুরুষগণের অমূল্য উপদেশের অনুসরণ করিয়াই বেদোপনিষদের উৎকর্ষ অনুবাদ করিতেছি। পরাশর বলিয়াছেন :—

অক্ষপাদ প্রণীতেচ কানাদে সাংখ্য যোগয়োঃ।
ত্যাজ্যঃ শ্রুতিবিরুদ্ধোহংশঃ শ্রুত্যেকশরনৈর্নৃভিঃ॥

ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য ও যোগ দর্শনের মধ্যে যে সকল অংশ শ্রুতিবিরুদ্ধ ঐ সকল অংশ শ্রুতিপরায়ণ ব্যক্তিদিগের পরিত্যাজ্য।

এইরূপ শত শত ঋষি-বাক্যের অনুসরণ পূর্ব্বক উপনিষৎ ও তদনুগত শাস্ত্রের সিদ্ধান্তানুসারেই আমি মুক্তির আনন্দ রূপত্ব প্রতিপাদন করিলাম। অথবা ইহা আমার প্রতিপাদন করা নহে, কেবল অপৌরুষের উপনিষদের ও পবিত্র পরমর্ষিবাক্যের অনুবাদ মাত্র। ইহা ভিন্ন লৌকিক ব্যবহার দর্শনেও মুক্তির আনন্দময়ত্ব কথঞ্চিৎ অনুভব করা যায়। বিশেষ মনোনিবেশ পূর্ব্বক চিন্তা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, পিপীলিকা হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সমস্ত জীবই প্রাতঃকাল হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত কেবল আনন্দের অনুসন্ধানেই উদ্যত আছে। যেমন বাহ্য দেহের সহজ অবস্থার ব্যতিক্রম ঘটিলেই তাহা রোগ বলিয়া নির্ণীত হয়, এবং ঐ রোগ নিবারণের নানাপ্রকার প্রতিকারের প্রয়োজন হইয়া থাকে, সেইরূপ আনন্দ স্বরূপ জীবের স্বরূপাবস্থা আবৃত্ত হইলেই অন্তরে যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, এবং ঐ দারুণ যন্ত্রণা নিবারণের জন্যই অর্থাৎ স্বাভাবিক আনন্দ স্বরূপে অবস্থান করিবার নিমিত্তই গ্রাসাচ্ছাদনাদি নানাপ্রকার বাহ্য প্রতিকারের প্রয়োজন হইয়া থাকে। অতএব ঐরূপ প্রতিকারের চেষ্টাকে দুঃখ নিবারণের অভিলাষ বলিয়া আপাততঃ প্রতীয়মান হইলেও নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে উহা নিত্যসিদ্ধ স্বাভাবিক আনন্দ লাভের অভিলাষ বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। যেমন স্থূলদেহের অন্যতম উপাদান জলীয় পদার্থের অভাব হইলেই তাহাকে তৃষ্ণা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, সেইরূপ জীবের অন্যতম উপাদান আনন্দ, সেই আনন্দের কোন প্রকার বিঘ্ন ঘটিলেই তাহা দুঃখ বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে, অতএব যাহা স্বরূপানন্দের আবরণ তাহাই দুঃখ, ঐ আবরণ অপসারণ না করিলে স্বরূপানন্দের প্রকাশ হয় না, সেই জন্যে উহা অপনয়ন করিতে হয় এবং সেই জন্যই আপাততঃ দুঃখ নিবারণের চেষ্টা বলিয়া প্রতীয়মান, হইয়া থাকে। বাস্তবিক স্বরূপানন্দ লাভই ঐরূপ চেষ্টার মুখ্য উদ্দেশ্য। যদি দুঃখ নিবারণ মাত্রই অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে উত্তরোত্তর উৎকৃষ্টতর সামগ্রীর জন্যে অভিলাষ হইত না। ক্ষুধা হইলে যে দুঃখের অনুভব হয়, তাহা সুখলভ্য শাকেও উপশমিত হইতে পারে, তবে যত্নলভ্য ক্ষীর শরাদির জন্য মনুষ্য এত যত্নবান্ কেন? শীত জন্যে দুঃখ কম্বলেও উপশমিত হইয়া থাকে, তবে শাল, বনাত প্রভৃতি বহুমূল্য বস্ত্র আহরণ করিতে হয় কেন? কেবল আনন্দের জন্য।

(ক্রমশঃ।)

শ্রীনীলকান্ত গোস্বামী।

কবিকেশরী

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের এক পরিচ্ছেদ।

(১৩০৫ সাল।)

"It is a good sign when good deeds are honoured. Blood may be shed and great victries may be won by the selfish, the vain glories and the proud, but they only are truely great who delight in goodness and hnmanity." P. C. SIRCAR.

ক্ষণজন্মা, স্বনামধন্য, বঙ্গের গৌরব, কবিকেশরী শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গত ২৫শে বৈশাখে ৩৯ ঊনচত্বারিংশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘজীবন ও সুস্থ শরীর লাভ করিয়া এই অধঃপতিত বঙ্গের জাতীয় সাহিত্য সিংহাসন চিরদিন সুশোভিত করুন, পরম কারুণিক পরমেশ্বরের নিকট ইহা একান্ত প্রার্থনীয়।

বিদ্যমান কাল, কবিকেশরী রবীন্দ্রনাথের জীবনবৃত্তান্ত লিখিবার উপযোগী নয়। সুতরাং তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা, সর্ব্বব্যাপিনী বিদ্যা, বীণা-বিনিন্দীত সুমধুর কণ্ঠস্বর—অথবা তাঁহার স্বভাবতঃ সরল হৃদয়, উদার চরিত্র, উন্নত চিত্ত, অকৃত্রিম স্বদেশানুরাগ, পরদুঃখ-কাতরতা, পরার্থপরতা প্রভৃতি নানাগুণের কথা—তাঁহার কমনীয় কান্ত রূপ, অনবদ্য স্বাস্থ্য, মহত্ত্ব-

ব্যঞ্জক প্রিয়দর্শন সৌম্যমূর্ত্তির কথা আমাদের ন্যায় হীন জনের ক্ষীণা-লেখনী দ্বারা ব্যাখ্যাত হওয়া অসম্ভব। কাজে কাজে সে সকল বিষয়, কিছুই বলা হইল না। তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের কোলে লালিত হইয়া—ভোগ বিলাস বাসনা ত্যাগ করিয়া—স্বদেশের জন্য—স্বদেশ-ভাষার উন্নতি-কল্পে আজন্ম পরিশ্রম করিয়া আসিতেছেন। তিনি বঙ্গভাষার এক অভিনব পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছেন! তাঁহার লিখিত বঙ্গভাষাই যে, কালে বঙ্গ সাহিত্যের অনেকের আদর্শ হইবে, ইহারই মধ্যে তাঁহার প্রবর্ত্তিত ভাষা এমনই অজ্ঞাত-সারে বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে; আজকাল বিস্তর ভাল ভাল বাঙ্গালা প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের ভাষার ছায়া দেখিতে পাই। শোভাবাজারের রাজবাটীতে সাহিত্য পরিষদের এক অধিবেশনে কবি-কেশরী রবীন্দ্রনাথের একটি বাঙ্গালা প্রবন্ধ শ্রবণ করিয়া সাহিত্য-পরিষদ সভার তাৎকালিক সভাপতি ক্ষণজন্মা স্বনামধন্য ভারতের মুখৌজ্জ্বল্য-কারী সাহিত্য রথী শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তজ মহাশয়, মুক্তকণ্ঠে বলিয়া-ছিলেন—রবীন্দ্রনাথ বাবুর প্রবন্ধের ভাষার মত এমন শ্রুতিমধুর বাঙ্গালা আর কখন শুনি নাই। আমি অনেক বাঙ্গালা পুস্তক লিখিয়াছি বটে, কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় এমন করিয়া মনের ভাব প্রকাশ করা যায়, রবীন্দ্র বাবুর বাঙ্গালা প্রবন্ধ শ্রবণ করিবার পূর্ব্বে তাহা জানিতাম না। বাস্ত-বিকই, রবীন্দ্রনাথের বাঙ্গালা, সতেজ অথচ সরল—অতরল সরবতের মত মুখপ্রিয় ও উপকারক, সুস্বাদু ও সুপেয়। পড়িতে পড়িতে আশ মেটে না। কিন্তু সে সব কথা যাক্। তাঁহার কলা-জ্ঞানের অনুশীলন, বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্যের অন্তর্গত অথবা অনুকূল নহে। অপ্রাসঙ্গিক বোধে তৎসমস্ত পরিত্যক্ত হইল।

স্বদেশের হিতের জন্য, স্বদেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি-কল্পে কবি-কেশরী রবীন্দ্রনাথ, স্বয়ং লোক শিক্ষক-রূপে সংসার ক্ষেত্রে কেমন করিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছেন, কৃষিকর্ম্মে তিনি নিজ জীবনের বর্ত্তমান কাল কিরূপে নিয়োজন করিয়াছেন, বক্ষ্যমাণ সংক্ষিপ্ত সন্দর্ভে তাহারই কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব। সহৃদয় জমিদারবর্গের ও জনসাধারণের ইহাতে মনুষ্যচক্ষুঃ, কথঞ্চিৎ আকৃষ্ট হইলে, রাজাদের ও জমিদারগণের সমবেত চেষ্টার ফলে আমাদের দেশের (ভারতের) ভবিষ্যতে অনেক মঙ্গলই সাধিত হইবে।

কবিকেশরী রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-ভক্তি, ফল্গু নদীর ন্যায়, অন্তঃ-

সলিলা। তিনি স্বদেশের হিতসাধন-সংকল্পে গলাবাজী করিয়া বক্তৃতা করিয়া বেড়ান নাই; অথবা গুছাইয়া গুছাইয়া শব্দ বিন্যাস করিয়া হৃদয়গ্রাহী কোন প্রবন্ধের রচনা নাই বটে, কিন্তু এমন দিন নাই, যে দিন তিনি স্বদেশের জন্য একবিন্দুও অশ্রুপাত করিয়া পৃথিবী সিক্ত না করেন। তাঁহার হৃদয়, স্বদেশ প্রেমময়। তাঁহার রচিত কয়েকটী ভারত-সংগীত শ্রবণ করিলে, প্রকৃত ভাবুকের প্রতি ধমনীতে এক মহাশক্তি সঞ্চারিত হয়। কবিকেশরী রবীন্দ্রনাথকে ভাবে বিমুগ্ধ হইয়া কেবল কবিতা লিখিয়াই নিশ্চিন্ত হইতে, শোনা বা দেখা যায় না। যাহাতে স্বদেশের আত্মীয় বা অনাত্মীয় দশের উপকার সাধিত হয়, যাহাতে স্বদেশের শিল্প-বাণিজ্যাদি কার্য্যের শ্রীবৃদ্ধি সংসাধিত ও বিশেষ উন্নতি হয়, যাহাতে এদেশে বাণিজ্য-ব্যবসায়-শিক্ষার পথ প্রশস্ত হয়, যাহাতে আমাদের দেশের বিজ্ঞানানুশীলন, সমধিক শ্রীবৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য রবীন্দ্রনাথ, প্রাণপণে যত্ন ও চেষ্টা করিতেছেন। শিল্প ও বাণিজ্য-শিক্ষার্থীদিগকে অর্থ-সাহায্য করি-তেছেন। বিজ্ঞানাগারের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন, এবং কৃষিকার্য্য ও বাণিজ্য বিস্তারের জন্য নিজেই, সমাজ-শিক্ষকরূপে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন! প্রতীচ্য শিক্ষায় অহঙ্কৃত ও বিদ্যাভিমান-দৃপ্ত উদ্ধত ও মদ-গর্ব্বিত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের চিহ্নিত যুবকগণকে অথবা ধনীর সন্তানদিগকে কৃষি-কার্য্য অথবা ব্যবসায়-বাণিজ্যে কর-ক্ষেপ করিতে বলা দূরে থাকুক, মুখের কথাতে উৎসাহ দিতে বলিব না। তাঁহারা, হয়তো অপমান বোধে অগ্নি শর্ম্মা হইয়া উঠিবেন—কত অকথ্য কথাই ব্যবহার করিবেন। এফ-এ এবং বি-এ, পাশ করিয়াও সামান্য অর্থের জন্য লোকের বাটীতেই শিক্ষকতা করিবেন। চাকরী যোটান তো দূরের কথা। ঘরের খাইয়া অপরের নিকট উমেদারী করিবেন, তাহাও তাঁহাদের স্বীকার! তথাপি আপন জন্মভূমিতে চাষ বাস করিয়া সুখে থাকিতে, তাঁহাদের মস্তকে অপমানের বোঝা যেন মাথায় আসিয়া চাপিয়া বসে। ধনীর পুত্রগণ, আলস্য-সলিলে ডুবিয়া ভোগবিলাসে পৈতৃক সম্পত্তি ক্ষয় করিতে তাঁহারা প্রস্তুত আছেন। তথাপি লাভকর ব্যাপারে মনঃসংযম করিয়া, ধনাগমের পথ পরিষ্কৃত করিতে কিছুতেই তাঁহারা সম্মত হইবেন না। বঙ্গদেশে দরিদ্রতা বৃদ্ধির ইহা এক প্রধান কারণ। এই সকল কুসংস্কার বা বৃথা আত্মাভিমান, বঙ্গদেশের দুঃখ দূর করিবার অন্যতম অন্তরায়। স্বীয়দেশের এই সকল দুরবস্থা সন্দর্শন ও

চিন্তা করিয়া কবিকেশরী রবীন্দ্রনাথ, কৃষিকার্য্য ও শিল্প-বাণিজ্যে অগ্রসর হইয়াছেন। গত ১৩০৫ সালের কার্য্য-বিবরণী হইতে পাঠকদিগকে তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস, আপাততঃ দিতে হইতেছে।

বৎসরের প্রথম দিবস অর্থাৎ ১লা বৈশাখে আদি ব্রাহ্মসমাজের একটী সাম্বৎসরিক উৎসব হয়। কবিকেশরী রবীন্দ্রনাথের যোড়াসাঁকোর বাটীতে এই উৎসব সমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে। উক্ত বর্ষের ১ম দিবসেই এই উৎসব সমাহিত হয়। কবিকেশরী রবীন্দ্রনাথের জনক পরম পূজনীয় শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ই, ইহার অনুষ্ঠাতা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বহির্বাটীর প্রাঙ্গণে উৎসবস্থল নির্দ্দিষ্ট ও সজ্জিত হয়। সে দিন কদলীবৃক্ষ বেষ্টিত, নানা জাতীয় লতা-পত্র মণ্ডিত, বেল, যুঁই, মল্লিকা, মালতী প্রভৃতি নানা সুসৌরভসম্পন্ন পুষ্পরাজি বিরাজিত মহর্ষি দেবের বসতি, যেমন সিদ্ধার্থের তপোবনোপম হইয়া উঠিল! নানা ফল ফুলে শোভিত ধূপ-ধূনা-চন্দন, দীপ, কুঙ্কুম-কস্তুরী প্রভৃতি সদ্‌গন্ধদ্রব্য দ্বারা সুবাসিত শঙ্খঘণ্টা নিনাদিত সেই তপোবননিভ নিবসতি-স্থলে সেই ভূত-ভবিষ্য বর্ষের সন্ধিস্থলে সেই অতীত মহাপুরুষদিগের কথিত ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে সেই আলোক-অন্ধকারের মধ্যে দেবাদিদেব মহাদেবের অর্চ্চনা হয়। যথার্থই সেই সময়ে হৃদয়ের মধ্যে ভক্তি-প্রেমের শত-উৎস উৎসারিত হয়। ক্ষণকালের জন্য—সমাগত উপাসনানিরত ব্যক্তি সমস্ত, স্ব স্ব অস্তিত্ববিস্মৃতি বারিধিতে নিমজ্জিত করিয়া দিয়া জগন্মাতায় আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক ভূমানন্দ লাভ করিয়া জীবন পবিত্র করেন। কবিকেশরী রবীন্দ্রনাথ, এই উৎসব উপাসনান্তে একটী ভাগবত-সংগীত গান করিয়া সমুপস্থিত সভাস্থ সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে যেন মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। সেই সুমধুর কালের মধুর কণ্ঠনিঃসৃত সুমধুর সংগীত, অদ্যাপি আমাদের কর্ণপ্রান্তে বার বার প্রতিধ্বনিত হইতেছে, রবীন্দ্রনাথের এই বৎসরের কার্য্য-বিবরণ ধারাবাহিক-রূপে সমালোচন করিলে বোধ হয়, যেন তিনি এই পবিত্র স্থানে বসিয়া বৎসরের প্রথম দিনে পবিত্র হৃদয়ে প্রশান্তমনে ১৩০৫ সালের কর্ত্তব্যকর্ম্ম স্থির করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার সংকল্পিত কর্ম্ম সকল কেমন করিয়া সম্পূর্ণ হইল, কিরূপে তাহা সকলের গ্রহণীয় হইল, যথাযথভাবে তাহা ব্যক্ত করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। [ক্রমশঃ]

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু।

অনুপমা।

—০:*:০—

রূপ-কথা।

(১)

"শ্রীচরণেষু—

"আমাদের বিবাহ হইবার পরে, আমি আপনাকে এই প্রথম পত্র লিখিতেছি। আপনি আমাকে দুই তিনখানি পত্র লিখিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সে সকল পত্রের উত্তরে এতদিন আমি কিছুই লিখি নাই। কেন লিখি নাই, আজ তাহাই স্পষ্ট করিয়া বলিব।

"আমরা উভয়ে শুভ পরিণয়বন্ধনে বদ্ধ হইয়াছি বটে, কিন্তু আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা, রুচি-প্রবৃত্তির কথা, আমরা পূর্ব্বে কেহ কাহাকেও বলি নাই। আমাদের দেশের হিন্দু-সমাজের সে রীতি নহে, আমাদের উভয়ের অভিভাবকগণ একটা কিছু ঠাওরাইয়া আমাদিগের বিবাহ-কার্য্য সম্পূর্ণ করিয়াছেন। বর-কন্যায় শুভদৃষ্টিও বিবাহের পূর্ব্বে হয় না; কিন্তু আপনি একবার বন্ধুগণের সহিত লুকাইয়া আমাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। আমি যে রূপসী, সে কথা সে সময়ে পাকে-প্রকারে বন্ধুগণকে বলিয়াছিলেন। কিন্তু আমার পক্ষের কথা তখন বলা হয় নাই।

"আমার যখন বিবাহ হয়, আমার বয়স তখন ১৬ বৎসর হইয়াছিল। কিন্তু আপনাদিগকে মিথ্যা করিয়া বলা হয়, আমার তখন মোট ১৩ বৎসর বয়স। এ মিথ্যার জন্য আমি দায়ী নহি। আপনি জানেন যে, আমাকে একটি মেম লেখাপড়া শিখাইয়াছেন, তিনি ইংরাজ রমণী হইলেও,—খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বিনী হইলেও, তিনি আমার শিক্ষয়িত্রী, ইষ্টদেবী স্বরূপিণী। তাঁহারই আদেশক্রমে আমি আপনাকে এই পত্র লিখিতেছি। আমার প্রগল্‌ভতা আপনি ক্ষমা করিবেন। আপনি উচ্চ শিক্ষায় বিমণ্ডিত, উদার প্রকৃতিক সাধুপুরুষ। আপনার কাছে মনের কথা সরলভাবে বলিলে, অবশ্যই আপনি মন্দ ভাবিবেন না; আমার দুরবস্থার বিষয় বিবেচনা করিয়া আমাকে ক্ষমা করিবেন।

"আমাদের বিবাহের বহু পূর্ব্বেই আমি শ্রীযুক্ত সিতেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে মনে মনে বরমাল্য প্রদান করিয়াছিলাম। এ কার্য্যে আমার

সহায় স্বয়ং ভগবান এবং আমার শিক্ষয়িত্রী। সিতেশ বাবু যে আমার মনোবাঞ্ছার কথা জানেন না, তাহাও নহে; তিনি আমার নির্ব্বাচনে সুখী হইয়াছিলেন এবং আমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবার জন্য শুভ অবসরের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু তিনি কৌলিন্যমর্য্যাদা-শূন্য এবং দরিদ্রের সন্তান, আমার পিতা তাই আমাকে তাঁহার করে সম্প্রদান করিতে পারেন নাই। আপনি কুলীন, ধনীর পুত্র এবং স্বয়ং শিক্ষিত; তাই আমার পিতা দশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া, অনেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করিয়া আপনাকে জামাতার পদে বরণ করিয়াছেন। আপনাদের হিন্দুসমাজের দৃষ্টিতে আমি আপনার পত্নী, আপনি আমার স্বামী; কিন্তু যিনি সকল সমাজের সারভূত—সকল জাতির ইষ্ট দেবতা—সেই দয়াময় পরমেশ্বরের সিংহাসনের সম্মুখে আমি সিতেশ বাবুর স্ত্রী। আপনার প্রণয়-লিপির উত্তর দিতে হইলে, আপনার প্রণয়-আলিঙ্গনের প্রতি-আলিঙ্গন দিতে হইলে আমাকে দ্বিচারিণী সাজিতে হয়,—আমাকে সয়তানের সহায়ী সাজিতে হয়। রাজার আইন—সমাজের শাসন, সবই আপনার অনুকূল; আপনি আমার দেহ লইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। কিন্তু আমি ত ভিতরের সকল কথা আপনাকে বলিলাম; যে দয়াময় আপনার আত্মায় অবস্থিতি করিতেছেন, তিনিই আপনাকে সুবুদ্ধি দিবেন, তিনিই আপনাকে সৎপথ নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন, ইহাই আমার ভরসা ইতি।"

"ক্ষমার্হা অনুপমা।" ৩

(২)

ভাই পাঠক! হাসিও না; কিন্তু ইহাই আমার প্রথম প্রণয়-লিপি। বড় সাধ করিয়া অনুপমাকে বিবাহ করিয়াছিলাম, তাহার অনুপম রূপ-মাধুরী দেখিয়া, তাহার হাতে পিয়ান বাজান শুনিয়া, তাহার কণ্ঠে অপূর্ব্ব সঙ্গীত শুনিয়া, তাহার মুখে সেলি বায়রণ—বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতির কবিতা পাঠ শুনিয়া, আমি দিশাহারা—জ্ঞানহারা হইয়া, বড় সোহাগে অনুপমাকে বিবাহ করিয়াছিলাম। আমার হৃদয়-স্বর্গের নন্দন-বনের বন-দেবী করিবার জন্য আমার নিষ্কলঙ্ক প্রীতি-পর্য্যঙ্কে অনুপমাকে বসাইয়াছিলাম। কেমন করিয়া বলিব, অনুপমার কত রূপ; সেই ভাসা ভাসা বড় বড় চোখ দুইটি—সেই চাঁদ নিঙ্ড়ান চাঁদমাখান স্বচ্ছ কপোলযুগল, সেই অমিয়মাখা কচি কচি ঠোঁট দুইটি, আর সেই গ্রীবা।—আ মরি!

মরি! কুঞ্চিত চুলগুলি গ্রীবার উপর পড়িয়া, খোপাটি গ্রীবার উপর হেলিয়া থাকিয়া, রাহু-কবলিত অর্দ্ধ-চন্দ্রের ন্যায় অপরূপ শোভা বিস্তার করিতেছিল। আর সেই দেহ-লতিকা!—সত্য সত্যই যেন স্বর্ণলতিকা। শাল-কাণ্ড বিলম্বিতা পুষ্পাভরণ-ভূষিতা বল্লরী যেমন ধীরপবনে ধীরে ধীরে কাঁপিতে থাকে, তেমনি অনুপমার দেহলতা লাবণ্য-কুসুমাভরণা হইয়া সোহাগভরে ধীরে ধীরে যেন সদাই কাঁপিতেছে।

আমি কি পাগল হইব, আমার অনুপমা আমাকে কেন এমন পত্র লিখিল? আমি কি করি!—আমি যে সে রূপের লোভ ছাড়িতে পারি না, আমি যে সে রূপের মোহ এড়াইতে পারি না, আমি যে সে রূপের জন্য সর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দিয়াছি! আমার ওকালতী গিয়াছে, উপার্জ্জন বন্ধ হইয়াছে, লোক-লৌকিকতা উঠিয়াছে, পিতৃমাতৃ-সেবা ঘুচিয়াছে,—আমার ইহকালও নাই, পরকালও নাই। আমার রূপের কনক-কটরায় কে এমন হলাহল ঢালিল রে? আমার সুখের কামিনীকুঞ্জে কে এমন করাল ব্যাল ঝাড়িয়া দিল রে? আমার বিলাসের চন্দ্রমাক্রোড়ে কে এমন কলঙ্কের শশক বসাইয়া দিল রে?

আমি কি পাগল হইব! পাগল হইবার বাকিই বা কি? পত্রপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত আমার আহার-নিদ্রা নাই, সাজ-সজ্জা নাই, রহস্যালাপ নাই, কর্ত্তব্যজ্ঞানও নাই। ওহো! এ কি রূপের জ্বালা! এ কেমন প্রদাহ! বজ্র সূচিবেধের ন্যায় এ জ্বালা আমার ভিতর পুড়াইয়া খাক করিয়া দিতেছে, আমার সরস হৃদয়কে শুকাইয়া বালুকাপূর্ণ ভীষণ মরুতে পরিণত করিতেছে। সত্য সত্যই আমি পাগল হইলাম, সেই শিক্ষয়িত্রী ইংরাজ রমণী—সে কি রাক্ষসী, সে কি পিসাচী? কেন সে আমার সুখের পথে শশ্মানের অতি উষ্ণ চিতাভস্ম ঢালিয়া দিল? আমি মরিলেই যে বাঁচিতাম।

(৩)

পাগলের ন্যায় দিক্-বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া, আমার শৈশব-সুহৃদ্ প্রিয়বাবুর নিকট ছুটিয়া যাইলাম; তাঁহাকে পত্রখানি পড়িয়া শুনাইলাম, তিনি একটু মুচকি হাসিলেন। আমার বড় রাগ হইল। আমার মুখ দেখিয়া মনের ভাব বুঝিয়া, প্রিয়বাবু আর একটু হাসিয়া বলিলেন, "শরৎ! অমন জ্ঞানহারা হইও না, পত্রে এমন মারাত্মক কিছুই নাই। তুমি অনুপমাকে ত ত্যাগ করিতে পারিবে না। ত্যাগ করিবার কথা বলিলে তুমি

যে মরিয়া যাইবে! আর অনুপমাও ত্যাগের যোগ্যা নহেন, তিনি অতি রূপসী এবং সুশিক্ষিতা, তাঁহার পত্র শুনিয়া বুঝিলাম, তোমার ন্যায় তিনিও রূপমুগ্ধা এবং ভাববিহ্বলা। সিতেশবাবু সুপুরুষ, সিতেশ বাবুর চেহারায় এমন কিছু আছে, যাহা দেখিলে যুবতী কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হয়।"

আমি কাতরভাবে বলিলাম—"উপায় ?"

প্রিয়।—উপায় আছে বই কি! তোমার বাবাকে বলিয়া অনুপমাকে তোমাদের নিজের বাটীতে আনাও; নিজের কাছে রাখিও না, দমদমার বাগান-বাড়ীতে তাহাকে রাখিয়া দাও। তোমার বৃদ্ধা পিসিমাকে তাহার সঙ্গে থাকিতে বল, দাসদাসী থাকুক, দরবান বেহারা থাকুক। তিনমাস কাল সে বাগানে তোমার ছোট ভাই ভগিনীপতি প্রভৃতি কোন যুবকই যেন না যাইতে পারে। তুমি প্রত্যহ একবার করিয়া যাইবে; আর দেখিও, অনুপমা যেন সিতেশকে কোন পত্র লিখিতে না পারে; আর জনানা মিশনের সেই শিক্ষয়িত্রী ইংরাজ রমণী কিছুতেই যেন অনুপমার সাক্ষাৎ না পায়।

আমি।—ইহাতে কি হইবে, জবরদস্তিতে কি কাহাকেও ভালবাসান যায়! জোর করিলে অনুপমা একটা বিপদ ঘটাইতে পারে, আত্মহত্যা করিতে পারে।

প্রিয়।—তুমি পাগল হইয়াছ, তাই সকল কথা বুঝিতে পারিতেছ না। অনুপমা কেবল লেখা-পড়াই শিখিয়াছে, কেবল গান-বাজনা শিখিয়াছে, আর শিক্ষয়িত্রীর কাছে কেবল নাটক নভেল পড়িয়াছে; কাব্যগাথা পড়িয়া এবং বিলাতী ফ্রি লভের মর্ম্ম বুঝিয়াছে। অনুপমা ধর্ম্ম-কর্ম্ম শিখে নাই, সমাজ তত্ত্ব বুঝে নাই, কর্ত্তব্যাবধারণ করিতেও পারে নাই; কিন্তু অনুপমা হিন্দু গৃহস্থের কন্যা, হিন্দুসংসারে প্রতিপালিতা। অনুপমার প্রকৃতি হিন্দুউপাদানে গঠিত, অনুপমার প্রাণ হিন্দুয়ানীতে পূর্ণ। এই পত্রখানি নূতন যৌবনের প্রথম জোয়ারের-নূতন শিক্ষার প্রথম তাড়নায় রূপবিলাসের মোহে লিখিত। যদি তাহাকে কিছুদিনের জন্য স্বতন্ত্রভাবে রাখা যায়, যদি তাহার বিমূঢ় হিন্দু-প্রকৃতির উন্মেষের পক্ষে চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে সে আবার তোমারই হইবে। তোমার পিসিমা সে কালের পাকা গিন্নি, তিনি কাছে থাকিয়া তাহাকে সদুপদেশ দিবেন, আর তুমি মাঝে মাঝে এক একবার দেখা দিয়া আসিও। অনুপমার নূতন যৌবনের প্রখর স্রোতের সরল পথে বিকৃত

ভাবের বালির বাঁধ পড়িয়াছে, তোমাকে মধ্যে মধ্যে দেখিতে দেখিতে যুবতীর স্পৃহার প্রবাহ তোমার দিকেই ছুটিয়া আসিবে; তোমার অনুপমা তোমারই হইবে।

আমি।—এই উপায়ে কি ভালবাসা ফুটিতে পারে? আমি কেবল অনুপমাকেই চাই না, তাহার ভালবাসাকেও চাই।

প্রিয়।—ইংরাজী পড়িয়া তোমারও মাথা বিগড়াইয়াছে। ইংরাজী নাটক নভেলে যে প্রকার অনুরাগের কথা আছে, সে প্রকারের তীব্র অনুরাগ আমাদের ভাতখেকো বাঙ্গালীসমাজে সম্ভবে না। বিশেষ, সিতেশের প্রতি অনুপমার যে অনুরাগ, তাহা অনুরাগই নহে। সামান্য একটা খেয়ালমাত্র; অহঃরহ নাটক নভেল পড়িয়া যুবতীর মনের একটা বিকার মাত্র। বিকারের ঔষধ আছে, কিন্তু প্রকৃতির বিকৃতির ঔষধ নাই। অনুপমার এই বিকারের যে চিকিৎসা কর্ত্তব্য, তাহা আমি করিলাম। তুমি তিন মাসকাল ধৈর্য্য ধরিয়া থাকো। আমি দুরাশার দুষ্টশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বাড়ী আসিলাম, এবং প্রিয়নাথের উপদেশ মত সকল ব্যবস্থাই করিলাম।

(৪)

দুই মাস কাটিয়া গিয়াছে, আজ আমার সুপ্রভাত, অনুপমা আজ এক-খানি পত্র লিখিয়াছে। পত্রখানি এই,—

"প্রিয়তম!

"ইহজীবনে আমার প্রায়শ্চিত্ত কি শেষ হইবে না। আমি বুঝিয়াছি, আমার প্রায়শ্চিত্ত তুষানল, সে তুষানলজ্বালা আমি ভোগ করিতেছি। জানিনা, কি কুক্ষণে পিতা আমাকে লেখাপড়া শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়া-ছিলেন,—কি কুক্ষণেই আমি মিস ফক্সের ন্যায় শিক্ষয়িত্রীর হাতে পড়িয়া-ছিলাম! আমার সোনার সংসার—সুখের ঘর বাড়ী—রাজা শ্বশুর, অন্নপূর্ণা তুল্যা শাশুড়ী, ইন্দ্রতুল্য স্বামী, আমি পাইয়া হারাইলাম।

"আমার কি অপরাধ! আমায় যেমন শিখাইয়াছিল, তেমনি শিখিয়া-ছিলাম, যেমন বুঝাইয়াছিল, তেমনি বুঝিয়াছিলাম, আর যাহাকে সামনে পাইয়াছিলাম, তাহাকে আপন বলিয়াই আদর করিয়াছিলাম। আমি নারী মাত্র,—অবলা চিরবিহ্বলা, আমার অপরাধের এমন বিষম প্রায়শ্চিত্ত কেন নাথ! আমি ত যুবতীসুলভ কপট ব্যবহার করি নাই! পোড়া বুদ্ধিতে তখন যাহাল ভাবুঝিয়াছিলাম, তোমাকে তাহাই লিখিয়া জানাইয়াছিলাম।

"তুমি স্বামী, আমার দেবতার দেবতা, আমার ইহকাল ও পরকালের সর্ব্বস্ব। তুমি দয়া করিয়া তখন আমাকে ত্যাগ করো নাই, তাই আমি এখনও কুলাঙ্গনার পবিত্র আসনের অধিকারিণী হইয়া আছি। যে দয়া প্রভাবে সে দুঃসময়ে তুমি আমায় রক্ষা করিয়াছিলে, সেই করুণা-গুণে তোমার পদপ্রান্তে একটু স্থান কি দিবে না? আমি কাঙ্গালিনী বনবাসিনী; সন্ধ্যার পূর্ব্বে যখন আমি আমার বনবাটীকার বাতায়নপথে বসিয়া থাকি, তখন দেখিতে পাই, তুমি বাগানে পদচারণা করিতেছ, প্রাণে বড় সাধ হয়, একবার ছুটিয়া গিয়া তোমার পদপ্রান্তে পড়ি, আর ঐ চারুচরণ যুগল হৃদয় ধরিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া মনের সকল ব্যথার কথা তোমাকে বলি; কিন্তু আমি যে রমণী, আমার রমণীসুলভ লজ্জা আসিয়া আমার ইচ্ছাপথে বাধা দেয়। আমার হৃদয়ের বাসনা হৃদয়ে উন্মীলিত হইয়া হৃদয়েই বিলীন হয়।

"ছাই লেখা পড়া! আমি যদি লেখা পড়া না শিখিতাম; আমি যদি নাটক নভেল না পড়িতাম, তাহা হইলে সেই ফুলশয্যার রাত্রি হইতেই আমি তোমার সকল সোহাগের অধিকারিণী হইতে পারিতাম।

"রক্ষা কর প্রভু! আমায় রক্ষা কর; তুমি না রাখিলে আমায় কে রাখিবে? তুমি আমার লজ্জা-নিবারণ, বিপদভঞ্জন; তুমি আমার এই তুচ্ছ নারীজীবনের ত্রাণকর্ত্তা; আমি তোমার দাসীর দাসী হইবার যোগ্যা নহি, আমি তোমার সেবিকা হইবার উচ্চ-আশা রাখি না; কিন্তু তুমি দয়া করিলে আমার ইহকাল ও পরকাল দুই বজায় থাকিবে। ইতি—"

"তোমার দাসী
অনুপমা।"

পত্রখানি পাঠ করিলাম, পাঠ করিবার কালে চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না, বুদ্ধিকে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না, হৃদয়কেও বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। ভাবিলাম একি! আমি কি সত্য সত্যই জীবিত? ইহা কি প্রেতপুরির এক অলৌকিক কাণ্ড? আর প্রিয়নাথ! সে কি দেবতা না ভবিষ্যৎদর্শি ঋষি! ছুটিয়া গিয়া প্রিয়নাথের পদপ্রান্তে পত্রখানি ফেলিয়া দিলাম, সে কুড়াইয়া লইয়া পড়িল। আবার সেই হাসি,—নির্ব্বিকার প্রশান্ত মুখে আবার সেই মুচ্‌কি হাসি! হাসি দেখিয়া আমি ত আর নাই। দুই মাস পূর্ব্বে সেই ভীষণ পত্রখানি পড়িয়া প্রিয়নাথ হাসিয়াছিল, আজ এই প্রাণ-মন

পাগল-করা পত্রখানি পড়িয়া প্রিয়নাথ আবার হাসিল। উদ্‌ভ্রান্ত উন্মত্ত হইয়া আমি বলিলাম, "এমন করিয়া হাস কেন ভাই! বারে বারে এমন করিয়া আমায় দেখিয়া এবং আমার পত্নীর পত্র পাঠ করিয়া হাস কেন ভাই? তোমার হাসি দেখিলে যে আমি আত্মহারা হই।"

প্রিয়।—অত চঞ্চল হইও না, ঔষধ ধরিয়াছে দেখিয়া আমি হাসিয়াছি। রোগী কেবল অনুপমা নহে; তুমিও রোগী। অনুপমার চিকিৎসার সঙ্গে তোমারও চিকিৎসা হইতেছে; তোমার পক্ষে স্বতন্ত্র পথ্যের ব্যবস্থা করি নাই।

আমি।—কিছুই বুঝিলাম না। তোমাকেও বুঝিতে পারিলাম না, তোমার ভাষাও বুঝিতে পারিলাম না।

প্রিয়।—না বুঝিবারই কথা। যে দিন মা তোমাকে বরণ করিয়া তোমার বিবাহ-যাত্রায় তোমাকে পাঠাইতে ছিলেন, সেই সময় মা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, বাবা, তুমি কাকে আনিতে যাইতেছ? অবনতমস্তকে তুমি বলিয়াছিলে, মা, তোমার দাসী আনিতে যাইতেছি। বলিতে হয় বলিয়া, তুমি এমন কথা বলিয়াছিলে; নিজের মনের সহিত লুকাচুরী করিয়া মাতৃসন্নিধানে মিথ্যা কথা কহিয়াছিলে।

আমি।—কেন ভাই?

প্রিয়।—মায়ের দাসী আনিতে হইলে এত বিড়ম্বনা সহ্য করিতে হয় না। অনুপমার রূপমোহে মুগ্ধ হইয়া রূপপূজা করিবার জন্য ছুটিয়াছিলে, তাই তোমার এত বিড়ম্বনা। হিন্দুর সংসার—দেবতার সংসার; সাকার সজীব দেবদেবী পিতা ও মাতা এই সংসারে অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন। এমন সংসারে বিলাস এবং রূপের সেবা স্থান পায় না। তুমি অঘটন ঘটাইতে চাহিয়া ছিলে, তাই তোমায় নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল। আর দিন কয়েক যাউক, অনুপমা যখন শ্বশুর ও শ্বশ্রূর সেবার জন্য অস্থিরা হইবে, তখন তুমি তাহাকে পাইবে।

(৫)

আজ আমার সুপ্রভাত! এমন দিন বুঝি আমার ইহজীবনে আর হইবে না। মাতা ঠাকুরাণী দমদমার বাগান বাড়ীতে আসিয়াছেন। অনুপমা তাঁহার পদসেবা করিতেছে, মা আমায় ডাকিলেন, আমি তাঁহার প্রকোষ্ঠে যাইলাম, দেখি অনুপমা মায়ের এক জানুর উপর বসিয়া আছে, মা আমার হাত ধরিয়া দক্ষিণ জানুতে বসাইলেন, এবং দুইজনের চিবুকে দুই হাত

দিয়া বলিলেন, "তোদের ছেলে মানষী ঝগড়া রাখ্। আমার ঘরের লক্ষ্মী ঘরে নিয়ে যাই, আমার এ জীবনের সকল সাদ মিটুক।"

হাসিতে হাসিতে আমরা সে দিন সন্ধ্যাবেলা বাড়ী আসিলাম। ছয় মাস পরে আমার শয়নকক্ষ আবার অধিকার করিলাম। আহারান্তে পানের ডিবা হাতে করিয়া কক্ষে আসিলাম এবং পর্য্যঙ্কোপরি বসিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে অনুপমাও আসিল, আসিয়াই সে আমার পা দুখানি জড়াইয়া ধরিল; শ্রাবণের ধারার ন্যায় দুই নয়ন দিয়া অশ্রুধারা বহিতে লাগিল আর মাঝে মাঝে বাষ্পগদগদকণ্ঠে অধরযুগল ফুলাইয়া ফুলাইয়া, "আমার ক্ষমা কর" এই কথাটি বলিতে লাগিল, আমি আর থাকিতে পারিলাম না। আমার যৌবন-সুখের অধিষ্ঠাত্রী দেবী; আমার সোহাগ-স্বপ্নের হরিণী, এমন করিয়া আমার চরণতলে কেন পড়িয়া থাকিবে!

আমি দুই বাহু প্রসারিত করিয়া আমার কনক লতাকে উঠাইয়া লইলাম। আমার ইহকালের সুখ, আমার বাঙ্গালী জীবনের সংসার, আমার মনুষ্যত্ব, আমার পরকালের ভরসা,—সবই বজায় রহিল, এতদিন পরে আমরা দুই জনে হংসদম্পতির ন্যায় রূপসাগরে ভাসিয়া বেড়াইতেছি।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

গোকুলে-শ্রীকৃষ্ণ।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, গোপগৃহে অন্নগ্রহণের কথা। এখন হইতেছে গোপিনী বিহারের কথা। হেরম্ব-হিতবাদীর কলঙ্ক ঘোষক মকর্দ্দমার সময় এদেশের কতিপয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত আদালতে উপস্থিত হইয়া ঐ বিহার শব্দের যে প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া ছিলেন, সে প্রকার অদ্ভুত ব্যাখ্যা হইলে আমরা এখানে নিশ্চয়ই পরাস্ত হইব কিন্তু বনবিহার, গগনবিহার, পাদবিহার প্রভৃতি নির্দ্দোষ অর্থে বিচার করিলে কৃষ্ণচরিত্র কদাচ কলঙ্কিত বোধ হইবে না।

বোধ করুন, যমুনা কুলে কদম্বমূলে বসিয়া কৃষ্ণ বাঁশী বাজাইলেন, গৃহস্থ গোপিনীরা গৃহকার্য্য ফেলিয়া কৃষ্ণদর্শনপিপাসায় অতি দ্রুত যমুনা

কুলে সমবেত হইল; ইহাতে কি কৃষ্ণের অথবা গোপিনীগণের বিষয় বাসনার কোনপ্রকার আভাষ পাওয়া যায়? গোপিনীরা কৃষ্ণপ্রেমে বিমুগ্ধ হইয়াছিল, একথা সত্য, কিন্তু সে প্রেম অন্য প্রকার। সে প্রেম হৃদয়ের;—বাহ্য বিহারের জন্য ইন্দ্রিয় বিকারের বাহ্য প্রেম নহে।

নহে কেন, তাহাও আমরা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। ষোলশত গোপিনী না হউক, অন্ততঃ বিংশতি গোপিনীও বংশীর স্বরে আকৃষ্ট হইয়া এক সঙ্গে কৃষ্ণ দর্শনে বনমধ্যে যাইত; কেহ কেহ যমুনা হইতে জল আনিবার ছল করিয়া কৃষ্ণ দর্শনার্থ কদম্বতলে প্রধাবিত হইত; মধুর অধরে মধুর মুরলী ধারণ করিয়া মনোহর ভূভঙ্গিম ঠামে বনবিহারী বনমালী মুরলীমোহন শ্রীকৃষ্ণ সেই সমবেত কামিনী-কুলের মধ্যস্থলে সহাস্য বদনে শোভা পাইতেন; তাহাতে কি বাহ্য প্রেমের কোন প্রকার লক্ষণ প্রকাশ পাইত? ততগুলি সুন্দরী যুবতী কামিনী একত্র, কৃষ্ণ যদি,—একাদশ বর্ষিয় বালক কৃষ্ণ যদি ইন্দ্রিয় বশে তাহাদের মধ্যে কাহার প্রতি অধিক অনুরাগ দেখাইতেন, তাহা হইলে তত বিলাসিনীর মধ্যে কাহারও মনে কি কিঞ্চিৎ মাত্রও ঈর্ষার উদয় হইত না? বহু রমণী সাক্ষী রাখিয়া কেহ কি কখন কোন রমণীর নির্জ্জন প্রেমালাপের অভিলাষ রাখে? কখনই না। কৃষ্ণ সর্ব্বদাই বহু গোপিনী একত্র পাইয়া সানন্দে কৌতুক লীলা প্রদর্শন করিতেন। কুঞ্জবনে রাধিকার সহিত মিলন হইত, সেখানেও সঙ্গে থাকিত অষ্ট সখী। ইহা যদি গোপিনী বিহার হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে বিহারকে নির্দ্দোষ বিহার বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। স্বীকার যাঁহারা করিবেন, তাঁহারা কদাচ বালক শ্রীকৃষ্ণকে মাখনচোরা লম্পট বালক নামে কলঙ্কিত করিতে চাহিবেন না, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

পরিতাপের বিষয়, বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ বৈষ্ণব সম্প্রদায় হইতেই কৃষ্ণ চরিত্রে কলঙ্কার্পিত হইতেছে। যাঁহারা আপনাদিগকে বিশুদ্ধ বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দেন, বৈষ্ণধর্ম্মানুসারে কার্য্য করেন, তাঁহারা অবশ্যই শ্রদ্ধার পাত্র;—তাঁহাদের মধ্যে যাহারা গোঁড়া, তাহারাই নানা অনর্থ সৃজন করিতেছে। জ্ঞানী লোকেরা বলেন, গোঁড়ারাই কৃষ্ণকে নষ্ট করিল। বিহার লীলা প্রসঙ্গে গোঁড়ারা বলে, সর্ব্ব রসের প্রধান রস আদি রস, সেই রসে গোপিনীরা কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছিল, সেই ভক্তিতেই অতি সহজে গোপিনীদের কৃষ্ণ প্রাপ্তি। গোঁড়াদের এই সিদ্ধান্তের প্রতি

কিছু মাত্র বিশ্বাস রাখিতে সাধুলোকের প্রবৃত্তি হয় না। কৃষ্ণের নামে কলঙ্ক দিয়া আপনারা অধর্ম্মে ডুবিয়া ইতরের নিকটে ধার্ম্মিক নামে যশস্বী হইবে, ইহাই গোঁড়াদের চেষ্টা। সে দুশ্চেষ্ট উত্তরকালে কিছুতেই ফলবতী হইবে না। কৃষ্ণের গোপান্ন ভক্ষণের প্রসঙ্গ তুলিয়া গোঁড়ারা দম্ভ করিয়া বলে, কৃষ্ণের আবার জাতি কি? নন্দদুলাল নন্দের গৃহে অন্নগ্রহণ করিয়া পালিত হইয়া ছিলেন, তাহাতে দুলালের দেবত্বই সপ্রমাণ হইতেছে।

অন্নগ্রহণ করিলেই দেবত্ব সপ্রমাণ হয়, নতুবা হয় না;—আদিরসে মিশ্রিত হইলেই কৃষ্ণপ্রেমে কামিনী-কুলের মুক্তিলাভ হয়, নতুবা হয় না;—গোঁড়াদের এই অদ্ভুত মীমাংসা তত্ত্বানভিজ্ঞ মূর্খ বৈষ্ণবদলের কতদূর অপকার করিতেছে, তাহা যাঁহারা চিন্তা করেন, ভারতের স্বেচ্ছাচার গোঁড়াকুল যত শীঘ্র সমূলে নির্ম্মূল হয়, তাহাই তাহারা মঙ্গল ভাবিয়া থাকেন। গোঁড়ারা বাস্তবিক কৃষ্ণকে চিনিতে পারে নাই;—যতদিন গোঁড়ামী থাকিবে, ততদিন পারিবেও না। কৃষ্ণ চরিতে তাহাদের কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই।

মানব সংসারে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা এবং কার্য্যকলাপ যত কিছু, তৎসমস্তই মহাভারতে বর্ণিত আছে। মহাভারতে অথচ কৃষ্ণের বাল্যলীলার কিছুমাত্র প্রসঙ্গ নাই। মহাভারতের অভিনয়-রঙ্গে কৃষ্ণের প্রথম প্রবেশ কখন, মহাভারত পাঠকেরা তাহা জানেন। পঞ্চালরাজ্যে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় লক্ষ রাজা যখন একত্র হন, সেই সময় কৃষ্ণ বলরাম সেই সভায় প্রথম দর্শন দিয়াছিলেন; তদবধি ভারতক্ষেত্রে তাহাদের প্রথম কার্য্যের আরম্ভ। পঞ্চপাণ্ডব সেই স্বয়ম্বর সভায় ছদ্মবেশে উপস্থিত ছিলেন, কৃষ্ণ তাহা জানিতেন;—পাণ্ডবের সহিত কৃষ্ণের কি সম্বন্ধ,তাহাও কৃষ্ণ জানিতেন, কিন্তু তৎপূর্ব্বে কৃষ্ণ একবারও পাণ্ডবগণের সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। লক্ষ্যভেদের পর দ্রৌপদীর বিবাহের সময় পাণ্ডবের সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রথম পরিচয়। তদবধি ভারত সংগ্রাম এবং যদুবংশ ধ্বংসকাল পর্য্যন্ত কৃষ্ণের বাল্যলীলা, নন্দালয়ে বাস, গোপান্ন ভোজন এবং গোপিনী বিহারাদির কোন প্রসঙ্গ মহাভারতে নাই। আছে কি?—রুক্মিণীর স্বয়ম্বর সভায় শিশুপাল যখন কৃষ্ণনিন্দা করেন, সেই সময়ে একবার শিশুপালের মুখে কৃষ্ণকে গোপান্নভোজি গোপনন্দন বলিয়া গালি দিবার উল্লেখ দেখিতে

পাওয়া যায়। শিশুপাল চিরদিন শ্রীকৃষ্ণের বিদ্বেষী ছিলেন, তাঁহার রচিত কুৎসার কথাকে কৃষ্ণের অভিজাত্যের সত্য প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। যাহারা নিন্দা করে, তাহারা সকল কথা সত্য বলে না, ইহা সকলেই জানে; অতএব নিন্দুকের বাক্য প্রমাণে কৃষ্ণ চরিত্রের বিচার করা কদাচ যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না।

অবতার বলিয়া স্বীকার করিলে কৃষ্ণ একটী আদর্শ অবতার, নমস্কার করিয়া অবশ্যই ইহা স্বীকার করিতে হইবে। মানব শিক্ষার অভিপ্রায়ে, দুষ্ট দমন, শিষ্ট পালনে ভূভার হরণ করণের অভিপ্রায়ে অবতারের উদ্ভব, পুরাণ শাস্ত্র প্রমাণে ইহাই প্রতিপন্ন হয়। যাহাতে মানব জাতির মঙ্গল হয়, মানব দেহ পরিগ্রহ করিয়া কৃষ্ণ সেই উদ্দেশ্যে মানব সংসারে ছোট বড় সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া ছিলেন; সংসারের সুখ নষ্ট করিবার চেষ্টা করেন নাই; অবোধ মানবের সম্মুখে কোনপ্রকার কুদৃষ্টান্ত রাখিয়া যান নাই! ব্রজের কৃষ্ণ, বৃন্দাবনের কৃষ্ণ, মথুরার কৃষ্ণ, দ্বারকার কৃষ্ণ, এবং কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ, সর্ব্বত্র মঙ্গল দৃষ্টান্তই রাখিয়া গিয়াছেন। এমন মহিমান্বিত কৃষ্ণ চরিতে যাঁহারা কলঙ্কারোপ করিতে সাহস করে, তাহারা মানব-সংসারের অভিসম্পাত স্বরূপ।

কৃষ্ণ চরিত্র সুনির্ম্মিল, সুপবিত্র, নিষ্কলঙ্ক। অজ্ঞানান্ধকারাবৃত গোঁড়া বৈষ্ণবেরা আপনাদের পায়ে আপনারা কুঠারাঘাত করিতেছে, বুঝিতে পারিতেছে না। কৃষ্ণ কিরূপ, গোঁড়ারা তাহা জানে না। হস্তির এক এক অঙ্গ স্পর্শ করিয়া সাতজন অন্ধ যে প্রকারে হস্তিবর্ণন করিয়াছিল, অজ্ঞানান্ধ গোঁড়ারাও সেই প্রকারে কৃষ্ণবর্ণন করিতেছে। হস্তি দর্শক অন্ধেরা কেহ বলিয়াছিল, হস্তি সর্পাকার, কেহ বলিয়াছিল, হস্তি সূর্পাকার; কেহ বলিয়াছিল, হস্তি স্তম্ভাকার;—কেহ বলিয়াছিল, হস্তি ঢক্কাকার; ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। অজ্ঞাননেত্রে গোঁড়ারাও কৃষ্ণকে সেইরূপ দেখিতেছে।

ন্যায়শাস্ত্রবিশারদ একজন পণ্ডিত একদা রহস্য করিয়া বলিয়াছিলেন, আমাদের দেশে কৃষ্ণ চারিপ্রকার হইয়াছেন। ভাগবতের কৃষ্ণ, মহাভারতের কৃষ্ণ, জয়দেবের কৃষ্ণ, এবং যাত্রার কৃষ্ণ। ভাগবতের কৃষ্ণ প্রেমের কৃষ্ণ; মহাভারতের কৃষ্ণ রাজধর্ম্মপরায়ণ রাজেন্দ্র কৃষ্ণ; জয়দেবের কৃষ্ণ রসিক কৃষ্ণ; যাত্রার কৃষ্ণটি অপকৃষ্ণ।

সত্যই তাহাই। গোঁড়ারা কোন্ ভাবে কোন্ কৃষ্ণকে লইয়া খেলা করিতেছে, তাহারা নিজেই তাহা বুঝিতে পারিতেছে না। গোকুলে শ্রীকৃষ্ণ নিষ্কলঙ্ক ছিলেন, পুনর্ব্বার আমরা সেই কথা বলিতেছি। মহা-ভারতের ভীষ্ম পর্ব্বে সর্ব্ব প্রথমে প্রতিযোগী কুরু-সৈন্য দর্শন করিয়া অর্জ্জুনের মনবিকার জন্মিয়াছিল, যোগ ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে প্রবোধ প্রদান করিয়া ছিলেন। যে মহাপুরুষের রসনা হইতে মহার্থ গীতা বাক্য উদ্গীরিত হইয়াছিল, সেই মহাপুরুষ গোকুলে শিশুকালে তস্কর ছিলেন, লম্পট ছিলেন, এ অপবাদ সহস্রবার অগ্রাহ্য!

শ্রীভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ছায়াসতী।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

বিদ্যালয়স্থ একটী কক্ষে সামান্য পালঙ্কে ইন্দ্রপ্রিয়া চিন্তাকুল অন্তরে শায়িত আছেন। রাত্র দ্বিপ্রহর অতীত, নিদ্রা নাই, একদিকে মাতৃস্নেহ লজ্জাভয়, অপরদিকে নবীন প্রণয়বাসনা। বৃদ্ধা পরিচারিকা যশোদা তাহার নিজের দৈনিক কর্ম্ম ও আহারাদি করিতে অধিক রাত্র হইত, এক্ষণে গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিল, ইন্দ্রপ্রিয়া জাগ্রত; সস্নেহে বলিল, "ইন্দু! কেন দিদি, এখনও জাগিয়া আছ যে?" ইন্দ্রপ্রিয়া কোন উত্তর দিলেন না। বৃদ্ধা ধীরে ধীরে ইন্দ্রপ্রিয়ার নিকটে উপবেশন পূর্ব্বক তাহার নবনীত-কোমল অঙ্গে হস্তমার্জ্জন করিতে করিতে বলিল, "ইন্দু! তোমায় একটী কথা বলির, রাগ করিবে না ত?" ইন্দ্রপ্রিয়া চিন্তাকুল অন্তরে ভ্রূ উত্তোলন পূর্ব্বক বলিলেন, "কি?" বৃদ্ধা নতমুখে অস্ফুটস্বরে রমণী মোহনের প্রার্থনা জানাইল, ইন্দ্রপ্রিয়া কম্পিত অন্তরে বলিলেন, "ঝি! মা তা হলে যে মুখ দেখবেন না, তাহার উপায় কি হবে?" বৃদ্ধা প্রবোধ দিয়া সান্ত্বনাবাক্যে বলিল, "কেন গো! অমন জামাই হবে, মা রাগ করবেন কেন? এখন বল, যাবে ত? তা হলে যাইতে বলি।" ইন্দ্রপ্রিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "না ঝি! আমার ভয় করে। মাসিমা যদি টের পান, আর আমি কেমন করে অপর লোকের সঙ্গে বাস করবো।" বৃদ্ধা সান্ত্বনাবাক্যে

বলিল, "ভয় কি, মাসিমা টের পাবে না, আর একলাই বা থাকবে কেন, আমি ত সঙ্গে যাব।" ইন্দ্রপ্রিয়া নীরবে রহিলেন। ঝি আবার বলিল, "তবে কবে যাবে?" ইন্দ্রপ্রিয়া অন্যমনস্কভাবে বলিলেন, "তোমার ইচ্ছা!" পরিচারিকা আনন্দিত অন্তরে চিন্তাকুলা বালিকার সুশ্রুষা করিতে লাগিল। ভাবনায় ক্লান্তা বালিকা নিদ্রাভিভূতা হইলে ঝি আপনিও শয়ন করিল।

আকাশ অন্ধকার করিয়া বারিবর্ষণ করিতেছে। ১১ই শ্রাবণ বিদ্যালয়ে মহাগোলযোগ উপস্থিত, সকলেরই মুখে ভীতিচিহ্ন। ইন্দ্রপ্রিয়া যশোদা দাসীর সহিত অদৃশ্য! কেহই কিছু অনুধাবন করিতে পারিতেছে না; বিদ্যা-লয়ের কর্ত্রী কোন্নগরে সংবাদ প্রেরণ করিলেন। কুসংবাদে তনয়াবৎসলা মাতা শোকে দুঃখে অভিভূতা হইলেন। উচ্চবংশে কালিমা পড়িল, এই চিন্তায় শোক ক্রমে ক্রোধে পরিণত হইয়া পুত্রকে বলিলেন, "পাপিষ্ঠার অনুসন্ধানে আবশ্যক নাই। যাহার দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমে এতদূর সাহস, অধিক বয়সে সে যে কত মন্দ হইবে, তাহা বলিতে পারি না, তাহার চিন্তায় আর আবশ্যক নাই, মনে করিব—তাহার মৃত্যু হইয়াছে। বিদ্যালয়ে সে প্রধানা হইয়াছিল, আশা করিয়াছিলাম,—কন্যা আমার রূপে গুণে সমতুল্য হইবে; কিন্তু আমার যেরূপ দূরদৃষ্ট, কার্য্যেও সেইরূপ হইল। যশোদা দাসীকে যে এত দয়া করিতাম, সে তাহার উত্তমরূপ প্রতিশোধ দিয়াছে; অতএব অনুসন্ধান করিয়া কলঙ্ককালিমা আর উজড়ান করিবার আবশ্যক নাই।" নীরেন্দ্র শেষে ধীরে ধীরে বলিলেন, "মা, ক্রোধের চেয়ে শত্রু নাই, রোষ পরবশ হইয়া কি নির্দ্দোষ বালিকাকে একেবারে বিসর্জ্জন দিব?" এই বলিতে বলিতে নীরেন্দ্রের কণ্ঠ হইতে আর কথা নির্গত হইল না। স্নেহময় ভ্রাতা নীরবে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। শোক-দলিতা মাতা পুত্রের ক্রন্দনে অধৈর্য্য হইয়া ভূমিতে লুঠাইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সে স্থানে আর একটী স্ত্রীলোক উপস্থিত ছিলেন, যাঁহার অন্তরে ইন্দ্রপ্রিয়ার পলায়নে কোনও ক্লেশ হয় নাই, বরং আনন্দ হইয়াছে। এই ঈর্ষান্বিতা অবলা নীরেন্দ্রের সহধর্ম্মিণী। ইন্দ্রপ্রিয়া সৌন্দর্য্যে ও সদ্‌গুণে মাতা ও ভ্রাতার অতি প্রিয় ছিলেন, এই কারণে কুটিলা ভ্রাতৃবধূর অত্যন্ত বিরাগভাজন ছিলেন। নীরেন্দ্রের স্ত্রী শত্রুকে উত্তোলন পূর্ব্বক সযত্নে মুখ মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, "মা, কেন আর প্রাচীন দেহে নিষ্ঠুর কার্য্যের জন্য যাতনা দিতেছ?"

নীরেন্দ্র মাতাকে বলিলেন, "মা, আমি প্রকাশ্যরূপে ইন্দ্রপ্রিয়ার সন্ধান লইব না। দুইজন গোয়েন্দা রাখিব, তাহারা গোপনে অনুসন্ধান করিবে; যশোদা দাসী ত লুকাইয়া থাকিবে না? সন্ধান পেলেই আমরা যাইব, এক্ষণে আমি কলিকাতায় চলিলাম, দুই চারিদিন বিলম্বে আসিব।" মাতা কোন উত্তর দিলেন না, নীরেন্দ্রের পত্নী কেবল বিরক্তভাবে স্বামীর দিকে চাহিয়া দেখিলেন, পুত্র প্রস্থান করিলে, ইন্দ্রপ্রিয়ার মাতা উঠিয়া যে কক্ষে কন্যা শয়ন করিত, সেই কক্ষের দ্বারে চাবিবন্ধ করিয়া বলিলেন, "এই দ্বারটির কিছুদিনের জন্য রুদ্ধ হইল।" ইন্দ্রপ্রিয়ার মাতা বা ভ্রাতা দুই বৎসর যাবৎ তাহার কোন সংবাদ পান নাই। তৃতীয় বৎসরের প্রারম্ভে এক-জন গোয়েন্দা আসিয়া বলিল, "যশোদা নূতন বাজারের নিকট চিৎপুর রোডে একখানি একতলা বাটীতে বাস করিতেছে।" [ক্রমশঃ]

শ্রীমনুজেন্দ্র দত্ত।

কাল ও আজ।

কাল সে এখানে ছিল, কাল ঘরে ছিল আলো,
দিয়ে গেছে—নিয়ে গেছে, সে আজ আঁধার কালো;
কাল তা'রে ব্যথা দিছি, জানিনাক কোন কাজে,
তা'র সে অশ্রুর স্মৃতি, আজ বড় প্রাণে বাজে!
কাল সে কাতর নেত্রে রুধেছিল মোর রোষ,
আজিকে পরাণ কাঁদে, এ ত নয় তা'র দোষ!
সুখের শয়নে কাল সে এনে দেছিল ঘুম,
আজ মনে পড়ে তা'র সেই শেষ—শেষ চুম।
কাল সে বলিয়া দেছে, "কেঁদ'না, আসিব ফের!"
আজ ভাবি, এই বুঝি শেষ দেখা জীবনের।
কাল সে ভরিয়েছিল হৃদয়ের অন্তঃপুর,
আজ সেই আশা-সাধ কে ভেঙে করেছে চুর?
ভাবিয়ে রেখেছি সুধু, আসিবে সে, হ'বে দেখা;—
হ'বে কি না হ'বে ফের, জানেন ভবেশ একা!

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী।

এ নহে সান্ত্বনা।

(১)

এ নহে সান্ত্বনা সখা শুধু অশ্রুজল!
ঝরিতেছে অবিরল,
যেই শোক অশ্রুজল,
তোমার নয়নে, তাতে মিশাতে কেবল
দুই ফোঁটা তপ্ত অশ্রু আমার সম্বল!
এ নহে সান্ত্বনামাখা শুধু অশ্রুজল!

(২)

এ নহে সান্ত্বনা শুধু হুতাশ নিশ্বাস!
আজি যে প্রলয় ঝড়ে,
ঘন আন্দোলন করে,
স্নেহ সুকোমল তব হৃদয় আকাশ;
কেবল তাহার বেগে,
উড়িতেছে থেকে থেকে,
হৃদয়ে ভীষণ ঝঞ্ঝা শোকের উচ্ছ্বাস!
এ নহে সান্ত্বনা শুধু হুতাশ নিশ্বাস!

(৩)

এ নহে সান্ত্বনা সখা শুধু হাহাকার!
আনন্দ আলয়ে তব,
সদা আনন্দের রব
উঠিত; এখন হায় কি দশা তাহার!
হারায়ে নয়নমণি,
পুত্রহারা বিষাদিনী,
হানে বুকে করাঘাত ক্ষণে শতবার;
ভুবন ভরিয়া উঠে তাঁর হাহাকার!
থাকি এ সুদূর স্থানে,
তবু ভুলি প্রতিক্ষণে,
মর্ম্মভেদী নিদারুণ বিলাপ তাঁহার!
তাই উঠে প্রাণ হ'তে,
হৃদয়ের প্রতিঘাতে,
সুগভীর শোকধ্বনি প্রতিধ্বনি তার!
এ নহে সান্ত্বনা সখা শুধু হাহাকার।

(৪)

এ নহে সান্ত্বনা শুধু হৃদয় অনল!
ক্ষণস্থায়ী যে চিতায়,
ভস্ম হইয়াছে হায়!
সে সুন্দর কমতনু কুসুম কোমল;
নিভিয়া গিয়াছে তাহা হয়েছে শীতল।
কিন্তু যেই শোকানলে,
তোমার হৃদয় জ্বলে,
দগ্ধ অনুক্ষণ জননীর বক্ষস্থল;]
সে অনল দুর্নিবার,
রাবণের চিতাকার,
প্রজ্জ্বলিত রবে সদা; শত গঙ্গাজল,
কিম্বা সপ্তার্ণব নীরে না হবে শীতল!
নদ নদী সুশীতল,
উল্লঙ্ঘিয়া সে অনল,
হৃদয়ে জ্বেলেছে শিখা ভীষণপ্রবল!
এ নহে সান্ত্বনা শুধু হৃদয় অনল!

(৫)

কি দিব সান্ত্বনা সখা কি আছে সম্বল?
বিদারিছে হাহাকার,
মুছাতে নয়নাসার,
নিভাইতে হৃদয়ের ভীষণ অনল,
না জানি প্রবোধ বাক্য হৃদয় বিফল!
এ নহে সান্ত্বনা সখা শুধু অশ্রুজল!

শ্রীবিহারীলাল রায়।

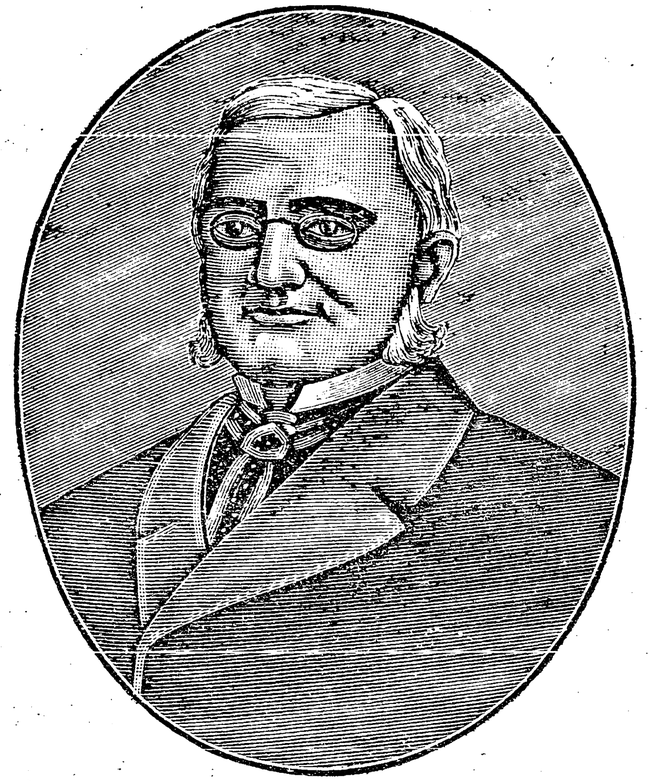

ভট্ট মোক্ষমূলর।

প্রাচ্যজ্ঞান পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে যে এক্ষণে যথেষ্ট আদৃত, তাহার অন্যতম কারণ হইতেছে, আমাদিগের প্রতি একান্ত অনুরক্ত মহাত্মা ম্যাক্সমূলার। স্বর্গীয় ম্যাক্সমূলারের ন্যায় প্রাচ্যসংস্কারে অভিজ্ঞ, বহুভাষাবিৎ বলিয়া বিশ্ব-ব্যাপী যশোলাভ করিতে আর কেহ পারিয়াছেন, এমন কথা স্মরণ হয় না। সংস্কৃত-সাহিত্যের আকর ভারতবর্ষের পক্ষে এই সংস্কৃতানুরাগী পাশ্চাত্য বন্ধুর বিয়োগ শোকোদ্দীপক নিশ্চিতই। শোকের সময় শুচ্য বন্ধুর স্মরণ হয়, তাঁহার কার্য্যাবলীর স্বতই দৃষ্টিপথে আবির্ভাব হইতে থাকে। এই জন্যই অদ্য অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের জন্মবিবরণ, কীর্ত্তিকলাপার্জ্জন ও দেহবিসর্জ্জন যথাক্রমে স্মৃতিপথে প্রতিভাত হইতেছে বলিয়া, এই স্থানে প্রকটিত হইল।

১৮২৩ খৃষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর তারিখে জর্ম্মণীর অন্তর্গত দেশগ্রামে সম্ভ্রান্ত মূলর বংশে ইনি জন্মগ্রহণ করেন; ইহাঁর মাতৃবংশ ও পিতৃবংশ—উভয়ই সারদার অনুগৃহীত;—পিতামহ মহাকবি গেটের জনৈকবিশিষ্ট বন্ধু—শিক্ষা-বিভাগের প্রধান সংস্কারক বলিয়া মান্য, পিতা উইলহেল্‌ম মূলর সুপ্রসিদ্ধ

জর্ম্মাণ কবি! আমাদিগের দেশে অনেকেই বিদিত আছে, সারদার সহিত কমলার চিরবিবাদ; কবি সারদার পূজায় রত থাকিয়া, কাব্যামৃতে বিভোর হইয়া বলিতে পারেন;—যাও লক্ষ্মী অমরায়, যাও লক্ষ্মী অলকায়, আসিও না কবিজন-তপোবন স্থলে! আর তাই যেন রুষ্টা হইয়া কমলা কবির গুণরাশি দারিদ্র্যদোষে আবৃত করিতে প্রয়াস পান। জর্ম্মাণকবি উইলহেল্‌ম মূলর মহোদয়ের ভাগ্যে লক্ষ্মী সরস্বতীর যুগপৎ প্রসাদলাভ ঘটিয়া উঠে নাই। লক্ষ্মীর বিরাগ জন্যই পিতার যথেষ্ট আনুকূল্য না পাইয়া, কবিপুত্র ম্যাক্সমূলরকে বাল্যকাল হইতে জীবিকার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় শিক্ষার জন্য সচেষ্ট হইতে হইয়াছিল—স্বনির্ভরেই শিক্ষাসোপানে অধিরোহণ করিতে হইয়াছিল। বাল্যজীবনের এই সকল সঙ্কটই হইতেছে, তাঁহার অধ্যবসায় দৃঢ় করিবার কারণ—অক্ষুণ্ণ উন্নতির মূল!

সংসারে দোষবর্জ্জিত গুণ নাই! যেমন প্রাণহর বিষও অবস্থাবিশেষে প্রযুক্ত হইল, প্রাণরক্ষা হয়, তেমনই গুণরাশিনাশী দারিদ্র্যও অনেক সময় গুণকর হইয়া থাকে। দরিদ্রপুত্র অধ্যবসায়ী বালক ম্যাক্সমূলরের পক্ষে দারিদ্র্য বিদ্যাসাধনের সহায় হইয়াছিল। বাল্যজীবনের পরিচয় পাইয়া কেহ বলিয়াছিলেন, আপনি কেমন করিয়া এরূপ উন্নতিসাধনে সমর্থ হইলেন? প্রত্যুত্তরে ম্যাক্সমূলর মহোদয় বলিয়াছিলেন,—"দারিদ্র্য ও কঠোর পরিশ্রম আমার এই উন্নতিবিধান করিয়াছে।" আমরা জানি, সংযমী ব্রহ্মচারী না হইলে, বিদ্যাসাধন হয় না; নিঃসঙ্গতা, বিলাসহীনতা, স্ত্রীসঙ্গ-বর্জ্জিতা বিদ্যাসাধনের প্রধান সহায়। কিন্তু কমলার কোমল ক্রোড়ে যাঁহাদিগের আশ্রয়, তাঁহাদিগের পক্ষে অনুচরসঙ্গ, বিলাস-সাধন, মিষ্টভোজন, স্ত্রী রাক্ষসী-গণের সহসংলাপন প্রায়ই অনায়াসলভ্য। সুতরাং ভোগভূমির অধিবাসীর পক্ষেও, দারিদ্র্য বিদ্যাসাধন সম্বন্ধে অমৃতপ্রসাবী হওয়াই সম্ভবপর।

বালক ম্যাক্সমূলর ১২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত স্থানীয় ড্যকল্প বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন; তথায় সঙ্গীত-বিদ্যায় পারিদর্শী হইয়া বেশ সুখ্যাতি লাভ করেন। কবিপুত্রের রসগ্রহণশক্তির উৎকর্ষ থাকায়, তাঁহার সঙ্গীতে অনেক মহাত্মারই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল; তাই তাঁহার সঙ্গীত বিদ্যায় অধিকার দৃঢ় ও প্রতিষ্ঠা দিগন্তকসারিণী হওয়ায়, কবি পিতা মহাত্মা মূলরের মনে যে অনিবার্য্য আমোদের উৎস ছুটিয়াছিল, তাহা তৎকালিক সকলেরই পরিচিত।

কিন্তু পিতা দরিদ্র; পুত্রপোষণ তাঁহার পক্ষে কষ্টকর! পুত্র-শিক্ষাসম্বন্ধে করেন কি? নিরুপায়! পুত্র কিন্তু এই সময় দরিদ্র পিতার গলগ্রহ বা ভারবিশেষ না হইয়া, স্বীয় গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থানজন্য পূর্ব্ব হইতেই প্রাচীন হস্তলিখিত গ্রন্থের পুনর্লিপিকরণ-কার্য্যে ব্রতী হইয়া জীবিকার্জ্জনের সূত্রপাত করিয়াছিলেন! ১৮৪১ সালে লিপজিক্ কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া ১৮৪৩ সালে P P. D. উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। লিপজিক কলেজে এই বর্ষত্রয়-ব্যাপী শিক্ষাকালে তথায় বিখ্যাত পণ্ডিত হর্ম্মণ ও হাপ্ত অধ্যাপকতা করিতেন; তাঁহাদের অধ্যাপনার গুণে ম্যাক্সমূলরের সংস্কৃতশিক্ষায় ক্রমশই অনুরাগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এই উপাধি লাভের পরেই ম্যাক্সমূলর বার্লিন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রবেশলাভ করেন; পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যফলে তাঁহার সুকোমল কৌমার-হৃদয়ে সংস্কৃতানুরাগের সঞ্চার হইয়াছিল বলিয়া, ইংলণ্ড হইতে এসিয়া গবর্ণমেণ্টের তৎকাল-সংগৃহীত হস্তলিখিত প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া, বার্লিণ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করেন; হিব্রু ও সংস্কৃতের চর্চ্চায় অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও অচ্ছেদ্য আয়াস স্বীকার করিয়া, বিখ্যাত ভাষাবিৎ পণ্ডিত বপ্ ও সোলিঙের সাহায্যে সফলকাম ও কৃতার্থ হন।

অষ্টাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে ম্যাক্সমূলর বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া জীবিকার্জ্জনে নিযুক্ত হয়েন সত্য, কিন্তু বিদ্যার সাধনে বিরত হয়েন নাই। সংস্কৃত-সাহিত্যের রত্নে মাতৃভাষার উন্নতি সাধিতে কৃতসঙ্কল্প হন; তাঁহার জীবনস্রোত বিংশতি বর্ষ অতিক্রম করিতে না করিতে বিষ্ণুশর্ম্মকৃত হিতোপদেশের জর্ম্মাণ অনুবাদ রূপ উজ্জ্বল-রত্ন প্রকাশ পায়।

তাঁহার সংস্কৃত অধ্যায়নের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানপিপাসা ক্রমশই বলবতী হইতে লাগিল। তৎপরে তিনি ফরাসী রাজধানী পারী সহরে গিয়া, তত্রত্য প্রাচ্য ভাষাবিৎ পণ্ডিত ইউজিন বুর্ণোর উপদেশলাভে স্বীয় জ্ঞানবৃদ্ধি করেন। এই পারী সহরে পণ্ডিত ইউজিনের সংস্কৃত সাহিত্য-বিষয়ক বক্তৃতা শ্রবণে আর্য্যদিগের পরম আদরের বস্তু বেদের উপর তাঁহার অনুরাগ সঞ্চারিত হইল। সেই জ্ঞানময় বেদের অধ্যয়নের ও তাহার যথেষ্ট প্রচারের জন্য সঙ্কল্প করিলেন; এই সঙ্কল্পের সাধনে দৃঢ়ব্রত হওয়াতেই ইহাঁর যশঃসৌরভ বিশ্বব্যাপী দিগন্তপ্রসৃত হইয়া পড়িয়াছে। ইউজিন বুর্ণোর ওজাস্বিনী বক্তৃতা শ্রবণ করিবার সময় ঋগ্বেদের মাহাত্ম্যানুভবের সঙ্গে সঙ্গে মনে সভাষ্য ঋগ্বেদের

মুদ্রণ করিবার ইচ্ছা হয়। তাঁহার নিজের কথায় প্রকাশ, তদাকৃষ্টহৃদয়ে তাহার সাধন চিন্তায় আবিষ্ট থাকিয়া, যে ভাবের অনুভব করিয়াছিলাম, অদ্যাপি তাহার স্মরণ হইলে, সেই মহা দৃশ্য আমার দৃষ্টির সমক্ষে জাজ্বল্যমান বলিয়া প্রতিভাত হয়। পণ্ডিতপ্রবর আচার্য্য বুর্ণো তাঁহার কুশাগ্রসদৃশ সূক্ষ্ম বুদ্ধিবলে প্রাঞ্জল অথচ বিশদবাক্যে অদম্য উৎসাহে উদ্দীপ্তভাবে পূর্ণকক্ষ নির্ঝরধারার ন্যায় জ্ঞানধারার যে অবিরল স্রোত বহাইয়া ছিলেন—বিবেকের অবিরাম উদ্গীরণ করিয়াছিলেন, সেরূপ আর কখনও দেখি নাই। উৎসাহোৎফুল্লবদন বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্র ছাত্রগণে পরিবৃত বাগ্মি-বরের সে সৌম্যমূর্ত্তি—সে মোহন দৃশ্য—কখন কি ভুলিতে পারা যায়? যাঁহার ছাত্রগণ গুণগরিমায় জগদ্বিখ্যাত—প্রাচ্যখণ্ডেও যাঁহাদিগের জ্ঞানের আলোক প্রতিফলিত, তাঁহাদের অনেকে আমাদিগের দেশীয় প্রাতীচ্যজ্ঞান-বৃদ্ধের পরিচিত। গোল্ডষ্টূকার এবটবাভেলি গোরেশিও নেভ ও রথ—আমার সতীর্থ হইলেও, আমি সর্ব্বকনিষ্ঠ; যদিও ইতিপূর্ব্বে সংস্কৃত হিতোপদেশের অনুবাদ প্রচার করিরাছিলাম,—কালিদাসকৃত কাব্য মহাকাব্য-গুলির অধ্যয়ন করিয়াছিলাম, ষড়্দর্শন ও উপনিষদের পরিচয় পাইয়া-ছিলাম; অপিচ তদ্ব্যতীত অপর কোন গ্রন্থেরই বিষয় অবগত ছিলাম না, তখন আমার দৃঢ় ধারণা ছিল, উপনিষদে যেমন অমৃতময়চ্ছন্দে সুললিত বাক্যজ্ঞানের উপদেশ আছে, এমন আর কুত্রাপি নাই। ইতিপূর্ব্বে যখন বার্লিণে অবস্থান করিতেছিলাম, তখন পণ্ডিত সোলিঙের উপদেশে ইহার কোন কোন অংশ অনুবাদ করিয়াছিলাম সত্য,—রয়েল লাইব্রেরীর হস্তলিখিত পুস্তক হইতে ভাষ্যের কিয়দংশ উদ্ধৃতও করিয়াছিলাম বটে, এবং সেইদিকেই বিশিষ্টরূপ মনোনিবেশ করিবার সঙ্কল্পও করিতেছিলাম; কিন্তু তখন জ্ঞানময় বেদের কথা ভাবি নাই। কিন্তু যখন পণ্ডিত বুর্ণো মহোদয় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বেদের মন্ত্রভাগ ও ব্রাহ্মণের সহিত তুলনায় উপ-নিষদের হীনতা দর্শাইলেন, তখন আমার মন বিস্ময়ে অভিভূত হইল। একদিন মহাত্মা বুর্ণো রোসেন সঙ্কলন ঋগ্বেদের প্রথমভাগের উপর বক্তৃতা করিতেছিলেন। তাঁহার সেই অমৃতনিঃস্যন্দিনী বক্তৃতা হইতে যে সার-সঙ্কলনে সমর্থ হইয়াছিলাম, এবং তাহার সযত্নরক্ষিত হস্তলিখিত সায়ণ-ভাষ্য হইতে যে যে অংশ উদ্ধৃত করিয়া লইয়াছিলাম, তাহা এখনও আমার অতীব আদরের বস্তু। ক্রমালাপে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়; তাই

অধ্যাপক বূর্ণো আমার প্রতি সদয় হইয়া, তাঁহার হস্তলিপি পুস্তকগুলি পাঠ করিবার অনুমতি দিয়া আমাকে বিশিষ্ট অনুগৃহীত করিলেন; এবং বিশিষ্ট অংশগুলির উদ্ধার করিয়া লইতে পরামর্শ দিলেন। তাঁহার নিকট শিক্ষার প্রারম্ভকাল অতীব কষ্টকর বোধ হইয়াছিল; সময়ে সময়ে নৈরাশ্যের বিকট হাস্যে মর্ম্মাহত হইতাম। আবার তাঁহার আশ্বাসবাণীতেই যেন নবোৎসাহে উৎসাহিত হইয়া কার্য্যে অগ্রসর হইতে সচেষ্ট হইতাম। কিন্তু তখন পর্য্যন্তও বেদ ও সায়ণাচার্য্যকৃত টীকার অংশাংশ মুদ্রাঙ্কণ করা ব্যতীত আর কোন অধিকতর আশা করিতে পারি নাই। মনে করিতাম, এতদতিরিক্ত আর কিছুই করিবার নাই। কোলব্রুকের ধারণা আমার ধারণার অনুরূপ। তিনি "হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র" শীর্ষক প্রবন্ধের উপসংহার কালে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ, "বেদ এরূপ বৃহৎ গ্রন্থ যে, সম্পূর্ণ অনুবাদ অসম্ভব; এবং তদ্দারা অনুবাদকেরও তৃপ্তি হইবেই না, পাঠকের তৃপ্তি লাভ ত পরের কথা। অপিচ যে প্রাচীন ভাষায় তাহা লিখিত, তাহা অত্যন্ত জটিল ও দুরূহ। কিন্তু ইহা এতই মহত্ত্বসম্পন্ন যে, ইহার সাহায্যে কি প্রাচ্য কি প্রাতীচ্য সকল প্রকার পণ্ডিতগণের যথেষ্ট উপকার হইবার সম্ভাবনা।" এইরূপ সত্যের প্রবল প্রসারে বহু পণ্ডিতের হৃদয়ক্ষেত্র বিপর্য্যস্ত থাকিলেও, ফরাসী পণ্ডিতপ্রবর অধ্যাপক বূর্ণো ইহার ঘোর প্রতিবাদ করিতেন। তিনি বলিতেন, বেদ প্রকাশ করিতে হইলে, মূল ও টীকার সহিত প্রকাশ করাই কর্ত্তব্য; আর এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে হইলে ইউরোপের সংগৃহীত সকল পুস্তকেরই পাঠ মিলাইয়া দেখারও সবিশেষ প্রয়োজন। কতিপয় উদ্ধৃত শ্লোকের উপর নির্ভর করা উচিত নহে। তাহাতে দুরূহ অংশের বর্জ্জন হওয়াই সম্ভবপর।

দ্বাবিংশবর্ষীয় দরিদ্র যুবকের এই দুরূহ ব্যাপারের সাধনসঙ্কল্পে আগ্রহ হইল। ইহার পূর্ব্বে পণ্ডিত রোসেন বেদের প্রথম কিয়দংশের মুদ্রণ ও প্রকাশ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাহা অতি স্বল্পাংশমাত্র। ইউরোপের কুত্রাপি একখানি সমগ্র বেদ পাওয়া গেল না; জর্ম্মণী ও ফ্রান্সের পুস্তকাগারে সংগৃহীত গ্রন্থ হইতে ভিন্ন ভিন্ন অংশ উদ্ধার করিয়া শেষে ভারতের রত্নাধার ইংলণ্ডে গমন করিয়া, অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন; তথায় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত বড্‌লিয়ান লাইব্রেরীতে যে সমস্ত হস্তলিখিত প্রাচীন গ্রন্থ পাইলেন, তাহার সহিত পূর্ব্ব সংগৃহীতাংশের পাঠ মিলাইয়া সমগ্র বেদের উদ্ধারের চেষ্টায় ব্রতী হইলেন। এই সময়ে প্রগাঢ় পণ্ডিত রাজনীতিকুশল জর্ম্মাণ রাজপুত ব্যারণ বুনসেনের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। তিনি এই জ্ঞানানুসন্ধিৎসু দরিদ্র জর্ম্মণযুবকের অধ্যবসায়ে সন্তুষ্ট হইয়া, বিশিষ্টরূপ চেষ্টায় ও ঐকান্তিক অনুরোধে ভারত-বাণিজ্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বেদ-মুদ্রণের বিপুল ব্যয় ভারবহন করিতে সম্মত করাইয়াছিলেন! এখন হইতে তিনি নিশ্চিন্ত মনে বেদের মুল ও টীকা সংগ্রহে ব্রতী হইতে পারিলেন।

১৮৪৯ হইতে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রায় ২৫ বৎসরের প্রগাঢ় পরিশ্রমে ম্যাক্সমূলর ঋগ্‌বেদের অনুবাদ সাঙ্গ করিয়া ছয়খণ্ডে মুদ্রণ ও প্রকাশ করেন। এই অনুবাদ প্রকাশ কার্য্যে যে, তিনি তাঁহার বন্ধুর ব্যারণ বুনসেনের নিকট বিশিষ্টরূপ ঋণী, তাহা তাহার ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের প্রবন্ধে প্রসঙ্গতঃ তিনি তাহার খ্যাপন করিয়া গিয়াছেন;—তাহাতে প্রকাশ—"বিংশতি বৎসর অতীত হইতে চলিল, আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু বুনসেন একদিন আমাকে তাঁহার লাইব্রেরীতে ডাকিয়া লইয়া গিয়া, বলেন—ঋগ্বেদ অনুবাদ প্রকাশের জন্য আর চিন্তা করিতে হইবে না। তিনি অনেক দিন হইতে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টারদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, এই অমুল্য গ্রন্থের অনুবাদপ্রকাশের আবশ্যকতা বুঝাইয়া দিয়া, উহার ইংলণ্ড হইতেই প্রকাশ সঙ্গত বলিয়া ধারণা জন্মাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছেন। উক্ত মহান্ বণিক্‌সম্প্রদায়ের কার্য্যপরিচালকগণ মহাত্মা বুনসেনের পরামর্শে উক্ত কার্য্যের ভার বহনে সম্মত হন; আর সেই শুভসংবাদ বন্ধুবর বুনসেন আমার নিকট জানাইয়া, আমার উদ্বেগ দূর করিয়া আমাকে প্রোৎসাহিত করেন। পরে তিনি আরও বলেন, 'এই কার্য্য লইয়াই, বন্ধো, তোমার জীবনযাপন হইতে পারিবে। খনি হইতে অবিশুদ্ধ ধাতুর উদ্ধার করিলেই, তোমার কর্ত্তব্য সাধিত হইবে না; ঐ অবিশুদ্ধ ধাতুর খনিজ মলাদির অপসারণ করিয়া, যতক্ষণ বিশুদ্ধিসাধনে সমর্থ না হইবে, ততক্ষণ তোমার কার্য্য সাঙ্গ হইবে না'।"

এই বিস্তৃত সময় কেবল বেদসঙ্কলনেই অতিবাহিত করেন নাই; ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্বসম্বন্ধের উপদেশ করিতে বক্তৃতা করেন,—এবং চারি বৎসর ব্যাপিয়া ইউরোপীয় ভাষাসমূহের

অধ্যাপনাকার্য্যে ব্রতী ছিলেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বড্‌লিয়ান লাইব্রেরীর কিউরেটার পদে অভিষিক্ত হন। এই সময় হইতেই ইনি যশোগৌরবে ও উপাধিলাভে বিশিষ্টরূপ সম্বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। এই সময় হইতে তিনি বহুসংখ্যক গ্রন্থের প্রণয়ন ও সঙ্কলন করেন; তাহার উল্লেখ করা এই সামান্য প্রবন্ধের উপযোগী নহে। তিনি ৫০খানি প্রাচ্য গ্রন্থে ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুবাদ করিয়া প্রচার করিয়াছেন। এই অক্সফোর্ড বিদ্যালয়ের অধ্যাপকতা করিবার কালে তিনি কেম্ব্রিজ, এডিনবরা, গ্ল্যাসগো প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে সময়ে সময়ে উপদেশ ও বক্তৃতা করিতে প্রায়ই ব্রতী থাকিতেন।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে রবার্ট হার্ব্বার্টের দানপত্রের মতানুসারে "ধর্ম্মের উৎপত্তি ও বিকাশ" সম্বন্ধে বক্তৃতার জন্য বৃত্তি ব্যবস্থাপিত হইলে, তাহার বক্তা নিযুক্ত হয়েন, অধ্যাপক ম্যাক্‌সমূলর। তাঁহার অমৃতনিঃস্যন্দিনী বক্তৃতার শ্রোতৃগণের এত সমাবেশ হইত যে, দিনে দুইবার বক্তৃতা না করিলে, সাধারণের শ্রুতিতৃপ্তি সাধিত হইত না। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে আদাম গীফোর্ড নামক একজন মৃত ধনী—স্কট্‌লণ্ডীয় বারিষ্টার তাঁহার সমগ্র সম্পত্তি ধর্ম্ম-বিজ্ঞানসংক্রান্ত বক্তৃতার জন্য বৃত্তিরূপে দান করিয়া যান; তাহারও বক্তা নিযুক্ত হয়েন, অধ্যাপক ম্যাক্‌সমূলর। তাঁহার সকল বক্তৃতাই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। সেই সকল পুস্তকের আদরও যথেষ্ট।

সে যাহাই হউক, যে ঋগ্বেদ প্রচারের জন্য, ম্যাক্সমূলর বিশ্ববিখ্যাত, সেই ঋগ্বেদের প্রথম সংস্করণের পুস্তকগুলি মুদ্রাঙ্কণ ব্যয়ের দ্বিগুণ মূল্যে বিক্রীত হয়; তাহার পর উহার পুনঃ সংস্করণের প্রয়োজন হইলে, ম্যাক্স-মূলর ভারতের ষ্টেট সেক্রেটরীর নিকট সাহায্যপ্রার্থী হন; কিন্তু ভারতীয় বিলাতী কর্ত্তা তাঁহার প্রার্থনা পূরণ করিতে পারেন নাই। অতঃপর ১৮৯০-৯২ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগরের স্বর্গীয় মহারাজ চারিখণ্ডে সংস্কৃত পুস্তকের মুদ্রণ ব্যয় বহন করিয়াছিলেন।

শ্রীঅঘোরনাথ শাস্ত্রী।

আঁধার মাণিক।

(১)

সকালের ফুল, শুকায় বিকালে,
আলোকের ধারে ঘোর অন্ধকারে।
সম্পদের ধারে বিপদ বিষম,
আজিকার হাসি কাল অশ্রুধার॥

(২)

নীলমেঘ কোলে চপলার হাসি
ক্ষণেকের তরে প্রকাশ পায়।
স্রোতস্বিনী বক্ষে লহরীর মালা
নিমিষের মাঝে মিলিয়া যায়॥

(৩)

প্রণয়ে বিরহ জীবনে মরণ
নশ্বর জগতে কি আছে সার।
ভাই পরিজন নিশার স্বপন
মানব জীবনে কিবা আছে আর॥

(৪)

মরিতে জনম তবে কেন ছাই
দুদিনের তরে খেলি এ খেলা।
আঁধারে জনম ডুবিব আঁধারে
ফুরাবে যখন জীবন বেলা॥

(৫)

নিরাশায় কেন করি হাহাকার
সুখনীরে কেন আবার ভাসি।
বুঝিতে পারিনা এ কেমন খেলা
দু-দিনের তরে ভালবাসা বাসি॥

(৬)

মাটির মানুষ ছাই মাটি নিয়ে
তাই নিশিদিন থাকে সে ভালো।
ভ্রমেও ভাবেনা পরাণ চাহেনা
আঁধার ঘরের মাণিক আলো॥

শ্রীশ্রীশচন্দ্র দে।

কবিতা কোরক।—শ্রীরাজচন্দ্র পাঁড়ে সঙ্কলিত। বিদ্যালয়ের বালকগণের পাঠোপযোগী করিবার অভিলাষে রাজচন্দ্রবাবু এই পুস্তকখানিতে কতকগুলি সুনীতিপূর্ণ সরল কবিতা সন্নিবেশিত করিয়াছেন। সর্ব্বশুদ্ধ ত্রিশটী কবিতা আছে। তন্মধ্যে অষ্টাদশটী রাজচন্দ্রের নিজের রচিত, অবশিষ্ট দ্বাদশটী অপরাপর লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবিগণের কবিতাবলী হইতে উদ্ধৃত। বিষয়গুলির নির্ব্বাচন অতি উত্তম হইয়াছে; কবিতাগুলিও উত্তম; বালকেরা ইহা পাঠ করিয়া জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে সন্দেহ নাই।

বাবু রাজচন্দ্র পাঁড়ে অকবি নহেন, তাঁহার স্বরচিত কবিতাগুলি পাঠ করিয়া তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি; কিন্তু কবিতাগুলির মধ্যে মধ্যে দুই একটী মিলদোষ এবং যতিভঙ্গদোষ দৃষ্ট হয়। যথা—৩য় পৃষ্ঠায় প্রাতঃউত্থানে

"মৃদুর সমীর পুষ্পে কাঁপিছে নলিনী;
পরিমল হরি মধুমক্ষি অভিমানী"—

এই দুই চরণে মিলদোষ এবং যতিদোষ, উভয়ই আছে। "নলিনীর" সহিত "অভিমানী"পদের সুমিল হয় না; দ্বিতীয়তঃ "পরিমল" হরি মধুমক্ষি অভিমানী, এই চরণের প্রথমে অষ্টাক্ষরা যতি ধরিলে মধুশব্দের পরে যতির বিরাম দিতে হয়;—পরিমল হরি মধু, মক্ষি অভিমানী,—যতিভঙ্গ জন্য সুতরাং এটা শুনিতে ভাল হয় না। আরও একাদশ পৃষ্ঠায় নীতিসারে—

"ঔষধিমন্ত্রের গুণে সর্প বশ হয়;
খলেরে করিতে বশ নাহিক উপায়॥"

এখানেও হয়, আর উপায় মিলদোষ। আরও সপ্তদশ পৃষ্ঠায় রাজভক্তি প্রসঙ্গে—

"যাঁহার রাজ্যেতে রহি যাঁর শস্য খেয়ে,
সুখেতে বেড়াও তুমি নাচিয়া গাহিয়ে।"

খেয়ে আর গাহিয়ে, এই দুটীতে মিলদোষ। তাহা ছাড়া "নাচিয়া গাহিয়ে", এরূপ প্রয়োগ হইতে পারে না;—নাচিয়া গাহিয়া অথবা নাচিয়ে গাহিয়ে, এইরূপ হওয়াই উচিত। যাহা পাঠ করিয়া নীতি-শিক্ষার সঙ্গে বিদ্যালয়ের বালকেরা কবিতার লক্ষণ শিক্ষা করিবে, তাহাতে ঐরূপ দোষ থাকা শোভা পায় না। আশা করি, কবি ভবিষ্যতে ঐরূপ দোষগুলি পরিবর্জ্জন করিবেন।

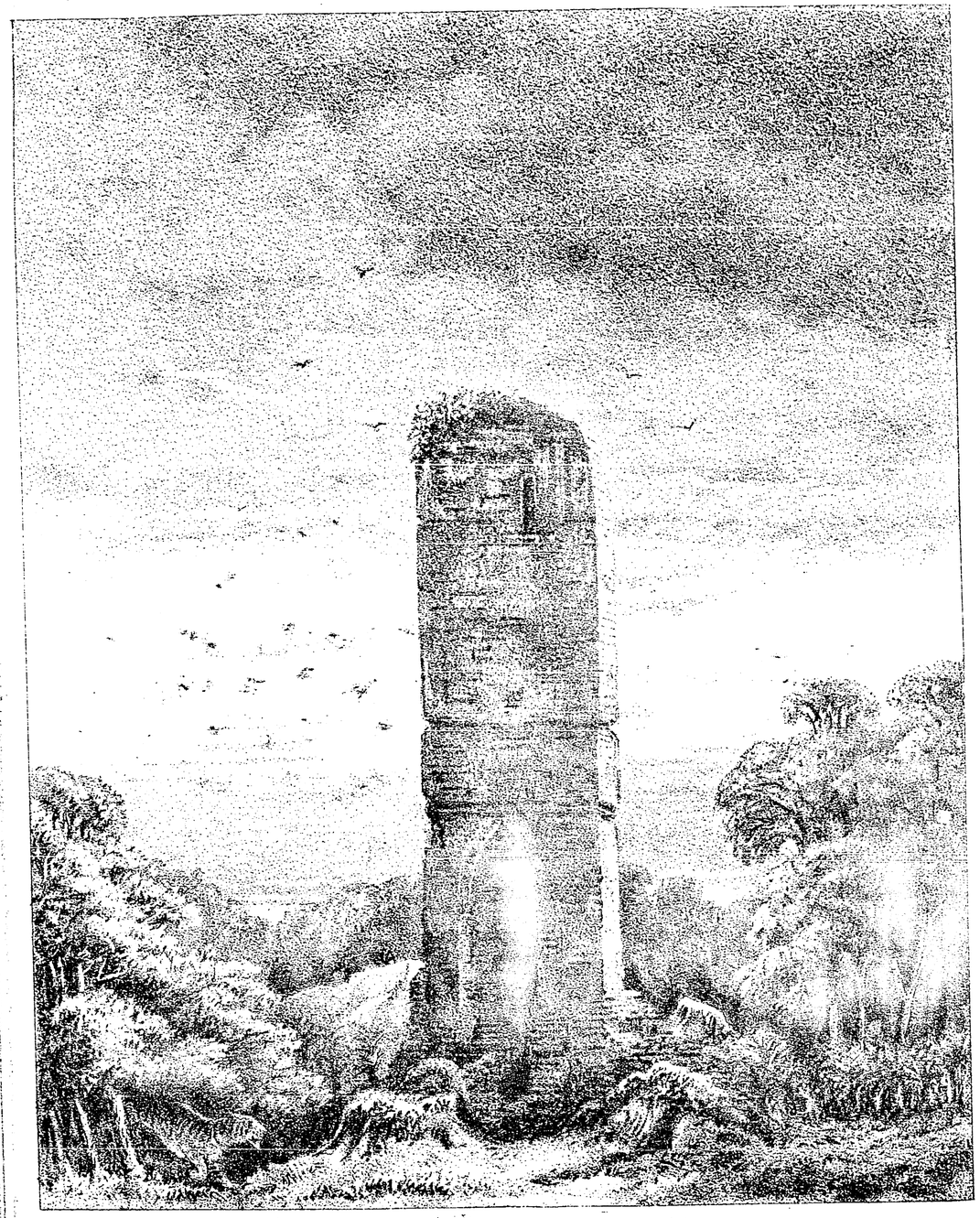

জন্মভূমি।

(সচিত্র মাসিক পত্র।)

নবম বর্ষ। } ১৩০৭ সাল, পৌষ। { ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

মহম্মদ্-গজনবী।

ইস্মাইল্‌কে পরাস্ত ও বন্দীকৃত করিয়া, মহম্মদ্ গজনবী, গজনীর রাজসিংহাসন অধিকার করিলেন।

ইতিহাস-লেখকগণ কহেন, কোন মহান্ রাজার যে সমস্ত গুণ থাকা আবশ্যক—মহম্মদ গজনবীতে তাহার সমস্তই ছিল। কেহ কেহ বলেন যে, তিনি বড় অর্থগৃধ্নু ছিলেন। এ কথা সত্য বলিয়াই উপলব্ধি হয়। কিন্তু তাঁহার অর্থের অধিকাংশই, দূরবর্ত্তী স্থানসমূহের জয়-সৌকর্য্যার্থেই ব্যয়িত হইত।

আবু নমর্ মাস্‌ফেটি, আবুল্‌ফজল্ প্রভৃতি বিখ্যাত পর্য্যটকগণের নিকট অবগত হওয়া যায় যে, তাঁহার রাজসভায় যেরূপ বিদ্বজ্জনগণের সমাগম ছিল, তাঁহার যেরূপ সমরকুশল সৈন্য ছিল, অন্য কোন নৃপতিরই সেরূপ ছিল না। এতৎ-সমূহে তাঁহার ভূরি পরিমিত অর্থ ব্যয়িত হইত—এটী আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

মহম্মদ্ গজনবী, দেখিতে সুপুরুষ ছিলেন না। প্রবাদ আছে, দর্পণে একদিন স্বীয় আননের প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া, তিনি বলিয়াছিলেন, "রাজদর্শনে সকলেই, রাজার সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে বিমোহিত হইয়া পড়ে; কিন্তু ঈশ্বর আমায় এতই অপ্রিয়দর্শন করিয়াছেন যে, আমার দর্শনে লোকের প্রীত হওয়া দূরে থাকুক, সকলেই অপ্রীত হইয়া থাকে।" তাঁহার উজীর, তৎক্ষণাৎ বলিলেন,—"প্রভু! দশ সহস্রের একজনও

আপনার দর্শনে অপ্রীত হয় না। গুণই মনুষ্যের রূপ। আপনার গুণাবলী পৃথিবীর সর্ব্বত্রই পরিব্যাপ্ত।”

মহম্মদ, সবক্তজীনের প্রথম পুত্র। তাঁহার মাতা, জেবুলিস্থানে এক অতি সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই হেতু বশতঃ লোকে, তাঁহাকে কখন কখন “জেবুলি” বলিত।

মহম্মদ ৩৫৭ হিজরায়, ৯ই মহরমের (৬৭ খৃষ্টাব্দে ১৫ই ডিসেম্বরের) রাত্রিতে জন্ম গ্রহণ করেন। কিংবদন্তী এইরূপ যে,—মহম্মদ যে তারিখে জন্মগ্রহণ করেন, মহম্মদ গজনবীও, সেই দিবস সঞ্জাত হয়েন। যখন সুলতান মহম্মদ জন্ম গ্রহণ করেন, তখন সবক্তজীন নিদ্রা যাইতেছিলেন। মহম্মদের জন্মকালে তিনি স্বপ্নে দর্শন করিলেন,—একটি নীলবর্ণের বৃক্ষ, তাঁহার গৃহের অগ্ন্যাগার হইতে বহির্গত হইয়া শাখা প্রশাখা বিস্তার পূর্ব্বক সমগ্র পৃথিবীকে ছায়া প্রদান করিল! মহম্মদের শাসনে ন্যায়পরায়ণতা দেখিয়া এই স্বপ্ন, আমাদের সত্য বলিয়াই বোধ হয়। তাঁহার শাসনগুণে “বাঘে বলদে এক ঘাটে জল খাইত।”

তাঁহার রাজত্বের প্রথম মাসেই “মিস্থানে” হস্তত্রয় পরিমিত বেধবিশিষ্ট উদ্ভিদাকার একখণ্ড বিশুদ্ধ স্বর্ণ পাওয়া গিয়াছিল। মুসায়ুদের রাজত্বকালীন, ভূমিকম্পে ইহা, মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রোথিত হইয়া যায়।

মহম্মদ স্বীয় সহোদরকে সিংহাসনাচ্যুত করিয়া “বাগম্” নগরে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে বোখারাধিপতি আনস্থরের নিকট এই বলিয়া এক দূত প্রেরণ করেন যে, আপনি কেন আমির তুজান্‌কে আমার পৈত্র্যাধিকারস্থিত খোরাসানের রাজসিংহাসনে স্থাপন করিলেন।

প্রত্যুত্তরে বোখারাধিপতি, বলিয়া পাঠাইলেন,—আপনি বালম্, তুরমুজ ও হিরাট এই তিনটী স্থানের অধিপতি। সুতরাং আপনার আর কোন নূতন স্থানের আধিপত্যের প্রয়োজন কি? অধিকন্তু বোখারাধিপতির অনুগ্রহে ইহার কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে বিভক্ত হওয়া উচিত। অতএব তুরজানকে খোরাগানের আধিপত্য প্রদান করা, অতি উত্তমই হইয়াছে।

মহম্মদ এই উত্তরে হীনসাহস না হইয়া আবদুল হোসেন নামক জনৈক দূত দ্বারা বোখারাধিপতিকে বহুমূল্য উপঢৌকন ও একখানি পত্র প্রেরণ করেন। পত্রে তিনি লিখিলেন—“আমরা সমানি-রাজবংশের বশত্যা স্বীকার করিয়া আসিতেছি। আমি আশা করি, তুজানের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ

করিতে গিয়া আপনি এই বশ্যতা লাভে বঞ্চিত হইবেন না।” বোখারাধিপতি ঐ পত্রের উত্তর প্রদান করিলেন না; অধিকন্তু দূতকে স্বীয় উজীরের পদ প্রদান করিয়া আপনার নিকটে রাখিলেন। মহম্মদ, আর নিরস্ত থাকিতে পারিলেন না। তিনি নিশাপুর অধিকারার্থ যাত্রা করিলেন। তুজান্, তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, নগর পরিত্যাগ করিয়া পালাইলেন। সম্রাট্, এই সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া ক্রোধান্ধ হইয়া, খোরাসানের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সুরুখশ্‌তে উপস্থিত হইয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন। মহম্মদ বিলক্ষণ জানিতেন, সম্রাট্, কখনও তাঁহাকে বাধা দিতে পারিবেন না। তথাপি সমানিররাজপরিবারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ, তিনি মুরখাকে আক্রমণ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। ইত্যবসরে তুজান্, ফইকের সহিত এক ষড়যন্ত্র করিয়া, মানমূরকে আক্রমণ পুরঃসর তাঁহার চক্ষুরুৎপাটন করেন।

অনন্তর তাঁহার (মানস্থরের) কনিষ্ঠ ভ্রাতা আবদুল মল্লিক্‌কে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া, মামুদের ভয়ে ফইকের সহিত সার্ভে পলায়ন করেন। মামুদ তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। অবশেষে নিরুপায় হইয়া সৈন্য সংগ্রহ করিয়া, তিনি, মামুদের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু উভয়েই, পরাস্ত হইলেন। ফইক, নব নৃপতি আবদুলকে লইয়া বোখারায় পলায়ন করিলেন। তুজান্‌ও পলায়ন করেন। অল্পকাল মধ্যেই ফইক, পীড়িত হইলেন। অচিরেই তাঁহাকে কালগ্রাসে পতিত হইতে হইল। কাশগড়াধিপতি ইলিক খাঁ, এই সুযোগে বোখারায় গমন করিয়া, আবদুলকে সবংশে ধ্বংস করিলেন। বোখারায় ১২৮ (একশ আঠাশ) বৎসর রাজত্বের পর সমানি-কুল, নির্ম্মূল হইল। মামুদ, এই সময় বালম্ ও খোরসানের শাসন-সম্বন্ধে সুবন্দোবস্ত করিলেন। ইহাতে বাগদাদের কালিফ, অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাঁহাকে একটী সম্মানসূচক বহুমূল্য পরিচ্ছদ প্রদান করেন। তৎ-সূত্রেই তাঁহাকে “আমিন্-উল্-মিলাট” ও “সিমিন উদ্দৌলৎ” এই দুই সম্মান-সূচক উপাধি প্রদত্ত হয়।

৩৯০ হিজরায় জিকাদ মাসে মামুদ, বালম্ হইতে হিরাটে গমন করিলেন; পরে তথা হইতে মিস্থানে গমন করিয়া তৎপ্রদেশাধিপতি আমেদের পুত্র মুলুককে পরাস্ত করিয়া, গজনীতে ফিরিয়া গেলেন। সেই সময়েই তিনি ভারতবর্ষাভিমুখেও যাত্রা করিয়াছিলেন। অনেক

প্রদেশ ও দুর্গ অধিকার করিয়া অধিকৃত স্থান সমূহে স্বজাতীয় শাসনকর্ত্তা নিয়োগ পূর্ব্বক রাজধানীতে ফিরিয়া যান। সমুদয় বিঘ্ন-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া অবশেষে মামুদ স্বদেশের উন্নতি-সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। দেওয়ানী এবং ফৌজদারী আদালতও, স্থাপিত হইল। তিনি এলিক খাঁকে বোখারার অধিপতি বলিয়া স্বীকার করা, শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিলেন এবং আবু তায়াব মহিল, বিনমলিমান এবং সালুকি এই তিন জন সম্ভ্রান্ত মুসলমানকে বহুমূল্য উপঢৌকন দিয়া এলিক খাঁর সহিত সন্ধি স্থাপনার্থ বোখারায় প্রেরণ করিলেন। এইরূপে স্বরাজ্যের সুবন্দোবস্ত করিয়া মামুদ হিণ্ড দেয়ার্থ কৃতসংকল্প হইলেন। ৩৯১ হিজরায় সুলভ মাসে মনোনীত দশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া গজনী হইতে পেসোয়ার যাত্রা করিলেন। ৩৯২ হিজরায় ৮ই মহরম সোমবার লাহোরাধিপতি জয়পালের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধে জয়পালের দ্বাদশ সহস্র অশ্বারোহিণী সেনা, ত্রিংশ সহস্র পদাতি এবং দুই শত হস্তী ছিল। কিন্তু দৈবের গতি বিবিত্র! এই যুদ্ধে মামুদ্‌ই, জয়লাভ করিলেন। জয়পাল, পুত্র-ভ্রাতৃ-গণের সহিত বন্দী হইলেন। সেই উপলক্ষে তাঁহার পাঁচ শত সৈন্যও, নিহত হইল। মামুদ এই যুদ্ধে প্রভূত অর্থ ও সুমহৎ যশঃ লাভ করিলেন। লুণ্ঠিত দ্রব্যের মধ্যে মামুদ ষোলগাছি মণিমুক্তাখচিত হার পাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে মহারাজ জয়পালের একগাছি ছিল। তাহার মূল্য তৎকালে ১,৮০,০০০ দিনার নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। এই জয়লাভের পর, তিনি পেসোয়ার পরিত্যাগ করিলেন। পথিমধ্যে বিটুণ্ডার দুর্গ আক্রমণ ও ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর বসন্তের প্রারম্ভে, তিনি প্রচুর অর্থ লইয়া এবং বাৎসরিক কর-প্রদানে অঙ্গীকার করাইয়া, বন্দীদিগকে মুক্তি প্রদান করিলেন। কিন্তু যে সকল আফগান সর্দ্দার তাঁহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহাদের সকলকেই হত্যা করিলেন এবং অবশেষে গজনীতে প্রত্যাগত হইলেন।

তৎকালে যদি কোন হিন্দু-রাজা, কোন বিদেশীয় কর্ত্তৃক দুই বার যুদ্ধে পরাভূত হইতেন, তাহা হইলে তিনি রাজকার্য্য-নির্ব্বাহে অসমর্থ বলিয়া বিবেচিত হইতেন। এই প্রথানুযায়ী মহারাজ জয়পাল, স্বীয় পুত্রকে রাজ্য প্রদান করিয়া, অগ্নিকুণ্ডে দেহত্যাগ করেন।

৩৯৩ হিজরার মহরম মাসে মামুদ, পুনরায় মিস্থানে যাত্রা করিলেন এবং খুলুককে বন্দী করিয়া গজনীতে আনিলেন।

সেই সময় হিন্দুস্থান হইতেও কিছুমাত্র কর আদায় হয় নাই, স্মরণ হওয়ায়, ৩৯৫ হিজরায় তিনি ভাতিয়ার অভিমুখে অভিযান করেন। মুলতানের মধ্য দিয়া মামুদ, ভাতিয়ার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ভাতিয়া, একটি অত্যুচ্চ প্রাচীর, গভীর ও সুপ্রশস্ত পরিখা দ্বারা পরি-বেষ্টিত। মহাপ্রতাপশালী মহারাজ বিজয় রায়, ইহার তাৎকালীন অধিপতি ছিলেন। ইনি, মামুদ্‌-প্রতিষ্ঠিত হিন্দুস্থানের শাসনকর্ত্তাদিগের উপরি যৎপরোনাস্তি উৎপীড়ন করিয়া অবশেষে মহারাজ আনন্দপালকেও* (মহারাজ জয়পালের পুত্রকে) প্রতিশ্রুত কর-প্রদানে বাধ্য করাইয়াছিলেন।

মামুদ, স্বরাজ্যে প্রবেশ করিবামাত্র, মহারাজ বিজয় রায়, সৈন্য সজ্জিত করিয়া, প্রস্তুত হইলেন। সুদৃঢ়-স্থান-সমূহে সৈন্য সমাবেশ পুরঃসর তিনি, এরূপ কৌশল ও সাহসের সহিত যুদ্ধ করিলেন যে, মুসলমানগণ, তিনদিন যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইয়াছিল। তাঁহাকে অবশেষে অবরোধ-সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া পলায়নে কৃতসঙ্কল্প হইতে হইয়াছিল। যাহা হউক, চতুর্থ দিবসে মামুদ, সৈন্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "সৈন্যগণ, অদ্য আমি স্বয়ং তোমাদের নেতা হইব। তোমরা ভীত হইও না। অদ্য হয় বিজয়লক্ষ্মীর ক্রোড়ে, নয় কৃতান্ত-ক্রোড়ে নিশ্চয়ই শায়িত হইব।" এই বলিয়া অসীম বিক্রম-প্রদর্শনে তিনি রাজার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। মহারাজ বিজয় রায়ও, ইষ্টদেবতার পূজা করিয়া অশেষ সাহসে মামুদের সহিত সমরে অবতীর্ণ হইলেন। যবনগণ, পুনঃ পুনঃ আহত ও তাড়িত হইয়াও, সাহসের সহিত বারংবার অগ্রসর হইতে লাগিল। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এইরূপে যুদ্ধ চলিল। সন্ধ্যা সমাগত হইলে, মামুদ, মক্কাভিমুখে মুখ ফিরাইয়া, সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক মহম্মদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর "হে সৈন্যগণ! সমরে অগ্রসর হও। ঈশ্বর, আমাদের প্রতি অনুকম্পা করিয়াছেন"—এই বলিয়া শ্রবণ-বধিরকারী ভীষণ ভৈরবরব করিয়া উঠিলেন। মুসলমানগণ, জয়ধ্বনি করিয়া অগ্রসর হইল এবং আপনাদের শত্রুগণকে পরাভূত করিয়া দুর্গের দ্বার পর্য্যন্ত তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

---

* কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে তাঁহার নাম "অনঙ্গপাল"।

মধু-কান।

মধু-কানের ভাল নাম মধুসূদন কিন্নর, কিন্তু মধুসূদন কিন্নর বলিলে লোকে বুঝুক না বুঝুক মধুকান্ বলিলে বুঝিতে আর কাহারও বাকী থাকে না। বাঙ্গলায় এমন বাড়ী নাই, বাড়ীতে এমন লোক নাই, লোকে এমন ছেলে বুড়া নাই যে, মধু-কানের নাম না, শুনিয়াছে। কালিদাস ভবভূতি শ্রীহর্ষ মাঘ—তাঁহারা অসাধারণ পাণ্ডিত্য-বলে দেশের সর্ব্বত্র যে প্রতিষ্ঠা-স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, আমাদের কিন্নর মধুসূদন বাঙ্গলায় তদপেক্ষা কম নাম কিনিয়া যান নাই। শ্রীহর্ষ মাঘ প্রভৃতির নাম সুধীসমাজেই সুপরিচিত, কিন্তু আমাদের এই মধুসূদনের নামটী সুধী অসুধী সব সমাজেই সুবিদিত। বহু গবেষণা, বহু শাস্ত্রানুশীলন দ্বারা পণ্ডিতমণ্ডলী যে কীর্ত্তি স্থাপিত করিতে পারেন নাই, মূর্খ মধুসূদন কোন শাস্ত্রের ধার না ধারিয়া, কেবল কতকগুলি গীত রচনা দ্বারা ততোধিক কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। মধুসূদন যদি এই হতভাগ্য বাঙ্গলা দেশে না জন্মিয়া ইউরোপের কোন এক স্থানে জন্মিতেন, তাহা হইলে মধুসূদনের গৌরব যে আরো কত বৃদ্ধি পাইত, তাহা আমরা বলিতে পারি না।

মধুসূদনের এত গৌরব কেন? গান ত অনেকে রচনা করিয়াছেন, অনেকেও করিতেছেন, তবে মধুসূদনের এত গৌরব কেন? শুধু মধুসূদনের নয়, মধুসূদন রামপ্রসাদ দাশরথি রায় রামনিধি গুপ্ত (নিধু বাবু) ইঁহারা প্রত্যেকেই কেবল সঙ্গীতরচনা দ্বারা মহা যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। সত্য বটে, শ্রীধর কথক কমলাকান্ত রসিকচন্দ্র রমাপতি প্রভৃতি অনেকেই সঙ্গীত-রচনায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন, কিন্তু আমরা উপরে যে চারিজনের নামোল্লেখ করিয়াছি, ইঁহারা কেহ উঁহাদের সমকক্ষই হইতে পারেন নাই। ইঁহাদের সঙ্গীতের একটু নবীনত্ব ও উপাদেয়ত্ব আছে, সে টুকু অন্যে নাই বলিয়া ইঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্বত্র প্রতিপাদিত হইয়াছে। রামপ্রসাদের ভক্তিপ্রবণতার সহিত তদীয় সঙ্গীতের ভাষা সারল্য আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। সাদা কথায়, গ্রাম্য ভাষায় এমন ভক্তির "বিশপদী" বোঝাই ভরা পাঠক আর কোথাও দেখিয়াছেন কি? রামপ্রসাদ ঠিক যেন মায়ের আবদারে ছেলে! সব সময়ই যেন মায়ের আঁচল ধরিয়া বেড়াইতেছেন; মাআসিয়া বেড়া বাঁধিয়া দিবেন, মা তাহাকে তহবিলদারী দিবেন, মা তাহার চোকের ঠুলি খুলিয়া দিবেন, অভয়পদ সবটাই তাহাকে দিবেন, মা তাহার সুরা সুধা করিয়া দিবেন, না দিলে "সর্ব্বনাশী" বলিয়া গালি দিবেন। গণ্ডযোগে জন্মিয়া তাহাকে উদরসাৎ করিবেন, বলিয়া ভয় দেখাইবেন, আবার "শিব হবে তোমার বাবা" বলিয়া উৎকট দিব্যও দিবেন! এই আবদার-মাখা ভরা ভক্তির উপর আবার সুরের নূতনত্ব! এজন্য প্রসাদীসুর বলিয়া সুরের একটী নামকরণও হইয়াছে! দাশরথি রায়ের সঙ্গীতেও সুরের নবীনত্ব আছে বটে, কিন্তু তাঁহার অনুপ্রাস ও রচনাচাতুর্য্য অতি মনোহর, অতি সুন্দর হৃদয়গ্রাহী! ভাবেরও অসদ্ভাব নাই! পাঠক! যদি কখন ফলপুষ্প সমাকীর্ণ তীরতরুভূষিত, কলনিহ্লাদ বিবিধ বিহগকুল বিচরিত সৈকতবামা শারদ স্রোতস্বতীর ক্ষীণরেখা দৃষ্ট করিয়া থাক, তবে দাশরথি রায়ের সঙ্গীতের ভাব বুঝিতে সমর্থ হইয়া থাকিবে। এহেন তটিনী রেখার তীরবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বাগ্রে যেমন ফলপুষ্পভারাবনত বৃক্ষরাজির শ্যামল সৌন্দর্য্যনয়নে প্রতিভাত হয়, সৈকতের শুভ্রত্বে চিত্ত চমৎকৃত হয়, কলনাদী পক্ষীকুলের সুললিত গানে শ্রবণ পরিতৃপ্ত হয়, পরে রজত রেখা সদৃশী তটিনীর দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, সেইরূপ দাশরথি রায়ের সঙ্গীতে প্রথমে শব্দের ঘটা ও অনুপ্রাসের ছটায় শ্রবণ ও নয়ন পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে, পরে ভাবের কুলুধ্বনি আসিয়া শ্রোতা বা পাঠকের চিত্তের তুষ্টি জন্মাইয়া দেয়। আর নিধুবাবু (রামনিধি গুপ্ত) এক ধরণের গীত রচয়িতা। ইহাঁর সমগ্র গানই প্রায় টপ্পা—প্রেম রসাত্মক! এমন টপ্পা বাঙ্গলায় অতি বিরল, সঙ্গে সঙ্গে ভাবেরও বিলক্ষণ সদ্ভাব আছে। নিধু বাবুর গানে মোহিত না হন, এমন লোক কয়জন আছেন? তাঁহার সিন্ধু-ভৈরবী মধ্যমানের টপ্পাগুলি যেন রসে ভরা, ন্যাংচা পানতুয়া যত খাও, সৃক্কণী প্রবাহিত রসধারায় বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইয়া যাইবে! নিধুবাবু কুঞ্জে কোকিল! গানগুলিতে কুহুভরা, মলয়মাখা, জোছনার রাশি ঢল ঢল করিতেছে! আর আমাদের মধুসূদন! আমাদের বোধ হয়, বৃন্দাবনের কোন আভীরবালা কৃষ্ণবিরহে আকুলা হইয়া সযত্নে শুকপাখী পুষিয়া তাহাকে কৃষ্ণবুলি শিখাইয়া, পরিশেষে ছাড়িয়া দিয়াছিল, সেই শুকই বোধ হয়, মর্ত্তে মধুসূদন হইয়া জন্মিয়া থাকিবে! অথবা কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর দেবর্ষি নারদ তাঁহার হরিনামে সাধাবীণার

প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া মর্ত্তে পাঠাইয়াছিলেন, সেই প্রতিষ্ঠিত-প্রাণ বীণা-যন্ত্রই বোধ হয়, আমাদের মধুসূদন! নতুবা এত মধু কি আর কোথায় সম্ভবে? তাঁহার গালগুলিও ভাবের উৎস, ভক্তির গোমুখী, সরলতার নির্ঝরণী! তদুপরি সুরের নূতনত্ব! যেমন প্রসাদীসুর, তেমনি মধুকানের সুর! এই সুরের নবীনতাই তাহাদিগকে উচ্চাসন দিয়া গিয়াছে। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে মধুসূদনের গানগুলির সৌন্দর্য্য দেখাইতে চেষ্টা করিব, নিধুবাবু দাশুরায় ও রামপ্রসাদের গানগুলি লইয়া পশ্চাৎ আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

"ন বিদ্যা সঙ্গীতাৎপরং।" গানের চেয়ে বিদ্যা নাই। স্বয়ং বাগ্‌বাণী সরস্বতী বীণাপাণি! বীণাবাদিনী! গানে মোহিত না হয় কে? বনের পশুও সঙ্গীতে মুগ্ধ! হিংস্র ক্রুর ভুজঙ্গও স্বর মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া দংশবৃত্তি বিস্মৃত হইয়া থাকে! এহেন বিদ্যার যে আজ কাল বিশেষ গৌরব নাই, ইহা আমাদের দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। এ বিষয়ে অদ্য আর অধিক বলিব না! মধুসূদন এই গীত বিদ্যার জন্যই এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। ছেলে বলে মধু কান, যুবায় বলে মধু কান, বুড় বলে মধু কান, বালিকা বলে মধু কান, যুবতী বলে মধু কান, বুড়ীতেও বলে মধু কান। ইহা অপেক্ষা মধুকানের আর কি সৌভাগ্য হইতে পারে? মধুকান লেখা-পড়া শিখিয়া পণ্ডিত হয় নাই, মধু কান ক্রিয়াকর্ম্ম করিয়া যশস্বী হয় নাই, মধুকান খোদ সরকারে দুদশ হাজার দান করিয়া গেজেটে নাম ছাপাইয়া জাহির হয় নাই, মধুসূদন কেবল গান গাইয়াই যশস্বী হইয়া গিয়াছেন! "গুণৈর্হি সর্ব্বত্র পদং নিধীয়তে।" মধুকানের শত্রু মিত্র সকলেই তাহার সুখ্যাতি করে, তাহার ক্ষমতার কথা উল্লেখ করিয়া সকলেই মুক্তকণ্ঠে তাহার গৌরব ঘোষণা করে।

মধুসূদন জাতিতে কিন্নর; নিবাস যশোহর জেলায়। কিন্নর জাতির উৎপত্তি কোথা হইতে হইল, তাহা আমরা বিশেষ বিদিত নহি! স্বর্গে এক কিন্নর জাতি আছে, তাহারা স্বর্গের গায়ক; জানিনা, মধুসূদনের জাতি সেই কিন্নর হইতে উদ্ভূত কি না! আমরা স্বর্গের কিন্নর দেখি নাই, তাহাদের গানও শুনি নাই, আমরা মধুসূদন হইতে সেই Fabulous Sect"এর অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। আমরা মর্ত্তের কিন্নরেই সন্তুষ্ট!

মধুসূদনের গানগুলির নাম ঢপ সঙ্গীত। এই ঢপ সঙ্গীত সবই কৃষ্ণ-বিষয়ক! গানগুলি প্রায় সমস্তই কীর্ত্তনাঙ্গ! যখন গানগুলি কলকণ্ঠে সুর লয়ে উদ্গীত হয়, তখন আমরা দেখিয়াছি, ছেলেরা খেলা ভুলিয়া, ক্ষুধা ভুলিয়া হাঁ করিয়া গায়ক বা গায়িকার দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে। যুবকেরা অবাত বিক্ষোভিত প্রশান্ত সরবৎ স্থির ধীর নিশ্চল নিস্পন্দ ভাবে বসিয়া থাকে, তাহাদের হৃদয়ের মহানন্দ বিস্ফারিত নেত্রযুগলে সুস্পষ্ট প্রতিফলিত দৃষ্টিগোচর হয়। তাঁহাদিগের হৃদয়ের ভাবলহরী গোমুখী নির্ঝরবৎ নয়ন বিগলিত শত ধারায় উচ্ছ্বলিত হইয়া থাকে। তাহাদের দরগলিত শতধার অশ্রুধারে বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইয়া যায়। যুবতীরা চঞ্চল চকিত কটাক্ষ ভুলিয়া "নিবাত পদ্ম স্তিমিত" চক্ষু গায়ক বা গায়িকার মুখে সংসক্ত করিয়া রাখে, দেখিলে বোধ হয় যেন তাহাদের উপোষিত নেত্র সর্ব্বাত্মনা সেই স্বর সুধা পান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, অথবা যেন তাহাদের অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলি স্বব্যাপার-শূন্য হইয়া নেত্রলীন হইয়া গিয়াছে। আর প্রৌঢ়ার দল ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে থাকে। আমাদের কিন্নর মধুসূদন বালক-বালিকা যুবক-যুবতী বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সকলের মনোরঞ্জনে পটু অপেক্ষা ও পটীয়ান্। এ হেন মধুসূদনের গানের সৌন্দর্য্য সঙ্কলনে কাহার না ইচ্ছা হয়? আমরা সেই সৌন্দর্য্যে আজ মধুসূদনের গীতাবলীর সৌন্দর্য্য নিষ্কাশনে সচেষ্ট হইব, তবে তদ্বাগ্ বিভবোঽপি সন্, তদ্গুণৈঃ কর্ণমাগত্য চাপলায় প্রণোদিতঃ" অবশ্য ত্রুটী সহৃদয় পাঠকগণের মার্জনীয়।

আমরা প্রথমেই অক্রুর সংবাদ লইয়া আলোচনা করিব। রাজা কংস পাত্রমিত্র সামন্ত রাজগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সভা মধ্যে উপবিষ্ট আছেন, বকাসুর, অঘাসুর, পুতনা প্রভৃতি কৃষ্ণহস্তে নিহত হইয়াছে শুনিয়া রাজা কংস অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়াছেন, সহসা তাহার চক্ষে কৃষ্ণরূপ দর্শন হইল। সেই সময়ে দেবর্ষি নারদ সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলে রাজা কংস গাত্রোত্থান করিয়া দেবর্ষিকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক আত্মদুঃখ নিবেদন করিয়া বলিতেছেন;

রাগিণী সুরাট—তাল কাওয়ালী।

কি জানি কি হোলো আমার মনে,
কি শয়নে কি স্বপনে কৃষ্ণরূপ হেরি দুনয়নে।
যদি না ভাবি অন্তরে, তবুনা রহে অন্তরে

কি আছে তার অন্তরে,
অন্তরে তা বুঝ্‌তে পারিনে,

* * * * * *

যে দিকে যাই যেদিকে চাই, দেখতে কৃষ্ণ পাই
কৃষ্ণ ভেবে কৃষ্ণবর্ণ বুঝি কৃষ্ণ পাই
কালরূপ চিনিনে কে সে, নাম বুঝি তার হৃষীকেশ,
ধরিল আমার কেশে
সূদন বলে শেষে জান্‌বে মনে

অক্রুর সম্বাদের প্রথম গান এই! পাঠক দেখুন, মধুসূদনের কতদূর রচনা কৌশল! আর মধুসূদনের শাস্ত্রাধ্যয়ন না থাকিলেও তাহার শাস্ত্রজ্ঞানটা কিরূপ প্রবল। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ শ্রী গীতায় বলিয়াছেন—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং"

অর্থাৎ যে আমাকে যে ভাবে দর্শন করে, আমি তাহাকে সেই ভাবে ভজনা করি। কংস শ্রীকৃষ্ণকে শত্রুভাবে দেখিতেন, শ্রীকৃষ্ণ তাহার বধসাধন করিয়াছিলেন, কিন্তু কংসের হৃদয় কৃষ্ণচিন্তায় পরিপূর্ণ হইয়াছিল, হৃদয়ের অন্ধি সন্ধি সব স্থান কৃষ্ণরূপে পূরিয়া গিয়াছিল। শয়নে কৃষ্ণ, স্বপনে কৃষ্ণ, ভোজনে কৃষ্ণ, ভ্রমণে কৃষ্ণ, ঊর্দ্ধে কৃষ্ণ, অধঃ কৃষ্ণ, কংসের চিন্তার ব্যষ্টি ও সমষ্টি কৃষ্ণ, তাই মধুসূদন কংসের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন—

যে দিকে যাই, যে দিকে চাই, দেখ্‌তে কৃষ্ণ পাই,
কৃষ্ণ ভেবে কৃষ্ণবর্ণ বুঝি কৃষ্ণ পাই।

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বৈরিভাবাপন্ন হইলেও কৃষ্ণগতমনাঃ কংসকে ত্যাগ করিতে পারেন নাই, তাই তাঁহার হৃদয়ে আসিয়া দেখা দিতেন। যে ভাবে যেই ভজনা করুক না কেন, কৃষ্ণ সেই ভাবেই তাহার সাধ পূর্ণ করিবেন, তাই ভগবানের রাসলীলা, তাই তাঁহার কেলিকুঞ্জ, তাই তাঁহার কৃষ্ণ কালীরূপ! কংস শত্রু ছিল, শত্রু হইয়াই তিনি তাহার মোক্ষসাধন করিয়াছিলেন! মধুসূদন ভগবদ্ভক্তির কোন সন্ধানই রাখিতেন না, কিন্তু তাহার সঙ্গীতে সেই মহাতত্ত্বের স্ফুটাভাষ পরিলক্ষিত হইয়াছে। আবার এই সঙ্গীতে মধুসূদনের বিজ্ঞান রহস্যটাও দেখুন! একাগ্রচিত্তে কোন বিষয়ের চিন্তা করিলে হৃদয়ে তত্তৎ বস্তুর পূর্ণছবি প্রতিভাত হইয়া থাকে, ইহা ইংরাজীর Concentration fo mind. মধুসূদন লেখা পড়া না জানিলেও এ সূক্ষ্ম তত্ত্ব তাঁহার অবিদিত

ছিল না। আবার কোন বিষয়ের নিগূঢ় চিন্তায় মন সন্নিবিষ্ট করিলে পরে যদি তাহা হইতে মন ফিরাইয়া লইতে চেষ্টা করা যায়, তথাপি সেই চিন্তা সেই ভাব সেই ছবি অজ্ঞাতসারে তাহার হৃদয়ে আসিয়া আবির্ভূত হইয়া থাকে; তাই মধুসূদন কংসের মুখে গাইয়াছেন—

যদি না ভাবি অন্তরে, তবু না রহে অন্তরে

* * * * * *

যদি থাকি আপন মনে, না করি মনে,
সে কেমনে মনে মনে উদয় হয় মনে।

পাঠক দেখুন, এক সঙ্গীতে মধুসূদনের কিরূপ পাণ্ডিত্য প্রকাশিত হইয়াছে। এখনও হয় নাই, আরো বাকী আছে। সকলেই বোধ হয় জানেন, ভয়ের মাত্রা অধিক হইলেই দৃষ্টি বিভ্রমও ঘটিয়া থাকে (Vision Distorted.) ভীতি বিহ্বলতায় কেহ কেহ তালগাছের ন্যায় দীর্ঘাকৃতি ভূত মূর্ত্তি দেখিয়াছেন বলিয়া শুনা গিয়াছে, জ্যোৎস্নালোকে, দাঁড়া কঞ্চির স্তূপের উপর শুভ্র বস্ত্র আস্তৃত দেখিয়া শুক্লবসনা প্রেতিনী ভ্রমে কেহ কেহ থরহরি কাঁপিয়াছেন, ভয়জনিত দৃষ্টি বিভ্রম অনেকেরই ঘটিয়া থাকে, কৃষ্ণের ভয়ে কংসের হৃদয় পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, তাহাতে আবার অঘাসুর বকাসুর প্রভৃতির নিধনে কংসের ভয়ের মাত্রা নিতান্তই বাড়িয়া উঠিয়াছিল, তাই মধুসূদন কংসের মুখে সেই ভীতি বিহ্বলতায় কিরূপ পরিচয় দিয়াছেন, পাঠক তাহাও একবার দেখুন—

কালরূপ চিনিনে কে সে, নাম বুঝি তার হৃষীকেশ,
ধরিল আমার কেশে,
সূদন বলে শেষে জান্‌বে মনে।

কংস এতক্ষণ কৃষ্ণরূপ কৃষ্ণকে চিনিয়াছিলেন, ক্রমে ভয়ে জড়সড় হইয়া কালরূপটীই দেখিতে লাগিলেন কিন্তু চিনিতে পারিলেন না, সে কালরূপ কার। "কালরূপ চিনিনে কে সে।" আবার কথঞ্চিৎ ধীরতা অবলম্বন করিয়া লুপ্ত স্মৃতির কথঞ্চিৎ পুনরুদ্ধার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "নাম বুঝি তার হৃষীকেশ!"

পাঠক এখন দেখুন, কৃষ্ণের সহস্র নাম আছে, কিন্তু কংস অনুমানে বলিলেন, "নাম বুঝি তার হৃষীকেশ", কেন, কংস কি আর কোন নাম খুঁজিয়া পাইলেন না? তা পাইবেন কেন? হৃষীকেশ অর্থে (হৃষীক + ঈশ)

হৃদয়ের ঈশ্বর, কৃষ্ণ কংসের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন, সুতরাং তিনি অন্য নামে তাঁহাকে আর কি করিয়া অভিহিত করিবেন? কাজেই তাঁহার মুখ দিয়া হৃষীকেশ বই আর কোন্ নাম নির্গত হইতে পারে? মধুসূদনের ইহা কম কৃতিত্ব নহে! বর্ত্তমানে বড় বড় কবিও সব সময়ে এরূপ সার্থক শব্দ ব্যবহার করিয়া উঠিতে পারেন না! পাঠক দেখিলেন, মধুসূদনের ক্ষমতা কতদূর! তার উপর আবার রচনার পরিপাট্য ও দেখুন! "অন্তরে" কথার কেমন পুনঃ পুনঃ সরস উল্লেখ, "মনে" কথারই বা কেমন সুচারু অনুপ্রাস! প্রবন্ধ বাহুল্যভয়ে অন্য আর গানগুলির আলোচনা করিলাম না, বারান্তরে পুনরবতারণা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়।

মনোরমা।

[রূপকথা।]

"আ মরি মরি! এমন সোণার চাঁপার উপর ভগবান কেন বজ্রঘাত ক'রলেন। বিধাতার মুখে আগুন, তোকে দেখ্‌লে আমার প্রাণ কেমন করে।" এই বলিয়া মুখুজ্জেদের বড় বউ মনোরমার গাল টিপিয়া দিল। মনোরমা মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল। পিছু পিছু বড় বউও ছুটিলেন, মনোরমার আঁচল ধরিয়া, টানিয়া আনিয়া কাছে বসাইলেন। আরসী চিরুণী, দড়ি, ফিতা আনিয়া রাখিলেন, তাহার একপিট চুল ধরিয়া দক্ষিণ করের অঙ্গুলী সঞ্চালন দ্বারা কলাইয়া দিতে লাগিলেন, ধীরে ধীরে কেশাগ্রভাগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জটাগুলি ছাড়াইয়া দিতে লাগিলেন।

মনো একটু যেন বিরক্তির ভাবে, কেমন যেন কাতরকণ্ঠে বলিল, "ছি বউদিদি, কি কর, আমার সঙ্গে কি আর রঙ্গ ভাল দেখায়? আমি কিসের জন্য চুল বাঁ'ধব, আমার সিঁতেও সিন্দুর পড়বে না, আমার চুলের বাহার দেখবার ত আর কেউ নেই, আমায় আর জ্বালিও না।" এই বলিয়া মনো ধীরে ধীরে বস্ত্রাঞ্চলে নয়নযুগল ঢাকিল। সম্মুখে মুকুর, সে মুকুরে মনোরমার শ্বেত বস্ত্রাবৃত মুখমণ্ডল শরতের সাদা মেঘঢাকা পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় প্রতিবিম্বিত হইল। পশ্চাৎ হইতে মুখুর্জ্জেদের বড় বউ সে প্রতিবিম্ব

দেখিলেন; দেখিয়া বুঝিলেন যে, মনোরমা কাঁদিতেছে, অমনি তাঁহারও বড় বড় দুইটি চক্ষুর কোণ হইতে দুইটি মুক্তাবিন্দু গড়াইয়া পড়িল। সে বিন্দুর পশ্চাতে আরও অগণিত বিন্দু মালাকারে গড়াইয়া আসিতে লাগিল। বড় বধূও কাঁদিলেন, কিন্তু তাই বলিয়া মনোরমার কেশবিন্যাস কার্য্য হইতে বিরত হইলেন না। কহিলেন, "মনি, তোর এত চুল, আমি হাতে আঁকড়ে পাইনে যে, হা ভগবান!"

মনো।—ও চুল পুড়িয়ে ফেলব বউ দিদি, বাবা মাথা মুড়োতে দিলেন না, মা এ চুল ছাঁটিয়া দিতে পারিলেন না, এখন দেখচি, আমাকে এ চুলে কাঁচি বসাতে হবে।

বউ।—বিধবা হ'লে মেয়ে-মানুষ মরে না কেন? তুই যদি মরতিস, আমি কাঁদতুম, কিন্তু সে একদিনের জন্য; এখন নিত্য দেখিব, নিত্য কাঁদিব, রাবণের চিতা আর কাকে বলে, তোরাই রাবণের চিতা।

মনো।—তোমাদের দীর্ঘ নিশ্বাস এই রাবণের চিতার অনুকূল বায়ু, তোমার চক্ষের জল ইহার ঘৃতাহুতি, আর এই কেশবিন্যাস চিতায় ধূপধূনার প্রক্ষেপ। কেমন, নয় কি? বড় বধূ আর কথা কহিলেন না। মনোরমার আজানুবিলম্বিত কেশরাশি বেণীবদ্ধ করিয়া মাথায় একটি অপূর্ব্ব খোঁপা বসাইয়া দিলেন। মনোরমা অব্যাহতি পাইল, ধীরে ধীরে কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

২

শ্রীযুক্ত রামবন্ধু মুখোপাধ্যায় যোত্রবান গৃহস্থ,সুব্রাহ্মণ,সদাচারী এবং দাতা। গ্রামের সকলেই বলিতেন, মুখুজ্জে মহাশয়ের পুণ্যের সংসার, এমন কি, যদি কোন প্রতিবেশী অতি প্রত্যুষে মুখুজ্জে মহাশয়ের দর্শন লাভ করিত, তাহা হইলে মনে মনে নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিত,—ভাবিত, আজিকার দিনটি ভাল যাইবে কিন্তু পুণ্যের সংসার হইলে কি হয়, বিধাতার নিকট পাপ পুণ্যের বাছাই বিচার নাই। মুখুর্জ্জে মহাশয়ের সংসারসুখে বঞ্চিত ছিলেন, তাঁহার তিন পুত্র, কিন্তু দুইটি নিরুদ্দেশ, জ্যেষ্ঠ জন্মান্ধ, তাই সে গৃহে আছে, একমাত্র কন্যা মনোরমা সম্প্রতি বিধবা হইয়াছে। সংসারসুখ যদি পুণ্যের ফলস্বরূপ হয়, তাহা হইলে মুখুজ্জে মহাশয়ের পুণ্যকে পুণ্য বলিয়া গণনা করা চলে না, কিন্তু স্বয়ং মুখুজ্জে মহাশয় কখনই এই সকল সংসার দুঃখে কখনই ক্লেশ বোধ করিতেন না, তিনি সংসারের কোন কথাই কাহার সহিত

কহিতেন না, সে প্রশান্ত মুখমণ্ডলে কখনই চিন্তার শ্যামছায়া পড়িত না, ঘড়ির কাঁটার মত যথা নির্দ্দিষ্টকালে পূজা-আহ্নিক সন্ধ্যা-বন্দনা করিতেন, পুরাণ পাঠ করিতেন এবং বিষয়কর্ম্ম সম্পাদন করিতেন।

সন্ধ্যাকাল। গৃহস্থ-গৃহে সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালা হইয়াছে, মুখুজ্জে মহাশয় সন্ধ্যা আহ্নিক সমাপন করিয়া দুর্গার স্তব পাঠ করিতেছেন, এমন সময় গৃহিণী ঠাকুরাণী তাঁহার নিকট আসিয়া বসিলেন, অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া স্বামী মুখে স্তব পাঠ শুনিলেন, শেষে উভয়ে জগদম্বার উদ্দেশে প্রণাম করিলেন।

"একি! তুমি যে! তুমি কখন এলে! দুর্গাপদকে জল খাবার দিয়েছ, বউমা খাবার খেয়েচেন, মোনা কোথায়? তার খাবারের একটু বিশেষ আয়োজন হইয়াছে? আজ যে দশমী!" উপর্য্যুপরি এতগুলি প্রশ্ন করিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় নীরব হইলেন, গৃহিণী কিন্তু তাঁহার কথা শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, ধীর ভ্রমরগুঞ্জন হইতে তীব্র কেকারব পর্য্যন্ত সে রোদন ধ্বনি ছাড়িয়া উঠিল, সে ধ্বনির প্রতিধ্বনিতে সমগ্র পল্লী পরিপূর্ণ হইল। মুখোপাধ্যায় মহাশয় অস্থির হইলেন, ভাঙ্গা গলায় বলিলেন, "তুমি দেখচি আমায় দেশ ছাড়া করবে, শ্যামাপদ ও রামাপদ যে পথে গিয়াছে, আমাকেও সেই পথে যাইতে হইবে। যা হবার তা'ত হয়ে গিয়েছে। পূর্ব্বজন্মে উভয়ে অনেক অসৎকর্ম্ম করেছি, সে কর্ম্মভোগ এ জন্মে ভুগচি, কেঁদে আর করবে কি, তোমার কান্না শুনলে মনোরমা যে অস্থির হয়ে পড়বে, তার মুখ চেয়ে তুমি স্থির হও, তাকে স্থির কর, আমার সংসারের মান রক্ষা কর।"

গৃহিণী মুখে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "ওগো, আমি যে আর পারিনে, আমার বুকটা যে কেমন করে ওঠে, পাথর হলে ফেটে যেত, মাটী হলে ধূল হ'ত, পুরুষ হলে হয় ত পাগল হ'ত, মেয়ে মানুষের শরীর তাই সব সহ্য হয়।"

মুখুজ্জে।—মেয়ে যদি খেয়ে পরে থাকলে তোমার এত সুখ হয়, তবে ওকে শ্বশুর বাড়ী পাঠিয়ে দাও, কলিকাতার বাবু মনোরমাকে আহার আচ্ছাদনে সুখে রাখবে, আর শ্বশুর বাড়ী থাকলে আমাদের সকল বালাই চুকে যাবে, আমার বয়স হয়েচে, ইষ্ট চিন্তা করবার সময় হয়েচে, এখন আমি পরের ভাবনা ভাবি কেন, আমি কালই কলিকাতায় চিঠি লি'খব, তারা এসে তাদের বউ নিয়ে যাক, যার যে ভাগ্যে আছে, সে তাই ভোগ করবে, আমরা করব কি।"

এই পরামর্শের পর একসপ্তাহ কাটিয়া গেল, মনোরমার দেবর আসিয়া তাহাকে লইয়া গেলেন।

৩

কলিকাতার বহুবাজারের একটি গলিতে মনোরমার শ্বশুর বাড়ী, মনোরমার শ্বশুরকুল কলিকাতার বনেয়াদি ব্রাহ্মণবংশ, সমাজে যথেষ্ট মান মর্য্যাদা আছে, জমিদারি হইতেও বৎসরে পর্য্যাপ্ত আয় হয়, বৃহৎ সংসারের সকল অভাব সঙ্কুলান হইয়া যায়।

মনোরমা শ্বশুর গৃহের এক প্রকোষ্ঠে বসিয়া আছেন, তাঁহার তিন যা তাহার সহিত রহস্যালাপ করিতেছেন।

মনো। দেখাতে পারবি ভাই। তোদের মুখে গল্প শুনে আমার সাধ মেটেনা, আমাকে দেখাতেই হবে।

মেজযা।—দেখিস লো, দেখিস, তোর ত আর এ জীবনে হবে না, তুই দেখেই সাধ মিটিয়ে নে।

বড়যা।—ছি, ওসব কি বিধবাদের দেখতে আছে, তোরা যেমন অল বড্ডে, তাই ঘরের কথা বলচিস, ঐ যে বলে, নূতন কাকে কি খেলে পরে কেমন হয়ে যায়, তোদের তাই হয়েচে। ছি বোন! তুমি এসব কথায় থেকনা, তুমি জপ তপ কর, পূজা আহ্নিক কর, আর আমাদের ছেলে-দের মঙ্গল কামনা কর, ভাঙ্গা কাঁচের বাটী কি আর জোড়া লাগে!

মনো।—না বড় দিদি, তুমি বারণ ক'রনা, আমি দেখবই, নিত্যি নিত্যি ওদের আর গালগল্প শুনতে পারি নি। ছোট বউ, আজ ঠাকুর পো যখন ঘরে আসবো, আমায় ডাকিস ত একবার, দেখতে হবে। "বৃষবৃক্ষ" পড়ে, কৃষ্ণকান্তের উইল পড়ে, কিছু বোঝা যায় না, যখন সাধ হয়েছে, তখন সাধ মিটুতেই হবে।

বড়যা।—তবে তুমি মর, যে পোকা আগুনে পড়তে চায়, ঘরের সারসি বন্ধ করে রাখলেও সারসির উপরে ঠোকর মারে, শেষে ঠোক্কর খেয়েই মরে যায়। দেখচি, তোর কপালে তাই আছে। মরতে হয় নিজে মর, আর কাওকে মেরনা, সোণার সংসারে কালী ঢেলনা।

মুখখানি লাল করিয়া মনোরমা কতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, অনেকক্ষণ কাহার সহিত কোন কথা কহিল না। তাহাকে নীরব দেখিয়া বড়বউ উঠিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে মেজবউ ঠাকুরাণীও উঠিয়া গেলেন, কেবল

রহিল ছোট বউ। মনোরমা এইবার ধীরে ধীরে বলিল, "ছোট বউ, আমার ঘাড়ে ভূত চেপেচে, আমি দেখবই, তুই কিছু মনে করিস নে ভাই, আমার এ সাধটা তোকে পূর্ণ করতেই হবে, আজ রাত্রে আমি ঠিক থা'কব, সিড়ির দোরের জানলার কাছে বসে আঁড়ি পেতে সব দেখব, ছোট ঠাকুর পোর নূতন বিয়ে হয়েছে, তুইও নূতন ঘর করতে এসেচিস, এই সময়েই ত আড়ি পাড়িতে হয়, তুই ঘরের প্রদীপ নিবুসনে।

ছোটবধূ অর্দ্ধাবগুণ্ঠিত মস্তক সঞ্চালন দ্বারা অভিমত প্রকাশ করিয়া সলজ্জভাবে ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল।

৪

মনোরমা শ্বশুর বাড়ী আসিয়া নূতন মানুষ হইয়াছে। সে এখন সাড়ী পরে, ৰডিজ গায়ে দেয়, নানা প্রকারে স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহার করে, পঞ্চ-ব্যঞ্জনের সহিত আতপ তণ্ডুল, ঘৃত দুগ্ধ বাদাম পেস্তা প্রভৃতি আহার করিয়া থাকে, সন্ধ্যার পর লুচি পরেটা প্রভৃতি গুরুপাক দ্রব্য ভোজন করে, এবং সারাদিন নাটক নভেল পাঠ করে, তাহার সিমন্তে সিন্দুর বিন্দু নাই, মনিবন্ধে লৌহ বলয় নাই, বাকি সর্ব্বাঙ্গেই সধবার সর্ব্বলক্ষণই বিরাজ করিতেছে।

সঙ্গদোষে—শিক্ষার দোষে মনোরমার এই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। মনো-রমার শাশুড়ী, মনোরমাকে বিধবার ব্রহ্মচারিণী বেশে দেখিতে পারিতেন না। তিনি প্রায় বলিতেন, "সেজ বৌমা থান পড়িয়া বেড়াইলে, আমার প্রাণ কেমন করে, আর কয় বৌ যেমন খাইয়া পরিয়া হাসিয়া বেড়ায়, সেজ বৌও তেমনি বেড়াক্, যা হবার তাত হয়ে গিয়েচে, তাই বলে কি খাওয়া পরা থেকে বঞ্চিত থাকবে।" কাজেই মনোরমার পোয়া বার, সে যাহা ইচ্ছা, তাহাই করে, যাহা চায়, তাহাই পায়, মনোরমা একটু মুখরাও হইয়াছিল, বাটীর ঝি বৌ তাহাকে কোন বিষয়ের কিছু উল্লেখ করিয়া বলিলে, সে এক কথার জায়গায় দশ কথা শুনাইয়া দিত, শাশুড়ী ঠাকুরাণী প্রায়ই তাহার পক্ষাবলম্বন করিয়া অন্য ঝি বৌদের তিরস্কার করিতেন, কাজেই মনোরমার কোন কথায় কেহ থাকিত না।

জল মাটিতে ঢালিলেই কাদা হয়, আর গড়াইয়া নীচে গিয়া পড়ে, যতক্ষণ জল ধাতু আধারে বা পাত্রে থাকে, ততক্ষণ নির্ম্মল পানীয় থাকে, কিন্তু একবার পাত্র হইতে গড়াইয়া পড়িলে উহা পঙ্কিল হইয়া যায়, মনের

প্রবৃত্তি মনের ভিতর লুকাইয়া থাকিলে এক রকম থাকে; বহুকাল হৃৎ-কোটরে লুকান থাকিলে উহার সকল ময়লা ধীরে ধীরে কাটিয়া যায়, শেষে নির্ম্মল স্বচ্ছ পবিত্র হয়। মনোরমার মনোবৃত্তি এতকাল মনোমধ্যেই লুকান ছিল। কালে উহা স্বচ্ছ এবং পবিত্র হইতে পারিত, কিন্তু মনো-রমা বিলাসের পথে প্রবৃত্তিকে ছাড়িয়া দিল। আর কি রক্ষা আছে? সে প্রবৃত্তি এখন দ্রুতবেগে ধূলিপূর্ণ মাটির উপর দিয়া বহিয়া যাইবে। বিষ্ঠা চন্দনের বিচার না করিয়া, নিজ তরল দেহে সকল সামগ্রীই গলাইয়া মিশাইয়া লইয়া যাইবে, শেষে পাপের চির লবণাক্ত অনন্ত অম্বুধিতে গিয়া মিশিবে।

মনোরমার আর রক্ষা নাই।

৫

অন্ধকার রজনী, এত বড় কলিকাতা সহরেও সব অন্ধকার! গ্যাসের আলোগুলাও যেন অন্ধকারের সহিত ঠেলাঠেলি করিয়া শেষে অন্ধকারের অঙ্গে মিশাইয়া যাইতেছে। ক্বচিৎ কদাচিৎ এক আধখানা ছ্যাকড়া গাড়ী দূরে বড় রাস্তা দিয়া যাইতেছে আর তার নানাপ্রকারের ঝঙ্কার শব্দ, গৃহস্থের নিস্তব্ধ কক্ষে প্রতিধ্বনিত করিয়া নগরের ঢাকা অন্ধকার রাশিকে যেন সজীব করিতেছে; গলির পথে এক একটা লোক হন হন করিয়া বেগে যাইতেছে, দ্বিতলের আলোকিত বাতায়ন-পথ হইতে নীচে তাকা-ইয়া দেখিলে বোধ হইতেছে, যেন এক একটা অন্ধকার পিণ্ড সশব্দে গড়াইয়া যাইতেছে।

সব নিস্তব্ধ, সব অন্ধকার মাখা। কেবল ছোট বধূর কক্ষে আলো জ্বলিতেছে, আর কক্ষ পার্শ্বে সিঁড়ির দুয়ারের উপর মনোরমা বসিয়া আছে, তাহার মনের মধ্যে আগুন জ্বলিতেছে; সিঁড়ির দরজার একদিক-কার ভিনিসিয়ানের পাকি খোলা আছে, আর মনোরমা পাকির ফাঁকে বড় বড় চক্ষু দুটি রাখিয়া নয়নরূপী হইয়া বসিয়া আছে।

ধীরে ধীরে কক্ষের দরজা ঠেলিয়া ধীরে ধীরে একটি কুড়ি বৎসর বয়সের সুন্দর যুবা সে কক্ষে প্রবেশ করিল। ইনিই ছোটবাবু; ছোটবধূ স্বর্ণ লতিকার ন্যায় দুগ্ধফেণনিভ শয্যায় এলাইয়া শুইয়া আছে, ধীরে ধীরে ছোটবাবু সে লতিকাপার্শ্বে শয়ন করিলেন। গৃহের প্রদীপ নির্ব্বাণ হইল।

অজগর সর্পের ন্যায় একটি ফুৎকার করিয়া মনো স্বস্থান ত্যাগ করিয়া অন্ধকারে বারণ্ডায় গিয়া দাঁড়াইল। অমন যে চাপ চাপ অন্ধকার, মনোরমার নয়ন দীপ্তিতে সে অন্ধকার যেন বিদ্ধ হইতে লাগিল। সাপের লেজে পা পড়িলে সে যেমন গর্জায়, সে যেমন ব্যর্থ প্রয়াসে পাষাণের উপর দংশায়, মনোরমাও তেমনি ঘোর রজনীতে সর্পের ন্যায় নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল এবং বিধাতাকে লক্ষ্য করিয়া ব্যর্থ অভিসম্পাত করিতে লাগিল।

মনোরমার ঘরে আগুন লাগিয়াছে, সে এইবার বেড়া আগুনে পুড়িয়া মরিবে।

৬

একখানি তিন দাঁড়ের ভাউলিয়া মূলাজোড়ের ঘাট ছাড়াইয়া তীব্রবেগে যাইতেছে, একে জোর দক্ষিণে বাতাস, তার উপর দ্বিতীয়ার কোটাল জোয়ার, তাহার উপর তিনখানি দাঁড় সজোরে চলিতেছে, ভাউলিয়া নক্ষত্রবেগে উত্তরদিকে যাইতেছে, ভাউলিয়ার ভিতরে একটী সুন্দর যুবাপুরুষ কাহার জানুর উপর মাথা দিয়া শুইয়া আছে। ওকে ও? ও যে সেই মনোরমা! মনোরমা অমন শুষ্ক কেন? চক্ষু দুইটি প্রভাহীন, চক্ষের কোলে কালি পড়িয়াছে, সুন্দর সরস অধর যুগল শুকাইয়া ধূলিপূর্ণ হইয়াছে।

যুবক।—তুমি কাঁদিতেছ কেন, আমি তোমাকে স্ত্রীর মতনই রাখিব, নানা সুখে সুখী করিয়া রাখিব।

মনো।—তুমি যে আমায় বিবাহ করিবে বলিয়াছিলে! আমি তোমার পরিণীতা ভার্য্যা হইয়া থাকিব বলিয়াই আমার অত সুখের শ্বশুরালয় ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি।

যুবক।—তাও কি হয় মনোরমা? আমার গৃহ-সংসার আছে, পিতামাতা আছেন, আত্মীয়স্বজন ও কুটুম্ব আছে, আমাকে সমাজ শাসন মানিয়া চলিতে হয়, আমি কি বিবাহ করিতে পারি?

মনো।—তবে আমায় আনিলে কেন? আমি সুখে দুঃখে, যৌবনে জরায় তোমার হইয়া থাকিব, আর তুমি আমার হইয়া থাকিবে;—সেই আশায় আমি পরকালের ভাবনা ভুলিয়া তোমার সঙ্গে আসিয়াছি।

যুবক।—মনোরমা, আমি তোমার; আমার ঐশ্বর্য্য সম্পত্তি তোমার; ইহার অধিক মানুষ মানুষকে দিতে পারে না।

মনো।—পারে বই কি! দিতে জানিলেই পারে। তোমার সংসার সুখ আমাকে দাও না? আমি আর কিছু চাই না, তোমার সেবিকা হইয়া থাকিব, তোমার বাড়ীর চাকরাণীর কাজ করিব, আমায় এই অধিকারটুকু দাও। আমি আর কিছু চাই না।

যুবক।—ইহা আমার ক্ষমতার অতীত, যেখানে আমার পিতামাতার পবিত্র আসন আছে, সেখানে তোমায় যাইতে দিব কেমন করিয়া? বিশেষ তুমি যে বিধবা!

মনো।—তুমি ত বিবাহ কর নাই, ইচ্ছা করিলে তুমি ত বিধবা বিবাহ করিতে পার! আমাকে বিবাহ কর না কেন? আমি কি তোমার পত্নী হইবার যোগ্যা নহি?

যুবক।—কেমন করিয়া বলিব! তুমি আমার রূপমুগ্ধ হইয়া বিলাস-সুখে সুখী হইবার জন্য আমার নিকট আসিয়াছিলে, আমিও তোমাকে দেখিয়া কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়া একটা দুষ্কর্ম্ম করিয়া ফেলিয়াছি। যখন দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি, তখন শেষ পর্য্যন্ত দেখিব। সংসারে আসিয়া অনেক অপকর্ম্ম করিলাম। এটাইবা বাকি থাকে কেন! তাই কলেজের লেখা পড়া ছাড়িয়া, বি-এল পরীক্ষার ভাবনা ভুলিয়া তোমাকে লইয়া পলাইয়া যাইতেছি। ওকালিত ত পয়সার জন্য! আমার ঢের পয়সা আছে, বারা যাহা দিয়াছেন, তাহাই ওড়াইতে আমার এ জীবন কাটিয়া যাইবে। পয়সা রোজগারের ভাবনা জন্মান্তরে হইবে। ওসব বাজে কথা রাখ, এস, দুজনে একটু আমোদ করা যাক, এই বলিয়া যুবক মনোরমার মধ্যদেশ বাহুবেষ্টিত করিলেন। ধীরে ধীরে মনোরমা তাহার হাত খুলিয়া লইল এবং ধীরে ধীরে বলিল, "আমি জানিতাম না, আমি কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি, ইহা অপেক্ষা আমার মরণ ভাল ছিল।"

যুবক।—ছি ছিঃ মনোরম! কোন্‌টা সৎকর্ম্ম, কোন্‌টা দুষ্কর্ম্ম জাননা! ভাল করচি, কি মন্দ কচ্চি, তা বোঝ না! আমি জেনে শুনে দুষ্কর্ম্ম করি, কারণ সৎকর্ম্ম করা আমার সামর্থ্যে কুলায় না; মরণ সুখ ত সকলেরই ভাগ্যে আছে। মনোরমা, এখন এস না দুইজনে দুষ্কর্ম্মের সুখানুভব করিয়া তৃপ্তিলাভ করি।

মনোরমা।—অমন কথা বলিও না, তুমি রাখিলে আমি থাকিব, তুমি অমন ব্যবহার করিলে আমি আত্মহত্যা করিব। তুমি আমায় বিবাহ কর।

যুবক।—সে কর্ম্ম হইয়া গিয়াছে। সুন্দরী তোমাকে সে কথা বলি নাই, বলিলে তুমি হরিণীর ন্যায় পলাইতে। তুমি বিলাসমোহে আত্মহারা হইয়া আমার নিকট আসিয়াছিলে। তুমি যে বিমূঢ়া নারী হইয়া আমার নিকট আসিয়াছিলে! তোমাকে এখন সোণার খাঁচায় সোণার পাখী করিয়া পুষিয়া রাখিব; তুমি আর কোথায় যাইবে? এখন দিনকয়েক আমার সাধ মিটাও, পরে যা ইচ্ছা—তা করিও।

৭

হুগলী খোল ঘাটের নিকট সেই ভাউলিয়া বাঁধা আছে, শুক্লপক্ষের চতুর্থীর চাঁদ গগনপ্রান্তে ডুবিয়া গিয়াছে, মাঝিমাল্লা সকলেই শুইয়াছে, যুবক মদ্যপানে বিভোর হইয়া ভাউলিয়ার মধ্যে অঘোর নিদ্রায় অভিভূত। মনোরমা বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। সম্মুখে প্রকাণ্ড জুবিলী ব্রিজ অন্ধকারের রেখার মত দেখা যাইতেছে, মনোরমা সেই কঠিন ঘন অন্ধকার রেখাই দেখিতে লাগিল। দেখিয়া দেখিয়া বুঝিল যে, প্রবৃত্তির খরতর প্রবাহের উপর সেতু বাঁধিতে হইলে কত কঠোরতার প্রয়োজন, কত বিদ্যা সাধনার প্রয়োজন! সংসারক্ষেত্রে আসিয়া সকলকেই কিছু নদী প্রবাহকে বাঁধিতে হয় না। যাহারা বিধবা, যাহারা যতি ব্রহ্মচারী, তাহাদিগকেই এই এঞ্জিনীয়ারির উৎকট সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে হয়। সিদ্ধি ত দূরের কথা, মনোরমা সাধনার চেষ্টাতেই ভীত হইয়াছিল এবং প্রবৃত্তির ললিত তরলপ্রবাহ দেখিয়া আত্মহারা হইয়া তৃণখণ্ডের ন্যায় উহাতে ঝম্পপ্রদান করিয়াছিল। মনোরমা মৃৎপিণ্ড নহে যে, গলিয়া জলে মিশাইয়া যাইবে, সে নবীন সরস তৃণখণ্ডমাত্র, তাই ডুবিয়াও ডুবে নাই।

মনোরমা এই প্রকারের অনেক ভাবনা ভাবিল, শেষে দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আমার মরণই ভাল, আমি যে সুখের আশায় আসিয়াছিলাম, সে সুখও পাইলাম না। আর যে সুখ পাইয়াছি, সে সুখ ক্ষণিকমাত্র, সে সুখে দুঃখই অধিক। সমাজ আমার বিরোধী, শাস্ত্র আমার বিরোধী। আমার ইহকালও গেল, পরকালও গেল; মা গঙ্গা, তুমি আমায় স্থান দাও, আমার হৃদয়গত রাবণের চিতা নির্ব্বাপিত কর।" এই বলিয়া মনোরমা সেই উত্তাল তরঙ্গ-ভঙ্গময় গঙ্গা প্রবাহে ঝম্পপ্রদান করিল। তরল অন্ধকার রাশিকে যেন উচ্ছলিত করিয়া গঙ্গাবক্ষে একটা কাতর শব্দ হইল। বিস্মৃতির অন্ধকারে বিস্মৃতির তরলপ্রবাহে ক্ষণিক পরে সব ঢাকিয়া গেল।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাঙ্গালা ভাষার লেখক।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

বিষ্ণুচন্দ্র ভ্রাতার আদেশক্রমে গ্রামের কোন লোকের নিকট ইংরেজী শিখিতে আরম্ভ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অধিকাংশ সময় পুস্তক ও সংবাদপত্র পাঠে অতিবাহিত হইত। গৃহে অসংখ্য পুস্তক ছিল, সংবাদপত্রের ফাইল ছিল,—তিনি দিবানিশি তাহাই পাঠ করিতেন। সে সময়ে এখনকার ন্যায় গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় ছিল না; লোকে পাঠশালায় বাঙ্গালা শিক্ষা করিত। পাঠশালার শিক্ষিত বালকেরা মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তক ভাল করিয়া পড়িতে পারিত না; কিন্তু বিষ্ণুচন্দ্রের বাঙ্গালা-শিক্ষা পিতামহের নিকটেই হইত, এবং তিনি বাঙ্গালা পুস্তকাদি ও সংবাদপত্র পাঠ করিয়া পিতামহকে শুনাইতেন। এই সময়ে তিনি একবার জ্যেষ্ঠভ্রাতা মধুসূদনের সহিত কলিকাতায় গিয়াছিলেন। এক দিন বিষ্ণুচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া, মধুসূদন কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। গুপ্ত কবির সহিত বিষ্ণুচন্দ্রের পিতা রাজনারায়ণের বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। কবিবর বিষ্ণুচন্দ্রকে দেখিয়া আনন্দ প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহার জ্ঞান পরীক্ষার্থ মাসিক প্রভাকরের সম্মুখস্থিত ফাইলটী তাঁহাকে পড়িতে দিলেন। প্রথমেই ঈশ্বরচন্দ্রের রচিত দীর্ঘ সন্ধিসমাস পরিপূর্ণ গদ্যময় ঈশ্বর-স্তোত্র। বিষ্ণুচন্দ্র অবলীলাক্রমে তাহা পাঠ করিলেন,—গুপ্ত কবির আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি বিষ্ণুচন্দ্রকে কলিকাতায় রাখিয়া শিক্ষা দিবার জন্য মধুবাবুকে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। কিন্তু অল্প বয়স বিধায় বিষ্ণুচন্দ্র তখন দীর্ঘকাল কলিকাতায় অবস্থান করিতে সমর্থ হন নাই।

এই সময় নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী নাকাশীপাড়ার রাজপুত জমিদারেরা একটী ইংরেজী বাঙ্গালা স্কুল স্থাপিত করেন। বিষ্ণুচন্দ্র শিক্ষা লাভার্থ ঐ স্কুলে প্রেরিত হন। সেখানে কয়েক মাসমাত্র অধ্যয়নের পর মধুবাবু পুনরায় তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া যান এবং গৌরমোহন আঢ্যের স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন। এই স্কুলে অল্পদিন অধ্যয়নের পরেই বিষ্ণুচন্দ্র পীড়িত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হন। কিছুদিন পরে শিক্ষালাভার্থ কৃষ্ণনগরে প্রেরিত হন এবং তথাকার মিশনরি স্কুলে প্রায় এক বৎসর অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে অর্থাৎ ইংরেজী ১৮৫৯ সালে রঙ্গপুর জেলার অধীন কাকিনীয়ার বিচক্ষণ ও বিদ্যোৎসাহী ভূম্যধিকারী শম্ভুচন্দ্র রায় মহাশয় একটী মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন ও একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে বাসনা করেন। মধুসূদন ভাবী সংবাদপত্রের সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হইয়া কাকিনীয়া যাত্রা করেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া তিনি সম্ভবতঃ ১৮৬০ সালে "রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ" নামক সংবাদপত্র প্রচার করেন। ঐ পত্র এখনও জীবিত আছে; কিন্তু মধুবাবুর সহিত তাহার আর কোন সংশ্রব নাই। ১৮৬১ সালে বিষ্ণুচন্দ্র মধুবাবুর সহিত কাকিনীয়ায় গমন করেন, এবং স্বর্গীয় শম্ভুচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের স্থাপিত ইংরেজী বাঙ্গালা স্কুলে একবর্ষ যাবৎ অধ্যয়ন করেন। ১৮৬২ সালে ভ্রাতার সহিত বাটী আসিয়া কিছুদিন তাঁহার পড়াশুনা বন্ধ হইয়াছিল। এই সময় শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের মৃত্যু হয়। মধুবাবু এই জন্য কাকিনীয়ায় যাইতে ইচ্ছুক না হইয়া, ১৮৬৩ সালে প্রথমে কলিকাতায় আগমন করেন। বিষ্ণুচন্দ্র তাঁহারই সঙ্গে ছিলেন, এবং কয়েক মাস ফ্রী চর্চ্চ ইন্‌ষ্টিটিউশনে অধ্যয়ন করেন। নানাকারণে মধুবাবু ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী যাইতে বাধ্য হন। অল্পদিন পরেই মধুবাবু কোন সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া দারজিলিং গমন করেন। বিষ্ণুচন্দ্র ঘোরতর ম্যালেরিয়াজ্বরে আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী ছিলেন। ঐ সময়ে নবদ্বীপ অঞ্চলে ভয়ানক ম্যালেরিয়ার উপদ্রব হইয়াছিল এবং এই উৎপাতে পূর্ব্বস্থলী গ্রাম প্রায় ধ্বংস হইয়া যায়। ১৮৬৪ সালে বিষ্ণুচন্দ্র শিক্ষা-লাভার্থ পুনরায় কৃষ্ণনগরে প্রেরিত হন এবং তথাকার বিদ্যালয়ে নিযুক্ত হইয়া কিছুদিন অধ্যয়ন করেন। ১৮৬৯ সালে কৃষ্ণনগরের এ, ভি, স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে নিযুক্ত হইয়া প্রায় একবর্ষ যাবৎ তিনি অধ্যয়ন করেন।

তখন মধুবাবু ময়নাগুড়ির ডিপুটী কমিশরের হেডক্লার্কের পদে নিযুক্ত ছিলেন। পীড়া-নিবন্ধন ঐ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তিনি দারজিলিং যাইতে বাধ্য হন। তাঁহার আদেশক্রমে বিষ্ণুচন্দ্রও ঐ বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া দারজিলিং গমন করেন। ইহার কিছু পূর্ব্ব হইতেই বিষ্ণুচন্দ্র সংবাদপত্রে লিখিতে আরম্ভ করেন। মধুবাবু ভ্রাতাকে কোন বন্ধুর নিকট রাখিয়া দেশে প্রত্যাগমন করেন। অল্পদিন পরে ময়নাগুঁড়ি পুলিস আফিসে কোন একটী কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া বিষ্ণুবাবু তথায় গমন করেন; কিন্তু অতি অল্পদিনের মধ্যেই পীড়িত হইয়া দেশে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হন।

মধুবাবু ইত্যবসরে এলাহাবাদে আসিয়া একাউণ্টেণ্ট জেনারেলের আফিসে কার্য্যে নিযুক্ত হন। ১৮৬৬ সালের শেষে ম্যালেরিয়া-পীড়িত বিষ্ণুচন্দ্রও এলাহাবাদে আগমন করেন। ইহা তাঁহার জীবনে একটী গুরুতর ফলপ্রসূ ঘটনা। প্রতিকূল ঘটনাবলী নিবন্ধন বিদ্যালয়ে তাঁহার রীতিমত অধ্যয়ন করা হয় নাই; কিন্তু তাঁহার জ্ঞানলালসা ও অধ্যবসায় অত্যন্ত প্রবল ছিল। যদিও বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে পান নাই, তথাপি তিনি নিজ চেষ্টায় যতদূর জ্ঞানবৃদ্ধি করা সম্ভব, তাহা করিতেছিলেন। এইবার তাঁহার পক্ষে শুভযোগ উপস্থিত হইল। তিনি ১৮৬৭ সালে একাউন্টেণ্ট জেনারেল আফিসে প্রবিষ্ট হইলেন। ঐ সময়ে "এলাহাবাদ ইন্‌ষ্টিটিউট" নামক এক সভা ও পুস্তকালয় স্থাপিত হয়। বিষ্ণুচন্দ্র সংবাদপত্রে লিখিতেন বলিয়া, ঐ সভার অবৈতনিক সভ্যরূপে মনোনীত হন। তিনি আফিসে কাজ করিতেন বটে, কিন্তু প্রাতে, সন্ধ্যায় ও রাত্রে—যখনই অবসর পাইতেন, তখনই "ইন্‌ষ্টিটিউট" পুস্তকালয়ে অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইতেন। ৪ বর্ষকাল অনন্যমনা হইয়া অধ্যয়ন করাতে, তাঁহার জ্ঞান অনেক বর্দ্ধিত হইল। একাউণ্টেণ্ট জেনারেল আফিসের কার্য্যে অবসর বেশী থাকিত না, এজন্য সেই কাজ পরিত্যাগ করিয়া, তিনি রেলওয়ে আফিসের কার্য্যে নিযুক্ত হন। মধ্যে স্থানান্তরে সরকারী আফিসে দু একটী ভাল কর্ম্মও জুটিয়াছিল। কিন্তু ইন্‌ষ্টিটিউট্ পুস্তকালয়ের প্রলোভনে ভ্রাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও, তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। এদিকে মেডিকেল কলেজে চিকিৎসা বিদ্যাশিক্ষা করিবার বাসনা তাঁহার নিতান্তই বলবতী ছিল; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে, মেডিকেল কলেজে প্রবেশোধিকার লাভ করা যায় না। এজন্য তিনি এলাহাবাদাস্থ মিশনরিদিগের সহায়তায় ১৮৭১ সালে ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তথাপি ঘটনার প্রতিকূলতাবশতঃ তাঁহার মেডিকেল কলেজে যাওয়া হইল না।

ইহার কিছু পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুস্তফী মহাশয়ের প্রযত্নে এলাহাবাদে "প্রয়াগ দূত" নামক একখানি সংবাদপত্র প্রচারিত হয়। ঐ পত্রের পরিচালন সম্বন্ধে নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হওয়াতে, শশীবাবু উহার সম্পাদকীয় সমস্ত ভার মধুবাবুর হস্তে অর্পণ করেন। পরে "প্রয়াগদূতের" একটী প্রেসও সাধারণের সাহায্যে সংস্থাপিত হয়। মধুবাবুর লেখার গুণে তিন চারি বৎসর পর্য্যন্ত এই পত্রের অবস্থা বেশ উন্নতি ছিল। বলা বাহুল্য, এই কার্য্যে বিষ্ণুচন্দ্র ভ্রাতার সহকারী ছিলেন। ১৮৭৩ সালে বিষ্ণুচন্দ্র এলাহাবাদের গভর্ণমেণ্ট "ল" স্কুলে ভর্ত্তি হন এবং ১৮৭৪ সালে পরীক্ষা দিয়া, জেলাকোর্টের ওকালতি করিবার সনন্দপ্রাপ্ত হন। অতঃপর ১৮৭৫ সালে এলাহাবাদ হাইকোর্টের ওকালতি পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হন। ১৮৭৫ সালের শেষে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, বিষ্ণুচন্দ্র হাইকোর্টে এন্‌রোল হন। ১৮৭৬ সাল হইতে ১৮৮৬ সাল পর্য্যন্ত আজমগড় জেলায় ওকালতি করেন এবং ১৮৮৭ সালের শেষভাগ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত এলাহাবাদ হাইকোর্টে ওকালতি করিতেছেন।

[ক্রমশঃ]

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।

কবিকেশরী

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের এক পরিচ্ছেদ।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

কবিকেশরী রবীন্দ্রনাথের ১৩০৫ সালের প্রথম কর্ম্ম ভারতীর সম্পাদকতা গ্রহণ। ভারতী আজ ২৩শ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। বঙ্গের গৌরব, ঋষিতুল্য মনস্বী দার্শনিক কবি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার জনক। গত ১২৮৪ সালে শ্রাবণ মাসে ভারতী প্রথম প্রকাশিত হয়। দ্বিজেন্দ্র

বাবু কিরূপ যোগ্যতার সহিত ভারতী সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহা বঙ্গের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কাহারও অবিদিত নাই। অতুল্য দ্বিজেন্দ্রনাথের যেমন স্বভাবের তেমনই রচনার অসামান্য মাধুরী। সুতরাং তাঁহার সম্পাদিত ভারতীও যে অতুল্য হইয়াছিল, তাহার আর বিচিত্রতা কি? ভারতীর জন্মকালে রবীন্দ্রনাথ যৌবনে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তখন তিনি জ্যেষ্ঠ সহোদরের সম্পাদিত ভারতীতে নবসুধাক্ষর প্রবন্ধাদি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

কিছুকাল পরে মনস্বী দ্বিজেন্দ্রনাথ ভারতীর সম্পাদন ভার বঙ্গের মুখৌজ্জ্বল্যকারিণী বিদুষী সহোদরা শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর হস্তে অর্পণ করেন। * তিনিও অতিশয় যোগ্যতার সহিত ভারতী সম্পাদন করিয়াছিলেন। কালক্রমে তিনিও ইহার সম্পাদন ভার কন্যাদ্বয়ের উপর দিতে বাধ্য হন। কয়েক বৎসর পরে ভারতীর অবস্থা অত্যন্ত হীন হইয়া পড়ে। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ বন্ধুবর্গের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া 'সাধনা'র পুনঃ প্রচারের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। প্রাচীন ভারতীর হীনাবস্থা দেখিয়া আর সাধনায় হাত না দিয়া, ভারতীর সংস্কারকল্পে ব্রতী হইলেন। ভারতীর সম্পাদন ভার গ্রহণ করিয়া তাহা কিরূপ যোগ্যতার সহিত পরিচালিত করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় দেওয়া বাহুল্যমাত্র। কিন্তু তিনি নানা কারণে ভারতীর সম্পাদন ভার একটী বৎসরের অধিক রাখিতে পারিলেন না। ভারতীর বিদায় গ্রহণকালে ভারতীর কার্য্য আশানুরূপ করিতে পারিলেন না বলিয়া, অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু কবিকেশরীর সিদ্ধহস্তে গিয়া ভারতীর অনেক আশা বর্দ্ধিত হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় যে, একটী বৎসর পরেই ভারতীকে মাসিক পত্রিকার সাধারণ গতিপ্রাপ্ত হইতে হইল। জানি না, বঙ্গদেশে মাসিক পত্রিকাগুলির উপর কি অভিশম্পাৎ আছে। বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শন, বান্ধব, নবজীবন, প্রচার, সাধনা প্রভৃতি বিখ্যাত পত্রিকাগুলিও অকালেই যোগ্যহস্ত হইতে এইরূপে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে! বঙ্গদেশবাসীদিগের সাহিত্যানুরাগের ইহা এক প্রধান পরিচয়!!

রবীন্দ্রনাথ ভারতীর সম্পাদন ভার নিজস্কন্দে লইয়া কেবল উহাতেই

---

* "ভারতী" শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর হস্তে যাইবার পূর্ব্বে কিছুদিন "বালকের" সহিত সংমিলিত হইয়া শ্রীমতী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়। জং সং।

যে বদ্ধ ছিলেন, এমন নহে। "ঐতিহাসিক চিত্র" নামে আর একখানি নূতন ধরণের ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রচারের আয়োজনও চলিতেছিল। উদীয়মান সাহিত্যলেখক "সিরাজদ্দৌলা" প্রণেতা শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ইহার সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথ ঐ ত্রৈমাসিক পত্রিকার প্রচারকালে ইহার একটী সুন্দর হৃদয়গ্রাহী ভূমিকা লিখিয়াছেন। শেষে ঢাকি বহির্বাটীতে বসিয়া ঢাক বাজাইয়া যেমন পূজা বাড়ীর সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া নিশ্চিন্ত, বিনয়ের আধার রবীন্দ্রনাথ তেমনি ঢাকিস্বরূপ ভূমিকা দ্বারা ঐতিহাসিক চিত্রের প্রচার ঘোষণা করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন বলিয়া ভূমিকা শেষ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা জানি, পত্রিকাটীর অঙ্গহীন হইবার আশঙ্কায় তাঁহাকে তন্ত্রধারকের কার্য্যও করিতে হইয়াছিল, এবং পত্রিকাটির দীর্ঘজীবন কামনায় যথেষ্ট অর্থ দান করিয়াছিলেন, বন্ধুবান্ধবদিগের দ্বারা তদর্থে নানাপ্রকারে সাহায্য করিতেও ত্রুটী করেন নাই। পত্রিকাটীর পুষ্টিসাধন ও গৌরববৃদ্ধির জন্য তাঁহার প্রবন্ধবর্ষিণী লেখনীও বিরাম পায় নাই। ইহাকেই রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় কর্ম্ম গণনা করা যায়।

তৃতীয় কর্ম্ম পুত্র শ্রীমান্ রথীন্দ্রনাথের উপনয়ন সংস্কার। রবীন্দ্রনাথ ভারতীর প্রথম সংখ্যা বাহির করিয়া দিয়াই পুত্র রথীন্দ্রনাথের উপনয়ন সংস্কার-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। রথীন্দ্রনাথের উপনয়ন সংস্কার পর্ব্বে কিছু বিশেষত্ব আছে। রথীন্দ্রনাথের উপনয়ন সংস্কার বা আর্য্যসমাজ ও আদি ব্রাহ্মসমাজ সম্মিলন রবীন্দ্রনাথের জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই বৎসর ১০ই বৈশাখ বীরভূম জেলার অন্তর্গত বোলপুর গ্রামস্থিত শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন তীর্থে রথীন্দ্রনাথের উপনয়ন সংস্কারকার্য্য সম্পন্ন হয়। এই তীর্থ ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ের লুপ লাইন বোলপুর ষ্টেশন হইতে প্রায় দুই মাইল দূরবর্ত্তী; ষ্টেশন হইতে শান্তিনিকেতন পর্য্যন্ত বাঁধা পথ, গো-শকটে গমনাগমন করিতে হয়। কিন্তু শক্তিমানজন এই দুই মাইল পথ পদব্রজে যাতায়াত করিতে আনন্দ বৈ কখন ক্লান্তিবোধ করেন না। এই পথ পদব্রজে যাইতে যে শ্রান্তি হয়, শান্তিনিকেতনে উপস্থিত হইলেই তাহার শান্তি হইয়া যায়। শান্তিনিকেতন প্রকৃতই শান্তিরই নিকেতন। সে জন-মানব-শূন্য বৃক্ষলতাদিহীন সুদূর বিস্তৃত প্রান্তরের মধ্যস্থলে লতাপাদপ বেষ্টিত, নানা ফলপুষ্পশোভিত, কোকিল কাকলিকূজিত মহর্ষি দেবের শান্তিনিকেতন আশ্রম বড়ই মনোরম—বড়ই প্রীতিপ্রদ, আশ্রম

প্রাঙ্গণে কোথাও হরিণী শাবকগণ আনন্দে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে, কোথাও গাভীগণ স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া রোমন্থন করিতেছে, কখন বা তাহার বৎসগণ এক এক বার দুগ্ধ পান করিতেছে, আরবার নির্ভয়ে আনন্দে নৃত্য করিতেছে। কোথাও ময়ূরগণ পুচ্ছ মেলিয়া তালে তালে নৃত্য করিতেছে, কোথাও পারাবতকুল ঝাঁকে ঝাঁকে বসিয়া আহার খুটিতেছে, এবং মধ্যে মধ্যে পুংপারাবত গ্রীবা স্ফীতকরতঃ বক্ বক্‌ম্ বক্‌ম্ রবে তালে তালে নৃত্য করিতে করিতে পারাবত-পত্নীকে সন্ত্রাসিত করিয়া তুলিতেছে। চটক পক্ষীর কোন বালাই নাই,—তাহারা দুই চারিটী মিলিয়া কখন প্রাঙ্গনে, কখন আমলকীবৃক্ষে, কখন আশ্রমকুটীরে যথেচ্ছ বিচরণ করিতেছে; কোথাও বৃক্ষের ডালে বসিয়া পুংকোকিল আপনমনে কুহু-উ-উ স্বরে কানন মোদিত করিতেছে, কোথাও চাতক পক্ষী সপ্তমস্বরে আকুল অন্তরে ফটী-ই-ইক জল ফটীই-ইক জল করিয়া নৈশগগণ প্রতিধ্বনিত করিতেছে,—কোথাও হল্‌দে পক্ষী "চোখ গেল" 'চো ও ওক্ গেল' স্বরে মনের অতি ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছে। আশ্রমের অনতিদূরে ক্ষুদ্রকায়া কুপাই নদী ধীরমন্থর গতিতে প্রবাহিত। সেখানে সকল জীবজন্তু নির্ভয় হৃদয়ে আশ্রমের শান্তি উপভোগ করিতেছে। সেখানে জনমানবের কোলাহল নাই, শোকাকুলার ক্রন্দন নাই—আতুরের আর্ত্তনাদ নাই, সে সুন্দর শান্তি-রসাস্পদ পুণ্যতীর্থের স্নিগ্ধতায় নয়নমন পরিতৃপ্ত হয়। সে নির্জ্জন আশ্রম কেবল ভগবানের মহত্ব অনুভব করাইয়া দেয়; শান্তিনিকেতনের গাম্ভীর্য্য যেন কোন মহাপুরুষকে স্মরণ করিবার জন্য অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে। এমন কঠোর প্রাণ কাহারও নাই যে, সে নির্জ্জন আশ্রমে গিয়া পবিত্রস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া ক্ষণকালের জন্য সংসারের মায়ামোহ ভুলিয়া সেই অব্যক্ত ভূমানন্দলাভ করিয়া কৃতার্থ না হয়।

রথীন্দ্রকে সংযত ও উপনীত করিবার এই উপযুক্ত স্থল। [ক্রমশঃ]

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু।

অতৃপ্তি।

যত আশা অভিলাষ মিটিয়াছে প্রিয়তমে,
একদিন যেই আশা—
মরমে অতৃপ্ত ছিল,
শোভিল সে আশা-লতা কত ফুল আভরণে।

অতীতের সেই স্মৃতি আজি যত পড়ে মনে!
যখন প্রথম তারা—
সাধের আকাশে ফুটি,
হাসাইলে, তারা রাণি আশা লোকে সুবরণে!

সেই সন্ধ্যা আসে ধীরে হয় দিবা অবসান,
পশ্চিম গগন গায়,
ঢুলিয়া অরুণ ছবি,
ঢালিয়াছে তরলিত হেম-জল অভিরাম।

অরুণের হেম-বিভা বিভাষিত ফুলবনে,
সেই তুমি অনিমিষে,
দাঁড়াইয়া চিত্রার্পিত ;
স্বপনে স্বর্গের ছবি দেখিলাম এ নয়নে।

রূপসি লো সে সন্ধ্যায় কত শোভা অভিরাম!
ফুলস্তূপে মনোহর,
তুমি লো উদয়শশী!
পশ্চিমে দিবসমণি করে শেষ অভিযান।

সেই সন্ধ্যা, সেই শশী, সেই রবি ডুবে দূরে,
বকুলে কোকিল কুজে,
পাপিয়া ভাসায় দিশি,
মত্তকণ্ঠে দধিমুখ, সন্ধ্যার বাঁশরী পূরে।

সেই দিন গোধূলীর—সে সুরম্য সুষমায়,
অতৃপ্ত প্রাণের ছায়া,
দেখিলাম ফুটিয়াছে,
নীরব সতৃষ্ণনেত্রে—প্রেম দৃপ্ত মহিমায়।

সে বাসনা আশা সাধ অনুরাগ অভিলাষ,
অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা যত,
মরমে মিটিয়া গেল,
বহিয়া অগন্ধ-প্রাণে যূথি সেফালিকাবাস।

মিটিয়াছে যত সাধ সকলি হয়েছে লীন,
ভুলিয়াছি সমুদয়,
রাখিয়াছি শুধুপ্রাণে,
অতীতের সুখময়ী সেই স্মৃতি সেই দিন!

বরষার রাতি আজি ঝরে বারি অবিরল,
নিরিবিলি তরুপাতে,
জড়িত জোনাকী পাতি ;
উছলিয়া নদী বয় জোয়ারে যে ভরা জল।

চমকি চপলা অই আলো করে ত্রিভুবন ;
স্বর্গের কিরণ মাখি,
নলিন নয়নে তব,
ফুটে কি বিজলী লাজে, প্রেম হাসি অতুলন।

বরিষার জল যথা জুড়াইল বসুমতী ;
অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা যত,
মরমে অতৃপ্ত ছিল,
অই বরিষার সম আজি তিরপিত সতি।

ক্ষণিকে বিজলী ঝলি আলোকিল ত্রিভুবন ;
ও বিজলী স্থির হাসি,
মণি মরকত সম,
চির অন্ধকারে প্রিয়ে করে আলো বিতরণ।

মিটিয়াছে আশা যদি তিরপিত অভিলাষ ;
নয়নে বিজলী এত,
তবু কেন অন্ধকার ?
তবু কেন প্রাণে আজি অতৃপ্তের দীর্ঘশ্বাস ?

দেখ আজি বরিষার অই নবঘন দাম ;
দিবানিশি অবিশ্রামে,
অকাতরে শতধারে,
শীতল বিমল জল ঢালিতেছে অবিরাম।

তৃষিত চাতক আজি, চিরশুষ্ক কণ্ঠ তার,
কত সুখে প্রেমভরে,
চপল আকুল প্রাণে,
অই অমৃতের জলে জুড়াইছে অনিবার।

জুড়াইল কণ্ঠ তার, তবু কেন অনুক্ষণ ;
চাতক কাতর প্রাণে,
চায় জল জলধরে,
এত বারি পাতে নাহি হ'ল তৃষ্ণা নিবারণ ?

এত বারিপানে তার তবু তৃষ্ণা মিটিল না !
এ অতৃপ্ত চির তৃষা,
না জানি মিটিবে কিসে ?
এ বিচিত্র পিপাসার কি দারুণ বিড়ম্বনা !

আজি এ চাতক সম চির তৃষাতুর প্রাণ ;
যত জল চাহিলাম,
তত জল পাইলাম,
তবু এ অতৃপ্ত তৃষা হইল না অবসান !

প্রিয়তমে এই তৃষা যাইবে না এ জীবনে !
এ তৃষা যাইত যদি,
আজি তবে পুনরায়,
জ্বলিবে এ প্রাণ কেন অতৃপ্তের হুতাশনে !

এ তৃষা মিটিবে যদি বল আজি কেন তবে ?
বিন্দুবারি ভিক্ষা করি,
জলদ চরণতলে,
লুটিয়া কাঁদিবে অই চাতক করুণ রবে !

মিটিয়াছে আশা যদি প্রাণের সে অভিলাষ ;
তবে কেন আজি দেবি,
ও অমৃতময় নামে,
আবার মরমতলে শত পদ্ম পরকাশ !

আবার জাগিল প্রাণ কেন সে অমৃত নামে ?
পূজিবারে দেবতারে,
উপাসক ফুলহারে,
আবার বসিল কেন, আরাধ্যে ! তোমার ধ্যানে !

এ চাতক পিপাসায় নাহি প্রিয়ে পরিত্রাণ !
জীবনে জনম সাথি,
মরমে রেখেছি গাঁথি,
এ চাতক শুষ্ককণ্ঠে কর বিন্দুবারি দান !

আছে কত প্রবাহিনী কত হ্রদ জলাশয় ;
অই নবঘন দাম,
পারে শুধু চিরদিন,—
জুড়াইতে চাতকের শুষ্ককণ্ঠ মরুময় !

শ্রীহরিশ্চন্দ্র নিয়োগী কবিরত্ন।

সমালোচনা।

আমরা রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর এম্, বি, এফ্, সি, এস, প্রণীত "জল" নামক প্রস্তাবনা পুস্তকাকারে মুদ্রাঙ্কিত প্রাপ্ত হইয়া পরম প্রীত হইলাম। ডাক্তার চুণীলাল বসুর ন্যায় সুযোগ্য রসায়নবিদ্ ব্যক্তির সুযুক্তিপূর্ণ গভীর গবেষণা সর্ব্বসাধারণ লোকের বিশেষ উপকারী, এ বিষয়ে আমাদের অনুমাত্র সন্দেহ নাই। এই পুস্তক যে পল্লীগ্রামস্থ প্রত্যেক গৃহস্থের থাকা উচিত, ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। জলের রাসায়নিক বিচার সম্বন্ধে আমাদের বলিবার কিছুই নাই। যে সকল কারণ দ্বারা জল অপরিষ্কার ও অব্যবহার্য্য হয় এবং যে সকল উপায় দ্বারা তাহা পরিষ্কার ও ব্যবহার্য্য হইতে পারে, চুণীবাবু তাহা যথাসাধ্য বুঝাইয়াছেন। তাঁহার পুষ্করিণী ও কূপ সম্বন্ধে উপদেশ সকল আমাদের শিরোধার্য্য। পাশ্চাত্যবিজ্ঞানের উন্নতির চরমসীমায় যতদূর জ্ঞানলাভ হয়, চুণীবাবু তাহা আমাদের উপদেশ দিতে ত্রুটি করেন নাই। তথাপি আমাদের মনে এই প্রস্তাবনা একটু অসম্পূর্ণ বলিয়া বোধ হয়; কারণ জনসাধারণের উপকারিতাসাধন করিতে হইলে, যে সকল উপায় দ্বারা আমরা বিপদ হইবার পূর্ব্বে বুঝিতে পারি ও নিবারণ করিতে পারি, তাহা বিশদ ও যতদূর স্বল্পায়াসসাধ্য হয়, তাহা চেষ্টা করা উচিত। আমরা ইহা বলিতেছি না যে, চুণীবাবু তাহাতে ত্রুটি করিয়াছেন, তথাপি তাহা এমত পরিষ্কার হয় নাই, যাহা দ্বারা সর্ব্বসাধারণে আপনাপন পুষ্করিণীর বা কূপের জল দুষ্ট হইয়াছে, ইহা বুঝিতে পারে ও তাহা ব্যবহারোপযোগী বা পানোপযোগী করিতে পারে। আমাদের মনে হয়, জল পরিষ্কার করিয়া দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা উচিত। ব্যবহারোপযোগী, Useable এবং পানোপযোগী Drinkable। কোন্ জল কি কি উপায় দ্বারা পরিষ্কার করিয়া কোন শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে, তাহা আমরা জানি না। আর Preventive causes নিবার্য্যকারণ ব্যতীত অনিবার্য্য কারণ দ্বারা জল অপরিষ্কার হয় কি না ও কতদূর হয়, তাহাও আমরা জানি না। মনে করুন, কোন জলাশয়ের জল শুষ্ক হইয়া কমিয়া গেলে সে জল পানোপযোগী বা ব্যবহারোপযোগী থাকে কি না, সে সকল বিষয় সহজে আমরা কি করিয়া বুঝিতে পারি। দেশকালপাত্র বিবেচনা করিয়া, পাশ্চাত্যবিজ্ঞান ও আপন দূরদর্শীতয় Experience দ্বারা সহজে উপলব্ধিকর উপায় সকল নির্দ্দেশ করিয়া দিলে সর্ব্বসাধারণের বিশেষ উপকার হইত।

শ্রীক্ষীরোদকুমার দত্ত, এম, বি।

জন্মভূমি।

(সচিত্র মাসিক পত্র।)

নবম বর্ষ। } ১৩০৭ সাল, মাঘ। { ৭ম সংখ্যা।

হায় মা ভিক্টোরিয়া!

হায় মা! তোমার নাম পশিলে শ্রবণে,
বিপুল আনন্দস্রোত উথলিত মনে॥
আজি কেন সেই নামে কর দিয়া শিরে,
ভাসিছে ভারতবাসী নিরানন্দনীরে?
স্বর্গধামে পশিয়াছ পুণ্যবতী তুমি।
তবশোকে অন্ধকার আজি আর্য্যভূমি॥
শুধু আর্য্যভূমি নয় সমগ্র সংসার।
তবশোকে সকলেই করে হাহাকার॥
ভারতের মহারাণী বিলাতের রাণী
এ জগতে নাহি আর! কি নির্ঘাত বাণি!
জননীরূপিনী ছিলে আমরা সন্তান।
ফেলিয়ে কোলের ছেলে করেছ প্রস্থান॥
হায় মা! তোমারে মোরা চক্ষে হেরি নাই।
ছবিতে মুদ্রাতে রূপ দেখিবারে পাই॥
তবু যেন জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীরূপ ধরি,
সম্মুখে উদয় আজি ভারত-ঈশ্বরী॥
ছিলে মা দয়ার নদী স্নেহের প্রতিমা।
সে দয়ার, সে স্নেহের, নাহি ছিল সীমা॥

আজি মা কোথায় তুমি! কোন্ পুণ্যধামে,
কাহারে করিছ দয়া? আছ কোন নামে?
আর কি তোমারে মাগো! উজল নয়নে,
হেরিবে না ভক্তিভরে পুত্রকন্যাগণে?
মা তোমার জন্মভূমি ইঙ্গোরঙ্গ ভূমি,
সেই ভূমি পরিহরি গিয়াছ মা তুমি!!
সেখানেও উঠিয়াছে শোকের উচ্ছ্বাস;
তবু তথা শতমুখে অট্টঅট্টহাস॥
একদিকে নিরানন্দ বিয়োগে তোমার,
অন্য দিকে বহিতেছে হর্ষ অশ্রুধার॥
মা তোমার সুখাসন রত্নসিংহাসনে,
বসিবে নব ভূপতি মুকুটভূষণে॥

সে আনন্দে প্রজাবৃন্দ ভাসিছে উল্লাসে,
সুখদুঃখ একসঙ্গে খেলে মর্ত্তবাসে॥
প্রবাদ কথার ছলে বলে বঙ্গবাসী,
একচক্ষে কান্না আর অন্য চক্ষে হাসি॥
তাই ঘটিতেছে মাগো স্বদেশে তোমার,
এদেশে মা ভিক্টোরিয়া! শুধু হাহাকার!!
লভিয়া ভারতবর্ষ তরিয়া সাগর,
রাজত্ব করেছ সুখে ত্রি-ষষ্ঠি বৎসর॥
করুণার সিন্ধু তুমি তব করুণায়,
জুড়ায়েছে প্রজাপুঞ্জ শীতল ছায়ায়॥
সে করুণা হারা হ'য়ে হারায়ে সে ছায়া,
ধরিছে ভারতবাসী শুধু মাত্র কায়া॥
নিরপেক্ষ রাজনীতি করিয়া প্রচার,
ঘুচায়েছ সর্ব্ব দুঃখ সমস্ত প্রজার॥
সবারে সমান দয়া, সমান বিচার,
বিতরণ করিয়াছ, লয়ে রাজ্যভার॥
শ্বেত কৃষ্ণ বর্ণভেদ ছিল না তোমার।
সমনেত্রে চাহিয়াছ বদন সবার॥
সর্ব্ব প্রজা সুখে থাকে করে সদাচার,
সকলে পালন করে ধর্ম্ম আপনার॥
এই স্বাধীনতা মাগো! দিয়াছিলে সবে।
জানিনা মা ভবিষ্যতে কিবা দশা হবে॥
কে আর লইবে কোলে সন্তান বলিয়ে!
কে মুছাবে অশ্রুধারা স্নেহাঞ্চল দিয়ে!!
কে আর করিবে দয়া হেরি অসময়!
ভয় পেলে কেবা আর দিবে মা অভয়!
কে আর বিপদে ত্রাণ করিবে সন্তানে!
কে আর প্রবোধ দিবে শুভ আশা দানে!
অন্নকষ্ট মহামারী বিদ্রোহ দুর্ব্বার।
ঘুচাতে কতই চেষ্টা ছিল মা তোমার॥

দৈব বিপদের সঙ্গে করেছ সংগ্রাম।
তাই এত প্রিয় মাগো ভিক্টোরিয়া নাম॥
এখন অকূলে ভাসে তব পুত্রগণ,
কে বারিবে মহারাণি! তাদের ক্রন্দন!
সর্ব্বগুণে গুণবতী ছিলে রাজেশ্বরী।
নাম স্মরি পাদপদ্মে নমস্কার করি॥
বর্ষকাল পূর্ব্ব হতে কত অমঙ্গল,
কাঁপাইয়া দিয়াছিল মেদিনীমণ্ডল॥
ঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প, নিত্য মারীভয়,
ঘন ঘন মহাযুদ্ধ বহুপ্রাণি ক্ষয়॥
গ্রহগতি ভিন্নাকার, সঘনে গ্রহণ,
ঘটেছিল ধরাধামে কত কুলক্ষণ॥
এবারে বসন্তে শীতে অকাল বাদল,
ভয়ে ভয়ে গণিয়াছি বহু অমঙ্গল॥
সেই অমঙ্গল ফলে এবে অকস্মাৎ,
ভারতের শিরে যেন ভীম বজ্রাঘাত!!
ঊনবিংশ শত এক বৈশব বৎসরে,
দ্বাবিংশতি জানুয়ারি মঙ্গল বাসরে।
পালালে মা মহালক্ষ্মী তেজিয়া সংসার,
চিরদিনে পুন ফিরে আসিবে না আর!!
সবে কয়, সবে দেখে, ভারত ভিতর,
মকরে প্রখর হন দেব প্রভাকর॥
কিন্তু মা যেদিনে তুমি মুদিলে নয়ন,
সেদিনে ভারতসূর্য্য নিষ্প্রভ বরণ॥
সেদিনেও মকরের তরুণ যৌবন,
তথাপি মলিন ছিল রবির কিরণ॥
ছিলে মা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী নারীমূর্ত্তি ধরি,
মহারাণী মহালক্ষ্মী ভারত-ঈশ্বরী॥
লক্ষ্মীহারা হইলাম তোমার বিহনে,
কে আর সান্ত্বনা দিবে সান্ত্বনা বচনে।

সসাগরা রাজলক্ষ্মী সমান তোমার,
এ জগতে ভিক্টোরিয়া কেহ নাহি আর!!
অনিবার বারিধারা ঝরিছে নয়নে,
জ্যোতির্ম্ময়ী স্বর্ণ-কান্তি সদা পড়ে মনে॥
ধরণীতে হাহাকার তাই শুধু নয়,
স্বর্গ মর্ত্ত সমভাব হেরি সমুদয়॥
আকাশে চাহিয়া দেখি আকুল লোচনে,
ঘুরিছে নক্ষত্র পুঞ্জ সন্ সন্ সনে॥
গ্রহগাত্রে গ্রহ ঠেকি হয় চুরমার,
চন্দ্র সূর্য্য ঘোরে যেন ভব চক্রাকার॥
রক্ত বর্ণ উল্কা যেন পড়িছে খসিয়া,
ভাস্মতে নিখিল বিশ্ব বহ্নি বিকাশিয়া।
অক্ষ লঙ্ঘি ঘনে যেন ঘুরিছে মেদিনী,
আকাশে উঠিছে যেন তোয়—তরঙ্গিণী॥
তোমারে হরিয়ে কাল, নিঠুর করাল,
ঘটাইছে ধরণীতে বিষম জঞ্জাল।
কি হবে মা মহারাজ্ঞি! হেন অলক্ষণে,
আর তুমি দেখিবে না করুণ নয়নে!!
সব যেন যায় যায় হেন শঙ্কা হয়,
শঙ্কা হয় ভবে যেন ঘটিছে প্রলয়!!
ভীষণ প্রলয় কাণ্ড ভীষণ আঁধার,
এ মহা প্রলয় তুমি হেরিবে না আর।
কোটি কোটি সুত সুতা শোকাচ্ছন্ন হয়ে,
কি হবে কি হবে ভেবে কাঁপিতেছে ভয়ে!
স্বর্গধামে পশিয়াছ স্বর্গনিবাসিনী,
সুখে থাক স্বর্গরাজ্যে রাজ্যবিলাসিনী!
তোমার পবিত্র আত্মা পবিত্র নয়নে,
চাহিবে মর্ত্তের পানে আশা আছে মনে॥
পুত্র পৌত্র পরিজন অমাত্যবান্ধব,
সুখেতে থাকুন সবে পূর্ণ থাক সব॥

রেখ মা করুণা দৃষ্টি ভারতের প্রতি,
স্বর্গ হতে বর্ষে যেন তব কৃপাজ্যোতি।
কাঁদিব মা তবশোকে জীব যতদিন,
দেব জ্যোতি অশ্রুধারা মুছাইয়া দিন!
এই নিবেদন মাগো উদ্দেশে তোমার,
উদ্দেশে শ্রীপাদপদ্মে করি নমস্কার!!

শ্রীভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

মুক্তি।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

যাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য আছে, ঐহিক দুঃখ নিবারণের কোন অসম্ভাবনাই নাই, তথাপি তাঁহার ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির আশা প্রবল বেগে প্রধাবিত হইয়া ধর্ম্মসেতু পর্য্যন্ত ভগ্ন করিবার উপক্রম করে কেন? কেবল আনন্দের জন্য। সর্ব্বসম্পত্তির অধীশ্বর হইয়াও যৎসামান্য একটী উপাধির আশায় প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে উদ্যত হয় কেন? কেবল আনন্দের জন্য। দরিদ্রের ধনী হইতে ইচ্ছা হয়, ধনীর রাজা হইতে ইচ্ছা হয়, রাজার চক্রবর্ত্তী হইতে ইচ্ছা হয় কেন? কেবল আনন্দ লিপ্সার প্রবল প্রবর্ত্তনায়। ফলতঃ আনন্দ লিপ্সাই জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কিন্তু জীব অবিদ্যার কপট প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া অযথাস্থানে আনন্দের অনুসন্ধান করে, সুতরাং কৃতকার্য্য হইতে পারে না। যাহা ত্যাগ করিলে আনন্দ হয়, তাহা ভোগ করিয়া আনন্দলাভ করিতে চাহে সুতরাং বিপরীত ফল হইয়া থাকে। ভোগানন্দ ও ত্যাগানন্দে অনেক বৈলক্ষণ্য। ভোগ সময়েই ভোগানন্দের অনুভব হইয়া থাকে, ত্যাগানন্দ আজীবনস্থায়ী। এই দক্ষিণ আফ্রিকার তুমুল সংগ্রামে অসংখ্য মনুষ্যের জীবননাশ করিয়া, অসংখ্য অনাথাকে অশ্রুজলে ভাসাইয়া ও অসংখ্য শিশুসন্তানকে পথের ভিখারী করিয়া বিজয়ীবৃন্দের যে আনন্দ হইল, ইহা কি চিরকাল থাকিবে? কখনই না। কিন্তু যিনি কতকগুলি নিকৃষ্ট পশুজাতির জীবননাশের উপক্রম দেখিয়া তৎপরিবর্ত্তে আপন অমূল্য জীবন অর্পণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, আজি যদি সেই পবিত্র কীর্ত্তি বুদ্ধদেব জীবিত থাকিতেন, তাহা

হইলে এখনও তাঁহার হৃদয়ে সেই পবিত্র আনন্দ পরিপূর্ণ থাকিত সন্দেহ নাই। যিনি কখনও আপন মুখের গ্রাস ক্ষুধাতুর দরিদ্র বালককে অর্পণ করিয়াছেন, তিনিই জানেন, ভোগানন্দ ও ত্যাগানন্দের বৈলক্ষণ্য কি? যিনি কখনও আপন প্রাণের উপর উপেক্ষা করিয়া পদ্মানদীর প্রবল প্রবাহে নিমগ্নপ্রায় ব্যক্তির জীবন রক্ষা করিয়াছেন, তিনিই জানেন, ভোগানন্দ ও ত্যাগানন্দের বিভিন্নতা কিরূপ? অধিক কি, যিনি কখনও ক্ষণকালের জন্য সংসারের সকল বিষয় বিস্মৃত হইয়া একাগ্রচিত্তে হরিগুণগান শ্রবণ বা কীর্ত্তন অথবা স্মরণ করিয়াছেন, ভোগানন্দের ও ত্যাগানন্দের আকাশ-পাতাল-বিভিন্নতা তিনিই বুঝিয়াছেন। ফলতঃ সংসার সম্বন্ধ অপসারিত হইলেই যে এক অপূর্ব্ব অপ্রাবৃত্ত আনন্দের আস্বাদন হইয়া থাকে, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই প্রত্যক্ষ বিষয়। ঐরূপ সর্ব্ববাসনাবিহীন অন্তঃকরণে যে এক অপূর্ব্ব বিমলানন্দের অনুভব হয়, তাহাই মোক্ষানন্দের আভাস; উহা দ্বারাই মুক্তির আনন্দরূপতা প্রতিপন্ন হইতে পারে। অতএব যখন নিখিল বাসনা ত্যাগ করিলেই প্রকৃত আনন্দ অনুভূত হয়, তখন জীব যে আনন্দ স্বরূপ তাহাতে আর অনুমাত্র সংশয় হইতে পারে না। সেই স্বরূপানন্দের আবরণেই দুঃখ এবং ঐ আবরণ উন্মোচনেই পরমানন্দ অর্থাৎ মুক্তি। যদি কোনও ব্যক্তি একটী পথভ্রষ্ট শিশুকে আপন গৃহে আনিয়া পরম যত্নের সহিত প্রতিপালন করে, তথাপি ঐ শিশু আপন জননীর অমৃতময় অঙ্কে উপবেশন করিতে না পাইয়া কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে পারে না এবং তাহার জননীর ক্রোড়ে উপনীত হইলেই অপার আনন্দ আস্বাদন করিতে থাকে, সেইরূপ পথভ্রষ্ট জীবও যতই সাংসারিক সুখ-ভোগে কালাতিপাত করুক, যতদিন আপন মূলস্বরূপ ব্রহ্মানন্দে অবগাহন করিতে না পারিবে, ততদিন কোনরূপেই সুখী হইতে সমর্থ হইবে না। এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে যখন কোন অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্যের ফলে সেই আনন্দময়ীর অনন্দময় ক্রোড়ে আত্মসমর্পণ করিবে, সেইদিন বিমলানন্দ আস্বাদনে সমর্থ হইবে, সন্দেহ নাই।

অতঃপর ইহাও চিন্তাশীলের চিন্তা করিবার বিষয় যে, যদি মুক্তাবস্থায় আনন্দের আশা না থাকিবে, তবে চতুর্বর্গের মধ্যে মুক্তিকেই সর্ব্বোচ্চ আসনে উপবেশন করাইবার কোনও কারণ নাই। আর ঐরূপ নীরস মোক্ষের জন্য ষড়ঙ্গচতুর্ব্বেদ, শতাধিক উপনিষৎ, অষ্টাদশ মহাপুরাণ, লক্ষ-

শ্লোকাত্মক মহাভারত, চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোকে সংগ্রথিত রামায়ণ, এতদ্ভিন্ন বহু সংখ্যক তন্ত্র মন্ত্রাদির কিছুই প্রয়োজন ছিল না। কেন না, আনন্দই জীবের স্বরূপ এবং আনন্দলিপ্সাই জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, সুতরাং যাহাতে আনন্দ নাই, অর্থ-সাধ্য ও আয়াস-সাধ্য না হইলেও তাহাতে কাহারও প্রবৃত্তি হইতে পারে না। যখন আনন্দের আশা না থাকিলে মনুষ্য একটী অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যৎকিঞ্চিৎ চালনা করিতেও অভিলাষী নহে, তখন আনন্দহীন মোক্ষের সাধনমার্গের সুদারুণ কঠোরতা সহ্য করিতে কাহারও অভিলাষ হইতে পারে, এমন বোধ হয় না। যাহাতে একবারেই কাহারও প্রবৃত্তি হইতে পারে না, তদ্বিষয়ে উপদেশ দেওয়াও উপযুক্ত নহে, সুতরাং আর্য্যশাস্ত্রকারদিগের সাধনসম্বন্ধীয় উপদেশ সমূহও অনর্থক হইয়া পড়িল।

আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ দুঃখ অনুক্ষণ জীবকে আক্রমণ করিতেছে। জীব প্রতিনিয়তই দুঃখভোগ করিতেছে, তথাপি মৃত্যু অভিলাষ করে না। আপন আপন অবস্থোচিত যৎকিঞ্চিৎ আনন্দের আশাই জীবনের অবলম্বন। অত্যন্ত হীনাবস্থ ও উৎকট রোগগ্রস্ত ব্যক্তিও সহজে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে চাহে না। অন্য কোন প্রকার সুখের সম্ভাবনা না থাকিলেও অন্ততঃ দেখিয়া শুনিয়া যে আনন্দ হয়, তাহারই অনুরোধে অবাহ্য দুঃখভারও কথঞ্চিৎ বহন করিয়া থাকে। সাংসারিক যন্ত্রণার আধিক্য বশতঃ অনেকে মৃত্যু কামনাও করিয়া থাকে, কিন্তু তাহা মৌখিক বাক্য মাত্র, আন্তরিক অভিলাষ নহে। তবে যে সহস্রাধিক ব্যক্তির মধ্যে কোনও একজন কোথাও কখনও প্রাণত্যাগ করে, তাহা বিচারস্থানে প্রমাণ স্বরূপে গ্রহণ করা যায় না; কেন না, যাহা স্বাভাবিক ও সাধারণ, তাহাই প্রমাণ, আর যাহা অস্বাভাবিক ও অসাধারণ, তাহা প্রমাণ বলিয়া কোনও বুদ্ধিমান্ গ্রহণ করেন না। এক্ষণে ইহা অনেকাংশে প্রতিপন্ন হইল যে, আনন্দলিপ্সা এতই বলবতী, যৎকিঞ্চিৎ আনন্দের প্রত্যাশা থাকিলে অসহ্য যন্ত্রণাও সহ্য করিতে কেহই পরাঙ্মুখ নহে। সেই আনন্দের গন্ধও যাহাতে নাই, এরূপ মুক্তির প্রয়োজন অতি অল্পই বোধ হয়। আবার গৌতমী ও কাণাদী মুক্তির কথা শুনিলে প্রয়োজনের প্রসঙ্গদূরে থাকুক, ভয়ে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। তাঁহাদের মতে মুক্তি একপ্রকার মূর্চ্ছা। কি সর্ব্বনাশ! আর মুক্তির কথায় প্রয়োজন নাই। এই দুঃখ-সঙ্কুল সংসারের মধ্যেও স্ত্রীপুত্রাদির মুখাবলোকন পূর্ব্বক যে ক্ষণিক সুখাভাসের অনুভব হয়, তাহাকেই পরমানন্দ জ্ঞান করিয়া এক প্রকার সুখে দুঃখে কালাতিপাত করি তাহাও ভাল, তথাপি মুক্তির কথায় কর্ণপাত করিতে অভিলাষ হয় না। অথবা যদি কাষ্ঠ পাষাণাদির ন্যায় জড়ভাবে অবস্থান করিতে হয়, তাহাও মূর্চ্ছা সদৃশী মুক্তি অপেক্ষা বাঞ্ছনীয়। সেই জন্যই কোন মহানুভব ভয়চকিত ভাবে বলিয়াছিলেন,—

"ন চ বৈশেষিকীং মুক্তিং প্রার্থয়ামি কদাচন॥

অর্থাৎ "বৈশেষিক মুক্তির অভিলাষ কখনই করিব না?" যদিও ঐ শ্লোকার্দ্ধ কোনও ব্যক্তি বিশেষের উক্তি, তথাপি মূর্চ্ছাপ্রায় মোক্ষের কথা; কথা শুনিলে বোধ হয় সকলেই একবাক্যে ঐ কথাই বলিবেন। যাঁহারা কোন প্রকার বাধ্যবাধকতায় আবদ্ধ হইয়া প্রকাশ্যভাবে ইহা স্বীকার করিতে না পারিবেন, তাঁহাদের হৃদয়ের সহিত বাক্‌শক্তির বিরোধ উপস্থিত হইবে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, অসাধারণ প্রতিভাশালী ঐ ঋষিদ্বয়ের সুবিমল মস্তিষ্ক এরূপ বেদবিরুদ্ধ অযৌক্তিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইল কেন, তাহা আমার ন্যায় ক্ষুদ্রচেতার চিন্তাতীত। পশ্বাদি ইতর জীব অপেক্ষা মনুষ্যত্ব অধিকতর আনন্দকর, সামান্য মনুষ্যত্ব অপেক্ষা রাজত্ব এবং রাজত্ব অপেক্ষা সাম্রাজ্য অধিকতর আনন্দের বস্তু, ইহাই আমাদের সাধারণ ধারণা ও প্রত্যক্ষ উপলব্ধি। আবার আর্য্য শাস্ত্র আলোচনা করিয়া দেখি, সাম্রাজ্য অপেক্ষা দেবত্ব, দেবত্ব অপেক্ষা ইন্দ্রত্ব এবং ইন্দ্রত্ব অপেক্ষা ব্রহ্মত্বই অধিকতর আনন্দজনক। শাস্ত্রকারগণ এইরূপ আনন্দকর ব্রহ্মলোকেরও মস্তকোপরি মোক্ষপদ সন্নিবেশিত করিয়াছেন। সেই মোক্ষপদ যে একপ্রকার মূর্চ্ছার সদৃশ হইবে, ইহা স্বীকার করিয়া, মহর্ষি গৌতম ও কণাদের সম্মান রক্ষা করিতে আমার মন মুখ উভয়েই অসম্মত। কাহারও পক্ষপাতী হইয়া কোন প্রবন্ধের অবতারণা করা উপযুক্ত নহে। সকলের অভিপ্রায় সমালোচনা করিয়া যাহা সুসঙ্গত বোধ হয়, তাহাই অকপটে প্রকাশ করা প্রবন্ধ লেখকের কর্ত্তব্য। আমি এই সামান্য বুদ্ধিতে অসাধারণ বিষয় আলোচনা করিয়া ইহাই উপলব্ধি করিয়াছি যে, মৃত্যুর পরে যদি দৈহিক কোনও চিদংশের অস্তিত্ব থাকে এবং সেই চিদংশের মুক্তি বলিয়া কোনও চরমাবস্থা স্বীকার করিতে হয়, তবে সেই অবস্থা পরম শান্তি ও পরমানন্দের অবস্থা তাহাতে আর সংশয় নাই।

শ্রীনীলকান্ত গোস্বামী।

গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

(ছাই-খেগো ক্রোরীয়ান্)

যখন প্রবল পরাক্রান্ত মুসলমান সম্রাট্ আওরঙ্গজেব, দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া এই বিশাল ভারতসাম্রাজ্য শাসন করিতেছিলেন; যখন (১৬৬৮ খৃঃ) দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্রীয় রাজ্যের স্থাপয়িতা প্রাতঃস্মরণীয় হিন্দুর প্রলুপ্ত-গৌরবের পুনরুদ্ধারকারী হিন্দুকুলচূড়ামণি মহারাজ শিবাজী, হিন্দু-স্বাধীনতার পুনঃ সংস্থাপন-বাসনায় বিপুল অশ্বসেনার অধিনায়ক হইয়া রায়গড়ে দুর্গ নির্ম্মাণ পুরঃসর বদ্ধ-পরিকর হইতেছিলেন; যখন (১৬৬৯ খৃঃ) সুদক্ষ নবাব সায়েস্তা খাঁ, বঙ্গদেশে রাজত্ব করিতেছিলেন; যখন ফরাসী ও দিনেমার, ওলন্দাজ, পর্ত্তুগিজ ও ইংরাজ প্রভৃতি য়ুরোপীয় বণিকেরা, পরস্পর প্রতিযোগিতা পূর্ব্বক বাঙ্গালার নানাস্থানে বাণিজ্য করিতেছিলেন; প্রায় সেই সময় সুবিখ্যাত নবদ্বীপের অগ্নিকোণে পূর্ব্বস্থলী (১) নামক গ্রামে একজন প্রধান বাঙ্গালীর উদ্ভব হয়। তাঁহারই নাম "গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।"

বঙ্গদেশের বিষয়, যতই আলোচনা করা যায়, ততই অবসন্নমতি হইতে হয়। অধুনাতন সময়ের বঙ্গবাসিগণ আপনাদিগকে চৌকস্, চতুর ও কাজের লোক বলিয়া মনে মনে কতই সন্তুষ্ট হন। তাঁহার লোকের নিকট অহঙ্কার প্রকাশ করিতেও ত্রুটি করেন না। কিন্তু তাঁহারা দেখেন না— তাঁহাদের দেশের প্রকৃত ইতিবৃত্ত, রচিত হয় নাই। যে জাতির ইতিহাস নাই, সে জাতির আছে কি? সভ্য জাতিরা আমাদিগকে মানুষই জ্ঞান করেন না। এই জন্যই বর্ত্তমান সুসভ্য রাজপুরুষগণের নিকট এই বাঙ্গালী জাতির তাদৃশ আদর, কোথায় বল! যদি বঙ্গদেশের পূর্ব্বতন অবস্থার একখানিও প্রকৃত পুরাবৃত্ত থাকিত, যদি আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের জীবনবৃত্তান্ত থাকিত, যদি পূর্ব্বতন সামাজিক আচার-ব্যবহার-বিষয়ক গ্রন্থাদি থাকিত, তাহা হইলে, আমাদিগকে পদ্মা ও ভাগীরথীর অন্তর্গত আধুনিক চর-বাসী বনবাসী বলিয়া

(১) মতান্তরে 'কামারকুলী' গ্রাম, গোবিন্দচন্দ্রের জন্মভূমি কিন্তু আমরা গবেষণা দ্বারা, গোবিন্দচন্দ্রের বংশ-পরম্পরায় ও প্রাচীন লোকের প্রমুখাৎ শুনিয়া, যত দূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে সিদ্ধান্ত হইয়াছে—নবদ্বীপের উত্তরাংশে বর্ত্তমান বিখ্যাত পূর্ব্বস্থলী নামক গ্রামে তিনি প্রাদুর্ভূত হন।

উপেক্ষিত হইতে হইত কেন? তাহা হইলে আমরা "বড়-ঘরানা" বলিয়া সম্মানিত হইতাম এবং সুসভ্য প্রবল পরাক্রান্ত জাতিগণেরও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিতাম। উপরি-উক্ত ব্যক্তির জীবনবৃত্তান্ত-সম্বন্ধে যে প্রকার গল্প শোনা যায়, বাঙ্গালার ইতিবৃত্ত-গ্রন্থে তাহার গন্ধবাষ্পও নাই বলিলে, অত্যুক্তি হয় কি? যাহাও কিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাও অত্যল্পমাত্র, ইহা কি অল্প আক্ষেপের বিষয় নয়! অথচ তাদৃশ-গুণসম্পন্ন ব্যক্তির তাদৃশ কার্য্যই, ইতিহাসের প্রধান বিষয়। নবাব মুর্সিদ্ কুলি খাঁর ও জাফর খাঁর সময়ে, নাজির আহাম্মদ, সইয়াদ্ রেজা খাঁ, সৈয়দ্ খাঁ, এক্‌রাম খাঁ প্রভৃতি মুসলমান রাজপুরুষেরা, বাঙ্গালার রাজত্ব-সম্বন্ধে যে কার্য্য করিতেন, একজন বাঙ্গালীও (২) আপন সন্তানের সহিত সেই সময়ে বহু বৎসর তাদৃশ কোন কার্য্য করিয়াছিলেন, এবং তদ্দ্বারা আপন অবস্থা, সমুন্নত করিয়া বিবিধ কীর্ত্তি-কলাপ দ্বারা চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। ইতিহাস পাঠ না করিয়া, জনশ্রুতির উপর কি প্রকারে বিশ্বাস করা যাইতে পারে? যে প্রকার শ্রুতিগোচর হয়, তাহাতে উক্ত বাঙ্গালীর পদ, উল্লিখিত মুসলমান রাজপুরুষগণের পদ অপেক্ষাও উচ্চতর ছিল বলিয়া বর্ত্তমান প্রাচীন লোকদিগের দৃঢ়বিশ্বাস। হয়, গোবিন্দচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্ত-সম্বন্ধে বঙ্গদেশীয় ও প্রাচীন লোকের জনশ্রুতি মিথ্যা বলিতে হইবে—না হয়, মুসলমান-রাজত্বের মুসলমান-ইতিহাসলেখক, ইতিহাস হইতে বাঙ্গালীর নাম পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। এই উভয় তর্কের মধ্যবর্ত্তী হইয়া, স্থির সিদ্ধান্ত করিলে, প্রতীতি জন্মিবে—গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর যাদৃশ উচ্চ পদের গল্প শোনা যায়, বোধ হয়, তাদৃশ প্রবল ক্ষমতাসম্পন্ন

(২) রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্ সঙ্কলিত 'প্রথমশিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাসের' ৩৮ পৃষ্ঠায় 'মুকুট' রায়ের' নাম-মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—"যে সময়ে পর্ত্তুগিজদিগের প্রভাব-বিলয় হয়, যে সময়ে সাহাজান সম্রাট হইয়াছিলেন (১৬২৮ খৃঃ); যে সময়ে সম্রাট, ইস্‌লাম খাঁ মাশহাদিকে বেহারের সুবাদার নিযুক্ত করেন (১৬৩৭ খৃঃ), তাঁহার অল্পকাল মধ্যে (১৬৩৮ খৃঃ) চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তা মুকুটরায় আরাকাণরাজের অধীনতা পরিত্যাগ পূর্ব্ব মোগল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করেন।" এই 'মুকুট রায়' "গোবিন্দ"-নন্দন। এই অংশটুকুই ভিন্ন তাঁহার নাম কোন ইতিহাসে ছিল না।

পদ, তাঁহার হয় নাই। ফলতঃ, যেমন শ্রুত হওয়া যায়, সেরূপ না হইলেও, যখন ডেপুটী গবর্ণর রাজা রাজবল্লভ, পেস্কর দর্পনারায়ণ প্রভৃতি এদেশীয়-গণের নাম, ইতিহাসে দৃষ্ট হয়, তখন বাঙ্গালা বিহার, উড়িষ্যার "ক্রোরীয়ান্" বলিয়া খ্যাত, গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বিষয়, বাঙ্গালার ইতিহাসে বিবৃত হওয়া, নিতান্তই উচিত ছিল, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ কৈ? দ্বিতীয় টীকায় রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস' হইতে যে বৃত্তান্ত, সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা, গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর নিজের বৃত্তান্ত নহে। তাহা, তাঁহার পুত্রের (৩)। যাহা হউক, যখন গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সম্বন্ধে কোন বিষয়, বাঙ্গালার ইতিহাস-গ্রন্থে কোনও লিপিবদ্ধ প্রমাণ নাই—তখন কেবল জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়াই, গোবিন্দচন্দ্রের চরিত্র-সম্বন্ধিনী আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইল।

নবাব সায়েস্তা খাঁর সময়ে বর্ত্তমানে বিখ্যাত "পূর্ব্বস্থলীতে" (কোন কোন গ্রন্থকর্ত্তা বলেন, 'কামারকুলিতে' বা 'কুমারখুলিতে'—কিন্তু বাস্তব পক্ষে যত দূর জানিতে পারা গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, বর্ত্তমান পূর্ব্বস্থলীতেই) গোবিন্দচন্দ্রের জীবন-সাগরের সমুদয় তরঙ্গ, দেখা দিয়াছিল। এক ঘর দুঃখী বৈদিক ব্রাহ্মণের তথায় নামে মাত্র বাগ ছিল। সাধ্বী স্ত্রী এবং ৭।৮ (সাত বা আট) বৎসর-বয়স্ক একমাত্র পুত্র লইয়া ব্রাহ্মণ, অতীব কষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। বালকটী, বাল্যকালে বিলক্ষণ দুষ্টস্বভাব-সম্পন্ন ছিল। এক দিন প্রতিবেশী বালকগণ ও আমাদের বর্ণনার বিষয়ীভূত উক্ত বালক, একত্র খেলা করিতেছিল। কে, কি দিয়া, ভাত খাইয়াছে, কথাপ্রসঙ্গে সেই কথা উঠিল। সকলের কথা, ফুরাইয়া গেলে, এক বালক, কথায় কথায় কহিল—"মা, যেরূপ লাউ-চিঙ্‌ড়ি রাঁধিয়াছিলেন, তোমরা কেহই, সেরূপ খাও নাই।" বর্ণিত বালক, গৃহে আসিয়া মাতার নিকট লাউ-চিঙ্‌ড়ি খাইবার অভিলাষ প্রকাশ করিল। মাতার হাতে এক কপর্দ্দকও মাত্র নাই যে, তদ্দ্বারা মৎস্য ক্রয় করেন। এ দিকে বালকের ভয়ঙ্কর আব্দার! সেই সময়ে হঠাৎ একজন মৎস্য-বিক্রয়িণী, গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। জননী, উপায়ান্তর নাই দেখিয়া, সাড়ে পাঁচ গণ্ডা কড়ির

(৩) 'গোবিন্দচন্দ্র'-নন্দন "মুকুট রায়ের" নিকট যথাসময়ে সমুপস্থিত হইতে হইবে।

(৪) দামে ধারে মৎস্য ক্রয় করিলেন এবং মেছুনীকে বলিয়া দিলেন, "বাছা, ফিরিয়া যাইবার সময় কড়ি লইয়া যাইও।" লাউ-চিঙ্‌ড়ির আয়োজন হইল দেখিয়া, গোবিন্দের আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি তখন খেলিতে বাহির হইলেন। জননী, পাক প্রস্তুত করিতে গমন করিলেন। মধ্যাহ্ন-কাল উপস্থিত। মৎস্যজীবিনী, পাড়ায় পাড়ায় মৎস্য বিক্রয় করিয়া, গোবিন্দ-জননীর নিকটে আসিয়া, বিক্রীত মৎস্যের মূল্য চাহিল। গোবিন্দের মাতা, তখন মূল্য-প্রদানে অসমর্থ। তিনি বলিলেন—"বাছা, এখন এক কড়া কড়িও, আমার হাতে নাই। আর একদিন আসিয়া লইও। আজ এস।" ইহাতে মৎস্যজীবিনী, অসন্তুষ্ট হইয়া যার পর নাই, নানাপ্রকার কূট কটূতর অকথ্য ভাষায় গোবিন্দের জননীকে লক্ষ্য করিয়া গালি দিল। কেহ কেহ বলেন—সে, রন্ধন-করা মাছগুলি, তরকারি হইতে বাছাইয়া লইয়া গিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে মৎস্যজীবিনী, তাহাই করিয়াছিল। গোবিন্দের পিতা, এই সমস্ত বৃত্তান্ত বিদিত হইয়া, বিলক্ষণ বিরক্ত হইলেন। পুত্রের জন্য ছোট লোকের গালি খাইতে হইল বলিয়া, স্ত্রীর সম্মুখে পুত্রোদ্দেশে বিস্তর তিরস্কার করিলেন। ইতোমধ্যে গোবিন্দ, গৃহে আসিয়া আহার করিতে বসিল। গোবিন্দ, মাছের তরকারিতে মাছ না পাইয়া, নিজ-জননীকে জিজ্ঞাসা করিল—"মা! মাছ কৈ?" জননী, ক্রন্দন করিতে করিতে, মেছুনীর বৃত্তান্ত, আদ্যোপান্ত গোবিন্দকে বলিলেন। কেহ কেহ কহেন, কর্ত্তার আদেশে গোবিন্দকে ছাই খাইতে দেওয়া হইয়াছিল। প্রকৃত পক্ষেও তাহাই হইয়াছিল। অদ্যাবধি পূর্ব্বস্থলীর আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলেই, "ছাই-খেগো চক্রবর্ত্তী" বলিয়া, গোবিন্দের জীবনবৃত্তান্তের অবতারণা করিয়া থাকে। ইহা, প্রকৃত না হইলে, পূর্ব্বস্থলীর লোকে, কেন তাঁহাকে "ছাই-খেগো গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী" বলিবে? ঘটনা, যাহাই হউক, ফলতঃ দারিদ্র্য-নিবন্ধন এই ব্যাপারোপলক্ষ্যে গোবিন্দের মনে একটি নিদারুণ আঘাত লাগিয়াছিল। ভোজন হইতে বিরত হইয়া, সেই আট বৎসর বয়স্ক বালক গোবিন্দ বলিলেন—"মা! আমার নিমিত্ত ভাবিও না। যদি টাকা উপার্জ্জন করিতে পারি, তবে আবার ঘরে ফিরিয়া আসিব। নতুবা এই জন্মের মত শেষ বিদায়

(৪) পূর্ব্বস্থলীতে অদ্যাপি কড়ি প্রচলিত আছে। তথায় এক পয়সায় ৵৪ (চব্বিশ গণ্ডা) অর্থাৎ এক পোণ চারি গণ্ডা কড়ি।

লইলাম"। এই কথা বলিয়া পিতৃ-মাতৃ-চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক গাত্রমার্জ্জনী (গামছা) গোবিন্দচন্দ্র, স্কন্ধে করিয়া, বাটী হইতে বহির্গত হইলেন।

কোথায় যাইবেন, কি ই বা করিবেন, তদ্বিষয়ে গোবিন্দের লক্ষ্য স্থির ছিল না। ভ্রমণ করিতে করিতে, তিনি, ভাগীরথী-তীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, একটী তাল-তরুর কুলায়ে পাখীর বাচ্ছা হইয়াছে। পক্ষি-শাবক-গ্রহণে লোলুপ হইয়া, তিনি, বৃক্ষে আরোহণ করিলেন। পাখীর বাসায় যেমন হস্ত-প্রসারণে উদ্যত হইয়াছেন, অমনই এক ভয়ঙ্কর বিষধর, তন্মধ্য হইতে অর্দ্ধ-নিষ্ক্রান্ত হইয়া, দংশনোন্মুখ হইল। এমন অবস্থায় ভয়ে অভিভূত হইয়া, শাখা হইতে পড়িয়া যাওয়াই সম্ভব। কিন্তু গোবিন্দ, তৎক্ষণাৎ উপস্থিত বুদ্ধিবলে এরূপে বিষধরের গলা টিপিয়া ধরিলেন যে, সে, আর দংশন করিতে পারিল না। সর্প, দংশনে অক্ষম হইল বটে, কিন্তু লাঙ্গুল দ্বারা তাঁহার অঙ্গুলি দৃঢ়রূপে জড়াইয়া ধরিল। গলা ছাড়িয়া দিলে, সর্পে, দংশন করিবে। সুতরাং এক হস্তের আনুকূল্যে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করাও, নিতান্ত সুকঠিন। প্রস্তুতবুদ্ধি বালক, আপনাকে এইরূপ বিপন্ন দেখিয়া, তদ্দণ্ডেই একটী সদুপায়ের উদ্ভাবন ও অবলম্বন করিলেন। যে ক্ষমতা, নিরাশ্রয় দুঃখী বালককে ভবিষ্যতে সম্ভ্রমসূচক গুরু-ভার-বহ রাজকীয় পদে উন্নত করিয়াছিল—পাঠকগণ, তালী-তরুর শিখরদেশে নাগ-পাশ-বদ্ধ সেই বালকের নবীন জীবনে ঐ দিন সেই সামর্থ্যের অঙ্কুর দেখিতে পাইলেন।

গোবিন্দচন্দ্র, অসাধারণ-প্রত্যুৎপন্নমতি-প্রভাবের বলে অপর হস্ত দ্বারা সর্পের লাঙ্গুলের অগ্র ভাগ ধরিয়া খোলেন,—আর তালের বাখ্‌ড়ার সুতীক্ষ্ণ অগ্র ভাগ দ্বারা সর্পকে ছিন্ন করিয়া, ভূতলে নিক্ষেপ করিতে থাকেন। সেই সময়ে এক জন পরিব্রাজক সন্ন্যাসী, যদৃচ্ছা-ক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে, সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জনশ্রুতি এই—তিনি তৎকালে নির্দ্দিষ্ট-গুণবিশিষ্ট একটী শিষ্যের অন্বেষণ করিতেছিলেন। সহসা তালবৃক্ষোপরি বালকের দিকে দৃষ্টিসংযোগ হওয়ায়, তিনি অদ্ভুত নাট্যের অভিনয় দেখিলেন। তিনি বৃক্ষারূঢ় বালকের অসাধারণ প্রত্যুৎপন্ন মতি ও অতি-সাহস দেখিয়া, মনে মনে স্থির করিলেন, সেই বালকই, তাঁহার যোগ্য শিষ্য হইবে। কিয়ৎ ক্ষণের মধ্যেই বালক, আরব্ধ কর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া গাছ হইতে নামিলেন। সন্ন্যাসী, তাঁহার ভাল করিবার আশা দিয়া, সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করিলেন। গোবিন্দ বলিলেন, "সন্ন্যাসী ঠাকুর! যদি পাখীর

বাচ্ছা দিতে পারেন, তবেই আমি আপনার সঙ্গী হই।" সন্ন্যাসী, পক্ষি-শাবকের প্রলোভন দেখাইয়া, তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া প্রস্থান করিলেন। সন্ন্যাসী, তাঁহাকে দীক্ষিত করিয়া মন্ত্রসিদ্ধির উপায় বলিয়া দিলেন এবং কহিলেন—"গোবিন্দ! ভবিষ্যতে তুমি বড়লোক হইবে; কিন্তু অস্ত্রাঘাতে তোমার মৃত্যু হইবে। পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী, সম্পূর্ণ-রূপে ফলবতী হইয়াছিল। অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়া, গোবিন্দ, পরিব্রাজকের সহিত শেষে দিল্লী গমন করেন।

কিংবদন্তী আছে, সন্ন্যাসীর বরে সামান্য যত্নে আরব্য ও পারষ্য ভাষায় তিনি সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন, এ কথা এক সত্য। অন্য দিকে বিনা যত্নে ও বিনা অধ্যবসায়ের সাহায্যে বিদ্যাভ্যাস হয় না, এটীও দ্বিতীয় সত্য। অতএব এমন স্থলে উপরি-উক্ত জনশ্রুতি, সত্য বা মিথ্যা বলিয়া বোধ করা যাইতে পারে। অনুমানে ইহাই, প্রতীত হয়—হয়, প্রোক্ত দুই ভাষায় সন্ন্যাসীর জ্ঞান ছিল, তাই তিনি স্বয়ংই, গোবিন্দকে শিক্ষা দেন। না হয়, দিল্লীতে তাঁহার তৎকাল-প্রচলিত বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছিল। স্বল্প সময়ে ও স্বল্প শ্রমে অসাধারণ অধ্যবসায়, স্বাবলম্বন ও অত্যাশ্চর্য্য স্মরণশক্তির বলে তাদৃশ বিদ্যা-ধন-উপার্জ্জনে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়াই, লোকে কহে—"বিনা ব্যয়ে, বিনা যত্নে সন্ন্যাসীর বরে তিনি বিদ্বান্ হইয়াছিলেন।"

ফলতঃ, এতাদৃশ-প্রতিভা-সম্পন্ন বালকের শিক্ষা গ্রহণ বিষয়ে অনেক কৌতুক ও আমোদজনক উপদেশ পাইবার আশা করা যাইতে পারে; কিন্তু এ-দেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার সবিশেষ বিবরণ কিছুই সংগ্রহ করা যায় না। গোবিন্দ, বাল-স্বভাব-সুলভ চপলতার বশীভূত হইয়া, আরবীয় সুললিত যে কবিতা, মুখে মুখে আবৃত্তি করিতে করিতে, দিল্লীর রাজপথ দিয়া পদব্রজে করিতেছিলেন, তাহা, তৎকালীন সম্রাটের "রায় রাঁইয়ার" (দেওয়ানের) কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া, বালককে নিকটে আহ্বান করেন। দেওয়ান, গঠন-সৌন্দর্য্যে ও মুখশ্রীতে অসাধারণ মতি-মত্তার লক্ষণ-দর্শনে গোবিন্দকে বড়ই ভালবাসিলেন; আশ্রয় দান করিয়া, তাঁহার উন্নতি-সংসাধন-সংকল্পে সবিশেষ মনোযোগী হইলেন। তিনি দেওয়ানের অনুগ্রহে বহুদিন সেইস্থানে থাকিয়া, বহুবিধ বিষয়-কার্য্য শিখিয়া কাজকর্ম্ম করেন। শেষে যে কার্য্য করিয়া, তাঁহার প্রচুর সম্পত্তি ও দেশাবচ্ছিন্ন খ্যাত লাভ হয়, এই স্থান হইতেই তাহার সূত্রপাত। গোবিন্দ, প্রধানামাত্যের অনুগ্রহে ও

অনুকম্পায় ক্রমান্বয়ে অনেক রাজকর্ম্মে নিয়োজিত হন। দেওয়ান, অপাত্রে অনুগ্রহ বিতরণ করিতে পারেন কি? গোবিন্দের অসাধারণ গুণ ও সমুদয় কার্য্যে বিলক্ষণ পারদর্শিতা-দর্শনে তিনি মোহিত হইয়া, তাঁহার প্রতি দয়া করিতে বাধ্য হন। নিজের একটু মনুষ্যত্ব না থাকিলে, কেবল পরানুকূল্যেই, কাহারও কখন কি প্রকৃত বড়লোক হওয়া সম্ভাবিত? অনেকে, সহায় নাই বলিয়া, আক্ষেপ করেন; কিন্তু অকারণ সহায়, অতি অল্পলোকেরই থাকে। যাহা হউক, গোবিন্দ, ক্রমে সম্রাটের শ্রুতিগোচর হইলেন। এই ঘটনাতেই, তাঁহার গুণ ও ক্ষমতার পর্য্যাপ্ত পুরস্কার হইল। কার্য্য ও কারণ এই উভয়ে, এরূপ অত্যাশ্চর্য্য-সম্বন্ধ-যুক্ত যে, তাহাদের মধ্যে কিঞ্চিন্মাত্র বৈষম্য থাকিবার যো নাই। আপাত-দৃষ্টিতে বোধ হইতে পারে, গোবিন্দের যেরূপ যোগাযোগ হইল, যাঁহারই সম্বন্ধে সেরূপ হইবে, তাঁহারই তাদৃশী উন্নতি হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু কার্য্য-কারণের ভাব পর্য্যালোচনা করিলে, বোধ হইবে, যোগাযোগ আপনা হইতে হয় না। এ সংসারে কয় ব্যক্তি, অতুচ্চ তালী-তরু-শিখরে তাদৃশ বিপন্ন হইয়াও, অদ্ভুত ও প্রস্তুত বুদ্ধি-প্রদর্শনে পারগ হয়?

তৎকালীন সম্রাট্, এক সময়ে গোবিন্দকে দেখিতে চাহিলেন। দেওয়ান, সম্রাট্-সাক্ষাৎ-করণোপযোগী আয়োজন করিয়া দিলেন। গোবিন্দ, স্বকীয় বিদ্যা, বুদ্ধি ও কার্য্য-দক্ষতা দর্শাইয়া, সম্রাটের এতাদৃশ স্নেহ ও সন্তোষ আকর্ষণ করিলেন যে, সম্রাট্, তাঁহাকে প্রার্থনার অধিক পুরস্কার-প্রদানে বাধ্য হইলেন। বাদশা, "বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা" এই তিনটী শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক পদ-সঞ্চালনে নিকটস্থ তিনটী তাকিয়া স্থান-ভ্রষ্ট করিলেন। গোবিন্দ, ইহার অর্থগ্রহ কিছুই করিতে না পারিয়া, একপ্রকার অসন্তুষ্ট হইয়াই, রাজসভা হইতে বিদায় হইলেন। গোবিন্দচন্দ্র, রাজসভা হইতে প্রত্যাগত হইয়া, দেওয়ান-জীকে কহিলেন,—"মহাশয়! এমন বাতুল সম্রাটের নিকট আমায় পাঠাইয়াছিলেন কেন?

প্রবাদ প্রচলিত যে, দিল্লীর রাজ-পথে একটি বৃহদাকার প্রস্তর, পতিত ছিল। সেই প্রকাণ্ড প্রস্তরে অস্পষ্ট অক্ষরে পারসী ভাষায় কি একটি কবিতা, বা অন্য কিছু ক্ষোদিত ছিল। তৎকালিক কি হিন্দু, কি মুসলমান—বড় বড় পারসীবিৎ পণ্ডিত কেহই, তাহার অর্থ করিতে সমর্থ হন নাই। গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, স্বকীয় অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধি ও প্রতিভার বলে

প্রস্তর-ক্ষোদিত কবিতা, আর অন্যান্য যাহা কিছু, ক্ষোদিত ছিল, তৎসমুদয়ই—অম্লান বদনে পাঠ করিয়াছিলেন। তাহাতে সম্রাট্, সন্তুষ্ট হইয়া, পুরস্কার-স্বরূপ তাঁহাকে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার সর্ব্বপ্রধান রাজস্ব-সচিবের পদ সমার্পণ করেন। (৫)

(ক্রমশঃ)

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

শকুন্তলা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি, "কবিষু কালিদাস শ্রেষ্ঠঃ"। আমরা যে শুধু ঐ কয়েকটী কথা যখন তখন আবৃত্তিমাত্র করিয়া কবিকে সম্মান করিয়া থাকি, তাহা নহে। আমাদের নিকট প্রায় সমুদায় প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের গল্পের নায়ক কালিদাস, কবিত্বপূর্ণ শ্লোক বা হেঁয়ালীর রচয়িতা কালিদাস। আমরা কল্পনায় কালিদাসকে কখনও মূর্খ করি, আবার কখন বা তাঁহাকে সরস্বতীর বরপুত্র করিয়া তুলি, কখন তাঁহাকে নির্ব্বোধের শেষ করি, আবার কখন বা তাঁহাকে বুদ্ধিমানের চূড়ান্ত করিয়া থাকি। আমাদের যেন বিশ্বাস, এক কালিদাস ভিন্ন ভারতবর্ষে আর দ্বিতীয় কবি জন্মগ্রহণ করেন নাই। আর কোন দেশের কোন কবির ভাগ্যে এরূপ ঘটিয়াছে কি না শুনি নাই। অথচ আমাদের দেশেই ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের কৃত একটী সমালোচন শ্লোক প্রচলিত আছে; যথা—"কাব্যেষু

(৫) আরও প্রবাদ আছে—গোবিন্দচন্দ্র, রাজসভায় সম্রাটের নিকট পারস্য-ভাষায় অদ্বিতীয় বিদ্বান্ প্রতিপন্ন হইলেন। বড় বড় পারসিবিৎ পণ্ডিতেরা, যে সকল লেখা পড়িতে পারেন নাই, সেই সকল লেখা, গোবিন্দচন্দ্রের হস্তে দিয়া, বাদশা বলিয়াছিলেন,—"এই লেখার ব্যাখ্যা কর।" গোবিন্দ, অক্লেশে পাঠ করিয়া তাহা সম্রাট্‌কে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই, তাঁহার ভাগ্যচক্র, পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়।

মাঘঃ কবিঃ কালিদাসঃ"। সমালোচক মহাশয় নাটকে ও কাব্যে প্রভেদ করিয়া কাব্যে মাঘকে ও নাটকে কালিদাসকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়া অবশেষে কালিদাসেরই জয় গাহিয়াছেন। নাটক রচনা করিয়াই কালিদাস এত সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। "অভিজ্ঞান শকুন্তল" কালিদাস কৃত নাটক দুইখানির মধ্যে উৎকৃষ্টতর। অতএব "অভিজ্ঞান শকুন্তলের" কবি বলিয়া তাঁহার এত আদর। সেই "অভিজ্ঞান শকুন্তলে" কি আছে, আজ আমরা তাহা দেখিব; দেখিব, কিরূপ একখানি নাটক রচনা করিয়া তিনি যাবতীয় কবির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। দেখিব, কেন "কবিষু কালিদাস শ্রেষ্ঠঃ।"

স্বর্গীয় ভূদেববাবু এই শকুন্তলাকে একটী গোলাপ ফুলের সহিত তুলনা করিয়া বলিয়াছেন, "ইহার দিগন্তব্যাপী সৌরভে স্ববন্ধু বান্ধবে উল্লাসপূর্ণ হওয়া যায়।" আমরা তাঁহার কথা অনুসরণ করিয়া আজ স্ববন্ধু বান্ধবে সেই তের বৎসর পূর্ব্বে উজ্জয়িনীতে প্রস্ফুটিত চির অম্লান গোলাপটীর দিগন্তব্যাপী সৌরভে উল্লাসপূর্ণ হইতে চেষ্টা করিব।

অভিজ্ঞান শকুন্তলের উপাখ্যান ভাগ কালিদাসের সম্পূর্ণ নিজের নহে। মহাভারতের আদিপর্ব্বে বর্ণিত শকুন্তলা উপাখ্যানটি ইহার মূলভিত্তি। মহাভারতের শকুন্তলা এইরূপ,—"চন্দ্রবংশে দুষ্মন্ত নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁহার রাজধানী হস্তিনাপুরে। একদিন তিনি মৃগয়া করিতে করিতে হঠাৎ মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে উপনীত হন। সে সময়ে কণ্ব আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন না। তাঁহার পালিতা-কন্যা শকুন্তলা রাজার অতিথি সৎকার করেন। রাজা শকুন্তলার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া, তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন, শকুন্তলা সম্মত হইলে গান্ধর্ব্ববিধানে উভয়ের বিবাহ হয়। এখন কণ্বের ফিরিবার পূর্ব্বেই দুষ্মন্ত স্বীয় রাজধানীতে ফিরিয়া যান। কণ্ব আশ্রমে আসিলে, সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অত্যন্ত আহ্লাদ প্রকাশ করেন। এদিকে শকুন্তলা গর্ভবতী হইয়াছিলেন। যথাসময়ে সেই আশ্রমেই তাঁহার এক পুত্র জন্মিল। সেই পুত্রের যখন ছয় বৎসর বয়স, তখন কণ্ব তাহার সহিত শকুন্তলাকে রাজার নিকট প্রেরণ করেন। রাজা শকুন্তলাকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন বটে, কিন্তু সম্বন্ধ অস্বীকার করিয়া তাড়াইতে চেষ্টা করিলেন। দৈববাণী হইল, 'শকুন্তলা তোমারই অতএব উহাকে গ্রহণ কর,। রাজা দ্বিরুক্তিমাত্র না করিয়া পিতার,

সুপুত্রের ন্যায় শকুন্তলাকে গ্রহণ করিয়া পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।"

অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে 'পদ্মপুরাণ' নামে একখানি গ্রন্থ আছে। সেই গ্রন্থের স্বর্গখণ্ডে শকুন্তলার একটী উপাখ্যান আছে। সেই গ্রন্থের গল্পের সহিত কালিদাসের নাটকের গল্প কতকটা মিলে। অনেকে বলেন, কালিদাস "পদ্মপুরাণে" শকুন্তলার গল্প যেরূপ পড়িয়াছিলেন, একটু আধটু পরিবর্ত্তন করিয়া তদবলম্বনে একখানি নাটক লিখিয়া গিয়াছেন। আমরা এই স্থলে আমাদের দেশের একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিকের কথা উদ্ধৃত করিলাম, "The eighteen Purans were mainly composed in the Vikramadityan Age, although they have been largely added to in subsequent times, even after the Mahomedan Conquest." * "Vikramadityan Age." বলিতে আমরা এরূপ বুঝি যে, যে সময়ে বিক্রমাদিত্য রাজত্ব করিতেন বরং তাহার কিছুকাল পরে, তথাপি একদিনও আগে নহে, কালিদাস বিক্রমাদিত্যের সম-সাময়িক। অতএব সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন পুরাণগুলি বড়জোর কালিদাসের সম-সাময়িক। তাহার মধ্যে "পদ্মপুরাণখানি" আছে কি না, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। তবে কেমন করিয়া শপথ করিব যে, কালিদাসের গল্প পৌরাণিক গল্পের অনুকরণ? আর বহু ব্যক্তি যে পথে গিয়াছেন, তাহাই প্রশস্ত বলিয়া ও কথা স্বীকার করিলেও, কালিদাসের তাহাতে অগৌরব নাই; কেন না, তাঁহার গল্প আরও প্রাণমুগ্ধকারী। লোকে পুরাণ ভুলিবে, তবু কালিদাসের শকুন্তলাকে ভুলিবে না। (ক্রমশঃ)

শ্রীদেবেশ্বর মুখোপাধ্যায়।

---

* A Brief History of Ancient and modern India by Mr. R. C. Dutt C. I. E. Page 54.

বাঙ্গালা ভাষার লেখক।

পণ্ডিত বীরেশ্বর পাঁড়ে। অধুনাতন যশোহর জেলার অন্তর্গত বনগ্রাম মহকুমার অধীন কায়রাগ্রামে পৈতৃক বাস। ইহাঁরা কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ। প্রায় দশ এগার পুরুষ হইতে বঙ্গদেশে বাস। পূর্ব্ব-পুরুষগণের অনেকেই বিলক্ষণ বুদ্ধিমান্ ও পণ্ডিত ছিলেন। তজ্জন্য কৃষ্ণনগরের রাজগণের নিকট হইতে বহু-পরিমিত ভূমি বৃত্তি পান। বীরেশ্বর বাবুর পিতামহের নাম ৺কনকচন্দ্র পাঁড়ে। ইহাঁর তুল্য দাতা ও অতিথিপ্রিয় লোক বিরল ছিল। তেজারতি ও ভূ-সম্পত্তিতে ইহাঁর আয়ও নিতান্ত কম ছিল না। কিন্তু সমস্ত অর্থ ইনি পূজা ও অতিথি-সেবাতেই ব্যয় করিতেন। এই অতিথি-সেবার জন্য কনকচন্দ্র সাধারণের নিকট রাজা উপাধি পাইয়াছিলেন। পূর্ব্বদেশের সমস্ত লোক তৎকালে তাঁহাকে রাজা বলিত। ব্রাহ্মণের উপর কনকচন্দ্রের বড়ই ভক্তি ছিল। তদীয় স্ত্রীও তদনুরূপ গুণবতী ছিলেন। সকলেই তাঁহাকে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী বলিত। তিনি পতির সহগামিনী হইয়াছিলেন। যে সময় কনকচন্দ্রের মৃত্যু হয়, তখন ইহাঁর পুত্র মৃত্যুঞ্জয়ের বয়স ষোড়শবর্ষমাত্র। তিনিই জ্যেষ্ঠ। এই বয়সে তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতৃত্রয় ও ভগিনীদ্বয়কে স্ব-মতে রাখিয়া সংসারের উন্নতি করেন। ইহাঁদের পৌভ্রাত্র ঐ প্রদেশে উপমা-স্থল হইয়াছিল। সকলে ইহাঁদিগকে রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন বলিতেন। ভ্রাতৃগণকে সর্ব্বপ্রকারে সন্তুষ্ট রাখিয়া পৈতৃক অতিথিসেবার ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া এবং সমস্ত পূজা পার্ব্বণাদির ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াও, প্রভূত পরিমাণ ভূসম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, এবং বাসভবনের জন্য এক বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ বাসভবন,—কলিকাতা জোড়াসাঁকোর নূতন বাজারের শ্যামাচরণ মল্লিকের বাটীর অনুকরণে প্রস্তুত এবং উহা অপেক্ষা অধিক ছোটও হইবে না। মৃত্যুঞ্জয় নানাগুণে ভূষিত ছিলেন। সংস্কৃত ও পারসী উভয় ভাষাতেই তিনি অধিকারী ছিলেন। জ্যোতিষ শাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র ও ব্যবহারশাস্ত্রেও তিনি ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ঔষধ ও পথ্য বিতরণে বহুতর দরিদ্রের প্রাণ তিনি রক্ষা করিতেন। সর্ব্বত্রই তাঁহার যশঃ প্রচার হইয়াছিল। সকলেই তাঁহাকে ভক্তির সহিত ভালবাসিত। তাঁহার স্বভাব অতি নির্ম্মল ছিল। ইহাঁর তিন পুত্র ও ছয় কন্যা। বীরেশ্বর বাবু পঞ্চম অর্থাৎ তিন ভগিনী ও এক ভ্রাতার পরে বীরেশ্বর বাবুর জন্ম হয়।

কৃষ্ণনগর কলেজে বীরেশ্বর বাবু অধ্যয়ন করেন। কিন্তু ভয়ানক শিরোরোগ উপস্থিত হওয়ায়, ডাক্তারগণের পরামর্শে ইহাঁকে পাঠ ত্যাগ করিতে হয়। পরন্তু লেখা পড়ার প্রতি সবিশেষ অনুরাগ নিবন্ধন, সেই রোগের সময়ও অধ্যয়ন করিতে ইনি বিরত হন নাই।

স্বদেশের প্রতি বাল্যকাল হইতেই বীরেশ্বর বাবুর অনুরাগ। সেই অনুরাগহেতু ইনি বাঙ্গলা বহুতর পুস্তক পাঠ করেন ও নিজের যত্নে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। এই ভয়ানক শিরোরোগের সময়ও বীরেশ্বর বাবু লীলাবতীর ন্যায় কঠিন সংস্কৃত অঙ্কপুস্তক, অন্যের সাহায্য ব্যতীত, নিজে পড়িয়া নিজে অনুবাদ করেন। ঐ লীলাবতীই বীরেশ্বর বাবুর প্রথম মুদ্রিত পুস্তক। ১৭।১৮ বৎসর বয়সে ইনি ঐ পুস্তক অনুবাদ করেন। ইহার পূর্ব্বে পাঠত্যাগের অব্যবহিত পরেই বীরেশ্বর বাবু "ভারতবর্ষের বৃত্তান্ত" প্রণয়ন করেন; কিন্তু এই বিষয়ে আরও পুস্তক বাঙ্গলায় প্রকাশিত হইয়াছে শুনিয়া সে পুস্তক প্রকাশ করেন নাই। কোন পুরাতন বিষয় লিখিতে বা কাহারও সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে ইহার প্রবৃত্তি ছিল না এবং এখনও নাই। এদেশের কাহারও কাহারও ধারণা, Arithmetic-এ যে সকল অঙ্ক আছে, এদেশের লোকে তাহা কখন জানিত না; দেশের এই অযথা কলঙ্কমোচনের জন্য বীরেশ্বর বাবু লীলাবতী প্রচার করেন। বীজগণিত, গোলাধ্যায়, গণিতাধ্যায় প্রভৃতি বিষয় বাঙ্গলায় প্রকাশ করার বলবতী ইচ্ছা তাঁহার ছিল; কিন্তু সে সকল পুস্তক এদেশের লোকে পড়ে না বলিয়া, তিনি তাহা প্রণয়ন করেন নাই। এমন কি বীরেশ্বর বাবুর লীলাবতী বহুকাল পূর্ব্বে সেই একবারমাত্র ছাপা হইয়াছিল, আজিও তাহার কিছু অবশিষ্ট আছে।

ইহার পর বিজ্ঞানসার, উপক্রমণিকা, শিশুবিজ্ঞান, লোকচরিত ও বাঙ্গলা শিক্ষা ১ম ও ২য় ভাগ এই সকল গ্রন্থ বীরেশ্বর বাবু প্রণয়ন করেন। বিজ্ঞানসার ও শিশুবিজ্ঞান, এই দুই গ্রন্থ ইংরাজির অনুবাদ; কিন্তু ইহার প্রণালী পদ্ধতি নূতন ধরণের। স্কুলের ছাত্রগণ কেবল বিদেশীয়গণের জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করে দেখিয়া, স্বদেশীয় মহাত্মাগণের বৃত্তান্ত, বীরেশ্বর বাবু আর্য্যচরিত নামক পুস্তক প্রকাশ করেন। বাঙ্গলা ভাষার মূলতত্ত্ব শিক্ষাসৌকার্য্যের উদ্দেশ্যে "বাঙ্গলাশিক্ষা" গ্রন্থ বীরেশ্বরবাবু প্রণয়ন করেন। পদার্থবিদ্যা ভিন্ন অন্য বিজ্ঞান বাঙ্গলায় ছিল না বলিয়া, পাঁড়ে মহাশয় বিজ্ঞানসার লিখেন। ইহাতে প্রায় সমস্ত দ্রব্য বিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। এই গ্রন্থে ৩০খানি চিত্র আছে।

ইহার কিছু পরে, পাঁড়ে মহাশয়ের স্কন্ধে বৈষয়িক কার্য্যের ভার পতিত হয়। সেই সময় বৈষয়িক অনেক গোলযোগও তাঁহার ঘটিয়াছিল। সেই জন্য পাঁড়ে মহাশয় কয়েক বৎসর যাবৎ সাহিত্যালোচনা করিতে পারেন নাই। তাহার পরে তিনি আর একটী কার্য্যে মন দেন; দেশে স্কুল নাই দেখিয়া, একটী স্কুল স্থাপন করেন। পাঁড়ে মহাশয় যে সময়ে কৃষ্ণনগরে পঠদ্দশায় ছিলেন, সেই সময়ে সেইখানেই দরিদ্রদিগের জন্য একটী বিনা বেতনের স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহার নাম দরিদ্র বিদ্যালয় ছিল। তিনি চলিয়া আসার পর সেই স্কুলে বেতন লওয়ার নিয়ম হয়। ঐ স্কুল আজিও আছে এবং এক্ষণে ঐ স্কুলই কৃষ্ণনগরের শ্রেষ্ঠ বঙ্গবিদ্যালয়রূপে পরিগণিত হইয়াছে। আপন গ্রামের ও চতুস্পার্শ্বস্থ গ্রামের বালকদিগের সুবিধার জন্যই তিনি স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি নিজেও ছাত্রগণকে শিক্ষা দিতেন। শিক্ষকগণকে অধ্যাপন কার্য্যে সমধিক উপযোগী করিবার জন্যে তিনি নিজে শিক্ষা দিতেন। এই সমস্ত বিষয়ে ব্যস্ত থাকায়, সাহিত্যালোচনার কিছুমাত্র অবসর পাইতেন না। কিন্তু এই সময়ে তাহার মনে দার্শনিক চিন্তার উদয় হইল। ভ্রমণে, শয়নে, যখন তিনি সময় পাইতেন, তখনই নানারূপ দার্শনিক চিন্তা তাঁহার মনে উদয় হইতে লাগিল।

এই সময় জ্ঞানাঙ্কুর পত্রের সম্পাদক,—পাড়ে মহাশয়কে ঐ পত্রে লিখিতে অনুরোধ করায়, পাঁড়ে মহাশয় ঐ সকল চিন্তা,—মানবতত্ত্ব নাম দিয়া জ্ঞানাঙ্কুরে লিখিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু নানাকার্য্যে ব্যস্ত থাকায় জ্ঞানাঙ্কুরে তিনি অল্পই লিখিতে পারিতেন। কিছুদিন অতিবাহিত হইবার পর পাঁড়ে মহাশয়ের গৃহবিবাদের সূচনা হইল। তাহাতে তিনি পৈতৃক বাসভূমি পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিলেন এবং "নববাস" নামে একখানি দেশী বস্ত্রের দোকান খুলিলেন। একদরে বস্ত্র বিক্রয়ের পথ ইনিই কলিকাতায় প্রথম দেখান এবং তাহাতে দেশী কাপড় লোকে অধিক ব্যবহার করিয়া দেশীয় তাঁতিগণের অন্ন সংস্থানের উপায় করেন, তাহা উপায়বিধান জন্য অল্পমূল্যে দেশীকাপড় বিক্রয় করিতে পাঁড়ে মহাশয় আরম্ভ করেন। এই সময়ে জ্ঞানাঙ্কুর উঠিয়া যায়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।

ছায়াসতী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নিষ্ঠুর নৈরাশ।

"হা বিধি এ বিধি বুঝিতে পারিনি,
কমল কোরকে কীটের বাস;
বিপাকে বধিতে সরলা হরিণী
শবরে গোতিয়া রেখেছে ফাঁশ।" বঙ্গসুন্দরী।

কলিকাতার অন্তর্বর্ত্তী গড়পার গ্রামে একটী সামান্য বাটীতে রাজপুত্র রমণীমোহনের বিবাহ অতি সংগোপনে নিষ্পন্ন হইল। বরকর্ত্তা, অতুল বাবু, কন্যাকর্ত্তা কুমারের অপর বন্ধু কমল মিত্র; স্ত্রী আচার কমল মিত্রের পরিবারেরা করিল, যে ব্রাহ্মণ বিবাহের মন্ত্রপাঠ করিল, সে দক্ষিণাস্বরূপ একশত টাকা প্রাপ্ত হইল। পরিণয়ের দুইদিবস পরে রমণীমোহন ইন্দ্রপ্রিয়াকে লইয়া বাগ্‌বাজারের খালধারে মনোহর উদ্যান বাটীকায় রাখিলেন। বিবাহের একমাস পরে একদিবস ইন্দ্রপ্রিয়া রমণীমোহনকে বলিলেন, "নাথ! আমার মার জন্য মন অতিশয় ব্যাকুল হইতেছে, তুমি আমায় মার কাছে নিয়া চল।" রমণীমোহন ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "না প্রিয়ে! এক্ষণে তোমার যাওয়া হইতে পারে না, কি জানি যদ্যপি তাঁহারা রাগত হইয়া অপমান করেন।" ইন্দ্রপ্রিয়া সাশ্রুনয়নে বলিলেন, "তবে আমি কতদিনে মাকে দেখিতে পাইব।" রমণীমোহন গম্ভীরভাবে বলিলেন, "সময়ে হইবে, অগ্রে আমি তাঁহাদিগকে শান্ত্বনা করিব, পশ্চাৎ তোমায় লইয়া যাইব।" দম্পতির কথোপকথনে বাধা দিবার জন্য অতুল উপস্থিত হইলেন। রমণীমোহন অতুলকে বলিলেন, "ইন্দ্রপ্রিয়া মাতাকে দেখিবার জন্য বড়ই ইচ্ছুক।" অতুল হাসিয়া বলিল, "সে এক্ষণে হতে পারে না।" বালিকা ইন্দ্রপ্রিয়া মুখে অঞ্চল দিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে সে স্থান হইতে উঠিয়া গেলেন। উদার রমণীমোহন ইন্দ্রপ্রিয়ার ক্রন্দনে ব্যথিত হইয়া বলিলেন, "কি হইবে ভাই! উহার ক্রন্দনে আমার ক্লেশ

বেলা পর্য্যন্তই ঘুমাইয়াছে কিন্তু তাই বলিয়া কি ডাকিতে নাই? আবার কতদিনে দেখা হইবে—যাওয়া কালে সে একবার দেখিয়াও লইতে পারিল না—বাস্তবিক এইরূপ অপ্রত্যাশিত অনাদরে তার মনটা বড়ই খারাপ হইয়া পড়িল; আজ শৈল বেশ বুঝিতে পারিল, সুশীলকুমারের সদয়, সস্নেহ ব্যবহারে সে তাহার প্রতি আকৃষ্টা হইয়াছে। নতুবা এমন কষ্ট হয় কেন! শৈলর চক্ষে তাহা না হইলে জল কেন? শৈল বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছে, ইহার মধ্যে হঠাৎ তাহার রাত্রির কথা মনে পড়িল; শৈলর গাটা চমকিয়া উঠিল! কাল শৈল তো বড় অবাধ্যতা করিয়াছে, তুচ্ছ একটু জল দিতে আপত্তি করিয়া শৈল স্বামীকে বড় কষ্ট দিয়াছে। পিপাসার জল—শত্রুও যদি চায়, তাহাকেও দেওয়া কর্ত্তব্য—আর ভাল স্বামী—যিনি তাহাকে এত ভাল বাসেন, এমন আদর করেন,—তিনি একটু জল চাহিয়াছিলেন, তুচ্ছ আলস্যের খাতিরে শৈল তাহা দিতে আপত্তি করিয়াছে! সেই জন্যই স্বামী মনে কষ্ট পাইয়া আর না ডাকিয়া চলিয়া গিয়াছেন। শৈল যতই ভাবিতে লাগিল, ততই তার মনটা আকুল হইতে লাগিল। স্বামী দেবতাতুল্য, তাঁকে অবহেলা, ইত্যাদি অত শত কথা বালিকার মনে আসিল না, কেবল তাঁর মনে কষ্ট দিয়াছে এই ভাবিতেই তার চোকে জল আসিতে লাগিল, আর নিজের উপর রাগ হইতে লাগিল। স্বামীর দোষ কি? শৈল তাঁর উপর বৃথা অভিমান করিয়াছে, তারই তো দোষ! স্বামী বাবুগিরীর কথা বলিয়াছিলেন বলিয়া বিরক্ত হয়েছিলাম—তাই ছি! ছি! শৈল এখন আর সে কথা মনে করিতে পারে না, ঠোঁটটা কামড়াইয়া লাল করিয়া ফেলিল, আর যেন কেমন একটা অশান্তি বোধ করিতে লাগিল। যতই ভাবিতে লাগিল, ততই অশান্তি বাড়িতে লাগিল, শৈল নিজের গালে নিজেই চাপড়াইতে লাগিল।

সে কতক্ষণ এই ভাবে থাকিল, তাহা বলা যায় না; ইতিমধ্যে মা ডাকিলেন, "শৈল, আজ কি উঠ্‌বি না?" শৈল তাড়াতাড়ি মুখ চোক মুছিয়া বাহিরে গেল, মা কন্যার ভার মুখ দেখিলেন, কিছু বলিলেন না।

শৈল প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া আবার ঘরে আসিল, আয়নায় মুখ দেখিতে গেল না, চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। শেষে তার মনে হইল, তার চোক মুখ বুঝি বড় লাল হয়েছে। তাই দেখিবার জন্য আয়নাখানি খুলিল, দেখিল, তার মধ্যে একখানি পত্র—সুশীলের হাতের লেখা, কম্পিত

হস্তে শৈল পত্রখানি লইল, বুকের মধ্যে দুর্‌দুর্‌ করিতে লাগিল, সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল—যেন কি বজ্রপাতই পত্রে আছে—পত্রখানা খুলিয়া খাটে বসিয়া পড়িতে চেষ্টা করিল—পারিল না, শুইয়া শুইয়া পড়িতে লাগিল:—

পত্র।

"শৈল, ভাবিয়াছিলাম, তোমার চেহারা যেমন, গুণেও তেমনি হইবে, কিন্তু আমি দেখিলাম, সে আশা বৃথা। আমি তোমাকে স্নেহ ভালবাসা দিতে ত্রুটী করি নাই, কিন্তু আমার প্রতি তোমার একটুও স্নেহ মমতা নাই, তাহা আজ রাত্রিতে বেশ বুঝিলাম। আমরা গরীব, আমার পিতা মাতা গরীব, তোমাদের বাড়ীর দাস দাসীদের মত; তোমার তাঁহাদের প্রতি নোংরা বলিয়া বিতৃষ্ণা, আমার বাড়ীর উপরও বিতৃষ্ণা; তোমার মত বাবু স্ত্রী লইয়া আমার ন্যায় গরীবের সুখ হওয়া অসম্ভব। যে স্ত্রী এক গ্লাস জল দিতে পর্য্যন্ত আপত্তি করে, তাহার স্নেহ কতদূর, তাহা বেশ বুঝাই যাইতে পারে। আর আমি যদি তোমার সহিত খারাপ ব্যবহার করিতাম, তাহা হইলেও বা কথা ছিল। যাহা হউক, তুমি সুখে থাক, আমি আর তোমাকে বিরক্ত করিতে আসিব না, প্রাতে আর তোমাকে জাগাইব না—আর আবশ্যকই বা কি? যদি কোন দিন গরীবের স্ত্রী হওয়া অপমান বোধ না কর বলিয়া জানিতে পারি, তখন আবার দেখা হইবে।

"আমার এ পত্রের কথা গোপন রাখিলেই ভাল হয়। মনে বড় কষ্ট পাইয়াই আমি ইহা লিখিলাম। ইতি শ্রীসুশীলকুমার।"

শৈল পত্রখানি পড়িল, পুনরায় পড়িল, শেষে একটু চুপ করিয়া থাকিল। তার পর বালিশে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল,—ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতে লাগিল—তাহা যেন আর থামিতে চাহে না।

উঃ! কি নির্দ্দয় পত্র! তুমি তো ভালবাস, তবে এমন মর্ম্মান্তিক পত্র শৈলকে লিখিলে কেন? না হয় সে একটা অপরাধই করিয়াছিল, বালিকা, বুঝিতে পারে নাই। যেমন করিয়াই হউক একটা দোষ করিয়াছে, তাই কি তোমার ন্যায় সুবোধের বিদ্বানের এমন করিয়া লেখা উচিত? ক্ষমা করিলে কি পারিতে না!—না, তোমারই বা দোষ কি, তুমি তো কত বলিয়াছ, শৈল শুনে নাই, তার পর এই সামান্য কাজে এমন অবাধ্যতা, এমন কর্কশ উত্তর সে দিয়াছে—একথা মনে আসিবামাত্র শৈল আরও আকুল হইয়া পড়িল—আবার কাঁদিতে লাগিল। দুঃখ কষ্টের সময় ক্রন্দন জীব-

হিন্দুকে হিন্দুর হিন্দুত্ব বুঝাইতেছেন—হিন্দুকে কর্ত্তব্য দীক্ষায় দীক্ষিত করিতেছেন—সাধককে ইষ্টদেবতার ধ্যান শিখাইতেছেন! এইটুকু করিতেছেন বলিয়াই আজ আমাদের বড় আনন্দের—বড় সুখের—বড় ভালবাসার জিনিষ। আজ এ সমুদয় আমাদের "ইষ্টদেবতার আশীর্ব্বাদ ফল।" এই অনুগ্রহ আমরা ইহজীবনে বিস্মৃত হইব না। আর যে মহাত্মাগণ "হিন্দু-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা, তাঁহারা আমাদের হৃদয়ের একমাত্র পূজনীয়—প্রাণের অধিক প্রিয়—আত্মার চেয়ে আত্মীয়। তাঁহাদের পবিত্র মূর্ত্তি—আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয়ে অক্ষয় অক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে। হিন্দু-হৃদয়, তাঁহাদের কাছে কখনও অকৃতজ্ঞ থাকিবে না।

কাল যায়, কার্য্যও যায়, থাকে কেবল তাহার স্মৃতিমাত্র। সেই স্মৃতির জন্যই হিন্দু আজ আপনার জিনিষ, আপনার বলিয়া চিনিয়া লইতে শিখিয়াছে। হিন্দুর এই নবজীবনের পুনরভ্যুদয়ের দিনে—হিন্দুর প্রাচীন গ্রন্থ "পশু চিকিৎসা" সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়াই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। একখানি হস্তলিখিত পুঁথির কয়েক পৃষ্ঠা মাত্র আমার হস্তগত হইয়াছে। ইহা অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য এবং অপ্রকাশিত। "বাগ্‌ভট" গ্রন্থের টীকাকার সুপ্রসিদ্ধ অরুণদত্ত এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। যে কয়েকটী মাত্র শ্লোক আমরা পাইয়াছি—তাহাতে আর কোনও উপকার হউক না হউক—আর্য্য ঋষিগণের পশু চিকিৎসা সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা ছিল—তাহা অনায়াসেই বুঝা যাইবে। গ্রন্থখানি সামান্য হইলেও—আমাদের গৌরবের নিদর্শন। নিম্নে মূল শ্লোক এবং তাহার অনুবাদ দেওয়া গেল।

সহচরস্য মূলস্য রক্ত সূত্রেণ বন্ধনাৎ।
মূর্দ্ধি সর্ব্ববিধো নশ্যেৎ জ্বরো বাজি শরীরজঃ॥

সহচরের (পীত ঝিন্টী) মূল, রক্ত সূত্রের দ্বারা মস্তকে বন্ধন করিলে, অশ্বের সর্ব্ববিধ জ্বর নষ্ট হয়।

কাঞ্জিকেন সমং লোধ্রং নিষ্পিষ্যাঙ্গেষু লেপনাৎ।
জ্বরো নাশং সমায়াতি তুরগস্য সুনিশ্চিতং॥

কাঞ্জিকের সহিত লোধকাষ্ঠ বাটিয়া অশ্বের অঙ্গে প্রলেপ দিলে, অশ্বের জ্বর নষ্ট হয়।

লতা কস্তুরিকা মূল চর্ব্বনান্নশ্যতি ধ্রুবং।
মুখ রোগ স্তুরঙ্গানাং সত্বরং সুধিয়ো দিতং॥

লতা কস্তুরিকা মূল চর্ব্বণ করিলে অশ্বগণের মুখরোগ নষ্ট হয়।

পদ্ম বীজাশনেনৈব কাস রোগঃ প্রশাম্যতি।

পদ্মবীজ ভক্ষণ করিলে, অশ্বের কাশরোগ নষ্ট হয়।

অসিতস্য তিলস্যাপি সুরয়া সহ ভক্ষণাৎ।
বাত রোগঃ প্রনষ্টঃ স্যাৎ সর্ব্বো বাজিগণস্যহি॥

মদ্যের সহিত কৃষ্ণতিল ভক্ষণ করিলে, অশ্বের সর্ব্ববিধ বাতরোগ নষ্ট হয়।

অশ্বানাং সহ মদ্যেন গুড়চী বিশ্ব ভক্ষণাৎ।
শাখাগতং নিহন্ত্যাশু বাত রোগং সুদারুণং॥

মদ্যের সহিত গুলঞ্চ ও শুঁঠ ভক্ষণ করিলে, অশ্বের শাখাগত বাতরোগ নষ্ট হয়।

ছর্দ্দিরোগে সমুৎপন্নে বাজিনাং তৎ প্রশান্তয়ে।
উত্তপ্ত লৌহদণ্ডেন দগ্ধং কুর্য্যাৎ পদদ্বয়ং।

অশ্বের বমন রোগ উপস্থিত হইলে, উত্তপ্ত লৌহদণ্ড দ্বারা দুইটী পা দগ্ধ করিয়া দিবে।

তণ্ডুলেন সহাশ্বস্য ধাতকীপুষ্প ভক্ষণে।
অতিসারঃ প্রবলোঽপি নাশ মায়াতি তৎক্ষণাৎ॥

তণ্ডুল ও ধাতকীপুষ্প ভক্ষণ করিলে, অশ্বের প্রবল অতিসার তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়।

কাঞ্জিক পানাদশ্বস্য তন্দ্রাদাহৌ বিনশ্যতঃ।

কাঞ্জিক পান করিলে, অশ্বের তন্দ্রা এবং দাহ রোগ নষ্ট হয়।

রসাঞ্জন গৈরিকায়া র্হরিদ্রায়াশ্চ বাজিনাং।
অঞ্জনেন বিনষ্টঃ স্যাৎ রোগো নেত্র সমুদ্ভবঃ॥

রসাঞ্জন গেরিমাটী, এবং হরিদ্রার অঞ্জনে, অশ্বের নেত্ররোগ নষ্ট হয়।

পলাশ বীজ চূর্ণস্য বারিণা মিশ্রিতস্য চ।
ধারণা দ্বাজিলা মাস্যে মুখ-পাকো বিনশ্যতি॥

জলের সহিত পলাশ বীজ চূর্ণ মুখে ধারণ করিলে, অশ্বের মুখ-পাক নষ্ট হয়।

বন্ধুক পুষ্পং বধ্নীয়াৎ কর্ণ রোগোপশান্তয়ে।
শ্রবণে বাজি-রাজীনাং তেন নূনং প্রশাম্যতি॥

বন্ধুক পুষ্প (বাঁধুলী) কর্ণে বন্ধন করিলে, অশ্বের কর্ণ রোগ নষ্ট হয়।

কৃমির্লিখেৎ কোষ্ঠস্থঃ খর্জ্জুর পত্র ভক্ষণাৎ।

খর্জ্জুর পত্র ভক্ষণ করিলে, অশ্বের কোষ্ঠগত কৃমি নষ্ট হয়।

শ্রীব্রজবল্লভ-কাব্যতীর্থ-কাব্যকণ্ঠ বিশারদ।

টাকা।

[১]

ধন্য টাকা! ধন্য বটে! মহিমা তোমার!
তুমি যা'র ঘরে নাই,
বলি, তা'র মুখে ছাই;
"লক্ষ্মীছাড়া" অভিধানে, কয় অতঃপর॥

[২]

ধন্য টাকা! ধন্য বটে! মহিমা তোমার!
তুমি যা'র আছ ঘরে,
মান্য, গণ্য, সবে করে;
পুত্র, পরিবারে তা'রে, তোষে নিরন্তর॥

[৩]

ধন্য টাকা! ধন্য বটে! মহিমা তোমার!
(তুমি) সতীরে অসতী কর,
সুজাতির জাতি মার;
আচণ্ডাল ধনী হ'লে পায়ত আদর?॥

[৪]

ধন্য টাকা! ধন্য বটে! মহিমা তোমার!
কলিতে নীচের ঘরে,
থাক তুমি সমাদরে;
উচ্চ ঘরে থাকিবারে, নারাজ বিস্তর॥

[৫]

ধন্য টাকা! ধন্য বটে! মহিমা তোমার!
তাই লক্ষ্মী নীচগামী,
পতিপ্রাণা ফেলে স্বামী;
অর্থ মদে হয়ে মত্ত, আকাঙ্ক্ষা বিস্তর॥

[৬]

ধন্য টাকা! ধন্য বটে! মহিমা তোমার!
(তুমি) অসাধ্য সাধন কর,
অজ্ঞানে সজ্ঞান কর;
সৃষ্টি ছাড়া, কার্য্য কর, ওহে সৃষ্টিধর॥

[৭]

ধন্য টাকা! ধন্য বটে! মহিমা তোমার!
(কিবা!) উজ্জ্বল সুগোল কায়,
'রাণী মূর্ত্তি' আঁকা গায়;
পয়সায় ষোল গণ্ডা, নহে তুচ্ছ দর॥

[৮]

ধন্য টাকা! ধন্য বটে! মহিমা তোমার!
ঠুন্ ঠুন্ কিবা! শব্দ,
আবাল, বণিতা, জব্দ;
বৃদ্ধ, যুবা, শুনে স্তব্ধ, ধ্বনিতে যাহার॥

[৯]

ধন্য টাকা! ধন্য বটে! মহিমা তোমার!
তুমি টাকা চমৎকার!
কি গুণ বলিব আর!
তোমা বিনা ত্রিসংসার হয় যে আঁধার॥

[১০]

ধন্য টাকা! ধন্য বটে! মহিমা তোমার!
রোগ, শোক, তুমি নাশ,
গলায় পরাও ফাঁস;
ভব তরে, হাঁস্ ফাঁস্, করে ত্রিসংসার॥

[১১]

ধন্য টাকা! ধন্য বটে! মহিমা তোমার!
(তুমি) একতিল হ'লে ছাড়া,
সৃষ্টি শুদ্ধ যায় মারা;
"হা! টাকা! হা! টাকা!" বলে, করে হাহাকার!

[১২]

ধন্য টাকা! ধন্য বটে! মহিমা তোমার!
পাপ, পুণ্য, যাই বল,
সকলি তোমারি কল;
তুমি পার ফেলিবারে যা'তে ইচ্ছা কর॥

[১৩]

ধন্য টাকা! ধন্য বটে! মহিমা তোমার!
যে যত তোমায় পায়,
সে তত তোমায় চায়;
ধরা, সরা জ্ঞান করে, পে'লে অতঃপর॥

[১৪]

ধন্য টাকা! ধন্য বটে! মহিমা তোমার!
(কবি) ভুবন কিষণ বলে,
যা' কিছু অর্থের বলে;
ধর্ম্মী, খুনী, পাপ করে, হয় সে উদ্ধার॥

[১৫]

ধন্য টাকা! ধন্য বটে! মহিমা তোমার!
কল্পতরু তুমি টাকা,
থেকো'না আমায় ফাঁকা;
মনতি আমার রেখ, কোটী নমস্কার॥

[১৬]

ধন্য টাকা! ধন্য বটে! মহিমা তোমার!
বৃক্ষ ফ'ল তুমি হ'লে,
ধামা ভরি ঘরে তুলে;
টপাটপ্ গালে ফেলে, হতে'ম সুস্থির॥

[১৭]

রূপার চাক্তিরে! মরি! কি গুণ তোমার!
নাহি সাঁস, নাহি আঁটী;
নাহি খোসা, নাহি শুঁটী;
(কিবা!) চক্‌চকে পরিপাটী;
ইচ্ছা হয় সদা ঘাঁটী, এমন সুন্দর!॥

শ্রীভুবনকৃষ্ণ মিত্র।

তুমি।

তুমি উজ্জ্বল যেন প্রভাত রবি
দীপ্ত নয়ন ধারা;
তুমি মধুর যেমন বাসন্তী রাতে
কৌমুদী দিশেহারা;
তুমি স্নিগ্ধ যেমন শোক-তাপহরা
পূত জাহ্নবী বারি;
তুমি শীতল যেমন মলয়-সমীর
অধীর যাতনাহারী;
তুমি মুক্ত যেমন মানস-কুঞ্জে
পিকবর-মধু-তান;
তুমি পবিত্র যেন ত্রিবেণী-তীরে
কি মহা যোগের স্নান;
তুমি ফুল্ল যেমন নব নলিনীর
অধরে অমর হাসি;
তুমি কোমল যেমন উদ্যান-মাঝে
ক্ষুদ্র ভূমিকা-রাশি;
তুমি সুন্দর যেমন পর্ব্বত-কোলে
একটী রজত-ধারা;
তুমি লক্ষ যেমন জলধি-ভ্রান্ত
শাবকের ধ্রুবতারা;

তুমি দুর্লভ যেন মরুশাহারায়
সুধা-প্রস্রবণ ক্ষীণ ;
তুমি দয়াময়ী যেন আলোক-স্তম্ভ
সাগরে সহায়হীন ;
তুমি নূতন যেমন ঘোম্‌টার মাঝে
বধূর চাহনি নব ;
তুমি অতুল যেমন চির অতুলনা
ওই মুখখানি তব ;
তুমি প্রশান্ত যেন পাদপ অশোক
নম্র, বিনত-ধীর ;
তুমি শান্তিদায়িণী আঁখি-কোণে যেন
এক ফোঁটা অশ্রু-নীর।

কালিদাস চক্রবর্ত্তী।

সমালোচনা।

পালফ্রেণ্ড।—পরিচ্ছদ মানব সৌন্দর্য্যের একমাত্র উপাদান ; বাহ্যিক বেশ-ভূষায় ব্যক্তিমাত্রকেই ইতর ভদ্র কি মধ্যবিত্ত, তাহা অনায়াসেই নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে ; দেশকাল ও পাত্রভেদে,—বর্ত্তমানকালে আমাদের দেশে বিবিধ নূতন নূতন পোষাক পরিচ্ছদের ব্যবহার চলিয়াছে ;—এই পোষাক পরিচ্ছদ প্রস্তুত কার্য্যে যাঁহারা নূতনত্ব দেখাইতে পারেন, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত এবং আদর্শস্থানীয় হইয়া থাকেন। কলিকাতা পাল ফ্রেণ্ড কোম্পানী ইহার দৃষ্টান্ত স্থল,—আমরা কলিকাতার ৩৪৬ নং অপার চিৎপুর রোডের পাল ফ্রেণ্ড কোম্পানীর সততা, কার্য্যতৎপরতা ও নূতন ধরণের কাট ছাঁট দেখিয়া সবিশেষ প্রীত হইয়াছি।

আমরা সুবিখ্যাত ভিক্টোরিয়া কেলিক্যাল ওয়ার্কসের প্রস্তুত এক শিশি কারবলিক টুথ পাউডার উপহার পাইয়াছি, ইহার দ্বারা দন্তধাবণ করিলে দাঁত বেশ পরিস্কার হইয়া মুখের দুর্গন্ধ দুর হয়।

জন্মভূমি।

(সচিত্র মাসিক পত্র।)

নবম বর্ষ। } ১৩০৭ সাল, ফাল্গুন। { ৮ম সংখ্যা।

ভিক্টোরিয়া-জীবনী-প্রসঙ্গ।

ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নাম এ ভারতবর্ষে কে না জানে? বালক ও বৃদ্ধ, পুরুষ ও স্ত্রী, ধনী ও দরিদ্র সকলেই মহারাণীর নাম জানে এবং তাঁহাকে হৃদয়ের সহিত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে। আমরা মাতৃ-স্তন্যপানের সহিত সেই পবিত্র নাম-সুধা পান করিয়াছি, আমাদের রুধিরের সহিত সে অমৃতময় নাম বিমিশ্রিত হইয়া গিয়াছে, পরে ক্রমেই বড় হইয়াছি, ক্রমেই তাঁহার দেবী-জীবনের অশেষ পুণ্যময়ী কথা শ্রবণ করিয়া, তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধান্বিত হইয়া পড়িয়াছি। আমরা যে মহারাণীকে রাজ্ঞী বলিয়া মান্য করি, ভক্তি করি, তাহাই নহে, তাঁহাকে নিতান্ত আপনার জন বলিয়া স্বীয় মাতৃবৎ শ্রদ্ধা করি। সকলেই জানেন, সেই অশেষ সৎগুণাধার, স্ত্রীজন-সুলভ কোমলতা-মণ্ডিতা আমাদের মাতৃবৎ শ্রদ্ধার ও ভক্তির পাত্রী মহারাণী ভিক্টোরিয়া আর ইহজগতে নাই; তিনি এ নশ্বর জগতের ক্ষণবিধ্বংশি শরীর পরিত্যাগ করিয়া গত ২২শে জানুয়ারী (১৯০১) মঙ্গলবার মঙ্গলময়ের চরণে লীনা হইয়া স্বর্গীয় শান্তি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র-পৌত্রাদি পরিবারবর্গ, অসীম রাজ্যের প্রজাকুল, সকলেই তাঁহার জন্য আন্তরিক সন্তপ্ত ও শোকভারাক্রান্ত হইয়াছেন। তাঁহার সুবিশাল রাজ্যের সর্ব্বত্রই নানারূপ সভা সমিতি, এবং নানা সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা তাঁহার বিয়োগবেদনা পরিব্যক্ত করা হইতেছে। সকল দেশের স্বাধীন রাজন্যবর্গও তাঁহার জন্য আন্তরিক শোক ও তাঁহার আত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শন

করিতেছেন। বাস্তবিকই আজ পৃথিবীস্থ সমস্ত লোক এই পুণ্যবতী রমণীর পবিত্র গুণাবলী স্মরণ করিয়া খেদ প্রকাশ করিতেছে। এটি একদিকে যেমন দুঃখের চিত্র, অন্যদিকে আবার আনন্দের চিহ্নও বটে! ইহা হইতে তাঁহার জীবনের মহত্বের আমরা বিশিষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হই। যাঁহার অভাব আজ সমস্ত পৃথিবী অনুভব করিতেছে, তিনি বড় সামান্যা রমণী নহেন। তাঁহার রাজগুণ অপেক্ষা হৃদয়ের মহত্বেই তিনি এরূপ মহৎ সম্মানের অধিকারিণী হইয়াছেন। মহৎ জীবনী আলোচনা করিলেও পুণ্য আছে, এজন্য আমরা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জীবনের কতকগুলি ঘটনা আলোচনা ব্যপদেশে এই আদর্শ রমণীর নাম কীর্ত্তন দ্বারা স্বীয় আত্মার পবিত্রতা সম্পাদন করিতে আসিয়াছি। পাঠকবর্গ বিশেষতঃ পাঠিকাবর্গ ইহাতে কিছু উপকৃত হইতে পারেন এবং স্বীয় স্বীয় জীবন এইরূপে গঠন করিতে চেষ্টা করিতে পারেন, ইহাও একতম উদ্দেশ্য। মহারাণীর স্মৃতিচিহ্ন নানা জনে নানাপ্রকারে স্থাপন করিতে অভিলাষী হইয়াছেন—সে অবশ্য ভাল কথা! কিন্তু আমাদের পাঠিকাগণের মধ্যে যাঁহাদের তাদৃশ কোন অর্থ সঙ্গতি নাই, তাঁহাদিগের নিকট এবং পাঠিকা সাধারণের নিকট এই প্রসঙ্গে আমি একটা স্মৃতিচিহ্নের প্রস্তাব করি যে, তাঁহারা এই পুণ্যবতী মহিলার জীবনের মহত্ত্ব ও সৎগুণাবলী আলোচনা দ্বারা স্বীয় স্বীয় জীবনে সেই সব গুণ প্রদর্শন করিতে চেষ্টমানা হইবেন, এবং নিজ নিজ কন্যা, পুত্র, বধূ প্রভৃতিকেও সেই সব আদর্শগুণে ভূষিতা করিতে সর্ব্ব প্রযত্নে চেষ্টা করিবেন। এই চেষ্টায় সফলতা লাভ করিলে তাঁহার স্মৃতিরও যেমন সম্মান করা হইবে, তেমনই এদিকে আমাদিগের বঙ্গের সংসারের লক্ষ্মী স্বরূপিণী রমণীগণও অনেক উপকৃতা হইবেন। ইহাতে অর্থব্যয় নাই, পরিশ্রম নাই, কেবল একটু আন্তরিক নিবিষ্ট চেষ্টা মাত্র। তরসা করি, পাঠক-পাঠিকাগণ আমার এ প্রস্তাবটির সারবত্তা বিবেচনা করিবেন, এবং তদনুসারে চেষ্টা করিয়া মহারাণীর পুণ্য স্মৃতির গৌরব রক্ষা করিবেন।

আমরা এস্থলে মহারাণীর ধারাবাহিক জীবনী আলোচনা করিব না, তাহা অনেকেই অনেক সংবাদপত্রাদিতে পাঠ করিয়াছেন। তবে সংক্ষেপে এই মাত্র বলিয়া রাখিতেছি যে, মহারাণী ভিক্টোরিয়া ইংলণ্ডের রাজা

৩য় জর্জ্জের চতুর্থ পুত্র এড্ওয়ার্ড ডিউক অব কেণ্টের কন্যা। ইঁহার মাতা জর্ম্মন রাজবংশীয়া। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ২৪শে মে ইনি স্বীয় পিতার প্রাসাদ কেনসিংটনে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজ্য-ভার প্রাপ্ত হন।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ইনি জর্ম্মন রাজপুত্র এলবার্টএর সহিত বিবাহিতা হন। এই বিবাহের ফলে তিনি নয়টি সন্তানের জননী হন। বর্ত্তমান সম্রাট্ সপ্তম এডোয়ার্ড তাঁহার দ্বিতীয় সন্তান ও জ্যেষ্ঠপুত্র। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে তিনি আমাদের ভারতবর্ষের অধীশ্বরী হন এবং তদুপলক্ষে ঘোষণা পত্র প্রচার দ্বারা জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সুবিচার হইবার অভয় প্রদান করেন। ১৮৮৮ সালে জুবিলী এবং ১৮৯৭ সালে হীরক জুবিলি হয়। বর্ত্তমান ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ২২শে জানুয়ারী মঙ্গলবার রাত্রে তাঁহার মৃত্যু হয়।

যে সমস্ত সৎগুণ থাকিলে মানুষ নরদেব বলিয়া গণ্য হয়, ভগবানের কৃপায় মহারাণীর সে সমস্তই ছিল। স্ত্রীজনোচিত কোমলতা, স্নেহ, দয়া, মায়া ইত্যাদি ত তাঁহার চরিত্রের অলঙ্কার ছিল, তদ্ব্যতীত সত্যনিষ্ঠা, বিলাসহীনতা, আত্মসংযম, নিরহঙ্কারিতা ইত্যাদি গুণও তাঁহাতে বহুল পরিমাণে বিদ্যমান ছিল।

সন্তানের ভবিষ্য জীবনের মঙ্গলামঙ্গল যে পিতা মাতার উপরই একমাত্র নির্ভর করে, একথা অবিসংবাদী সত্য। পিতা মাতার গুণ অলক্ষ্যে সন্তানের জীবনে অনুপ্রবিষ্ট হয়, আবার তাঁহাদের দোষও তদ্রূপ সন্তানে সংক্রান্ত হয়, এজন্য সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই তাহার সুশিক্ষার বিষয় পিতামাতার দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। এ বিষয় বেশী বলিবার স্থান বর্ত্তমান প্রবন্ধে নহে, ভবিষ্যতে তাহা বিশদ করিয়া বলিবার ইচ্ছা থাকিল; তবে মহারাণীর জীবনের এই সব সৎগুণের জন্যও যে তিনি তাঁহার পিতামাতার নিকট ঋণী, তাহা বলিবার জন্যই ঐ কথার উল্লেখ করিতে হইল। মহারাণীর পিতা ডিউক মহোদয় অত্যন্ত পরোপকারী, বিলাসিতা বর্জ্জিত, কলানিপুণ এবং নিরহঙ্কার ছিলেন, ভৃত্যগণকে পর্য্যন্ত তিনি বিশেষ স্নেহ করিতেন এবং তাহাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি বিশেষ যত্ন লইতেন। যদিও মহারাণীর দুর্ভাগ্য বশতঃ ঈদৃশ পিতার স্নেহ হইতে তিনি এক বৎসর বয়স না হইতেই বঞ্চিতা হইয়া ছিলেন,

তথাপি পিতৃগুণাবলী যে তিনি সম্যক্ লাভ করিয়া ছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য। পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার মাতা মহারাণীকে সৎগুণ-মণ্ডিতা করিতে বিশেষ পরিশ্রম ও যত্ন করিয়া ছিলেন। তিনিও অশেষ সৎগুণশালিনী মহীয়সী রমণী ছিলেন; তাঁহার স্নেহের ধন একমাত্র বিনোদস্থান 'ড্রিনা' (মহারাণীর বাল্যের আদরের নাম—পূর্ণ নাম আলেক্ জন্দ্রিনা), যাহাতে সৎগুণের আধার হন, সে বিষয়ে তাঁহার আন্তরিক যত্ন ছিল; দোষ দেখিলে তিরস্কার করিতে তিনি পরাঙ্মুখী হন নাই। কন্যার শিক্ষার জন্য 'লেজেন' নাম্নী একটি শিক্ষয়িত্রীও নিযুক্তা হইয়াছিলেন। যাহা হউক, মাতার এইরূপ ঐকান্তিকী চেষ্টার ফলে মহারাণী বাল্যবয়সেই স্বীয় চরিত্রের মাধুর্য্যে প্রত্যেকেরই স্নেহ ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন, কন্যার মধ্যে যাহাতে বিলাসিতা অহঙ্কার আদি প্রবেশ করিতে না পারে, মাতা সে জন্য বিশেষ সতর্ক ছিলেন। ঈশ্বর কৃপায় তাঁহাতে সে সব দোষ প্রবেশ করিতেও পায় নাই। রাজকুমারী বাল্যকাল হইতেই স্নেহময়ী, দয়াবতী, নিরহঙ্কারা! শিক্ষা বিষয়েও তাঁহার একান্ত আগ্রহ ছিল, এবং তাহাতে মেধার পরিচয়ও বিশেষরূপেই তিনি প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু এ ক্ষেত্রেও তিনি সর্ব্বদা শিক্ষয়িত্রীর আদেশানুবর্ত্তিনী ছিলেন। বড় ঘরের মেয়ে বলিয়া একদিনও শিক্ষয়িত্রীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন নাই। আমাদের দেশের অনেক বড় ঘরের বালিকার পক্ষে এই আদর্শ বিশেষ-রূপে অনুকরণীয়।

তিনি বাল্য হইতেই নিরহঙ্কার—আমাদের দেশের বড় ঘরের বালক-বালিকাগণ বাল্য হইতেই নানাপ্রকারে, তাঁহারা যে বড় মানুষের ছেলে মেয়ে, এই শিক্ষায় অভ্যাস্ত হয় এবং তখন হইতেই আর সকলকে তুচ্ছ তৃণজ্ঞান করিতে আরম্ভ করে। সেটি একটি মহৎ দোষ। মাতৃগণ অনেক সময় সে অভ্যাসে তাহাদিগকে সাহায্য করেন, এটা কতদূর সঙ্গত তাহা তাঁহারা বিবেচনা করিবেন—সে অহঙ্কার ভবিষ্যতে কত ভাল ফল প্রদান করে, তাহাও একবার বিবেচ্য।

মহারাণী অসঙ্কোচে নিজ বাল্যসঙ্গীতসখীর সহিত মেজের মাদুরে বসিতেন এবং নিজের মূল্যবান্ খেলনকগুলি স্বেচ্ছায় তাহাকে দান করিতেন। ইহাতেই তাঁহার বাল্যহৃদয়ের উদারতা ও নির্লোভিতার

পরিচয় পাওয়া যায়। অনেক বালক-বালিকাই এরূপ স্বার্থত্যাগ করিতে পারে না। এমন কি, নিজ নিজ ভাই বোনের সঙ্গে পর্য্যন্ত এই সব পুতুল আদি লইয়া ঝগড়া-দ্বন্দ্ব করে, সেটা তাহাদের মাতৃগণের প্রশংসার বিষয় নহে।

মহারাণী ৯।১০ বৎসর বয়সে যে বুদ্ধির ও সৎবিবেচনার পরিচয় দিয়াছেন, তাহার দুই একটি দৃষ্টান্ত এখানে দিতেছি, তাহা হইতেই সকলে বুঝিবেন যে, কালে তিনি যে একজন আদর্শ সতী রমণী হইবেন, তাহার পরিচয় তখনই তিনি প্রদান করিয়াছিলেন।

কোন সময় মহারাণী দুই একজন সঙ্গিনীসহ গাড়ীতে বেড়াইতে বেড়াইতে এক জহুরীর দোকানের নিকট দিয়া যাইতে ছিলেন। এই সময় দেখিলেন, একটি রমণী একছড়া হার পছন্দ করিতেছেন। রমণী বহুকষ্টে একছড়া মনোমত হার বাছিয়া তাহার মূল্য জিজ্ঞাসা করিলেন। জহুরী একটা উচ্চ মূল্য হাঁকিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহাপেক্ষা কম মূল্যে ঐ হার বিক্রয় করিতে পারে কি না?" জহুরী বলিল, 'না।' রমণী তখন ক্ষুণ্ণা হইয়া হার প্রত্যর্পণ করিয়া বলিলেন, "তবে আর হার লওয়া হইল না। আমার অবস্থা এমন নহে যে, অতমূল্য একছড়া হারে ব্যয় করিতে পারি।" রমণী চলিয়া গেলেন। রাজকুমারী সবই দেখিলেন, এবং পরে জহুরীর নিকট ঐ রমণীর সম্বন্ধে সমস্ত শুনিয়া তিনি এত প্রীতা হইলেন যে, নিজে মূল্য দিয়া ঐ হার ছড়া কিনিয়া ঐ রমণীকে পাঠাইয়া দিলেন এবং সঙ্গিনীর দ্বারা ঐ সঙ্গে এই মর্ম্মে একখানি পত্র লিখাইয়া দিলেন যে, আপনি এই হারছড়াটি বিশেষ পছন্দ করিলেও অবস্থাতিরিক্ত মূল্য বিধায় তাহা ক্রয় করিতে বিরত হইয়া যে সৎবিবেচনার পরিচয় দিয়াছেন, সে জন্য রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া পরম সন্তুষ্ট হইয়া এই হার আপনাকে উপহার দিলেন। তিনি আশা করেন, আপনি এইরূপ স্বীয় অবস্থা বিবেচনায় চিরকাল চলিবেন, এইরূপ অবস্থা বুঝিয়া চলার উপরই স্ত্রীজাতির সংসারে সুখ-শান্তি ও স্বচ্ছন্দতা নির্ভর করে।" এই ৯।১০ বৎসর বয়সেই স্বীয় অবস্থা বুঝিয়া চলিবার কর্ত্তব্যতা বিষয় কিরূপ জ্ঞান হইয়াছিল; দেখুন দেখি! আমাদের দেশীয়া অনেক রমণীর এই অবস্থাতিরিক্ত ব্যয়ের দুর্নাম আছে, বিশেষতঃ অলঙ্কার পত্রের জন্য

দাবী করিতে অনেক সময় তাঁহারা স্বামীর অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করেন না। মহারাণীর বাল্যবয়সের এই অমূল্য উপদেশটি তাঁহাদের হৃদয়ে গ্রথিত হওয়া উচিত।

আর একবার মহারাণী একটি বড়ই পছন্দসই একটা খেলানা কিনিয়া দোকানের বাহিরে আসিতেছেন, এমন সময় একজন দরিদ্র ব্যক্তি তাঁহার নিকট নিজ দৈন্য জ্ঞাপন করিল, সঙ্গে আর অর্থ না থাকায় তিনি পুতুলটী ফেরৎ দিয়া সেই অর্থ দরিদ্রকে দান করিয়া স্বীয় স্বর্গীয় হৃদয়ের পবিত্র স্নেহ-ধারার পরিচয় প্রদান করিয়া ছিলেন। এইরূপে অনেক প্রকারেই তিনি স্বীয় চরিত্রের মাধুর্য্যের পরিচয় বাল্যেই প্রদান করিয়া ছিলেন। যাঁহারা তাঁহাকে বাল্যকালে দেখিয়া ছিলেন, তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে বলেন, তিনি মিষ্টভাষিণী, মিতব্যয়িনী, সত্যভাষিণী, নম্র, ধীরা, অথচ সৎসাহস সম্পন্না ছিলেন। যখন রাজ-সিংহাসন প্রাপ্তির বিষয় একরূপ স্থিরই হইল, তখনও তাঁহার মাতা পাছে কন্যা এ সংবাদে অহঙ্কৃতা হন, এজন্য তাঁহাকে এ সংবাদ জানান নাই, কিন্তু শেষে যখন জানান হইল, তখন তিনি বলিয়া ছিলেন, "রাণী হওয়া বড় কঠিন কার্য্য, সকল প্রজার সুখ-স্বচ্ছন্দতা বিধানের জন্য অনবরত দেখা আবশ্যক। আমাকে যদি তাই হইতে হয়, আমি ভাল ভাবে তাহা করিতে চেষ্টা করিব, ভগবান আমাকে সাহায্য করিবেন।" আহা! একথা তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া গিয়াছেন, যেখানে কষ্ট, যেখানে বেদনা, যেখানে আর্ত্তনাদ, সেখানেই তাঁর মাতৃহৃদয় অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাহার অংশ গ্রহণ করিয়া প্রজাকুলকে আশ্বস্ত করিয়াছেন। তাঁহার সহানুভূতি সর্ব্ববিধ বিপদে সর্ব্ব শ্রেণীর উপর বিস্তৃত ছিল। স্নেহ মমতা রমণী হৃদয়েরই গুণ; রমণীগণ এই গুণে মণ্ডিতা হইলেই সংসারের শান্তিদায়িনীরূপে নানা শোক-তাপক্লিষ্ট পুরুষগণকে শান্তির শীতল ছায়া দান করেন। মহারাণী রাজপদ প্রাপ্ত হইলেই স্বীয় বাল্যসখী দরিদ্র কন্যাগণকে ভুলেন নাই; তাহাদিগের বিপদে আপদে সান্ত্বনা দিয়াছেন, সাহায্য করিয়াছেন এবং স্পষ্ট বলিয়াছেন, ইংলণ্ডের রাণী হইলেও তাহাদিগকে তিনি কখন ভুলিবেন না। এটা বড় কম ঔদার্য্যের পরিচয় নহে। অনেক দরিদ্র কন্যা সৌভাগ্যক্রমে ধনীর গৃহে বিবাহিতা হইয়া স্বীয় দরিদ্রা বাল্যসখীগণকে

চিনিতে পারাও অপমান জ্ঞান করেন এবং নানাপ্রকারে স্বীয় গর্ব্ব-চিহ্ন সমস্ত প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাঁহারা এই বিশাল রাজ্যেশ্বরীর ব্যবহারটা মনে করিলে ভাল হয়।

দয়া ও ক্ষমাগুণের পরিচয় মহারাণীর জীবনে এত অধিক পাওয়া যায় যে, তাহা সংক্ষেপে ব্যক্ত করা অসম্ভব। তিনি ইংলণ্ডের রাণী হইলে পর একজনের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হয়, তখন সেই আদেশপত্রে রাজ-স্বাক্ষরের প্রয়োজন হইত, এজন্য মহারাণীর নিকট সেই আদেশ-পত্র স্বাক্ষরের জন্য আনীত হয়। মহারাণীর কোমল হৃদয় সে কঠোর আদেশ প্রদানে অক্ষম হইল। তিনি অনেক ভাবিয়া "ক্ষমা করিলাম" লিখিয়া দিলেন। এইরূপ আরও কয়েকটী ঘটনা উপস্থিত হওয়ায় শেষে নিয়ম হইল, ঐরূপ আদেশপত্রে স্বাক্ষরের আর আবশ্যক হইবে না। আহা! তাঁহার ন্যায় স্নেহের হৃদয় কি প্রাণদণ্ডের আদেশ দিতে পারে?

একবার মহারাণী কোনও দরিদ্রা মহিলার মৃত্যু-শয্যার পার্শ্বে বসিয়া তাঁহাকে ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিয়া শুনাইতে ছিলেন, পরে ধর্ম্মযাজক আসিলে "তিনিই ইহার উপযুক্ত ব্যক্তি" বলিয়া তাঁহাকে ঐ কার্য্য করিতে দিয়া চলিয়া যান।

বাহ্য-জাঁকজমক মহারাণীর জীবনে আদৌ ছিল না, তিনি তাহা ভালও বাসিতেন না। অনেক সময় তিনি একাকী ভ্রমণ করিতেন এবং দরিদ্র প্রজাগণের সঙ্গে অজ্ঞাতভাবে মিশিয়া তাহাদের সুখ-দুঃখের কথা জিজ্ঞাসা করিতেন এবং নানারূপে সমবেদনা প্রকাশ করিতেন।

তাঁহার বিবাহ ব্যাপারেও তাঁহার হৃদয়ের মহত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। রাজকুমার আলবার্টকে অশেষ গুণসম্পন্ন ও উদার হৃদয় জানিয়া তাঁহার প্রতি তিনি বিশেষ অনুরাগিণী হন; রাজকুমারের চরিত্র বিশেষরূপে জানিয়াই তিনি এরূপ প্রেমবতী হইয়া ছিলেন, এবং তাঁহার সহিত বিবাহিতা হওয়াই তাঁহার একমাত্র ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তথাপি তিনি গুরুজনের আদেশের ও সম্মতির অপেক্ষা করিয়াছিলেন। ইহাতেও তাঁহার চরিত্রের কোমলতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করা ভালবাসিতেন না। যাহা হউক, যখন তিনি

জানিলেন, এ বিবাহে সকলেই আনন্দের সহিত সম্মতি দিলেন, রাজকুমারও বিশেষ প্রফুল্লচিত্তে স্বীকৃত হইলেন, তখন তিনি নিরতিশয় আনন্দিতা হইয়াছিলেন। আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে সতী পবিত্রতার যে সমস্ত লক্ষণ পাঠ করা যায়, মহারাণীতে সে সবই প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে। তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন, "রাজপুত্র আলবার্ট নিষ্কলঙ্ক, দেবোপম চরিত্রবান্, তাঁহার ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তি আর তিনি দেখিতে পান না, আলবার্ট অতি উচ্চ, তিনি নিজে অতি তুচ্ছ। আলবার্টের স্ত্রী হইতে পারেন, এরূপ গুণ তাঁহার কিছুই নাই। রাজকুমার তাঁহাকে বিবাহ করিয়া বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ ও অসীম স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন; তিনি সর্ব্বপ্রযত্নে এমন দেবোপম স্বামীকে সুখী করিতে চেষ্টা করিবেন, কিন্তু তাহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইবেন, তাহাতে সন্দেহ। আলবার্টকে সুখী করাই তাঁহার জপমালা হইবে, ইত্যাদি প্রকারে স্বীয় পাতিব্রত্য তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। যখন বিবাহের সময় তাঁহারা ধর্ম্মমন্দিরে সমবেত হইলেন, তখন একটা কথা উঠিল যে, ইংলণ্ডের রাণী তাঁহার একজন প্রজা আলবার্টকে (কারণ ভিক্টোরিয়া বংশানুক্রমে রাণী হইলেও তাঁহার স্বামী রাজা নহেন, প্রজাগণ তাঁহাকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিলেন। তিনি ইংলণ্ডের একজন অধিবাসী, রাণীর প্রজা মাত্র) কেমন করিয়া বলিবেন যে, তিনি আলবার্টের অধীন থাকিবেন, মান্য করিবেন ইত্যাদি, সুতরাং প্রস্তাব হইল, মন্ত্র ও প্রতিজ্ঞার পাঠের পরিবর্ত্তন করা হউক। রাণী এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "সাধারণ স্ত্রীলোক যেরূপ ভাবে বিবাহিতা হইয়া থাকেন, তিনিও সেইরূপেই বিবাহিতা হইতে চাহেন। ইংলণ্ডের পবিত্র ধর্ম্মমন্দিরের যথানির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারেই তাহা সম্পন্ন হইবে। স্বামী সকল অবস্থাতেই স্ত্রীর পূজনীয়! সাধারণ স্ত্রীভাবে তিনি বিবাহ সম্বন্ধীয় সকল প্রতিজ্ঞাই পাঠ করিতে ইচ্ছুক আছেন।" কি সুন্দর কথা! কি আত্মগৌরব বিসর্জ্জন! তিনি সতী, তিনি তাঁহার আরাধ্য প্রাণের দেবতা স্বামীর নিকট অধীনতা, বাধ্যতা স্বীকার করিবেন না? এই তাঁহার মনের ভাব! ধর্ম্মযাজক প্রতিজ্ঞা পাঠ করাইলেন, ভিক্টোরিয়া বিশেষ আন্তরিকতার সহিত স্বীকার করিলেন। তিনি আলবার্টকে স্বামীরূপে বরণ করিয়া তাঁহাকে মান্য করিতে, সম্মান দেখাইতে, সেবাশুশ্রূষা করিতে, আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া চলিতে,

আপদে বিপদে, সুখে দুঃখে তাঁহার সঙ্গিনী হইতে এবং তাহার প্রতি আজীবন অক্ষুণ্ণভাবে অনুরক্তা থাকিতে স্বীকৃতা আছেন। বলা বাহুল্য, এ পবিত্র প্রতিজ্ঞাও তিনি অক্ষুণ্ণভাবে পালন করিয়াছেন, রেখামাত্রও বিচ্যুতি ঘটে নাই।

মহারাণীর বিবাহের জীবন যে কিরূপ স্বর্গীয়সুখে অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহা কি বলিব! মহারাণীর মতে আলবার্ট অপেক্ষা পবিত্র, মহৎ এবং হৃদয়ের বস্তু আর পৃথিবীতে নাই। একদণ্ড তাঁহার সঙ্গ ছাড়া হইলে, মহারাণী অন্ধকার দেখিতেন, সব তাঁহার নিকট শূন্য বলিয়া বোধ হইত। স্বামী নিকটে থাকিলে তিনি সর্ব্বদা আনন্দসাগরে মগ্ন থাকিতেন। স্বামীর চরণে প্রাণমন সমর্পণ করিয়া হৃদয় ঢালিয়া কেমন করিয়া তাঁহাকে সুখী করিবেন, এই চিন্তাতেই তিনি অস্থির হইতেন। স্বামীর সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন কার্য্যই করিতেন না, এমন কি, রাজকার্য্যে পর্য্যন্ত স্বামীর উপদেশ লইতেন এবং কিসে প্রজার কল্যাণ হয়, সে বিষয়ে পরামর্শ করিতেন। রাজকুমারও এমন সাধ্বী স্ত্রী পাইয়া তাঁহার প্রতি যে বিশেষ অনুরক্ত হইয়াছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য। বস্তুতঃ তাঁহাদের দুই হৃদয়ের যেন মণিকাঞ্চনযোগ হইয়াছিল এবং নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে তাঁহাদের যুগল জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। এদিকে মহারাণী যখন সন্তানের মাতা হইলেন, তখন সন্তানগণের সুশিক্ষা দানের বিষয় তাঁহারা উদাসীন্য অবলম্বন করেন নাই। এত বড় একটা রাজ্যের রাণী হইলেও তিনি ধাত্রীর হস্তে সন্তান পালনের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হন নাই, তাহাদের শিক্ষাসহবৎ ইত্যাদির বিষয় যত্ন লইতেন এবং পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। যাহাতে সন্তানগণ বিলাসী অহঙ্কৃত না হয়, সে বিষয় তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। সন্তানগণকে কখন জাঁক-জমকের পোষাক পরিতে দিতেন না, কখন কোন অবিনয় দেখিলে তাহা মার্জ্জনা করিতেন না। একবার তাঁহার কয়েকটী সন্তান একটি পরিচারিকার মুখ আমোদ স্থলে কালি দিয়া চিত্রিত করিয়া দিয়াছিলেন, মহারাণী তাহা জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ দোষী সন্তানগণকে ডাকাইয়া যুক্তকরে পরিচারিকার নিকট স্বীয় স্বীয় দোষের জন্য রীতিমত ক্ষমা প্রার্থনা করাইয়া তবে ছাড়েন। আমাদের দেশের বড়লোকের ছেলে মেয়েরা তো অনেক স্থলে পরিচারিকাগণকে

বিড়াল কুক্কুরের তুল্যই জ্ঞান করে এবং যথেচ্ছ ব্যবহার করে! পরিচারিকার প্রতি অত্যাচার করিলে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা এটা অনেক মাতার বিশেষতঃ বড় ঘরের অনেক রমণীর নিকট স্বপ্ন ও কল্পনাতীত ঘটনা! সন্তানগণকে বাগানের কাজ, অন্যান্য ক্রীড়া ইত্যাদিতে সর্ব্বদা উৎসাহ দিতেন, এবং আত্মনির্ভরতা শিক্ষা দিতেন। সামান্য সামান্য কাজকর্ম্মে চাকরদের উপর নির্ভর করিয়া থাকা তিনি ভালবাসিতেন না। রাজকন্যা হইলেও কন্যাগণকে রন্ধন, সূচিকর্ম্ম, গৃহস্থিত আসবাবের শৃঙ্খলা ও বন্দোবস্ত, গৃহিণীপনা ইত্যাদি বিশেষ যত্নের সহিত শিক্ষা দিতেন এবং যাহাতে তাহারা এ বিষয়ে অনুরাগিণী হয়, সেদিকে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তাহার ফলে কন্যাগণও সকলেই সুগৃহিণী, এবং আত্মম্ভরিতা ও বিলাসিতা-বর্জ্জিতা হইয়াছেন। এইরূপে তিনি মাতৃ-কর্ত্তব্য সর্ব্বথা পালন করিয়াছিলেন।

মহারাণী সর্ব্বদা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেন যে, স্বামীর বিরহযাতনা যেন তাঁহাকে সহ্য করিতে না হয়। কোন্ সতীরমণী সে প্রার্থনা না করেন? কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা অন্যরূপ বলিয়া তাঁর সে প্রার্থনা পূর্ণ হয় নাই। বিংশ বৎসরকাল অনাবিল স্বামী-প্রেম-ভোগ ও স্বামী-সেবা করিবার পর বিধাতার অখণ্ডবিধানে তাঁহাকে স্বামীহারা হইতে হয়। উঃ! সে সময় মহারাণীর পক্ষে কি ভীষণ! মহারাণীর হৃদয়গ্রন্থি যেন ছিন্ন হইয়া গেল! স্বামীর শয্যাপার্শ্বে সতী বসিয়া তাঁহার জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হওয়া পর্য্যন্ত যুক্তকরে ভগবানের নিকট তাঁহার আত্মার কল্যাণ জন্য প্রার্থনা করিলেন, পরে যখন সব ফুরাইল, প্রাণপ্রিয়তম এ নশ্বরলোক পরিত্যাগ করিলেন, তখন মহারাণী লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন—উঃ! সে বেদনার—সে মর্ম্মন্তুদ কষ্টের সতীর বৈধব্য-যন্ত্রণার দৃশ্যের আর বিস্তৃতি কাজ নাই; তাহা সহজেই অনুমেয়। মহারাণী সেই শোকের তরুণ আঘাত সহ্য করিতে বড়ই বেগ পাইয়াছিলেন। শেষে আত্মসংযম ও ভগবানে নির্ভর শীলতার বলে তাহা বাহ্যে সংযত করিলেন বটে, কিন্তু অন্তরে অন্তরে সে দুর্ব্বিসহ শোকবহ্নি চিরকাল তিনি অনুভব করিয়া গিয়াছেন এবং স্বামীর মৃত্যুর পর হইতে প্রকৃত হিন্দু বিধবার ন্যায় ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া আমৃত্যু তাহা পালন করিয়া আদর্শ সতীর দৃষ্টান্ত রাখিয়া

গিয়াছেন। বিধবা হইবার পর তিনি কোনও প্রকার আমোদ-প্রমোদে যোগদান করেন নাই, রাজোপযোগী বিলাসাদি একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, প্রত্যহ স্বামীর পবিত্রমূর্ত্তি দর্শন এবং ধ্যান তাঁহার নিত্য ব্রত ছিল। জাঁক-জমক কোন দিনই তিনি ভালবাসিতেন না, বিধবা হইবার পর হইতে তো তাহা একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এমন কি, ঘরের আস্‌বাবগুলি নূতন রঞ্জিত হইবার সময়ও যদি তেমন উজ্জ্বল রং দেওয়া হইত, তাহা হইলে তিনি তাহা বদ্‌লাইয়া ফেলিতেন।

মহারাণী যে পবিত্রতার আদর্শ ছিলেন, তাহা তাঁহার অনেক কার্য্যে ও কথাতেই বুঝিতে পারা যায়। যখনই স্বামীর নাম মনে করিতেন, তখনই নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিত।

মহারাণীর রাজত্বকালে দেশবিদেশে অনেক যুদ্ধবিগ্রহ হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাতে তাঁহার সহানুভূতি ছিল না। তাঁহার মন্ত্রীগণই সেজন্য দায়ী। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রজাগণের প্রাণহানি দেখিয়া তিনি অশ্রুপাত করিয়াছেন, আহত সৈনিকগণের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন। এই বৃদ্ধকালে বুয়রযুদ্ধে প্রজাক্ষয় দেখিয়া তিনি যথেষ্ট মনস্তাপ পাইয়াছিলেন, তাঁহার কোমল হৃদয় দুঃখকষ্ট দেখিলেই গলিয়া যাইত এবং তাহা হইতে পবিত্র মন্দাকিনীর পূতধারার ন্যায় সহানুভূতি অশ্রু প্রবাহিত হইত। ভারতের দুর্ভিক্ষে, প্লেগে লোকধ্বংশের সংবাদ শুনিয়া তিনি যেরূপ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং স্বীয় ভাণ্ডার হইতে যেরূপ সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার ন্যায় হৃদয়েরই উপযুক্ত! সকলেই যেন এ স্থলে একথা মনে রাখেন, তিনি রাণী হইলেও রাজকোষের অর্থ তিনি যথেচ্ছ ব্যয় করিতে পারেন না। সে বিষয় মন্ত্রীগণ ও পার্লামেণ্ট সভার মত ও পরামর্শ লইতে হয়।

যখন তিনি ভারতেশ্বরী উপাধি গ্রহণ করেন, তখন যে ঘোষণাপত্র প্রচারিত হয়, তাহা প্রজা সাধারণের ধর্ম্মবিশ্বাসে হস্তক্ষেপ না করিয়া জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে গুণের আদর ও সম্মান সুবিচার করা হইবে বলিয়া প্রচার করা হয়, তাহাতে সকলেই বিশেষ সুখী হইয়াছিল। ভারত ও ভারতীয় প্রজাকে তিনি বড় ভালবাসিতেন। ভারতীয় ভাষা শিক্ষাতেও তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল।

তাঁহার পবিত্র জীবনের সদ্‌গুণাবলীর সম্যক্ আলোচনা করা এরূপ

স্থলে সম্ভব নহে। তিনি আদর্শরমণী, আদর্শজননী, আদর্শসতী এবং আদর্শ রাজ্ঞী ছিলেন। স্বকর্ম্মার্জ্জিত পুণ্যলোকে তাঁহার আত্মা এখন শান্তিলাভ করিতেছে, কিন্তু তাঁহার পবিত্র নাম প্রাতঃস্মরণীয়রূপে চিরকাল সকলের হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিবে এবং তাঁহার আদর্শ জীবনের পুণ্যকথায় অনেক হৃদয় উন্নত হইবে, ইহা নিশ্চিত। আমাদের পাঠক পাঠিকাগণ এই পুণ্যবতীর গুণাবলীতে স্বীয় স্বীয় হৃদয় স্বীয় স্বীয় সন্তানগণকে ভূষিত করিয়া তাঁহার পুণ্যস্মৃতির সম্মান করুন, ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা। শান্তি! শান্তি! শান্তি!!!

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

হোলী।

কবে, কতকাল পূর্ব্বে, শ্রীমথুরা পুরে,
ভাদ্রমাসে, কৃষ্ণপক্ষ অষ্টমী তিথিতে
কংস-নিপাতন হেতু, কংস কারাগারে
শুভক্ষণে হয়েছিল কৃষ্ণ অবতার
নারায়ণ, অংশরূপী শ্রীমধুসূদন ?
স্মরণে আসে না তাহা, না হয় নির্ণয়
বহুদূর, নির্ণিবারে দ্বাপরের কথা!
গোকুলে শৈশবলীলা, গোষ্ঠে গোচারণ,
কৈশোরে মধুর ভাবে বৃন্দাবন লীলা—
করে ছিলা হৃষীকেশ, বিবিধ প্রকার।
কৃষ্ণলীলা সারাৎসারা বৃন্দাবন লীলা।
নমি আজি কৃষ্ণপদে প্রেম ভক্তিভাবে!
বাসনা পুরাও কৃষ্ণ! এই ভিক্ষা করি।
গাইব তোমার গীত, মঙ্গল আচরি—
রাধা সহ কেলী কুঞ্জে হোলী নাম যার।
ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথি বসন্ত মধুর,
আকাশেতে পূর্ণচন্দ্র নিশাসমাগমে,

প্রবাহে মলয়নিল বাসন্তী পূর্ণিমা;
চারিধারে ঝিকিমিকি দক্ষসুতাগণ।
হাস্যমুখী বসুন্ধরা, কৌমুদী মাখিয়া
গলে পরি ফুল হার বিতরি সুবাস,
মাতাইতে ছিলা সতী, ভাবুক মানস।
সেই দিনে কৃষ্ণচন্দ্র, সেই শুভদিনে—
দুলে ছিলা মধুকুঞ্জে শ্রীরাধিকা সহ,
সুধাময় সুপবিত্র বৃন্দাবন ধামে।
বৃন্দাবন; আহা মরি! চন্দ্রিকা পরিয়া—
কি শোভা ধরিয়া ছিল চিত্ত-বিমোহিনী.
সে শোভা মোহিনী শোভা, মম নেত্রপথে
ধরিয়া দিতেছে যেন আকাশ কুমারী
কল্পনা; প্রসন্নমুখী দেবী দয়াবতী।
চেতন যমুনা জল, কদম্ব চেতন,
সচেতন গোবর্দ্ধন, বৃন্দাবন শিলা,
চেতন কুঞ্জের রেণু, চেতন লতিকা,
চেতন পাদপাবলী, চেতন পল্লব,
চেতন কুসুমকুল, চেতন বাঁশরী,
চেতন সমগ্র কুঞ্জ; রাজসমাগমে
যেমন সুন্দর সভা সাজায় মানব,
তেমনি প্রকৃতি সতী আপনি হাসিয়া,
সাজালেন দেবসভা পুণ্য বৃন্দাবনে!
সকলেই কথা কয়, সকলেই হাসে।
প্রহরী বসন্তরাজ, কোকিল নিকর।
এতগুলি এক সঙ্গে মিলিয়াছে হেথা,
আগমনে মধুময়ী বাসন্তী পূর্ণিমা।
পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে প্রথম কৌতুক—
রণরঙ্গে অগ্নিক্রীড়া, মেঢ্বাসুর বধ।
চাঁচর তাহার নাম বিখ্যাত সংসারে।
সে ক্রীড়াকে মানবেরা মেড়া পোড়া বলে।

পূর্ব্বদিনে সেই ক্রীড়া করি সমাধান,
পূর্ণিমায় দুলিলেন দোল্ দোল্ দোল্,—
প্রেমময় কৃষ্ণচন্দ্র বেষ্টিত গোপিনী ;
বামভাগে শোভাময়ী বৃকভানু সুতা
শ্রীরাধিকা ; প্রেমময়ী, কৃষ্ণ মনোহরা।
দোলমঞ্চে দুলিলেন কিশোরী কিশোর।
উভয়ে সমান ভঙ্গী, উভয়েই বাঁকা !
দাঁড়াইল অষ্ট সখী মণ্ডল আকারে।
হাস্যাননা ব্রজাঙ্গনা, পিচিকারী হাতে ;
সুবাস আবীরপূর্ণ যমুনার বারি—
বর্ষিছে যুগল অঙ্গে। গিরি মুখে যেন
ঝর ঝর ঝরে ঝরে ঝরণার জল !
লালে লাল, ক্যাসা লাল, শ্রীনন্দ-দুলাল ;
লালে লাল রাসেশ্বরী শ্রীমতী রাধিকা ;
লালে লাল সখীপুঞ্জ, ব্রজের গোপিনী—
কৃষ্ণপ্রেম-পিপাসিনী, রূপে চন্দ্রকলা।
হাসিমুখে বলিতেছে, দুলাইছে দোল,
"রাসেশ্বরী আমাদের আজি দোলেশ্বরী !"
গগনধ্বনিত করি সুমধুর স্বরে—
গাইতেছে হোলীগান মধুর মধুর !
কাঁপাইছে মৃগ চক্ষু, হেলাইছে গ্রীবা,
গাহিছে প্রেমের গীত, নাচিয়া ঘুরিয়া ;
তালে তালে বাজাইছে বসন্ত সমীর ;
শুনিলে মোহিত হয় সবার শ্রবণ !
রূপবতী যতগুলি গোয়ালা কুমারী—
হেসে হেসে ধরিতেছে পরিহাস গীত !
হানিছে রাধারে বাণ, কটাক্ষে ব্যঙ্গিয়া। *
কৃষ্ণকেও হানিতেছে চোখ চোখ শর !

* ব্যঙ্গিয়া—ব্যঙ্গ করিয়া।

সবাই আনন্দে পূর্ণ, রসিক-রসিকা,
কানুসনে সকলেই খেলিতেছে হোলী ;
হাসিমুখে বলিতেছে, হোলী খেল হরি !
বড় সাধ আছে মনে, বহুদিন আশা—
খেলিব তোমার সঙ্গে বসন্ত ঋতুতে—
প্রেমখেলা হোলীখেলা, মধুময় প্রেম !
কাল অঙ্গ লালেলাল, রাধিকারমণ !
কি সাজ সেজেছ হরি ! আমরি আমরি !
ওই লালে আরো লাল দিব মিশাইয়া
বলিতেছে ছড়াতেছে শ্রীঅঙ্গে আবীর !
ছুড়িছে কুঙ্কুম কেহ, বাঁকায়ে নয়ন ;
বনমালা লালে লাল, লাল পীতধড়া,
লালে লাল শিখিপুচ্ছ, ঢাকা ভৃগুপদ,
লাল কুঞ্জ, লাল কৃষ্ণ, কুঞ্জ বনমালী !
রসিকের চূড়ামণি, রাখাল কানাই—
হেসে হেসে প্রতিশোধ দিতেছেন তার !
রাধিকা হরিকে দেন, রাধিকারে হরি,
কি মধুর হোলী খেলা, শ্রীকৃষ্ণের দোল !
গোপিকা কৃষ্ণকে দেয়, কৃষ্ণ গোপিকায়,
প্রেমের চূড়ান্ত খেলা, বসন্ত বাসরে !
তাই বলে কৃষ্ণ প্রেম গোপীরাই জানে !

ফুরাল দোলের লীলা, হোলীর বিশ্রাম।
ফলার হইল কিনা, বলে না কল্পনা।
এইত কৃষ্ণের দোল, এ দোলের প্রেমে
আবীরের সঙ্গে সঙ্গে প্রেম ছড়াছড়ি !
পবিত্র সকল অঙ্গ, দেবতার খেলা,—
প্রেমভাব, ভক্তিভাব, গোপিকা হৃদয়ে
একসঙ্গে বাস করে, তারি পরিচয়
দেখাইল গোপীকারা, শ্রীকৃষ্ণের দোলে !
নিন্দুকেরা নাম দেয়, গোপিনী বিহার !!

বহু বহু গোপবধূ, যুবতী সুন্দরী—
কৃষ্ণপাশে একসঙ্গে ছুটে ছুটে আসে,
এককালে একসঙ্গে জড় হয় সব ;—
কোন প্রেমে আসে তারা, একসঙ্গে মিলে ?
যাচে তারা কোন্ প্রেম, কৃষ্ণ সন্নিধানে ?
কভুনা, কভুনা, কভু সম্ভবে কি তাহা ?
দশমবর্ষের শিশু ইন্দ্রিয়বিলাসী
এ কথা যাহারা ভাবে, বাতুল তাহারা।
সুপবিত্র কৃষ্ণলীলা, সুপবিত্র গাথা,
সুপবিত্র হোলী খেলা, সুপবিত্র রাস।
হায়রে ! এদেশে আজি, সেই হোলী খেলা—
সুনিত্য পবিত্র যাহা, বৃন্দাবন মাঝে,
সেই সুপবিত্র হোলী এদেশে এখন—
কি বিকট ভীমামূর্ত্তি করেছে ধারণ !!
ব্রজবাসীনামধারী, পশ্চিমের যত
হিন্দুস্থানী খোট্টা আছে, এ হোলীতে তারা—
মাখিয়া আবীর অঙ্গে, বাঁধিয়া কোমর,
নাচিতে নাচিতে রঙ্গে, বাজায়ে মাদল—
কত শত গীত গায়, মুখে বলে হোলী,
কিন্তু মুখে কাঁটা খোঁচা বাধেনা তখন !!
যাহা ইচ্ছা, তাহা বলে, অকথ্য খেঁউড় !!
তাহাতেই সবে মত্ত, কৃষ্ণ কথা দূরে !
মথুরার ক্ষত্রকুল উজ্জ্বল রতন—
পুণ্যব্রত বসুদেব দেবকী কুমার,
রাধাকে তাঁহার মামী সাজায় খোট্টারা !
সাজাইয়া ক্ষান্ত নয়, খেঁউড় গান গেয়ে
উচ্চরবে ; মাতোয়ারা, দলে দলে চলে—
বড় বড় রাজবর্ত্মে, বাদ্যভাণ্ড লয়ে
নেচে নেচে গীত গায় ! কি পবিত্র গীত !
শুনিলেই দুই কর্ণে দিতে হয় হাত !!

এইত পশ্চিমে হোলী ! আরো কিছু বলি।
আমাদের জন্মভূমি, ইহ বঙ্গদেশে
কি দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, পূর্ণিমার দোলে !
যেমন যাত্রার সং, নানা রঙ্গে সাজে,
তেমতি পথিক লোকে নানা রং মেখে—
অবসাদে চলে যায়, চাহেনা পশ্চাতে।
রং মাখা কেহ কেহ, প্রেমানন্দে মেতে
হাস্যমুখে হল্লা করে, কতই আহ্লাদ।
কেহ কেহ সং সেজে মুখ ভারী করে !
একদিনে না ফুরায়, পর্ব্ব অবসানে
তিন দিন জের চলে, লোকে সাজে ভূত !
শ্রীকৃষ্ণের হোলী খেলা বঙ্গে এই দশা !!
আবীরের সমাদর আছে অতি কম !
ছাই, মাটী, ম্যাজেণ্ডার কালী জুলী, কাদা,
তারি জলে পিচিকারী, তারি যোগে ছাবা !
ষাঁড় দাগা দেগে দেয়, বেচারা পথিকে !!
নরনারী ভেদাভেদ নাহি করে কেহ !
মেয়েদের দুরবস্থা আরো বেশী করে !!
লজ্জায় মরিয়া যায় বাজারের মেয়ে !
এর চেয়ে বেশী আর বলা ভাল নয়।
কেবল বাজারে মেয়ে, সে কথাও নয় ;
গঙ্গাস্নানে কুলবালা রাস্তায় আসিলে,
তাহাদেরো সাজা দেয় ডান্‌পিটে ছোঁড়া !
আরো এক হোলী খেলা হয়েছে রটনা.
সকলের চেয়ে সেটী আরো বেশী ভয়ঙ্কর !
সহরের গলি পথে, কিছু কিছু দূরে,
আবাশের দোতলার বারাণ্ডা হইতে
বিষ্ঠা বৃষ্টি হয়ে থাকে পথিকের গায় !!
ছিছি কি ঘৃণার কথা ! পাহারা পুলিশ—
বিপক্ষের কাছে কিছু সেলামীর লোভে,

ধূলাতে ডুবায়ে দেয় রাজার আইন !!
হায় কি দুঃখের কথা ! বৃন্দাবন-লীলা
নন্দলাল গোপালের বসন্তের দোল,—
নিকুঞ্জ আনন্দময় যে দোলের ভাবে,
সেই দোল কি নরক, এই বঙ্গদেশে !!
আ মল ধর্ম্মের ভাব ভুলিয়াছে সবে,
হর্ষ প্রমোদের ভাব ছাড়িয়া দিয়াছে,
নূতন হোলীর মূর্ত্তি করেছে গঠন,
বিরূপ, কুৎসিৎ, ঘৃণ্য বীভৎস বিকল !
সকলেরি সমভাব, শৃগালের ডাক !
রাজ্যময় হীনপ্রভা হতেছে বিস্তার,
হোলীর প্রকৃত ভাব, কিছু নাহি আর !!
সত্য বটে, কেহ কেহ ভক্তি উপচারে—
দোল দেয় রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ দুটিকে ;
জানায় সাত্ত্বিকী পূজা বিতরে আবীর,
বিতরে বান্ধবগণে সুখাদ্য বিবিধ,
সঙ্গীত আমোদে করে যামিনী যাপন ;
সত্য বটে ; সত্য, কিন্তু সংখ্যা বড় কম !
কাঁদিতেছে জন্মভূমি, এই মনস্তাপে !
যাচিতেছে কৃপাবিন্দু, মিনতি করিয়া—
এই আর্য্য সমাজের ভূষণ যাঁহারা,
উদ্দেশে মনের দুঃখে, তাঁহাদের কাছে
এই ভিক্ষা ভক্তিভাবে—আর্য্য পুত্রগণ !
শ্রীকৃষ্ণের হোলী দোল সুপবিত্র কর !
যাহা ছিল, তাহা পুনঃ, ফিরাইয়া আনো ;
ঘুচুক লোকের নিন্দা, ঘুচুক উৎপাত।
কত কত অনাচার মিশিয়াছে দোলে,
ব্রহ্মজ্ঞানী ছেলে বলে অসভ্য পার্ব্বণ !!
সত্য সত্য অসভ্যতা করেছে প্রবেশ,
ধুয়ে পরিষ্কার কর, এই নিবেদন !

জয় জয় রাধাকৃষ্ণ ! জয় বৃন্দাবন !
জয় গোবর্দ্ধন গিরি ! জয় কুঞ্জ ধাম !
জয় কৃষ্ণ প্রবাহিণী কলিন্দনন্দিনী
যমুনা ! গোপিনী জয় ! হোলী পর্ব্ব জয় !
পূর্ব্বাপর হোলী দেখা হইল আমার,
রাধাকৃষ্ণ শ্রীচরণে করি নমস্কার !!

শ্রীভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

নরক দর্শন।

শাস্ত্রের মহিমা অনন্ত। আর্য্যশাস্ত্রে যাঁহাদের বিশ্বাস অটুট, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন, জগতের মানবগণকে কোন না কোন প্রকার পাপস্পর্শ করে, সেই পাপে তাহাদিগকে নরক ভোগ করিতে হয়। কলিযুগেই পাপীর সংখ্যা অধিক। কলিযুগের প্রথম রাজা ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির। যাঁহারা মহাভারত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা যুধিষ্ঠিরকে জানেন। যুধিষ্ঠিরের আত্মায় বিন্দুমাত্র পাপস্পর্শ করে নাই। তথাপি ধর্ম্মের শাসন এতদূর যে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণের প্ররোচনায়, যুধিষ্ঠিরকে সামান্য একটু কপটতার আশ্রয় লইতে হয় ; সেই সামান্য পাপে তাঁহাকে চরমে একবার নরক দর্শন করিতে হইয়াছিল। পাপের শাসন আর্য্য শাস্ত্রে যে প্রকার বর্ণিত আছে, তেমন আর কোন শাস্ত্রেই নাই। এইখানে আজ আমরা আর একটি যুধিষ্ঠিরকে উপস্থিত করিব।

কে তিনি ?—মিথিলার রাজা বিপশ্চিৎ। ধর্ম্ম-শাস্ত্রে, ব্যবহার-শাস্ত্রে, যত প্রকার পুণ্য কার্য্যের বিধান আছে, রাজা যুধিষ্ঠিরের ন্যায় রাজা বিপশ্চিৎ নিত্য নিত্য অবিচ্ছেদে সেই সকল পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন ; কোন প্রকার পাপ কার্য্যে তাঁহার মতি যাইত না। তাঁহার দুই মহিষী ছিলেন ;—পীবরী আর সুশোভনা। সেই উভয় রাণির মধ্যে সুশোভন পরমরূপবতী, গুণবতী, এবং পুণ্যবতী ছিলেন ; রাজা তজ্জন্য তাঁহাকেই অধিক ভাল বাসিতেন ; পীবরীর প্রতি কিছু কিছু অবহেলা ছিল।

রাণী অথবা রাজকন্যা হইলে রূপ কিরূপ হয়, সাধারণে তাহা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারেন; রাণী পীবরী অরাণী অথবা অসুন্দরী ছিলেন না; অথচ তাঁহাকে পতির অবহেলা ভোগ করিতে হইত। কারণ এই যে, রাণী পীবরী পার্থিব সংসারের ব্যবহারানুসারে কার্য্যাকার্য্য বিচার করিয়া চলিতেন; রাজাকে তাহা ভাল লাগিত না। সংসারে সকল কার্য্যেই প্রায় কিছু না কিছু অকার্য্যের মিশ্রণ থাকে, রাজা বিপশ্চিৎ সেই জন্য সংসারকে বড় ভয় করিতেন; সেইজন্যই সংসারানুরাগিণী রাণী পীবরীর প্রতি তাঁহার কিছু কিছু অযত্ন ছিল।

জীবনকালের মধ্যে ইহসংসারে রাজা বিপশ্চিতের কেবল ঐ মাত্র পাপাংশ। পূর্ণচন্দ্রে যেমন কলঙ্ক, গঙ্গাজলে যেমন বিন্দুমাত্র শুন মূত্র, রাজা বিপশ্চিতের পবিত্র হৃদয়ে সেই প্রকার ঐ ক্ষুদ্র পাপাংশ। ভারতের ন্যায় ধর্ম্মক্ষেত্র ইহজগতে আর দ্বিতীয় নাই; সেই বিন্দুমাত্র পাপে রাজা বিপশ্চিতের কি ভোগ হইয়াছিল?—একবার মাত্র নরক দর্শন।

রাজা বিপশ্চিতের সংসার লীলা সম্বরণের পর যমালয়ে একটিবার নরক দর্শন হইয়াছিল। ক্ষুদ্র পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইলে যমদূতেরা তাঁহাকে বলিল, আর আপনাকে এখানে রাখিতে আমাদের অধিকার নাই, আপনি স্বচ্ছন্দে স্বর্গধামে গমন করুন। রাজা স্বর্গগমনে উদ্যত হইলে নরকের পাপীরা উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিল, "মহারাজ! মহারাজ! দয়া করিয়া আর খাণিকক্ষণ এইখানে থাকুন; এত যন্ত্রণার মধ্যেও আপনার তুল্য পুণ্যাত্মা দর্শনে আমরা অননুভূত সুখানুভব করিতেছি।"

পুরাণ শাস্ত্রে নরকের যেরূপ বর্ণনা আছে, পাপীগণের নরক ভোগের যে প্রকার ভীষণ চিত্র পরিলক্ষিত হয়, মুদিত নেত্রে তাহা স্মরণ করিলেও হৃৎকম্প হইয়া থাকে। জ্বলন্ত অনলে উত্তপ্ত তৈল কটাহে পাপী নিক্ষেপ, জ্বলন্ত লৌহ নারী মূর্ত্তিতে ব্যভিচারী পাপীর গাঢ় আলিঙ্গন, কৃমি কুণ্ডে নারকী পাপীর মস্তকে লৌহ মুষলাঘাত, বিষ্ঠাকুণ্ডে পাপী লোকের অবগাহন, ইত্যকার ভীষণ ভীষণ নরকদণ্ড সর্ব্বজনের ভয়প্রদ। নরকবাসী কোটি কোটি পাপীর ঐ প্রকার নিদারুণ নরক যন্ত্রণা, নিদারুণ বিকট চীৎকার!

নরকবাসী পাপীগণের আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া রাজা বিপশ্চিৎ স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন; মনে মনে ভাবিলেন, নিঃস্বার্থ পরোপকার, আর্ত্তের

পরিত্রাণ এবং বিপন্নের সহায়তা. এই তিনটি কার্য্য সংসারের পরমধর্ম্ম। ইহারা মহাবিপন্ন, আমি এখানে থাকিলে ইহারা সুখী হইবে, কেন আমি তবে এই সকল বিপন্নের সুখের আশা হরণ করিব?—মনে মনে এইরূপ তর্ক করিয়া, যমদূতগণকে রাজা বলিলেন, আমি স্বর্গে যাইব না। নরকেই থাকিব। আমি নরকে থাকিলে এত লোক যদি সুখে থাকে, তাহা অপেক্ষা সৌভাগ্য কি? নরকেই আমি থাকিব, কোটি কোটি লোককে যন্ত্রণানল হইতে রক্ষা করাতে যে সুখ, স্বর্গে কেন, তাদৃশ পবিত্র সুখ ব্রহ্মলোকেও নাই। অতএব আমি স্বর্গে যাইব না, ইহাদিগকে নিরাশ করিয়া স্বর্গে আমি সুখ পাইব না, ইহাদের উপকারের জন্য নরকেই আমি থাকিব।

রাজা বিপশ্চিতের এই সংকল্পের কথা ধর্ম্মরাজের শ্রবণগোচর হইল। দেবরাজ ইন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া ধর্ম্মরাজ স্বয়ং রাজসমীপে উপস্থিত হইলেন; বিনীতভাবে রাজাকে কহিলেন, মহারাজ! স্বর্গে চলুন; দেবরাজ পুরন্দর স্বয়ং আপনার জন্য পুষ্পকরথ আনয়ন করিয়াছেন, আপনি অখণ্ড পুণ্যাত্মা, সেই বিমানে আরোহণ করিয়া আপনি স্বর্গে গমন করুন! চরমে পুণ্যাত্মার বাসস্থান স্বর্গ।

রাজা কহিলেন, কোটি কোটি প্রাণী এখানে দুঃসহ নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, ইহারা বলিতেছে, আমি এখানে থাকিলে ইহাদের কষ্ট লাঘব হইবে; অতএব আমি নরকেই থাকিব; ইহাপেক্ষা স্বর্গে আমার কি সুখ?

ইন্দ্র বলিলেন, মহারাজ! সংসারে সকলেই স্ব স্ব কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে। ইহারা পাপী, পাপকর্ম্ম ফলে ইহারা নরকবাসী হইয়া অহরহ নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে; পাপক্ষয় না হইলে ইহাদের পরিত্রাণ নাই। আপনি পুণ্যাত্মা, আপনি স্বর্গে চলুন।

রাজা বিপশ্চিৎ কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, দেবরাজ! ধর্ম্মরাজ! আপনারা বারম্বার বলিতেছেন, আমি পুণ্যাত্মা। সংসারে আমি এমন কি পুণ্য করিয়াছি যে, আপনারা আমাকে স্বর্গে লইয়া যাইবার জন্য এত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন? এত লোককে কাঁদাইয়া কদাচ আমি স্বর্গে যাইব না; ইহাদের সুখের জন্য নরকেই আমি বাস করিব; নরকের আগুনেই আমি দগ্ধ হইব; স্বর্গে যাইব না। তবে যদি

আমার কিছুমাত্র পুণ্য ফল সঞ্চিত থাকে, এমন আপনারা জানেন, তাহা হইলে সদয় হইয়া এই নরকবাসী বিপন্নগণকে সেই পুণ্যফলের অংশ প্রদান করুন; ইহারা নরকমুক্ত হউক; ইহাদিগকে নিষ্পাপ করিয়া, ইহাদের সকলকে সঙ্গে লইয়া, স্বর্গগমনে আমি প্রস্তুত হইব, নতুবা নহে।

ইন্দ্র, ধর্ম্ম, উভয়েই একবাক্যে কহিলেন, মহারাজ, নরকবাসী পাপীলোক পাপ নির্ম্মুক্ত হইল; আপনার পুণ্যবলে ইহারাও স্বর্গবাসী হইবে।

রাজা সুখী হইলেন। অন্তরীক্ষ হইতে রাজার মস্তকে পুষ্প বৃষ্টি হইল। অসংখ্য পাপীকে সঙ্গে লইয়া, গলদেশে দেবমাল্য ধারণ পূর্ব্বক স্বর্গীয় বিমানারোহণে, রাজা বিপশ্চিৎ পরমসুখে স্বর্গধামে গমন করিলেন।

আমাদের শ্লাঘা। নিঃস্বার্থ পরোপকারের কত মহিমা, ভারতে পুণ্যবান্ আর্য্য মহাপুরুষেরাই তাহা জানিতেন। এখনও প্রকৃত ধর্ম্মভাবের আদর যদি কিছু থাকে, এই ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতক্ষেত্রের আর্য্য সন্তানের হৃদয়ক্ষেত্রেই তাহা আছে; নশ্বর জগতের কুত্রাপি আর এপ্রকার পবিত্র ধর্ম্মভাব নাই।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত।

বসন্ত এবং প্লেগে গোবসন্ত বীজের টীকার উপকারিতা।

বাঙ্গালা টীকার প্রচলন কেন রহিত হইল?

মনুষ্য-জীবনে বসন্তরোগ প্রায় একাধিকবার হয় না। সত্য বটে, কোন কোন ব্যক্তি একাধিকবার বসন্তরোগাক্রান্ত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অতি বিরল; সহস্রের মধ্যে একজন। প্রকৃত বসন্তরোগ অতি ভীষণ। ইহার আক্রমণ অধিকাংশ স্থলেই মারাত্মক। এই সাংঘাতিক পীড়ার আক্রমণ নিবারণ করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বে আমাদের দেশে বাঙ্গালা টীকা প্রচলিত ছিল। মনুষ্য-দেহোৎপন্ন সুবসন্তবীজ দ্বারা যে টীকা দেওয়া হইত, তাহাই বাঙ্গালা টীকা; ইহার ইংরাজী নাম small pox inoculation. এই বাঙ্গালা টীকা বসন্তরোগের মারাত্মক আক্রমণ নিবারণে সমর্থ হইলেও নানাবিধ বিঘ্নসঙ্কুল।

বসন্তরোগ সংক্রামক,—ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। স্বাভাবিক বসন্ত রোগ এবং সুবসন্ত বীজের বাঙ্গালাটীকা-সমুদ্ভূত বসন্তরোগ,—উভয়ই এক। সুতরাং প্রকৃত বসন্তরোগ এবং বাঙ্গালা টীকা সমুৎপন্ন বসন্তরোগ উভয়ই সমান সংক্রামক। বাঙ্গালা টীকা দ্বারা যে বসন্ত রোগ হয়, তাহাতে সংক্রামকতা দোষ সম্পূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকে। এই কারণে কোন গ্রামে যখন কোন এক ব্যক্তি বাঙ্গালা টীকা লইতেন, তখন তাঁহার সহিত সেই গ্রামস্থ আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই টীকা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেন। এই রূপ না করিলে প্রথমোক্ত ব্যক্তির শরীর হইতে অপরাপর লোকের দেহে বসন্তরোগ সংক্রামিত হইবার সম্পূর্ণ আশঙ্কা থাকিত। অনেক স্থলে এইরূপ দুর্ঘটনাও প্রায় ঘটিত। বসন্তরোগে যেরূপ কঠোর নিয়ম পালন এবং পবিত্রভাব ও শুদ্ধাচার অবলম্বন আবশ্যক, বাঙ্গালাটীকা গ্রহণ কালেও তদ্রূপ কঠোর নিয়মাদি পালন প্রয়োজনীয়। প্রকৃত বসন্তরোগের ন্যায় বাঙ্গালা টীকায় সমুৎপন্ন বসন্তরোগও শারীরিক অবস্থা ভেদে কখনও সুবসন্ত কখনও কুবসন্তে পরিণত হয়। এই প্রকার নানাবিধ বাধা বিঘ্ন, বিপৎসমাকুল বলিয়া বাঙ্গালাটীকার প্রচলন অধুনা রাজকীয় দণ্ডবিধি অনুসারে রহিত হইয়া গিয়াছে।

গো-বসন্ত বীজের টীকার প্রচলন এবং তাহার উপকারিতা।

গো জাতির এক প্রকার বসন্ত হয়। এই বসন্ত বীজ কোন মনুষ্য-শরীরে প্রবেশ করিলে তাহার প্রায় বসন্ত হয় না। কখনও কখনও বসন্ত হয় বটে, কিন্তু তাহা সুবসন্ত। তাহাতে জীবন নষ্ট হয় না। মহাত্মা স্যার উইলিয়াম জেনার এই অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া বসন্তরোগে গোবীজের উপকারিতার কথা প্রকাশিত করেন। সেই সময় হইতে গোবসন্তের বীজ দ্বারা মনুষ্য শরীরে টীকা দিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। ইহাই আমাদের দেশে প্রচলিত আধুনিক ইংরাজী টীকা অথবা Vaccination (ভ্যাক্‌সিনেসন্)। এই গো বীজ এক মনুষ্য শরীর হইতে অন্য মনুষ্য শরীরে কিম্বা গো শরীরেও বপন করা যায়। ইংরাজী টীকাও বাঙ্গালা টীকার ন্যায় বসন্ত রোগের আক্রমণ নিবারণে সমর্থ, অথচ বাঙ্গালাটীকার মত বিপৎসঙ্কুল নহে।

ইংরাজী টীকা বা ভ্যাক্‌সিনেসন্ হইবার পরও কোন কোন লোক বসন্তরোগাক্রান্ত হন,—এই কারণে অনেকে বিবেচনা করেন যে ভ্যাক্‌সিনেসন্' দ্বারা বসন্তরোগের আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না; এই প্রকার ধারণা নিতান্ত ভ্রমাত্মক তাহা বলাই বাহুল্য। প্রকৃত বসন্ত রোগ হইবার পর বা ইংরাজী টীকা লইবার পরও সহস্রের মধ্যে দুই এক জন ব্যক্তিকে পুনরায় বসন্তরোগাক্রান্ত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অধিকাংশ লোকই যখন ভ্যাকসিনেসন্ দ্বারা বসন্তরোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতেছেন, তখন ইংরাজী টীকা অর্থাৎ ভ্যাকসিনেসন্ যে বসন্তরোগের আক্রমণ নিবারণক্ষম, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। অধিকাংশ স্থলে যাহা সত্য ও প্রমাণীকৃত, তাহাই গ্রাহ্য; দুই এক স্থলে যাহা সত্য, তাহা কখনই গ্রহণীয় নহে।

যাঁহাদের ভ্যাক্‌সিনেসন্ হয় নাই, তাঁহারা প্রায়ই কুবসন্তে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। ভ্যাক্‌সিনেসন্ হইলে প্রায় বসন্ত হয় না; যদি হয়, তাহা সুবসন্ত হইয়া থাকে। এবং তদ্দ্বারা জীবন নষ্ট হয় না। ইংরাজী টীকা গ্রহণ করিলে বাঙ্গালা টীকা গ্রহণকালীন কঠোর নিয়মাদি পালনের প্রয়োজন নাই। বাঙ্গালা টীকার ন্যায় ইংরাজী টীকা সংক্রামক নহে। ভ্যাকসিনেসনে ভয়ের কোন কারণ নাই। সকল ব্যক্তিই নির্ভয়ে গোবীজের টীকা লইতে পারেন; ইহাতে আশঙ্কা করিবার কিছুই নাই। কোন ব্যক্তির শরীরে গোবসন্তের বীজ প্রবিষ্ট হইবার পর অর্থাৎ ভ্যাক্‌সিনেসন্ হইলে যদি টীকা না উঠে, তাহা হইলে সেই বৎসর বসন্তরোগের বীজ তাহার শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া কোন প্রকার ক্ষতি করিতে পারিবে না বুঝিতে হইবে। সুতরাং স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, ভ্যাক্‌সিনেসনে কোন বিপদ কিম্বা ভয় তাই, পক্ষান্তরে যথেষ্ট সুবিধা আছে।

জীবনে একবার টীকা লইয়া নিশ্চিন্ত থাকা নিতান্ত ভ্রম। শারীরিক পরিবর্ত্তনের সহিত গোবীজের টীকার বসন্তরোগাক্রমণ নিবারণ করিবার শক্তিও হ্রাস প্রাপ্ত হয়। সুতরাং মধ্যে মধ্যে নূতন টীকা লওয়া উচিত। কলিকাতা ক্যাম্বেল হাঁসপাতালে বহু বসন্ত রোগী চিকিৎসার্থ নীত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে যাহাদিগের কোন প্রকার টীকার দাগ নাই, তাহাদিগের ভিতরই মৃত্যু সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। যাহাদের শরীরে কোন প্রকার টীকার দাগ কিম্বা বসন্তের দাগ উত্তমরূপ চিহ্নিত দেখা যায়,

তাহাদের বসন্ত সুবসন্ত এবং তাহা কখনও মৃত্যুর কারণ হয় না। যে কোন ব্যক্তি উক্ত হাঁসপাতালে আসিয়া অনুসন্ধান লইতে পারেন। বাল্যকালে টীকা হইলেও যৌবনে পুনরায় টীকা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এক-বার টীকা লইয়াছি; আবার কেন টীকা লইব—এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের অনুবর্ত্তী হইয়া অনেক মনুষ্য বসন্তরোগাক্রান্ত হইয়া অসময়ে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। ন্যূনকল্পে প্রতি পাঁচ বৎসর ব্যবধানে একবার টীকা লওয়া উচিত। প্রতিবৎসর টীকা লইলে সমস্ত ভয় হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

অনেক স্থলে এরূপ দৃষ্ট হয় যে, একই বীজে একজনের টীকা সম্পূর্ণ উঠিল, অন্য এক ব্যক্তির কিছুই উঠিল না। যে ব্যক্তির টীকা উঠিল না, তাহার সে বৎসর বসন্তরোগাক্রান্ত হইবার আদৌ সম্ভাবনা নাই বুঝিতে হইবে। বসন্তরোগের প্রবল প্রাদুর্ভাবের সময় সকল ব্যক্তিরই টীকা লওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহা হইলে তাঁহাদের সেই বৎসর বসন্তরোগা-ক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা আছে কি না, তাহা তাঁহারা এই প্রক্রিয়া দ্বারা অবগত হইতে পারিবেন।

গোবীজ দ্বারা প্লেগাক্রমণ নিবারণ।

গোবসন্তবীজের টীকা অন্ততঃ এক বৎসর কাল পর্য্যন্ত প্লেগরোগের আক্রমণ নিবারণ করিতে সমর্থ—ইহাই আমার ধারণা। কলিকাতায় যে বৎসর প্লেগ এপিডেমিক হয়, সে বৎসর যাঁহারা গোবসন্ত বীজের টীকা লইয়া ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে প্লেগ হয় নাই; এ বিষয়ে আমি বিশেষ অনুসন্ধানের পর এ ধারণায় উপনীত হইয়াছি। চিকিৎসক মহোদয়গণ এই বিষয় অনুসন্ধান করিয়া আমার ধারণার সত্যাসত্যতা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিলে জনসাধারণ বিশেষ উপকৃত হইবেন।

যে বৎসর কোন সংক্রামক রোগের বীজাণু কোন শরীরে প্রবেশ করে, সে বৎসর সেই শরীরে অন্য কোন সংক্রামক রোগের বীজাণু প্রায় প্রবেশাধিকার লাভ করে না, ইহাই শরীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের অভি-মত। এক প্রকার রোগের বীজাণু অন্য প্রকার রোগের বীজাণুর সহিত এক শরীরে একই সময়ে প্রায় পরিদৃষ্ট হয় না। যে জীবাণু দ্বারা রক্ত মাংস প্রভৃতি পচিয়া যায়, তাহা দ্বারাই যক্ষ্মা ও ক্যান্সার রোগের উপ-কার হয়। ইহাদের ইংরাজী নাম Germs of Pucri feiation.

প্লেগের টীকা লইলে যেমন অন্ততঃ তিন মাস কাল প্লেগ হইবার সম্ভাবনা থাকে না, প্লেগের সময় গো বসন্তবীজের টীকা লইলেও তদ্রূপ প্লেগ হইবার সম্ভাবনা দূর হয়।

আমরা প্রতি বৎসর গোবীজের টীকা লইয়া থাকি; ইহাতে আমাদের কোন প্রকার কার্য্যের ক্ষতি বা শারীরিক অনিষ্ট হয় না এবং আমাদের মনেও দৃঢ় বিশ্বাস সর্ব্বদা বদ্ধমূল থাকে যে, আমাদের বসন্ত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। আমার কোনও রোগীর, গোবীজের টীকা লইবার পর প্লেগ হয় নাই। যদি কোন ব্যক্তি গোবসন্তবীজের টীকা উত্তমরূপে উঠিবার পর এক বৎসর মধ্যে কাহাকেও প্লেগাক্রান্ত হইতে দেখিয়া থাকেন, তবে সে বিষয় আমায় সবিশেষ অবগত করিলে আমি অতীব উপকৃত হইব।

শ্রীহেমচন্দ্র সেন এম, ডি।

কিম্ভূত-কিমাকার।

(জন্মভূমির ৫৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিতের পর।)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

সদর রাস্তার চৌমাথা।

(রামচরণ ও হারাধনের প্রবেশ।)

রাম। কিহে, এত ব্যস্তত্রস্ত হয়ে কোথা ছুটেছ?

[হারাধনের হস্তধারণ।

হারা। না ভাই, এখন আমার কথা কবার সময় নাই। আমায় একবার উকিলের বাড়ী যেতে হবে, সে আবার দশটার মধ্যে বেরিয়ে যাবে।

রাম। তোমার আবার কিসের মোকদ্দমা হে?

হারা। পরে বল্‌ব, এখন ছেড়ে দাও, আমি যাই।

রাম। (ঘড়ি দেখিয়া) এই ত সবে আট্টা, এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন?

হারা। তোমার ভাই ঘড়ি নয়, ওটা কচ্ছপ। বাঙ্গালীর ঘড়ি, দেখাবার জন্য—দেখ্‌বার জন্য নয়। তোমাদের টাকা যেমন কচ্ছবদ্ধ থাকে, ওটাও সেইরূপ কচ্ছগত হওয়া উচিত।

রাম। আচ্ছা ভাই, আমরা বাঙ্গালী—তুমি সাহেব। এখন মোকদ্দমাটা কিসের বল?

হারা। কতকগুলা ছোটলোকের মেয়ে আমার পরিবারকে গালি দিয়েছে।

রাম। তাই মানহানির নালিস্ করতে যাচ্ছ নাকি?

হারা। ক'র্‌ব না?

রাম। ছি, ছি, ও কাজ ক'র না, কিল খেয়ে কিল চুরিই ভাল।

হারা। বাঙ্গালীর রক্ত এতই ঠাণ্ডা বটে!

রাম। ভাই, সাহেবের পোষাক পর্‌লেই কি সাহেব হওয়া যায়? ও পোড়াকাঠের রং টুকু ঢাক্‌বে কিসে?

হারা। তার বেশ উপায় আছে, দুচারবার বিলাত যাত্রা কর্‌লেই গাদ কেটে যাবে।

রাম। সহজে ত নয়, বিলাতে ব'সে চারি পুরুষে কুরুচ্ খেলে যদি কিছু হয়; তোমার কন্যা যদি গোরা ভজে, পুত্র গোরা মিসে মজে, নাতির পুতি হ'লে যদি রঙে মিস খায়।

হারা। তাও কি ভাল নয়? আমাদের পুত্র না হয় পৌত্র, পৌত্র না হয় প্রপৌত্রও ত জেন্টুইন্ জন্‌বুল্ হ'তে পার্‌বে, এটা কি স্পর্দ্ধার কথা নয়?

রাম। ওহে সাহেব, তোমাদের সে সকল পৌত্র প্রপৌত্রের সহিত ভারতের আর কি সম্বন্ধ থাক্‌বে? তারা কি ভারতের পানে চেয়ে দেখ্‌বে? তারা কি কামদেব পণ্ডিতের সন্তান, রামেশ্বর পণ্ডিতের সন্তান ব'লে আপনাদের পরিচয় দিবে? না কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ প্রভৃতি গোত্রের সহিত সম্পর্ক রাখ্‌বে? তারা সব হয়ে যাবে Mr. এখন বাড়ী ফিরে যাও, যা বল্লেম, বেশ ক'রে বুঝে দেখগে যাও।

[প্রস্থান।

হারা। Chained dog! দেশাচারের দাস! আমায় আবার উপদেশ দিতে চায়! এই সঙ্কীর্ণচেতা Conservativeগুলা শিকল-বাঁধা কুকুরের মত,

যা কিছু অপরিচিত, যা কিছু নূতন দেখ্‌বে, অমনি ঘেউ ঘেউ ক'রে উঠ্‌বে! অ্যাঁ! ও আবার কারা? আঃ! আবার সেই কদাকারা মাগীরা জ্বালাতন কর্‌তে আস্‌ছে।

হাড়িনীগণের প্রবেশ, নৃত্য ও গীত।

মানের কান্না কেঁদ না আর, মান থাকে কি মান করিলে?
অভিমানে অপমান, মান অপমান সহিলে।
এখনো গো মান আছে,
যার হাঁড়ি তার কাছে,
হাঁড়ি ভেঙ্গে ছড়িয়ে যাবে, মানহানির নালিশ যুড়িলে।

হারা। Infernal Bitch! (প্রহারোদ্যত।)

১ম হাঁড়িনী। কি সাহেব, মার্‌বে নাকি?

২য় হাঁড়িনী। বল দেখি চাঁদবদন, কালা গোরা হ'লে কি কারণ?

৩য় হাঁড়িনী। কালাচাঁদ মার্‌বে নাকি? ও গোরাচাঁদ মার্‌বে নাকি?

সকলে। মার দেখি, মার দেখি!

[হাসিতে হাসিতে প্রস্থান ও হারাধনের পশ্চাদ্ধাবন।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ময়রাবিবিদের Boudoir.

ঈশাবালা কলে সেলাই করিতেছে ও ঝালাফালা পশম বুনিতেছে।

Mr. M. M. মাসচটক এলেম্‌ বাগীশের প্রবেশ।

মাসচটক। Good Morning Mrs ভাবন বিশ!

ঝালা। Good Morning sir, আমরা এইমাত্র আপনার কথাই কহিতেছিলাম।

মাস। কেবল তুমি আর Mrs ভাবনবিশ? না আরও কেহ?

ঝালা। আপনার সেই আরও কেহ না হ'লে, প্রাতে উঠেই আপনার কথা আর কে পাড়িবে?

মাস। Oh yes yes! I am very glad to hear it. (ঈশাবালার নিকটে গিয়া) Good Morning sweet Isabel! (একখানি chair টানিয়া লইয়া ঈশাবালার পার্শ্বে উপবেশন।)

(ঝালাফালা কর্ত্তৃক ঘণ্টা নিনাদন ও ভজহরি খানসামার প্রবেশ।)

ভজা। ঘণ্টায় ঘা দিলে কেনে?

মাস। এখনকার কালে এ প্রকার অসভ্য চাকর আর চলে না।

ঈশা। But he is very honest.

মাস। Excuse me sweet Isabel, honesty is another word for stupidity.

ভজা। মশাই, আমায় ষ্টুপিট্‌ ব'লে গালি দিলে কেনে?

ঝালা। যা, যা, তুই এখন চা আন্‌গে যা।

এলেম্‌ বাগীশের গীত।

চীন হ'তে এলি চা
চীনে পুনঃ চলে যা
পথ চিনে যারে ফিরে ফিরিস্‌নিক আর।
ভারতে মহিমা তোর হবে না বিস্তার।
মুটে মজুর ভজে তোরে,
বামুনেরা ঘৃণা করে,
বামুনের মুখে আগুণ জ্বল্‌বে না কি আর?
চীনের চীনী চুনে নিল,
ছানা ক্ষীরে মিসাইল,
চিনিলনা তোরে তারা এ কি অবিচার।
বামুনগুলা না মরিলে,
টিকি ফোঁটা না ঘুচিলে,
বৈজ্ঞানিক আহারের হবে না প্রসার।

ঝালা। Excellent!

ঈশা। Ful of Fun, Full of fun.

ঝালা। But unfortunately play on words is now a days looked upon as puerile witticism.

(চা লইয়া ভজহরির প্রবেশ।)

ঝালা। (পরীক্ষা করিয়া) আরে, আজ একি রকম চা করেছিস্? না হয়েছে মিষ্টি, না হয়েছে রং—কিছু হয় নাই।

ভজা। ব'লে ফ্যাগালে কিছুই হয় নে। আরে কিছু হবে কেমন ক'রে, একসের জলে এক কাঁচ্চা দুধ, আর আধ পয়সার বাতাসায় কত রং, কত মিষ্টি হবে?

ঝালা। হাঃ হাঃ! ও কে Stupid বলে কে?

ভজা। সাহেব বাবু, ষ্টুপিট বলা তোমাদেরই সাজে।

ঝালা। যা, যা, তুই এখন যা।

ভজা। যাচ্ছি ঠাকরূণ, যাব না ত কি!

[প্রস্থান।

(সকলের চা পানান্তর)

ঝালা। এলেম্‌বাগীশ মহাশয়, আমাদের ঈশাবালা গান শুন্‌তে বড় ভালবাসে।

মাস। আমি যাহা ভালবাসি, ঈশাবালা তাহাই ভালবাসে, হাঃ হাঃ, ভালবাসার লক্ষণই এই। এখন একটা গান কর্‌তে হবে? তবে শুন—

গীত।

ঈশাবেল মতিয়াবেল প্রেয়সী আমার,
হেন রূপরাশি বল আছে আর কার?
রূপ-জ্যোতি রবি ভাতি,
অথবা চর্ব্বির বাতি,
স্বাতীনক্ষত্রের নীরে জনম উহার,
কজ্জাসম ঝিনুকখানি জননী যাহার।

ঝালা। মাসচটক মহাশয়, এ গীতটি কি আপনার রচিত?

মাস। কেন বল দেখি, গানটী কি ভাল হয় নাই?

ঝালা। আপনার গানের ভাব বড়ই গভীর—অতল তলায় তলাইয়া

না গেলে খুঁজিয়া পাওয়া ভার। আচ্ছা এলেম্‌বাগীশ মহাশয়, "কজ্জাসম ঝিনুকখানি" জননী কাহার?

মাস। স্বাতীনক্ষত্রের নীরে জনম যাহার—অর্থাৎ মুক্তার, মুক্তা এখানে ঈশাবেল—বিমল মতি বা মতিয়াবেল। আমার প্রত্যেক গানে গূঢ় মানে থাকে, আর উপমার উপমা Double উপমা থাকে।

ঝালা। সুন্দর! অতি সুন্দর উপমা, কজ্জাসম ঝিনুকখানি মুক্তারূপা ঈশাবালার জননী। অতি সুন্দর, বড়ই সুন্দর—বড়ই রুচিকর।

মাস। My dear Mrs হাবনবিশ, তোমার ভাবানুভাবকতার বড়ই অভাব। প্রাচীন কবি ভবভূতি কি বলিয়াছেন জান? তিনি বলিয়া গিয়াছেন——

নির্ভয়ে লিখিব কাব্য আপন ইচ্ছায়,
কাব্য ও কামিনী কভু নিন্দা না এড়ায়।

(সদারঙ্গের প্রবেশ।)

ঝালা। একি! পাগ্‌লা এখানে কেন?

সদারঙ্গের [illegible]

টিয়া [illegible]

গীত।

হৃদয় মথিত হলে যে সুধা উপজে,
তাহাই কবিতা তাহে প্রাণমন মজে।
কবিতা দুর্ল্লভনিধি,
জনমে কি নিরবধি,
নিরবধি জনমে কি গজমতি গজে ?

[গান করিতে করিতে প্রস্থান।

মাস। Come sweet Isabel, এখন আমরা পার্কে একটু বেড়াইয়া আসি চল। দ্বারদেশে আমার ব্রুহাম তোমার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছে।

ঈশা। না, এখন না।

মাস। No denial, no excuse my love,

ঝালা। You take undue liberty with my sister Mr মাসচটক!

মাস। Liberty, Equality andlove. আধুনিক সমাজের মূলমন্ত্র।

ঝালা। আপনার এ প্রকার আচরণ ভদ্রোচিত নয়।

[illegible] আচরণ করিয়াছেন ? দিদি, আমি বড়ই ভালবাসে। [illegible] ননা করিলে ?

মাস। আমি যাহা ভালবাসি, ঈশাবালা তাহাই ভা[illegible] সাম্যবাদের ভালবাসার লক্ষণই এই। এখন একটা গান কর্‌তে হবে ? তবে শুন—

গীত।

ঈশাবেল মতিয়াবেল প্রেয়সী আমার,
হেন রূপরাশি বল আছে আর কার ?
রূপ-জ্যোতি রবি ভাতি,
অথবা চর্ব্বির বাতি,
স্বাতীনক্ষত্রের নীরে জনম উহার,
কজ্জাসম ঝিনুকখানি জননী যাহার।

ঝালা। মাসচটক মহাশয়, এ গীতটি কি আপনার রচিত ?

মাস। কেন বল দেখি, গানটী কি ভাল হয় নাই ?

ঝালা। আপনার গানের ভাব বড়ই গভীর—অতল তলায় তলাইয়া

জন্মভূমি।

(সচিত্র মাসিক পত্র।)

অষ্টম বর্ষ। } ১৩০৭ সাল, চৈত্র। { ৯ম সংখ্যা।

ভক্তি।

ভক্তি মনুষ্যমণ্ডলীর একটী উৎকৃষ্ট বৃত্তি। এই বৃত্তি দ্বারা মনুষ্য অন্যান্য জীবগণ অপেক্ষা উৎকর্ষ লাভ করে। আমরা সর্ব্বদা কহিয়া থাকি, প্রভু-ভক্তি, রাজ-ভক্তি, পিতৃ-মাতৃ-ভক্তি গুরুভক্তি, ঈশ্বরে ভক্তি ইত্যাদি। কিন্তু ভক্তি এই শব্দের ভিতর কি যেন একটী ভাব নিহিত আছে। আমরা দেখিতে পাই যে, কর্ত্তব্যানুষ্ঠান ব্যতীত আরও যেন কিছু অনুষ্ঠান বাকী রহিয়াছে। যাহা দ্বারা ভক্তি এই ভাবটীকে সম্পূর্ণ করে, সেই ভাবটী কি, তাহা বিশদরূপে বুঝান বড় সহজ নয়। অথচ তাহা না থাকিলে ভক্তির আভ্যন্তরিক ভাবটী যেন অসম্পূর্ণ বলিয়া বোধ হয়। এখন দেখা যাউক, সেটি কি? মনে করুন, কেবলমাত্র কর্ত্তব্য পালন করিলে, কি তাহাকে কেহ ভক্তি বলিবেন? যদি পিতা-মাতাকে ভরণ পোষণ করা যায়, তাহা হইলে কি ভক্তি করা হইল? বা তাঁহারা যাহা করিতে বলেন, তাহা করিলেই কি ভক্তি করা হইল? আমার বোধ হয়, শুধু তাহা করিলে ভক্তি ভাবটী সম্পূর্ণ হইল না। প্রত্যহ পাঠাভ্যাস করিলেই কি শিক্ষককে ভক্তি করা হয়? না—রাজাজ্ঞা প্রতিপালন করিলেই কি রাজভক্তি প্রদর্শন করা হইল? তবে কিসে ভক্তি করা হয়, অর্থাৎ এই বৃত্তির সম্পূর্ণতা প্রকাশ পায়? যদি বল, নাম-সাধনই ভক্তির মূলমন্ত্র, তাহা হইলে দেখা যাউক, নাম সাধন কি, নাম সাধন কি শুধু পুনঃ পুনঃ নাম উচ্চারণ, না অপর

কিছু? তবে সাধন যাহাকে বলে, তাহা স্পষ্টরূপে বুঝান উচিত। নতুবা ভক্তি কাহাকে বলে, আমরা স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারিলাম না। ভক্তির মূলমন্ত্র কি এবং কোথায়, ইহা বুঝাইবার পূর্ব্বে আমি একটী গল্প দ্বারা পাঠকদিগকে হৃদয়ঙ্গম করাইতে চেষ্টা করিয়া দেখি। তাহা দ্বারা কতদূর কৃতকার্য্য হইব, বলিতে পারি না। হয়তো আমার নিজের ভাবের ভ্রম থাকিতে পারে, আমি দেখিতে পাইতেছি না। সহৃদয় পাঠকগণ দেখাইয়া দিলে বাধিত হইব। গল্পটী এই ;—

জনশ্রুতি আছে, মহারাজ নবদ্বীপাধিপতির দুই পুত্র ছিল—শিবচন্দ্র ও শম্ভুচন্দ্র। এই দুই জন সহোদর ভ্রাতা নহেন। ইহারা পরস্পর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। রাজা সর্ব্বদা শিবচন্দ্রের সুখ্যাতি করিতেন। একদা শিবরাত্রিতে রাজা শম্ভূচন্দ্রের মাতার নিকট শিবচন্দ্র-সম্বন্ধে এরূপ সুখ্যাতি করিতেছিলেন। তাহা শুনিয়া রাণী দুঃখিত হইয়া মহারাজকে কহিলেন, "প্রভু! আমি আপনার মুখে সর্ব্বদা শিবের কথা শুনিতে পাই, কিন্তু শম্ভূর কথা কখন শুনি নাই, ইহার কারণ কি? শম্ভু কি আপনার অবাধ্য, না আপনার আজ্ঞাপালন করে না, বা কখন আপনাকে কোন প্রকারে অভক্তি বা অসম্মান করিয়াছে? এমন কখন ঘটে নাই, যাহাতে আপনি কোন কারণে তাহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। তবে কি কারণে তাহার উপর বিরক্ত হইয়াছেন? কি কারণেই বা আপনি পুনঃ পুনঃ শিবের সুখ্যাতি করেন, ইহা আমি উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না।" রাজা বলিলেন,—"আমি তোমাকে এখনই দুজনের বিশেষত্ব দেখাইব।" এই বলিয়া মহারাজ দাসীকে আজ্ঞা করিলেন, শম্ভুচন্দ্রকে ডাকিয়া আন। দাসী, শম্ভুকে গিয়া কহিল, "মহারাজ আপনাকে ডাকিতেছেন।" শম্ভু কহিলেন, "দাসী! মহারাজকে গিয়া বল, আমি শীঘ্রই যাইতেছি। কহিও, আমি শিবপূজা করিয়া শিবের অর্ঘ্য সংস্থাপন করিতেছি, পূজা সাঙ্গ করিয়া অবিলম্বে সাক্ষাৎ করিব।" দাসী প্রত্যাগত হইয়া রাজাকে ঐ সংবাদ দিল। রাজা তখন কোন কথা না বলিয়া দাসীকে শিবচন্দ্রকে ডাকিতে আজ্ঞা করিলেন। দাসী রাজাজ্ঞা লইয়া শিবচন্দ্র-সমক্ষে গিয়া সংবাদ করিল। শিবচন্দ্র তখন শিবপূজা শেষ করেন নাই; প্রায় শেষ হইয়াছে, কিছু বাকী ছিল। সংবাদ পাইবামাত্র পূজা ত্যাগ করিয়া দাসীর অনুসরণ করিলেন।

দাসী, শিবচন্দ্রের নিকট হইতে প্রত্যাগত হইবার পূর্ব্বেই শম্ভুচন্দ্র রাজসমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া প্রণতিপূর্ব্বক মহারাজকে অসময়ে আহ্বানের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাঁহার নিজের বিলম্বের কারণ জ্ঞাপন করিলেন। তিনি কহিলেন যে, শিবের অর্ঘ্য সম্পাদন করিয়াই মহারাজসমক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। রাজা কহিলেন, "বাপু! এত শীঘ্র আসিবার কারণ কিছুই নাই, পূজা সমাপন করিয়া আসিলেও বিশেষ ক্ষতি ছিল না। যাহা হউক, শম্ভুচন্দ্র! রজনী প্রায় নিঃশেষ, আর তুমি উপবাসী আছ, কিছু জল খাও।" শম্ভুচন্দ্র কহিলেন, "মহারাজ, আপনি যাহা অনুমতি করিবেন, অবশ্যই আমার তাহা পালন করা উচিত। তবে আমার ব্রত সম্পূর্ণ হয় নাই, পূজা প্রায় সাঙ্গ হইয়াছে। পূজা শেষ করিয়া ত্বরায় আসিয়া মহারাজের প্রসাদ গ্রহণ করিব। আর অল্পক্ষণের জন্য ব্রতভঙ্গের প্রয়োজন সম্বন্ধে আপনি যাহা বলিবেন, তাহাই আমার শিরোধার্য্য।" রাজা কহিলেন, "আচ্ছা, পূজা সাঙ্গ করিয়া আসিও", এই বলিয়া শম্ভূচন্দ্রকে বিদায় দিলেন। সেই সময়েই শিবচন্দ্র, দাসী-সমভিব্যাহারে রাজসমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া প্রণতিপূর্ব্বক মহারাজের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া অসময়ে আহ্বানের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা কহিলেন, "শিব, তুমি যে দাসী সঙ্গে আসিলে? তুমি কি করিতেছিলে?" শিবচন্দ্র কহিলেন, "মহারাজ! আমি শিবপূজার দক্ষিণান্ত করিতেছিলাম, কিন্তু যখন আপনি ডাকিলেন, তখন আর তাহা শেষ না করিয়াই চলিয়া আসিলাম। কারণ আপনিই আমার সাক্ষাৎ শিব। যখন দেখিলাম, বিনা পূজায় শিব সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারি, তখন আর পূজা সাঙ্গে ফল কি?" রাজা কহিলেন, "ভাল, সে কথা থাক। এখন রজনী প্রায় শেষ হইয়াছে, কিছু জল খাও।" শিবচন্দ্র কোন দ্বিরুক্তি না করিয়া, তৎক্ষণাৎ প্রসাদ মস্তকে ধারণ করিয়া মুখে ফেলিয়া দিলেন। রাজা বলিলেন, "শিবব্রত সাঙ্গ না করিয়া জল খাইলে যে?" শিব উত্তর করিলেন, "মহারাজ! যদি ব্রত সাঙ্গ না হইতে ব্রতের ফল লাভ হয়, অর্থাৎ স্বয়ং শিব, সাক্ষাৎ হইয়া প্রসাদ দেন, তাহা হইলে আর ব্রত সাঙ্গ করিয়া ফল কি?" রাজা তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিদায় দিয়া রাণীকে পরস্পরের পার্থক্য দেখাইয়া দিলেন।

এই গল্পে ভক্তির সম্পূর্ণতা স্পষ্ট দেখান হইল। ভক্তিভাব প্রকৃতরূপে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, নিষ্কাম আত্ম-ত্যাগই ইহার মূলমন্ত্র, ইহার ভক্তি। ইহা ব্যতীত কখনই ভক্তি সম্পূর্ণ হইতে পারে না, নিঃস্বার্থপর হইয়া কামনা বর্জ্জন পূর্ব্বক ঈশ্বরে আত্মবিসর্জ্জন করার নাম ভক্তি। যদি কিছু আমাদিগকে ঈশ্বর হইতে বিভেদ করে, তাহা আত্মজ্ঞান ও কামনা। এই দুইটী পরিত্যাগ করিতে পারিলে আর প্রভেদ থাকে না। আমার বোধ হয়, আত্মজ্ঞান-পরিত্যাগ করার নাম সাধনা—সাধনা অন্য কোন বস্তু নহে। তাই বলি, যদি ভক্তি কি, তাহা বুঝাইবার জন্য বল, নাম সাধন, তাহা হইলে সাধন কি, অগ্রে বুঝাইতে হইবে, কারণ, সাধন কি, না জানিলে, ভক্তি কি প্রকারে বুঝিব?

শ্রীক্ষীরোদকুমার দত্ত এম-বি।

গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

(ছাইখেগো ক্রোরীয়ান্)

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

এতাদৃশ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির রাজত্ব-সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রধান পদপ্রাপ্তি-বিষয়ক অনেক কৌতুকাবহ ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়—এতদ্দেশের দুর্ভাগ্য-বশতঃ তৎকালীন ঘটনার সবিশেষ বিবরণ কিছুই সংগৃহীত হইতেছে না। সে যাহা হউক, গোবিন্দের প্রতি পাতশার অভাবনীয় অনুরাগ দেখিয়া, দেওয়ানের কিঞ্চিৎ শঙ্কা হইয়াছিল—পাছে দেওয়ানীপদও, গোবিন্দকেই দেওয়া হয়। গোবিন্দের সহিত সম্রাটের সাক্ষাতে "তিন তাকিয়ে ইলাম" হইয়া গেলে, দেওয়ানের সে শঙ্কা অন্তর্হিত হইল। তৎকালে মুসলমান সম্রাটদিগের সভায়, সিংহাসনের সম্মুখে ও উভয় পার্শ্বে কতকগুলি "তাকিয়া" থাকিত। ঐ সকল "তাকিয়া ইলামের" অর্থ এই যে, কোন ব্যক্তিকে ঐ পুরস্কার দেওয়া হইলে, সে তত্তৎ সুবার কোন প্রধান রাজকর্ম্ম পাইবার অধিকারী হইত। তদনুসারে গোবিন্দ—বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা এই তিন সুবার "ক্রোরীয়ান" অর্থাৎ রাজস্ব-সচিবের পদে অভিষিক্ত হইলেন। বাঙ্গালার নবাবের অধীন হইয়া তাঁহাকে কাজ করিতে হইত বটে, কিন্তু সে

অধীনতা নাম মাত্র। বাঙ্গালা বলিলে, তৎকালেও বঙ্গ বিহার উৎকল—এই তিন প্রদেশ বুঝাইত। গোবিন্দ একরূপ স্বাধীন ভাবেই বাঙ্গালার রাজস্ব নির্ণয় ও আদায় করিতেন।

গোবিন্দ, এইরূপে বঙ্গের প্রধান সচিবের পদপ্রাপ্ত হইয়া কয়েক বৎসরের মধ্যে বহুল অর্থসঞ্চয় করিয়া, স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনি কিরূপ স্বাধীনভাবে রাজস্ব নির্ণয় করিতেন, নিম্নলিখিত কয় পঙ্‌ক্তির আভাসেই তাহা প্রতীত হইবে।

প্রবাদ আছে, গোবিন্দ দেশে প্রত্যাবর্ত্তন কালে তাঁহার অধীন রাজগণের প্রদেশ সমূহ হইতে একটী দ্রুতগামী অশ্ব ছুটাইয়া দিয়াছিলেন। "অশ্ব ছুটাইয়া দিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন, "যে যে প্রদেশ দিয়া এই অশ্ব যাইবে, এবং অশ্ব যেখানে গিয়া স্থির হইবে, সেই পর্য্যন্ত তাঁহার নিজ অধিকারে থাকিবে। তিনি সেই সেই প্রদেশের রাজস্ব, দিল্লীর সম্রাটকে দিবেন। রাজগণ আমাকে রাজস্ব দিবেন।" তিনি গাড়ি টাকাদ্বারা পূর্ণ করিয়া লইয়া সেই দ্রুতগামী অশ্বের পশ্চাৎ পশ্চাৎ টাকার "হরির লুট" দিতে দিতে বাটী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। টাকা "হরির লুট" দিবার অর্থ—তত্তৎ প্রদেশের মূল্যস্বরূপ উহা প্রদত্ত হইল। অথবা দরিদ্রদিগকে অর্থ দান করা হইল, ইহাই অনুমিত হয়। বিনা রক্তপাতে রাজা কোন প্রদেশ জয় করিতে সমর্থ হন না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সামান্য দ্রুতগামী অশ্বরূপ অস্ত্রদ্বারা তাহা অক্লেশেই বিনা রক্তপাতেই অধিকার করিয়া লইলেন। তাহাতে অধীন রাজগণ, ভীত হইয়া এই সকল অমানুষিক কার্য্যের কোন প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিতে সাহসী হইলেন না! গোবিন্দের যে প্রভূত ক্ষমতা ছিল, ইহাই তাহার প্রভূত পরিচয়। গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পিতৃ মাতৃ চরণে বিপুল বিত্ত দিয়া প্রণাম করিলেন। পরে যে মেছুনী, যে বাজরায় (মৎস্য-বিক্রয় পাত্র) করিয়া তাঁহার বাটীতে মাছ বিক্রয় করিতে আসিয়া তাঁহাকে গালি দিয়া গিয়াছিল, সেই মেছুনীকে তাহার ডালা সহ লোক দ্বারা ডাকিয়া পাঠাইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মৎস্যজীবিনী ডালা সঙ্গে লইয়া গোবিন্দের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী মৎস্য-জীবিনীকে দেখিয়া আনন্দাশ্রুপূর্ণ লোচনে গদ্‌গদস্বরে বলিলেন, "এই অনন্তবিশ্বের অনন্তরূপী ভগবানের অনন্ত

লীলার মহিমা মাদৃশ মানবে কি বর্ণন করিবে? আমি যখন বাটী ত্যাগ করিয়া যাই, তখন আমার বয়স মোটে আট বৎসর। এই আট বৎসর বয়সের মধ্যে এই মৎস্য-জীবিনী কিংবা অন্য কোনও মৎস্য-জীবিনী "মৎস্য লইবে" বলিয়া কখনও আমার বাটী আসিয়া উপস্থিত হয় নাই; এবং আমিও সেই আট বৎসর বয়সের মধ্যে কোন দিনই মৎস্যাস্বাদন করি নাই। আমার সেই আট বৎসর বয়সের সময় যদি এই মৎস্য-বিক্রয়িণী, আমার বাটীতে মীন বিক্রয় করিতে না আসিত; এবং মীন বিক্রয় করিতে আসিয়া আমাকে যদি গালি না দিত, তবে কি আমি এতাদৃশ অর্থোপার্জ্জনে সমর্থ হইতাম? আমি কখনই এতাদৃশ অর্থোপার্জ্জনে সমর্থ হইতাম না। এই মেছুনী আমার বাটীতে মাছ বিক্রয় করিতে আসিয়াছিল বলিয়াই আমি এতাদৃশ অর্থোপার্জ্জনে সমর্থ হইয়াছি। অন্তর্যামী ভগবান্, আমার উন্নতিপথাবিষ্কারের জন্যই এই মৎস্য-জীবিনীকে আমার সৌভাগ্য লক্ষ্মীরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। এই মেছুনীই আমার সৌভাগ্য-লক্ষ্মী। এই বলিয়া মেছুনীর ডালা, টাকায় পরিপূর্ণ করিয়া দিলেন।

বাস্তবপক্ষে অধিকাংশ দরিদ্র সন্তানের উন্নতি, সুশিক্ষা, আত্মাবলম্বন ও ধর্ম্ম শিক্ষার পথ নীচ কুলোদ্ভব জঘন্য বৃত্তিধারী লোকের তীব্র-মিষ্ট, কটু সম্ভাষণ দ্বারা প্রথমে পরিষ্কৃত ও পরিমার্জ্জিত হইয়া সংসারে প্রবেশ করে, ইহা অনন্তবিদের অনন্তরূপী ভগবানের অনন্ত কার্য্যসূত্রের অনন্ত লীলা। গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর অদৃষ্টেও, তাহাই ঘটিয়াছিল। গোবিন্দকে যদি মেছুনী গালি না দিত, তবে তাহাকে কখনই সেই আট বৎসর বয়সের সময় অর্থোপার্জ্জন মানসে বাটী হইতে বহির্গত হইতে হইত না। মৎস্য-জীবিনী গালাগালি দিয়াছিল এবং সেই গালাগালি গোবিন্দের হৃদয়ে মর্ম্মান্তিক তীক্ষ্ণ শলাকার ন্যায় বিদ্ধ হইয়াছিল বলিয়াই স্বয়ং লক্ষ্মী তাঁহার সহায় হইয়াছিলেন।

মুসলমান অধিকারের পূর্ব্ব হইতেই, বঙ্গদেশ দ্বাদশটি ক্ষুদ্ররাজ্যে বিভক্ত ছিল। জনরব আছে, সম্রাট জহাঙ্গীরের সময়ে যশোহর-রাজ প্রতাপাদিত্য ঐ বারটি রাজ্য স্থাপন করেন। একথা সত্য বোধ হয় না। অথবা সত্য হইলেও, ঐ রাজ্যগুলি তিনি অধিককাল আত্ম-বশে রাখিতে পারেন নাই। যেহেতু গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর সময়ে এবং তাঁহার

মৃত্যুর পরও অনেক দিন পর্য্যন্ত পূর্ব্বস্থলীতে ঐ বার জন রাজার বারটি বাসা-বাটী ছিল। ঐ বাসাবাটী সকল "বার ভূম" বলিয়া খ্যাত ছিল। রাজস্ব-সম্বন্ধী কার্য্যাদি করিবার জন্য বঙ্গরাজগণের কর্ম্মচারীরা, উপরি-উক্ত বাসাবাটী সকলে অবস্থান করিতেন। কখন কখন প্রয়োজন মতে গোবিন্দের সহিত বা পরবর্ত্তী তৎপদাভিষিক্তের সহিত সাক্ষাৎ করিতে স্বয়ং রাজারাও তথায় আসিতেন। গোবিন্দ, পূর্ব্বস্থলীর বাটীর তিন দিকে গড় কাটা হইয়াছিল। অপর দিকে গঙ্গা স্বয়ং, গড়ের কার্য্য করিতেছিলেন। বাসবাটী ব্যতীত গঙ্গাতীরে অট্টালিকাময় ঠাকুরবাটীও ছিল। তথায় একশত আটটি শিবমন্দির ছিল। তদ্ব্যতীত রাধাকান্ত, রাধাবল্লভ, কৃষ্ণদেব এবং মদনগোপাল এই চারিটী দেববিগ্রহ তথায় ছিলেন। গোবিন্দ পশ্চিম হইতে আগমনকালে তৎকালীন জয়পুরপতির নিকট প্রথম বিগ্রহ প্রাপ্ত হন। দেবালয়ের সহিত সংযুক্ত স্বতন্ত্র অতিথিশালা ছিল। গোবিন্দ, ঐ সকল দেবসেবা এবং অতিথিসেবা, মহাসমারোহে সম্পন্ন করিতেন। জনশ্রুতি আছে, তিনি অত্যন্ত বদান্য ছিলেন। উক্ত রাধাকান্ত—শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ রায়ের বাটীতে, রাধা-বল্লভ শ্রীযুক্ত আনন্দকুমার রায়ের বাটীতে, কৃষ্ণদেব শ্রীযুক্ত বীরভদ্র ভট্টাচার্য্যের বাটীতে (পূর্ব্বস্থলীতে), অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন। মদন-গোপাল বিগ্রহ সম্বন্ধে কিছুই প্রমাণ পাওয়া যায় না। বর্গীর হাঙ্গামার সময় উক্ত মদনগোপাল বিগ্রহ বর্গীরা ভাগীরথীর জলে নিক্ষেপ করিয়া ছিল। কিন্তু হায়! আজ বলিতে কষ্ট হয়—গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী যে দেবসেবা অতি সমারোহে সম্পন্ন করিতেন; অহো কি বিড়ম্বনা, কালের কুটিল গতিতে সেই দেব-বিগ্রহ, আজকালকার ঊনবিংশ শতাব্দীর সুশিক্ষিত সুসভ্য আত্মাভিমানী নব্য যুবক বাবুদের হস্তে পড়িয়া উপযুক্ত দেবসেবার অভাবে দেববিগ্রহ, নিগ্রহ প্রাপ্ত হইতেছেন, কিন্তু ন্যায়ের অনুরোধে বলিতে হইবে, উক্ত ব্যক্তি সকল চাকরি উপলক্ষে বৎসরের বার মাস প্রবাসে (বিদেশে) বাস করিয়া থাকেন। তত্তাবধানের উপযুক্ত লোকাভাবে দেববিগ্রহ এরূপ নিগ্রহ প্রাপ্ত হইতেছেন।

বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে তিনটী শ্রেণী আছে। রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র এবং বৈদিক। এই শ্রেণীত্রয়ের মধ্যে জাতিগত বিভিন্নতা কিছুই নাই। কিন্তু সকলেই আপন আপন শ্রেণীকে অপেক্ষাকৃত পবিত্র

মনে করেন। সেটি, কেবল তাঁহাদের মনের ভ্রান্তিমাত্র। কার্য্যে কাহারও অধিক প্রাধান্যের প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং সকলেই সমান, এইরূপ অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। এই তিন শ্রেণী ব্রাহ্মণদিগের ব্রাহ্মণ্যদেব যে, এক—ইহা বোধ হয়, সকলেই জ্ঞাত আছেন। কিন্তু প্রকাশ্যরূপে এই শ্রেণীত্রয়ের মধ্যে আহার ব্যবহার বা বিবাহাদি সম্বন্ধ হইতে পারে না। অথচ কেহ কাহার অন্নগ্রহণ করিলে, তাহাকে স্বশ্রেণী হইতে পতিত হইতে হয় না; এবং ঐ শ্রেণী সকলের মধ্যে গুরু শিষ্য সম্বন্ধও প্রচলিত আছে। যাহাহউক, এক জাতির মধ্যে এইরূপ অমূলক ভিন্নতা থাকায় অনেক অনিষ্ট হইতেছে। এই তিন শ্রেণীর মধ্যে বিবাহাদি সম্বন্ধ প্রচলিত হইলে ব্রাহ্মণ জাতির অনেক মঙ্গল হইতে পারে। এই তিন শ্রেণী একত্র হইলে কিরূপ মঙ্গল হইতে পারে এবং পৃথক্ থাকায় কি অনিষ্ট সাধিত হইতেছে; তাঁহার সূক্ষ্ম বিচার এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। যাহাহউক, এই তিন শ্রেণীকে একত্র করিবার জন্য গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি নিজে তিনশ্রেণীতে "কে আমাকে সমাজচ্যুত করে?" এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার তিন পত্নীরই সন্তান হইয়াছিল। কিন্তু বৈদিক পত্নীর গর্ভজাত সন্ততিগণ ব্যতীত, আর কেহই জীবিত ছিল না। তাঁহার অপর সন্তানেরা জীবিত থাকিলে এবং পর বংশীয়েরা এই নূতন প্রণালী প্রচলিত করিবার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করিয়া আসিলে কোন ফল হইত না, একথা বলা যায় না। ফলতঃ, গোবিন্দের এই চেষ্টা, ফলবতী হয় নাই। তিনি মৃত্যুকালে দুই পুত্র রাখিয়া যান। জ্যেষ্ঠের নাম রূপরাম, কনিষ্ঠের নাম রাম রায়। বোধ হয়, কর্ম্মসূত্রে, রাজসংসার হইতে তিনি "রায়" উপাধি পাইয়াছিলেন। এইজন্য তাহার পরবংশীয়েরা "রায়" উপাধিতেই খ্যাত হন। কিংবদন্তী আছে, একদা আহ্নিক করিতে করিতে হঠাৎ গোবিন্দের মৃত্যু হয়। তিনি যোগাসনে উপবিষ্ট, তাহার ছিন্নমস্তক গৃহতলে লুণ্ঠিত হইতেছে, তৎকালীন পরিজনেরা, তাঁহার এইরূপ পরিণাম দেখিয়াছিলেন। যাঁহারা তাঁহার এইরূপ মৃত্যুতে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা বলেন, গোবিন্দ ছিন্নমস্তার মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন; এইজন্য তাঁহার ঐ রূপে মৃত্যু হইয়াছিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

মৃত্যু।

কোথা যাও দ্রুতপদে পথিক প্রবিণ!
ছিন্নকন্থা জঠরজ্বালায় তনুক্ষীণ॥
বুঝি অর্থ অন্বেষণে, চলিয়াছ ক্ষুণ্ণমনে,
যাও,—যাও,— সম্মুখেতে গভীর গহন।
মৃত্যু অই সম্মুখে ভীষণ॥

কুবেরের প্রতিনিধি কে তুমি রাজন্!
আসমুদ্র ক্ষিতিতল করিছ শাসন?
ধন-বল, জন-বল, মরকত হর্ম্ম্যস্থল—
পেয়ে সুখে আছ বুঝি? করহ স্মরণ—
মৃত্যু অই সম্মুখে ভীষণ॥

হুঙ্কারি চলিছ রণে কেও বীরবর!
পদভরে ধরাতল কাঁপে থর থর॥
ভীম অসি প্রহরণে, বধিছ অরাতিগণে,
দিগ্‌বিজয়ী বলি তোমা বাখানে ভুবন।
মৃত্যু অই সম্মুখে ভীষণ॥

নবজাত শিশু তুমি প্রভাতের তারা।
অনন্ত সুখের উৎস—মুখে হাসিভরা।
নাহি কপটতা ভান্, পুণ্যালোকে জ্যোতিষ্মান্
নিভিবে আঁধারে ওই সুবর্ণ বরণ।
মৃত্যু অই সম্মুখে ভীষণ॥

কত আশা যুবা তুমি সম্মুখে তোমার।
বহুশ্রমে বিদ্যালাভে ফুল্ল পরিবার॥
কত অর্থ, কত মান, লভিতে তোমার প্রাণ,
ঊধাও উতালা; ভ্রমে করি কি স্মরণ।
মৃত্যু অই সম্মুখে ভীষণ॥

রূপ গৌরবিনী তুমি,—সুকোমল-কায়া
কটাক্ষে জগৎ মুগ্ধ-মূর্ত্তিমতী মায়া।

ভাল বিম্ব অলকায়, চন্দ্রিমা স্তিমিত প্রায়,
ভ্রূভঙ্গে বিলোল তব আব্রহ্ম ভুবন।
মৃত্যু অই সম্মুখে ভীষণ॥
স্থিরবুদ্ধি বৈজ্ঞানিক তুমি অভিমানী।
পঞ্চভূত-ক্রীড়নক—হেন অনুমানি॥
বহ্নি বায়ু ব্যোম-তলে, সসাগরা ভূমণ্ডলে,
প্রকৃতি নিয়ম লঙ্ঘি গড়িছ নূতন।
মৃত্যু অই সম্মুখে ভীষণ॥
মহামেধা দার্শনিক তর্কে চূড়ামণি।
বাগ্মীতায় প্রতিভায় স্তম্ভিতা ধরণী॥
প্রখর গভীর দৃষ্টি, তন্ন তন্ন করি সৃষ্টি,
উদ্ভাবিলে কত তত্ত্ব জগদান্দোলন।
মৃত্যু অই সম্মুখে ভীষণ॥
প্রেমিক সুকবি কেহে উধাও পরাণ।
প্রকৃতির উরে বসি তুলিছ সুতান॥
সুরসিক নবরসে, প্রকৃতির ভাবাবেশে,
নানা রঙ্গে ভঙ্গে কর বিশ্ব বিপ্লাবন।
মৃত্যু অই সম্মুখে ভীষণ॥
হে কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, স্থাবর, জঙ্গম,
চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা, কোথায় গমন?
ব্রহ্মা আদি দেবগণ, করিতেছ কি চিন্তন?
নেহার কালের আস্যে বিকট ব্যাদন।
মৃত্যু অই সম্মুখে ভীষণ॥
কে অই বসিয়া শুভ্র হিমাচল শিরে
জন্ম মৃত্যু হীন আমি কহে দম্ভভরে
এ কি শুনি তব ঠাঁই
জন্ম নাই মৃত্যু নাই,
তুমি নাকি বিশ্বব্যাপী জন্ম-মৃত্যু-হীন।
সে তত্ত্বে আমায় প্রভো! করহে বিলীন॥

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

তোতা-পাখী।

প্রথম উল্লাস।

প্রথম দর্শন।

লক্ষ্মণাবতী নগরীর একটি সদর রাস্তার পূর্ব্বধারে সারি সারি খান-কতক বাড়ী। রাস্তার পশ্চিম ধারে হরেক রকম জিনিষের দোকান। ছোট একখানি দোকানে একজন হিন্দুস্থানী কামিনী পায়ের উপর পা রাখিয়া বসিয়া পানের খিলি বিক্রয় করিতেছে। কামিনীর বয়স অল্প, ফিট গৌর বর্ণ, নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ কেশ পাশ; ললাটের দুই পাশ দিয়া ঝুলিয়া সেই কেশরাশি কর্ণমূল ঢাকিয়া উরুদেশ পর্য্যন্ত বিলম্বিত হইতেছে, অঙ্গে কতকগুলি অলঙ্কারও আছে, সুন্দরী সুন্দর সুন্দর মসলাদার পান খাইয়া সুন্দর ঠোঁট দুখানি লাল করিয়াছে, দোকানে খরিদ্দার নাই, পানওয়ালি এক একবার বড় বড় চক্ষু দুটি ঘুরাইয়া রাস্তার এধার ওধার চাহিয়া দেখিতেছে। শোভা বড় মন্দ নয়।

মাঘ মাস; নবীন বসন্তের সমাগম; পাঁচ দিন পূর্ব্বে বসন্ত পঞ্চমীর উৎসব হইয়া গিয়াছে, বসন্ত বর্ণের বস্ত্র পরিধান করিয়া দুটি পাঁচটি হাস্য-মুখী কামিনী রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইতেছে। খিলিওয়ালি পথপানে চাহিয়া আছে। সময় অপরাহ্ণ। দোকানে খরিদ্দার নাই। প্রায় দশমিনিট পরে একটি যুবাপুরুষ আসিয়া সেই দোকানের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। দিব্য সুপুরুষ; বয়স অনুমান বিংশতি কি এক বিংশতি বর্ষ, অধরে ভ্রমর বর্ণ নবীন গোঁপ, চক্ষের পাতা বেশ বড় বড়, ভ্রূযুগল সুন্দর ধনুকাকারে বক্র, কপালখানি ছোট, সুকুঞ্চিত বাবরিচুল, হিন্দুস্থানী পোষাক পরা, মস্তকে হিন্দুস্থানী তাজ বামদিকে ঈষৎ বক্র, হস্তে এক গাছী যষ্টি, পদযুগে জরির লপেটা।

নবীন খরিদ্দারকে দেখিয়া, সুন্দর মুখে ফিক্ করিয়া হাসিয়া, মিহি আওয়াজে খিলিওয়ালি বলিল, "ছাঁচি খিলি বাবু সাব! গোলাপী খিলি বাবু সাব!" অভ্যর্থনা মন্দ হইল না; বাবু সাহেব অবাক হইয়া পান-ওয়ালির রূপ দেখিতেছিলেন বোধ হয় তাহার নয়নের সহিত মনের

গাঢ়তর সম্মিলন হইয়াছিল, অভ্যর্থনাকারিণীর অভ্যর্থনা বাক্য তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল কি না; আমরা সে কথা বলিতে পারিব না; কেবল এই টুকু বলিতে পারিব, খিলিওয়ালির সহিত তিনি মুখামুখী করিয়া দাঁড়ান নাই, একটু পাশ কাটাইয়া নির্ব্বাক অভিনয় করিতে ছিলেন; অন্যমনস্কভাবে পানের খিলির আসনের উপর তিনি একটি চুয়ানী ছুড়িয়া ফিলিয়া দিলেন, আবার একটু ফিক্ করিয়া হাসিয়া, সুন্দরী দোকানী দুটি গোলাপী দোনা বাবু সাহেবের হস্তে প্রদান করিল, দক্ষিণ হস্তে যষ্টি, সুতরাং বাবু সাহেব বাম হস্তে তাহা গ্রহণ করিলেন; চক্ষু রহিল পানওয়ালির দিকে।

ওদিকে আর একপ্রকার চমৎকার রঙ্গ! খিলির দোকানের ঠিক ঋজু ঋজু সম্মুখের বাড়ীখানির দোতালার জানালার খড়খড়ি বন্ধ; এক-ধারের একটি পাখি খোলা; সেই রন্ধ্রপথে দুটি সমুজ্জ্বল কৃষ্ণ নয়ন কিঞ্চিৎ প্রচ্ছন্নভাবে শোভা পাইতেছিল; যুবা অথবা দোকানীর নেত্র-ফলকে সে শোভা প্রতিবিম্বিত হয় নাই। সে দুটি কৃষ্ণ নয়ন কাহার, তাহাও আমরা জানি না। পানের দোনার আদান প্রদানের ৫ মিনিট পরে সেই দুই নয়নের অধিকারী অথবা অধিকারিণী কাহাকে যেন নিকটে ডাকিয়া আজ্ঞা দিলেন, "তুই একবার নীচে যা, ঐ দেখ্, ঐ যে মানুষটি পানের দোনা হাতে কোরে দাঁড়িয়ে আছে, ঐ মানুষটি কোনদিকে যায়, কোথায় যায়, দেখে আয়। ঠাই ঠিকানা জেনে আসিস, মনে মনে জেনে আসিস, কেহ যেন কিছু জান্তে না পারে। যা,—শীঘ্র যা!" যাহার প্রতি এই আজ্ঞা হইল, সে একজন সেই বাড়ীর কিঙ্করী। আজ্ঞা প্রাপ্তি মাত্রেই কিঙ্করী শীঘ্র শীঘ্র নিচে নামিয়া আসিল।

দ্বিতীয় উল্লাস।

পাখি পিঞ্জরে। খড়খড়ির পাখির ভিতর দিয়া যে দুটি কৃষ্ণ নয়ন এতক্ষণ রাস্তা পানে চাহিয়াছিল, সে নয়ন কাহার, পুরুষের কি রমণীর, এতক্ষণ তাহা আমরা জানিতাম না, এখন জানা গেল, একটি পরদা-নসীন কামিনীর,—পরম সুন্দরী মানবতী যুবতী কামিনীর। এখন আর তাঁহাকে ইতর সম্ভাষণে পরিচিত করা উচিত হয় না! তাঁহার কিঙ্করী

ফিরিয়া আসিল। লজ্জা রঞ্জিত আরক্ত বদনে—লজ্জা রঞ্জিত অথচ আগ্রহ-পূর্ণ প্রফুল্ল বদনে কিঙ্করীকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে মোহিনী! কি সংবাদ!"

প্রকাশ পাইল, সেই কামিনীর কিঙ্করির নাম মোহিনী। নির্জ্জন গৃহে কথোপকথন, কিছু আর গোপন রাখিবার প্রয়োজন ছিল না, পন্থা পরিস্কার! মোহিনী উত্তর করিল, "খিলিওয়ালির দিকে চাহিতে চাহিতে লোকটি সরাসর দক্ষিণদিকে চলিল, তফাতে তফাতে আমিও সঙ্গ লইলাম। বেশী দূর নয়,—আন্দাজ একশত গজ তফাতে ছোট একখানা একতলা বাড়ী, লোকটী সেই বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। সেই বাড়ীর দুই ধারে আরও পাঁচ সাত খানা একতলা বাড়ী আছে, পাছে ভুল হয়, সেইজন্য বাড়ীখানার বাহিরের কপাটের গায়ে আমি একটা চিহ্ন রাখিয়া আসিয়াছি।"

"বেশ করিয়াছিস।"—আহ্লাদে করতালি দিয়া কামিনী বলিলেন, "বেশ করিয়াছিস। সন্ধ্যার সময় আবার তোরে সেই বাড়ীতে আর একবার যাইতে হইবে।"

এইখানে কামিনীর কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়া না রাখিলে আখ্যায়িকার রসভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা। অতএব পাঠক মহাশয় জানিয়া রাখুন, যে বাড়ীতে কামিনী, সেই বাড়ীতে একজন নবাব থাকেন, কামিনীটি সেই নবাবের বেগম। "সন্ধ্যার সময় আবার তোরে সেই বাড়ীতে আর একবার যাইতে হইবে।" এই কথা শুনিয়া সবিস্ময়ে মোহিনী বলিল, "কি নিমিত্ত"—বেগম সাহেব বলিলেন, "সেই লোকটিকে এখানে আনিবার নিমিত্ত।"

আরও অধিক বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কম্পিতস্বরে মোহিনী কহিল, "বল কি তুমি! এ পরিহাসের অর্থ কি, কোথাকার লোক, কি বৃত্তান্ত, কিছুই জানা নাই, নবাবের অন্দরমহলে তাহাকে আনিতে হইবে, এটা তোমার কি রকম পরিহাস!

বেগম। পরিহাস নয়, সত্য সত্যই তাহাকে আনিতে হইবে। তাহাকে লইয়া আমি একটা নূতন রকমের খেলা করিব। আনিতেই হইবে।

মোহিনী। আমি পারিব না।

বেগম। পারিতেই হইবে, না পারিলে আমি তোর উপর রাগ করিব।

এত ভালবাসি তোরে, এত বিশ্বাস করি তোরে, এ কাজটা যদি তুই না পারিস, সব ভালবাসা ফুরাইবে, সব বিশ্বাস ফুরাইবে।

মোহিনী। ফুরায় ফুরাবে, আমি পারিব না। সাত বৎসর নবাব সাহেবের নিমক খাচ্চি, আমি নিমখহারাম হব না।

বেগম। তা কেন হবি! আমার হুকুমে কাজ করা নিমখহারামি নয়। সন্ধ্যার সময় তোরে সেই একতালা বাড়ীতে যাইতেই হইবে,—লোকটিকে এখানে আনিতেই হইবে।

মোহিনী। আমার কর্ম্ম নয়। তুমি বরং আর কাহাকেও ঐ দুরন্ত কাজটার ভার দিও, না হয় আমারে বরং চাকরীতে জবাব দিও, ও কাজ আমি কখনই পারিব না। বাপ্‌রে! সর্ব্বনেশে কাজ!

বেগম। ফিকির আছে। কেহ কিছু জানিবে না। কিসের ভয়! নবাব সাহেব বাড়িতে নাই, তিনি এখন দিল্লীতে। সংবাদ এসেছে, আরও একমাস সেখানে থাকিবেন। কিসের ভয়। নবাব এখানে থাকিলেও ভয় করিতে হইত না। ফিকিরের কাছে কোন প্রকার ভয় দাঁড়াতেই পারে না।

মোহিনী। বল দিখি, তোমার ফিকিরখানা কি রকম!

বেগম সাহেব এখানে ফিকিরখানা ব্যাখ্যা করিতে বসিলেন। মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "শোন তবে,—শোন্ আমার ফিকির। তুই যাবি,—গেলেই তাঁর দেখা পাবি। কেন জানিষ! হিন্দুস্থানীর পোষাক্ পরা বটে, লোকটি কিন্তু বাঙ্গালী। চেহারা দেখেই আমি চিনেছি। বিদেশী মানুষ, নূতন এসেছে, নূতন লোকে সহরে সন্ধ্যাকালে প্রায়ই বাহির হয় না, গেলেই দেখা পাবি। নূতন এসেছে, এটা আমি কিরূপে জানি, শোন্ বলি। এটা হইতেছে সদর রাস্তা, সহরের সকলকেই এ রাস্তায় যাওয়া আসা করিতে হয়, একদিনও আমি,—একবারও আমি ঐ লোকটিকে আমি এ পথে দেখি নাই।

হাসিয়া মোহিনী বলিল, "এই তোমার ফিকির! ও দশা! ওমন ফিকির আমারে ভুলাতে পারে না। নূতন এসেছে, নূতন মানুষ, ঘরেই থাকে, গেলেই দেখা হবে, এ রকম ফিকির খাটান আমার কর্ম্ম নয়।"

চঞ্চলা হইয়া বেগম সাহেব কহিলেন, "ঐ ত তোর রোগ! সকল কথা না শুনেই জবাব করিস! ফিকিরের কথাটা কি এরই মধ্যে বলা

হয়ে গেল! শোন্ আগে, তারপর কথা কবি। ফিকিরটা এই যে, তুই যাবি, দেখা পাবি হাসবি না, বলবি, বাবু সাব তোতা-পাখী কিনবে! খোষ পাহাড়ের তোতা, সব রকম কথা জানে, সব রকম কথা কয়, বুদ্ধি পর্য্যন্ত দেয়, ভারি সস্তা। একটিবার চক্ষে দেখলেই সব গুণ জান্তে পারবে, চেহারাও খুব ভাল! হাতে হাতে আনা যায় না, যেখানে আছে, সেইখানে গিয়ে দেখে শুনে পছন্দ করা চাই!—এই সকল কথা বলিলেই রাজি হবে। লোকটি সৌখীন, ব্যবহারেই পরিচয় পেয়েছি, চোয়ানী দিয়ে দুই দোনা পান কিনেচে। নিশ্চয় রাজি হবে। রাজি হলেই ওমনি তখনি সঙ্গে করে আন্‌বি।"

মুখ ভারী করিয়া মোহিনী বলিল, "সব কথাই বুঝিলাম! তোতা পাখির ফিকির! সেলাম বহুৎ বহুৎ। তোতা পাখির ফিকির চালাইতে কিন্তু মোহিনীর সাধ্য নাই, মোহিনীর অত বড় বুকের পাটা নয়। তোতাই বল, ময়নাই বল, কিংবা হাতিই বল, আনাটা চাই! লোকটিকে তোমার একান্তই দরকার। মোহিনীর কপাল দোষ, সে রকম ময়না-গিরি মোহিনী শিখিতে পারে নাই!"

মৃদু হাসিয়া বেগম সাহেব বলিলেন, "কিছুই অসাধ্য হবে না। দোহারা ফিকির। এক ফিকির তোতা পাখি, আর ফিকির বড় মজার। এক-জন অচেনা পুরুষ মানুষকে নবাবের অন্তঃপুরে নিয়ে আয়, এমন মন্ত্রণা আমার নহে। একপ্রস্ত বাইজীর পোষাক,—পেসয়াজ, ওড়না, টুপী, রুমাল, এই সব সজ্জা সঙ্গে নিয়ে যাবি, বলবি পুরুষ মানুষ দেখিলে সেই তোতা পাখিটির বড় রাগ হয়, একটিও কথা কয় না, তুমি মেয়ে-মানুষ সাজ, নির্ব্বিঘ্নে সওদা হয়ে যাবে। এ কথা শুনিলে সৌখীন পুরুষ অবশ্যই বাইজী সেজে তোতা কিনিতে আসিতে রাজি হবে, কোন আপত্তি করিবে না। তুই তারে স্বহস্তে বাইজী সাজাবি, মুখে গোঁপের রেখা আছে, সেই মুখে একখানা লাল রুমালের ঘোমটা ঢাকা দিয়ে, পাল্কিতে তুলে দিবি, পাল্কির দরজায় চাবি বন্ধ থাকিবে, আর একখানা পাল্কিতে তুই নিজে উঠিয়া বসিবি, সরাসর খিড়কী দরজা দিয়ে পাল্কি শুদ্ধ বাড়ীর ভিতর নিয়ে আসবি। কেমন, এ ফিকিরে আর তোর কোন ওজর আছে। এ ফিকিরে তোর প্রাণে আর কি কোন ভয় থাকিবে!

হো হো করিয়া হাসিয়া মোহিনী তখন বলিল, "ফিকির বটে! ফিকির বটে! বহুৎ আচ্ছা ফিকির! লোকটিকে তবে একান্তই তুমি চাও! আচ্ছা, আর এখন আমি গররাজি নই, মনিবের হুকুম এই ফিকিরে তামিল করিব। কিন্তু সে লোক যদি রাজি হয়, তবে।"

যুক্তি স্থির হইল, ফিকির স্থির হইল, মোহিনী রাজি হইল, সজ্জা গুছাইতে, সরঞ্জাম সংগ্রহ করিতে বেলাটুকু কাটিয়া গেল, সূর্য্যদেব অস্ত গেলেন, সন্ধ্যা হইল। মোহিনী তখন বাইজী সজ্জার একটি পুটুলি কক্ষে লইয়া দূতীগিরি করিতে যাত্রা করিল।

বেগমের কথাই ঠিক। মোহিনী উপস্থিত হইবামাত্র বাবু সাহেবকে দেখিতে পাইল, কথাবার্ত্তা ঠিক হইল, যে রকমে সাজাইতে হয়, কক্ষস্থিত পোষাকে মোহিনী সেই রকমে বাবু সাহেবকে বিবি সাহেব সাজাইল, মোহিনীর সঙ্গে পাল্কি চড়িয়া রাত্রি চারিদণ্ডের সময় নূতন বিবি সাহেব তোতা পাখি কিনিতে শুভ যাত্রা করিলেন। অত্যল্প সময়েই দুইখানি বদ্ধ শিবিকা নবাবের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। বাঙ্গালী বাবু সাহেব, ওরফে বিবি সাহেব সেই রাত্রে নবাবের বেগম সাহেবের বিলাসগৃহে পরম যত্নে আশ্রয় পাইলেন। সে আশ্রয় ছাড়িয়া আর বাহির হইতে পারিলেন না। পাখি কিনিতে আসিয়া নিজেই পাখি হইলেন। হাস্য করিয়া মোহিনী বলিল, "পাখি পিঞ্জরে।"

তৃতীয় উল্লাস।

জোড়া পাখি উড়িল। পাল্কি হইতে বাহির হইয়া বাইজীবেশধারী বাবু সাহেব যখন বেগমের সম্মুখে দাঁড়াইলেন, বেগমের রূপ দেখিয়া তখন তাঁহার চক্ষু স্থির হইল। বেগমটি নবাব সাহেবের দ্বিতীয় পক্ষের বেগম, বয়সে সপ্তদশী, রূপ অতি চমৎকার, উপন্যাস পুস্তকে পরিরাজ্যের পরীগুলির রূপের যেরূপ বর্ণনা পাঠ করা যায়, এই বেগমটির রূপও যেন সেই প্রকার; ঠিক যেন সাক্ষাৎ পরিজাদী। বাইজীরূপী বাবু সাহেব সেই অপরূপ রূপ দেখিলেন। মুখে আর বাক্য সরে না, সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত, নেত্রপুট পলকশূন্য। অনেকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া পরিশেষে বাইজী একবার গদগদকণ্ঠে উচ্চারণ করিলেন, তো—তা—পা—খী।

মধুর অধরে মধুরহাস্য আনয়ন করিয়া রূপবতী বেগম সাহেব আপন বক্ষে হস্তার্পণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ প্রতিধ্বনিত করিলেন, "হাঁ, তোতা পাখি! দেখ বাইজী! দেখ দেখ, এইটি তোমার তোতা পাখি!"

বাক্যের সঙ্গে সঙ্গেই কার্য্য। বাইজী বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়াই রসিকা বেগম সানুরাগে বাইজীর করধারণ পূর্ব্বক মখমল পর্য্যঙ্কে উপবেশন করাইলেন, আপনিও সহাস্যবদনে পার্শ্বে বসিলেন; সহাস্যবদনেই নৃত্যভঙ্গী করিয়া কহিলেন, "আমাদের এই বাইজী অপেক্ষা বাইজীর গোঁপ জোড়াটি বেশী সুন্দর! বাইজীর মুখে গোঁপ! এমন অপূর্ব্ব দৃশ্য কেহ কখন দেখে নাই! আমি দেখিলাম! বাহবা বাহবা! আমি তবে পরম ভাগ্যবতী!"

বাইজী আর বেশীক্ষণ রহিলেন না, নবীন বসনভূষণে নবীন বাবুজী হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন, কথাচ্ছলে নানাপ্রকার রসালাপ হইল। বেগম সাহেবের অনুমানটী সত্য। বাবু সাহেবটি সত্য সত্যই বঙ্গবাসী,—জাতি ব্রাহ্মণ, নাম রাধিকাপ্রসাদ রায়। প্রথম রজনীতেই ব্রাহ্মণের যজ্ঞ-কার্য্য সমাপ্ত হইল। আড়ম্বর অধিক হইল না। আদর করিয়া বেগম সাহেব বলিলেন, "লজ্জা স্ত্রীজাতির ভূষণ, সেই লজ্জাকে দূরে রাখিয়া আমি নিজমুখে কবুল দিলাম, দূর হইতে পানের দোকানে তোমার রূপ দেখিয়া সত্য আমি বিমোহিত হইয়াছি, তুমি যদি আমারে ভালবাসিতে পার, এই রাত্রেই নবীনবন্ধুদের উপাসক হও; সাদরে আমি তোমারে এই নবযৌবন দান করিব। রাধিকাপ্রসাদ কথার প্রসঙ্গে অবগত হইলেন, এ বেগম সাহেবটি নবাবের বিবাহিত নহে, এটি একটি রক্ষিতা।

রাধিকাপ্রসাদ আপন কর্ণকে সহসা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, আপনি তখন জাগ্রত কি নিদ্রিত, কথাগুলি স্বপ্ন কি সত্য, তাহা বুঝিয়া লইতে সন্দেহ উপস্থিত হইল। বেগম যখন দ্বিতীয়বার বলিলেন, মুসলমান হও, আমি তোমারে নবযৌবন দান করিব, রাধিকার হৃদয়ে তখন আর প্রেমানন্দ ধরিল না; বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের ক্ষুদ্র হৃদয়খানি যেন মহাসমুদ্র বোধ হইল, সেই মহাসমুদ্রে মুহুর্মুহু প্রেমতরঙ্গ বহিল। সেই রজনীতেই রাধিকাসাদ যজ্ঞসূত্র ত্যাগ করিয়া কল্মা পড়িলেন, সুস্বাদু রামপক্ষী ভক্ষণ করিলেন। নামটিও বদল করিয়া আবদুল আলি নাম লইলেন, আমরা আর এখন কি বলিয়া অভিনন্দন করি,—পাঠক মহাশয়গণের সহিত আনন্দে বাহু তুলিয়া বলি, হরিবোল হরি!

শুভ সম্মিলন। প্রায় একমাসকাল পরমসুখে রাধিকাপ্রসাদের ওরফে আবদুল আলি মোল্লার নবাব নিকেতনে বাস। ভরসা ছিল, নবাব তখন দেশভ্রমণে গিয়াছেন। ক্রমে তাঁহার স্বগৃহে প্রত্যাগমনের দিন নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল। বেগম সাহেব আর রাধিকাপ্রসাদকে নিজ নিকেতনে লুকাইয়া রাখিতে সাহস করিলেন না। প্রায় একমাস একসঙ্গে অবস্থিতি, তথাপি কেবল এক মোহিনী ভিন্ন নিকেতনের কেহই জানিত না যে, সুন্দরী বাইজীটি পুরুষ মানুষ। রাধিকাপ্রসাদ প্রতিদিন সূর্য্যের উদয় অস্তকাল ঘোমটা দিয়া বাইজী সাজিয়া থাকিতেন, অধিক রাত্রে নিজমূর্ত্তি ধরিতেন। দিনমানে বাইজী, নিশামানে বাবুজী, অথবা মোল্লাজী। এতদিন এই ভাব, কিন্তু আর সে ভাব চলিল না। কথাটা কেবল উপন্যাসের অঙ্গ নয়, আমাদের দেশের দুর্ভাগ্যক্রমে একালে আজকাল আর্য্যসমাজ মধ্যে দিয়া রাত্রে অনেকগুলি লোকের দুই প্রকার মূর্ত্তি নয়নগোচর হইতেছে। হায় হায়! এরূপ লুকাচুরি আর কতদিন এই আর্য্যসমাজকে অনুৎসন্ন রাখিবে, একমাত্র ভগবানই তাহা জানেন।

হাঁ, বেগমসাহেব আর রাধিকাপ্রসাদকে লইয়া লুকাচুরি দেখিবার সুবিধা পাইলেন না। এক রাত্রে তিনি রাধিকাকে বলিলেন, "ভাই আবদুল্লা! আমার ঘরে তুমি তোতা পাখি কিনিতে আসিয়াছিলে, কিনিতে হয় নাই, বিনামূল্যে এই তোতা-পাপী তোমার হইয়াছে;—এ তোতাকে আর তুমি পিঞ্জরে বদ্ধ রাখিও না। পাখীর সঙ্গে তুমিও পাখী হইয়া পিঞ্জরে আছ, আর না; খোলা বাতাসে উড়াইয়া লইয়া চল।"

পরামর্শ স্থির। দুটি পাখি উড়িয়া যাইবে। সঙ্গে থাকিবে মোহিনী। এই শুভ সম্মিলনের গোড়া হইতেছে মোহিনী, অতএব মোহিনী সঙ্গে না থাকিলে চলিবে না। ঘটকালি করিয়া মোহিনী একটী পুরস্কার পাইয়াছিল, সাতখান মূল্যবান পাথর বসান স্বর্ণাঙ্গুরীয়। এখনকার পুরস্কার একসঙ্গে পলায়ন। পঞ্জিকার আশ্রয় লইতে হইল না, একদিন গভীর নিশাকালে তিনজনে গোপনে গৃহ ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় পলাইয়া আসিলেন, বাটী হইতে বাহির হইয়া করতালি দিয়া নাচিয়া মোহিনী বলিল, ঠিক ঠিক ঠিক! জোড়া পাখি উড়িল!

শ্রীভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

কবিকেশরী।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের এক পরিচ্ছদ।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

শান্তিনিকেতন আশ্রমে এই পরম পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথের উপনয়ন সংস্কার মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছিল।

এই উৎসবোপলক্ষে কবিকেশরী রবীন্দ্রনাথ পঞ্জাবের আর্য্য সমাজকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ৺দয়ানন্দ সরস্বতী এই সমাজের প্রতিষ্ঠাতা। আর্য্য সমাজের সহিত আদি ব্রাহ্ম সমাজের মতের কিছু কিছু পার্থক্য থাকিলেও উভয় সমাজের উদ্দেশ্য একই। জড়ের অতীত, মূর্ত্তিহীন, ঈশ্বরের উপাসনা প্রচার জন্য উভয় সমাজ দৃঢ়ব্রত। দেশের কুসংস্কার দূর করা এবং সুবিচারে ধর্ম্ম পালন করা উভয় সমাজের লক্ষ্য। আর্য্য সমাজের ও আদি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যপ্রণালী বহুদিন হইতে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন হইয়া চলিয়া আসিতেছে। আর্য্য সমাজের কয়েক জন তীক্ষ্ণবুদ্ধি সভ্যকে মহর্ষিদেবের নিকট ব্রহ্মতত্ত্বপ্রতিপাদক বহু শাস্ত্রালোচনা করিতে দেখিয়া গুণগ্রাহী রবীন্দ্রনাথ তাহাদিগের সাধুবাদ করিয়াছিলেন। এই ক্ষেত্রে পুত্রের উপনয়ন সংস্কার উপলক্ষে তিনি আর্য্য সমাজকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া উপস্থিত সভ্যদিগের যথোপযুক্ত সম্বর্দ্ধনা করিলেন।

আর্য্যসমাজের সম্প্রদায়ভুক্ত বৈদিক শাস্ত্রবিচারনিপুণ পাশ্চাত্য ব্রাহ্মণগণ এই উপলক্ষে মহর্ষিদেবের সংস্কৃত অপৌত্তলিক ক্রিয়াপদ্ধতিরও যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন। উভয় সমাজের বিধি ব্যবস্থা লইয়া অনেক আলোচনার পর কয়েকটী বিষয়ের মীমাংসা হইয়াছিল। আজি যে আর্য্য-সমাজ ও আদি ব্রাহ্ম-সমাজ একযোগে অপৌত্তলিক সনাতন ব্রহ্মোপাসনার পুনঃ প্রতিষ্ঠার্থ কার্য্য করা মনঃস্থ করিয়াছেন, শ্রীমান্ রথীন্দ্রনাথের উপনয়ন উৎসবে তাহার সূত্রপাত হইয়াছিল। যদি কালে কখন এই দুই সমাজের সংযোগ হয়, তবে শ্রীমান্ রথীন্দ্রনাথের উপনয়ন এবং কবিকেশরী রবীন্দ্রনাথের হাতের গড়া সুকবি ৺বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পাণ্ডিত্য চিরদিন স্মরণ করাইয়া দিবে।

কবিকেশরী এইরূপে পুত্র রথীন্দ্রনাথের উপনয়ন সংস্কার কার্য্য-সম্পাদন

করিয়া বোলপুরে শান্তিনিকেতন আশ্রমে নির্জ্জন প্রকৃতির নীরব সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করতঃ আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন।

বোলপুরের যে প্রান্তরে শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠিত, তাহা কঙ্কর-ময় স্থান—কতকটা পাহাড় সদৃশ। শান্তিনিকেতন হইতে চারিদিকের ভূমি ক্রমশঃ ঢালু হইয়া গিয়াছে। আবার কতক দূরের ভূমি উচ্চীকৃত এবং পুনশ্চ অবনত হইয়া সেই স্থান বৃহৎ ভৌমিক তরঙ্গবৎ দৃশ্যমান হয়। সেই কঙ্করময় প্রান্তরের মধ্যস্থলে শান্তিনিকেতনের সুদৃশ্য ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত। কঠিন ভূমি বলিয়া তথায় শীত গ্রীষ্মের পূর্ণ অধিকার। শীতকালে যেমনই কল্পনকারী শীত, গ্রীষ্মকালে আবার তেমনই প্রচণ্ড গ্রীষ্ম। শীতকালে শীতের কন্‌কনানিতে গাত্রাচ্ছাদক শীতবস্ত্র হইতে হস্ত বহিষ্কৃত করা দুরূহ ব্যাপার। কলসীতে বা অন্য পাত্রে জল তুলিয়া রাখিলে প্রাতঃকালে তাহা বরফ তুল্য শীতল হইয়া থাকে—শরীরের যেখানে লাগে, ক্ষণকালের জন্য সে স্থান অসাড় হইয়া যায়—এমনই শীত। গ্রীষ্ম-কালেও তেমনই প্রচণ্ড রৌদ্র। সূর্য্যদেব আকাশের এক চতুর্থাংশে না আসিতে আসিতে প্রান্তর ভয়ানক উত্তপ্ত হইয়া উঠে। প্রাঙ্গণে পদক্ষেপ করিবার যো থাকে না। পাদুকাও ২।৫ মিনিট পরে গরম হইয়া যায়। প্রখর রৌদ্রোদ্ভাসিত প্রশস্ত প্রান্তর ধূ ধূ করিতে থাকে। মধ্যে মধ্যে উত্তপ্ত বায়ুর ঝল্‌কা আসিয়া মুখে চোখে লাগিয়া যেন দগ্ধ করিয়া তোলে। বেলা নয় ঘটিকা হইতে না হইতে গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়; নতুবা সূর্য্যের উত্তাপে তিষ্ঠিবার যো থাকে না। শীত গ্রীষ্মের এমনই বিপর্য্যয়। কিন্তু কবিকেশরীর কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই। এই উৎকট প্রাকৃতিক দৃশ্য হইতে রসগ্রহণ করা প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথের স্বাভাবিক ধর্ম্ম! রবীন্দ্র নাম এখানে সার্থক!

কেবল বোলপুরের প্রান্তরের কথা বলি কেন? কাব্যসুধাবাদী রবীন্দ্র নাথ নানা স্থানে ঐ প্রকার প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যেই অবস্থিতি করিতে ভালবাসেন। বঙ্গের সমতল বহু বিস্তৃত বন উপবনে গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডদেব মস্তকোপরি আসিয়া স্বীয় প্রভাব দ্বারা যখন প্রাণিগণকে আকুলিত করেন,—যখন প্রখর রবিকিরণে উত্তপ্ত হইয়া আহার ত্যাগ করত পশুগণ বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া চক্ষু মুদিত করিয়া রোমন্থন করিতে থাকে, পক্ষিগণ যখন বৃক্ষের শাখা প্রশাখায় উপবেশন করিয়া

কাকলী দ্বারা মাধ্যন্দিন গ্রীষ্মাতিশয্যের দারুণ সন্তাপ প্রকাশ করে—বঙ্গের ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ যখন দ্বিতলগৃহে দুগ্ধফেননিভ সজ্জিত সোফায় শয়ন করিয়া কেওড়া জলসিক্ত খস্‌খসিতে গৃহদ্বার আচ্ছন্ন করিয়া প্রলম্বিত টানা পাখা দ্বারা সমীরণ পরিচালিত করিয়া—নিদাঘতাপ কতক প্রশমিত করেন—তখন সর্ব্বসুখী রবীন্দ্রনাথ সুখশয্যা ত্যাগ পূর্ব্বক ছায়াতপবিশিষ্ট সেই প্রান্তরে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করতঃ তৃপ্তি লাভ করেন। আবার, নিদাঘ দিনান্তে দক্ষিণ পবন দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া খরস্রোতা পদ্মানদী যখন ভীষণ আকার ধারণ করে,—যখন পদ্মার সুতুঙ্গ তরঙ্গ রঙ্গ দেখিয়া সকলে সন্ত্রাসিত হয়—যখন কল্লোলিনী পদ্মা বৃহৎ বৃহৎ বাষ্পীয়পোত ও বৃহদাকার তরণী সকলকে গলাধঃকরণ করিবার আশয়ে বিকট মুখব্যাদান করে—যখন ছোট ছোট নৌকাস্থিত মাল্লাগণ পদ্মার ভীষণ ভঙ্গিমা দেখিয়া প্রাণ ভয়ে "দরিয়ার পাঁচপীর, আল্লা ও আকবর" স্মরণ পূর্ব্বক আর্ত্তনাদ করিতে থাকে—তখন রবীন্দ্রনাথ ভাবি বিপদ সম্মুখে দেখিয়াও "বোট ছোড়" বলিয়া আপনার ফুলচাঁদ বোটে আরোহণ করেন। সেই সর্ব্বগ্রাসিনী খরস্রোতা পদ্মার বক্ষে উত্তাল তরঙ্গে বোট ভাসিয়া যাইতে থাকে। বোট-খানি তরঙ্গে নাচিতে নাচিতে কখন দশহস্ত ঊর্দ্ধোত্থিত হয়, আবার কখন বিশ হস্ত নীচে পড়ে। এইরূপে কখন ডুবিয়া কখন উঠিয়া পদ্মার হিল্লোল সহ বোটখানি ভাসিয়া যায়। তখন রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে যে আনন্দ হিল্লোল উঠে, তাহার ভাব অপরে কি বুঝিবে? রবীন্দ্রনাথ সেই তরঙ্গায়িত পদ্মা-বক্ষে উচ্চাবচ গতিতে পরিচালিত বোটের ছাদে বসিয়া প্রকৃতির উৎকট দৃশ্যে এক অদ্ভুত সুধাস্বাদ করেন।

পদ্মার স্মরণে তাহার বর্ষাকালের পূর্ণ বলবিক্রমের কথা মনে পড়ে। তাহা হৃদয়কে কম্পিত না করিয়া ছাড়ে না। বর্ষাকালে পদ্মা স্ফীত হইয়া যখন দুই কুল প্লাবিত করে, তাহার স্রোতোবেগ যখন অষ্টগুণ বৃদ্ধি পাইয়া তীরগতিতে প্রবাহিত হয়, তখন কত গ্রাম, কত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নগর, কত বাজার, কত ঘরবাড়ী, কত বন জঙ্গল, কত গো মহিষ প্রভৃতি ইতর জন্তু পদ্মার নির্ম্মমবক্ষে ডুবিয়া ভাসিয়া দূর-দূরান্তরে চলিয়া যায়। কত রাজ্যপাট, কত বিষয় বৈভব মুখে করিয়া লইয়া পদ্মা কাহাকেও পথের কাঙ্গাল করে, আবার সেই সকল রাজ্য ও ধনসম্পত্তি পথের কাঙ্গালকে দিয়া হয় তো তাহাকে রাজ্যেশ্বর করিয়া তুলে। বর্ষায় পদ্মার দিকে চাহিয়া

দেখিবে—কেবল শ্বেতাম্বুরাশি ধূ ধূ করিতেছে। তাহার কুল নাই, কিনারা নাই। পদ্মা বিপুল বক্ষ বিস্তার করিয়া গম্ভীররবে আপন মনে বহিয়া যায়। পদ্মা কাহার দশা কি করিল, তাহা ফিরিয়াও দেখে না। যে ব্যক্তি তাহার ভীষণবক্ষে আশ্রয় লইয়া নিতান্ত কর্ম্মের বশে কোন দূরতর স্থানে যাইতে থাকে, সেও সন্ত্রস্তচিত্তে কেবল লক্ষ্য স্থানের দিকে চাহিয়া থাকে। অপরদিকে চাহিবার তাহার অবকাশ থাকে না।

ঈদৃশক্ষেত্রে কবিকেশরী প্রকৃতির শোভা দেখিতে জানেন ও পারেন। তাঁহার কোন উদ্বেগ নাই; তিনি কবির ভোগ্য তত্ত্বরস গ্রহণে সম্যক্ উৎসুক থাকেন।

জ্যোস্নাবিধৌত রজনীতে পদ্মার সৌন্দর্য্য আর এক প্রকার। পদ্মার সকলই অসাধারণ। রবীন্দ্রনাথ জ্যোৎস্নাময় রজনী দেখিলে পদ্মার এহেন বিচিত্রলীলা রঙ্গসময়েও ক্ষুদ্র ডিঙ্গিতে আরোহণ করিয়া উদ্বেগশূন্যহৃদয়ে চন্দ্রালোকবিভাসিত জলরাশির সহিত রজনীর মনোমুগ্ধকর ক্রীড়া সন্দর্শন করিয়া ভাবসাগরে নিমগ্ন হন।

শীতকালে আর এক বৈচিত্র। শীতের প্রাদুর্ভাবে যখন সকলে হি হি করিতে থাকে, যখন শীতের কন্‌কনানিতে হস্তের অঙ্গুলীগুলিকে সোজা করা যায় না, বৃদ্ধগণ শীতে যখন কুব্জপ্রায় হইয়া যায়, অথবা প্রবহমান শীতবায়ু যখন তাহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি ধরিয়া দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করে—ধনীযুবকগণ যখন নিত্য নূতন শীতাবরণ দ্বারা বাহার দিবার প্রশস্ত সময় পান, তখন কবি রবীন্দ্রনাথ দিবাবশানে এক অলষ্টার কোট মাত্র গাত্রে দিয়া, কটকী বা মোগলাই চটী পরিধান করিয়া ক্ষীণকায়া গোড়ই-নদী-সৈকতে ভ্রমণ করেন। বালকদিগের ন্যায় প্রকৃতি-নন্দনের শীতবাত গ্রাহ্য হয় না। ঋতু-অনুযায়ী সকল সুখোপকরণ সম্পূর্ণ থাকিলেও তত্তাবৎ ত্যাগপূর্ব্বক শীতের কম্পনের মধ্যে বাতাসে সুখ অনুভব করা কেবল ঈদৃশ কবি হৃদয়েরই কার্য্য।

সৌন্দর্য্য রসমগ্ন এই কবির অর্দ্ধোক্তি স্মরণ করিয়াই বুঝি অক্ষয়বাবু লিখিয়াছেন—

সরল হৃদয় কবি
যেখানে মাধুরী ছবি
সেখানে আকুল।

জ্যোস্নাতলে নদীকূলে
উষালোকে তরুমূলে
কত বকে ভুল।
প্রজাপতি মৃগ আঁখি
ফুলে অলি ডালে পাখী
গাছে গাছে ফুল।
দোলে লতা কাঁপে পাতা
চকাচকি ঠোঁটে গাঁথা
দেখিলে ব্যাকুল।
রমণি! তোমারে চেয়ে
ভেবোনা কি গেল গেয়ে
কি বকিল ভুল।
সরল হৃদয় কবি
যেখানে মাধুরী ছবি
সেখানে আকুল।

বোলপুরের বৈশাখী প্রচণ্ড রৌদ্রের বিষয় বলিতে আরম্ভ করিয়া প্রসঙ্গাধীন অনেক কথা বলিয়া ফেলিলাম।

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে থাকিয়া নিশ্চিন্তমনে তথাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সন্দর্শনকরতঃ পরমানন্দ উপভোগ করিতেছিলেন। এমন সময়ে তথায় সংবাদ পঁহুছিল, কলিকাতায় প্লেগ আসিয়াছে। কলিকাতায় প্লেগের শুভাগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া কবিকেশরীর প্রেমার্দ্রচিত্ত বিচলিত হইয়া পড়িল।

প্লেগ রাক্ষসী ১৩০৩ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া বোম্বাই সহরকে ধ্বংস করিয়াছে। সহৃদয় ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট প্লেগদমন মানসে বিকট আইন প্রচার করিলে বোম্বাই সহরবাসীগণ আরও ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল,—কঠোর-রাজশাসনে কাহারো মানসম্ভ্রম ছিল না, পুরস্ত্রীদিগের লাঞ্ছনার সীমা পরিসীমা ছিল না। বোম্বাই সহরের অধিকাংশ ব্যক্তি সহরকে শ্মশান-ক্ষেত্রবৎ ভাবিয়া মান-ইজ্জতের ভয়ে দেশ-দেশান্তরে পলায়ন করিয়াছিল। বোম্বাই সহরের সেই সকল কঠোর চিত্র বঙ্গদেশবাসীকে বড়ই সন্ত্রাসিত করিয়া রাখিয়াছিল। যখন প্লেগরাক্ষসী বোম্বাই সহরকে গ্রাস করিতে সমুদ্যত হইয়াছে—তখন তাহার বঙ্গদেশে আসিতে কতক্ষণ? কলি-

কাতাবাসীগণ তজ্জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতচিত্তে বাস করিতেছিল। যূপকাষ্ঠ সন্নিহিত অজ ছিন্নমস্তা অজকে দেখিয়া সভয়ে বাত্যান্দোলিত কদলীপত্র যেরূপ কম্পিত হইতে থাকে,—কলিকাতা সহরবাসীগণ বোম্বাই সহর-বাসীদিগের অভাবনীয় লাঞ্ছনা সন্দর্শন করিয়া তেমনি কম্পিত হইতেছিল। বৈশাখ মাসের প্রথমে যখন প্লেগের শুভাগমনবার্ত্তা সহরে প্রচারিত হইল, যখন 'করেন-টাইন ল' পাশ হইবার কথা সহরের চারিদিকে আলোচিত হইতে লাগিল, তখন যে যে দিকে পারিল, সে সেইদিকে দিগ্বিদিকশূন্য হইয়া পলায়ন করিল! সে লোক-পলায়ন-দৃশ্য আমার চিত্রপটে চিরাঙ্কিত হইয়া রহিয়া গিয়াছে, আজও স্মরণ করিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। এমন ভীষণ ব্যাপার, এমন অদ্ভুত দৃশ্য ইতঃপূর্ব্বে আর কেহ কখন দেখে নাই। তখন কলিকাতা সহরের যে রাস্তার যে দিকে তাকাইয়া দেখি,—নর-নারীর স্রোত বর্ষার নদী স্রোতের ন্যায় অজস্রধারায় অপ্রতিহত বেগে চলিতেছে; ১৫ই, ১৬ই, ১৭ই বৈশাখ সহরে জনস্রোতের বিরাম ছিল না। সহরের গাড়ী পাল্কী ক্রমশঃ দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিল—অবশেষে তাহাও অপ্রাপ্য হইয়া উঠিল। ।৵০ আনা ॥০ আনা স্থলে ৬৲ ৮৲ টাকাতে আর ভাড়াটিয়া গাড়ী পাল্কী পাওয়া গেল না। যখন গাড়ী পাল্কী পাওয়া একেবারে দুর্লভ হইয়া পড়িল, তখন এই দুর্ব্বিপাকে পড়িয়া কত ভদ্রপরিবারের অসূর্য্যম্পশ্যা রমণী কলিকাতা সহরের রাজপথে বহিষ্কৃত হইয়া পদব্রজে চলিয়া গিয়াছে—কে তাহার গণনা করিয়াছে! কত বালক, কত বালিকা কত যুবক, কত যুবতী, কত বৃদ্ধ, কত বর্ষীয়সী, কেহ কক্ষে, কেহ পৃষ্ঠে—অপোগণ্ড শিশুসন্তান লইয়া প্রাণভয়ে নক্ষত্রবেগে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিয়াছে। দৌড়িয়া যাইবার ব্যাপারই বা কি অদ্ভুত দৃশ্য!—দৌড়িয়া যাইতে যাইতে এক একবার পশ্চাদ্দিকে তাকায়—আরবার ঐ বুঝি আসিল, ঐ বুঝি টীকাদার আসিয়া ধরিল! ভাবিয়া কিয়ৎক্ষণ থমকিয়া দাঁড়ায়;—যখন দেখে, কেহ ধরিতে আসিতেছে না—তখন কতদূর অগ্রসর হয়। পঞ্চহস্ত পরিমাণ রাস্তা অগ্রসর হয় তো দশহস্ত রাস্তা পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া আইসে। এইরূপে নরনারীগণ অতিকষ্টে—অতি উদ্বেগে রাজপথ অতিক্রম করিয়া চলিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু।

বাঙ্গলা ভাষার লেখক।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ভূতপূর্ব্ব "আর্য্যদর্শন"-সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ পাঁড়ে মহাশয়কে তাঁহার মানবতত্ত্বের অবশিষ্ট অংশ তাঁহার আর্য্যদর্শনে প্রকাশ করিতে অনুরোধ করেন। সে সময়ে নববাসের কার্য্যে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকায়, অবকাশ অভাবে, পাঁড়ে মহাশয় বেশী লিখিতে পারিতেন না। আর্য্যদর্শনের সহকারী-সম্পাদক পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ের বিশেষ উত্তেজনায় একটু একটু করিয়া তিনি লিখিতেন মাত্র। পাঁড়ে মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত নববাস অধিক দিন ছিল না। সরিকি গোলযোগের জন্য তাহা উঠাইয়া দিতে তিনি বাধ্য হন। তাহাতে তাঁহার প্রভূত অর্থ-ক্ষয় হয়। এই সময়ে মানবতত্ত্বের অব-শিষ্ট অংশ হস্তে লিখিয়া পুস্তকাকারে তিনি প্রকাশ করিলেন ও কিছুদিন পরে একটী প্রেস করিলেন। এই সময়ে "বিজ্ঞানদর্পণ", "সহচরী" ও "জাহ্নবী" নামে তিনখানি কাগজের সম্পাদকতা—একা বীরেশ্বর বাবু করিতে লাগিলেন। মাসিক কাগজে যে বিশেষ আয় হয় না, তাহা অনেকেই জানেন; সুতরাং অতিকষ্টে দিবানিশি পরি-শ্রম করিয়া, কয়েক বৎসরমাত্র, বীরেশ্বর বাবু এই তিনখানি কাগজ চালাইয়াছিলেন।

পরে ধর্ম্মবিজ্ঞান ও অদ্ভুত স্বপ্ন নামক দুইখানি পুস্তক বীরেশ্বর বাবু প্রণয়ন করেন। মানবতত্ত্ব ও ধর্ম্মবিজ্ঞান প্রভৃতি গ্রন্থ মৌলিক উৎকৃষ্ট হইলেও এদেশের এখনও এমন অবস্থা হয় নাই যে, যাহাতে গ্রন্থকারের একটা নির্দ্দিষ্ট আয় হয়। যদিও বীরেশ্বর বাবু একবার এনট্রান্সের পরীক্ষক হইয়াছিলেন এবং অন্যান্য উপায়ে কিছু উপার্জ্জন করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু পূর্ব্ব দেনা চারি পাঁচগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় পৈতৃক দুই আনা অংশের প্রাপ্ত বিষয় রক্ষা করাও কঠিন হইয়া উঠিল। ৭।৮টী পুত্রের লালনপালন ও শিক্ষাদি ব্যয়নির্ব্বাহ করা,—কলিকাতার বাসাখরচ নির্ব্বাহ করা দুর্ঘট হইল দেখিয়া, বীরেশ্বর বাবু স্কুলপাঠ্য পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বে কয়েকখানি স্কুলপাঠ্য পুস্তক লিখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার প্রচলন-চেষ্টা কখন করেন নাই। তিনি দেখিলেন,

স্কুলপাঠ্য প্রায় সমস্ত বাঙ্গলা পুস্তকই ইংরেজীর অনুবাদ ; দেশীয় বিষয়ের শিক্ষার উপযোগী পুস্তক বাঙ্গালায় অতি অল্প। সেইজন্য তিনি আর্য্য-পাঠ, আর্য্যশিক্ষা, নীতিকথামালা প্রভৃতি পুস্তক লিখিয়াছিলেন, এবং ভালো বাঙ্গলা ব্যাকরণের অভাবে, জষ্টিস শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্ররোচনায়, তিনি একখানি ব্যাকরণ প্রণয়ন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে "পাঁড়ে ব্রাদার্স" নাম দিয়া পুত্রগণের জন্য একখানি দোকান করিয়া দিলেন। প্রথমে ঐ দোকানে পুস্তক বিক্রয় হইত, পরে তৎসঙ্গে দেশী বস্ত্র বিক্রয় হইতে আরম্ভ হইল। এক্ষণে কেবলমাত্র বস্ত্রই এই দোকানে বিক্রয় হইয়া থাকে। দেশী বস্ত্র অধিকতর সস্তা করিবার জন্য এখনও পর্য্যন্ত তিনি নানাপ্রকার চেষ্টা করিতেছেন। যাহাতে দেশের লোকে দেশী বস্ত্রের অনুরাগী হয়, তাহার চেষ্টা তিনি বিধিমতে করিয়া থাকেন। ধর্ম্মের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা ভক্তি জন্মাইবার জন্য বীরেশ্বর বাবু তদ্বিরচিত মানবতত্ত্ব, ধর্ম্মবিজ্ঞান প্রভৃতি গ্রন্থে ধর্ম্মের অনেক গূঢ় কথা আলোচনা করিয়াছেন।

যখন মানবতত্ত্ব প্রচারিত হয়, তখন এ দেশ পাশ্চাত্যভাবে পূর্ণ ছিল ; তাই সে সময়ের সমস্ত সংবাদপত্র ও সমস্ত বিজ্ঞব্যক্তি,—পাঁড়ে মহাশয়ের পুস্তকের তর্কযুক্তির ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। হিন্দু-ধর্ম্মকে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও খৃষ্টীয়ধর্ম্মের কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য, বীরেশ্বর বাবু সর্ব্বপ্রথম এই শ্রেণীর গ্রন্থ লিখিবার চেষ্টা করেন। হিন্দুধর্ম্ম যে নিকৃষ্ট নহে,—পরন্তু একমাত্র শ্রেষ্ঠ মানবীয় ধর্ম্ম, তাহা ইনিই প্রথম হইতেই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

লীলাবতী, বিজ্ঞানসার, উপক্রমণিকা, মানবতত্ত্ব, ধর্ম্মবিজ্ঞান, অদ্ভুত-স্বপ্ন বা স্ত্রীপুরুষের দ্বন্দ্ব, ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত, আর্য্যচরিত, আর্য্যপাঠ, আর্য্যশিক্ষা, নীতিকথামালা, কবিতা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ, শিশুবিজ্ঞান, বাঙ্গালা ব্যাকরণ, শিশুশিক্ষা, বাঙ্গালা শিক্ষা প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ প্রভৃতি বহু গ্রন্থ বীরেশ্বর বাবু প্রণয়ন করিয়াছেন। এই সমস্ত পুস্তক অতি উৎকৃষ্ট ও নূতন প্রণালীতে লিখিত। এতদ্ভিন্ন বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শন, জ্ঞানাঙ্কুর প্রভৃতি অনেক পত্রেও বীরেশ্বর বাবু বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। সাবিত্রী লাইব্রেরী প্রভৃতি নানা সভায় অনেক প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতাও তিনি করিয়াছেন। স্বদেশের হিত-

সাধন ও গৌরববৃদ্ধি,—তৎসমস্তেরই উদ্দেশ্য। বীরেশ্বর বাবুর সমস্ত পুস্তক ও সাবিত্রী লাইব্রেরীতে পঠিত এবং সাবিত্রী নামক পুস্তকে প্রকাশিত "হিন্দুর অবনতি" শীর্ষক প্রবন্ধ এবং সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত "আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য" শীর্ষকপ্রবন্ধ সকলেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য।

বীরেশ্বর বাবু একজন চিন্তাশীল পণ্ডিত ব্যক্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহার মৌলিক চিন্তা ও স্বাধীনভাব,—তাঁহার ধর্ম্মবিজ্ঞান ও মানব-তত্ত্বে বিশিষ্টরূপে প্রকটিত। এই গ্রন্থ দুইখানি সাহিত্যের গৌরব। তর্কতত্ত্বেও পাঁড়ে মহাশয় সুপণ্ডিত। তর্কে, সহজে কেহ তাঁহাকে হটাইতে পারে না। (ক্রমশঃ)

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।

ছায়াসতী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ইন্দ্রপ্রিয়া কাতরস্বরে বলিলেন, "হার কি হইবে, অনেক ত আছে, আমি হার চাহিতেছি না; আমি মার পা দুখানি দেখিতে পাইলেই সুখী হই।" রমণীমোহন সাদরে ইন্দ্রপ্রিয়ার চিবুক ধারণ করিয়া বলিলেন, "সুখী হইবে তুমি, তার চিন্তা নাই, আমার ইন্দুমুখি ইন্দ্রপ্রিয়া।" ইন্দ্রপ্রিয়া সলজ্জায় মুখ নম্র করিলেন। কুমার হাসিয়া বলিলেন, "এখনও আমাকে এত লজ্জা! আমি চাহিলেই প্রফুল্ল অরবিন্দ নত হইয়া পড়ে, আমার জীবন-কৌমুদি তুমি জান না যে, আমি তোমায় দেখিতে কত ভাল বাসি।" সন্ধ্যা হইয়াছে, ফরাশ কক্ষে প্রবেশ করিয়া ঝাড়ে দেয়াল-গিরিতে বাতি লাগাইয়া দিয়া প্রস্থান করিল। অতুল গৃহে প্রবেশ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "এই নাও তোমার দোনরি।" কুমার মুক্তার কেশটী হস্তে লইয়া বলিলেন, "এখন তুমি বাহিরে যাও, আমি যাইতেছি।" অতুল ইন্দ্রপ্রিয়ার দিকে পাপ চক্ষে চাহিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। কুমার মুক্তামালা লইয়া ইন্দ্রপ্রিয়ার কণ্ঠে পরাইয়া বলিলেন, "মুক্তার জন্ম সার্থক যে, এমন কণ্ঠে স্থান পাইল।"

ইন্দ্রপ্রিয়া লজ্জিতভাবে কক্ষ হইতে প্রস্থান করিলেন। রমণীমোহন অন্যমনস্কভাবে বাহিরে গমন করিলেন। ইন্দ্রপ্রিয়া সর্ব্বদা স্বামীর নিকট প্রার্থনা করেন, যে মাতার কাছে যাইবেন। রাজকুমারও অতুলকে কোন্নগরে যাইয়া মিলনের উপায় করিতে বলেন। কিন্তু কুটীল অতুলকর মনে মনে নানারূপ কু-মতলব আঁটিতেছে। ইন্দ্রপ্রিয়ার বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বর্ষ, সরলা বালিকা বাল্যসীমা অতিক্রম না করিতে করিতে প্রসূতি সীমায় পদার্পণ করিলেন, ইন্দ্রপ্রিয়া নয় মাস গর্ভবতী। রাজকুমার অতিশয় ভাবিত; কারণ তাঁহার পিতা অতিশয় রাগত হইয়াছেন। বলিয়াছেন, কি নিমিত্ত তুমি সর্ব্বদা অনুপস্থিত থাক? রাজকুমার ক্লিষ্ট অন্তরে খালধারের উদ্যানে উপবিষ্ট; অতুল কর নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিল, "কুমার, ভয়ানক সময় উপস্থিত!" রাজকুমার সত্রাসে বলিলেন, "কি! কি! অতুল বলিল, অদ্য মহারাজের নিকট গিয়াছিলাম, তিনি মহা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "আমি সম্বন্ধ করিয়াছি, খিদিরপুরের রাজা বাহাদুরের কন্যার সহিত রমণী মোহনের বিবাহ দিব, সে মেয়ে বেশ সুন্দরী। পরিণয়ের দিন স্থির করিয়াছি, আগামী মাসের তৃতীয় দিবসে এবং প্রতি রাত্রে তাহাকে বাটীতে উপস্থিত থাকিতে হইবে, যদি সে এ বিবাহে অস্বীকার করে, তবে তাহাকে ত্যজ্য পুত্র করিলাম।" রাজকুমার সকাতরে বলিলেন, "অতুল, কি করে ভাই ইন্দ্রপ্রিয়াকে ছেড়ে থাকিব, সে বিবাহের কথা শুনিলে কি বলিবে, তাহাতে তাহার গর্ভাবস্থা, আমিত ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না, তুমি যদি মহারাজকে আমার এই অবস্থা জানাও।" অতুলের পাপি মনে ঘৃণিত অভিসন্ধি লুক্কাইত রহিয়াছে; কল্পিতভয়ে বলিল, "না ভাই, আমি তাহা পারিব না, তাহা হইলে মহারাজ আর আমাকে তাঁহার বাটীতে প্রবেশ করিতে দিবেন না, তোমারও তাহাতে নিস্তার নাই, আমার বোধ হইতেছে।" কুমার ভগ্নহৃদয়ে বলিলেন, "তবে ইন্দ্রপ্রিয়াকে কিরূপে এই নিষ্ঠুর নৈরাশ বাক্য জানাই, একেত তাহার সপত্নী হইবে, তার উপর আমি প্রতি বিভাবরী তাহার নিকট থাকিতে পারিব না, এক্ষণে উপায়।" অতুল মনে মনে হাসিয়া কৃত্রিম বিমর্ষভাবে বলিল, "তার আর উপায় কি হবে? তাঁহাকে প্রকাশ্যরূপে বল, মহারাজের এই হুকুম, তাহাতে

তুমি কি করিবে। দ্বিতীয়তঃ ইন্দ্রপ্রিয়া যদি তোমার রক্ষিতা মহিলার ন্যায় থাকে, তাহা হইলেও তাহার সৌভাগ্য।" নির্ব্বোধ রাজকুমার ধূর্ত্তের প্রবঞ্চনা জালে জড়িত হইলেন, পাষণ্ড অতুল করের মতেই মত দিলেন। অতুল উৎসাহ যুক্তস্বরে বলিল, "আর ত দিন নাই; আজ হইল পোনেরই পৌষ, দোসরা মাঘে বিবাহ, অতএব এখনই ইন্দ্রপ্রিয়াকে বলিয়া রাখ; নচেৎ সেই সময়ে গোলমাল করা উচিৎ নয়।" নির্দ্দয় রাজকুমার পাপাত্মা বন্ধুর সঙ্গে একত্রিত ভাবে যেন গর্ভিণী হরিণীকে বধ করিতে বিষাক্ত বাণ হস্তে অগ্রসর হইয়া ইন্দ্রপ্রিয়ার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। দুর্ভাগা অবলা গর্ভভারে পীড়িতা, নিশ্চেষ্ট ভাবে পর্য্যঙ্কে শায়িত আছেন। অভাগিনী জানেন না যে, নৈরাশ কাল সর্প ফণা বিস্তার পূর্ব্বক দংশন করিতে আসিতেছে; নিষ্ঠুরগণ কিরূপে এই সুন্দর লাবণ্যজনিত মোহের পুত্তলিকে দুর্ভাগ্য আতপ তাপে নিক্ষেপ করিবে, যে নির্ম্মল কমলানন দর্শন করিলে শত্রুর মনও আর্দ্র হয়, তোমরা আত্মীয় হইয়া কিরূপে দুর্ব্বাক্য শল্যে তাহাকে বিদ্ধ করিবে। ইন্দ্রপ্রিয়া স্বামীর সহিত অতুল করকে আগত দেখিয়া, সলাজে পর্য্যঙ্ক হইতে উঠিয়া ভূমিতলে কারপেটের উপর উপবিষ্টা হইলেন, বন্ধুদ্বয় কৌচে উপবিষ্ট হইলেন। কুমার ধীরে ধীরে বলিলেন, "ইন্দ্রপ্রিয়া! আমি তোমায় একথা জানাতে দুঃখিত হইতেছি, তথাপি না জানালেও নয়, আমার পিতা আগামী মাসের তৃতীয় দিবসে আমার বিবাহ দিবেন এবং তিনি নিজে যে বাটীতে থাকেন, সেই বাটীতে আমাকেও প্রতি রাত্রে উপস্থিত থাকিতে হইবে।" ইন্দ্রপ্রিয়ার সুমোহন বদন শবাকার ধারণ করিল, শুষ্ককণ্ঠে বলিলেন, "সে কি নাথ! আবার বিবাহ কি? ভদ্রলোকে কি স্ত্রী সত্বে আবার বিবাহ করেন? শ্বশুর মহাশয়কে জানাও যে, তুমি যে লুকাইয়া বিবাহ করিয়াছ। তিনি আমার এই অবস্থা শুনিলেই দয়া করিবেন।" কুমার বলিলেন, "আমার এতদূর সাহস হয় না যে, তোমার কথা তাঁহাকে বলিব, আর আমি অন্য বিবাহ করিলেই বা তোমার কি ক্ষতি— তুমি যেরূপ সুখে আছ, সেইরূপই থাকিবে, তোমার সন্তানাদি হইলে তাহাদিগেরও সুখে রাখিবার উপায় করিয়া দিব।" ইন্দ্রপ্রিয়া ক্লেশ প্রপীড়িত স্বরে বলিলেন, "আমি কি তোমার সহধর্ম্মিণী নই? আমার

কফ স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে এবং গর্ভও স্বাভাবিক হইবে। প্রাচীন ঋষিদের পরামর্শ মানিয়া চলিলে সুসন্তান হইবে এবং সেই পুত্রের দ্বারা দেশের মঙ্গল হইবে। ইহা অগ্রাহ্য করিয়া যাঁহারা যথেচ্ছাচার করিবেন, তাঁহাদের ধাত্রী, স্ত্রীরোগ চিকিৎসক এবং কুলাঙ্গার সন্তানের যন্ত্রণায় জর্জ্জরীভূত হইতে হইবে। এখন যাঁহার যাহা ইচ্ছা হয় করিবেন।

যে বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা একবারে উদাসীন, সে বিষয়ে ঋষিরা বহুদর্শনে যে নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা মানিয়া চলাই ভাল। যাঁহারা না জানার দরুণ এই নিময় পালন করেন নাই, তাঁহাদের জন্যই লেখা হইল। এ সম্বন্ধে পরামর্শ লওয়া প্রত্যেক যুবকেরই আবশ্যক।

পিতা হইতে কৌলিক ব্যাধি, দৈহিক আকৃতি, শরীরের হাব ভাব প্রভৃতি সন্তানে আইসে, ইহা সকলেই জানেন। একটি কাফরির ঔরসে এক শ্বেতাঙ্গিনীর গর্ভে মিশ্র বর্ণের পুত্র জন্মায়। পুংবীজের সংস্কারগত প্রভাবেই ইহা হইয়া থাকে। কমলেকামিনী সৃষ্টি গ্রাস করেন এবং বাহির করেন। ইহা এই বীজ এবং পূর্ণ দেহ দেখিলেই বুঝা যায়। বীজে সূক্ষ্মভাবে যে শক্তি নিহিত থাকে, তাহারই প্রভাবে কালে মহাবৃক্ষ বা জীবদেহ উৎপন্ন হয়। এক পুংবীজে যদি যাবতীয় পিতৃভাব নিহিত থাকিতে পারে এবং সময়ে উহা পিতার মত দেহে পরিণত হইতে পারে, তাহা হইলে গীতার "একাংশেনস্থিতো জগৎ" ধারণা করা অসম্ভব নহে। সেই অপূর্ব্ব জীবনীশক্তির ইয়ত্তা করিতে না পারিয়া হিন্দুরা তাহাকেই বৈষ্ণবীশক্তি বলিয়া পূজা করেন।

শ্রীহেমচন্দ্র সেন এম, ডি।
৩৪ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

জীবন সঙ্গীত।

তুচ্ছ হীন অর্থদার্থ মত যেতেছি এ কোথা তলইয়া ?
নীচমতি কোথা নিয়ে যায় জীবনের সামর্থ্য টুটিয়া ?
এই সবে আরম্ভ সংগ্রাম—এই সবে প্রথম সমর ;
আগে হ'তে বিভীষিকা হেরে, প্রাণ কেন পাও ভয় ?

চলিতে দুর্গম বনপথে, পথভ্রম যদি ঘটে যায়,
বিবেকে ধিক্কারি পুনঃ ফিরে চল, কেন অধীরতা হায় !
কেন এ হীনতা ? বাঁধ বুক, সহিষ্ণুতা—মনুষ্যত্ব-বল ;
নিন্দকের নিন্দাবাদ সে ত আবর্জ্জনা, নরকের মল।
মূঢ় মন ! কেন অধীরতা ? মুছে ফেল নয়নের জল ;
তোষামোদ নীচত্ব আত্মার, তোষামোদে প্রেতাত্মা সকল
যাক্ তারা ঐশ্বর্য্যের দেশে, ক'দিন অনিত্য তুচ্ছ ধন ?
কয়দিন বিষয়-মত্ততা, লোক ত সম্মান, উচ্চাসন ?
সূক্ষ্মদর্শী বিধাতার চক্ষু, এড়াবার সাধ্য আছে কার ?
তাঁরি পায় মান অপমান, সুখ-দুঃখ জীবনের ভার
রেখে সাধু পদাঙ্কিত পথে ধীরে ধীরে হও আগুয়ান,
জীবনের আরম্ভ সংগ্রাম এই সবে, কেন ম্রিয়মান ?

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস।

প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলী।

(১)

নিধুবনে বিহরই যুগল কিশোর,
ফাগু অঙ্গে আজু হইয়া বিভোর ;
চুয়া চন্দন ভরি পিচকারি,
শ্যাম নাগর অঙ্গে দেয়ত ডারি ;
ললিত বিশাখা সখিগণ মেলি,
রহে নিয়তে সবে ফাগুলেহ গেলি ;
সব সখি ডারত নাগর অঙ্গে,
নাগর খেলত রসিক সঙ্গে ;
বীণ বাবহার জকাপি না বিবিধ,
যন্ত্র লেহ করয়ে বিলাস,
কোই কোই ডারত নব নব তাল ;
জ্ঞানদাস কর্ণ পবিত্র ভেয়াল।

"চিত্রা ও গৌরী" উপন্যাসের নামটি যেমন শ্রুতিমধুর—অলৌকিক ঘটনা দুইটিও ততোধিক মধুরতায় পূর্ণ; চিত্রা উপন্যাসে বর্ণিত নায়ক "সুরেশচন্দ্র," নায়িকা "চিত্রা",—বর্ত্তমান ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত যুবক সুরেশচন্দ্রের অসৎ সংসর্গে পাপের ভীষণ পরিণাম; আর তাহার পত্নী চিত্রা, প্রকৃত প্রস্তাবেই সতীসাধ্বিসাবিত্রী; জীবন সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় সুরেশচন্দ্রকে উদ্ধার করিয়াই তাহার মৃত্যু;—সে চরিত্র পাঠে পাঠক-পাঠিকা অনেক শিক্ষা লাভ করিবেন সন্দেহ নাই।

"গৌরী" ভাষা, ভাব, বর্ণনা বড়ই উপাদেয়; বাহ্যিক জগতের সহিত আধ্যাত্মিক জগতের সম্বন্ধ; সদ্‌গুরুর উপদেশ, পাপতাপময় সংসারে শান্তিহারা হইলে, ধর্ম্মজীবনে পারমার্থিক লাভ করা যায়; এবং ধর্ম্মজীবনের উন্নতি, বাহ্যিক আড়ম্বরশূন্য মূর্ত্তিতে সূর্য্যদেবের ন্যায় জ্যোতিঃ বিস্তার করিয়া বিমল আনন্দের হেতু হয়।

ত্রেতাযুগে রাবণরাজা স্বীয় মহিষী মন্দোদরীকে কহিয়াছিলেন, "দৈবাধীন্ মিদং ভদ্রেজীবতা কিন্ন দৃশ্যতে" অনেকদিন বাঁচিয়া থাকিলেই অনেক দেখিতে হয়; হারাণবাবুর "গৌরী" উপন্যাসে গৌরীর পিতা দুর্গাদাস সংসারে অনেক দেখিলেন, শেষে "মা বিশ্বপ্রসবিনী জননী, আমায় কোলে লও! লও মা;—আমার মনুষ্য জন্মের সাধ মিটিয়াছে" এই বলিয়া অনন্তধামে গমন করিলেন। আর দেখাইতেছেন,—"জীবের মৃত্যু নাই, মরা বাঁচা তুল্য মূল্য।"

আমাদের বিশ্বাস হারাণবাবুর সরল বিশুদ্ধ ও মনোহর কবিত্বপূর্ণ ভাষায় সুলিখিত সুরুচিসঙ্গত উপন্যাস দুইটি; আমাদের ন্যায় সকলেই একাসনে পাঠ সমাধা করিয়া যারপরনাই মুগ্ধ হইবেন।

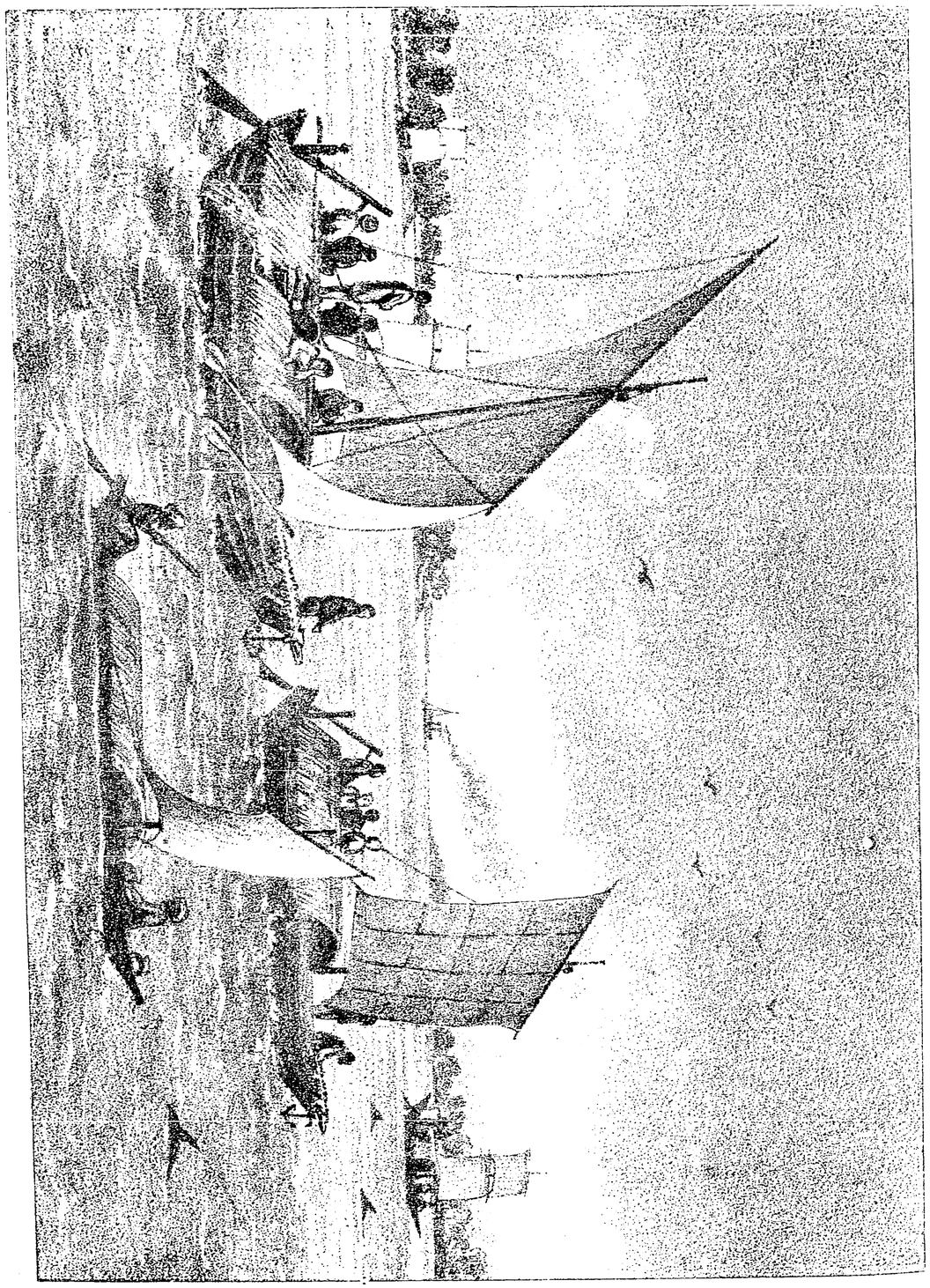

জন্মভূমি।

(সচিত্র মাসিক পত্র।)

নবম বর্ষ। } ১৩০৮ সাল, বৈশাখ। { ১০ম সংখ্যা।

বিক্রয় কাহাকে বলে।

(একটি প্রশ্ন।)

আজিও সকলে গ্রাহ্য করিতেছেন না, একটি মহা বিক্রয় পাপে স্বদেশের দুই তিনটি শ্রেষ্ঠ জাতি ক্রমশঃ অধঃপতিত হইতেছেন। যদিও আজ আমরা সাধারণ গঠিত একটি চর্ব্বিত চর্ব্বণ প্রসঙ্গের পুনরুক্তি করিতেছি, তথাপি এতৎ প্রসঙ্গে আমরা একটি নূতন কথা জানিতে চাহিব।

পুনরুক্তি করিতেছি, আমাদের আধুনিক বৈবাহিক প্রথার কথা। বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে এই সুন্দরী প্রথার কেমন সুন্দর পবিত্রতা ছিল, এখন সেই প্রথা কতদূর কদর্য্য হইয়া পড়িয়াছে, বিবেচনাশক্তিসম্পন্ন আর্য্যসন্তান মাত্রেই বোধ হয় অহরহ দর্শন করিতেছেন, কায়স্থ ব্রাহ্মণের কন্যার বিবাহ আজকাল যেরূপ ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, বড় বড় ধনবানেরা না হউন, গৃহস্থ ঘরের কন্যার পিতারা তদ্দ্বারা অতি শীঘ্রই পথের ভিখারী হইবেন, এইরূপ লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন যে প্রকারে বর কন্যার বিবাহ হয়, তাহাতে কন্যার পিতার নিকট হইতে পণ গ্রহণ পূর্ব্বক বরকে বিক্রয় করাই কি বরের পিতার ব্যবসা হইতেছে না? পূর্ব্বে নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা কন্যা বিক্রয় করিত, এখনও অনেকে করে; সেই দোষে ভদ্র সমাজের ব্রাহ্মণেরা তাহাদের সহিত সামাজিকতা রাখেন না। পূর্ব্বে পূর্ব্বে শাস্ত্রের প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইত। তদ্দেশং পতিতং মন্যে যদ্দেশে শুক্র বিক্রয়েৎ।—ইহার অর্থ এই, যে দেশে শুক্র বিক্রীত হয়, সে দেশটা পতিত বলিয়া গণ্য।

উত্তম।—যাহারা কন্যা বিক্রয় করিত কিংবা করে, তাহারা গরীব

লোক, সেই জন্য তাহারা সমাজে মস্তক উত্তোলন করিতে পারে না; কিন্তু আজকাল ভদ্রবংশীয় বড় বড় ধনপতিগণ স্বচ্ছন্দে পণ গ্রহণ করিয়া বিষয় বৃদ্ধি করিতেছেন, কত শত দরিদ্র বৈবাহিককে এককালে ফতুর করিয়া ফেলিতেছেন, ইহাকে কি শুক্র বিক্রয় পাপ বলে না? তবে বিক্রয় করা কাহাকে বলে?

কন্যা বিক্রয় করিলে শুক্র বিক্রয় করা হয়, পুত্র বিক্রয় করিলে তাহা হয় না, শাস্ত্রে কি ইহার কোন প্রকার বর্জ্জিত বিধি আছে? আমরা জানি, কুত্রাপি নাই। যাঁহারা পুত্র বিক্রয় করিতেছেন, তাঁহারা স্বচ্ছন্দে সমাজে মাথা উচ্চ করিয়া মহাগৌরবে বুক ফুলাইয়া বেড়াইতেছেন। কেন? তাঁহারা কি শুক্র বিক্রয় পাপে পাপী নহেন? অবশ্যই পাপী। তবে কেন তাঁহাদিগকে সমাজ মধ্যে খর্ব্ব করা না হয়?—কে করিবে?—লোক নাই—কেবল ইহাই একমাত্র উত্তর।

সাময়িক পত্রে, সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রে, দৈনিক সংবাদ পত্রে, বক্তা মহাশয়গণের দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতায়, নাট্যশালার রঙ্গমঞ্চে, এবং প্রচলিত যাত্রার উপসংহারে এই ব্যাপারের প্রচুরাধিক প্রচুর আন্দোলন হইতেছে, কেহই কিছু গ্রাহ্য করেন না। স্রোত যেরূপ বেগে চলিতেছে, বর্ত্তমান ঔদাসীন্যে সেই বেগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে, ইহাই সর্ব্বদা মনে হয়। কায়স্থ জাতির বিবাহ ব্যয় লাঘব অভিলাষে, রাজা রাধাকান্তদেব বাহাদূরের নাটমন্দিরে দিনকতক এক সভা বসিয়াছিল; এখন আবার পাথুরীয়া ঘাটার ৺খেলাচন্দ্র ঘোষের বাটীতে মধ্যে মধ্যে ব্যয় নিবারিণী সভা হয়, নয়মাসে ছয়মাসে এক একখণ্ড বিবরণি প্রকাশ পায়—সভায় কেবল বক্তৃতা হইয়া থাকে; কার্য্য কিছুই হয় না। সভাই বা কোথায়! বর্ষাবধি সে সভার নাম গন্ধও শুনা যায় নাই, বাবু রমানাথ ঘোষ এবং বাবু পশুপতিনাথ বসু বৈবাহিকক্ষেত্রে উদাসীন থাকিবার কারণ কি?

সভায়, বক্তৃতায় প্রবন্ধে অথবা অভিনয়ে কিছুই হইবে না। যাঁহাদের সংকল্প নাই, দৃঢ়তা নাই, প্রতিজ্ঞা নাই, মূল কথায় যাঁহাদিগের আদৌ ঐক্য নাই, তাঁহারা সভা করিয়া কি করিবেন!—নাট-মন্দিরের সভার সময় জনকতক মান্যগণ্য কায়স্থ সন্তান অঙ্গীকার পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন;—দলীলে লেখা ছিল, পুত্রের বিবাহে কন্যার পিতার নিকট পণের দাবি করিব না।

লেখা ছিল, কিন্তু স্বাক্ষরকারীদিগের ভিতর কেহ কার্য্যকালে আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন। একটি ভদ্রলোক ঐ দলের একজনের নিকট প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গের হেতু জিজ্ঞাসু হইয়া উত্তর পাইয়াছিলেন, "কি করিব ভাই, গৃহিণীর মত হয় না, অল্প টাকায় পুত্রের বিবাহ দিতে।"

এ প্রকার সাহসী বীর পুরুষ যাঁহারা, সভার অঙ্গীকার পত্রে স্বাক্ষর করিয়া তাঁহারা পরিণামে উপহাসাস্পদ হইবেন, ইহা বিচিত্র নহে। এক-জনের চেষ্টায় অথবা দুই একজনের অঙ্গীকারে সমাজের কার্য্য হয় না;—বিশেষতঃ কায়স্থ ব্রাহ্মণের বৈবাহিক কার্য্যটি নিতান্ত ক্ষুদ্র ব্যাপার নহে; যাঁহাদের মতে সমাজ চলিবে, দুর্ভাগ্য বঙ্গে তাঁহারা কদাচ একত্র মিলিত হইয়া একমতে কার্য্য করিবেন না, বহু দৃষ্টান্তে এ বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা পতিপন্ন হইয়াছে। সমাজে লোক নাই। একথা বলিলে লোকেরা আমাদের উপর তুষ্ট হইবেন না; অতএব আমরা বলিব, সমাজের মস্তক নাই। মস্তকশূন্য সমাজের কেহই সমাজ বলিয়া গণনা করে না। এরূপ অবস্থায় এ সমাজে সমাজপতির দ্বারা একটা কোনরূপ বন্ধন হইবে, এরূপ আশা অল্প; অথচ পুত্র বিক্রয় নিবারিত না হইলে সমাজের মঙ্গল নাই। এইজন্য কেহ কেহ রাজবিধির আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিবার উদ্‌যোগে আছেন। হিন্দু সমাজের কার্য্যে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বি রাজার হস্তক্ষেপ আমাদের বাঞ্ছনীয় ছিলনা, কিন্তু রাজা যখন স্ব ইচ্ছায় মধ্যে মধ্যে আমাদের সামাজিক ব্যবহারে হস্তক্ষেপ করিতেছেন, বর কন্যার একত্র বাসের বয়ঃক্রম বিধিবদ্ধ করিয়া যখন দণ্ডবিধির অধীন করা হইয়াছে, পুত্র বিক্রয় বন্ধ করিবার আইনের প্রার্থনা করা তখন অপরামর্শাসিদ্ধ হইবে না, বর্ত্তমান বৈবাহিক প্রথার কু লক্ষণ দেখিয়া এখন আমাদের এইরূপ ধারণা জন্মিতেছে।

আয়ুর্ব্বেদে দোষত্রয়

রোগের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সেই দোষ তিনটী আমাদিগের শরীরের ধারক ধাতুত্রয়—বাত, পিত্ত, কফ। বায়ু পিত্ত কফ ব্যতীত স্থূল শরীরের—প্রাকৃতিক দেহের অস্তিত্বের সম্ভাবনা কোথায়? রস-রক্তাদি স্থূল ধাতুর সহিত দেহের নিত্য সম্বন্ধ হইলেও, বায়ু পিত্ত কফই তাঁহাদিগের একমাত্র ধারক। রস রক্ত মাংস মেদ অস্থি মজ্জা শুক্র—এই সপ্-

ধাতুরই সমবায়রূপ শরীরে বাত পিত্ত কফের অনুলোম বিলোমে বাহ্যতঃ ও আভ্যন্তরতঃ বিবিধরূপ অবস্থান্তর পরিলক্ষিত হয়; আর এই ধাতু-ত্রয়ই সপ্ত স্থূলধাতুর ধারক বলিয়া, সূক্ষ্ম ধাতুনামে অভিহিত হইয়া থাকে। আর পূর্ব্বোক্ত সপ্ত স্থূলধাতুকে মলিন করিয়া থাকে বলিয়া, ঐ সূক্ষ্ম ধাতু-ত্রয়ের অপর নাম মল; অপিচ ঐ সপ্তস্থূল ধাতুকে আশ্রয় করিয়া, এই সূক্ষ্ম ধাতুত্রয় দেহকে দূষিত করে বলিয়া, ইহাদের আর একটী নাম দোষ। যাহা হউক, এই দোষ মল বা ধাতুর সহিত স্থূল-ধাতু-সপ্তকের যেরূপ সম্বন্ধ ও তাহাতে যেরূপ দোষোৎপত্তি হেতুক বৈলক্ষণ্য পরিলক্ষিত হয়, তাহারই যথারীতি বিন্যাস করিতে অদ্য এই প্রবন্ধের অবতারণা। এক্ষণে বিবেচ্য—

কফ কি ?

কে অর্থাৎ জলে যাহা ফলে, তাহাই কফ; কিংবা কে মস্তকে যাহা ফলে, তাহাই কফ, (ক+ফল [নিষ্পত্ত্যর্থক]+কিপ্) ইহার আর একটী নাম শ্লেষ্মা; যে পদার্থ শ্লেষণ বা আলিঙ্গন করিয়া থাকে, অন্যান্য ধাতুর সহিত তাহার নাম শ্লেষ্মা। চরকে মহর্ষি অগ্নিবেশ বলিয়াছেন,—

গুরুশীতমৃদুস্নিগ্ধমধুরস্থিরপিচ্ছিলাঃ।
শ্লেষ্মাণঃ——।"

শ্লেষ্মা গুরু, শীতল, মৃদু, স্নিগ্ধ মধুর, স্থির ও পিচ্ছিল। আমাদিগের স্থূল ধাতুর মধ্যে যাহারা ইহাদের সমগুণ, তাহাদিগের সহিত শ্লেষ্মার সগুণ সম্বন্ধ। যেমন আমাদিগের দেহস্থ রসধাতু স্নিগ্ধকর বলিয়া, ইহা শ্লেষ্মার সমগুণ বা সগুণ। রসের স্বতঃ গতি নাই বলিয়া স্থির। এইরূপ রসের চরম পরিণতি যে শুক্রে নির্দ্দিষ্ট, তাহাও শ্লৈষ্মিক ধাতু। শ্লেষ্মার সকল গুণই শুক্রের সহিত যে সম্বন্ধ, তাহার অপলাপ করিবার যো নাই।

তাহা হইলেও, শ্লেষ্মার প্রধান অধিষ্ঠান মস্তকে। মস্তকের মস্তিষ্কও শ্লৈষ্মিক ধাতু। শ্লেষ্মক্ষয়ে—শুক্রশোষে গুরু শীতাদিগুণের বিপরীত গুণের আবির্ভাব হওয়ায়, ইহার বিপরীত-ধর্ম্মা বায়ুর প্রকোপ ঘটায়, শ্লেষ্মাধিষ্ঠান মস্তিষ্কের শূন্যতা বোধ ঘটে। আরও তজ্জন্য ঐরূপ মেহাদিহেতুক শুক্র-ক্ষয় ব্যাধিতে শিরঃশূন্যতার আবির্ভাব হয়। আর মস্তিষ্ক-কোষের নিম্নে মেরু-দণ্ডের ঊর্দ্ধ প্রান্তের বন্ধনীই ত স্নায়ুবন্ধনী! সেই শিরঃশূন্যতা এই স্নায়ুবন্ধনীর বিকৃতিতে স্নায়ুদৌর্ব্বল্য (Nervous Debility) হয়। স্নায়ু

বায়ুবাহিনী নাড়ী বলিয়া, শ্লেষ্মক্ষয়ে বাতপ্রকোপজন্য রোগের—শিরঃ শূন্য-তাদির সহিত অপরাপর বাতজরোগের লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়।

পিত্ত কি ?

অপি উপসর্গের উত্তর পালনার্থক দে ধাতুর সহ ক্ত প্রত্যয় যোগে বা ছেদনার্থক দে ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় যোগে পিত্ত নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহাতে অর্থ হইতেছে, প্রকৃতাবস্থায় শরীরের রক্ষা করে যে, কিংবা বিকৃতাবস্থায় নষ্ট করে যে, তাহাই পিত্ত। পিত্তগুণ সম্বন্ধে মহর্ষি অগ্নিবেশ বলিয়াছেন,—

"সস্নেহমুষ্ণতীক্ষ্ণঞ্চ দ্রব্যমম্লসরং কটু।"

পিত্ত আমাদিগের শরীরের উষ্ণভাব। পিত্ত ভিন্ন আর উষ্মা নাই, ইহাই আয়ুর্ব্বেদবক্তা ঋষিদিগের মত। এক্ষণে এই উষ্মার অধিষ্ঠান নির্ণয় করিতে গেলে, বহুস্থান দেখা গেলেও, পিত্তকোষ যকৃৎই যে প্রধান, তাহার নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। আবার সবিশেষ অবধানতার সহিত দেখিলে, এই উষ্মার সহিত রক্তসঞ্চালনের সম্বন্ধ থাকায়, স্থূলতঃ রক্ত পিত্তের সগুণ ধাতু। অপিচ রঞ্জক পিত্তকর্ত্তৃক রাগযুক্ত হয় বলিয়া, রক্ত নামের সার্থক্য। আর তাই পিত্তবিকারে রক্তজন্য বিকারের আবির্ভাব সম্ভবপর। যে পিত্তোল্বনজন্য, দেহস্থ উষ্মার বৃদ্ধি বা জ্বর হয়, তাহারই অতিবৃদ্ধিহেতুক রক্তদূষিত হইয়া, রক্তপিত্তের উদ্ভব হইয়া থাকে। এইজন্য রোগবিনিশ্চয়ের পঞ্চনিদানে কথিত হইয়াছে,—

তদ্‌যথা জ্বরসন্তাপাদ্ রক্তপিত্তমুদীর্য্যতে।

অত্যন্ত জ্বরসন্তাপহেতুক রক্তপিত্তের উদ্ভব হয়। এইরূপ হইবার কারণই হইতেছে, রক্তপিত্তের সগুণত্ব-সম্বন্ধ।

বায়ু কি ?

বহনার্থক বা গমনার্থক বা ধাতুর কর্ত্তৃবাচ্যের পদ হইতেছে বায়ু; যাহা বহন করে বা গমনশীল, তাহাই বাত বা বায়ু নামে অভিহিত। ইহার অপর নাম অনিল। ইহাদ্বারা প্রাণী জীবিত থাকে বলিয়া, (অন [জীবনার্থক] +ইলচ্) অনিল নামের সার্থক্য। শাস্ত্রে আছে, "বায়ুরেব প্রভুঃ।"—বায়ুই একমাত্র কর্ত্তা—ক্রিয়াশীল। চরকে মহর্ষি অগ্নিবেশ বলিয়াছেন,—

"রুক্ষঃ শীতোলঘুঃ সূক্ষ্মশ্চলোঽথ বিশদঃ খরঃ।"

চলত্ব বায়ুর ক্রিয়াশীলত্বের পরিচায়ক। ইহার সক্রিয়ত্বের খ্যাপন করিতে গিয়া, বাগ্‌ভটে কথিত হইয়াছে,—

পিত্তং পঙ্গুঃ কফঃ পঙ্গুঃ পঙ্গবো মল-ধাতবঃ।
বায়ুনা যত্র নীয়ন্তে তত্র বর্ষন্তি মেঘবৎ॥

পিত্ত ও কফ জড়ধর্ম্মা ; কেবল বায়ুই শরীরের মধ্যে ক্রিয়াশীল। এই বায়ুবাহিনী নাড়ী হইতেছে, স্নায়ু ;—স্নায়বো বন্ধনানি স্যুঃ। স্নায়ু সকল শরীরের বন্ধনী। এই বন্ধনের বিষয়ীভূত হইতেছে, রসরক্তাদি ধাতু ও অস্থি। আর যে স্নায়ু স্নায়ু-মূল হইতে মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া প্রবাহিত, তাহা যে অস্থিযোগে সঞ্চালিত, তাহা প্রকৃত তত্ত্বদর্শীদিগের অবশ্যস্বীকার্য্য। তাই বায়ুর সগুণ স্থূলধাতু হইতেছে, অস্থি। আর তজ্জন্যই অস্থিভঙ্গাদি-রোগে বাতবিকার পরিলক্ষিত হয়। অস্থিসংক্রান্ত ব্যাধিতে বাত প্রকোপ লক্ষণ সম্পূর্ণ বর্ত্তমান থাকে।

এইরূপ স্থূলধাতুর সহিত সূক্ষ্মধাতুর সম্বন্ধ অব্যাহতভাবে সুরক্ষিত। আয়ুর্ব্বেদে যে দোষত্রয়ের বিচার লইয়া সকল রোগের নির্ণয়াদির ব্যবস্থা আছে, প্রাচীন ঋষিগণ যে দোষত্রয়ের স্বরূপখ্যাপন করিতে গিয়া, ত্রিশক্তি ত্রিগুণাদির উল্লেখ করিয়াছেন,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর বলিয়া বাত্যাদি ধাতুর আখ্যান্তর নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার সম্পূর্ণ অধিগমন করিতে গেলে, স্থূল জগতের সহিত সূক্ষ্ম জগতের সম্বন্ধবিচারের শক্তি অর্জ্জন করা আবশ্যক ; কিন্তু তাহা লেখনীদ্বারা ব্যক্ত হওয়া অসম্ভব। আমাদিগের কোন আর্য্য গ্রন্থই গুরুমুখ ব্যতীত অববোধের যোগ্য বা স্ববোধের আয়ত্ত বিষয় নহে ;—শাস্ত্রের আভাস গুরুবক্ত্রনিঃসৃত উপদেশে বিকাশ পাইয়া থাকে ; আর সেইরূপ বিকাশই ঋষিগণের অভিপ্রেত ও তাঁহাদিগের বিচারনীতিসঙ্গত। আর তাই ঋষিবাক্যে প্রকাশ,—যিনি এই দোষত্রয়ের বিচার করিয়া, গুরুর নিকট হইতে দৃষ্টকর্ম্মা হইয়া ক্রিয়ার (চিকিৎসার) অভ্যাস করিয়াছেন, তিনিই একজন অভিজ্ঞ ভিষক্‌শব্দবাচ্য। শাস্ত্রে আছে,—

"শ্রুতে পর্য্যবদাতৃত্বং বহুশো দৃষ্টকর্ম্মতা।
দাক্ষ্যং শৌচমিতি জ্ঞেয়ং বৈদ্যে গুণচতুষ্টয়ম্॥"

শ্রুতে—বেদোক্ত বিধানে নির্ম্মলজ্ঞান—বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি, গুরুর নিকট বহুব্যাপারে কর্ম্মদর্শন, দক্ষতা ও শুচিতা বৈদ্যের আবশ্যক। আয়ুর্ব্বেদের সর্ব্বাঙ্গীণ ব্যাপার দোষত্রয় লইয়াই বর্ণিত। দোষত্রয়ের অববোধ ব্যতীত চিকিৎসায় প্রবেশলাভের উপায়ান্তর নাই। এতৎসম্বন্ধে চরকের সূত্রস্থানে ১৯শ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে,—

"যথা শকুনিঃ সর্ব্বাং দিশমপি পরিপতন্ স্বাং ছায়াং নাভিবর্ত্ততে, তথা স্বধাতুবৈষম্যনিমিত্তজাঃ সর্ব্ববিকারাঃ বাতপিত্তকফান্নাতিবর্ত্তন্তে।"

শকুনি যেমন সকল দিক্ পরিভ্রমণ করিয়াও, নিজের ছায়ার অতিক্রম করিতে পারে না, তেমনই সকল ব্যাধি,—দোষকৃত প্রাকৃতিক ব্যাধি বা আগুন্তুজ ব্যাধি,—বাত পিত্ত কফ—এই দোষত্রয়ের অতিক্রম করিতে পারে না। সুতরাং দোষত্রয়ের স্বরূপোপলব্ধি করিয়া, তাহার অংশাংশের বিচার-পূর্ব্বক যথাবিধি ঔষধাদির ব্যবস্থাপন করিতে পারিলে, সদ্‌গুরুর উপদেশে শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়া যথাশাস্ত্র ভেষজ প্রয়োগ করিতে সমর্থ হইলে, রোগ-নিরাকরণ ও আরোগ্যবিধান হওয়া সম্ভবপর। অদ্য আমরা দোষত্রয়ের সহিত স্থূলধাতুর সম্বন্ধগত কথঞ্চিৎ আভাসমাত্র প্রদান করিলাম ; উপসংহারে আমরা ইহার পোষক একটী সুশ্রুত বচনের উদ্ধার করিয়া দেখাইতেছি,—

নর্ত্তে দেহঃ কফাদস্তি ন পিত্তান্ন চ মারুতাৎ।
শোণিতাদপি বা নিত্যং দেহ এতৈস্তু ধার্য্যতে॥

বাত পিত্ত কফ ব্যতীত দেহের অস্তিত্ব নাই। তবে স্থূলধাতু মধ্যে শোণিতেরও অতি খ্যাতিমাত্র বর্ণিত থাকিলেও, পূর্ব্বোক্ত ধাতুই দেহের একমাত্র ধারক। তবে শোণিতও আমাদিগের স্বাস্থ্যাদির অনুকূল বলবর্ণ বিধায়ক। চরকে কথিত আছে ;—

তদ্বিশুদ্ধং হি রুধিরং বলবর্ণসুখায়ুষা।
যুনক্তি প্রাণিনাং প্রাণঃ শোণিতং হ্যনুবর্ত্ততে॥

বিশুদ্ধ রক্ত প্রাণীদিগের বল, বর্ণ, সুখ ও আয়ুর সংযোগ বিধান করে। প্রাণ রক্তের অনুগামী। প্রাণ-ধারণ-সম্বন্ধে রক্তের আবশ্যকতা থাকিলেও, বাত পিত্ত কফ—প্রধানতঃ দেহের যে ধারক, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। সুতরাং দোষত্রয়ের প্রকোপ প্রচয়াদি ভাব বা সাম্য-রূপ জানা চিকিৎসকমাত্রেরই একান্ত প্রয়োজন। এই ধাতুত্রয়ের সহিত তত্ত্বজ্ঞানের প্রকৃষ্ট সম্বন্ধ থাকায়, ইহার অববোধজন্য বিমল তত্ত্বজ্ঞানের একান্ত প্রয়োজন। ঋষিগণের সকল উপদেশই যে তত্ত্বময়। অদ্য আমরা ধাতুত্রয়ের সহিত দেহের সম্বন্ধ বিচার, বায়ুর নেতৃত্ব ও বাতপিত্তের নীতত্ব—এই তিনের যোগে অবস্থার নিরন্তর বিপরিণাম প্রভৃতির অধিগমন করিতে নেতার প্রতি স্বাধিকার প্রসার বা প্রাণায়ামাদির সাধন আবশ্যক। আর তদ্ব্যতীত সম্যক্ সাফল্যলাভ হইতেই পারে না। কবিরাজ শ্রীঅঘোরনাথ শাস্ত্রী।

গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

(ছাইখেগো ক্রোরীয়ান।)

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

তন্ত্রের রহস্য উদ্ভেদ করা সহজ ব্যাপার নহে। পুরাণে কথিত আছে, লঙ্কেশ্বর রাবণ আপন ছিন্ন মস্তক দ্বারা ইষ্টদেবের প্রীতিসাধন করিয়াছিলেন। গোবিন্দের ইষ্টদেব-পূজাও, সেইরূপ কি না, বলা যায় না। এরূপ মৃত্যুর বহুবিধ হেতুকল্পনা করা যাইতে পারে। কোন কারণবশতঃ একজন মুসলমান নববাবের সহিত তাঁহার বিবাদ হইয়াছিল, এরূপ জন-শ্রুতি আছে। সেই নিষ্ঠুর নববাবের ষড়যন্ত্রে গোবিন্দের তাদৃশ মৃত্যু ঘটিতে পারে। অথবা তাঁহাকে যে কার্য্য করিতে হইত, তাহাতে এতদ্দেশীয় তৎকালীন রাজগণের সহিত মনোবাদ হইবার সম্ভাবনা ছিল। কথিত আছে, অধীন রাজগণ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নবাবগণ, রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে গোলযোগ করিলে, সেই রাজগণকে ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নবাবগণকে ধরিয়া আনিয়া তিনি তাঁহাদিগকে বৃক্ষে টাঙ্গাইয়া প্রহার করিতেন। বোধ হয়, অধীন রাজগণ এইরূপে অপমানিত হইয়া ইহার প্রতিশোধ লইবার মানসে বিষম ষড়যন্ত্র করিয়া গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর তাদৃশ মৃত্যু ঘটাইয়াছিলেন। কিম্বা যে গুরুর প্রসাদে তাঁহার তাদৃশী উন্নতি হইয়াছিল, সেই গুরুর বাক্য সার্থক করিবার জন্য আত্মঘাতের প্রবৃত্তি হওয়াও নিতান্ত অসম্ভব নহে। সুজা উদ্দিনের রাজ্যারম্ভের কিছু পূর্ব্বে এই ঘটনা সংঘটিত হয়।

গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী বঙ্গদেশে "মুকুটরায়" বলিয়া খ্যাত; নিম্নে তাঁহার এইরূপ খ্যাতির কারণ প্রকাশ করা যাইতেছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে,—তাঁহার দুইটীমাত্র পুত্র—জ্যেষ্ঠ রূপরাম রায় ও কনিষ্ঠ মুকুটরাম রায়। কনিষ্ঠ মুকুটরাম রায় অধিকতর বিদ্বান্, সদ্‌গুণশালী ও কার্য্যক্ষম হইয়াছিলেন। পিতাও তাঁহাকে সম্যক্ উপযুক্ত দেখিয়া, সকল কার্য্য তাঁহার নামে চালাইতেন। গোবিন্দের অপেক্ষা মুকুটরাম অধিককাল ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। বোধ হয়, রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে মুকুট, রাজগণের সহিত অধিক রূক্ষ ব্যবহার করিতেন। কারণ, খাজনা আদায় সম্বন্ধে নানাপ্রকার পীড়াপীড়ির ঘটনা, পূর্ব্বস্থলীতেই ঘটিয়াছিল, এইরূপ শোনা যায়। কেহ কেহ বলেন, গোবিন্দের পূর্ব্বস্থলীর বাটী তাঁহার পরলোক

সময়েই নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহা যে, কতদূর সত্য, তাহা জানা যায় না। কিন্তু গোবিন্দের পূর্ব্বনিবাসের ও কামরকুলিতে "বারভূমের" কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। তাই আমরা বলিতেছি যে, তিনি পূর্ব্বস্থলীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মুকুট রায়ের কর্ত্তৃত্বে এবং তাঁহার অভিপ্রায়-মতেই পূর্ব্বস্থলীর বসতি-বাটী, দেবায়তন, কাছারী বাড়ী, নহবৎ-খানা, হাওয়াখানা ইত্যাদি "আমিরী" ধরণের বাড়ীঘর নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই আমিরী ধরণের যাবতীয় অট্টালিকা ও গৃহাদি, এক অত্যুচ্চ দুরারোহ প্রাকারে বেষ্টিত ছিল। ইহাকে "চৌদালী" কহিত। দক্ষিণে পাঠানেরা, তোরণ রক্ষা করিত এবং উত্তরে বাগ্‌দী-জাতীয় তীরন্দাজ ও তলোয়ার রাজচোয়াড়েরা, খিড়কী-দ্বার রক্ষা করিত। বাটীর পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে কর্ম্মকার, কায়স্থাদি অন্যান্য জাতির আবাস ছিল। কালক্রমে তাহারাও তত্তৎস্থানের অধিবাসী হইয়াছে। অদ্যাপি পূর্ব্বস্থলীতে ঐ সকল অধিবাসীর অবশেষ বর্ত্তমান আছে। মুকুট রায়ের সময় ক্রিয়াকাণ্ডের কিছু বাহুল্য হইয়াছিল। তিনি অতি সমারোহের সহিত খিড়কীর পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ঐ কার্য্যে মিথিলার অধ্যাপকগণও আগমন করেন। উক্ত খিড়কীর পুকুর, ভাগীরথীর পবিত্র সলিল-গর্ভে নিমজ্জিত রহিয়াছে। পূর্ব্বস্থলীর বর্ত্তমান প্রাচীন ও প্রৌঢ়েরা, ঐ পুকুর দেখিয়াছেন। তাঁহারা উক্ত খিড়কীর পুষ্করিণীকে "পানা-পুকুর" বলিয়া থাকেন। বোধ হয়, উক্ত পুষ্করিণী, বহুদিনের সংস্কারাভাবে তাহাতে পানা ও শৈবালাদি জন্মিয়াছিল। তাই তাঁহারা উহাকে পানা পুকুর বলেন। * ঐ সময়ে অন্য রূপেও অনেক সদ্ব্যয় হইয়াছিল। বাবুগিরি করা, সদ্ব্যয়াদি দ্বারা দেশাবচ্ছিন্ন সুখ্যাতি লাভ করা, বাহ্যাড়ম্বর প্রদর্শন দ্বারা ছোট বড় সকলের কাছে সম্ভ্রম বৃদ্ধি করা—এ গুলি কর্ত্তার ভাগ্যে প্রায় ঘটে না—পৃথিবীতে ইহার ভূরি উদাহরণ বিদ্যমান। কর্ত্তার ভাগ্যে ঘটে না, তাহার বিশেষ কারণ আছে। অর্থোপার্জ্জনের পথ

* পূর্ব্বস্থলী হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে "একডালা" নামক গ্রামে "যমনা" নামক প্রস্তর দ্বারা ঘাট বাঁধান পুষ্করিণী ও এই পুষ্করিণীর নিকটে চারিটী দেবমন্দির, এ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল। গত ১২৯৮ সালের আশ্বিন মাসে গঙ্গার সহ্য না হওয়ায় তাহার পূর্ব্বচিহ্ন ভাঙ্গিয়া লইতেছিলেন। সমুদায় ভাঙ্গিয়া লইয়াছেন কি না, বলিতে পারি না।

আবিষ্কৃত করিতে ও অর্থোপর্জ্জন করিতেই, তাঁহার জীবনের অধিকাংশ ও উৎকৃষ্টাংশ, অতিবাহিত হইয়া যায়; পর-বংশীয়েরাই, ধনভোগের অধিকারী। মুকুটরাম রায় বড়লোকের সন্তান হইয়াই উচ্চ পদে আসীন হইয়াছিলেন। তাঁহাকে গোবিন্দের ন্যায় মেছুনীর গালী খাইয়া, পিতামাতা কর্ত্তৃক ছাই খাইতে দেওয়া ইত্যাদি নানা প্রকারে তিরস্কৃত হইয়া "টাকা রোজগার" করিবার জন্য গৃহ পরিত্যাগ করিতে হয় নাই। তাঁহাকে অযত্ন-রক্ষিত নিরভিভাবক বালকের ন্যায় তালগাছে উঠিয়া বিপদে পড়িতে হয় নাই; তাঁহাকে সন্ন্যাসীর শিষ্য হইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে হয় নাই; তাঁহাকে পরান্নভোজী হইয়া স্বজনশূন্য দূরদেশে থাকিয়া লেখা পড়া শিখিতে হয় নাই। তাঁহাকে হঠাৎ উচ্চ পদলাভের বিষম-সঙ্কট সকল অতিক্রম করিতে হয় নাই। তিনি একবারেই নির্ব্বিঘ্নে বড়লোক হইয়া কার্য্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার অবসর পাইয়াছিলেন। এই জন্যই তাঁহার অধিকতর যশঃ, সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইয়াছিল। এই জন্যই তাঁহার আড়ম্বরানুগামিনী খ্যাতিতে পিতৃ-কৃত কার্য্য, বিলীন হইয়াছিল। এই জন্যই, গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, দেশে মুকুটরাম রায় বলিয়াই খ্যাত হইয়াছিলেন।

"নবদ্বীপ অঞ্চলের কে একজন, প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক সন্ন্যাসীর সঙ্গে বিদেশে গিয়া বড় লোক হইয়া আসিয়াছে" ইত্যাদি সংবাদ, গোবিন্দের বাল্য-বিবরণের সহিত প্রথমে সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়। তাঁহার অধ্যবসায়, আত্মাবলম্বন, সদাশয়তা প্রভৃতি ক্রমে প্রচারিত হওয়ায় "লোকটি কে?" জানিবার জন্য সকলেরই ইচ্ছা হইতে পারে; কিন্তু তৎকালে এ দেশে মহান্ লোকের জীবন-বৃত্তান্ত অনুসন্ধানের প্রকৃত রীতি, প্রচলিত না থাকায়, মুকুটরাম রায়ই, অনুসন্ধিৎসুগণের নেত্রে পতিত হইলেন। যেহেতু, গোবিন্দ, তাঁহার অনেক পূর্ব্বে অনধিক ৪।৫ (চারি পাঁচ) বৎসর মাত্র রাজকার্য্য করিয়া পরলোকগত হইয়াছিলেন। লোকের অনুসন্ধান-কালে মুকুটরাম রায়ই, অধিকতর সমৃদ্ধির সহিত পিতৃপদে অভিষিক্ত ছিলেন। যখন লেখা পড়ার সাধারণের চর্চ্চা অধিক ছিল না, কোন বিষয়ের স্বরূপ-নির্ণয়ে লোকের তত ইচ্ছা ছিল না, বঙ্গদেশের তাদৃশী অবস্থায়, একজন, আর একজন বলিয়া খ্যাত হওয়া, বড় অসম্ভব নহে।

যে সকল গুণ-প্রভাবে মনুষ্য, উন্নতি-সোপানে আরোহণ করে, অধ্যবসায়, আত্মাবলম্বন, সাহস, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা প্রভৃতিই সেই গুণসমূহের শিরোভূষণ।

গোবিন্দের জীবনে প্রথমাবধি ঐ গুণগুলি ছিল বলিয়াই, তিনি তাদৃশ উন্নতি লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি যখন সম্পূর্ণ বালক, পাখীর ছানা পাইলে, যেখানে সেখানে যাইতে পারিতেন, তখনই তাঁহাতে ঐ সকল গুণ স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল। যে বয়সে অন্য বালক, স্বগ্রাম মধ্যে একাকী বেড়াইতে সাহস করে না, সন্ধ্যার পর রুদ্ধ-দ্বার গৃহমধ্যে থাকিয়াও "ভূত-প্রেতের" ভয়ে চমকিয়া উঠে, গোবিন্দ, সেই আট বৎসর বয়সে অর্থোপার্জ্জন করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া গৃহত্যাগ করেন! কোথায় যাইবেন, কি করিবেন, কে তাঁহার সহায় হইবে, তখন এ সকলের স্থিরতা ছিল না। তিনি আপনিই, আপনার অবলম্বন হইয়া গৃহত্যাগ করেন। গৃহত্যাগ করিয়াই, তালীয় তরুশিখরে নাগপাশে বদ্ধ হইয়া অসামান্য প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও অসীম সাহসের পরিচয় দেন। পক্ষিশাবকের প্রত্যাশায় সন্ন্যাসীর সঙ্গে যথা তথা যাইতে সম্মত হওয়ায়, এক দিকে যেমন বালকতা, অন্য দিকে তেমনই সাহসও, প্রকাশ পাইয়াছিল। তাঁহার বাল্য-জীবন পর্য্যালোচনা করিলে, কাহার না অন্তরে উৎসাহ-স্রোতঃ প্রবাহিত হয়? কাহার না দুঃখের দশায় পড়িয়া অর্থোপার্জ্জনের জন্য ঘর ছাড়িতে সাহস হয়? কাহারই বা পরপ্রত্যাশী হইয়া, মনুষ্য-জীবনকে কলঙ্কিত করিতে ঘৃণা হয়? কাহারই বা আলস্যবশে বিবিধ বিড়ম্বনা ভোগ করিতে ইচ্ছা হয়?

যে স্থলে পার্থক্য দ্বারা অনিষ্ট সংঘটন হয়, অথবা ইষ্টোৎপত্তির ব্যাঘাত ঘটে, সেই স্থলে যিনি একীকরণের চেষ্টা করেন, তিনিই মহান্। ইষ্টানিষ্টের লাঘব গৌরব অনুসারেই, মহত্ত্বের তারতম্য হইয়া থাকে। ধর্ম্ম, রাজ্য, জাতি, বর্ণ ইত্যাদির মধ্যগত বিভিন্নতাকে লক্ষ্য করিয়াই লাঘব-গৌরবের কথা উত্থাপিত হইতেছে। ধর্ম্ম, যে সংসারের একটী প্রধান বস্তু এবং উহার পার্থক্যের বিষয় অনর্থ সংঘটিত হইতেছে, এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। এই জন্যই নানক, চৈতন্য, খ্রীষ্ট, মহম্মদ, প্রভৃতি ধর্ম্ম সংস্কারকগণ সর্ব্ব জাতীয় লোককে এক ধর্ম্মে আহ্বান করিয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের ন্যায় ভক্তি ও সম্মান লাভ করিতে আর কে পারিয়াছেন? এই জন্যই প্রসিয়ার রাজমন্ত্রী কাউণ্ট বিস্মার্ক, জর্ম্মনির ক্ষুদ্র রাজ্য সকলকে একীভূত করিয়া তাদৃশ প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন। সেই প্রাধান্যেই আজ সমগ্র য়ুরোপ-খণ্ড, জর্ম্মনির ভয়ে ভীত—এই জন্যই বুদ্ধদেব

শ্রীক্ষেত্রে আনন্দবাজারে সকল জাতিকে একত্র একান্ন ভোজন করাইয়া এত মাহাত্ম্য লাভ করিয়াছেন। এই জন্যই আমরা গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীকে মহান্ ও সদাশয় বলিতে অধিকার লাভ করিয়াছি। এ স্থলে কেহ যেন এমন মনে করিবেন না যে, গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী উপরি-উক্ত মহাত্মগণের সহিত সর্ব্বাংশে তুলনীয় হইলেন। কেবল কার্য্যাগত আংশিক সাদৃশ্য হেতুই এ স্থলে তাঁহার নাম গৃহীত হইল।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তিনি রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র ও বৈদিক এই তিন শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ বর্ণের একীকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার সদাশয়তা ও মাহাত্ম্যের পর্য্যাপ্ত প্রমাণ। সুনীতি শিক্ষা করা এবং উৎকৃষ্ট কার্য্যের "প্রস্তাব" করা, অপেক্ষাকৃত সহজ! আমরা কেবল তাহাতেই নিপুণ। বাল্য-বিবাহ ও বহু বিবাহ রহিত করা, বিধবা বিবাহ দেওয়া, ধর্ম্ম বিষয়ে স্বাধীন চিন্তা করা, ইচ্ছানুরূপ ব্যবসায়ে বুদ্ধি চালনা করা ইত্যাদি বিষয়ে অনেকের দ্বৈধ নাই। অন্যকে এই সকল কার্য্যে উপদেশ দান করিবার জন্য সভা-সমিতি, সমাজ, সংবাদ-পত্র, গ্রন্থ প্রণয়নের ছড়াছড়ি করিয়া থাকেন ও করিতেছেন। কিন্তু স্বয়ং কোন বিষয়ের প্রবর্ত্তক হইতে অনেকেই সাহস হয় না। যিনি সভায় গিয়া তেজস্বিনী বক্তৃতা দ্বারা বাল্য-বিবাহের প্রতিবাদ করিয়া আসেন, হয় তো তিনি আপনার দুই একটী বালিকা কন্যার বিবাহ দিয়া ফেলিয়াছেন, কিম্বা তাহাদিগের বিবাহের সম্বন্ধ দেখিতেছেন। যিনি অপরের বিধবা ভগিনী বা কন্যার পুনরুপযমে সবিশেষ যত্নশীল, তিনি হয় তো প্রাচীনগণের প্রশংসা-প্রত্যাশায় বাড়ীর বিধবাদিগকে, একখানি পাইড়ওয়ালা কাপড় পরিতে দেখিলে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। আমরা যে যে বিষয়ে দুই একটী উদাহরণ প্রদর্শন করিলাম, দেশকাল-পাত্রের অবস্থানুসারে ইহার মধ্যে অনেক তর্ক চলিতে পারে। ফলতঃ, অধুনাতন ব্যক্তিগণের নৈতিক সাহসের অভাব প্রতিপন্ন করাই, আমাদের উদ্দেশ্য। বোধ হয়, গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর জীবন-বৃত্তান্ত পাঠ, আমাদের উক্তবিধ চিত্ত-রোগ প্রতিকারের একটি ঔষধ হইতে পারে। তিনি স্বয়ং সাধু কার্য্যের প্রদর্শক হইয়াছিলেন। তাঁহার তিন পত্নীর গর্ভজাত সন্তানগণ, জীবিত থাকিলে নিশ্চয়ই তাঁহার অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হইত। মুকুটরাম রায়ই, তাহার প্রধান প্রমাণ।

মুকুটের ন্যায় ক্ষমতাশালী তাঁহার রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ভ্রাতারা জীবিত

থাকিলে কি তাঁহাদের বিবাহ হইত না? অবশ্যই হইত। সেই সঙ্গে সঙ্গে এই তিন শ্রেণী মিলিত হইয়া আসিত এবং রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণগণ, বৈদিক শ্রেণীর সংমিশ্রণে কঠোর কন্যাপণ দায় হইতে রক্ষা পাইত।

গোবিন্দের দুই পুত্র, রূপরাম ও মুকুট রাম। রূপরামের চারি পুত্র;—গোপাল রায়, চাঁদ রায়, বেণী রায় এবং কেশব রায়। বেণীরায়ের বংশে সূর্য্যকুমার রায় নামক একটীমাত্র পুরুষ বহুদিন গোয়ারীর সদর আলা বিখ্যাত বারিষ্টারপ্রবর শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষের পিতা রামলোচন ঘোষের পেসকারি কার্য্য করিয়া বৃদ্ধ বয়সে স্ত্রী-পুত্রহীন হইয়া গোবিন্দের পশ্চিম-প্রদেশস্থ নষ্ট সম্পত্তি উদ্ধার করিয়া সম্পত্তির উপস্বত্বে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া ৭।৮ বৎসর হইল, ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, ইনিই গোবিন্দের শেষ বংশধর। কিন্তু এ কথা, বিশ্বাসযোগ্য নহে। কারণ, পূর্ব্বস্থলীতে রায় উপাধিধারিগণের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে, গোবিন্দের বংশধর কে আছেন, তাহা জানিতে পারা যায়।

রূপরামের পুত্রেরা "বর্গীর হাঙ্গামার" সময়ে পূর্ব্বস্থলীর বাটী ত্যাগ করিয়া বাখরগঞ্জে গিয়া বাস করেন। বহুকাল পরে তাঁহার বংশীয়েরা পূর্ব্বস্থলীতে ফিরিয়া আসেন। তখন তত্রত্য গৃহাদি, জঙ্গলাকীর্ণ ও বন্যপশুর আবাস হইয়াছিল। কালক্রমে ঐ সকল অট্টালিকা, গঙ্গার উদরসাৎ হইয়াছে। সূর্য্যকুমার উহার ভগ্নাবশেষ দ্বারা গঙ্গাতীরে যে সামান্য বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেন, ঐ বাটী, গঙ্গাতীরে ভাগীরথীর স্রোতোধৌত ভগ্নাবশেষে অদ্যাপি গোবিন্দের চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে! কিন্তু সেও, যায়—আর থাকে না।

উপসংহার।—যাঁহারা সংসারে উন্নত অবস্থার অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বিদ্যা, ধর্ম্ম ও স্বাবলম্বন শিক্ষা করিয়াছিলেন। পুরাবৃত্তপাঠে অবগত হওয়া যায়, দরিদ্রের গৃহ হইতেই অধিকাংশ মনস্বী ব্যক্তি প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। ইঁহারা সকলেই, স্বাবলম্বন-বলে সুশিক্ষা পাইয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন। আত্মাবলম্বন, বিদ্যা ও ধর্ম্ম শিক্ষা না হইলে, উন্নতি কোথায়?

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

বসন্ত-বাহার।

কে গাও মধুর গীতি গাও আরবার।
কিবা রাগ চমৎকার
স্বরেতে সুধার ধার
ঢালে, প্রাণে বিমোহিত এ স্বরে আমার
গাও পুনঃ অই গীতি বসন্ত বাহার।

(২)

বাসনার পরিতৃপ্তি এ স্বরে আমার
এ রাগ কোথায় ছিল
ধরাতলে কে আনিল
হেন মধুমাখা সুর সৃষ্টি বল কার ?
অনুপম সুধাসার বসন্ত বাহার।

(৩)

জানি বটে ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী
দীপকে আগুণ জ্বলে
মেঘেতে ভাসায় জলে
ভৈরবের হুহুঙ্কারে কম্পিত মেদিনী
আতঙ্কে শঙ্কিত জীব তরাসে পরাণী।

(৪)

মালবের মধুরতা মানবের নয়
সারঙ্গে কুরঙ্গ আনে
কামনা জাগায় প্রাণে
হিন্দোলে দোলায় হিয়া বিষম সংশয়
সংগঠিত চিত্তে বল কোথা সুখোদয়।

(৫)

ললিতের কোমলতা কেবল কথায়
ললিতে লালিত্য কোথা
জাগায় প্রাণের ব্যথা
বিভাষে দুঃখের ভাষ আনিয়ে দেখায়
পাহাড়ী শোকের অশ্রু কেবল বহায়।

(৬)

পুরবি উদাস ভাব এনে দেয় মনে
ধন জন সুত জায়া
কিছু নয় শুধু ছায়া
"দিবা অবসান হোলো" বলে ঘনে ঘনে
এ রাগে বিরাগ বাড়ে সংসার-বন্ধনে।

(৭)

বেহাগে বিষম জ্বালা বিরহ বেদন
প্রতি পলে অশ্রু ধার
"শিথিল কবরী ভার"
অবশ অঙ্গেতে হয় যামিনী যাপন
কেবল সুধায় "সুখে আছত এখন"।

(৮)

সিন্ধু সত্য সুধাসিন্ধু মানি বটে তায়
কিন্তু বড় অভিমান
সঙ্গী প্রায় মধ্যমান
কভু সে গম্ভীর ভাব প্রাণে নাহি চায়
বাগেশ্রীর সিংহনাদে আতঙ্ক বাড়ায়।

(৯)

ভালবাসে রামকেলি কেলিমত্ত জনে
সাহারার মরুপ্রায়
ধুধু শুধু সাহানায়
যুবক যুবতী জাগে ছায়ানট স্বনে
সোহিনী মোহিনী শুধু কামীগণ মনে।

(১০)

শুনি বটে কত মুখে টৌরীর বাখান
যে পঞ্চম পিক স্বরে
অমিয় বর্ষণ করে
সে পঞ্চম টৌরী হতে হয় তিরোধান
পঞ্চম বর্জিত টৌরী বিষের সমান।

(১১)

পিলুর শকতি কোথা অতি ক্ষুদ্র প্রাণ
বারোয়া সহায় করে
সজনীর কলেবরে
যতনে রতন এনে সজ্জা সমাধান
নেপথ্যকারিণী পিলু কোথা তার মান।

(১২)

সুরটে ভীরুতা অতি ভরসা মল্লার
বিরহে আপনা হারা
কেঁদে কেঁদে হয় সারা
"বাঁচি যদি দেখা হবে" বলে বার বার
পরজে গরজ বড় স্বার্থের আধার।

(১৩)

ঝিঝিট খাম্বাজে দেখি কেবল ঝঙ্কার
শূন্য গর্ত্ত অতিশয়
কেবল ঝঙ্কারময়
শূন্যপাত্র চিরদিন শব্দমাত্র সার
ইমন্ বাণীর প্রিয় কি কাজ আমার।

(১৪)

পুরবীর সহোদর ভঁয়রো যোগিয়া
সন্ন্যাসী বন্দির মুখে
থাকে দোঁহে মহাসুখে
পুলকিত নহে তাহে সংসারীর হিয়া
কালাংড়ার সদা বাস লম্পটে চাহিয়া।

(১৫)

সুতান মুলতান বটে "সাধন সমরে"
হৃদিপদ্মে কুণ্ডলিনী
সে তানে প্রবুদ্ধা তিনি
"রসিক" ডাকিত ভয় পাইয়ে অন্তরে
রসিকের সাধা স্বর তোষে কি অপরে।

(১৬)

"সে নামে শিহরে প্রাণ" ভৈরবীর তানে
আলেয়া আলেয়া প্রায়
ধাঁধায় ফেলিয়া যায়
হা শিবানী ব'লে শিব কাঁদেন শ্মশানে
কানেড়া-নিপুণা শুধু প্রিয়ার আহ্বানে।

(১৭)

জয়ন্তী সুরূপা বটে মধুর ভাষিণী
"শ্যামবিলাসিনী" তরে
কেবল ভাবিয়া মরে
"কা হেতু কা হেতু" মুখে দিবস যামিনী
পাঠায় কাননে একা কুলের কামিনী।

(১৮)

ভাবিলে "দেশের" কথা বহে নীরধার
দেশেতে সম্বন্ধহীন
প্রবাসীর চির দিন
সে "দেশ" তুষিবে বল শক্তি কিবা তার
"কাফিতে" বাড়ায় মাত্র চিত্তের বিকার।

(১৯)

মালকোষ মল্লপ্রিয় সমর সজ্জায়
তুরী ভেরী শঙ্খনাদে
মালকোষ সিংহনাদে
বীরের শিরায় রক্ত আনিয়ে জোগায়
চৌতালে হামির চলে ধনীর সভায়।

(২০)

বাহারে বাহার বটে একা কিন্তু নয়
কখন পরজ পাশে
কভু বা বাগেশ্রী বাসে
আড়ানা শোহিনী সনে গোপনে প্রণয়
বসন্তে মিশেছে ব'লে লোকে ভাল কয়।

(২১)

তাই বলি গাও গীতি বসন্ত বাহার
পৃথিবীর কোমলতা
স্বরগের পবিত্রতা
নন্দনের পারিজাত সৌরভ সম্ভার
একাধারে বিরাজিত তুলনা কি তার।

(২২)

কেন প্রাণ ভালবাসে বসন্ত বাহার
বসন্তের ভালবাসা
পুরায় প্রাণের আশা
খুলে দেয় অনুপম সুখের ভাণ্ডার
আনন্দ লহরী তুলে হৃদয় মাঝার।

(২৩)

বসন্ত বাহারে প্রাণ সুধায় মগন,
শীতের তুহিন বাত,
বরষার ধারাপাত,
মনে নাহি পড়ে ঘোর শারদ গর্জ্জন,
সুখের বসন্ত মনে জাগে অনুক্ষণ।

(২৪)

বসন্ত বাহারে সদা উল্লাস অন্তর,
মনে পড়ে কত কথা,
"ললিত লবঙ্গলতা,"
মনে পড়ে বৃন্দাবনে নিকুঞ্জ বাসর,
মনে পড়ে রাধাসনে শ্যাম নটবর।

(২৫)

মনে পড়ে সুখস্পর্শ মলয় পবন,
কদম্বের তরু-মূল,
যমুনার কুল কুল,
মনে পড়ে কোকিলের ললিত কুজন,
মনে পড়ে ফোটা ফুলে অলি বিহরণ।

(২৬)

মনে পড়ে পূর্ণিমার পূর্ণ শশধর,
চকোর চকোরী মেলি,
চাঁদপাশে করে কেলি,
মনে পড়ে কুমুদির সহাস অধর,
জোছনায় ঢল ঢল ফুল্ল কলেবর।

(২৭)

মনে পড়ে বসন্তের বাসর বিলাস,
কুসুমে সজ্জিত কেশ,
কুসুমে রচিত বেশ,
শয়নের চারিভিতে কুসুমের রাশ,
মনে পড়ে সে অধরে কুসুম সুহাস।

(২৮)

মনে পড়ে প্রিয়াসনে কুসুম শয়নে,
কত কথা আলাপন,
সারা নিশি জাগরণ,
মনে পড়ে বিহরণ প্রভাত পবনে,
মনে পড়ে কথা বলা নয়নে নয়নে।

(২৯)

মনে পড়ে কত দিন বকুলের তলে,
যতনে বকুল-মালা,
গাঁথিয়ে সাঁজের বেলা,
পরায়ে দিয়েছি এনে প্রেয়সির গলে,
নীরবে রয়েছি চেয়ে এ সংসার ভুলে।

(৩০)

মনে পড়ে প্রেয়সির সুষুপ্ত আনন,
অলক শোভিত তায়,
ভ্রমরের পাঁতিপ্রায়
নিদ্রাবশে অধরের ঈষৎ কম্পন
নীলাম্বরে নিপতিত চাঁদের কিরণ।

(৩১)

মনে পড়ে প্রিয়ার সে বনদেবী বেশ
লুণ্ঠিত কুন্তল ভার
ফুল্ল ফুল অলঙ্কার
সুনীল নলিন নেত্রে সোহাগ আবেশ
সর্ব্বাঙ্গ বেষ্টিত কিবা দিব্য পরিবেশ।

(৩২)

তাই ভালবাসে প্রাণ বসন্ত-বাহার
বসন্তের ভালবাসা
পূরায় প্রাণের আশা
খুলে দেয় অনুপম সুখের ভাণ্ডার
আনন্দ লহরী তুলে হৃদয় মাঝার।

(৩৩)

তাই বলি কে গাহিছ গাও আরবার
কিবা রাগ চমৎকার
স্বরেতে সুধার ধার
ঢালে, প্রাণ বিমোহিত এ স্বরে আমার
গাও পুনঃ অই গীতি বসন্ত-বাহার।

(৩৪)

গাও পাখী ভালবাসি সুস্বর তোমার
বিনয়ে তোমারে বলি
অন্য স্বর যাও ভুলি
প্রাণ খুলে গাও পাখী বসন্ত-বাহার
প্রাণ মন বিমোহিত হউক আমার।

(৩৫)

গাওরে কোকিল তুমি বসন্ত বাহার
বসন্তের পাখী তুমি
বসন্তের অনুগামী
অন্য স্বরে প্রয়োজন কি আছে তোমার
বসন্ত-বাহারে ঢাল সুধা অনিবার।

(৩৬)

কল্লোলিনী কলরবে সাগর মাঝার
যাইছ সুতান তুলি
এ সুতান যাও ভুলি
বীচি রবে গাও তুমি বসন্ত বাহার
রাখ নদি সোহাগিনী মিনতি আমার।

(৩৭)

পল্লবিত তরু-মাঝে মধুর স্বননে
বসন্ত বাহার তান
তোল হে জগৎ প্রাণ
সে স্বরে ফুটিবে ফুল শুষ্ক উপবনে
শোন বন্ধু রাখ কথা নিবেদি চরণে।

(৩৮)

গাও সব গ্রহগণ মিলি একতানে
বসন্ত বাহার গান
ভুলাও মানব-প্রাণ
ত্রিদিববাসীরে তোষ সে সুধা প্রদানে
তুষিবে ত্রিদিববাসী সে অমিয় পানে।

(৩৯)

গাও বীণা গাও তুমি বসন্ত বাহার
গাও তুমি সপ্তস্বরা
তব কণ্ঠে মধুভরা
শুনিবে ঝঙ্কার তব হৃদয়-মাঝার
চিরদিন বিরজিবে বসন্ত আমার।

শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়।

দোপাটী।

(১)

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।"

তৃপ্তি হয় না! এ তো আর নূতন কথা নয়! শ্যাম-সুন্দরের রূপই দেখ—আর মুকুর-প্রতিফলিত নিজের রূপের বিকাশই দেখ';—দেখার মত দেখিতে হইলে, দেখার সাধ কখনই মিটে না।

সাধ মিটে না বলিয়াই তো যত সর্ব্বনাশ হয়! সাধ মিটে না বলিয়াই তো যত সুখের সঞ্চার হয়! সাধ মিটিলেই তো সব শেষ হইল!—সুখেরও শেষ, দুঃখেরও শেষ। কিন্তু সুখ-দুঃখ লইয়া সংসার; সুখ-দুঃখের শেষ হইলে, সংসারেরও শেষ হয়। তাই কভু—

"নয়ন না তিরপিত ভেল।"

(২)

সুরূপা সুন্দরী। নামেও সুরূপা, গুণেও সুরূপা, দেহেও সুরূপা। বাহিরের অন্য দশজনের দৃষ্টিতে সে সুরূপা বলিয়া পরিগণিত হইত কি না, তাহার অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন নাই। তবে স্বামী কান্তিচন্দ্র, সত্য সত্যই সুরূপাকে সুরূপা দেখিতেন, তাহা নহে; তাহার গুণে মুগ্ধ হইয়া, তাহাকে অতি সুন্দর দেখিতেন।

কান্তিচন্দ্র মালদহে চাকরি করিতেন। সেকালে, কালেক্টারীর সেরেজদারকে কালেক্টারীর দাওয়ান বলিত। কান্তিচন্দ্র, সেই দাওয়ানের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অল্পবয়সেই উচ্চপদ পাইয়া, কান্তিচন্দ্রের মাথা খারাপ হয় নাই; তবে কান্তিচন্দ্র অবস্থার-অতীত দাতা ছিলেন। নিজের বাসাবাটিতে প্রত্যহ দুই বেলা ৫০।৬০ জন লোকের আহারের যোগাড় হইত। কান্তিচন্দ্র যাহা রোজগার করিতেন, তাহাই ব্যয় করিতেন। সঞ্চয় করিবার তাঁহার কোনও প্রয়োজনই ছিল না। কারণ, তিনি অপুত্রক। বৃদ্ধ পিতা-মাতা, বহুকাল পূর্ব্বেই স্বর্গ-গমন করিয়াছেন। কান্তিচন্দ্রের সংসারে আপনার বলিবার আর কেহ নাই। আছেন, কেবল এক বৃদ্ধা মাতৃস্বসা; তিনিই কান্তিচন্দ্রের সংসারের গৃহিণী।

এই সংসারে, কান্তিচন্দ্রের আর একজন আত্মীয় ছিলেন। তিনি মালদহ জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার প্রসিদ্ধ র‍্যাভেন্‌সা সাহেব। কোমলে ও কঠোরে এমন সংযোগ, মধুরে-রৌদ্রের এমন সম্মিলন, আর কোনও 'সিভিলিয়ানে' দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহা কিছু ছিল, তাহা র‍্যাভেন্‌সা সাহেবেরই ছিল। তাঁহার প্রভাবে, গৌড়ের গহন বনের বেদিয়া-সাঁওতাল প্রভৃতি অসভ্য জাতিগণ, সংযত ও শান্ত হইয়া ছিল। তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া, এই সকল দুর্দ্ধর্ষ বর্ব্বর, স্বেচ্ছায় ইংরাজের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। এই র‍্যাভেন্‌সা সাহেব, কান্তিচন্দ্রকে বড় ভালবাসিতেন। তাঁহার ভালবাসার গুণেই, কান্তিচন্দ্র মালদহ-জেলার দাওয়ান।

(৩)

মাঘী পূর্ণিমা,—পুণ্যাহ। হিন্দুমাত্রেই গঙ্গাস্নান করিবার জন্য উদ্যোগী। পশ্চিমে বাতাস ফুর্‌ফুর্ করিয়া একটু বহিতেছে। বাতাসের উপর শীত;—ছোট ছেলেটির মত ঘোড়-সওয়ার হইয়া, সূর্য্য-রশ্মির প্রখরতাকে নষ্ট করিতেছে; আর দরিদ্রের ছিন্নকন্থা উল্টাইয়া ফেলিয়া, শীর্ণ ও শুষ্কদেহে যেন সূচীবিদ্ধ করিতেছে। দরিদ্র, শীতের জ্বালায় অস্থির হইয়া কাঁপিতেছে; আর ধনী নানা বস্ত্রাবৃত হইয়া, শীত-প্রফুল্লিত রাগরক্তিম মুখে, যেন দরিদ্রের এই কম্পনকে বিদ্রূপ করিতেছে।

কারাগোলালার মেলা। এইখানে কুশী নদী, গঙ্গায় আসিয়া নিজ অঙ্গ মিলাইয়াছেন। বৎসরে বৎসরে মাঘী পূর্ণিমার দিন এই সঙ্গম স্থলে মহা মেলা হয়। মালদহ, পূর্ণিয়া, ভাগলপুর, রাজমহল প্রভৃতি নানা জেলার, নানা স্থানের লোক এই দিনে আসিয়া, এইখানে গঙ্গাস্নান করিয়া কৃতার্থ হন।

সুরূপা, স্বামিসহ গঙ্গাস্নানে আসিয়াছেন। দাওয়ানজীর এক তাঁবু পড়িয়াছে। তাঁবু সঙ্গমের মুখে চরভূমির উপর স্থাপিত। তাঁবু মধ্যে বৃদ্ধা মাসী, একখানি 'গড়া-কাপড় পরিয়া, শীতে কাঁপিতেছেন;—আর দণ্ডে দণ্ডে গিয়া গঙ্গায় ডুব দিয়া আসিতেছেন। কান্তিচন্দ্র, মাসী-মাকে বারে বারে হাত ধরিয়া গঙ্গায় লইয়া যাইতেছেন; আর তাঁহার স্নানান্তে আবার তাঁহাকে তাঁবুতে আনিয়া বসাইতেছেন।

সুরূপার বয়স আঠার বৎসর। ব্রাহ্মণের কন্যা, সম্ভ্রান্ত-বংশীয়া; আবার দাওয়ানজীর পত্নী। সুরূপার অবরোধে থাকিবারই কথা। কিন্তু আজ পুণ্যদিন; স্থান—পবিত্র তীর্থক্ষেত্র; কাজেই সুরূপার অদ্য আর তেমন

অবরোধ নাই। তিনি একটি দাসী সঙ্গে করিয়া স্বেচ্ছায় গঙ্গাস্নান করিতেছেন, এবং আর্দ্রবস্ত্রে থাকিয়াই অন্নদান অর্থদান করিতেছেন।

(৪)

দাওয়ানজীর তাঁবুর সম্মুখে বড় ভিড়। দীন-দুঃখী কাঙ্গালীর ভারি ভিড় লাগিয়াছে। হঠাৎ ভিড় ঠেলিয়া, একটী বালিকা আসিয়া কান্তিচন্দ্রের হাত ধরিল। বালিকার পরিধানে কিছুই নাই বলিলেও চলে। একটুক্‌রা ছেঁড়া কম্বল, কষ্টে কোমরে জড়াইয়া লজ্জা-নিবারণ করিয়াছে। বালিকার বয়স ষোল বৎসর। বালিকা, কান্তিচন্দ্রের হাত ধরিয়া বলিল,—"বাবুজী, বড় শীত, বড় ক্ষুধা; আমায় কিছু দাও।"

"তুমি কি নেবে? চা'ল, ডা'ল, কাপড় সবই আছে; তোমার যা ইচ্ছে, তাই নেও।"—উদাসভাবে বালিকার প্রতি তাকাইয়া, কান্তিচন্দ্র এই কয়টি কথা বলিলেন।

"চা'ল-ডা'ল নিয়ে কি কর্‌বো? কাপড় চোপড় নিয়ে কি কর্‌বো? আমায় ভাত রেঁদে দেবে কে? কাপড় পর্‌লেই ওরা যে আমার কাপড় কেড়ে নেবে!"

"তুমি কে? তোমার সঙ্গে আর কেউ নেই? তোমার বাপ-মা নেই? তুমি যদি ভাত খেতে চাও, তবে ঐ তাঁবুতে গিয়ে ব'সো"—একটু যেন সাগ্রহে এই কয়টি কথা বলিয়া, কান্তিচন্দ্র বালিকাকে তাঁবু দেখাইয়া দিলেন। একটি দাসী বালিকার হাত ধরিয়া তাঁবুতে লইয়া গেল।

সুরূপা, বালিকাকে পাইয়াই তাহাকে একখানি বস্ত্র পরিতে দিলেন। বালিকা, কাপড় হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সুরূপা তাহা দেখিয়া বলিলেন,—"লজ্জা কি? কাপড় পর।"

"আমি যে কাপড় পরিতে জানি না। আমি কখনও কাপড় পরি নাই।"

সুরূপা।—তবে তুমি কাপড় চাহিতেছিলে কেন?

বালিকা।—যাদের কাছে আমি থাকি, তাদের জন্যই আমি কাপড় ভিক্ষা ক'রে নিয়ে যাই। এই শীতে আমায় একখানা ছেঁড়া কাপড় দিয়েছিল; সেখানও আজ কেড়ে নিয়েছে। আমি সে কাপড়খানি গায়ে দিতাম। আজ এই মেলায় নতুন কাপড় ভিক্ষে করে নিয়ে গেলে, তবে সেই কাপড়খানি পাবো।

সুরূপা।—তোমার তারা কোথায়?

বালিকা।—এই ভিড়ে তাদের হারিয়েছি। তারা আমায় খুঁজে নেবে।

সুরূপা।—তারা তোমার কে? তোমার বাপ-মা নেই?

বালিকা।—তারা বেদে; ভিক্ষা ক'রে, মেয়ে-ছেলের হাত দেখে ঔষুধ-পত্র দেয়, আর গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ায়। আমার ক্ষিদে পেয়েছে, আমায় কিছু খেতে দাও; আর এই কাপড়খানি পরিয়ে দাও।

সুরূপা, সরলা বালিকার কথা শুনিয়া, মুখ ঘুরাইয়া চক্ষের জল মুছিলেন। তাঁবুতে গরম জল ছিল; সেই গরম জলে বালিকার দেহ সুন্দররূপে মার্জ্জিত করিয়া, দিব্য একখানি চুন্‌রী কাপড় তাহাকে পরাইয়া দিলেন। বালিকা কাপড় পরিয়া তাঁবুর এক কোণে বসিয়া রুটি খাইতে লাগিল। আর সুরূপা একদৃষ্টে সেই বালিকাকে দেখিতে লাগিলেন।

বালিকা অপূর্ব্ব-সুন্দরী। মাথায় জটাভার আছে বটে; ফণি-বিনিন্দিত কুঞ্চিত কেশরাশি নাই; কিন্তু জটাভারেই গ্রীবার ও মস্তকের অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে। রং মাজা, শ্যামবর্ণ। কার্ত্তিকের গঙ্গার জলের ন্যায় দেহের আভা। গঠন অতি সুন্দর; ঠিক যেন পাথরে কোঁদা।

সুরূপা দেখিতে লাগিলেন; আর মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"বেদের মেয়ে এমন সুন্দরী হয়! এ নিশ্চয় ভদ্রঘরের মেয়ে; বেদেরা চুরি করিয়া আনিয়াছে।"

এমন সময় বাহিরে একটা গোল হইল। এক প্রৌঢ়া রুক্ষ-কেশা গলিত-দেহা রমণী তাঁবুর ভিতর আসিয়াই কিচিমিচি কি বকিয়া উঠিল। সে ভাষা কেহই বুঝিতে পারিল না। হঠাৎ সুরূপাকে দেখিয়া, সে থমকিয়া দাঁড়াইল। একবার সেই বালিকার দিকে তাকায়, আবার সুরূপার দিকে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি করে।

"রেখো না মা, ওকে রেখো না, ও তোমার সর্ব্বনাশ কর্‌বে।"

"করে কর্‌বে। তোকে এখানে ডাক্‌লে কে?"

"যদি রাখ—তো আমার বেটীর দাম দাও। দশ টাকা দাম।"

সুরূপা, বিরক্তির ভাবে দশটা টাকা মাগীর দিকে ছড়াইয়া ফেলিয়া দিলেন। মাগী ধীরে ধীরে সেই কয়টি টাকা, এক একটি করিয়া গণিয়া তুলিয়া লইল। মাগী যাইবার সময় মুখ ফিরাইয়া সুরূপাকে বলিয়া গেল,—"যখন কেবল কাঁদ্‌বে মা, তখন গৌড়ের জঙ্গলে 'সা'-সাহেবের মস্‌জিদে যেও; আমার সঙ্গে দেখা হ'বে।"

(৫)

বালিকার নাম দোপাটী। বালিকা কিছুই জানে না। যাহা জানিলে, মানুষ—মানুষ হয়, সুখ-দুঃখ বুঝিতে পারে, পাপ পুণ্যের বিচার করিতে পারে, বালিকা তাহার কিছুই জানে না। বালিকার ভয় নাই, লজ্জা নাই, সঙ্কোচ নাই, সন্দেহ নাই। অথচ বালিকার বয়স ষোল বৎসর হইয়াছে।

বালিকার মাথায় আর জটা নাই। জটার স্থানে এখন কুঞ্চিত কেশ-রাশি এলাইয়া আছে। বর্ণের সে পাংশুল ভাব নাই—দিব্য গৌরকান্তি ফুটিয়া বাহির হইতেছে। সুরূপাকে সে দিদি বলিয়া ডাকে; কান্তিচন্দ্রকে কখনও দাদা বলে, কখনও বাবু বলে; সর্ব্বদাই ছুটিয়া ছুটিয়া নাচিয়া বেড়ায়।

কাজের মধ্যে বালিকা পান সাজিতে শিখিয়াছে। সে যতগুলি পান সাজে, সকলগুলিই কান্তিচন্দ্রকে খাওয়ায় বা সুরূপার মুখে গুঁজিয়া দেয়। বালিকার আচার-বিচার-জ্ঞান নাই, উচিত-অনুচিত-বোধ নাই। কান্তিচন্দ্র পান খাইতে না চাহিলে, সে তাঁহার গলা ধরিয়া মুখে পান গুঁজিয়া দিত। তখন কান্তিচন্দ্র কেবল শিহরিতেন। কি জানি, দোপাটীর গায়ে কি লাগান ছিল! কি জানি, দোপাটীর ভাবভঙ্গিতে কেমন মাধুর্য্য ছড়ান ছিল!

(৬)

সুরূপা দোপাটীকে বড় ভালবাসিত, চাকর-বাকর বা অন্য কেহ দোপাটীর অতিচাঞ্চল্য দেখিয়া যদি তিরস্কার করিতে যাইত, তাহা হইলে সুরূপা সকলকেই ভৎর্সনা করিতেন। এমন কি স্বামী কান্তিচন্দ্র যদি কদাচিৎ দোপাটীকে শাসন করিতে উদ্যত হইতেন, তাহা হইলে সুরূপা স্বামীকেও তিরস্কার করিতে ছাড়িতেন না।

এত ভালবাসা, এত টান, এত আদর, এত সোহাগ সত্ত্বেও যখন দোপাটী কান্তিচন্দ্রের গলা জড়াইয়া তাহার মুখে পান গুঁজিয়া দিত, তখন কিন্তু সে দৃশ্য দেখিয়া সুরূপার কেমন কেমন ঠেকিত, একদিন সন্ধ্যার সময় দোপাটী কান্তিচন্দ্রের মুখে একটা বড় পান দিয়া সেই পানের অর্দ্ধেকটা নিজের দাঁত দিয়া কাটিয়া লইল, সুরূপার কেমন-কেমন-ভাব রোষে পরিণত হইল। সুরূপা স্বামীর হাত ধরিয়া তাঁহাকে কক্ষাভ্যন্তরে টানিয়া লইয়া গেলেন এবং একটু যেন ভাবে স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "দেখ, হাজার হউক দোপাটী মেয়েমানুষ--সুন্দরী—ষোড়শী—পূর্ণযুবতী—ও কিছু না জানিলেও বয়সের গুণে ধীরে ধীরে আপান-আপনি অনেক কথা

বুঝিতে পারিবে। তুমি ওকে অমনভাবে ঘাড়ে পিঠে কর, মুখে মুখ দিয়ে পান খাও, পান দাও;—এ সব কিন্তু আমার ভাল লাগে না, তোমার মনে পাপ না থাক্‌লেও লোকত ধর্ম্মত এ সব কাজ মন্দ, তুমি আর ওর সঙ্গে অমন ব্যবহার করো না।" কান্তিচন্দ্র একটু মুচকি হাসিয়া বলিলেন, "রূপ! ভয় কি, আমিও অষ্টপ্রহরই তোমার কাছে থাকি—আর যা কিছু করি, তোমার সম্মুখেই করি, তবে আর ওতে পাপ কি?"

সুরূপা।—আমার সম্মুখে কর বলেই পাপকাজ পুণ্যময় হবে, এমন কিছু লেখা আছে কি? তুমি আর অমন ব্যবহার কর্‌তে পার্‌বে না, অন্তত আমার সমুখে ও সব কিছু কর্‌তে পার্‌বে না।

কান্তিচন্দ্র স্ত্রীর আদেশবাণী শুনিয়া সুরূপার দিকে তাকাইয়া মুসলমানী ধরণে একটা লম্বা সেলাম করিলেন এবং বলিলেন, "জো-হুকুম মহারাজ, গোলাম হুজুরের হুকুম তামিল করিবে।"

(৭)

শিশুকে যাহা করিতে বারণ করা যায়, শিশু তাহা অগ্রে করে। নবাগত শিশু সংসারে তাবৎ বিষয়ই নূতন দেখে—সকল সামগ্রী দেখিয়া তাহার মনে হয়, এমন বুঝি আর দেখি নাই—একবার দেখি, দুইবার দেখি, বারবার দেখি। ইহার উপর যদি তাহাকে কোন কার্য্য করিতে বারণ করা যায়, তাহা হইলে শিশুর অনুসন্ধিৎসা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়া যায়; সে সহস্র বিঘ্নসত্ত্বেও গোপনে সেই কাজ করে, গুপ্তভাবই পাপের মূল।

কান্তিচন্দ্র বিজ্ঞ কর্ম্মচারী হইলেও ভাবজগতে তিনি শিশু। সুরূপ যখন দোপাটীর সহিত অত হুড়াহুড়ি করিতে বারণ করিল, তখন কান্তিচন্দ্রের হৃদয়ের ভস্মাচ্ছাদিত বিলাসবহ্নি একবার যেন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। লজ্জা ও ভয় সে জ্বালা যেন বস্ত্রাঞ্চলে চাপিয়া রাখিল, কান্তিচন্দ্র সামলাই-লেন—কিন্তু মনের সাধ তুষের আগুনের মত মনের মধ্যে ধিকিধিকি জ্বলিতে লাগিল। কান্তিচন্দ্র মনে মনে স্থির করিলেন, অতঃপর দোপাটীকে লইয়া সুরূপার চক্ষের অন্তরালে হুড়াহুড়ি খেলা করিবেন; তাহার সহিত খেলা করিলে তিনি সুখ বোধ করেন,—পাপভুজঙ্গ এমনি ভাবেই মনুষ্য-হৃদয়রূপী কল্পতরুকে জড়াইয়া ধরে।

(৮)

"ও দোপাটী! ও শীতলপাটী! তুই আমার কাছে আয় না; আমার মুখে

পান দে না"—দোপাটী কিন্তু এখন আর তেমন হাসে না, তেমন হুড়াহুড়ি করে না,—দোপাটী যেন এখন কেমন হইয়া গিয়াছে। সুরূপাকে সম্মুখে রাখিয়া দোপাটী যেমন দুষ্টামি করিত, বাহিরের ঘরে বা বাগানবাটীতে কান্তিচন্দ্রকে একলা পাইলেও দোপাটী তেমন হাসে না, তেমন বকে না; ঐ শুন না, বিহ্বল কান্তিচন্দ্র দোপাটীকে বারবার ডাকিতেছেন। দোপাটী কাছে আসিতেছে না, একটু যেন সলজ্জভাবে দূরে সরিয়া যাইতেছে।

না পাইলেই আকাঙ্ক্ষা বাড়ে, মনের মতনটি না হইলেই মনের মতন হইবার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিতে ইচ্ছা করে; কান্তিচন্দ্র দোপাটীর জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছিলেন, গৃহ ছাড়িয়া বাগানবাটীতে বাস করিতেছিলেন; দিনান্তে সুরূপার শুষ্কমুখ দেখিবার জন্য একবার বাসায় যাইতেন বটে; কিন্তু সে যাওয়া মাত্র; সে লোকদেখান যাওয়া; তথাপি দোপাটী কিন্তু তাঁহার হইল না, ফুলের প্রজাপতির মত দোপাটী এক একবার তাঁহার কাছে আসে, আবার রূপের পাখা ছড়াইয়া দূরে পলাইয়া যায়। আশায় উৎকণ্ঠায়—নৈরাশ্যে বিষাদে কান্তিচন্দ্রের অপরূপ রূপ শুকাইয়া গেল, চক্ষু কোটরগত হইল, তিনি একপ্রকার আত্মহারা হইলেন।

(৯)

ওদিকে সুরূপা কৃষ্ণপক্ষের শশীর ন্যায় দিনে দিনে মলিন হইয়া যাইতে লাগিলেন; স্বামীর মঙ্গলচিন্তা, সংসারের চিন্তা, নিজের চিন্তা, ইহকালপর-কালের চিন্তা, কত চিন্তা আসিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া ধরিল, জীয়ন্ত অবস্থায় চিন্তারূপ-চিতায় অহরহ পুড়িতে লাগিলেন।

দুঃখে পড়িয়া সুরূপার মেজাজটাও খারাপ হইয়া গেল; স্বামী আসিলে স্বামীর সহিত ভাল করিয়া কথা কহেন না, এমন কি তাঁহার কাছে পর্য্যন্ত যান না। একদিন সন্ধ্যার সময় কান্তিচন্দ্র বিষাদমুখে বাসায় আসিয়াছেন, মনের সাধ সুরূপার সহিত দণ্ডকয়েক কথা কহেন; সুরূপা কথা কহিল না, সরিয়া পলাইতে চেষ্টা করিল। কান্তিচন্দ্র সুরূপার হাত ধরিলেন। বলিলেন, "রূপ! একটু দাঁড়াও, আমার দুটা কথা শুন। তুমি কেন অমন কর, আমি ত কোন দোষের দুষী নহি। আমি ত কোন পাপই করি নি, তোমায় যথেষ্ট অর্থ দিচ্ছি। তুমি যা চাচ্ছ, তাই পাচ্চ, তবে তুমি এমন কেন?"

সুরূপা।—কথা কইব না ভেবেছিলেম, কিন্তু তুমি যখন হাত ধরে কথা কইলে, তখন একটা উত্তর দিতেই হয়। আমি তোমার টাকা পয়সা চাইনে, ধনদৌলত চাইনে, আমি তোমাকে চাই। তুমি যখন আমার হ'লে না, তুমি যখন আমার চক্ষের উপর একটা বেদের মেয়েকে নিয়ে বাগানে আমোদ-প্রমোদ কর্‌তে লজ্জা বোধ কোচ্ছো না, তখন তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ নাই। আমার ভাগ্যে যা আছে, তাই হবে।

ছি ছি সুরূপা! হেলায় হাতের পাঁচ হারাইলে, এখন যে অনেক খেলা বাকি আছে।

(১০)

পাঁজরভাঙ্গা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কান্তিচন্দ্র উদাসনয়নে বাগানের দিকে চলিয়া গেলেন; তিনমাস দোপাটীর সাধনা করিয়াও তাহাকে নিজের করিতে পারেন নাই বলিয়া সুরূপার আশ্রয়ের আশায় গিয়াছিলেন; স্ত্রী হইয়া সুরূপা তাঁহাকে দূর করিয়া দিল, ধীরে ধীরে কান্তিচন্দ্র বাগানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হইয়াছে; আকাশের পূর্ব্ব-কোণে চাঁদ উঠিয়াছে; গ্রীষ্মকাল, ঝির্ ঝির্ করিয়া একটু হাওয়া বহিতেছে; বাগানে বেলা চামেলি জুঁইফুল ফুটিয়াছে, সৌরভে দশ দিক্ আমোদ করিয়াছে; দোপাটী ফুলের হার, ফুলের বলয়, ফুলের মুকুট পরিয়া, বনবালা সাজিয়া, নাচিয়া নাচিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, একরাশি চুলের উপর থরে থরে চম্পকের মালা সাজান আছে, দোপাটীর অপরূপ রূপ! ভগ্নহৃদয় কান্তিচন্দ্র উদাসমনে বাগানে প্রবেশ করিলেন। উপরে চাঁদের আলো, নীচে ফুলের আলো, আর এই দুই আলোর মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া দোপাটী নিজের রূপের আলোর সহিত ফুলের আলো মিশাইয়া চাঁদের আলোয় যেন ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে; কান্তিচন্দ্রের বিষাদ গেল, নৈরাশ্য দূর হইল। কান্তিচন্দ্র ভাবিলেন, দেখি কোন্‌টা; উপরে আকাশ, আর আকাশের চাঁদ দেখিব না; নীচে বাগান, আর বাগানের ফুল দেখিব না; নানা-পুষ্পাভরণভূষিতা ফুল্লারবিন্দবদনা কিশোরী বনদেবীকে দেখিব। কান্তিচন্দ্র বিহ্বল বিমূঢ় হইলেন, বিভ্রান্তভাবে অগ্রসর হইতে হইতে দোপাটীর কাছে গিয়া পড়িলেন। দোপাটীর আর সে ভাব নাই, এখন সে সলজ্জা গম্ভীরা নারী; কান্তিচন্দ্র এই নারীমূর্ত্তির সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ধীরে ধীরে তাহার দুইটি হাত ধরিয়া বলিলেন, "দোপাটী! এমন করিয়া

কতদিন কাটিবে, আমি যে আর পারি না; তোমার আমি যা উপকার করিয়াছি, তোমাকে আমি যে ভাবে প্রতিপালন করিয়াছি, তাহাতে তোমার কি আমার সহিত এরূপ ব্যবহার করা শোভা পায়? তুমি যে আমায় তিল তিল করিয়া ক্ষয় করিতেছ, তাহা কি তুমি বুঝিতেছ না; তোমার ধর্ম্মে যাহা হয়, তুমি তাহাই কর।"

দোপাটী।—বস্ বাবু বস্, আর বলিতে হইবে না। আমাদের মধ্যে ধর্ম্ম নাই, অধর্ম্ম নাই, পাপ নাই, পুণ্য নাই, কেবল আমরা উপকারকের উপকার ভুলি না, সে ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য আমরা সর্ব্বস্ব পণ করিতে পারি; কিন্তু আমাকে পাইলে তোমার ভারি অমঙ্গল হইবে। এ কথা আমাদের কত্তা-মা সেই কারাগোলার ঘাটে তোমার পত্নীকে প্রথম দিনই বলিয়া গিয়াছেন। সে কথা আমি বিশ্বাস করি, তাই এতদিন ইচ্ছা করিয়াই তোমার সাধ মিটাই নাই; যখন উপকারের কথা তুলিয়াছ, তখন তোমার ভাগ্যে যাহা আছে, তাহাই হউক। সে ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য আমি তোমার হইলাম। কিন্তু জানিও, বেদের মেয়ে চির-কাল কাহারও হইয়া থাকে না। আর জানিও, বেদের মেয়ে ভালবাসিতে জানে না।

কান্তিচন্দ্র।—আমার আবার বিপৎ-সম্পদ্ কি, বাঁচিলে তবে ত?

দোপাটী।—তোমার ভাগ্যে যাহা আছে, তাহাই হইবে, আমি কি করিব বল। কিন্তু জানিও, সতী নারীর দীর্ঘশ্বাস ব্যর্থ যায় না, বেদের মেয়ে হইলেও এ কথা আমরা বেশ জানি।

(১১)

কান্তিচন্দ্র এখন কি সুখী? তাহার ত মনের সাধ মিটিয়াছে। সে ত অলভ্যকে লাভ করিয়াছে। জ্ঞানহারা দিশেহারা হইলে যদি সুখী হওয়া যায়, তাহা হইলে কান্তিচন্দ্র সুখী বটে; কিন্তু সে যে পাগল, পাগলকে সুখী বলিব কেমন করিয়া! কান্তিচন্দ্র দোপাটীর রূপে পাগল, দোপাটীর গুণে পাগল, দোপাটীর ভাবে পাগল, সে এখন ত্রিভুবন দোপাটীময় দেখে। উপাসক ইষ্টদেবীর যেরূপ সেবা করেন, কান্তিচন্দ্র দোপাটীর ততোধিক সেবা করে। ফাছারীর কাজ নাই, বাটীতে যাতায়াত নাই, লোক-লৌকিকতা নাই, তেমন স্বজন-প্রতিপালন নাই,—কান্তিচন্দ্রের আছে কেবল দোপাটী।

শ্রাবণ মাস, আকাশ সর্ব্বদাই মেঘে ঢাকা, ধরাতল সর্ব্বদাই জলে ভরা, অনবরত বৃষ্টির ধারা পড়িতেছে; দেখিলে মনে হয়, আকাশের দেবতাগণ যেন পৃথিবীর জন্য কেবল রোদন করিতেছে; এ রোদনে দেবতার গর্জ্জন নাই, বিদ্যুতের বিকাশ নাই, সব স্তম্ভিত ভাব; কেবল ঝর্ ঝর্ আসার-সম্পাত, ঘোর অন্ধকার, আকাশেও আলো নাই, ধরাতলেও আলো নাই, কোলের মানুষ চেনা যায় না—কেবল অন্ধকারের স্তূপের মধ্যে মাঝে মাঝে খদ্যোতের অগ্নিবিন্দু দেখা যাইতেছে। কান্তিচন্দ্র বাগানবাড়ীর বারাণ্ডায় বসিয়াছেন, বাহিরের অন্ধকারের সহিত নিজের অন্ধকারময় মনকে মিশাইয়া দিয়া তমপিণ্ডের ন্যায় বসিয়াছেন। এমন সময় অন্ধকার ঠেলিয়া যেন, দোপাটী আসিয়া দাঁড়াইল। দোপাটীর অপূর্ব্ব বেশ, পরণে ভিজা কাপড়, বস্ত্রাঞ্চল হইতে টশ্ টশ্ জল পড়িতেছে, আজানুপরিলম্বিত কেশরাশি বাহিয়াও জল পড়িতেছে, আর সেই কেশরাশির উপর খদ্যোতের মালা জড়ান আছে; দপ্ দপ্ করিয়া খদ্যোতের মালা জ্বলিতেছে, আর মনে হইতেছে, যেন ঝর্ ঝর্ করিয়া কত মণিমাণিক্যের দ্যুতি ঝরিয়া পড়িতেছে। দোপাটী বেদের মেয়ে, ফুল ফল লতা লইয়া, বেশবিন্যাস করিতে তাহার ন্যায় কেহ জানিত না। সে যেমন জোনাকী ধরিয়া জোনাকীর মালা গাঁথিত, তেমন বুঝি কেহ জানিত না। তাই তাহার সাজের গুণে তাহাকে মর্ত্ত্যের নয় বলিয়া মনে হইত।

দোপাটী।—বাবু সাহেব! আমি আপনার নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছি, আমার কাল ফুরাইয়াছে, আমি আর আপনার নিকট থাকিতে পারিব না; আমার ঋণ আমি পরিশোধ করিয়াছি।

কান্তিচন্দ্র।—সে কি দোপাটি! তুমি যাবে কি? তুমি গেলে যে আমি মরে যাব, তুমি যে আমার সর্ব্বস্ব, অমন কথা বলে ঠাট্টা কোরো না দোপাটী।

দোপাটী।—আমি ত ঠাট্টা-তামাসা কখন জানিনে। আপনি ত আমায় ভালবাসার জোরে পান নাই, আমাকে ভাল বাসাইতেও শেখান নাই; আপনি আমার উপকারক, সেই উপকারের ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য আমাকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সে প্রার্থনা আমি মঞ্জুর করিয়াছিলাম। আমি এখন গর্ভবতী, আপনার আমার উপর আর কোন অধিকার নাই; আপনার গৃহে, আপনার আশ্রয়ে আমি সন্তান প্রসব করিব না। আমাদের বেদীয়া নিয়ম এই, আপনার আশ্রয়ে আপনারই ঔরসজাত সন্তান প্রসূত হইলে

চিরজীবন আপনার দাসত্ব করিতে হইবে,—আমি তাহা সহ্য করিতে পারিব না। গৌড়ের জঙ্গলের কোন এক গুপ্তস্থানে আমাদের একটী আড্ডা আছে, আমি সেইখানেই থাকিব।

ক্রান্তিচন্দ্র।—সে কি দোপাটি! তা হবে না, আমি তোমার নিকট অনেক অপরাধে অপরাধী, আমার সে সকল অপরাধ মার্জ্জনা কর, আমার কাছে থাকো, তুমি চক্ষের আড়াল হইলে ত মরিব।

অনতিদূরে অন্ধকার ভেদ করিয়া উত্তর আসিল, "তুমি মরিবে না, পাগল হইবে, তুমি মরিবে না, পাগল হইবে, আমি চলিলাম।" উদ্‌ভ্রান্ত উন্মত্ত কান্তিচন্দ্র "কোথায় যাও" ঊর্দ্ধশ্বাসে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, আর সেই শব্দের দিক্ লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া চলিলেন। সেই সূচিভেদ্য অন্ধকারকে গাঢ় করিয়া বারবার মুষলধারে শ্রাবণ মেঘের অশ্রান্ত বর্ষণ হইতে লাগিল; অগণিত ভেককুল অজস্র বর্ষাবারি পানে উল্লসিত হইয়া চারিদিক হইতে যেন বিকট হাস্যের শব্দ করিতে লাগিল; আর সেই শব্দরাশির সহিত কান্তিচন্দ্রের আর্ত্তস্বর অতীতের অনন্তে মিশাইতে লাগিল।

(১২)

প্রভাত হইয়াছে, বর্ষাকালের প্রভাত। এ প্রভাতের কোন শোভাই নাই, কেবল নিশাকালের ঘনান্ধকার অপসৃত হইয়াছে মাত্র,—আর সেই বৃষ্টি, সেই মেঘ, সমানই বর্ত্তমান। সূর্য্যের প্রভা আছে বটে কিন্তু কিরণ নাই, পাতায় পাতায় সোণার বরণ নাই। যা হউক, প্রভাত হইয়াছে, পথের দুইধার দিয়া নদী বহিয়া যাইতেছে, পথ দিয়াও নদী বহিতেছে।

ওকি ও! ওই ভাঙ্গাবাড়ীটার সম্মুখে ভাঙ্গাদরজার পাশে ওটা কি ও! ওকি মনুষ্যের শবদেহ, না ভস্মাচ্ছাদিত মনুষ্যদেহ! একটু অগ্রসর হইয়া দেখ দেখি, একি এ! এ যে কান্তিবাবুর বাড়ী, সে বাড়ীর এই শ্রী হইয়াছে! যে বাড়ীতে বারমাস দুর্গোৎসব ব্রাহ্মণভোজন হইত, সে বাড়ী এখন জনশূন্য!

(ক্রমশঃ)

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

জন্মভূমি।

(সচিত্র মাসিক পত্র।)

নবম বর্ষ। } ১৩০৮ সাল, জ্যৈষ্ঠ। { ১১শ সংখ্যা।

ভারত-সাররত্নং।

মহারাজ যুধিষ্ঠির কপট অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদী সহ বনগমন করিলেন, তথায় অননুভূতপূর্ব্ব নানাবিধ ক্লেশ অনুভব করিতে লাগিলেন। তখন রাজা শোকাচ্ছন্ন হইয়া ভূতলে উপবেশন করিলে অধ্যাত্মজ্ঞাননিরত সাংখ্য এবং যোগে কুশল শৌনক মহর্ষি রাজাকে কহিয়াছিলেন। বনপর্ব্ব ২ অং ১৬ শ্লোক।

১। শোকস্থানসহস্রাণি ভয়স্থান শতানি চ।
দিবসে দিবসে মূঢ়মাবিশন্তি ন পণ্ডিতং ॥ ১৬ ॥

সহস্র সহস্র শোকের কারণ ও শত শত ভয়ের কারণ প্রত্যহ মূর্খদিগকেই অভিভূত করে, পণ্ডিতদিগকে কিছুই করিতে পারে না ॥ ১ ॥

২। অর্থকৃচ্ছ্রেষু দুর্গেষু ব্যাপৎসু স্বজনস্য চ।
শরীরমানসৈর্দ্দুঃখৈর্ন সীদন্তি ভবদ্বিধাঃ ॥ ১৯ ॥

অর্থনাশ, নানাবিধ ক্লেশ এবং আত্মীয়গণের বিপদ প্রভৃতি শারীরিক ও মানসিক দুঃখে ভবাদৃশ মহানুভব ব্যক্তি অভিভূত হয় না ॥ ২ ॥

৩। ব্যাধেরনিষ্টসংস্পর্শাচ্ছ্রমাদিষ্টবিবর্জ্জনাৎ।
দুঃখঞ্চতুর্ভিঃ শারীরং কারণৈঃ সংপ্রবর্ত্ততে ॥ ২২ ॥

পীড়া, কণ্টকাদি দ্বারা বেধ, ব্যায়ামাদি, এবং খাদ্যের অভাব এই চারি প্রকার শারীরিক দুঃখ উপস্থিত হয় ॥ ৩ ॥

৪। তদা তৎপ্রতিকারাচ্চ সততঞ্চাধিচিন্তনাৎ।
আধিব্যাধিপ্রশমনং ক্রিয়াযোগদ্বয়েন তু ॥ ২৩ ॥

উক্ত চতুর্ব্বিধ দুঃখের যাহা দ্বারা প্রতীকার হয়, যেমন ব্যাধিনিবৃত্তির কারণ ঔষধ, কণ্টক বেধ নিবৃত্তির কারণ চর্ম্মপাদুকা, ব্যায়াম ক্লেশ নিবৃত্তির কারণ স্বাস্থ্য এবং অন্ন-সংগ্রহ এই চারি প্রকার প্রতীকার ও সর্ব্বদা অন্য চিত্তে থাকা এই দুই উপায়ে আধিব্যাধি নষ্ট হয় ॥ ৪ ॥

৫। মতিমন্তোঽতোবৈদ্যাঃ শমং প্রাগেব কুর্ব্বতে।
মানসস্য প্রিয়াখ্যানৈঃ সন্তোগোপনয়ৈর্নৃণাং ॥ ২৪ ॥

অতএব বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক বুঝিয়া শুনিয়া অনুকূল বচন কথনে, অর্থাৎ বহু লাভজনক উপায় দর্শনে অর্থনাশজনিত দুঃখ ও তত্তৎ রূপাদি সমর্পণ দ্বারা কামাদিজনিত দুঃখের প্রশমন করিবে ॥ ৫ ॥

৬। মানসেন হি দুঃখেন শরীরমুপতপ্যতে।
অয়ঃপিণ্ডেন তপ্তেন কুম্ভসংস্থমিবোদকং ॥ ২৫ ॥

যেমন অগ্নিতপ্ত লৌহ-খণ্ডের সংযোগে কলসস্থিত জল সন্তপ্ত হয়, তেমনই মানসিক দুঃখ দ্বারাও শরীর অভিভূত হয়। মন আর শরীরের এমনই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ॥ ৬ ॥

৭। মানসং শময়েত্তস্মাৎ জ্ঞানেনাগ্নিমিবাম্বুনা।
প্রশান্তে মানসেঽস্য শারীরমুপশাম্যতি ॥ ২৬ ॥

অতএব জল দ্বারা যেমন অনল নির্ব্বাপিত হয়, সেই প্রকার জ্ঞান দ্বারা মানসিক দুঃখ প্রশমিত করিবে। সুতরাং মানসিক দুঃখ প্রশমিত হইলে তৎসহ শারীর দুঃখ আপনা হইতেই লয় প্রাপ্ত হইবে ॥ ৭ ॥

৮। মনসো দুঃখমূলন্তু স্নেহ ইত্যুপলভ্যতে।
স্নেহাত্তু সজ্জতে জন্তুর্দ্দুঃখযোগমুপৈতি চ ॥

এখন বিচারে উপপন্ন হইতেছে, "স্নেহ"ই মানসিক দুঃখের মূল, স্নেহই মানবদিগকে সংসারে জড়াইয়া বাঁধিতেছে, এবং তাহাতেই দুঃখানুভব করিতেছে ॥ ৮ ॥

৯। স্নেহমূলানিদুঃখানি স্নেহজানি ভয়ানি চ।
শোকহর্ষৌ তথায়াসঃ সর্ব্বং স্নেহাৎ প্রবর্ত্ততে ॥ ২৮ ॥

বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, সকল প্রকার দুঃখেরই মূল স্নেহ এবং ভয়, শোক, আনন্দ এবং ক্লেশ সমস্তই স্নেহ-হেতুই ঘটিয়া থাকে ॥৯॥

১০। স্নেহাদ্ভাবোঽনুরাগশ্চ প্রজজ্ঞে বিষয়ে তথা।
অশ্রেয়স্কাবুভাবেতৌ পূর্ব্বস্তত্র গুরুঃস্মৃতঃ ॥ ২৯ ॥

বিষয়ে স্নেহ থাকাতেই তাহার জন্য সতত ভাবনা থাকে, এবং উত্তরোত্তর অধিকাধিক বিষয়ে প্রীতি জন্মে। ইহার অভিপ্রায় এই—প্রথমতঃ বিশেষ না বুঝিয়াই লোকে বিষয়ের কামনা করে, তৎপরে বিষয়ে আসক্তি, তৎপরে মনে মনে আনন্দ, তৎপরে সেই বিষয় লাভের প্রবৃত্তি, তৎপরে জন্মগ্রহণ, তৎপরে সুখ দুঃখ, তৎপরে আবার কোন কোন বিষয়ে অনুরাগ, কোন কোন বিষয়ে বিরাগ, তৎপরে আবার বাসনা—এই ক্রম। কিন্তু তাহাতে গোড়ায় স্নেহই পর পর ভাবনাদির হেতু। উক্ত স্নেহজনিত ভাবনা এবং ভাবনাজনিত অনুরাগ—এই দুইই অত্যন্ত মন্দ। আর এই দুয়ের মধ্যেও আবার ভাবনাই অত্যন্ত অনিষ্টকরী ॥ ১০ ॥

শ্রীজয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ।

দোপাটী।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

ধীরে ধীরে একটি বৃদ্ধা বাহিরের কপাট খুলিলেন, কপাট খুলিয়াই মনুষ্যশবদেহ দেখিয়া "মা গো" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার চীৎকারশব্দ শুনিয়া প্রাতঃকালের সেই টিপ্ টিপ্ বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে একটি শীর্ণকায়া যুবতী বাহিরে আসিলেন, তিনিও সম্মুখে শবদেহ দেখিলেন। তিনি কাঁদিলেন না, দেখিয়া ধীরে সেই কাদামাটির উপর বসিয়া পড়িলেন। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন, "মাসীমা! দেখ্‌তে পাচ্ছ না ও কে!" বৃদ্ধা মাসীমা, দুঃখিনী সুরূপার এই কথা শুনিয়া সাহসে বুক বাঁধিয়া ধীরে ধীরে শবের দিকে অগ্রসর হইলেন। বুড়ীর নজর ভাল ছিল না, শবদেহটার কাছে বসিয়া পড়িলেন, চর্ম্মসার শুষ্ক হস্তে সেই দেহ স্পর্শ করিলেন, এবং চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, "একি! এ যে আমার কাতু!" এই বলিয়া বুড়ী "বাবারে! কান্তিরে! তুই কোথায় গেলিরে" ইত্যাদি সুরে মড়াকান্না ধরিল।

সত্যসত্যই কান্তিচন্দ্র মূর্চ্ছিত অবস্থায় সেইখানে পড়িয়াছিল। কেমন করিয়া তিনি নিজের বাড়ীর সম্মুখে আসিলেন, তিনিও জানেন না, কেহই জানে না। বুড়ীর কান্নার রোলে পাড়াপ্রতিবাসী সকলে আসিয়া জুটিল, মূর্চ্ছিত কান্তিচন্দ্রও গাত্র ঝাড়িয়া উঠিয়া বসিলেন। সুরূপার মস্তকে অবগুণ্ঠন নাই, কাহাকেও দেখিয়া লজ্জা নাই, সুরূপা বাহ্যজ্ঞানশূন্যা হইয়া

হাসিমুখে গিয়া স্বামীর হস্তধারণ করিল। কান্তিচন্দ্র যেন ছোট শিশুটির মত তাঁহার করাকর্ষণে শুড়শুড় করিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল।

"হিহি তুই কে, তুই কি দোপাটি, হি হি আমি তোর সঙ্গে বনে যাব।" কান্তিচন্দ্র সত্যসত্যই পাগল হইয়াছে, একেবারেই উন্মাদ। কিন্তু স্বামীকে উন্মাদ অবস্থাতে পাইয়াও সুরূপা এখন সুখী। কেন না, সে যে স্বামীকে পাইয়াছে। উন্মাদ স্বামীর চড়-চাপড়-কিল সুরূপা হাসিমুখে সহ্য করে, আর তাঁহার সেবা করে। সুরূপার সর্ব্বাঙ্গে কালশিরার দাগ, তথাপি সুরূপা স্বামীকে শিকল দিয়া বাঁধিতে পারে নাই। সুরূপা প্রায় বলিত, "আমার স্বামী আমার দেবতা, আমার ইহকালের সর্ব্বস্ব, পরকালের সম্বল, আমি সেই স্বামীর সেবা করিতে পারিতেছি, আবার চাই কি? আমি পোড়া-কপালী, জন্মান্তরে অনেক পাপ করিয়াছিলাম, তাই এমন স্বামী পাইয়াও হারাইয়াছিলাম, হারানিধি ফিরাইয়া পাইয়াছি, ইহাই আমার যথেষ্ট। তবে ইন্দ্রতুল্য স্বামী পাগল হইল, সেও আমার পোড়া কপাল।"

(১৩)

ভাদ্রমাসের রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, নীল আকাশের তলে কে যেন সোণা গালাইয়া ঢালিয়া দিয়াছে, রৌদ্রের দিকে তাকাইবার যো নাই।

"মাগো দুটি ভিক্ষা দাও", মধ্যাহ্নগগনের তীব্রতেজকে ভেদ করিয়া কাতর বামাকণ্ঠে কে বলিল, "মাগো দুটি ভিক্ষা দাও।" কান্তিচন্দ্রের বাড়ীর সম্মুখের দরজা খুলিয়া গেল। বৃদ্ধা মাসীমাকে দেখিয়াই ভিখারিণী শুষ্ক-মুখে একগাল হাসিয়া বলিল, "বুড়ু মা! আমার ছুটু মা কই?" এই বলিয়া ভিখারিণী গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। সুরূপা ভিখারিণীকে দেখিয়াই চমকিয়া উঠিলেন, ক্রমে মনে পড়িল, সেই কারাগোলার বেদিনী বুড়ী। বেদেনী জমকাইয়া গিয়া দাওয়ার উপর বসিল এবং বলিল, "কাঁদিস্‌নি মা! তুই যে আমার ভাল মেয়ে, তুই কাঁদ্‌বি কেন?" বেদেনীর কথার আওয়াজ পাইয়া উন্মাদ কান্তিচন্দ্র কক্ষাভ্যন্তর হইতে বাঘের ন্যায় লাফাইয়া বাহিরে আসিলেন। আসিয়াই বজ্রমুষ্টিতে বুড়ীর চুল ধরিয়া বলিল, "দে বুড়ী আমার দোপাটীকে ফিরিয়ে দে।" বৃদ্ধা বেদেনী কান্তিবাবুর দিকে একবার তাকাইয়া স্থিরদৃষ্টিতে বলিল, "ঐখানে চুপ করে বস।" বৃদ্ধার সে গম্ভীর শব্দ শুনিয়া পাগল কান্তিচন্দ্র ঠিক যেন বিড়ালের মতন ঘরের কোণে গিয়া চুপ করিয়া বসিলেন। বেদিনীর প্রভাব দেখিয়া সকলেই অবাক হইল।

"আর কেন কষ্ট পাও মা! আগামী অমাবস্যের দিন তোমার স্বামীর হাত ধরে সা সাহেবের দরগায় যেও, তোমার স্বামী আরোগ্য লাভ কর্‌বেন। মাগো! বোনের পাখী বেদিনীকে পুষতে আছে কি? তোমার স্বামী বোঝানেনি, দোপাটীকে পুষেছিলেন, তাকেও রাখতে পার্‌লেন না, নিজেও ঠিক থাকলেন না। আমরা মা নাগের জাত, আমাদের যতই দুধকলা দেবে, আমাদের ততই বিষ বাড়বে। যাউক, তোমার ঘরসংসার আবার পাতিয়ে দিতে পারলে, আমি ওস্তাদের নিকট রেহাই পাই।" এই বলিয়া বেদিনী উঠিয়া গেল।

(১৪)

র‍্যাভেন্সা সাহেব কান্তিচন্দ্রকে বড় ভালবাসিতেন, প্রত্যহই তাঁহার স্ত্রীপরিবারের সংবাদ লইতেন, প্রয়োজন হইলে অর্থসাহায্যও করিতেন। সা সাহেবের দরগায় যাইতে হইবে শুনিয়া সাহেব নিজেই হাতির বন্দোবস্ত করিলেন, লোকজন সঙ্গে দিলেন, যথেষ্ট অর্থও সুরূপার হাতে পাঠাইয়া দিলেন।

সন্ধ্যা হইয়াছে। সুরূপা লোকজন লইয়া সা সাহেবের দরগায় উপস্থিত হইলেন। চারিদিকে গহন বন, বনের মধ্যে হুসেনসাহের নির্ম্মিত বিরাট্ মসজিদ্ এবং তাহার ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। সে মস্‌জিদের একটি ভূগর্ভস্থ ক্ষুদ্র কক্ষে বৃদ্ধ মুসলমান সা সাহেব বাস করিতেন। সেই নির্জ্জন গহনবনে তাহার অন্ন কেমন করিয়া হইত, কে জানে? সুরূপা দূরে লোকজন ও হাতি রাখিয়া স্বামীর হস্তধারণ করিয়া সেই পুরাতন মসজিদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ঠিক সেই সময়েই আনাভি-বিলম্বিত-শুভ্রশ্মশ্রু আগুল্‌ফ-চুম্বি জটাভার এলায়িত দীর্ঘকায় শুভ্র গৌরবর্ণ মুসলমান-ফকির সা সাহেব আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার হাতে তস্‌বী, অষ্টপ্রহর কলমা জপ করিতেছেন। ফকির আসিয়াই কান্তিচন্দ্রের মাথায় বামহস্ত অর্পণ করিলেন। বলিলেন, "কাতর আরাম হো যাও।" সেই গম্ভীর আদেশবাণী শুনিয়া কান্তিচন্দ্র যেন কতকটা প্রকৃতিস্থ হইলেন। আর বলিলেন, "রূপো! এ কি, এ কার রূপ? আমি কোথা?" ঠিক এই সময়েই নিবিড় গহনবন হইতে কে গাহিয়া উঠিল, "জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু নয়ন না তিরপিত ভেল।" গান শুনিয়া কান্তিচন্দ্র চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "বটেই ত! যতদিন পারিয়াছি, নয়ন দিয়া রূপ দেখিয়াছি। যখন জ্ঞান হারাইয়াছি, তখন মনে

মনে মাঝে মাঝে সে রূপ ধ্যান করিতাম, তবুও সাধ মিটিত না। সুরূপা আজ তোমায় বড় রূপসী দেখিতেছি, চল বাড়ী চল। আমার হৃদ্‌গত রূপের হুতাশন রাবণের চিতার ন্যায় অহরহ জ্বলিতেছে, তোমার রূপের ইন্ধন-সাহায্যে সে আগুন জ্বালাইয়া রাখিব। যা হবার তা হয়েছে, চল বাড়ী যাই। ফকির সেলাম। সমাপ্ত।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

ছায়াসতী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

তুমিই বা ইহার জন্য এত ক্লেশ করিতেছ কেন? তুমি যেরূপ অবস্থার লোক, তাহাতে এরূপ সুখ-স্বচ্ছন্দ তোমার পক্ষে যথেষ্ট। ইন্দ্রপ্রিয়া ভূতলে পতিত হইয়া সুকোমল বাহুবল্লী দ্বারা পতির পদযুগল ধারণ করতঃ রোদন করিতে করিতে বলিলেন, "আমায় কলঙ্কিনী করিও না। এই কি তোমার ভালবাসা? কেমন করিয়া নিষ্ঠুর নৈরাশ্যে আমাকে ফেলিতেছ, আমাকে তোমার পিতার নিকট লইয়া চল, আমি তাঁহার চরণে ধরিয়া আমার দুঃখের কথা তাঁহাকে বলিব, তিনি আমায় দয়া করিবেন, তাঁহার বংশের অঙ্কুর আমার গর্ভে অবস্থান করিতেছে, সে খাতিরেও তিনি আমায় দয়া করিবেন।" নৃশংস রাজপুত বিনা বাক্যব্যয়ে পদপতিত ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিয়া অতুলের সহিত বাহিরে গমন করিলেন। সেখানেও ইন্দ্রপ্রিয়ার করুণ কণ্ঠস্বর শুনা যাইতে লাগিল; ধর্ম্মহীন ধনীরা যাহা করে, রাজকুমারও সেই পথে চলিলেন। বলিলেন, "আর বিরক্তিকর রোদন শুনা যায় না, গাড়ী তৈয়ার করিতে বল, কিছু সময় Course বায়ু সেবন করিগে।" অতুল করের চির পালিতা আশালতা সফল হইয়াছে; মহানন্দে দরোয়ানকে হুকুম করিল। যাঁকজমকীয় শকট আনিত হইলে উভয় বন্ধুতে পাশাপাশী উপবিষ্ট হইলেন, বেগগামী অশ্বদ্বয় সশব্দে চৌরঙ্গি অভিমুখে চলিল। ইন্দ্রপ্রিয়ার রোদনে দিবাসতী কাতরা হইয়া পশ্চিম সাগরে পতির সহিত গমন করিলেন। নিশা আগত হইলেন এবং দুঃখিনীর ক্লেশ দর্শনে হিম ছলে ঝর্ ঝর্ করিয়া অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। যশোদা ইন্দ্রপ্রিয়ার রোদনের কারণ আদ্যান্ত

জানিয়া যারপরনাই যাতনা পাইল কিন্তু দুঃখিনী কি সাহায্য করিবে? পৌষ মাস! ঘোর অন্ধকার নিশি, ইন্দ্রপ্রিয়া একখানি শাল মুড়ি দিয়া ধীরে ধীরে উদ্যানের পশ্চাৎ দ্বার মোচন করত খাল ধারে উপস্থিত হইলেন; ভয়চকিত নেত্রে চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, কেহ কোথাও নাই, গাত্রের শালখানি খুলিয়া ফেলিয়া খালে ঝাঁপ দিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু পারিলেন না, পশ্চাৎ হইতে একজন আসিয়া দৃঢ়রূপে ধরিল, ইন্দ্রপ্রিয়া সজল চক্ষে ফিরিয়া দেখিলেন, যশোদা। যশোদা বলিল, "ইন্দ্র! তোমার পায়ে পড়ি, এমন কাজ করো না, তোমার পেটে ছেলে রয়েছে, তাকে বিনা দোষে মেরো না, ঘরে ফিরে চল।" ইন্দ্রপ্রিয়া সগর্ব্বে বলিলেন, "এ জীবনে ও পাপ বাড়িতে আর যাইব না।" যশোদা বলিল, "নূতন বাজারে আমার ভগিনী আছে, রাস্তার মোড়েই তার স্বামীর দোকান, সেইখানে তোমায় লইয়া যাই, চল।" ইন্দ্রপ্রিয়া উদাসভাবে বলিলেন, "ততদূর কি চলিয়া যাইতে পারিব।" দাসী বলিল, "না দিদি, খানিক আগে গিয়া গাড়ী ভাড়া করবো এখন্।" ইন্দ্রপ্রিয়া দাসীর গাত্রের মলিন চাদরে আবৃত হইয়া দাসীর সহিত অগ্রসর হইতে লাগিলেন, পোলের উপর একখানি ঠিকা গাড়ী ভাড়া করিয়া তাহাতে আরোহণ করিলেন, গাড়ী যথাসময়ে নূতন বাজার চিৎপুর রোডে পৌঁছিল। যশোদা ইন্দ্রপ্রিয়ার সহিত গাড়ী হইতে নামিয়া, সম্মুখস্থ দোকানীকে বলিল, "বোনাই! এই গাড়োয়ানকে ২৲ টাকা দাও।" দোকানী ইন্দ্রপ্রিয়ার দিকে বিস্মিত ভাবে চাহিয়া গাড়োয়ানকে ২৲ টাকা ফেলিয়া দিল। গাড়োয়ান হিস্ হিস্ শব্দে গাড়ী লইয়া প্রস্থান করিল। ইন্দ্রপ্রিয়া যশোদার সহিত দুইজনে অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে, একটী অর্দ্ধবয়স্কা স্ত্রীলোক বলিল, "কে, যশোদা দিদি যে! এ মেয়েটী কে?" যশোদা বিমর্ষভাবে বলিল, "শিগ্‌গির শিগ্‌গির তক্তাপোষের উপর ভাল করে বিছানা করে দেও।" উক্ত স্ত্রীলোক ব্যস্তভাবে শয্যা প্রস্তুত করিতে লাগিল। ইন্দ্রপ্রিয়া ব্যাকুল অন্তরে কক্ষের চারিদিকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। হরিণনয়নে দরদরিত বারিধারা বহিতে লাগিল, মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। যশোদা সত্রাসে বলিল, "বামা বামা! জল দে, জল্ দে।" বামা ত্বরিত পদে সত্রাসে জল আনিল এবং মুখে চক্ষে ছিটা দিয়া অঙ্গে হাত বুলাইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ইন্দ্রপ্রিয়ার চৈতন্য হইলে সকলে ধরাধরি করিয়া

শয্যায় শয়ন করাইয়া দিল। পরিশ্রান্তা অবলা অনতিবিলম্বে নিদ্রাভিভূতা হইলেন। বামা এবং তাহার স্বামী ইন্দ্রপ্রিয়ার পরিচয় জিজ্ঞাসু হইলে যশোদা নিকটে উপবিষ্ট হইয়া আদ্যোপান্ত ব্যক্ত করিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীমনুজেন্দ্র দত্ত।

কাঙ্গালের মণি।

বিপুল বিশ্বের মাঝে এই মুখখানি,
বুঝি বিধাতার শুভ আশীর্ব্বাদ বাণী।
কত আশা আকাঙ্ক্ষার,
কত তৃপ্তি সাধনার,
কত সুখ-ভাবনার সুপ্ত প্রস্রবিণী!

বিপুল বিশ্বের মাঝে অই মুখখানি,
মনে হয় একমাত্র সৌন্দর্য্যের খনি।
যা' দেখি যা' শুনি আর,
উহার ভিতরে তার,
র'য়ে গেছে একটুকু কেমনে-কি-জানি।

বিপুল বিশ্বের মাঝে অই মুখখানি;
কিসে যে তুলনা ওর—দিব নাহি জানি।
যখনি যা চাহি পাই,
কিছুরি অভাব নাই,
হৃদয়ের কি মধুর ধ্রুব প্রতিধ্বনি!

বিপুল বিশ্বের মাঝে অই মুখখানি,
তাপিত এ জীবনের তীর্থ ত্রিবেণী।
দরশনে প্রসন্নতা,
পরশে কি তৃপ্তি সদা,
দূরে যায় ব্যাকুলতা—অবসাদ গ্লানি।

বিপুল বিশ্বের মাঝে অই মুখখানি,
দীনের কুটীরে যেন বহুমূল্যমণি।
বুকে রাখি তবু ভয়,
পাছে কেহ হ'রে লয়;
কাঙ্গালের মণিলাভ জ্বালায় এমনি!

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

শকুন্তলা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

বাজে কথা দূর হউক। নাটকের প্রথমেই আমরা রাজদর্শনে পুণ্য লাভ করি। মৃগয়াবেশে সজ্জিত, রথারূঢ়, অধিজ্যকার্ম্মুক দুষ্মন্ত বেগে পলায়নপর মৃগের অনুসরণ করিতেছেন, মৃগ শরপতনভয়ে আকুল হইয়া, তাহার দেহের পশ্চাদ্ভাগটা যথাসম্ভব সম্মুখভাগে কুঞ্চিত করিয়া, প্রাণভয়ে দৌড়িতেছে, তাহার মুখের গ্রাস পড়িয়া যাইতেছে, এই মনোহর দৃশ্যে নাটকের পট উঠিল। রাজা প্রায় মৃগের "নাগাল" ধরেন, বাণ মারেন আর কি, এমন সময়ে কোথা হইতে শব্দ আসিল, "মহারাজ! ক্ষান্ত হউন, আশ্রম মৃগ বধ করিবেন না। বিপন্নের উদ্ধারের জন্যই আপনার অস্ত্র ধারণ, আর আপনি কিনা নিরপরাধের প্রাণ সংহারে উদ্যত হইয়াছেন, ছি!" এই কথা শুনিয়া রাজা লজ্জিত হইয়া দিব্য ভাল মানুষটির মত মৃগানুসরণে ক্ষান্ত হইলেন। তাঁহার অত বড় মৃগয়ার সখ, যে সখের জন্য তিনি রাজধানী ছাড়িয়া, রৌদ্র নাই, বৃষ্টি নাই, বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, যে সখ তাঁহার কুলক্রমাগত, প্রথমে হরিণ-টাকে মারিতে না পারিয়া যে সখ তাঁহার আরও বাড়িয়া উঠিয়াছিল,—সেই সখ তিনি এক কথায় ছাড়িয়া দিলেন, নিজের চিত্ত সংযত করিলেন।

শুধু এই স্থলেই নহে, কালিদাস বরাবর সমুদায় নাটকখানিতে রাজার এই অদ্ভুত ও প্রশংসনীয় চিত্তদমনের ভূরি ভূরি উদাহরণ দিয়াছেন। দেখাইয়াছেন, একদিকে রাজা চিত্তসংযম করিতে মোটে পারেন না, আবার একদিকে তিনি পরম সংযতচিত্ত। পরস্পর বিরোধীভাবে চিত্রিত এই রাজ-চরিত্র যে কিরূপ মনোহর, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

যে ব্যক্তি মৃগ বধ করিতে রাজাকে নিষেধ করিয়াছিলেন, তিনি একজন তপস্বী। রাজা তাঁহার কথা রাখিলেন দেখিয়া, লোকটির আহ্লাদ আর ধরে না; একেবারে বিকসিত দন্তে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ফেলিলেন, "মহারাজ! তোমার অনুরূপ গুণবান্ পুত্রলাভ কর।" এই আশীর্ব্বচন শুনিয়া হয় ত রাজার মনটা 'ছাঁৎ' করিয়া উঠিল; তিনি ত আরও কত আশীর্ব্বাদ প্রত্যহ পাইয়া থাকেন, তাহার মধ্যে "পুত্রলাভ কর"ও থাকে, কিন্তু কই, তাহাতে ত মনটা এমন করিয়া উঠে না। তপস্বী অবশ্য কিছু না ভাবিয়া চিন্তিয়াই ঐ আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার আশীর্ব্বাদটি এক্ষণে বাহির হইয়াছিল। "ক্ষণে—অক্ষণে" এক আধটা কথা ঐরূপই বাহির হইয়া যায়।

বাস্তবিক নাটকখানি আদ্যোপান্ত এইরূপ "দৈবক্ষণের" উপর রচিত। নাটকের নায়িকা শকুন্তলা, এক মুহূর্ত্তের জন্যও দৈবচক্ষুর অন্তরালে নহেন। নাটক পাঠ করিলেই দেখা যায় যে, দৈব বসিয়া বসিয়া, দেখিয়া দেখিয়া, চক্র ঘুরাইয়া, পাত্র-পাত্রীগণকে লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন।

তপস্বী ত চলিয়া যাউন। যাইবার সময় তিনি বলিয়া গেলেন, "মহারাজ! এতদূর আসিয়াছ ত একবার মহর্ষি কণ্বের আশ্রমটা বেড়াইয়া যাও। মালিনী-নদীর তীরে সেই নিবিড়-ছায়া-বিশিষ্ট শান্ত আশ্রম দেখিলেই তুমি বুঝিতে পারিবে, তোমার রাজত্ব কেমন সুখে স্বচ্ছন্দে চলিতেছে।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, মহর্ষি আশ্রমে আছেন ত?" তদুত্তরে সন্ন্যাসী বলিলেন, "না; তা তোমার খাতির যত্নের কিছু ত্রুটী হইবে না। আশ্রমে কণ্বদুহিতা শকুন্তলা আছেন, তিনি যথাবিধি অতিথি-সৎকার করিবেন। আর কণ্ব গিয়াছেন ঐ শকুন্তলারই কাজে;—তাঁহার দুষ্ট গ্রহশান্তি করিতে।" দুষ্টগ্রহের প্রকোপে শকুন্তলা অচিরাৎ পতিবিয়োগ দুঃখভোগ করিলেন; এবং গ্রহশান্তির গুণে তিনি শেষে পতির সহিত মিলিতা হইলেন। এই গ্রহশান্তির উদ্দেশ্যে কণ্বের অনুপস্থিতির সহিত আখ্যানটির একটি সুন্দর সামঞ্জস্যে নাটকের যে একটী সুন্দর বাহার খুলিয়াছে, তাহা বর্ণনা করা অপেক্ষা মনে মনে বিবেচনা করা সহজ। মহাভারত বা পুরাণের কণ্বের ন্যায় আমাদের কণ্ব ফলাহরণার্থ বাহিরে যান নাই। আর এত কি ফল পাড়িতে ছিলেন? ঐ সময়ের মধ্যে যে বৃক্ষ রোপণ করিয়া তাহার ফল ভোগ করা যায়! যাহাহউক, পুরাণ-কর্ত্তাদের ত আর সম্ভব অসম্ভব জ্ঞান ছিল না; তাঁহাদের গল্প হইলেই হইল,

এবং পরিশেষে একটু নীতি-শিক্ষা থাকিলেই যথেষ্ট হইল। নাটককারের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র।

তপস্বী চলিয়া গেলে, রাজা সারথীকে বলিলেন, "দেখ, তপোবনে যাইতে হইবে, বেশ ভদ্র লোকের মত; রথে চড়িয়া গেলে ভাল দেখাইবে না, হাঁটিয়াই যাইব। আর অস্ত্রশস্ত্র সব এই রথেই থাক, সে গুলা লইয়া গেলে বড় 'গোঁয়ার গোবিন্দ গোছ' দেখাইবে।" এই বলিয়া তিনি তপোবনের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

চলিতে চলিতে হঠাৎ তাঁহার দক্ষিণবাহু ঘন ঘন স্পন্দিত হইতে লাগিল। রাজা চমকিত হইলেন। তিনি হিন্দু, সুতরাং কুসংস্কারবর্জ্জিত নহেন—সুতরাং হাঁচি টিক্‌টিকিও বিশ্বাস করেন।

দেখিতেছি "হাঁচি টিক্‌টিকি" বহুকালের জিনিস। সকল সময়ে, সকল জাতিতেই ছিল, আজও আছে, কেবল ধরা পড়িয়াছি আমরা।

স্পন্দন চরিত্রের মতে দক্ষিণবাহু স্পন্দিত হইলে শীঘ্র স্ত্রীলাভ হয়। আমাদের মধ্যে যাঁহাদের ভাগ্যে স্ত্রীলাভ ঘটিয়াছে, তাঁহাদের কাহারও বিবাহের পূর্ব্বে ঐরূপ দক্ষিণবাহু কাঁপিয়াছিল কিনা জানি না, কিন্তু রাজার কাঁপিয়াছিল। তিনি ভাবিলেন, এ আবার কি? অথবা ভবিতব্য কে লঙ্ঘন করিবে? হয় ত আবার এই খানেই ভবিতব্য আছে! যে মুহূর্ত্তে তিনি ঐ কথাগুলি মনে করিয়াছেন, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই কোথা হইতে শব্দ আসিল, "সখি, এদিকে এদিকে!" হাঁ, বাস্তবিক, ভবিতব্যের দ্বার এ দিকেই বটে!

(ক্রমশঃ)

শ্রীদেবেশ্বর মুখোপাধ্যায়।

মেডিকেল কলেজ।

ভারতে ইংরেজরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ক্লাইবের সময় এদেশে কোনরূপ বিধি বিধানের উদ্যোগ অনুষ্ঠান হয় নাই; তাঁহাকে কেবল রাষ্ট্রবিদ্রোহাদি লইয়াই বিড়ম্বনায় দিনযাপন করিতে হইয়াছিল। তবে বাদসাহের চিকিৎসাকালে বিলাতী ডাক্তারের চিকিৎসার ব্যবস্থা হইলেও, তাহা সাময়িক ও কেবল সম্রাট্‌সংক্রান্ত ব্যাপারেই সম্বদ্ধ ছিল। অতুলমনস্বী ইংরাজসাম্রাজ্যের দৃঢ়ীকরণ সম্বন্ধে প্রধান সাধক ওয়ারণ হেষ্টিংশের সময়ে ইংরেজার্জ্জিত বা নব-

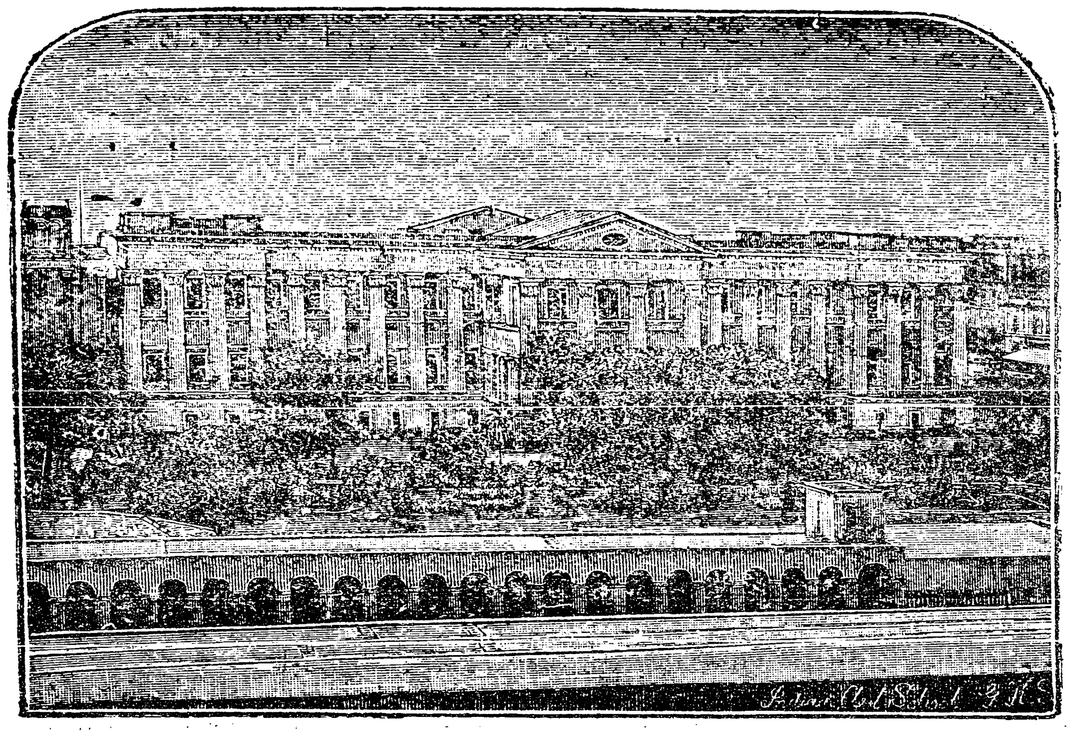

ব্যবস্থায় গৃহীত রাজ্যমধ্যে নূতন বিধিবিধানের—সংহিতাদিপ্রণয়নের—উদ্যোগ অনুষ্ঠান হয়। তখনও কিন্তু দেশীয় লোকের সহিত ইংরেজদিগের কোনরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মিলনজন্য অনুরাগ বা সহানুভূতি দৃঢ় হয় নাই; দেশীয়গণও যেন শ্বেতকায় হইতে স্বতন্ত্র থাকিলেই, শান্তির অনুভবে সমর্থ! ইহা কিন্তু প্রায়শঃ দৃষ্টিগোচর হইলেও, তৎকালিক বিশিষ্ট বাঙ্গালীদিগের সহিত হিন্দু মুসলমানের সহিত—মহীয়ান্ ওয়ারণ হেষ্টিংশ বেশ মিলিয়া মিশিয়া সুবিধির ব্যবস্থাপনের জন্য একান্ত আবশ্যক ও উপযোগী বলিয়া স্থির করায়, তাঁহাদিগের সাহায্য লইয়াছিলেন। এখনও কলিকাতা টাউন-হলের সম্মুখে ওয়ারণ হেষ্টিংশের মূর্ত্তির একপার্শ্বে হিন্দু, অপর পার্শ্বে মুসলমান—উভয়জাতিকে দক্ষিণ ও বামহস্তরূপে মনে করিয়া, বিধিব্যবস্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন,তাহা যেন প্রত্যক্ষতঃ দেখা যায়। তাঁহার সেই বিধি ব্যবস্থা আজও বর্ত্তমান—সেই মহাত্মার ব্যবস্থাপিত বিধির—সংহিতা-নিহিত বিধানের—আংশিক সংস্কারাদি হইলেও, ইহার অস্থি মজ্জা কেন—প্রাণ সেই মহাত্মার নিকট হইতে লব্ধ। সমস্তই হেষ্টিংশের সৃষ্ট! পাশ্চাত্য-শিক্ষা-বিধানের বিস্তৃতির প্রতি তাঁহার আকাঙ্ক্ষা থাকিলেও, দেশকালপাত্রের অনুকূলতার অভাবে তাঁহার উদ্যম বিফল হয়। পরে লর্ড হেষ্টিংশ বা ময়রার সময় ভারতীয় শিক্ষাবিভাগের প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়। এদেশে মিশানারীগণের অত্যাচার উপদ্রব আরম্ভ হইলে, অশান্তির সম্ভাবনা বুঝিয়া,

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মিশনারীগণকে স্বাধিকৃত স্থান হইতে বিতারিত করেন; তাঁহারা শ্রীরামপুরে ডচঅধিকারে গিয়া, শিক্ষার ফাঁদে লোক ধরিবার উদ্যোগ অনুষ্ঠান করেন সত্য, কিন্তু তাহার প্রসার প্রতিপত্তির বৃদ্ধি হইতে অনেকবিধ অন্তরায় ঘটে। পরন্তু ময়রার অধিকার-কালে পাশ্চাত্য শিক্ষার কথঞ্চিৎ অনুকূল সময়ের আবির্ভাব হয়। তাই তাৎকালিক শিক্ষা-বিধানের চেষ্টা চরিত্রে বেশ ফল হইয়াছিল। সেই সময়ে মহাত্মা হেয়ার প্রমুখ অনেক বিজ্ঞ ইংরেজ মহাপুরুষ এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুকূল চেষ্টায় ব্রতী হইয়া, সবিশেষ সিদ্ধি লাভে সমর্থ হন। এই উদ্যমের সঙ্গে সঙ্গে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। তখনও পাশ্চাত্য মতে চিকিৎসা-শাস্ত্র-শিক্ষা দিবার উদ্যোগ অনুষ্ঠান হয়; কিন্তু বিশিষ্ট ফল হয় নাই। পরে পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণে ক্রম-পরিবর্ত্তনের সহিত এতৎপ্রতি লোকের আগ্রহ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। হিন্দুদিগের শল্যতন্ত্রে শবব্যবচ্ছেদে ব্যবস্থা থাকিলেও, পাশ্চাত্য জাতির আগ্রহ সত্ত্বে তৎপ্রতি অনুকূলদৃষ্ট কাহারই পতিত হইল না। তখন ছাগশরীরের ব্যবচ্ছেদ করিয়া, শারীরতত্ত্বের শিক্ষা দিবার উদ্যোগ অনুষ্ঠান হয়। ইহার কিছুদিন পরে—বেণ্টিকের রাজত্বকালে—৺মধুসূদন গুপ্ত প্রথম চিকিৎসা-বিদ্যালয়ের—শবব্যবচ্ছেদালয়ে প্রবেশ করেন, এবং তাঁহার এই প্রবেশের জন্য, তাৎকালিক সহৃদয় গবর্ণমেণ্টের আনন্দসূচক তোপধ্বনি হয়। ইহার পর হইতে পাশ্চাত্য চিকিৎসার—ডাক্তারীর প্রসার প্রতিপত্তি চারিদিকে বৃদ্ধি পাইতে থাকে; মধ্যে দেশে ডাক্তারীর অতুল প্রভাবে দেশীয় চিকিৎসক কবিরাজগণের ব্যবসায়ের সঙ্কোচ হইয়াছিল। লর্ড ডালহৌসির সময়ে শিক্ষাবিভাগের আরও উন্নতির সহিত মেডিকেল কলেজের উন্নতি হয়। তাঁহার চেষ্টায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে, মেডিকেল কলেজের শিক্ষা-প্রণালীর সংস্কার ও আপেক্ষিক উৎকর্ষ সাধন হইয়াছিল। বর্ত্তমান মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা হয়, ১৮৫৭ সালে—সিপাহীবিদ্রোহের অবসানে। ১৮৫৯ সাল হইতে ইহার ছাত্রগণ উপাধিভূষণে ভূষিত হইয়া, রাজসাহায্যে—বিশিষ্টরূপ প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন। তদবধি এদেশে পাশ্চাত্য-চিকিৎসা-তত্ত্বের শিক্ষার ও চিকিৎসার প্রসার বৃদ্ধিতে সাধারণের মহোপকার সাধিত হইয়াছে।

কবিরাজ শ্রীঅঘোরনাথ শাস্ত্রী।

কবিকেশরী।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের এক পরিচ্ছেদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

যে যেরূপে পারিল, এইরূপে কলিকাতা সহর ত্যাগ করিয়া গেলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের লাঞ্ছনার ভাগ্য খণ্ডিল না। শিয়ালদহ ও হাবড়া রেলওয়ে ষ্টেশনে, গঙ্গার ঘাটে, ষ্টীমার ষ্টেশনে তাহাদের লাঞ্ছনার একশেষ হইয়াছিল। ষ্টেশন সমূহে প্যাসেঞ্জারের জনতার জন্য কত শ্বেতপুঙ্গবের সুমধুর রুলের গুঁতা ও বেত্রাঘাত কত লোককে যে বেমালুম সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহার আর ইয়ত্তা নাই।

এইরূপ সূচীভেদ্য জনতার মধ্যে টিকিট ক্রয় করা যে কিরূপ দুরূহ ব্যাপার, তাহা সহজেই অনুমেয়। কোনরূপে টিকিটখানা ক্রয় করিতে পারিলেই "ত্রাহিমাং মধুসূদন" বলিয়া গাড়ীতে উঠিয়াছিল। প্রদত্ত টাকার যত কম মূল্যের টিকিট হউক না কেন, তাহার অবশিষ্ট পয়সা ফেরত লইবার অবসরটুকু পর্য্যন্ত তাহাদের সহিল না। টিকিটখানা হাতে পাওয়া মাত্র দৌড়িয়া গিয়া গাড়ীতে উঠিয়া হাঁফ ছাড়িয়া ছিলেন। এমনও শুনা গিয়াছিল যে, দুই একটী গর্ভবতী নারী গঙ্গার অপর পারে গিয়া এই দারুণ ত্রাশে অকালেই সন্তান প্রসব করিয়াছিল।

এ সকল অদ্ভুত ঘটনা লোকমুখে দেশদেশান্তরে অতিরঞ্জিত হইয়া প্রচার হইতে লাগিল। রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা নগরবাসীগণের ঈদৃশ দুর্দ্দশার কথা শ্রবণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি পুত্র কন্যাদিগকে বোলপুরে রাখিয়া ত্বরায় প্লেগ-সংক্রামিত সহরে উপস্থিত হইলেন। লোকে ঘরবাড়ী ত্যাগ করিয়া সহর ছাড়িয়া যখন দেশ দেশান্তরে পলায়ন করিতেছে—সেই সময়ে তেজপুঞ্জ রবীন্দ্রনাথ প্লেগ সংক্রামিত সহরে নির্ভয় হৃদয়ে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার সমস্ত জীবন-বৃত্তান্ত আলোচনা করিলে দেখা যায়, তাঁহার জীবনের অধিকাংশ ঘটনাই এইরূপ অসীম সাহসিকতায় পূর্ণ।

একটু পরের কথা বলি। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জমিদারী নদিয়া জেলার অন্তর্গত বিরাহিমপুরে অবস্থিতিকালে এক সময়ে তথায় বিসূচিকা রোগের ভয়ানক প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। তাঁহার কুঠীর চারিপার্শ্বে জমিদারী কাছারীর চারিদিকে বিস্তর লোক প্রতিদিন কালকবলে পতিত হইতেছিল। কোন কর্ম্মচারীর এক নিকটআত্মীয়ের মৃত্যু হওয়ায় নায়েব পেস্কার প্রভৃতি অধিকাংশ

আমলাগণ রবীন্দ্রনাথের নিকট বিদায় লইয়া যথেচ্ছ গমন করিল। তাঁহার ভৃত্যবর্গ দুর্ঘটনায় ত্রাসযুক্ত হইয়া তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। তিনি নির্ভয়ে অটল হইয়া পুত্র কন্যা শিশুসন্তান সহ তথায় বাস করিতে লাগিলেন। এবং দুই বেলা কাছারীর অবশিষ্ট আমলাদিগের বাসায় গিয়া তাহাদের সাহস ও সান্ত্বনা দিয়া আশ্বস্ত করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ স্বাধীন পুরুষ, ইচ্ছা করিলে নিরন্তর সুখময় স্থানেই থাকিতে পারেন। কেবল নিরন্তর অবিকারী গুণপ্রভাবে তেমন মৃত্যু বিভীষিকার মধ্যে অচল ছিলেন। তাঁহার এই প্লেগক্ষেত্র আর একটী কর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া প্রতীতি হইল।

রবীন্দ্রনাথ প্লেগব্যাপ্ত সহরে যখন প্রবেশ করেন, তখন কলিকাতা সহরে মহা হৈ চৈ পড়িয়াছিল। সকলেই প্লেগের কথা, প্লেগ আইন, প্লেগের টীকা, করেনটাইন ল প্রভৃতির মহা আন্দোলন করিতেছিল। প্লেগ সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, রাজ আইন বড় কঠোর হইবে—পীড়ার উপর আরো পীড়া জন্মিবে, যমরাজ সমাহূত হইয়া ত্বরার উপর আরো ত্বরা করিয়া আসিবেন, এই আতঙ্কে সহরবাসীদিগের অন্তরাত্মা শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় আসিয়া দেবতুল্য পিতার শরীর-রক্ষার্থে প্রথমে মনোনিবেশ করিলেন। রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা তাঁহার পিতার তেজোবল অত্যন্ত অধিক; যেহেতু তাহা ব্রহ্মবল সমন্বিত। পিতৃভক্তি, পুত্রবাৎসল্য, সকলের উপর সর্ব্ববিজয়ী চিত্তের নির্ভীকতা প্রবল হইল। রবীন্দ্রনাথের পরিবারের কেহ কোথাও নড়িলেন না। কবিকেশরী কেশরী বিক্রমেই প্লেগ নিবারণের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ব্যবস্থা সকল অবলম্বন করিলেন। তাঁহার দ্বারা তাঁহার পরিজনের সহিত বন্ধুবর্গও প্রচুর সাহস ও রোগ নিবারণ শক্তি জন্মিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু।

বাঙ্গালাভাষার লেখক।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

বিপিনবিহারী রক্ষিত। পিতা—৺হরিদাস রক্ষিত; পিতামহ ৺নিত্যানন্দ রক্ষিত; প্রপিতামহ ৺বৈষ্ণবচরণ রক্ষিত; বৃদ্ধ প্রপিতামহ ৺রামনারায়ণ রক্ষিত। সাং মজিলপুর, জয়নগর পোষ্ট, ২৪ পরগণা—কলিকাতার দক্ষিণ। সম্ভ্রান্ত কায়স্থ; দ্বাদশপুরুষ মজিলপুরে বাস; "তেলে"র রক্ষিত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

সুকবি শ্রীমান বিপিনবিহারী,—এই প্রবন্ধের লেখক, শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিতের কনিষ্ঠ সহোদর। ভাইয়ের নিকট ভাই,—চিরদিন স্নেহভাজন; স্নেহচক্ষে সকলই সুন্দর বোধ হয়। সুতরাং বিপিনবিহারীর সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা আমি যাহা লিখিব, তাহা হয় ত কাহারও কাহারও ভাল না লাগিতে পারে। কিন্তু কি করিব, আমি যে, এই কার্য্যের ভার লইয়াছি।

তা বিপিনবিহারীর জীবন-কথা লিখিবার পূর্ব্বে,—বিপিনবিহারীর, তথা এই প্রবন্ধ লেখকের পুণ্যাত্মা পিতৃপুরুষগণের কাহিনী কিঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ করিব, মনে করিয়াছি।

স্বর্গীয় হরিদাস রক্ষিত মহাশয়,—এই লেখকের পিতৃদেব,—দয়া-ধর্ম্ম-বাৎসল্যের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন। পরের দুঃখমোচনে, পরোপকার-ব্রতে তিনি জীবন ধন্য করিয়া গিয়াছেন। ধনীর সন্তান ছিলেন, নিজেও ধনবান্ ছিলেন, কিন্তু নিষ্ঠুর নিয়তির ছলনায়, শেষদশায় বড় কষ্ট পাইয়াছিলেন। পরন্তু সেই কষ্টেই তাঁহার হৃদয়ের মহত্ত্ব ও উদারত্ব অধিকরূপে প্রকটিত হইয়াছিল। তাঁহার সেই মহৎ আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করিলে, চক্ষে জল আইসে।—এখনও মজিলপুর জয়নগর প্রভৃতি দক্ষিণ অঞ্চলের লোকে তাঁহার গুণগান করিয়া, তাঁহার স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের মহত্ত্ব কীর্ত্তন করিয়া, এই অধম প্রবন্ধ-লেখককে,—কত-স্নেহ-আশীর্ব্বাদ করে, সান্ত্বনা ও প্রবোধ দেয়। পুণ্যাত্মা পিতার পুণ্যকাহিনী শুনিয়া, তাঁহার এই অকৃতী পুত্র, অনেক সময় চিত্ত স্থির করে, লক্ষ্যপথে মন দৃঢ় করে, কর্ত্তব্য কর্ম্মে অধিকতর উৎসাহিত হয়;—পক্ষান্তরে—নীচতা, কপটতা, স্বার্থের মলিনতা, হিংসা-দ্বেষ-বক্রতা এবং সত্য ন্যায়বিগর্হিত কার্য্যে ঘৃণা করিয়া থাকে। কিন্তু এ অধম যে, সকল সময় পিতৃদেবের সেই মহৎ আদর্শ গ্রহণ করিতে পারে,—তাঁহার পদানুসরণ করিয়া সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করিতে সক্ষম হয়,—তাহা নহে; তাহা হইলে মিথ্যা কথা বলা হয়;—তবে তাঁহার ধ্যান-ধারণায়, অনেক সময়, চিত্তের লঘুতা হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে সক্ষম হয় বটে।

স্বর্গীয় হরিদাস রক্ষিত মহাশয় লোক-প্রিয়, লোক-প্রতিপালক, দয়াবান, ধর্ম্মনিষ্ঠ, মহানুভব ব্যক্তি ছিলেন। বিষয়বুদ্ধি তাঁহার প্রখর ছিল না,—কিন্তু ধর্ম্মবুদ্ধি ও পরোপকারে ও আত্মত্যাগে তিনি অনেকের হৃদয় অধিকার করিতে পারিতেন,—অনেকেই তাঁহাকে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত হৃদয়াসনে বসাইতেন। তাঁহার পরোপকার-ব্রতের একটি মাত্র কাহিনী এখানে উল্লেখ

করিব;—তাহা হইতে সহৃদয় পাঠক তাঁহাকে চিনিয়া লইবেন। আমাদিগের পৈতৃক বিষয়-আশায় যখন যাইতে বসিয়াছে,—কমলা যখন আমাদের প্রতি বিরূপা হইয়াছেন,—সেই মলিন অবস্থায়, একদিন দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁহার দৈন্যদশা জ্ঞাপন করিয়া, মদীয় পিতৃদেবের নিকট কিছু প্রার্থনা করিলেন; পিতৃদেব তখন শৌচকার্য্যাদির জন্য বাহিরে যাইতেছিলেন, হস্তে জলপূর্ণ একটি লোটা ছিল;—ব্রাহ্মণের দুঃখ-কাহিনী শুনিয়া, তিনি একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আজ আমার নিজের সংসারেরই কোন সম্বল নাই,—তাহাতে পয়সাও নাই,—তা তুমি এই ঘটিটি লইয়া যাও; ইহার বিনিময়ে কিছু পাইতে পারিবে।" এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ সেই ঘটি হইতে জলটুকু ফেলিয়া দিয়া সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের হস্তে, সেই ঘটিটি দিলেন।—এ দৃশ্য আমি স্বয়ং স্বচক্ষে দেখিয়াছি; তখন আমি ৮।৯ বৎসরের বালক মাত্র; তথাপি বেশ মনে আছে, সে দৃশ্যে আমার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়াছিল; আমার চক্ষে জল আসিয়াছিল। আজিও যেন সে দৃশ্য চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি এবং আজিও সে দৃশ্য স্মরণ করিয়া আমি রোমাঞ্চিত হই। উপস্থিত এই মুহূর্ত্তেও আমি পিতৃদেবের সেই সুঠাম সুন্দর পুণ্যময় সৌম্যমূর্ত্তি দেখিয়া,—পরদুঃখকাতর সে প্রেম-প্রবণ হৃদয়ের মাধুর্য্য উপলব্ধি করিয়া, ভক্তি ও বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইতেছি। এই একটিমাত্র কাহিনী বলিলাম; এমন অনেক কাহিনী আজিও লোকমুখে শুনিতে পাই; শুনিয়া অশ্রুসম্বরণ করিতে পারি না। সেই পিতার পুত্র আমি ও শ্রীমান বিপিনবিহারী;—আমাদের সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা, বোধ করি, ইহাতেই শেষ হইতে পারে। বড় সৌভাগ্যের বিষয়, আমার পূজনীয়া মাতৃদেবীও, সর্ব্বাংশে আমার পিতার অনুরূপা। তাঁহার স্নেহ, মমতা, সরলতা, দয়া, দান,—সর্ব্বাংশেই পিতৃদেবের যোগ্য। লোক-জনকে খাওয়াইতে, পাঁচজন লইয়া থাকিতে, পাঁচজনকে প্রতিপালন করিতে ও আশ্রয় দিতে, এখনও—এই মধ্যবিত্ত অবস্থায়ও তিনি সমুৎসুক। দেব-দ্বিজের প্রতি তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা। মন এত সরল ও পবিত্র যে, একালে অনেক সংসার খুঁজিয়াও তাহা দেখিতে পাই না। মা,—আমাদের সুখে দুঃখে সহায়। তিনি না থাকিলে যে, আমরা কি হইতাম, তাহা বলিতে পারি না।

আমার জ্যেষ্ঠতাত স্বর্গীয় বিশ্বম্ভর রক্ষিত মহাশয়ও একজন সদাচারসম্পন্ন, নিষ্ঠাবান্ ক্রিয়াবান্ সেকালের বর্দ্ধিষ্ণু হিন্দু-গৃহস্থ ছিলেন। দেব-দ্বিজে ইহাঁদের উভয় ভ্রাতারই বিশেষ অনুরাগ ও শ্রদ্ধা ছিল। পুরুষানুক্রমে ইহাঁরা ধর্ম্মভীরু,

ঈশ্বর-বিশ্বাসী বলিয়া লোক-সমাজে সম্মানিত, এবং কোথাও কোথাও সম্পূজিত। ধনবান্, বিদ্বান, বষয়ী ইহাঁদের সমান—ওদেশে অনেক ছিলেন, ইহাঁদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠও অনেক ছিলেন এবং এখনও আছেন,—কিন্তু ইহাঁদের ন্যায় স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, ঈশ্বরভক্ত, পরোপকারী ব্যক্তি তখনও অল্প ছিল; এখনও অতি অল্প পরিদৃষ্ট হয়।

বিশেষ, রক্ষিত বংশের ব্রাহ্মণ-ভক্তি—দক্ষিণ অঞ্চলে একরূপ প্রবাদবাক্যের মধ্যে পরিগণিত। স্বর্গীয় বিশ্বম্ভর রক্ষিত,—এই প্রবন্ধ লেখকের জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়,—এক দিন আপন মহাল হইতে কর্ম্মচারী সমভিব্যাহারে খাজনা লইয়া আসিতেছেন; পথিমধ্যে দেখিলেন, এক ব্রাহ্মণ দেনার দায়ে, গভর্ণমেণ্টের লোক কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হইয়া যাইতেছে;—এ দৃশ্য দেখিবামাত্র, ব্রাহ্মণ-ভক্ত জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়, তৎক্ষণাৎ সেই খাজনার সমুদয় টাকা দিয়া, এবং বাকী টাকা গৃহে আনিয়া দিয়া, ব্রাহ্মণকে উদ্ধার করিলেন। অবিলম্বে গ্রামে এ শুভ-সংবাদ রাষ্ট্র হইল,—গ্রামবাসিগণ অমনি ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন।

পৈতৃক গৃহদেবতা কৃষ্ণ-রায়ের যুগলমূর্ত্তির উপর ইহাঁদের দুইভাইয়ের অচলা ভক্তি ছিল। ইহাঁদের কেহ কখন স্বপ্ন দেখিতেন,—গ্রীষ্মকালে কৃষ্ণরায়ের ছোলা-গুড় নিয়মিতরূপে নিবেদন করা হইতেছে না;—তৎক্ষণাৎ আহার সন্ধান হইত,—সন্ধানে স্থির হইত, স্বপ্ন সত্য বটে,—অমনি ইহাঁরা তাহার সমুচিত ব্যবস্থা করিতেন। কোন দিন বা ইহাঁদের কাহারও মনে হইত, ঠাকুরের ছানা চিনি খাইতে সাধ হইয়াছে; অমনি গয়লা প্রজাদের উপর হুকুম হইত; ভার ভার ক্ষীর-ছানা আসিয়া মজুত হইত এবং যথাকালে তাহা ঠাকুরকে নিবেদন করা হইত। মাতৃদেবীর মুখে শুনিয়াছি,—একবার পিতৃদেব মহাল হইতে অনির্দ্দিষ্ট সময়ে গৃহে ফিরিয়া আইসেন, তাঁহার সঙ্গে লোক-স্কন্ধে স্তূপাকার শ্যামসড়া ইক্ষু। জিজ্ঞাসায় পিতৃদেব বলিলেন,—"হঠাৎ একদিন দ্বিপ্রহরে, আমাদের গৃহদেবতা কৃষ্ণরায় ঠাকুর আমার পৃষ্ঠদেশে করাঘাত করিয়া বলিলেন, "আমার শ্যামসড়া আখ খাইতে ইচ্ছা হইয়াছে;—তুই এখানে বসিয়া মাথামুণ্ডু কি করিতেছিস?" পিতৃদেব,—তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়া,—আমার জেঠাই মাকে—তাঁহার পৃষ্ঠদেশ দেখাইয়া বলিয়াছিলেন,—"দেখ, আমার পিঠ এখনও ফুলিয়া আছে।" এইরূপ এবং আরও অনেকরূপ গল্প আমরা শুনিতে পাই। ফলতঃ ইহাঁরা যে, পুরুষানুক্রমে পরম-ধার্ম্মিক, পরম বৈষ্ণব ও পরম ঈশ্বরভক্ত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।

বেলুনে-যুদ্ধ।

(শ্রাবণ সংখ্যার পর)

ডিক্ ও ডাক্ এক আশ্চর্য্য রকমের মানুষ; সার্কাস শুদ্ধ লোক যখন তাহাদের প্রশংসা করে, তাহাতেও তাহারা উল্লসিত হয় না, যখন তাহারা কোন একটা ব্যায়াম প্রদর্শন করিলে সকলে সমস্বরে আনন্দ ধ্বনি করিয়া উঠে, তাহাতেও তাহারা ভ্রূক্ষেপ করে না। কাজ করিতে হয়, তাই তাহারা কাজ করে; সার্কাসে ক্রীড়া দেখাইতে হয়, তাই তাহারা ক্রীড়া দেখায়—কিন্তু না ছিল তাহাদের কোন উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, না ছিল তাহাদের মুখে একটী কথা। দুই জন সারাদিন নীরবে বসিয়া থাকিত; আহাদের সময় আহার করিত, বিশ্রামের সময় বিশ্রাম করিত, কাজের সময় কাজ করিত—সম্পূর্ণ নির্ল্লিপ্তভাবে তাহারা এত বড় একটা সার্কাসের দলে রহিয়াছে।

লংম্যান কতদিন তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কিন্তু তাহারা কিছুই উত্তর দেয় না, বড় পীড়াপীড়ি করিলে বলে, "আমাদের বাড়ী নাই, আমাদের বাপ মা নাই; আমরাই দুই ভাই আছি। যাহা নাই, যাহা চলিয়া গিয়াছে, তাহার পরিচয় কেন?" লংম্যান চুপ করিয়া যাইতেন। এমন রহস্যময় যুবকদ্বয় তাঁহাকে অধীর করিয়া তুলিয়াছিল; এ দিকে যতই তাঁহার সার্কাসের পসার বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ততই তাঁহার মনে অশান্তির উদ্রেক হইতে লাগিল; অজ্ঞাতকুলশীল দুইটী যুবকের উপর তাঁহার সমস্ত প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠিত; আজ যদি তাহারা তাঁহার দল ছাড়িয়া দেয়, তাহা হইলেই ত তাঁহার সর্ব্বনাশ। কিন্তু লংম্যান কিছুতেই এই আশ্চর্য্য যুবককদ্বয়ের মন পাইতেছেন না, নিজের কন্যা নেটা হইতেও তাহাদিগকে তিনি অধিক আদর করেন, সর্ব্বদা তাহাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকেই তাঁহার নজর; কিন্তু কিছুতেই তাহাদের মন গরম ও হয় না, নরমও হয় না। এত বড় একটা সার্কাস কোম্পানীর অংশীদার করিবেন বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন, কিন্তু যুবকদ্বয় তাহাতে হাঁ, কি না, কিছুই বলিল না। ইহাদের ব্যবহার দেখিয়া লংম্যান ক্রমেই আশ্চর্য্যান্বিত হইতে লাগিলেন।

অবশেষে লংম্যান স্থির করিলেন যে, ইহাদের একজনের সহিত তাঁহার প্রাণসমা দুহিতা নেটার বিবাহ দিয়া তাহাকে আটক করিবেন। কিন্তু কাহার সহিত নেটার বিবাহ দেন। ডিক্ ও ডাক্ দুই জনেই সমান;

দুই জনেরই সমান ক্ষমতা; দুই জনেই এক বয়সী, দুই জনেরই অনিন্দ্য-সুন্দর কান্তি। কাহাকে ফেলিয়া কাহাকে ধরিবেন। বিশেষ দুই জনে এমন ভাব যে, কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া থাকিতে চাহে না। দুই জনের সঙ্গে ত আর নেটার বিবাহ দেওয়া চলে না—শাস্ত্রেও তাহা লেখে না। ফরাসী শাস্ত্রের যদি তাহা লেখা থাকিত, তাহা হইলে লংম্যান অনায়াসে তাহাও করিতে পারিতেন।

কয়েকদিন পর্য্যন্ত লংম্যান এই চিন্তাতেই ব্যাকুল থাকিলেন; শেষে স্থির করিলেন, ডিকের নিকটই এই প্রস্তাব করা যাউক।

একদিন সার্কাসের ক্রীড়া প্রদর্শন শেষ হইলে, তিনি ডিক্‌কে নিকটে ডাকিলেন; দুই জনেই উপস্থিত হইল। লংম্যান বলিলেন, "ডিকের সঙ্গেই আমার দরকার। ডাক, তুমি বিশ্রাম-গৃহে গমন কর।"

ডাক নড়িল না, যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সেইখানেই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

লংম্যান বিষম বিপদে পড়িলেন, সে দিন আর কিছু বলা হইল না; যুবকদ্বয় স্বস্থানে চলিয়া গেল।

লংম্যানের বুদ্ধি এদিক দিয়া খাটিল না; শেষে তিনি এই দুরূহ কার্য্যে তাঁহার বুদ্ধিমতী কন্যা নেটাকে নিযুক্ত করিতে সঙ্কল্প করিলেন।

একদিন অপরাহ্নে নেটাকে ডাকিয়া লংম্যান বলিলেন, "দেখ নেটা, আমার ইচ্ছা যে, তোমার বিবাহ দিই। এতদিন ভাল ছেলে পাই নাই, তজ্জন্য আমার ইচ্ছা সম্পন্ন হয় নাই। এখন আমি মনের মত বর পাইয়াছি। কাহার কথা বলিতেছি, বুঝিয়াছ? আমার ইচ্ছা যে, তুমি ডিক্, কি ডাক্, এই দুই জনের একজনকে বিবাহ কর এবং ইহার মধ্যে যাহাকে তোমার মনে ধরে, তাহাকেই বেশী যত্ন করিতে আরম্ভ কর, তাহার হৃদয় আকৃষ্ট করিবার জন্য চেষ্টা কর।"

নেটা অবনত মুখে সমস্ত কথা শুনিল; শেষে অতি ধীরে বলিল "দেখিব"

এখন ডিক্ ও ডাকের কথা একটু বলিতে হইতেছে। সামো সহরে যখন লংম্যান সাহেবের সার্কাস প্রথম আসে, সেই সময়ে একদিন ডিক্ ও ডাক্ তাহাদের গৃহ হইতে সার্কাস দেখিতে আসে। তাহারা যে গ্রামে বাস করিত, সে গ্রামের লোকেরা বড় একটা কেহ সহরে আসে না—তাহারা

দুই ভাই গ্রামের মধ্যে চালাক চতুর জন্য তাহারা সামো সহরে সার্কাস দেখিতে আসিয়াছিল। সেই দিন তাহাদের প্রথম সার্কাস দর্শন—আর কখনও তাহারা ইহা দেখে নাই; তবে পল্লীগ্রামের যুবক; তাহারা নিজের গ্রামে বসিয়া কত রকম কুস্তি করিত। এই সার্কাসের ক্রীড়া কৌতুক দেখিয়া তাহারা তেমন আনন্দ বোধ করিল না—তাহারা আনন্দ বোধ করিল, সুসুরী, লংম্যান-দুহিতাকে দেখিয়া। দুই ভাই অনিমেষ-নেত্রে সেই কিশোরীর রূপসুধা পান করিতে লাগিল; তাহারা যেন ঐ রূপ সাগরে ডুবিয়া গেল। নেটা যেমন রূপবতী, তেমনি খেলোয়াড়; একাধারে রূপ ও গুণের সমাবেশ দেখিয়া তাহারা আত্মহারা হইয়া গেল।

সার্কাস শেষ হইয়া গেল। দুই ভাই ধীরে ধীরে বাহিরে আসিল। দুই জনের হৃদয়েই তখন নেটার রূপ জাগ্রত।

ডিক্ জিজ্ঞাসা করিল, "ডাক্, এখন কোথায় যাইব?"

ডাক।—চল, একটা হোটেলে যাই; সেখানেই আজ রাত্রি কাটাইব। আচ্ছা, সার্কাস কেমন দেখিলে?

ডিক্।—যে সকল খেলা দেখাইল, তাহা অপেক্ষা ভাল খেলা আমরাও দেখাইতে পারি। কিন্তু ঐ মেয়েটী—কেমন সুন্দর রূপ, কেমন খেলিবার কায়দা।

ডাক্।—আমিও তাই ভাবিতেছি। উহাকে পাইলে আমি পৃথিবীতে আর কিছুই চাহি না।

ডিক্।—আমারও সেই মত। আমিও ঐ মেয়েটীর রূপ দেখিয়া পাগল হইয়াছি। দেখ ডাক্, কি করিয়া ঐ মেয়েটীকে হস্তগত করা যায়। আমি উহাকে নিশ্চয়ই বিবাহ করিব—এই আমার প্রতিজ্ঞা।

ডাক্।—সে কি কথা তুমি বলিতেছ, ঐ মেয়েটীকে আমি বিবাহ না করিয়া ছাড়িব না। কা'লই আমি সার্কাসের দলে প্রবিষ্ট হইব এবং যে করিয়া পারি, ঐ কিশোরীকে বিবাহ করিব।

ডিক্ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিল; তাহার পর বলিল, "দেখ, ডাক্, তুমিও ঐ মেয়েটীর রূপে মুগ্ধ, আমিও তাই। এখন উপায়?"

ডাক্।—উপায়—তুমি উহার আশা ত্যাগ কর। আমি সার্কাসে যাই, তুমি দেশে চলিয়া যাও। আমি ঐ মেয়েটীকে বিবাহ করিয়া ঘরে ফিরিব।

ডিক্।—তাহা কখনই হইবে না। তুমি ঘরে যাও, আমি ঐ মেয়েটীকে বিবাহ করিয়া ঘরে ফিরিব।

এই ব্যাপারের পর দিনই দুই ভাই কি পরামর্শ করিয়া এক সঙ্গে লংম্যানস্‌সাহেবের সার্কাসে কর্ম্মপ্রার্থীরূপে উপস্থিত হইল। (ক্রমশঃ)

শ্রীজলধর সেন।

নভেলের-নায়িকা।

নভেল কি?—নভেল ইংরাজী কথা। বাঙ্গালায় নভেল মানে—উপাখ্যান অথবা উপন্যাস। এ দেশে ইংরাজী লেখাপড়ার চর্চ্চা হওয়াতে আজকাল এ দেশে নভেলের যেমন ছড়াছড়ি হইয়াছে, পূর্ব্বে এতটা ছিল না। যাঁহারা নভেল করেন, তাঁহাদের সংস্কারও প্রকপ্রকার নভেল। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বলেন, ইংরাজ আমলের পূর্ব্বে বঙ্গদেশে নভেলের অস্তিত্ব ছিল না।

এই হাস্যকর কথা লইয়া আলোচনা করিতে আমাদের ইচ্ছা নাই। এ দেশে অনেক নভেল ছিল। নাম ছিল না নভেল, প্রকৃতিও আশ্চর্য্য ছিল না, ইংরাজী নভেলের ন্যায় সর্ব্বাংশে অদ্ভুত রসাশ্রিত না থাকুক, অনেকগুলি মনোরঞ্জন উপাখ্যান আজিও আমরা দেখিতে পাই। সংস্কৃত ভাষায় কাদম্বরি একখানি অপরূপ উপন্যাস। মধ্যে মধ্যে কতকগুলি অত্যন্ত অলৌকিক তত্ত্ব বিদ্যমান থাকিলেও, কাদম্বরির উপাখ্যানটী অতি চমৎকার। এখন যাঁহারা ইংরাজী পড়িতেছেন, কাদম্বরিকে অস্বাভাবিক বলিয়া তাঁহাদের অনেকেই উপহাস করেন। যাঁহাদের অন্তরে কিছুমাত্র সার আছে, উপন্যাসের ভাব রস বিচারে যাঁহাদের অধিকার আছে, কাদম্বরির নামে তাঁহারা অশ্রুপাত করেন। সাহিত্যবন্ধু বঙ্কিম বাবুকে একপ্রকারে আধুনিক বঙ্গীয় নভেলের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়; সেই সুবিজ্ঞ বিচারক কদাচ কাদম্বরির ন্যায় উৎকৃষ্ট উপন্যাসকে উপহাসাস্পদ বলেন নাই। যাঁহারা বিচার জানেন, তাঁহারা কেহই প্রকৃত গুণের অপলাপ করেন না।

নভেল লিখিতে হইলেই নায়ক-নায়িকা দরকার। এখনকার ইংরাজী ধরণে যে সকল নভেল প্রস্তুত হইতেছে, তাহার এক একটি অঙ্গ অতিশয়

অদ্ভুত; সত্য সত্যই অদ্ভুত! নায়িকাদের ঘন ঘন মূর্চ্ছা! বাঙ্গালা নাটকে যেমন অঙ্কে অঙ্কে—গর্ভাঙ্কে গর্ভাঙ্কে ঘন ঘন পতন ও মূর্চ্ছা দেখিতে পাওয়া যায়, নভেলেও সেইরূপ। কেন ঘন ঘন এত মূর্চ্ছা হয়, এ দেশের লোকে পূর্ব্বে সেটা জানিতেন না, শকুন্তলা নাটকে রাজা দুষ্মন্তের সহিত তপোবনে শকুন্তলার প্রথম দর্শনে নূতন, অনুরাগের সঞ্চার, সেই সঞ্চারে শকুন্তলার বিভ্রান্ত ভাব। কালিদাসের লিপি চাতুরীর এই দৃষ্টান্ত দেখাইয়া এখনকার এক একজন নভেল-লেখক বলেন, সত্য অনুরাগ সঞ্চারে, হতাশের আশঙ্কায় অথবা কোন প্রকার বিপদের সম্ভাবনায় কামিনীগণের মূর্চ্ছা অতি সুন্দর হয়। যুক্তিটা ঠিক্ বটে! শকুন্তলার মূর্চ্ছা এখনকার থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চে ধুপ করিয়া পতনের ন্যায় অস্বাভাবিক নহে?—সে যে কি বিমুগ্ধ ভাব, তাহা কল্পনায় আনিয়া বুঝিতে হয় না। শকুন্তলা বসিয়া আছেন, সখিদের সহিত কথা কহিতেছেন, কিন্তু অন্যমনস্ক;—শকুন্তলা চাহিয়া আছেন, তপোবনের বৃক্ষ-লতা দর্শন করিতেছেন, কিন্তু কি দেখিতেছেন, হুঁস নাই! সেই বিমুগ্ধ-ভাবের অনুকরণ করা এখনকার নভেলিগণের পক্ষে একেবারেই অসাধ্য।

আর আমরা দুটি কথা বলিব। প্রথম কথা এই যে, ইংরাজীর অনুকরণে ২১ বৎসরের বালিকা;—সেই বালিকা আবার অবিবাহিতা;—সেই বালিকা আবার বীরাঙ্গনা;—সেই বালিকা আবার স্থল বিশেষে ছোরা চালায়—পিস্তল চালায়! এইরূপ বর্ণনা এখনকার নভেলের এবং নভেল লেখকগণের মহাগুণ। নায়িকাদের বাস্তবিক কোন্ দেশে জন্ম, ২১ বৎসরের কুমারী বালিকা কি প্রকারে অস্ত্রচালনা করে, নভেল লেখকেরা কার্য্যকালে সেটি ভুলিয়া যান। ২১ বৎসরের বালিকা সৌদামিনী দাসী এক বন মধ্যে একজন কালান্তক দানবতুল্য পরাক্রান্ত পুরুষকে ছোরা মারিতে অথবা গুলি করিতে উদ্যত হইল, পাঠ করিবার সময় পাঠকের সেটি কেমন লাগে, গ্রন্থকর্ত্তারা তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না, এই একটী মহাক্ষোভের বিষয়।

দ্বিতীয় কথা এই যে, নভেলের নায়ক নায়িকা হইলেই মহা মহা বিপদে পড়িতে হয়। দুরন্ত লোকেরা নভেলের নায়িকাগণকে চুরি করে। ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান-বর্জ্জিত পাষাণ্ড ধনাঢ্য কুলাঙ্গার অথবা অরণ্যবাসী দুর্জ্জয় দস্যু একটী সুন্দরী যুবতীকে চুরি করিয়া লইয়াছে, বলপূর্ব্বক তাহার

সতীত্বহরণ করিতেছে না, বোধ হয় সেই সময় সেই দুরন্ত লম্পটের ধর্ম্ম-জ্ঞানের উদয় হইয়াছে, পরস্ত্রীহরণে পাপ হয়, পাষণ্ড যেন তাহা বুঝিতে পারিয়াছে, বুঝিতে পারিয়া কি করিতেছে?—একবার হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া করজোড়ে বন্দিনী যুবতীর নিকটে প্রেম ভিক্ষা করিতেছে;—সুন্দরী যুবতীর সম্মতি চাহিতেছে। রাম! রাম!! আমরা পাগল! কাহাকে আমরা যুবতী বলি!—নভেলের নায়িকা হইলে দেশ বিচার করিতে হয় না,—বয়স বিচার করিতে হয় না, নভেলের নায়িকা হইলেই বালিকা বলিতে হয়। সেই বালিকার নিকটে প্রেমভিক্ষা—সম্মতি ভিক্ষা। এদেশে সাধারণ মুসলমানের বিবাহের অগ্রে বর যেমন বিবিকে জিজ্ঞাসা করে, রাজি কি গর রাজি?—নভেলের নায়ক সেইরূপে নভেলের বালিকাকে বলে, রাজি হও! বল, তুমি আমার! বল, তুমি আমার হইবে! বল, তুমি আমারে ভালবাস! তোমার চাঁদমুখের অঙ্গীকার শুনিলেই আমি চরিতার্থ হইব, ধরাতলে স্বর্গসুখ অনুভব করিব!—বালিকা বলে, সাবধান! খবরদার! নিকটে আসিও না! স্পর্শ করিও না! এই দেখ!—কি দেখায়?—ছোরা কিংবা পিস্তল, কিংবা তলোয়ার! বালিকার ভীষণমূর্ত্তি দর্শনে বড় বড় ডাকাতেরাও ভয় পায়,—প্রেম কথা বুঝাইবার জন্য দুই এক দণ্ড নয়; দুই একদিন নয়, পাঁচ সাত দিন পর্য্যন্ত—এক এক স্থলে একমাস পর্য্যন্ত সময় লয়! ইতিমধ্যে অপূর্ব্ব কৌশলে বালিকা পলাইয়া যায়! এরূপ না হইলে নভেলের নায়িকা মানায় না;—তেজস্বিনী ধর্ম্মশীলা বীরাঙ্গনা বিশেষণও পায় না!

নভেলের নায়কের তেজস্বিতাও সেই প্রকার। বাঙ্গালাদেশে জন্ম, বীরপুরুষের বেশ, বন মধ্যে দস্যু হস্তে বন্দী, ষোলজন অস্ত্রধারী পাহারা, অথচ বাঙ্গালী যুবক নেত্র নিমেষে তিনজন বলবান দস্যুকে নিপাত করিয়া, সুদৃঢ় বন্ধনরজ্জু ছিন্ন করিয়া, অশ্বারোহণে পবনবেগে বাহির হইয়া যায়;—পাঁচ সাতবার ধরা পড়ে, সকলবারেই ঐরূপ বীরত্ব দেখাইয়া ঐরূপে পলায়ন করে!

ইংরাজী নভেলের অনুকরণে এ দেশের উপন্যাসে আজকাল ঐরূপ চিত্রই অধিক দৃষ্ট হয়! প্রত্যেক নভেলেই প্রায় ঐরূপ বর্ণনা থাকে, একথা বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। নভেলিরা বলেন, সেই গুলিই নভেলের গুণ, আমরা বলি, সেইগুলিই এদেশের নভেলের দোষ।

দেশের এখন দুর্ভাগ্য, সেই দুর্ভাগ্যের ফলে কলিকাতা সহরের রাজ-পথে এখন ঐরূপ নভেল-লেখকের ছড়াছড়ি,—গড়াগড়ী! নভেলের দ্বারা সাহিত্য-সংসারের উপকার সম্ভাবনা যদি স্বীকার করিতে হয়, তবে আমরা গলবস্ত্র হইয়া করপুটে ঐ প্রকার নভেল-লেখকগণের নিকটে মিনতি করি, একান্ত অনুকরণের দাস না হইয়া, অনুগ্রহ পূর্ব্বক দেশকাল-পাত্রের প্রতি একটু একটু নেক্ নজর রাখিয়া, নভেলের ঐ সকল মহাদোষ পরিহারে তাঁহারা যত্নশীল হইবেন, আজ এই পর্য্যন্ত নিবেদন ইতি।—

শ্রীভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

উমা।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ, মহাশয় 'উমা' নামক একখানি উপন্যাস লিখিয়াছেন। পাঁচকড়ি বাবুকে শ্রেষ্ঠ সুদক্ষ সম্পাদকরূপে সকলেই জানেন, কিন্তু তাঁহাকে গ্রন্থকাররূপে বোধ হয় এই প্রথম দেখা গেল।

'উমা' একখানি গার্হস্থ্য চিত্র—অতি স্বাভাবিক এবং সাধারণ ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। ঘটনাটির সার মর্ম্ম এই:—

যোগেশ্বর একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তান। তাঁহার বয়স নয় বৎসর হইলেই পিতা সংসার ত্যাগী উদাসীন হইয়া গৃহত্যাগ করেন। তাঁহার মাতা একমাত্র পুত্রকে অতি যত্নে পালন এবং সুশিক্ষা দান করেন। স্বামীহারা দুঃখিনীর এই একমাত্র পুত্র তাঁহার নিকট কেমন আদরের ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। যোগেশ্বর ছেলে ভাল, তিনি ক্রমে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট হইলেন, এবং নানাস্থানে ঘুরিতে লাগিলেন, মাতা এবং পত্নী সঙ্গেই আছে। তাঁহার পত্নীর নাম 'উমা'। উমাও পিতামাতার একমাত্র কন্যা, আর পিতাও বেশ ধনশালী লোক। সুতরাং কন্যাও তাঁহাদের নিকট বড়ই আদরিণী।

উমার রূপও ছিল বেশ। কিন্তু সাংসারিক কাজকর্ম্ম প্রভৃতি কিছুই জানিত না। শ্বশুর-ঘরে আসিয়াও একমাত্র শাশুড়ীর বড়ই প্রিয়পাত্রী হইয়া ছিল। তাঁহার যোগেশ্বরের স্ত্রী বলিয়াই তিনি উমাকে বড় ভাল বাসিতেন। তাঁহাকে সর্ব্বদা নানাপ্রকার আদরের সম্বোধনেই আদৃতা করিতেন, 'বৌমা' কি 'বাছাও' বলেন নাই। ১৪ বৎসর বয়স্কা বালিকা উমা একটি

পুত্রের জননী হইয়াছে। ছেলেটি লইয়া আমোদে আহ্লাদে স্বামীর সঙ্গে ধর্ম্মালাপে উমার দিন আনন্দেই কাটিত। যোগেশ্বরও কাছারীতে কাজ-কর্ম্ম করিতেন, আর স্ত্রীর সহিত প্রেম-রহস্যালাপে সুখে দিন কাটাইতেন। বেতনের টাকা মায়ের হাতে দিতেন, মা খরচপত্র করিতেন। উমা সংসারের সুব্যবস্থা এবং রন্ধনাদির সহায়তার জন্য তাহার এক আজন্ম বিধবা অতি রূপবতী বিংশতি বর্ষ দেশীয়া মাতা পিতৃহীনা, উমার পিত্রালয়ে পালিতা, ভগিনী বিনোদিনীকে (স্বামীকে রাজি করিয়া) বাসায় আনিল, উমার পিতা তাহার মামা। ক্রমে যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিল, বিনোদের রূপে যোগেশ্বর মজিয়া গেল, এবং উমা যখন দ্বিতীয়বার সূতিকা গৃহে, তখন অলক্ষ্যে তাহার অদৃষ্টে বজ্রপাত হইল। সে তাহা বুঝিল এবং পিতা তাহাকে লইতে আসিলে সে বড় ছেলে বাসায় রাখিয়া, স্বামীর আদেশ-মত অনিচ্ছাতেই সেই কচি ছেলে লইয়া পিত্রালয়ে গেল। যোগেশ্বর আরও মজিয়া গেল—ডুবিয়া গেল। যোগেশ্বরের মাতা শেষে তাহা বুঝিলেন, যোগেশ্বরের সহিত কথায় কথায় সেই মাতৃভক্ত পুত্র কর্ত্তৃক অপমানিত হইলেন—এবং তৎক্ষণাৎ বাসা ত্যাগ করিয়া একেবারে কাশী যাত্রা করিলেন, তথায় গিয়া পুত্রবধূ উমাকে এক বিস্তৃত পত্রে সব লিখিলেন, এবং তাহাকে অবিলম্বে বাঁকিপুরের বাসায় যোগেশ্বরের নিকট যাইতে উপদেশ করিলেন, এবং স্বামীকে এ পাপ কবল হইতে উদ্ধার করিতে আদেশ করিলেন। পিতৃ সহায়া উমা ছেলেটি লইয়া স্বামীর বাসায় গেল। স্বামীর প্রতি রাগ, রোষ প্রকাশ করিয়া বেশ-শান্তভাবে স্বামীর সেবা করিল, এবং রজনীতে স্বামীর সহিত দেখা করিয়া যেন কিছুই ঘটে নাই, এইভাবে আলাপ করিয়া স্বামীকে স্তম্ভিত করিয়া দিল, তাহার উচ্চ হৃদয়ের পরিচয় দিল, স্বামীর চমক ভাঙ্গিল। এদিকে বিনোদিনীর সঙ্গেও সে বেশ সস্নেহ ব্যবহার করিল, এবং এমন কি স্বামীর সহিত দ্বন্দ করিয়া আর একবার স্বামীর সহিত তাহার নির্জ্জনে দেখা পর্য্যন্ত করাইয়া দিল—বিনোদ তখন গর্ভবতী—সেদিন একাদশী। যোগেশ্বরের সঙ্গে কথায় কথায় মনের কষ্টে ও উচ্ছ্বাসে বিনোদের গর্ভস্রাবের লক্ষণ দেখা দিল, ঔষধ পত্রে ফল হইল না, গর্ভস্রাব ও পরে বিনোদের মৃত্যু হইল। বিনোদের সৎকার করিয়া যোগেশ্বর স্ত্রীর পরামর্শমত সস্ত্রীক সপুত্র এবং শ্বশ্রূ শ্বশুর কাশীতে মায়ের সঙ্গে দেখা করিল—মাতা তখন মৃত্যুশয্যায়—তথায় পিতার দেখাও যোগেশ্বর

পাইল, তাঁহার নিকট নানা উপদেশও পাইল, শ্বশুরও অনেক উপদেশ দিলেন। মাতার মৃত্যুর পর কলঙ্ক বিধৌত যোগেশ্বর আবার দেশে স্বকর্ম্ম স্থানে ফিরিয়া আসিল। উমার নিজগুণে পতিত স্বামীর উদ্ধার সাধন হইল।"

এই তো উমার গল্পাংশ, কিন্তু আমি এই গল্পাংশের সংক্ষেপ করিতে যাইয়া পুস্তকখানিকে খুন করিলাম, তাহার যে মাধুর্য্য, তাহার যে উচ্চ-ভাব, যাহা পড়িতে পড়িতে আমার শরীর রোমাঞ্চ হইয়াছে, চক্ষে জল দেখা দিয়াছে, তাহার কিছুই উহাতে দেখাইতে পারিলাম না। এই সামান্য গল্পাংশ লইয়া পাঁচকড়ি বাবু যে কিরূপ কৃতিত্বের সহিত রমণীর উচ্চ আদর্শ, কর্ত্তব্য, অকর্ত্তব্য, পাপপুণ্য বিচার, দায়িত্ব ইত্যাদি দেখাইয়াছেন, তাহা পুস্তকখানি না পড়িলে বুঝিবার উপায় নাই। আমি এ প্রবন্ধে সংক্ষেপে উমার চরিত্রটা একটু আলোচনা করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব, যে কিরূপ উচ্চ আদর্শ, পাঁচকড়ি বাবু সমাজের মঙ্গলজন্য উপস্থিত করিয়াছেন।

তাঁহার ভাষার সম্বন্ধে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন—তাহা সুমার্জ্জিত, সুসংস্কৃত, এবং যেন একটু নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত—কাঠিন্য নাই, শব্দাড়ম্বর নাই, অথচ তাহা সুমধুর, এবং শক্তিশালী অর্থাৎ হৃদয়ের উপর একটা প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ—একটা ছবি অঙ্কিত করিতে সক্ষম। আর যে পুস্তক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত প্রভুপাদ বলাইচাঁদ গোস্বামী এবং অতুলচন্দ্র গোস্বামী ভ্রাতৃদ্বয়ের দ্বারা সুসংস্কৃত হইয়াছে, তাহার ভাষার সম্বন্ধে আর কিছু না বলিলেও চলে। পুস্তকের ছাপা ও বাঁধাই বেশ হইয়াছে।

'উমা'র চরিত্রটি আমাদের নিকট বড়ই মিষ্ট লাগিয়াছে। বড়ই উচ্চ, বড়ই দেবভাব সমন্বিত বলিয়া বোধ হইয়াছে। এই চরিত্রটিতে আমরা একটু কলঙ্ক রেখা মাত্র ত দেখিতে পাই নাই। উমার স্বামীর হৃদয়ের উপর, স্বামীর প্রেমের উপর অগাধ অনন্ত বিশ্বাস। এরূপ বিশ্বাস, এরূপ নির্ভরতা সংসারে বড় দেখা যায় না। স্বামীর চরিত্রে কলঙ্ক স্পর্শ হইতে পারে, উমার নিকট তাহা অসম্ভব বিশ্বাসাতীত ঘটনা। আমাদের সংসারে প্রকৃতই যে এরূপ সতী দেব-হৃদয়া রমণী নাই, তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু বড় বিরল। প্রকৃত জীবনে এরূপ দেবী বেশী দেখা যায় না। আমার সৌভাগ্যক্রমে আমি এরূপ একটি দেব-হৃদয়া, স্বামীর প্রতি অনন্ত প্রেম অখণ্ড বিশ্বাসবতী, প্রেমময়ী রমণী সংসারে স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছি,

তাঁহার হৃদয় কিছুতেই স্বামীর প্রতি বিশ্বাসহারা হয় না। অনেক প্রকার কূট পরীক্ষাতেও সে রমণী এ বিষয় এরূপ প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণা হইয়াছেন যে, তাহাতে আমি আশ্চর্য্য ও মুগ্ধ হইয়া গিয়াছি। তাঁহার নিকট স্বামী নিষ্কলঙ্ক দেবতা স্বরূপ! আমোদ আহ্লাদক্রমেও ভ্রমে তাঁহার মুখ হইতে স্বামীর নিন্দা বাহির হয় নাই, স্বামীর প্রতি কোনরূপ দোষযুক্ত বাক্য শুনা যায় নাই, এবং তিনি ঠাকুর দেবতা স্পর্শ করিয়া, পতির পদস্পর্শ করিয়া স্বচ্ছন্দে বলিয়াছেন, কোনও দিনই স্বামীর প্রতি বিন্দুমাত্র সন্দেহও তাঁহার মনে উদয় হয় না—স্বামী তাঁহার নিকট স্বর্গীয়, সন্দেহাতীত এক অনুপম অপার্থিব বস্তু। স্ত্রী কেমন করিয়া স্বামীর প্রতি বিশ্বাসহারা হয়, তাহা তিনি বুঝেন না। আমি উমাতে সেই রমণীর ছায়া স্পষ্ট দেখিয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছি।

পাঁচকড়ি বাবুও এরূপ রমণীর স্বভাব স্বয়ং দেখিয়াছেন, নিজেই বলিয়াছেন। সুতরাং উমাচরিত্র আদর্শ হইলেও অস্বাভাবিক নহে। উমার অনেক কথা যেন সেই রমণীর কথার প্রতিধ্বনি! সুতরাং রমণীগণ উমার আদর্শ অনুকরণ করিতে গেলে, বিফল হইবেন না, ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

উমা বড় লোকের কন্যা, আদরিণী, কিন্তু তাহার হৃদয় স্বর্গীয়, তথায় অভিমান নাই, অহঙ্কার নাই, কেবল পতিপ্রেম; এবং তাহার আনুসঙ্গিক পতি-সেবা।

তবে প্রথম প্রথম বালিকা উমা শ্বশুরবাড়ী আসিয়াও অন্য শিক্ষার সুবিধা পায় নাই, গৃহিণীও স্বকর্ত্তব্য ভুলিয়া, গৃহোচিত শিক্ষা দেন নাই, সুতরাং গৃহিণীপণায় বা সংসারের ভাবগতিক বুঝিতে সে একটুও দক্ষা ছিল না, সে ভাবিত, তাহার দিন এইরূপেই যাইবে, পিত্রালয়েও আদরে ছিল, শ্বশুরালয়েও সবই আদর—ন-নন্দা পর্য্যন্তও ছিল না, শাশুড়ী মায়ের অপেক্ষাও অধিক আবদার সহ্য করিতেন, স্বামীও প্রাণ দিয়া ভাল বাসিতেন, তার উপর পুত্ররত্ন পাইয়া তাহার আনন্দ সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল; স্বামীকে কেবলই ভাল বাসিত, স্বামীকে অগাধ বিশ্বাস করিত, ক্ষুদ্র হৃদয়ের প্রেম ঢালিয়া দিয়া স্বামীকে স্বর্গীয় ধারায় স্নান করাইত। স্বামীর বিরহও তাহাকে সহ্য করিতে হয় নাই। এই সব কারণে সে সুখের মূল্য সে বুঝিত না—বুঝিবার আবশ্যকও ছিল না, স্বামীর সঙ্গে

প্রেমরহস্য এবং দ্বন্দ্ব করিয়া সে বেশ সুখে কাটাইত। স্বামীও ঠিক বালকের ন্যায় প্রেমবতীর সহিত আমোদে, আহ্লাদে, দ্বন্দ্বে, বেশ কাটাইতেন।

এই ছবিটি আমাদিগকে ভ্রমর ও গোবিন্দলালের প্রথম অবস্থার কথাটা মনে করাইয়া দেয়, শ্রীশ ও কমলমণির ছবি দেখাইয়া দেয়। শেষে যখন উমা নিজের সরল হৃদয়ের অনুযায়ী সরলভাবে বুঝিয়া পিসতুতো ভগ্নী বিনোদিনীকে আনিবার প্রস্তাব করিল, যখন সঙ্গে সঙ্গে শুনিলাম, বিনোদ আজন্ম বিধবা, যুবতী ও অনুপম সুন্দরী—তখনই প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল, বুঝিলাম, উমা ভুল করিল, কিন্তু উমা তাহা বুঝে নাই; কেন? তাহা সে নিজেই শতবার বলিয়াছে, "তাহার কলসী ভাঙ্গা নহে", বিনোদের রূপসাগরে তাহা ডুবিবে না, স্বামীর প্রতি এই অটল বিশ্বাস তার ছিল। উমা যখন শেষে বিনোদকে আনিল, কিন্তু বিনোদ স্বামীর কাছে যায় না, কথা বলে না, তাহা দেখিল, স্বামীর কাছেও তার অলক্ষ্য রসিকতার কথা শুনিল, তখন সে বুঝিয়াও বুঝিল না, জানিয়াও জানিল না, সে ভাবিল, উভয়ের কথাবার্ত্তা কহিবার সুবিধা করিয়া দিলেই সব ঠিক হইবে। উমা বড়ই ভুল বুঝিল, নিজের পায়ে নিজে কুঠার মারিল, নিজে উদ্যোগ করিয়া বিনোদ দিদিকে দেখাইল, অথবা স্বামী দেবতা, যে পুষ্প ভাল বাসেন, সতী আনন্দে সেই পুষ্পে তাঁর পূজার আয়োজন করিল।

রূপমুগ্ধ পতঙ্গ বহ্নিমুখে প্রবেশ করিল, অপ্রেমিক, লালসামুগ্ধ পাপিষ্ঠ যোগেশ্বর এমন সতীলক্ষ্মীর অবমাননা করিয়া বিনোদের রূপে মজিয়া গেল; উমা দেখিল, বুঝিল, তাহার কপাল ভাঙ্গিয়াছে! হঠাৎ এ দুরদৃষ্টে উমা বড় কষ্ট পাইল বলা বাহুল্য মাত্র, তথাপি যখন আঁতুড় হইতে বাহির হইবার কিছুদিন পরেই তাহার পিতা তাহাকে লইয়া যাইতে চাহিলেন, তখন তাহার একটুও ইচ্ছা ছিল না, যে সে এ অবস্থায় স্বামীকে লালসাবহ্নিতে ফেলিয়া যায়—কিন্তু স্বামী স্বীয় পাপপথ সুগম ও নিষ্কণ্টক করিবার ইচ্ছায় নিজেই সম্মতি দিলেন—সুতরাং স্বামী আজ্ঞায় বিষাদিনী প্রাণ এবং সঙ্গে সকল সুখ ফেলিয়া রাখিয়া দেহ লইয়া চলিয়া গেল। পাপিষ্ঠ যোগেশ্বর বিনোদকে লইয়া নরকের পথে ছুটিল।

এই পাপের চিত্র পাঁচকড়ি বাবু অতি সাবধানে অঙ্কিত করিয়াছেন; ইহাতে তাঁহার আনন্দ নাই, হৃদয়ের গভীর বেদনার সহিত, নয়নে অশ্রু লইয়া তিনি এই ছবি আঁকিয়াছেন; এ দৃশ্য তিনি দেখিয়াছেন বটে,

কিন্তু তাহা দেখিয়া পাঠক পাঠিকার হৃদয়ে লালসার অগ্নি জ্বলিয়া হৃদয়কে অবনত করে না; কিন্তু পাপের প্রতি একটা প্রবল ঘৃণা আনিয়া দেয়—এ চিত্র দেখিয়া আমরা চমকিয়া সরিয়া দাঁড়াই—বুঝি বা আমাদিগকেও স্পর্শ করিল! পাপের চিত্র এইরূপেই অঙ্কিত হওয়া প্রয়োজন। পাঁচকড়িবাবু এই প্রসঙ্গে এ কার্য্যের জন্য কে দোষী, কে দায়ী, তাহাও বেশ সুন্দর আলোচনা করিয়াছেন; সে গুলি মন দিয়া পাঠ করা উচিত। বিনোদিনীকে তেমন দোষ দিতে পারি না। সুতরাং হৃদয়ের উচ্ছ্বাস কেমন করিয়া দমন করিতে হয়, কেমন করিয়া নিবৃত্তি-মার্গে অল্পে অল্পে অগ্রসর হইতে হয়, তাহাকে শিক্ষা করে নাই, অতি বাল্যকালে বিবাহিতা হইয়া অচিরেই বিধবা হইয়াছে। স্বামীর একটু আবছায়া পর্য্যন্তও তার মনে নাই, তাহা থাকিলে সে এরূপ করিত না, সে নিজে বলিয়াছে। তার উপর সে সমবয়স্কাদিগের স্বামী ঘটিত বৃত্তান্ত, তাহাদের চালচলন দেখিয়াছে, এবং মনে মনে অবশ্য একটা তরঙ্গও সে যৌবনে বোধ করিয়াছে, তার উপর সে রূপবতী—সুতরাং তাহার লালসা হওয়াটা বিচিত্র কি? বাঁধিয়া রাখিলে সবাই সতী; মাতুলালয়ে থাকা কালে তারও তাই ঘটিয়াছিল, সকলের চোকে চোকে ছিল, প্রলোভ্য বস্তুরও সংঘটন হয় নাই, তাই সে পাষাণ প্রতিমা ছিল, কিন্তু সে পাষাণ প্রতিমার অন্তরে অন্তরে যে ফল্গু প্রবাহ বহিত, তাহার যে পূর্ণ জোয়ার উঠিত, মাতুল তাহা বুঝিতেন না, বুঝিবার চেষ্টা বা আবশ্যকতা জ্ঞানও তাঁহার ছিল না; তিনি বৃদ্ধবয়সেও স্ত্রীর সহিত বাস করিতেছেন, রহস্যালাপ করিতেছেন, তাঁহার আর অবসর কোথায়? তিনি নিরামিষ আহার, তাম্বুল অলঙ্কারাদি বর্জ্জন, শ্বেতাম্বর ইত্যাদির মার্কা মারিয়া বিনোদিনীকে ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষিত করিয়াছেন, কিন্তু ঐ সব বাহ্য রক্ষা কবচমাত্র সম্বল লইয়া বিনোদিনী লালসা বিলাসিনী রাক্ষসীদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে কিনা তাহা কে বিবেচনা করে?—"অবশ্য পাইবে—তাহাকে পাইতে হইবে!" এই তাঁহাদের মত; ইহার আনুসঙ্গিক নিবৃত্তি মার্গের উপদেশ, ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ, ধর্ম্ম চর্চ্চা, পরলোকের সুখ ও পুণ্য ইত্যাদির উপদেশ যে আবশ্যক তাহা মাতুলের মনে হয় নাই—মনের উপর প্রভুত্ব করা, প্রবৃত্তির প্রাণাগুণ জয় করা যেন এতই সহজ! এমন মাতুল, এমন পিতা, এমন ভ্রাতা যথেষ্ট আছেন, যাঁহারা কেবল বাহিরে বিধবা সাজাইয়াই নিজ নিজ কন্যা ভগিনী প্রভৃতিকে সংযতা রাখিতে চান, আর তাহাদের চক্ষের সম্মুখে শত শত বিলাসের ভঙ্গী, বিলাসের লীলা অবিরত চলিতে থাকে; সুতরাং তাহাদের হৃদয়ে আগ্নেয় গিরিগহ্বরের ন্যায় অগ্নি সঞ্চিত হইতে থাকে, পরে অবসর পাইলেই তাহা কাটিয়া যে নিঃস্রব ছুটিতে থাকে; তাহাতে চতুর্দ্দিক দগ্ধ হয়! পিতা ভ্রাতাগণ, সাবধান হউন, বিনোদিনীর দশা দেখিয়া সাবধান হউন, যদি দুর্ভাগ্যক্রমে বালিকা বিধবা আপনাদের ঘরে থাকে, তবে তাহাদের সম্মুখে বিলাসের প্রলোভন আনিবেন না, তাহাদিগের হৃদয় বাল্যকাল হইতে ধর্ম্মপথে চালিত করুন, তাহাদের পূত হৃদয়ের প্রেমধারা ভগবানের চরণে ঢালিয়া দিতে শিক্ষা দিন্, তবেই পবিত্রা সন্ন্যাসিনীরূপে ভগবতী মূর্ত্তির বিকাশ দেখিতে পাইবেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

রাগিণী মধুমাধব—তাল কাওয়ালী।

পাগলী পাগলসনে সেজেছে ভাল,
শ্মশানে মশানে নাচে নৃকপাল মাল।
হিহি হিহি হিহি হাস, সুরাসুরগণ ত্রাস,
কটীতে নাহিক বাস ভ্রূকুটী করাল॥
আসব পানে মগনা, বালসূর্য্য ত্রিনয়ানা,
ঢ'লে পড়ে পড়ে কি না এলোকেশ জাল॥
নেচে নেচে নেচে শ্যামা, ইন্দু হৃদে এসগো মা,
(তোর্) ওরূপে মজিয়ে সে মা হয়েছে পাগল॥

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

সমালোচনা।

সাহিত্য-সাধনা।—বঙ্গ-সাহিত্যের সুলেখক, শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত, মূল্য ১৷৷০ টাকা, ছাপা, কাগজ, বাঁধা উৎকৃষ্ট; ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে গুরুদাস বাবুর নিকট প্রাপ্তব্য।

"সাহিত্য-সাধনায়" বর্ত্তমান বঙ্গ সাহিত্যের আলোচনায়, হারাণবাবুর ছয়টি সাহিত্যসন্দর্ভ একত্রে গ্রথিত; প্রথম প্রবন্ধ, ভিক্টোরিয়ারাজত্বে বাঙ্গালা সাহিত্য; ইতিহাস আলোচনার গতি অপূর্ব্ব, ভিক্টোরিয়ার রাজত্বে

বাঙ্গালা-সাহিত্যের, শৈশব অবস্থার বিষয়, যাহা কিছু অতীতের গর্ভে চির-নিমজ্জিত; হারাণবাবু সেই পুরাতন বৃত্তান্ত মাধুর্য্যের ও পবিত্রতার মন-মুগ্ধকর ভাষার পরিচ্ছদে সজ্জিত করিয়া লোকসমক্ষে প্রকাশ করিয়াছেন।

এতদ্ভিন্ন "সাহিত্য-মনুষ্যত্ব" "সংবাদপত্র ও থিয়েটার", "হিন্দুর আদর্শ সাহিত্য" প্রভৃতি প্রবন্ধ সুচিন্তার পরিচায়ক ও সারগর্ভ ভাবের সন্নিবেশ আছে। বাঙ্গালা সাহিত্যের বর্ত্তমান প্রতিকৃতি; বাঙ্গালী জাতীর আধুনিক রুচিপ্রবৃত্তি এই কয়েকটি বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনায় অনেক কথাই পরিস্ফুট হইয়াছে। প্রত্যেক প্রবন্ধের ভাষা সরল ও মধুর। পুস্তকের শেষে হারাণবাবুর কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী রক্ষিতের লিখিত "মেঘদূত" সমালোচনাটি উপাদেয় হইয়াছে।

উপন্যাসপ্রিয় পাঠক্-পাঠিকা, হারাণবাবুর অনেক উপন্যাস পাঠ করিয়াছেন; আমরা একবার "সাহিত্য-সাধনা" পাঠ করিতে বিশেষ অনুরোধ করি।

বঙ্গদর্শন।—বঙ্কিমচন্দ্রের নামের সহিত, বঙ্গদর্শনের নাম, বঙ্গসাহিত্যে অক্ষয় ও অমর, সেই "বঙ্গদর্শন" গত বৈশাখ মাস হইতে পুনর্জ্জীবিত হইয়াছে। সম্পাদক হইয়াছেন আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের গুরুস্থানীয়; বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার ট্রষ্টী (Truste) শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। "বঙ্গদর্শন" সম্বন্ধে বারান্তরে আমাদের অনেক কথা বলিবার আছে।

তাম্বুল বিহার।—শ্রীকিশোরীলাল জৈনী কৃত; প্রস্তুত কারকের নিকট হইতে আমরা কয়েক কৌটা উপহার পাইয়াছি। পান ও তামাকের সহিত ব্যবহার্য্য; কিন্তু তাম্বুল সংযোগে তাম্বুল বিহার, বড়ই উপাদেয়, রসনা তৃপ্তিকর, মুখের দুর্গন্ধ নাশ করিয়া সৌগন্ধ উৎপাদন করে; মূল্য ।৹ চারি আনা। ১১৯।৪ নং পুরাতন চিনাবাজার কলিকাতায় প্রাপ্তব্য। শ্রীকিশোরীলাল জৈনী কোম্পানির ইংরাজী ১৯০১ সালের রঙ্গিন চিত্রপট "দেলখোস" পঞ্জিকা, ইহা গৃহে টাঙ্গাইবার উপযোগী, নয়নমনোরঞ্জনকর, সমাদরের সামগ্রী।

মনোহরা।—আমরা ৩৮ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট হইতে বি, চক্রবর্ত্তীর মনোহরা নামক কেশতৈল প্রাপ্ত হইয়াছি, মূল্য ১৲ টাকা। ইহার সৌরভ সুমিষ্ট ও দীর্ঘকাল স্থায়ী। স্নানের পরও ইহার সৌরভ বিলুপ্ত হয় না, কেশ ও মস্তিষ্কের পক্ষে হিতজনক। "মনোহরা" নিজগুণে সকলেরই মন হরণ করিতে সমর্থ হইবে, এরূপ ভরসা করি।

জন্মভূমি।

(সচিত্র মাসিক পত্র।)

নবম বর্ষ। } ১৩০৮ সাল, আষাঢ়। { ১২শ সংখ্যা।

"সরস্বতী" স্রোতস্বতী।

১।—সরস্বতী—হিন্দুর পরমপবিত্র নদী। তজ্জন্যই উহার একতম নাম "দেব নদী।" ইহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাঠক মহাশয়ের নিকট পেস্ করিতেছি। মোক্ষদায়িনী সপ্ত পুরীর (১) ন্যায়, ৭ (সাতটী) তটিনীও "দেব নদী" নামে প্রথিত। যথা,—

"গঙ্গে চ যমুনে চ গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু-কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥"

২।—অতি প্রাচীন কালে আমাদের আর্য্য-পূর্ব্ব-পিতামহগণ, 'সরস্বতী' ও 'দৃশদ্বতী' এই দুই পবিত্র নদীর মধ্য-ভাগস্থ প্রদেশে প্রথম উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। সেই প্রদেশের নাম 'ব্রহ্মাবর্ত্ত' (২)। ঐ প্রদেশে "সরস্বতীর" নামান্তর—"কাগার"। কুরুক্ষেত্রের নিকটে উহা 'ফল্গু'-তরঙ্গিণী-বৎ অন্তর্জল-বাহিকা।

৩।—দেবনদী সরস্বতী, প্রায় সর্ব্বত্রই অন্তঃ-সলিল-বাহিনী হইয়া, প্রয়াগে গঙ্গার সহিত সঙ্গত হইয়াছেন। পরে পুনর্ব্বার ত্রিবেণীতে গঙ্গা হইতে পৃথক্ হইয়া হুগলী জেলার নানা স্থান পরিভ্রমণ পূর্ব্বক কলিকাতার পর-

---

(১) মুক্তিপ্রদা সপ্ত পুরীর নাম ঃ—

"অযোধ্যা মথুরা মায়া, কাশী কাঞ্চী হ্যবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ॥"

(২) মনুসংহিতা, ২য় অধ্যায়।

পারবর্ত্তি-'শিবপুরস্থ' "কোম্পানির বাগানের" অদূরে পুনর্ব্বার ভাগীরথীতে সম্মিলিত হইয়াছেন (৩)।

৪।—গিরিরাজ হিমাদ্রির পাদ-প্রদেশ-সন্নিহিত, অথচ সমুদ্র হইতে ষট্‌শত (৬০০) ক্রোশ দূরবর্ত্তী "পারওয়ার্" (৪) নামক এক জনপদের সন্নিকটস্থ ক্ষুদ্র পর্ব্বত হইতে বিপুল সলিল রাশির যে একটী প্রবাহ, শতদ্রু (সট্‌লেজ)-নাম্নী তটিনীতে সম্মিলিত হইয়াছিল, ঐ স্রোতস্বতীর নাম "সরস্বতী"। উহারই অনতিদূরে একতমা ক্ষুদ্রতমা তরঙ্গিণী প্রবহমানা। এই দীর্ঘ ও ক্ষুদ্র নদীদ্বয়ের মধ্যে এক প্রকাণ্ড ভূমিখণ্ডের ব্যবধান, বহু দিন বিদ্যমান ছিল। যে সময়ের কথা এখানে বর্ণন করা যাইতেছে, তাহা খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর ঘটনা।

ঐ ভূমি-ভাগের ব্যবধান-মৃত্তিকা খনিত হইলে, "সার্হিন্দ" ও "মন্‌সুর্" প্রদেশীয় বিশাল ভূ-খণ্ডের উর্ব্বরা-শক্তি সমুৎপাদিত হইবে, এই সংস্কারের ও উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া, "ফিরোজ্ উদ্দিন্" বাদশা—উল্লিখিত উভয় পর্ব্বত-দুহিতাকে একত্র সম্মিলিত করিতে, কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। কেবল সঙ্কল্প নয়—উহা প্রকৃত প্রস্তাবে কার্য্যেও পর্য্যবসিত হইয়াছিল।

মহারাজ ফিরোজের মনঃকল্পনা, যাহাতে কার্য্যে পরিণত হইতে পারে, তদুদ্দেশে উক্ত স্থানগুলি, স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবার কামনায় রাজধানী হইতে তিনি নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সেই সূত্রে তাঁহাকে সমস্তই নিরীক্ষণ করিতে হয়। তিনি তৎ-প্রদেশাভিমুখে যাত্রা পূর্ব্বক একাদিক্রমে তাবৎ বৃত্তান্ত, পর্য্যবেক্ষণ-সাহায্যে বিদিত হইবার পর, স্বীয় মনোরথ পরিপূরিত করিতে সমর্থ হইলেন। ধন্য সম্রাটের উৎকৃষ্ট উদ্যম! তাঁহার পর্য্যবেক্ষণের সুগুণে সুফলই ফলিল। পাতশার যেরূপ অভিলাষ, সেই রূপই আদেশ! তাঁহার অনু-

(৩) প্রকৃত প্রস্তাবে হুগলী জেলার অন্তর্গত "সপ্তগ্রাম" নামক গ্রামের নিম্ন দিয়া, প্রাচীন কালে ভাগীরথীরই স্রোতঃ, প্রবাহিত ছিল। খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দী পর্য্যন্ত 'সপ্তগ্রামের' নিম্ন দিয়া প্রবাহিতা ভাগীরথী, একটী সুনাব্যা নদী ছিল—অর্থাৎ উহাতে নৌকা ও জাহাজাদিও গতায়াত করিত। উহার উপর দিয়া বৃহৎ বৃহৎ বাণিজ্যপোত, সদা বাহিত হইত। এই নদীই, পবিত্র-সলিলা ভাগীরথী বলিয়া হিন্দুগণ কর্ত্তৃক প্রপূজিত হইতেন।

(৪) মতান্তরে ঐ স্থান—"হরিদ্বার" বলিয়া বিদিত ও বিখ্যাত।

জ্ঞাক্রমে একেবারে ৫০,০০০ (পঞ্চাশৎ সহস্র) শ্রমজীবী, একাদিক্রমে অক্লান্ত ও অশ্রান্ত শ্রমে ঐ বিষম কর্ম্মে নিয়োজিত হইয়া গেল!

খনন-কালে দৃষ্ট হইল—উক্ত ভূ-ভাগের একাংশ হইতে মৃত হস্তীর অস্থি—অন্যাংশ হইতে সুদীর্ঘ প্রকাণ্ড মানব-দেহের বিশাল ভুজদেশ, অবলোকিত ও উত্তোলিত হয়। খনন-লব্ধ নর-শরীরের বাহুদেশ, ৫ (পাঁচ) ফুট, ১ এক ইঞ্চি অর্থাৎ প্রায় হস্তত্রয়-অষ্টাঙ্গুলি-পরিমিত।

ঐ খনিত খাত, সম্প্রতি বর্ত্তমান নাই। যখন "ফিরিস্তার" ইতিবৃত্ত, ইংরাজিতে ভাষান্তরিত হয়, তাহার ৫০০ (পাঁচ শত) বৎসর পূর্ব্বে উহার বিদ্যমানতা ছিল।

৫।—১৬শ শতাব্দীর প্রারম্ভে সরস্বতীর মোহানা, বালুকাপূর্ণ হইয়া অনাব্য হইয়া উঠে। এই জন্য তদানীন্তন পোর্ত্তুগীজ বণিগ্‌গণ, সপ্তগ্রাম (৫) বন্দর পরিত্যাগ করিয়া কয়েক ক্রোশ নীচে "গোলাঘাট" (৬) নামক স্থানে এক নূতন বন্দর স্থাপন করেন। আজি-কালি ত্রিবেণীর নিকট সরস্বতীর চিহ্ন আছে বটে, কিন্তু উহা একটি ক্ষুদ্র খালের ন্যায়। জোয়ারের সময় উহা কেবল জলময় হয়। সপ্তগ্রামের নিম্ন দিয়া প্রাচীন কালে দীর্ঘ নদী প্রবাহিত ছিল। সেই নদী, অত্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এমন কি, তাহার বিস্তার, চতুঃ-শত-ক্রোশ-পরিমিত ছিল। কিন্তু এখন তথায় সরস্বতীর চিহ্নমাত্রও নাই। অদ্যাবধি 'মগ্‌রার বালী' বলিয়া যে বালুকা, কলিকাতার বাজারে বিক্রীত হয়, উহা প্রাচীন সরস্বতীরই বালুকা। তথায় প্রায়ই বালী খুঁড়িবার সময় জাহাজের ভগ্নাবশেষ (মাস্তুলাদি) পাওয়া যায়। তাহা দেখিয়াই সরস্বতীর অবস্থান-স্থানের অনুমান হয়। বিশুষ্ক সরস্বতীর স্রোতঃ, কিন্তু অদ্যাপি একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। ত্রিবেণীর দক্ষিণ-পশ্চিমস্থ বহু-সংখ্যক গ্রামের ভিতর এখনও সরস্বতীর স্রোতঃ পরিদৃষ্ট হয়। হুগলী জেলার অন্তর্গত আম্‌তা গ্রামের সান্নিধ্যে সরস্বতীর একটি শাখা, দামোদর নদে প্রবেশ করিয়াছে। সরস্বতীও, শাঁকরাল নামক স্থানের নীচে পুনর্ব্বার প্রকাণ্ড নদীর আকার ধারণ পূর্ব্বক উলুবেড়িয়া, ডায়মণ্ড-হার্ব্বার প্রভৃতি জনপদের নিম্ন দিয়া প্রবাহমান হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছেন। সকলেই,

(৫) অন্য নাম—"সাত গাঁ"।

(৬) গোলাঘাটই সহর হুগলী নামে পশ্চাৎ প্রসিদ্ধ হয়।

অবগত আছেন, ভাগীরথী,বাম-বাহিনী হইয়া,কালীঘাটের নিম্ন দিয়া প্রবাহিত হইয়া ক্রমে সাগর-সঙ্গতা হইয়াছেন। ভাগীরথীর স্রোতঃ, সম্প্রতি কালীঘাট অতিক্রম পূর্ব্বক ক্রমশঃ মজিয়া গিয়াছে; কিন্তু সাগর-সঙ্গমের সমীপে উঁহার কিয়দংশ, প্রবল আকারে অদ্যাপি দেখা যাইতেছে।

৬।—খিদিরপুরের নিম্ন হইতে প্রবাহিত পশ্চিমাভিমুখীন স্রোতঃ, একটী কাটা-খাল-মাত্র। ঐ খাল-কাটার পর গঙ্গার স্রোতঃ, উহার ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া, সরস্বতীর সহিত মিলিত হইয়া সাগরগামী হইয়াছে। সপ্তগ্রাম, এই ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত। এই গ্রাম, এখন সুবর্ণ-বণিকদিগের একটি প্রধান সমাজ-স্থান।

৭।—এবার এই পর্য্যন্ত বর্ণিত হইল।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

কাদম্বিনী।

(ক্ষুদ্র গল্প।)

বাপের বয়স ৫৫ পঞ্চান্ন বৎসর, ছেলের বয়স ২৪ চব্বিশ বৎসর, বাবার পরিবারের বয়স ২৪ চব্বিশের কাছাকাছি। বাবার নাম রামধন বিশ্বাস, ছেলের নাম তারাপদ, রামধনের পরিবারের নাম কাদম্বিনী।

রামধন পূর্ব্বে কোম্পানির পরমিট গুদামে কাজ করিতেন, একটী চক্ষু যাওয়াতে কর্ম্ম ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছে, পেন্‌সন্ হয় নাই, তারাপদের যখন ১৩ বৎসর বয়স, সেই সময় তাহার মাতৃ-বিয়োগ হয়; এক বৎসর পরে রামধন পুনরায় একটি ডাগর মেয়ে বিবাহ করেন, সেই মেয়ের নাম কাদম্বিনী। বিবাহের এক বৎসর পরে কাদম্বিনীর একটি পুত্র-সন্তান জন্মে; তাহার পর বৎসর একটি কন্যা; তৃতীয় বৎসরে একসঙ্গে একটি পুত্র একটি কন্যা। তাহার পর তিন বৎসর বন্ধ। তিন বৎসর পরে একটি হাতকাটা কন্যা; এখন অর্থাৎ বর্ত্তমানে একটি কচিছেলে কাদম্বিনীর কোলে।

তারাপদের বিবাহ হয় নাই। তাহার পিতা পিতামহেরা কোন জাতি তাহা আমরা জানি না। ব্রাহ্মণ কায়স্থ হইলে আজিকার বাজারে মূর্খ ছেলেও

উচ্চ ডাকে নীলাম হইয়া যাইত; তারাপদ মূর্খ ছেলে, তথাপি তাহার ডাক হয় নাই। ইহাতেই বুঝিতে হইবে, তারাপদ কায়স্থ ব্রাহ্মণের ঘরের ছেলে নয়।

তারাপদ নিরেট মূর্খ, তারাপদ গোঁয়ার, তারাপদ গুলিখোর। তারাপদের কিন্তু দুটি গুণ আছে;—তারাপদ চোর নয়, তারাপদ লম্পট নয়। বিবাহ হয় না কেন, তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি না। পাড়ার কেহ কেহ বলে, উহাদের বিবাহে অনেক টাকা লাগে; মেয়ে কিনিয়া বিবাহ করিতে হয়। রামধনের টাকা নাই, সুতরাং ২৪ বৎসরের পুত্র অবিবাহিত।

রামধনের অবস্থা ভাল নহে। চাকরি ছিল উপজীবিকা, বিধির বিড়ম্বনায় চাকরিটি গিয়াছে, অন্য কাজকর্ম্ম জোটেনা, কাজে কাজেই রামধনের বড় দুরবস্থা। যখন চাকরি ছিল, রামধন তখন্ কলিকাতার খালের পূর্ব্বদিকে উল্টাডিঙ্গি নামক স্থানে সস্তাদরে একখণ্ড জমি খরিদ করিয়া একখানি একতালা বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন;—সেই বাড়ীখানি এখন বন্ধক পড়িয়াছে;—সেই টাকায় গোছে গাছে এখন সংসার চলিতেছে।

মানুষের অবস্থা মন্দ হইলে ধর্ম্মকথা বলিতে হয়। আমরা রামধনের অনুকূলে ধর্ম্মকথা বলিব। পেটে খাইবার জন্য রামধন বাস্তবিক বাড়ী বন্ধক দেন নাই, মৎলব ছিল। বন্ধক দিবার পরেই তিনি বড়বাজারে দুর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীটে একখানি সুতার দোকান খোলেন; দোকানখানি দেড়বৎসর চলিয়াছিল; কিছুই লাভ হয় নাই, একথা বলা যাইবে না;—হইয়াছিল কিঞ্চিৎ, কিন্তু খাতাপত্রে লাভের অপেক্ষা দেনা বেশী দাঁড়ায়। কাপড়ের কারবারে সুতার কারবারে, আরও কয়েকটা কারবারে দোকানদারকে অথবা জানাশুনা খরিদারকে ধারে জিনিষ পত্র ছাড়িয়া দিতে হয়, না দিলে কারবার চলে না; সেই হিসাবে রামধনের অনেক টাকা বিলাত-বাকী পড়ে। কাজে কাজেই দোকান বন্ধ হইয়া যায়। মহাজনেরা নালিশ করিয়া ডিক্রী করে, রামধন গা ঢাকা হন। আজিও গা-ঢাকা।

তারাপদ কোন কাজ করে না। বাড়ীতেই প্রায় থাকে না। বেলা একটার সময় একবার আসিয়া ভাত খাইয়া যায়, সন্ধ্যার পর একবার কিছু খাবার চায়; বাড়ীতে মুড়ী কেনা থাকে, বিমাতার স্নেহের হস্তে তারাপদ আধ পয়সার মুড়ী খায়। রাত্রে বাড়ীতে থাকে না; পাড়ার

একজন পাঁচালীওয়ালা বন্ধুর বৈঠকখানায় শয়ন করে। নিজ বাড়ীর সঙ্গে তারাপদের ঐ পর্য্যন্ত সম্পর্ক।

সংসারে বড় কষ্ট। পরিবার অনেকগুলি। ধার করা টাকা। কর্ত্তা গা-ঢাকা। কাজে কাজেই বড় কষ্ট। দুই বেলা রন্ধন হয় না;—প্রতিদিন বেলা দুই প্রহরের পর যৎসামান্য উপকরণে অন্ন প্রস্তুত হয়। এই কষ্টের সংসারে কাদম্বিনী কিন্তু চওড়া চওড়া পাড়ওয়ালা ফরসা ফরসা কাপড় পরেন, কর্ত্তার চাকরির আমলে খান্‌কতক গহনা হইয়াছিল, বাড়ী বন্ধকের পূর্ব্বে কাদম্বিনী তাহার একখানিও বন্ধক দিতে দেন নাই, সেই গহনাগুলি কাদম্বিনী নিত্য বৈকালে অঙ্গে দেন, কবিরাজ এন সেন, এবং এন, দত্তের সুগন্ধি তৈলে চুল বাঁধেন, হাতে পায়ে, নখে ঠোঁটে, এন, দত্তের সুপ্রশংসিত পরিমলময় তরল আলতা মাখিয়া বিবি হন, কালো কালো গুবরে পোকার টিপ্ কাটেন, এন দত্তের সুরাভিময় তাম্বুলীন মিশাইয়া পান খান, দিব্য সৌখিনভাবে থাকেন। সংসারের তত কষ্টেও ঐরূপ নাগর মোহিনী সজ্জায় দিব্য হাসি হাসি মুখে পঞ্চান্ন বৎসরের পতির সঙ্গে সটান আমোদ আহ্লাদ করেন।

রামধন বিশ্বাস কাদম্বিনীর অত্যন্ত বাধ্য। অধিক বয়সে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিলেই স্ত্রীর বাধ্য হইতে হয়, এই বিশ্বজনীন সূক্ষ্ম তত্ত্বটী রামধনের উত্তমরূপ জানা হইয়াছে। অতগুলি ছেলেমেয়ে হইলেও কাদম্বিনী এখনও যুবতী, রামধন ৫৫ বৎসরের বৃদ্ধ;—সুতরাং সর্ব্বদাই যুবতীর মন জোগাইয়া চলিতে হয়। কেবল তাহাই নহে, রামধনকে পদে পদে কাদম্বিনীকে ভয় করিয়া চলিতে হয়।

তারাপদ এই বিমাতাকে মা বলে না। সমবয়স্কা বলিয়া নাম ধরিয়াও ডাকে না। কাদম্বিনীর প্রথম সন্তানের নাম মন্মথনাথ; সেই নামের যোগে তারাপদ কাদম্বিনীকে মোনার মা বলে। যাহাই বলুক, তারাপদ কিন্তু মোনার মাকে মনে মনে অত্যন্ত ঘৃণা করে;—চক্ষেও কালসার্পিনী দেখে।

কাদম্বিনী অত্যন্ত মুখরা। স্বামীর সহিত যখন কলহ হয়, কাদম্বিনী তখন জাতি-বিচার পর্য্যন্ত বাকী রাখেন না। সেকালে বধূ-ননদে যেরূপ ঝুটাপুটি ঝগড়া হইত, কাদম্বিনী এখন পতির সঙ্গে সেই রকম ঝুটাপুটি ঝগড়া করেন। মধ্যে মধ্যে সপত্নীপুত্র তারাপদের সঙ্গেও দুই এক হাত লাগিয়া যায়। এইবার আমরা আসল কথা বলিব।

একদিন সন্ধ্যার পর বৃদ্ধ রামধন আপনার শয়ন ঘরে বসিয়া কাশীরাম দাসের মহাভারত পড়িতেছেন, পাশের ঘরে কাদম্বিনী শয়ন করিয়া আছেন, তাঁহার চারিধারে ছেলে মেয়েরা খেলা করিয়া বেড়াইতেছে, ঘরে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে, এমন সময়ে তারাপদ আসিয়া ডাকিল, "মোনার মা!"

মোনার মা উত্তর দিলেন না। তারাপদ আবার ডাকিল, "মোনার মা!" সেবারেও মোনার মা, কথা কহিলেন না। পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক গর্জ্জনে তারাপদ তৃতীয়বার ডাকিল, "মোনার মা!"

এইবার মোনার মা গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া বসিলেন। পূর্ব্ববর্ণিত মোহিনী বেশ! চক্ষুদুটি রক্তবর্ণ, সুন্দর মুখখানিও রক্তবর্ণ। কেননা, কাদম্বিনী সুন্দরী। ক্রোধের সময় সুন্দরীদের মুখ চক্ষু রক্তবর্ণ হয়, সেই লক্ষণে তারাপদ বুঝিল, রাগ হইয়াছে।

তিনবার ডাকে উত্তর না পাইয়া তারাপদেরও রাগ হইতেছিল, এমন সময়ে কাদম্বিনী হুঙ্কার করিয়া বলিলেন, "জোটে কোথা থেকে? হয় কোথা থেকে? আসে কোথা থেকে? মুখে কেবল খাবার—খাবার—খাবার! আজ কেবল উনুনের ছাই আছে। পঁচিশ বছরের মদ্দ, এককড়ার ক্ষমতা নেই, রোজ রোজ কেবল খাওয়াও—খাওয়াও—খাওয়াও! বুড়ো আর পারবে না, দূর হয়ে যা!"

তারাপদ ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিল না। অত্যন্ত কর্কশস্বরে বলিল, "হাজারবার খাবো! তোর বাবার কি! আজ তুই মদ খেয়েছিস! নিশ্চয় খেয়েছিস! মুখ চক্ষু লাল! তোর ঐ মুখে আমি লাথি মারি!"

তারাপদ লাথি মারিতে উদ্যত হইল। ছেলেরা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, বৃদ্ধ রামধন কাঁপিতে কাঁপিতে দ্বারের কাছে আসিয়া উঁকি মারিলেন। দেখিতে পাইয়া তারাপদ পিতাকে এক ধাক্কা দিয়া সক্রোধে বলিল, "তুমি কেন এখানে? আচ্ছা দাঁড়াও! তোমার সাক্ষাতেই আজ আমি এই বেটীর দর্প চূর্ণ করিব! বেটী মদ খেয়েছে! মুখ চক্ষু লাল করেছে! আবার এক কালা পোকার টীপ্ কেটেছে। রঙ্গ দেখ! কথা কহিও না! বাবা আছ, বাবাই আছ! কথা কহিলে এক চড়ে তোমার—" কর্ত্তাকে এই রকম ধমক দিয়া, কাদম্বিনীর দিকে ফিরিয়া, তারাপদ ঘন ঘন ঘাড় নাড়িয়া সগর্জ্জনে বলিতে লাগিল, "তো বেটীর আর একটা

ভালবাসা আছে! নিশ্চয় আছে! তারি সঙ্গে তুই মদ খাস! এক লাথিতে আজ তোরে আমি সোজা করিব! কারে কি বলিস, তাহা তুই জানিস? আমি তারাপদ বিশ্বাস, আমার হাতে তোর—আমি বাবা নই বাবা! আমার হাতে তোর নিশ্চয় মৃত্যু!"

তারাপদ পুনর্ব্বার লাথি তুলিল, কাদম্বিনী কাঁদিয়া উঠিলেন, যাহা মুখে আসিল, তাহাই বলিয়া গালাগালি পাড়িতে লাগিলেন, ছেলে মেয়েরা চীৎকার করিয়া উঠিল।

কর্ত্তা আর চুপ্ করিয়া থাকিতে পারিলেন না; কদলীদলের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। কাদম্বিনীকে ছাড়িয়া, দুই হাতে ঘুসি পাকাইয়া, দন্ত পেষণ করিতে করিতে, তারাপদ এক লম্ফে কম্পিত বৃদ্ধের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল; ভ্রূকুটি করিয়া জিজ্ঞাসিল, "কিসের কম্প? শীতের না জ্বরের? জ্বরের না ভয়ের? অত কম্প ভাল নয়! দেখ বাবা! তোমার ঐ মেয়েমানুষটির জগত-মোহিনী সাজ-সজ্জা দেখিয়া তুমি নিশ্চয় তাহা বুঝিতে পার, মুখে কিছু বল না, সেটা কেবল ভয়ে। তোমার মেয়েমানুষ ওপাড়ার রামকালীর সঙ্গে রোজ সন্ধ্যা-কালে মদ খায়। রামকালীর টাকা আছে, তোমার মেয়েমানুষ রোজ রোজ টাকা পায়। রামকালী উহাকে কুলের বাহির করিবার পরামর্শ করিতেছে! কেন তুমি বিয়ে করিলে? কেন তুমি বাড়ী বন্ধক দিলে? বাড়ী বন্ধক দিবার তুমি কে? কিসের বাবা তুমি? তোমার মেয়েমানুষের গায়ে অত গহনা, ভয়ে তাহার একখানিতেও তুমি হস্তার্পণ করিতে পারিলে না। আমি বালক, কেবল আমাকে বঞ্চনা করিবার জন্য তুমি এই বাঘিনীকে বিবাহ করিয়াছ। গণ্ডা গণ্ডা ছেলে হইতেছে। পাছে আমি দাবিদার হই, সেই ভয়ে বাড়ীখানা আগে ভাগে বন্ধক দিয়াছ! গণ্ডা গণ্ডা ছেলে একটাও রাখিব না! সব গুলাকে গলা টিপিয়া মারিব, কেন তুমি বিয়ে করিলে? কেন তুমি বাড়ী বন্ধক দিলে? কেন তোমার মেয়েমানুষ পরের সঙ্গে মদ খায়! ছি বাবা! ছি ছি! ধিক্ তোমাকে! বাবা কি এই রকম? ছি বাবা! তোমাকে বাবা বলিতে নাই; আর আমি তোমাকে বাবা বলিব না; কি বলিয়া ডাকিব, তোমার মেয়েমানুষ মদ খাইয়া শিখাইয়া দিবে। মেয়েমানুষ কেন বলি,—আমি বলি না,—পণ্ডিতেরা বলেন, পক্ক বয়সে দ্বিতীয়বার বিবাহ করা অপেক্ষা, ভাল দেখিয়া

একটা মেয়েমানুষ রাখা ভাল, তুমিও আনরপুর হইতে এই মেয়েমানুষ আনিয়াছ, মেয়েমানুষ লইয়া থাক, আমি বাহির হইলাম; না হয় মেয়ে-মানুষ লইয়া তুমি বাহির হও, আমি এই বন্ধকী বাড়ীতে থাকি। যেমন করিয়া পারি, মহাজনের হাতে পায়ে ধরিয়া, এ বাড়ী আমি উদ্ধার করিব, তোমার নূতন ছেলেদের গলা টিপিয়া মারিব! যাও, আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম! বাবা তুমি নও! আর একদিন—যদি কোন দিন মোনার মাকে কাটিয়া ফেলিতে পারি, তবে আর একদিন তোমাকে বাবা বলিয়া শ্রীচরণ দর্শন করিব। প্রতিজ্ঞা যদি ভঙ্গ হয়, তাহা হইলে তোমার মত গাধাকে বাবা বলা আমার এই পর্য্যন্ত শেষ। হয় তুমি যাও, সব যাও; না হয় তোমরা থাক, আমি যাই। দেখ বাবা—এখনও বলি বাবা। দেখ বাবা! তোমার মুখ দেখিতে নাই। নূতন বিবাহের পর হইতে এতদিন আমি তোমাকে বাবা বলিয়াছি,—ধিক্ আমাকে! বড়ই পাপ করিয়াছি, প্রায়শ্চিত্ত করিব! আমার মা নাই, স্বচ্ছন্দে খুঁজিয়া লইব, আর একটি নূতন বাবা! কেন না, সংসারে একটা বাবা থাকা ভাল। ভাল বাবা চাই। তোমার মত বাবা আমি চাই না! যাও, চলিয়া চাও! সহজে যদি না যাও, ঘুসি মারিয়া বাহির করিব।"

একটু বাবাগিরী জানাইয়া, একটু পুরুষত্ব দেখাইয়া, এই কাহিনীর বাবাটী কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "কই? কই? ঘুসি কই? মারো দেখি ঘুসি?"

পাকানোই ছিল, তারাপদ ধাঁ করিয়া বাবার নাকে এক ঘুঁসি মারিল, বাবা ঘুরিয়া পড়িলেন, নাক দিয়া হু হু করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। হাসিতে হাসিতে কাদম্বিনীর দিকে চাহিয়া হাত নাড়িয়া তারাপদ বলিল, "মোনার মা! দেখ্, তোর দফা রফা হয়ে গেল! তুই রাঁড় হলি!"

মোনার মা রাঁড় হইল না। বাড়ীখানা ছাড়িতেও চাহিল না। মোনার মার দুই গালে দুই ঠোনা মারিয়া, ছেলেগুলাকে এক এক লাথি মারিয়া, হাসিতে হাসিতে, বকিতে বকিতে তারাপদ বাহির হইয়া গেল। বাবা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া রহিলেন। ঘরের ভিতর ক্রন্দনের রোল উঠিল। পাঠক মহাশয়েরা দেখিলেন, এক রকম ছিল পূর্ব্বের বাবা, আর একরম হইল কাদম্বিনীর কর্ত্তা বাবা।

শ্রীভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

শকুন্তলা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

স্বর শুনিয়া রাজা মনে করিলেন, "এই বৃক্ষবাটিকায় আলাপের ন্যায় কি শুনিলাম না?" সেই স্বর এত মধুর যে, তাহা মনুষ্যকণ্ঠনিঃসৃত কি পক্ষি-কূজিত, রাজা তাহা নির্ণয় করিতে পারিলেন না। কৌতূহলী হইয়া যেদিক হইতে শব্দ আসিয়াছিল, সেই দিকেই চলিলেন।

কিয়দ্দূর গিয়া রাজা যাহা দেখিলেন, তাহা হইতে আর চক্ষু তুলিতে পারিলেন না। দেখিলেন, তিনটি তাপস-বালা। তিনটিই প্রায় সমবয়স্কা—তিনটিই নবযুবতী। আহা মরি মরি কি রূপ! দেহে যেন ধরে না। কি সৌকুমার্য্য! যৌবনে যেন ঢল ঢল করিতেছে! হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, যেন পুষ্পরাশি থরে থরে সাজান রহিয়াছে। তরু-আলবালে জল-সেচন-কার্য্য ব্যাপৃতা তিনটি রমণীকে দেখিলে মনে হয় যেন, বসন্তানিলচালিতা পল্লবিনী লতা। রাজা অতৃপ্ত লোচনে দেখিতে লাগিলেন।

তাঁহার ঘরে সুন্দরী যুবতীর অভাব নাই; কিন্তু ইহাদের কাছে, তাহাদের রূপ লাগে কোথা? ইহাদের দেখিয়াই তিনি যেন তাঁহার মহিষীগণকে একে একে স্মরণ করিয়া তুলনায় সমালোচনা করিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, "দেখিলাম আজ উদ্যানলতা বনলতার নিকট পরাজিতা?"

এদিকে রমণীগণ ক্রমশঃ সেই দিকে আসিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে একজন অপর একজনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখ ভাই শকুন্তলা, মহর্ষি তোমার চেয়েও ঐ নবমল্লিকা গাছটিকে ভালবাসেন, এই দেখ না কেন, তোমাকে ইহার সেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন।"

এই "ভাই শকুন্তলা" সম্বোধনেই রাজা বুঝিলেন যে, ইনিই তপস্বী-কথিতা কণ্বদুহিতা শকুন্তলা। কালিদাস অতি সুন্দর উপায়ে রাজাকে শকুন্তলা চিনাইয়া দিলেন। তাঁহার এই নাট্য-চাতুর্য্য (Dramatic Art) সেক্সপিয়ারের অ্যাণ্টনীর বক্তৃতায় অথবা আয়াগোর বচন-চাতুর্য্যে প্রযুক্ত লিপি-কৌশল অপেক্ষা কোনও অংশে ন্যূন বলিয়া আমাদের মনে হয় না।

রাজা কন্যার অবিবেচনা দেখিয়া মনে মনে তাঁহার নিন্দা করিয়া বলিলেন, "মহর্ষি দেখিতেছি নীলোৎপল পত্রদ্বারা শমীবৃক্ষ ছেদন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। স্ত্রীলোকের কোমলতার যদি কিছু উপমা থাকে, তবে তাহা পদ্মের

পাতা। মহাকবি কালিদাস ঐ উপমা প্রয়োগ করিয়া কবিত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। পদ্মপাতাটি যখন জলের উপর ভাসিয়া থাকে, তখন তাহাকে দেখিতে বড়ই ভারসহ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু জল হইতে তুলিবামাত্র উহা ঢলিয়া পড়ে। কোমলা স্ত্রীও ঠিক্ সেইরূপ; তাহার সুগোল, সুঠাম দেহ-যষ্টি-খানি দেখিলে মনে হয় যেন, কত শ্রমসহিষ্ণু, কিন্তু সামান্যমাত্র শ্রম করিলে তাহার দেহ যেন ভাঙ্গিয়া পড়ে।"

তাহাদের সামান্য ক্ষণ দেখিয়া রাজার তৃপ্তি হইল না। দর্শনেচ্ছা আরও বলবতী হইয়া উঠিল। তাহাদিগকে ভাল করিয়া দেখিবার জন্য এবং তাহাদের বিশ্রাম্ভালাপ শুনিবার জন্য তিনি এক সন্নিহিত বৃক্ষান্তরালে লুক্কায়িত হইলেন। আর সহসা তাহাদের সম্মুখে যাওয়াও উচিত নহে,—তাহাদের কার্য্যে ব্যাঘাত হইবে। সাত-পাঁচ ভাবিয়া তিনি লুকাইলেন।

কাজটা বড় ভাল হইল না। যিনি সসাগরা পৃথিবীর রাজা, কুলকামিনীর সম্ভ্রম রক্ষা করা যাঁহার কর্ত্তব্য, তাঁহার পক্ষে এরূপে লুকাইয়া যুবতীগণের গতিবিধি লক্ষ্য করাটা ভাল দেখাইবে কি? তাহারা হয় ত কত মনের কথা বলিবে, কোনও পুরুষ নিকটে নাই দেখিয়া পরিহিত বস্ত্রাদি একটু আধটু "অসামাল" করিয়া দিবে? সে গুলা শুনা বা দেখা কি কোন ভদ্রলোকের উচিত? বিশেষ তিনি হিন্দু। হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র মনুসংহিতায় উক্ত আছে যে, যদি কোনও পুরুষ কোনও স্ত্রীলোকের অজ্ঞাতসারে তাহার নগ্ন বা প্রায়-নগ্ন দেহে দৃষ্টিপাত করে, তবে তাহার অনন্ত নরক বাস হয়। ঋষিবাক্য প্রগাঢ় শ্রদ্ধাশীল দুষ্যন্তের কি এরূপ করা উচিত? আমরা বলি, কোনমতে উচিত নহে। রাজা হয়ত আমাদের এই অনুযোগ শুনিলে বলিবেন যে, "আমি সব বুঝি, সব জানি; কিন্তু তবু পারি না। সুন্দরী স্ত্রীলোক দেখিবার লোভটুকু আমি ত্যাগ করিতে পারি না। ঋষিবাক্যে শ্রদ্ধা আছে—বলিয়া এক কথায় মৃগয়ার লোভ সামলাইতে পারি, অধর্ম্মে ভয় আছে বলিয়া—পত্নী বলিয়া উক্ত হইলেও অসামান্যা সুন্দরীকে অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু ঐটি পারি না, দেখিবার লোভটুকু সামলাইতে পারি না।

বলিতে পারি না, এ লোভ সামলাইতে পারেন, পৃথিবীতে এমন বীর কয়জন আছেন। রাজার এইরূপ প্রকৃতি দিয়া কবি আমাদিগকে এক মহাসত্য দেখাইয়া দিয়াছেন। দেখাইয়াছেন, যে যৌবনে উদ্দাম প্রকৃতি

হইলেই, মানুষ অপদার্থ হয় না—অসচ্চরিত্রতার ইহা একমাত্র নিদর্শন নহে। পক্ষান্তরে কেবল ইহা হইতে বিরত হইলেই সচ্চরিত্র হওয়া যায় না।

রাজা লুকাইয়া দেখিতে শুনিতে লাগিলেন। আমরাও রাজার পাশে দাঁড়াইয়া সাধু সঙ্গের মহিমা বুঝিতে পারিলাম, আমাদের ভাগ্যেও দেখা শুনা ঘটিল।

যে সখীটি শকুন্তলাকে নবমল্লিকার গাছ উপলক্ষ করিয়া কন্যার ভালবাসার তুলনা করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম অনসূয়া। শকুন্তলা তাঁহাকে বলিলেন, "ভাই অনসূয়া, প্রিয়ম্বদা বল্কলটা আমার বুকে বড় আঁট করিয়া পরাইয়া দিয়াছে, একটু আল্গা করিয়া দাও ত।" সখী দুইটির কাহার কি নাম, রাজা জানিতে পারিলেন।

এতক্ষণ রাজার খেয়াল হয় নাই যে, ইহাঁরা বল্কল পরিয়া আছেন; হাঁ করিয়া তাহাদের রূপই দেখিতেছিলেন, পরিহিত বস্ত্রের প্রতি অত লক্ষ্য করেন নাই; এতক্ষণে "হুঁস" হইল। শকুন্তলার কথা শুনিয়াই মনে করিলেন, "এ যে বল্কল দেখিতেছি, বল্কলের পরিবর্ত্তে ইহাঁকে বস্ত্রালঙ্কার পরাইলে আরও মানায়! পরক্ষণেই আবার ভাবিলেন না, 'যা'র যা'—তা'র তা'—ইহাঁকে বল্কলেই বেশ মানাইতেছে, গহনা গাঁটি পরিলে কুৎসিৎ দেখাইত।" সুন্দরী স্ত্রীলোক হইলেই যে তাহাকে বস্ত্রালঙ্কার পরিতে হয়, স্বীয় মহিষীদিগকে দেখিয়া রাজার এতদিন সেই ধারণাই ছিল—আজ তাহা ঘুচিল।

অনসূয়া বল্কল শিথিল করিতে আসিল; প্রিয়ংবদা বল্কল অত কষা হওয়ার কারণ লক্ষ্য করিয়া একটু ঠাট্টা করিল। প্রিয়ংবদা উহাদের সকলের অপেক্ষা একটু বয়োজ্যেষ্ঠা এবং পরিহাস-রসিকা। সে কথায় কথায় শকুন্তলাকে এমন ক্ষেপাইত যে শকুন্তলা মনে মনে তাহাকে প্রশংসা করিয়া মুখে ক্রোধ প্রকাশ করিতেন; কখনও বা তাহারই কথার দ্বারা তাহাকে পরিহাস করিতেন। আমরা সে মনোহর কলহ অল্পে অল্পে দেখিতে পাইব।

শকুন্তলা নবমল্লিকা, গাছটির নাম দিয়াছেন 'বনজ্যোৎস্না'। এই নাম করণেও কবির যথেষ্ট কবিত্ব আছে। জানালার ভিতর দিয়া অন্ধকার ঘরে যখন জ্যোৎস্না প্রবেশ করে, তখন জ্যোৎস্না রেখাটিকে বড়ই সমুজ্জ্বল দেখায়। আর নবমল্লিকা গাছটিও কালো যেন অন্ধকার ঘর। তাহার

ভিতর একটি সাদাফুল ফুটিলে ফুলটি ফুট ফুট করে—সমস্ত লতাটিকে যেন আলো করিয়া থাকে।

শকুন্তলা এইবার নবমল্লিকা লতার নিকট গিয়া দাঁড়াইলে প্রিয়ংবদা অনসূয়াকে বলিলেন, "অনসূয়া, শকুন্তলা বনজ্যোৎস্নাকে কেন এত ভাল বাসে জান?" সরলা অনসূয়া বলিল, "না—কেন?" প্রিয়ংবদা "বনজ্যোৎস্না কেমন সহকারকে বর পাইয়াছে; শকুন্তলারও ঐরূপ একটি উপযুক্ত বর পাইতে ইচ্ছা করে কিনা, তাই।" শকুন্তলা তাহা শুনিয়া আপনার সুন্দর মুখখানি নাড়িয়া বলিলেন, "তার চেয়ে স্পষ্ট বল না কেন, ভাই, তোমার নিজের বরের দরকার হইয়াছে, অত "ফেরাফিরি ভাঁড়াভাঁড়িতে" কায কি? প্রিয়ংবদা কথাটা গায়ে মাখিলেন না।

রাজা এতক্ষণ শকুন্তলাকে দেখিতেছিলেন—দেখিয়া মজিতেছিলেন, এখন তাঁহাকে পাইতে বাসনা হইল। তাঁহার গৃহে যে বহুমহিষী আছেন, তাঁহারা সকলে যে সপত্নীসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে ব্যথিত হইবেন, সে কথাটা তিনি একবারও ভাবিলেন না। শকুন্তলার রূপ, তাঁহার চলন বলনের ভঙ্গী, তাঁহার সারল্য দেখিয়া একবারে তাঁহাকে পাইয়া বসিতে চাহিলেন। কথাই আছে, "যার ছেলে যত পায়, তার ছেলে তত চায়।"

আমাদের মনে হয়, রাজা তাঁহার মহিষীগণের মধ্যে একজনকেও পূর্ব্বরাগের বশবর্ত্তী হইয়া বিবাহ করেন নাই। স্বয়ংবরের নিমন্ত্রণ পাইয়া কন্যালয়ে যাইতেন এবং কন্যা তাঁহার রূপ দেখিয়া এবং বেত্রবতীর নিকট তাঁহার গুণ ও পদমর্য্যাদা শ্রবণ করিয়া তাঁহার গলে বরমাল্য দিতেন; যথারীতি বিবাহান্তে কন্যা রাজান্তঃপুরে গিয়া মহিষী সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেন। এখন, শকুন্তলায় তাঁহার চিরাগত প্রথার বিরুদ্ধাচরণ হইল, বিবাহের পূর্ব্বেই তিনি শকুন্তলাকে ভাল বাসিয়া ফেলিয়াছেন,—নূতনত্ব জন্মিয়াছে, সুতরাং তাঁহাকে না পাইয়া থাকিতে পারেন না। পুরাতনে বিরক্ত হইয়া লঙ্কার দশানন একদিন দুঃখিতচিত্তে বলিয়াছিলেন, "নাহি রমণী ভূতলে, প্রেম আশে সাধি যারে, দেবকন্যা ইঙ্গিতে আমায় ভজে।" যাহারা চিরকাল অযাচিত প্রেম লাভ করিয়াছে, যাহাদের পদে সুন্দরীকুল বিক্রীত, তাহারা মাঝে মাঝে মুখ বদলাইবার আকাঙ্ক্ষায় সাধাসাধি, কাঁদাকাঁদি, মান, মান-ভঞ্জনের আস্বাদ পাইতে ইচ্ছা করিয়া থাকে। যে কারণেই হউক, রাজা শকুন্তলাকে পাইতে বাসনা করিলেন।

শ্রীদেবেশ্বর মুখোপাধ্যায়।

উমা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পুস্তক পাঠ করিয়া প্রাণের উচ্ছ্বাসে অনেক কথা বলিয়াছি, তবু কিছুই বলা হইল না। সমাজের প্রত্যেক গৃহে অধিকারী ভেদে কর্ত্তব্য ; ধর্ম্ম, আচার শিক্ষা দেওয়ার আবশ্যকতা যে কতদূর তাহার কিছুই বলা হইল না। পাঁচকড়ি বাবু তাঁহার পুস্তকে তাহা সুবিধা মত দেখাইতে ত্রুটী করেন নাই! মোট কথা, বিনোদিনীর জন্য দায়ী উমার পিতা এবং কতক পরিমাণে উমার শাশুড়ী! যোগেশ্বরেরও কোন দোষ নাই গ্রন্থকার বলিতেছেন,—তাহারও কারণ বিনোদিনীর মতই! ব্রাহ্মণোচিত শিক্ষা তাহার হয় নাই। বিনোদিনী যেমন সাদা কাপড় পরিয়াই হবিষ্যাশিনী হইয়াই বিধবা ব্রহ্মচারিণী, যোগেশ্বরও তেমনি গলায় পৈতা ঝুলাইয়াই ব্রাহ্মণ! যোগেশ্বর উচ্চ শিক্ষা পাইয়াছেন বটে, সে কেবল পুঁথিগত, তাহা কেবল পাশ করিবার ও বড় চাকরীর আশায়, জীবনে যে তাহা খাটাইতে হইবে, তাহা একদিনও তিনি ভাবেন নাই বা তাহার চেষ্টা করেন নাই। মাতাও বাল্যকাল হইতে সে শিক্ষা কিছুই দেন নাই, সুতরাং সংযম শিক্ষা কিরূপে হইবে? কিন্তু তথাপি যোগেশ্বরের উপর আমার রাগ যায় না, তার উপর আমার ক্ষমাবৃত্তি তেমন চালনা করিতে পারি না। বিনোদিনীর চোকের জল দেখিলে আমারও সহানুভূতির অশ্রু আসে, কিন্তু যোগেশ্বরের চোকের জলে আমার ততটা হয় না, কারণ সে কেবল রূপের লালসায়, ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় উমার ন্যায় সতীকে অবহেলা করিয়াছে। বাস্তবিক সে যদি উমাকে অবহেলা না করিয়া, হতাদর না করিয়া, বিনোদের প্রতি আসক্ত হইত, তাহা হইলে হয়ত আমার এত রাগ হইত না ; উমাও এত কষ্ট পাইত না ; সে যদি উমাকে নিজ মনের ভাব খুলিয়া বলিত, তবে উমা যেরূপ স্বামী প্রেমবতী ; তাহাতে সে হয়ত স্বয়ং স্বামীর প্রবৃত্তির সন্তোষ বিধান করিতে যাইত এবং তখন হয় ত ভগবদনুগ্রহে বিল্বমঙ্গলের মত যোগেশ্বরের চৈতন্য হইতে পারিত, সব দিক রক্ষা পাইত, কিন্তু পাপিষ্ঠ তাহা করে নাই—সে অবজ্ঞা করিয়া সতীর মনে কষ্ট দিয়াছে, তাহাকে লুকাইয়া তাহার বস্তু অন্যকে দিয়াছে, তবুও সতী একদিনের জন্যও স্বামী

প্রেম হইতে চ্যুতা হয় নাই, স্বামীর প্রতি ভক্তি হারায় নাই! বিনোদিনী পুরুষান্তরে কখনও নিজ দেহ অর্পণ করে নাই, সে যোগেশ্বরে রীতিমত আত্ম সমর্পণ করিয়াছিল, অকৃত্রিম ভালবাসার সহিত স্বামীভাবে যোগেশ্বরে আত্ম সমর্পণ করিয়াছিল। এইখানে বিনোদিনী কুন্দ অপেক্ষা অনেক কম দোষী, কারণ কুন্দ স্বামীসঙ্গতা হইয়াও পুরুষান্তরে প্রেমবতী হইয়াছিল। অন্যান্য বিষয়ে উভয়েই প্রায় তুল্য বলিয়া বোধ হয়। তবে বিনোদিনীর একেবারে যে দোষ নাই, তাহা নহে, তাহার এরূপ করাও যে মহাপাপ, তাহাতে সন্দেহ নাই। যোগেশ্বরকে সে অন্যের স্বামী জানিয়া সেই রমণীর বিনা আদেশে ও ধর্ম্মসঙ্গত কোন বন্ধনে বদ্ধ না হইয়া তাহার এরূপ করা কর্ত্তব্য হয় নাই, সে কথা তাহার মৃত্যুকালে তাহার মাতুল তাহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, তার পর সেও তাহা বুঝিয়াছিল এবং মৃত্যুকালের প্রলাপের সময় সে যোগেশ্বরকে স্বামী ভাবিতে ভাবিতে নিজ স্বামীর ছায়ামূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহাকেই তখন ক্ষমা করিবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিল এবং তখন তাঁহারই প্রশংসা ও যোগেশ্বরের নিন্দা করিয়াছিল।

কিন্তু যোগেশ্বরের ভালবাসা অকৃত্রিম নহে, সে কেবল একটা লালসার তাড়না মাত্র, ইন্দ্রিয়ের নিয়োগ মাত্র ; তাহাতে নরকের অগ্নি দপ্ দপ্ জ্বলিতেছে কিন্তু স্বর্গের অমৃতের স্নিগ্ধতা ও পবিত্রতা একটুও নাই। যোগেশ্বরের কেবল বিনোদের গর্ভ লক্ষণ দর্শনে এবং মায়ের বাটী পরিত্যাগে তথা উমার আগমনে চেতনা হইয়াছে, এ কথা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন ; এরূপ চেতনা অনেকেরই হইতে পারে! তার পর উমার চেষ্টায় যখন যোগেশ্বর বিনোদের সহিত দেখা করেন, তখনকার কথাবার্ত্তাতেই তাঁহার মনের ভাবের সঙ্কীর্ণতা ও নীচতার পরিচয় পাওয়া যায় এবং উমার মধুর তিরস্কারেও তাহা বুঝিতে পারা যায়। মোট কথা, যোগেশ্বরের প্রতি আমার একটুও সহানুভূতি নাই। কিন্তু একথাও স্বীকার করিতে লজ্জা করি না যে, আমরা নব্যশিক্ষিত, অনেকেই এক এক যোগেশ্বর ; আমরা মিল, কোম্‌ত্, মাটসিনি, বেদান্ত-দর্শন, গীতা পড়িয়াও প্রায়শঃই সংযম শিখি না, জীবনের উন্নতির পথ দেখি না, কেবল উদ্‌গীরণ করি এইমাত্র, বিদ্যা প্রকাশ করি এই মাত্র—নতুবা আমরা নীতি বিজ্ঞানের উচ্চ পরীক্ষা দিতে গিয়া জুয়াচুরী অপরাধে তাড়িত হইব কেন? উচ্চ শিক্ষিতের শত শত অসদাচরণে সমাজবক্ষঃ কলঙ্কিত হইবে কেন? তাই বলি, যোগেশ্বর

বর্ত্তমানকালের অসংযত চিত্তবৃত্তি উচ্চ শিক্ষিত যুবকের একখানি অতি স্বাভাবিক চিত্র মাত্র।

এই প্রথম প্রলোভনের কালের অবস্থা তুলনা করিলে আমরা গোবিন্দ লালকে যোগেশ্বর অপেক্ষা খুব উচ্চ স্থান দিতে প্রস্তুত। গোবিন্দলাল "রোহিণী তাহার প্রতি আসক্ত" জানিয়াও কাল ভ্রমরকে ভুলে নাই—স্বামী-কর্ত্তব্য বিস্মৃত হয় নাই; তাহার নিজ মন জয় করিবার জন্য সে বিদেশগামী পর্য্যন্ত হইয়াছিল। তার পর যে সে খারাপ হইল, সে ভ্রমরের ভুল বশতঃ ভ্রমরের প্রতি রাগ করিয়া, অভিমান করিয়া। ভ্রমর যদি উমা হইত, আর যোগেশ্বর যদি গোবিন্দলাল হইত, তাহা হইলে সব দিক রক্ষা পাইত, কিন্তু তাহা হইল না, তাই যোগেশ্বর পড়িল, আর উমা আসিয়া হাত ধরিয়া তুলিল, ময়লা মাটি ঝড়িয়া ফেলিয়া নিজ কণ্ঠরত্ন কণ্ঠে পরিধান করিল।

এ বিষয় উমার তুলনা নাই। উমার দেবী চরিত্র এখানেই পরিস্ফুট, ভ্রমরের অপেক্ষা উমার স্থান অতি উচ্চে। ভ্রমরের সন্দেহেই তার সর্ব্বনাশ ঘটিল, অভিমানেই তার সুখের প্রাসাদ ধূলায় মিশাইল; আর উমা স্বামীকে অন্যাসক্তা জানিয়াও তখন শাশুড়ীর পত্র পাইয়াই স্বামীর উদ্ধারের জন্য ছুটিল; স্বামীর এ বিপদে তাঁহার মুক্তিপদ দেখাইতে না পারিলে পতিব্রতা সহধর্ম্মিণী কিসে? যে ভাল, তাহাকে সকলেই ভাল বাসিতে পারে, যে ভাল বাসে, তাহাকে ভালবাসায় মহত্ত্ব কি? কিন্তু যে ভাল না বাসে, যে মন্দ, ঘৃণিত, তাহাকে যে ভালবাসে, সেই ত দেবহৃদয়ের লোক; উমার সে দেব হৃদয় ছিল? তার উপর তাহার ইহ পরকালের দেবতা স্বামীর এই পাপে তাহার হৃদয় কেমন করিয়া স্থির থাকিবে? তাই সে ছুটিয়া গেল। উমা এত দিনের বিরহে স্বামীর মর্ম্ম স্বামীর প্রেমের গভীরতা, তাহার লৌকিকত্ব বুঝিয়াছে—স্বামীর দেবত্ব তাহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, স্বামী খেলার জিনিস নহে তাহা সে জানিয়াছে। বিরহই প্রকৃত প্রেমের পরীক্ষা, সে পরীক্ষার ফল সে পাইয়াছে—তাই সে ফল দেবচরণে অর্পণ করিতে সে ছুটিল; স্বামীর এ পতনও যে তাহারই ভুলবশতঃ তাহা শতবার স্বীকার করিয়াছে, দেবতা লইয়া খেলা করা যে ভাল নহে, তাহা সে বুঝিয়াছে! উমা আসিল, নিজ সংসার নিজে বুঝিয়া লইল, নিজ দেব-সেবা নিজে করিতে ব্যাপৃতা হইল। স্বামীর সহিত যখন দেখা হইত, তখন সেই লজ্জালিপ্ত, অবনত মুখ, স্বামীর সহিত সেরূপ প্রফুল্লভাবে সে কথা বলিল, ব্যবহার করিল, তাহাতে বস্তুতঃই আমি

বিস্মিত হইলাম, আমার চক্ষে জল আসিল, দেহে রোমাঞ্চ হইল। যোগেশ্বরের সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে বলিলাম, "এ যে দেবতার মত কথা! এমন স্বর্গীয় কথা কোথায় শিখিলে উমা?" আমাদের স্থান সংক্ষিপ্ত, উমার এসব কথা তুলিয়া দিবার ও ইহা লইয়া উপযুক্ত আলোচনা সম্ভব হইবে না, কিন্তু উমা যেরূপ ভাবে এই পতিত স্বামীকে আদর করিয়াছে, তাঁহার অশ্রু মুছাইয়াছে, স্বীয় হৃদয়ের ঔদার্য্য প্রকাশ করিয়াছে, তাহাতে আমরা মুগ্ধ হইয়াছি, এরূপ কথা, এরূপ দৃশ্য আমরা বড় বেশী দেখিতে পাই নাই। এ দৃশ্য দেখিলেও পুণ্য হয়, হৃদয় উন্নত হয়, ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, পুণ্যের জ্যোতিতে পূত হৃদয়ের সংস্পর্শে মহাপাপও ভস্মীভূত হইতে পারে। হৃদয়ে নির্ম্মলতা আসিতে পারে! সতী পতিব্রতা নিজগুণে যে পতিতের উদ্ধার করিতে পারেন, তাহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি, সংসারে প্রত্যক্ষ করিয়াছি! স্বামী যে দোষ করিয়াছেন, জানিয়া শুনিয়া উমা তাহা বিশ্বাস করিতে চাহে না, তাহা শুনিতে চাহে না। "তাহার স্বামী তাহারই আছে, স্বামীর অন্য কিছু খোঁজে তাহার আবশ্যক কি?" এই তাহার মত—এই তাহার ধারণা! "তাহার কলসী মাটীর নহে, তাহার সোণার কলসী, ফুটো হইলেও তাহা আবার নূতন করা যায়, সে ফুটো বন্ধ করিয়া দেওয়া যায়, আর তাহার চিহ্নও থাকে না,"—এই তাহার মত! ধন্য উমা! ধন্য তোমার হৃদয়! ভগবতী সাবিত্রী অরুন্ধতী প্রভৃতি সতীগণ উমার পবিত্র হৃদয়ে এই নিরভিমানের, এই আত্ম নির্ভরের ভাব উদ্দীপ্ত করিয়া দিয়াছিলেন, তাই বিষবৃক্ষে অমৃত ফল ফলিল; নতুবা প্রাকৃত রমণীর ন্যায় উমা এ অবস্থায় অভিমান করিলে, স্বামীকে অবজ্ঞা করিলে অতি বিষময় ফল ফলিত, সংসার উচ্ছন্ন যাইত, যোগেশ্বর নরকের কীট হইয়া পড়িত, আর উমাও শেষে প্রাণ হারাইত, অকালে সংসার-সুখ ফুরাইত। স্বামী সকল অবস্থাতেই পূজ্য, ত্যজ্য নহেন, তাঁহার পতন হইলে সতী নিজ ধর্ম্মবলে তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া নিজ সহধর্ম্মিণী ধর্ম্মের সার্থকতা সম্পাদন করিবেন, উমা এই মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়াই এ সাধনা করিয়াছিল, এবং ভগবদিচ্ছায় তাহাতে সিদ্ধিলাভও করিতে পারিল।

স্বামী যাহা ভালবাসেন, উমা তাহা ঘৃণা করিতে পারে না; স্বামীর হৃদয় যে হরণ করিয়াছিল, সেই বিনোদিনীকেও উমা স্নেহ করিতে

পশ্চাৎপদ হয় নাই, সে বাহিরের স্নেহ নহে, পবিত্র স্নেহ; সে বিনোদিনীকে কটু বলে নাই, অবজ্ঞা করে নাই, দেবীর ন্যায় সেই কলঙ্কিতাকে বক্ষে ধারণ করিয়াছে, তাহার অশ্রু মুছাইয়াছে! তার উপর তাহার চিত্তবিনোদনের জন্য স্বয়ং উদ্যোগ করিয়া স্বামীর গৃহে তাহাকে দিয়া আসিয়াছে, স্বামীর আপত্তি এমন করিয়া খণ্ডন করিয়াছে যে, পড়িলে চোকে জল আইসে! আন্তরিক ভাবে প্রফুল্লতার সহিত এই স্বার্থ ত্যাগ করা কতদূর কঠিন, কতদূর মনের বলের পরিচায়ক, তাহা রমণীগণ আমা অপেক্ষা অনেক বেশী বুঝিতে পারেন। বিনোদিনীর গর্ভে স্বামীর ঔরসজাত সন্তান, সেই বিনোদকে উমা দেখিতে পারে? কখনও নহে; সে জন্য সে সমাজ-নির্য্যাতনও সহিতে প্রস্তুত? জ্যেষ্ঠ পুত্র বিনোদের বিরুদ্ধে বলিতে গেলে, উমা তার মুখ চাপিয়া ধরে, "ছি! সে তোমার মাসী মা!" পরলোকগামিনী বিনোদের অবস্থায় উমার কি কষ্ট! কি শুশ্রূষা! আবার এদিকে স্বামীর প্রতি কি গভীর প্রেম, কি ভালবাসা, কি দৃষ্টি!

এই সব গুণেই উমা রমণীর আদর্শস্থানীয়া, পতিব্রতাগণের মধ্যে আসন পাইবার যোগ্যা; স্বামীতে সে মিশিয়া গিয়াছে, পৃথক অভিমান, দ্বেষ, হিংসার অস্তিত্ব সে হৃদয়ে নাই।

এই জন্যই উমাকে আমাদের এত ভাল লাগিয়াছে। যোগেশ্বর উমার ন্যায় সতীর গুণেই উদ্ধার পাইয়াছেন, একথা বাহুল্য!

যোগেশ্বরের মাতায় গৃহিণীর কার্য্যকুশলতার অভাবে সংসারে কিরূপে পাপ প্রবেশ করে, তাহা সুন্দর পরিস্ফুট! গ্রন্থকার একথা বিশদরূপে বুঝাইয়াছেন, যে তাঁহার গৃহিণীপণার যোগ্যতা থাকিলে এরূপ হইতে পারিত না; আমরাও তাঁহার সে দোষ ভুলিতে পারি না। তিনি খরদৃষ্টি রাখিলে, চারিদিক্ দেখিয়া শুনিয়া কাজ করিলে এরূপ ঘটিত না তাহা নিশ্চয়; তবে তিনি কোন দিন গৃহিণীপণা করেন নাই, ঈশ্বর সে সুযোগ তাঁহাকে দেন নাই, সুতরাং তিনি সে সবে দক্ষা হইতে পারেন নাই; ছেলে কি করিতেছে, তাহা বড় খোঁজ করেন নাই, কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মানুরাগের প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। পুত্রের দোষ দেখিয়া সে পাপসংসারে তিনি একদণ্ডও থাকেন নাই, পুত্রের সে দোষ গোপনের চেষ্টা করেন নাই, এমন সাধের, আদরের পুত্র ও পৌত্র অনায়াসে ত্যাগ

করিয়া তিনি কাশী চলিয়া গিয়াছেন, এবং পুত্রবধূকেই উপযুক্ত পাত্রী জানিয়া তাহাকে যাইতে পত্র দিয়াছেন। এটা অবশ্য তাঁর প্রশংসার বিষয়; কিন্তু তথাপি তিনি রমণী, তাঁর এসব দিকে একটু সাবধানতা আমরা খুব প্রত্যাশা করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা না পাইয়া দুঃখিত হইয়াছি।

পুস্তকের শেষভাগে যে সব উপদেশগুলি যোগেশ্বরের শ্বশুর ও পিতা যোগেশ্বরকে দিয়াছেন, সেগুলি পাঠকবর্গের বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাহতে অনেক উচ্চ অঙ্গের ধর্ম্মতত্ত্ব এবং দার্শনিক সত্যের আলোচনা আছে।

উমা একাধারে প্রকৃত ও আদর্শ (real and ideal) উপন্যাস; যোগেশ্বর! বিনোদিনী প্রভৃতি প্রকৃত আর মহামহিমাময়ী 'উমা' সকলের মধ্যে আদর্শস্থলে দাঁড়াইয়া স্বীয় চরিত্রপ্রভায় দিঙ্মণ্ডল আলোকিত করিতেছে!

তাহার চরিত্রের আদর্শে, মাধুর্য্যে হৃদয় মুগ্ধ হয়, প্রাণ পুলকিত হয়। পাঠক-পাঠিকাগণ পুস্তকখানি কিনিয়া পাঠ করুন, স্বীয় স্বীয় প্রিয়জনকে পাঠ করিতে দিন এবং ইহা হইতে শিক্ষালাভ করিয়া সমাজ উন্নত করিতে চেষ্টা করুন; ইহা পাঠে অনেক স্বকর্ত্তব্য অবহেলার কথা মনে হইবে, ইহাতে পাপের চিত্র আছে, কিন্তু তাহার সহিত লেখকের হৃদয়ের বেদনা, কাতরতা, অশ্রু এবং উপদেশজড়িত—সে চিত্রে হৃদয় প্রলুব্ধ হয় না, হৃদয় সংস্কৃত হয়—ইহাতে পুণ্যের আদর্শ আছে, তাহাতে হৃদয় ভক্তিভারাবনত হয়; ইহা পাঠে রুচি বিকৃত হইবে না, সংস্কৃত হইবে, মন উন্নত হইবে; রমণীগণ হিন্দুনারীর পতিব্রতার উচ্চ আদর্শ, তাঁহার ক্ষমতা এবং তেজ দেখিতে পাইয়া তাহা লাভ করিবার জন্য চেষ্টিতা হইবেন।

তাই বলি, এ গ্রন্থ আমাদের রমণীগণের হস্তে দিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত, পুরুষের পাঠেরও সম্পূর্ণ উপযোগী; ইহাতে কুরুচি নাই, হৃদয় অবনতকারী কোন চিত্র নাই! এ পুস্তকের যদি আদর না হয়, এ আদর্শ যদি মনোনীত না হয়, তবে জানিব, হিন্দু-সাহিত্য অধঃপতিত হইয়াছে, হিন্দু-সমাজ প্রকৃত লক্ষ্য হইতে চ্যুত হইয়া বহুদূরে পড়িয়াছে।

আমি প্রার্থনা করি, গৃহে গৃহে উমার ন্যায় পতিব্রতা শোভিতা হইয়া সংসার শান্তিময় করুক, এইরূপে পতিতগণের উদ্ধার সাধন করুক, তাহাদিগকে স্বর্গের পথে লইয়া যাউক।

পাঁচকড়ি বাবু, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, বিজ্ঞতায়, বয়সে, সর্ব্ববিষয়েই আমার অপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ, তিনি আমার প্রণম্য, বিশেষ ভক্তির পাত্র!

তাঁহাকে আর কি বলিব! এই নবীন গ্রন্থকাররূপে তিনি যে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, তাহার জ্যোতিতে জনগণ মুগ্ধ হউক, যে আদর্শ নিজে একদিন দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন, এবং যাহার ছায়ায় উমার গৌরবের চরিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেই আদর্শের বিকাশ নিজ পরিবারে দেখিয়া তিনি সুখ ও শান্তি লাভ করুন, আর গৃহে গৃহে এই আদর্শ স্বর্গীয়া দেবীগণের কৃপায় প্রতিফলিত হইয়া সংসারকে স্বর্গের সিংহাসনের দিকে লইয়া যাউক!

পাঁচকড়ি বাবুর লেখনী হইতে যেন সুর তরঙ্গিণীর অনাবিল পূতঃঅমৃতধারা পরিপুষ্ট, এইরূপ উচ্চ আদর্শ আরও প্রসূত হইয়া সাহিত্যের ও সমাজের মহদুপকার সাধন করে!

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

শ্রীযুক্ত রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের মৃত্যু উপলক্ষে

হৃদয়োচ্ছ্বাস—শোক।

একি একি একি শুনিনু আজ।
নাহি এ জগতে ভায়াল রাজ॥
এই কি বিধির বিহিত বিধি।
হারানু অকালে অমূল্যনিধি॥
এই কি বিধাতা তোমার কাজ।
অকালে কপালে হানিলে বাজ॥
আঁধারি আকাশ আঁধারি পুরী।
রাজেন্দ্র-মাণিক করিলে চুরি।
বঙ্গ-গগনের গৌরব-রবি।
সাহিত্য-কমল-কানন-কবি॥
জগত জুড়িয়া সুযশ যাঁর।
হেরিব না তাঁরে জগতে আর॥
হেরিব না তাঁর সহাস মুখ।
স্মরিতে এ কথা বিদরে বুক॥
শুনিব না তাঁর মধুর ভাষ।
হেরিব না তাঁর মধুর হাস॥
উদার স্বভাব মধুর ভাব।
উদার হৃদয় মধুর হাব॥
মধুর মূরতি সুষমা সার।
হেরিব না কভু জগতে আর॥
ত্যজিয়া তনয়া-তনয়-মায়া।
জরতী জননী যুবতী জায়া॥
যত্ন-সুলালিত ললিত কায়া।
রাজ-সমাদৃত রাজত্ব-পায়া॥
আত্মীয় স্বজন সুহৃদ্‌গণ।
পরম-আত্মীয় 'বান্ধব-জন'॥
গেলেন চলিয়া সকলি ছাড়ি।
দেহ হ'তে প্রাণ লইয়া কাড়ি॥
অতুল বৈভব অতুল ধন।
রম্য উপবন সুরম্য বন॥
সুরম্য প্রাসাদ সুরম্য বাড়ী।
হাতী ঘোড়া গাড়ী সুরম্য যুড়ী॥
ত্যজিয়া এ সব জানি অসার।
গেলেন চলিয়া ছাড়ি সংসার॥
জননী ধরণী আত্মীয়জন।
শোকে অচেতন ব্যাকুল মন॥
বালক-বালিকা জননী সনে।
আছাড়-কাছাড় খেতেছে ক্ষণে॥
রাজা প্রজা বন্ধু-বান্ধবজন।
না কাঁদে না হেরি এ হেন জন॥
জানি এ জগতে কেহ না রবে।
সকলেরি ক্রমে যাইতে হবে॥
কিন্তু যিনি বহু জনের পতি।
অকারণ তাঁহার কেন এ গতি॥
শত শত লোক জগতে আছে।
যাতনা-অস্থির মরিলে বাঁচে॥
তাদেরে ফেলিয়া হে কাল আজ।
কেমনে এমন করিলে কাজ॥
কিছু কি তোমার না হ'ল দয়া।
কিছু কি হৃদয়ে নাহিক মায়া॥
যাহোক করিলে যাহা ফিরিবে না আর
দীর্ঘজীবী করি রাখ রাজপরিবার॥
সুকবি বিদ্বান বাগ্মী অমাত্য-প্রধান।
জগত জুড়িয়া যাঁর যশের বাখান॥
যাঁর গুণে বিমোহিত সাহিত্য সংসার
বিদ্যার সাগর যিনি বুদ্ধির আগার॥
যিনি কাজে রাজা, রাজা উপাধিতে রাজা
যাঁর সুশাসনে সুখে আছে যত প্রজা॥
কালীর প্রসাদে যাঁর নাম অনুরূপ।
যাঁর গুণে অনুরক্ত ছিলা মৃত ভূপ॥
শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ যাঁহার আখ্যান।
রায় বাহাদুর যাঁর উপাধি-সম্মান॥
তাঁরে দীর্ঘজীবী করি, রাজপরিবার।
রাখ সুখে সদা এই প্রার্থনা আমার॥

শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভক্ত।

কবিকেশরী।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের এক পরিচ্ছেদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

এই বৎসর শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এষ্টেটে তাঁহার সুসংস্কৃত ব্রাহ্মবিধান মতে পুণ্যাহের কার্য্য প্রথম আরম্ভ হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের জমিদারী নদীয়ার অন্তর্গত বিরাহিমপুর পরগণায় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া অতি সমারোহের সহিত শুভ পুণ্যাহ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ২৩শে আষাঢ় এই শুভ পুণাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়। সুপ্রসিদ্ধ রামায়ণ অনুবাদক এবং "তত্ত্ব-

বোধিনী" পত্রিকার বর্ত্তমান সহকারী সম্পাদক,—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় শুভ পুণ্যাহ আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।

আচার্য্যের কর্ম্ম সমাধান হইলে বিদ্যারত্ন মহাশয় কিছু অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। পীড়া সহসা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ফলতঃ পীড়ার ভীষণ যন্ত্রণায় বিদ্যারত্ন মহাশয় জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তিম দশা উপস্থিত হইয়াছিল। অন্তিমকাল ব্রাহ্মণের অতি প্রিয় পুঁথি-গুলির কথা স্মরণ হইল। তিনি অতি কষ্টে বলিলেন, "রবি দাদা! আমি তো চলিলাম, আমার সকলই তোমরা জান। তবে আমার একটী প্রার্থনা এই যে, আমার কতকগুলি প্রাচীন পুঁথি ও পুস্তক আছে; সেইগুলি যাহাতে আমার ছাত্র ও পুত্রপ্রতিমের হস্তগত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিও।"

এই কথা বলিতে বলিতে বিদ্যারত্ন মহাশয় অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। রবীন্দ্রনাথ ভাল ডাক্তার-বৈদ্যহীন দেশে তাঁহাকে লইয়া বিষম বিব্রত হইয়া পড়িলেন। ব্রাহ্মণের জন্য তাঁহার কিছু অধৈর্য্য দেখা গেল। নিজের প্রাণাধিক পুত্রের কি পরিবারস্থ অন্য কাহারো ব্যারাম হইলে, তিনি বিচলিত হয়েন না। সে সময় তাঁহার ধীর ও শান্ত প্রকৃতি অতুলনীয়। কিন্তু অপর কোন আশ্রিত ব্যক্তির পীড়া হইলে তাহার অস্থিরতা লক্ষণ প্রকাশ পায়। উদ্যম ও অধ্যবসায় রবীন্দ্রনাথ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা-শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। তিনি সমস্ত রাত্রি ধরিয়া ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া আমন্ত্র্য থাকিয়া মনে প্রাণে বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সেবাশুশ্রূষা ও চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। এবং ভাল ডাক্তার আনিবার জন্য কুমার-খালিতে লোক পাঠাইলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের চিকিৎসাগুণে বিদ্যারত্নের ক্রমশঃ রোগের উপশম হইতে লাগিল। শেষে তিনি রোগমুক্ত হইলেন। বিদ্যারত্ন মহাশয় বলেন, "রবি দাদার অসামান্য গুণপণা সন্দর্শন করিয়া আমি বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি। তিনি চাকর-মুনিব-সম্পর্ক ভুলিয়া আমার যেরূপ সেবা শুশ্রূষা ও চিকিৎসা করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনাতীত। অধিক কি, রবিদাদা সেরূপ যত্ন ও পরিশ্রম না করিলে, বৃদ্ধের হাড় কয়খানা পদ্মাতেই রাখিয়া আসিতে হইত। রবিদাদা আমাকে যমের দক্ষিণ দ্বার হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছেন।" রবীন্দ্রনাথের এই মহত্ত্ব তাঁহার ন্যায় বড় লোকের পক্ষে অসাধারণ, আমরা দেখিয়াছি, তিনি সামান্য ভৃত্যটীরও যে কোন পীড়া হউক না কেন, স্বয়ং তাহার চিকিৎসা সেবা শুশ্রূষার রীতিমত বন্দোবস্ত

করিয়া থাকেন। যত দিন না রোগী সুস্থ ও কার্য্যক্ষম হয়, তত দিন পর্য্যন্ত তাহার চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষাদির ত্রুটী লক্ষিত হয় না। রবীন্দ্রনাথ যে সকল অলোক সাধারণ সদ্গুণ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে এ মহত্ত্ব তাঁহাতেই সম্ভবে। প্রতি পাদবিক্ষেপে তাঁহার অনন্যসাধারণ মহত্ত্ব যেন আপনি বিকাশিত হয়।

লরেন্সের জন্মোৎসব—লরেন্সের নাম শুনিয়া পাঠকগণ চমকিত হইবেন না। ইনি চন্দ্রশেখরের Lowrence Foster বা শৈবলিনী ওরফে ষমের প্রণয়ভিখারী ফষ্টার নহেন—অথবা রবীন্দ্রনাথের স্বকপোলকল্পিত জুওলাজি-ক্যাল গার্ডেনের উপযুক্ত কোন প্রকার কিম্ভূত-কিমাকার জীব নহেন। ইনি রবীন্দ্রনাথের পুত্র শ্রীমান্ রথীন্দ্রনাথের গৃহশিক্ষক। ইনি এখনো সশরীরে বর্ত্তমান। বয়স কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধ পঞ্চাশৎ বর্ষ। সাহেবপুঙ্গব বড় সরল,—কর্ত্তব্যনিষ্ঠ এবং মিষ্টভাষী। সাহেবের কোন কোন দোষ থাকিলেও তাহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠার গুণে রবীন্দ্রনাথ তাহার সকল অপরাধ ক্ষমা করেন; অধিকন্তু তাহার সকল আব্দার রক্ষা করিয়া থাকেন। এই বৎসর ২৯শে শনিবার সাহেবের জন্মোৎসব পর্ব্ব সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছিল। সাহেব রবীন্দ্রনাথের নিকট আব্দার জ্ঞাপন করিলেন যে, দেখ মিঃ ঠাকুর, আজ আমার জন্ম দিন; আজ আমাকে ছুটী দিতে হইবে। আমার পিতা মাতা থাকিলে আমার জন্মোৎসব করিত। সাহেবের আব্দার হৃদয়বানের হৃদয়ে বড় লাগিয়াছিল। তিনি বিশেষ আয়োজন করিয়া সাহেবের জন্মোৎ-সব পর্ব্ব সমারোহে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ স্থানীয় স্কুলের ছাত্র-দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন। শিলাইদহ বাস ভবনের সম্মুখের ময়দান, বালকদিগের খেলিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। সাহেব বালকদিগকে সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া তাহাদের দেশের নানাপ্রকার খেলা দেখাইলেন, Huddle Race, Long run, Long jump, High jump. প্রভৃতি নানা-প্রকার খেলা হইয়াছিল। এই সকল ক্রীড়াতে যাহারা ১ম, ২য় ও ৩য় হইয়াছিল—সেই সকল বালকদিগকে রবীন্দ্রনাথ নানাপ্রকার পুস্তক, দোয়াত, ছুরী, ছবির বহি ইত্যাদি পুরস্কার দিয়া উৎসাহিত করিয়াছিলেন। এবং পরিশেষে সকল বালকদিগকে প্রচুর পরিমাণে সন্দেশ ভোজন করাইয়া সম্যক্ প্রকারে বালকদিগের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু।

বাঙ্গালা ভাষার লেখক।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

দেব-দ্বিজে ভক্তির ন্যায়, ইঁহাদের গুরুভক্তিও অচলা। গুরুবল,—ইঁহাদের পরম বল। এই গুরুভক্তি-বলেই ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ—অতি মলিন অবস্থা হইতে বিপুল বিত্তের অধিকারী হইয়াছিলেন। গুরুদত্ত অতি সামান্য টাকা অবলম্বন করিয়া,—ইঁহারা ভক্তি, বিশ্বাস ও বুদ্ধিবলে জমিদারী অবধি করিয়া যান। মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত শক্তিপুর পোষ্টের অধীন মণিকাহারের "ঠাকুর"-বংশ আমাদের গুরুবংশ। মদীয় গুরুদেবের নাম শ্রীল শ্রীযুক্ত কংসারিলাল ঠাকুর। পরম সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, গুরুদেবদিগের কৃপাদৃষ্টি ও সদয় ব্যবহার,—আমাদের প্রতি আজিও সমভাবেই আছে। আমাদের স্বর্গীয় পিতামহ ও প্রপিতামহ,—নিত্যানন্দ ও বৈষ্ণবচরণ,—পূর্ব্বপুরুষগণের সেই জমিদারীর আয় আরও বাড়াইয়াছিলেন। বিশেষ স্বর্গীয় ঠাকুরদাদা মহাশয়ের ধর্ম্মবলের সহিত বুদ্ধিবল অসাধারণ ছিল। পিতামহও এ বিষয়ে কম ছিলেন না; তবে, পুত্রের নিকট তাঁহাকে হারি মানিতে হইত বটে। ইঁহাদেরও ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী আছে। প্রতিবাসীগণ অভুক্ত থাকিতে ইঁহারা জলগ্রহণও করিতেন না।

মদীয় প্রপিতামহের এক সহোদর ছিলেন; তাঁহার নাম গোরাচাঁদ রক্ষিত। তিনি আমরণ ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিয়াছিলেন। তাঁহার ঈশ্বরভক্তি অতি আশ্চর্য্যরূপ ছিল। স্বপ্নে একদিন তিনি দর্শন করেন যে, শ্রীবৃন্দাবনের অমুক কুঞ্জে এক রাধিকামূর্ত্তি আছেন,—সেই রাধিকার সহিত আমাদের পৈতৃক রাসধারী ঠাকুরের বিবাহ দিতে হইবে।—ঠাকুর যেন স্বপ্নে তাহাকে এইরূপ প্রত্যাদেশ করেন। ভগদ্ভক্ত গোরাচাঁদ অবিলম্বে বৃন্দাবন-যাত্রা করিলেন, এবং নির্দ্দিষ্ট কুঞ্জে উপস্থিত হইয়া, সেই কুঞ্জের অধিকারী "ব্রজবাসীকে" আপন অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। তৎপরে বহুযত্নে সেই রাধিকামূর্ত্তি দেশে আনিয়া, মহা সমারোহে পৈতৃক দেবতা রাসধারী ঠাকুরের সহিত বিবাহ দিলেন। আজিও আমাদের বাটীতে সেই রাধিকামূর্ত্তি আছেন, এবং আজিও পূর্ব্বপ্রথা অনুসারে তিনিই রাসধারী ঠাকুরের বামে বিরাজ করেন, আর পূর্ব্ব রাধিকা ঠাকুরের

দক্ষিণে শোভা পান। তাই বলিয়াছি, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই পরম ধার্ম্মিক ও ভগবদ্ভক্ত ছিলেন;—দুর্ভাগা আমরা,—তাঁহাদের সেই উচ্চ আদর্শ গ্রহণ করিতে সক্ষম হই নাই।

লোকের পিতৃদায়, মাতৃদায়, কন্যাদায়,—সকল দায়েই আমাদের পিতৃপুরুষগণ মুক্তহস্ত ছিলেন। বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ—সম্বৎসরে শ্রদ্ধাসহকারে, অন্ততঃ সর্ব্বপ্রকারে পঞ্চাশবার ব্রাহ্মণ-ভোজন ইহাঁরা করাইতেন। ইদানী অবস্থা অতিমলিন হওয়ায়,—দোল-দুর্গোৎসবাদি সকলই বন্ধ হইয়া যাওয়ায়,—মদীয় পিতৃদেব ও জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় একরূপ জীবন্মৃত অবস্থায় ছিলেন।—তাঁহাদের ইহলোকের কর্ম্মভোগ ফুরাইয়াছিল; তাই যথাদিনে তাঁহারা সাধনোচিত পুণ্যলোকে চলিয়া গিয়াছেন।

২৪ পরগণার অন্তর্গত গোকুলনগর, গরাণকাটী, রাণাঘাট, ঘাড়ী প্রভৃতি স্থানে আমাদের মহাল ও চক্ ছিল;—তাহা সকলই এখন পরহস্তগত হইয়াছে। মদীয় পিতামহ মহাশয়,—আমাদের দেশস্থ সমস্ত কায়স্থসমাজ একত্র করিয়া তিনবার "একজাই" করিয়াছিলেন। ৭২ ঘরের মৌলিক কায়স্থ হইলেও, প্রতিপত্তি ও সম্ভ্রমবলে, অনেক মুখ্য কুলীনের সহিত আমাদের বংশের করণকারণ চলিয়া আসিতেছে। জয়নগরের মিত্র জমিদারগণ আমাদের মাতুলবংশীয়। মদীয় মাতামহের নাম ঈশ্বর পার্ব্বতীচরণ মিত্র। মাতুল মহাশয়দ্বয়ের নাম শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মিত্র ও শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মিত্র। উপস্থিত আমরা তিন সহোদর; আমাদের অগ্রজের নাম শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ রক্ষিত। গ্রন্থকার ও লেখক না হইলেও, অগ্রজ মহাশয় সাহিত্যামোদী ও কাব্যানুরাগী; সদাশয়, সচ্চরিত্র ও শান্তস্বভাব। দুর্ভাগ্যবশতঃ, আমাদের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, উদারচেতা মহেন্দ্রনাথ রক্ষিত ও আমাদের সর্ব্বকনিষ্ঠ সহোদর প্রাণাধিক পূর্ণচন্দ্র এবং জাস্তুতো ভাই,—কীর্ত্তিমান্ উপেন্দ্রনাথ রক্ষিত অকালে আমাদিগকে কাঁদাইয়া গিয়াছেন।

এই আমাদের সংক্ষিপ্ত বংশপরিচয়। এই বংশেই শ্রীমান্ বিপিনবিহারীর জন্ম। তিনি অনেকাংশে পৈতৃকগুণ পাইয়াছেন;—সচ্চরিত্র, উন্নতমনা, পরদুঃখকাতর ও পরোপকারী বলিয়া, বিপিনবিহারী, অনেকেরই স্নেহ এবং ভালবাসা পান। বিপিনবিহারীর দুই পুত্র,—শ্রীমান্ বিকাশচন্দ্র ও শ্রীমান্ প্রভাসচন্দ্র। আশীর্ব্বাদ করি, প্রাণাধিক বাবাজীউদ্বয় দীর্ঘজীবী হইয়া, ধর্ম্ম ও মনুষ্যত্ব অর্জ্জনপূর্ব্বক, কালে আমাদের বংশোজ্জ্বল করিবেন।

এই জন্মভূমিতে, বিপিনবিহারীর বাঙ্গালা লেখার একরূপ হাতে খড়ি হয়। আমিই তাহাকে বিশেষ উৎসাহ দিয়া, বহুযত্নে বাঙ্গালা সাহিত্যের আসরে নামাইয়াছি। প্রতিভার কি আশ্চর্য্য শক্তি!—জন্মভূমিতে এক প্রবন্ধ লিখিয়াই—বিপিনবিহারী সর্ব্বত্র সুপরিচিত হন। এক বাণভট্ট-রচিত সংস্কৃত কাদম্বরী গ্রন্থোক্ত মহাশ্বেতা চিত্রের অবতারণা করিয়াই,—সুকবি বিপিনবিহারী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনোযোগ আকর্ষণ করিলেন। তখন কেহ কেহ আমাকেই সেই অপূর্ব্ব সমালোচনাপূর্ণ প্রবন্ধের লেখক স্থির করিয়াছিলেন। সমধিক প্রশংসার বিষয় হইলেও সে প্রশংসার অধিকারী আমি নাহি,—আমার কনিষ্ঠ সহোদর—সুকবি শ্রীমান্ বিপিনবিহারী লিখিয়াছেন অল্প; কিন্তু যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই সারবান্, চিন্তাপূর্ণ ও সাহিত্যের পুষ্টিকারক।

জন্মভূমিতে প্রকাশিত "মহাশ্বেতা", "চিত্রদর্শন", "ছায়া", "প্রেমের পরীক্ষা", "মলিনা", "আক্ষেপ", "সমর্পণ", "বিকাশ", রাজা ও রাণী", "উদ্বোধন" প্রভৃতি বহু গদ্য পদ্য প্রবন্ধ এবং সমালোচনা,—শ্রীমান্ বিপিন-বিহারীর অপূর্ব্ব লিপি-কুশলতার উজ্জ্বল নিদর্শন। তাঁহার লিখন-ভঙ্গিমা, তাঁহার সদ্‌যুক্তি এবং তাঁহার চিন্তা ও ভাব-সমাবেশ,—অতি অপূর্ব্ব। তাঁহার ভাষা এত মিষ্ট ও কোমল যে, পড়িতে পড়িতে প্রাণ গলিয়া যায়। ফলতঃ এরূপ কবিত্বময়ী ভাষা এবং গভীর চিন্তা ও সুভাবপূর্ণ লিপি-কুশলতা,—বাঙ্গালা সাহিত্যে অতিঅল্পই পরিদৃষ্ট হয়। বিপিনবিহারীর লেখা, যে পড়িয়াছে, সেই মুগ্ধ হইয়াছে। নব্যভারতে প্রকাশিত তাঁহার রচিত, "বর্ষার বিরহগাথা" শীর্ষক,—মেঘ-দূতের সমালোচনা এবং "সঞ্জীবনী" ও "আরতি" শীর্ষক কবিতাদ্বয় ও অনুসন্ধানে "ঘোম্‌টা" নামে প্রবন্ধ,—তাঁহার কবি-প্রতিভার উজ্জ্বল নিদর্শন। এখন, সাহিত্যের বাজারে কেহ কাহাকে মানে না; কেহ কাহাকে সহজে উচ্চাসন দিতে চাহে না; তাই বিপিনবিহারীর তেমন আদর ও সম্মান হয় নাই; কিন্তু উত্তর-কালে যিনি নিরপেক্ষভাবে সাহিত্যের ইতিহাস লিখিবেন, আশা আছে, এই অপূর্ব্ব মৌলিক প্রতিভা সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিবেন, এবং সাহিত্যে বিপিনবিহারীর অদ্ভুত শক্তির কথা, মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিবেন।

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।